বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস



বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস

(বরিশাল বিভাগ)

বাকলা

রোহিণীকুমার সেন

বরিশালের বিবরণ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বাকরগঞ্জের ইতিহাস

খোসালচন্দ্র রায়

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস

বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড



র‍্যাডিক্যাল
কলকাতা
২০০০

BRIHATTARA BAKARGANJER ITIHAS

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর, ২০০০

প্রচ্ছদ :
অমিতাভ ভট্টাচার্য

প্রকাশক ও মুদ্রক :
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

প্রয়াত শৈলেশ্বর চক্রবর্তী
বরিশাল নিবাসী

মরহুম দেওয়ান মাওলানা আজিজুর রহমান
বদরপুর, হিজলা নিবাসী

মরহুম আবদুস সামাদ সিকদার
তারুলী, ঝালকাঠি নিবাসী

মুখবন্ধ

বাকরগঞ্জের ইতিহাস, চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ও বাকলা এই তিনখানাই অনেক দিন হল দুষ্প্রাপ্য। দীর্ঘদিন ধরেই বই তিনটির পুনর্মুদ্রণ খুবই জরুরি বলে মনে হচ্ছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে তথা অবিভক্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে বরিশাল অঞ্চলের যে একটি গৌরবজনক ভূমিকা রয়েছে সে কথা প্রায় সর্বজনবিদিত হলেও প্রামাণ্য বইপত্রের অভাবে সব সময় একথাগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি।

বরিশাল অঞ্চলের ইতিহাস চর্চায় কিছু কিছু বিদেশীর মধ্যে মুখ্যত ইংরেজ রাজকর্মচারীরা উৎসাহ দেখালেও ইংরেজি ভাষায় লেখা সেসব ইতিহাস অনেকাংশেই বিকৃত এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতায় আক্রান্ত।

১৮৯৫ সালে শ্রী খোসাল চন্দ্র রায় 'বাকরগঞ্জের ইতিহাস' নামে বরিশাল অঞ্চলের প্রথম বাংলা ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ১৯১৩ সালে বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড 'চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস' প্রকাশ করেন এবং ১৯১৫ সালে রোহিণী কুমার সেন (রায় চৌধুরী) রচিত 'বাকলা' নামক বরিশাল অঞ্চলের ইতিহাসের আকর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

একত্রে এই তিনটি বই পড়লে প্রাচীন বরিশাল অঞ্চলের একটি সামগ্রিক ছবি পাওয়া যাবে মনে করেই এ বই তিনটি একত্রে প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ থেকে বরিশালবাসী যেমন নিজেদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাবেন তেমনি বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও বই তিনটি মূল্যবান অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ তিনটি বই বাদেও বরিশালের ইতিহাস বিষয়ে আরও কিছু কিছু বাংলা বই বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, যে বইগুলো পরবর্তী সময়ে একত্রে প্রকাশনার ইচ্ছে রইল।

ইংরেজদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে এ অঞ্চলের মানুষের

সংগ্রামী চেতনাকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। একমাত্র হেনরি বেভারেজ-এর বইটি কিছুটা তথ্যসমৃদ্ধ এবং পাঠযোগ্য হলেও অন্য বইগুলো একদেশদর্শিতায় পরিপূর্ণ।

একত্রে প্রকাশিতব্য বই তিনটি আমি কলকাতা থেকে সংগ্রহ করি। একটি বই সংগ্রহে আমাকে সহায়তা করেন কলকাতার বিশিষ্ট কবি সাগর চক্রবর্তী।

ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী ও উৎসাহী পাঠকদের কাছে বই তিনটি একত্রে পৌঁছে দিতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আগামী দিনে বরিশালের লুপ্তপ্রায় আরও বহু ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করে নতুন কোন গবেষক নতুনভাবে এ অঞ্চলের যথার্থ ইতিহাস রচনা করবেন– এ প্রত্যাশা নিশ্চয়ই অমূলক হবে না।

দুটি কথা

অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে সমগ্র বাকরগঞ্জ-বরিশাল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় পর্বের সূচনা করে। দক্ষিণে বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলে চরা পড়ে ভূখণ্ড গড়ে উঠেছে বছরের পর বছর। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বারবার বিধ্বস্ত এই ভূখণ্ডকে প্রকৃতি দান করেছে অজস্র সম্পদও। বাকরগঞ্জ-বরিশালের ইতিহাস সমৃদ্ধির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক বাধাকে অগ্রাহ্য করে মূল ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন অঞ্চল পরিণত হয়েছে বৃহৎ জনবসতিতে। বাকরগঞ্জ থেকে পটুয়াখালীকে বিচ্ছিন্ন করে পরবর্তীকালে গঠিত হয়েছে বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলা। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মগ– নানা জাতের মানুষ সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করেছে দীর্ঘকাল। মন্দির, মসজিদ, লৌকিক দেবদেবী, পীর-পয়গম্বর নিয়ে ছিল সমৃদ্ধ আঞ্চলিক ইতিহাস।

'বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস'-এ তিন খানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর বরিশাল সংক্রান্ত বিবরণ এবং আধুনিক বাকরগঞ্জের তথ্য।

রোহিণীকুমার সেনের 'বাকলা' প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর। প্রকাশ করেন রোহিণীকুমারের পুত্র সুধাংশুকুমার সেন। রচনার পর আট বৎসর গ্রন্থটি অমুদ্রিত অবস্থায় পড়ে থাকে। তাছাড়া বেশ কিছু স্থানে রচনা অসম্পূর্ণ থাকায় সুধাংশুকুমার কিছু স্থান পুনর্লিখনের প্রয়োজন বোধ করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস অধ্যাপক হেমচন্দ্ররায় চৌধুরী। অত্যন্ত মূল্যবান কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবিসহ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণ থেকেই বর্তমান পুনর্মুদ্রণ।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জলপথে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে বাকরগঞ্জের কয়েকটি স্থানে যান। বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে তার প্রেরিত বিবরণ

নিয়মিত প্রকাশিত হতো 'সংবাদ প্রভাকরে'। সেই সমস্ত তথ্যপূর্ণ অসামান্য রচনাগুলি পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় 'ভ্রমণকারীবন্ধুর পত্র' নামে। সমাজসচেতন কবির চোখ যে কতখানি নিবিড় ও প্রখর ছিল রচনাগুলিতে তা সুস্পষ্ট। সেইসব রচনা থেকে কেবল বরিশাল ও তৎসংলগ্ন বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

'বাকলা' এবং 'বাকরগঞ্জের ইতিহাস' দুটি গ্রন্থে দু'রকম বানান রীতি ছিল। সেইসব বানানে এক রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এই প্রাচীন গ্রন্থ দুটির বানান যথাসাধ্য আধুনিক করা হয়েছে। 'বাকর' না 'বাখর'-এ বিষয়ে বিতর্ক আছে বিস্তর। তাই ঐ অঞ্চলের কয়েকজন প্রাচীন অধিবাসীর পরামর্শে বইটির সর্বত্রই 'বাকর' অনুসরণ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

বাকলা : রোহিণীকুমার সেন ১৭-২৫৮

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী : শরৎকুমার রায় ১৯-২২

সূচনা ২৩

প্রথম অধ্যায় : সীমা ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাচীন প্রাকৃতিক বিবরণ ২৭

তৃতীয় অধ্যায় : প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহ ৪১

চতুর্থ অধ্যায় : প্রাচীন সমাজ ৭৮

পঞ্চম অধ্যায় : পরগনা ১০৩

(১) চন্দ্রদ্বীপ ১০৬, (২) গ্রেদ-বন্দর ১৩৪, (৩) বোজরগ উমেদপুর ১৩৫, (৪) সেলিমাবাদ ১৪৪, (৫) হাবেলি সেলিমাবাদ ১৬৮, (৬) তপ্পে হাবেলি ১৭৮, (৭) ইদিলপুর ১৭৮, (৮) তপ্পে নাজিরপুর ১৮০, (৯) রতন্দি কালিকাপুর ১৮১, (১০) উত্তর সাহাবাজপুর ১৮৩, (১১) দক্ষিণ সাহাবাজপুর ১৮৫, (১২) তপ্পে কৃষ্ণদেবপুর ১৮৮, (১৩) তপ্পে আলিনগর ১৮৮, (১৪) রামনগর ১৮৮, (১৫) তরফ রামহরিচর ১৮৯, (১৬) কল্‌মিচর ও তরফ ১৯০, (১৭) সুলতানাবাদ ১৯০, (১৮) কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়া ১৯১, (১৯) খাঞ্জা বাহাদুরনগর ১৯১, (২০) শ্রীরামপুর ১৯১, (২১) তপ্পে আবদুল্লাপুর ১৯১, (২২) তপ্পে কাদিরাবাদ ১৯৩, (২৩) তপ্পে আজিমপুর ১৯৩, (২৪) জাহাপুর ১৯৪, (২৫) ইদ্রাকপুর ১৯৪, (২৬) রসুলপুর ১৯৪, (২৭) বাঙারোড়া ১৯৪, (২৮) পরগনে বীরমোহন্ ১৯৯,' (২৯) তপ্পে বীরমোহন ১৯৯, (৩০) হবিবপুর ২০০, (৩১) মৈজরদি ২০০, (৩২) জালালপুর ২০০, (৩৩) সায়েস্তাবাদ ২০১, (৩৪) সায়েস্তানগর ২০৩, (৩৫) সাহাজাদপুর ২০৪, (৩৬) তপ্পে বাহাদুরপুর ২০৬, (৩৭) অরঙ্গপুর ২০৬, (৩৮) সৈদপুর ২১০

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইংরাজ রাজত্ব ২২২

সপ্তম অধ্যায় : সাহিত্য ও শিল্প ২৩৪

বরিশালের বিবরণ : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২৫৯-২৭৭

বাকরগঞ্জের ইতিহাস : খোসালচন্দ্র রায় ২৭৯-৩৬৬

উপক্রমণিকা : ২৮৭

প্রথম অধ্যায় : প্রাকৃতিক বিবরণ ২৮৯, দ্বীপ ২৯০, নদী ২৯০, দোন সমূহের নাম ২৯০, বিল ২৯১, ঝটিকাবর্ত ২৯১, বরিশাল গান ২৯১, উৎপন্ন সামগ্রী ২৯২, শস্যাদি ২৯২, মৎস্য ২৯২, পশ্বাদি ২৯২

দ্বিতীয় অধ্যায় : পুরাতন ইতিহাস ২৯৩

তৃতীয় অধ্যায় : পরগনার বিবরণ ও রাজস্ব ২৯৬. পরগনাসমূহের নাম ৩০০, চন্দ্রদ্বীপ ৩০০, বোজরগ উমেদপুর ৩০৪, সিলেমাবাদ ৩০৫, ইদিলপুর ৩০৫, নাজিরপুর ৩০৬, রতনদি কালিকাপুর ৩০৬, উত্তর সাহাবাজপুর ৩০৬, দক্ষিণ সাহাবাজপুর ৩০৬, সুলতানাবাদ ৩০৮, ইদ্রাকপুর ৩০৮, বাঙারোড়া ৩০৮, বীরমোহন ৩০৮, অরঙ্গপুর ৩০৮, সৈদপুর ৩০৮, পরগনার হকিয়ত ৩০৯, পরগনার জমিদার ৩০৯, গভর্নমেন্টের খাসসম্পত্তি ৩০৯, সুন্দরবন ৩০৯।

চতুর্থ অধ্যায় : ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও দেশের অবস্থা ৩১২

পঞ্চম অধ্যায় : সাধারণ বিবরণ ৩১৭, লোকসংখ্যা ৩১৭, মুসলমান ৩১৭, হিন্দু ৩১৮, বৌদ্ধ ৩১৯, খৃষ্টান ৩১৯, ব্রাহ্ম ৩১৯, লোকের স্বাভাবিক লক্ষণ ৩১৯, বাকরগঞ্জের জাতিসমূহের নাম ৩২০, মাদকদ্রব্য ৩২০, আমোদ ৩২০, কারখানা ও বাণিজ্য ৩২১, জলপথ ও স্থলপথ ৩২২, স্বাস্থ্য ও রোগ ৩২৩, দাতব্য ঔষধালয় ৩২৪, শিক্ষা ৩২৪, সাধারণ পুস্তকালয় ৩২৭, সংবাদপত্র ৩২৭, মুদ্রাযন্ত্র ৩২৭, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ৩২৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : বারকগঞ্জে ইংরেজ রাজত্ব ৩২৯, ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকদ্দমার সংখ্যা ৩৩৩, জেল ৩৩৩, রেজিস্টারি অফিস ও পোস্টাফ্রিস ৩৩৩, স্বায়ত্তশাসন ৩৩৪, পথকর ৩৩৫

সপ্তম অধ্যায় : সদর ও সব ডিভিসনের বিবরণ ৩৩৬, বরিশাল ৩৩৬, পিরোজপুর ৩৩৭, পটুয়াখালি ৩৩৭, ভোলা ৩৩৮

পরিশিষ্ট : গ্রামসমূহের বিবরণ ৩৪০, কীর্তিপাশা ৩৪১, তারপাশা ৩৪৩, কেওরা, বেলদাখান ও রসমতি ৩৪৪, বাসন্ডা ৩৪৫, হাবেলি সিলেমাবাদ ৩৪৫, উত্তর সাহাবাজপুর ৩৪৬, লতা ৩৪৬, সায়েস্তাবাদ ৩৪৮, কাশীপুর ৩৫১, লাখুটিয়া ৩৫১, রহমতপুর ৩৫২, শিকারপুর ৩৫২, উজিরপুর ও বার পাইকা ৩৫৩, নথুল্লাবাদ ৩৫৩, গাভা ৩৫৪, নারায়ণপুর ৩৫৪, বাটাজোড়

৩৫৫, শোলোক ৩৫৬, নলচিড়া ৩৫৬, গৈলা ও ফুল্লশ্রী ৩৫৭, চাঁদসি ৩৫৯, রামচন্দ্রপুর ৩৬০, মানপাশা ৩৬১, পিরোজপুর বিভাগ-রায়ের কাঠি ৩৬২, সাতুরিয়া ৩৬৩, বানরিপাড়া, নরোত্তমপুর ও কুন্দিহার ৩৬৩, খ লিসাকোটা ৩৬৪, পটুয়াখালি ৩৬৫, দক্ষিণ সাহাবাজপুর-ভোলা ৩৬৬

সংযোজন ১ : ৩৬৭-৪৫৬

বর্তমান বাকরগঞ্জ জেলা ৩৬৯, নদনদী ৩৭৮, বরিশাল-বুড়ীশ্বর ৩৮৪, তেঁতুলিয়া নদী ৩৮৫, কীর্তনখোলা নদী ৩৮৬, আড়িয়ালখাঁ নদী ৩৮৬, মাছ ঃ অন্যতম সম্পদ ৩৮৮, জীবজন্তু-পাখি-গাছপালা ৩৯১, কৃষিসম্পদ ৩৯২, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ৩৯৫, অর্থনৈতিক অবস্থা ৩৯৯, জীবন ও সংস্কৃতি ৪১১, জেলার মেলা ৪১৩, ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব ৪১৪, নারী জাগরণ ৪১৬, বরিশালে বিধবা বিবাহ ৪১৬, নারী স্বাধীনতা ৪১৭, বাল্য-বিবাহ বিতর্ক ৪১৭, রাজনৈতিক আলোড়ন ৪১৭, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ৪৩২, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ৪৩৭, শিক্ষাব্যবস্থা ৪৪০, পুরসভা ৪৪৩, বিশিষ্ট স্থান ৪৪৫, বরিশাল ৪৪৫, সুজাবাদ-বাটাজোড়-লাখুটিয়া-চরামদ্দি-মাধবপাশা ৪৪৬, রামসিদ্ধি-শারিকল-মাহিলাড়া-ক্ষুদ্রকাঠি-খাঁপুরা ৪৪৭, রহমতপুর-আধুনা-চন্দ্রহার ৪৪৮, বাকরগঞ্জ-পাদ্রি শিবপুর ৪৪৯, লতা-শিয়ালঘুনি-নারায়ণপুর-ভারুকাঠি-বাইশারি ৪৫০, শিকারপুর-গৈলা-ফুল্লশ্রী ৪৫১, চাঁদসি-ভোলা ৪৫২, দৌলতখাঁ-মনপুরা ৪৫৩, চাখার-পিরোজপুর-স্বরূপকাঠি-বানরিপাড়া ৪৫৪, মঠবাড়িয়া-রায়েরকাঠি-ঝালকাঠি-কীর্তিপাশা-নলছিটি ৪৫৫, পুনিহাটি-চরফ্যাসন ৪৫৬

সংযোজন ২ : ৪৫৭-৫৩২

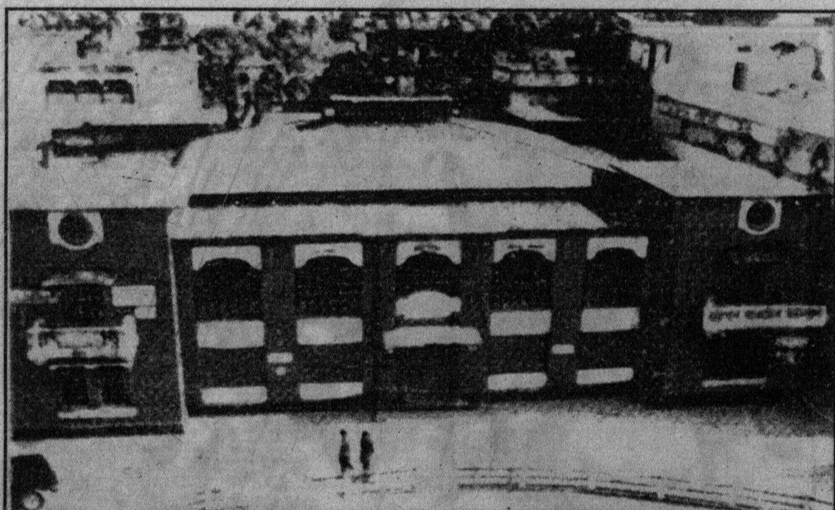
প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ : বাকলা ৪৫৯, চন্দ্রদ্বীপ ৪৬০, উৎপত্তির বিবরণ ৪৬০, বাকলা চন্দ্রদ্বীপের খারিজা পরগনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৪৬৪, দনুজমর্দন ও চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ৪৬৯, বরিশালের উপভাষা ৪৭১, বরিশালের ত্রয়ী ৪৭৪, গৈলার কথা ৪৮০, বাকরগঞ্জ ঃ দেশভাগের সময় ৪৯৪, বাকরগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ ৫০৭, মেলা ঃ হান্টারের বিবরণ ৫১৪, পরগনা ঃ হান্টারের বিবরণ ৫১৪, বাকরগঞ্জের ছড়া আর লোকসঙ্গীত ৫১৮

সংযোজন ৩ : চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস : বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড ৫৩১-৬১০

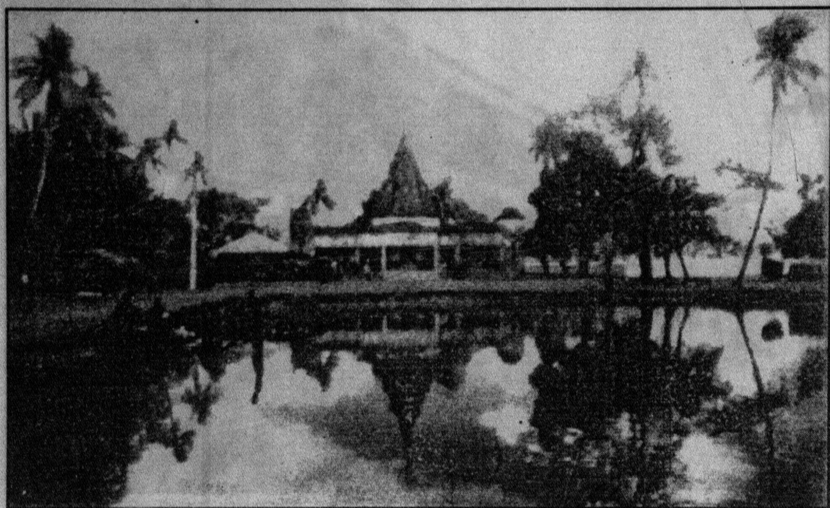
নির্ঘণ্ট ৬১১



দক্ষিণ বাংলার এক সময়ের 'অক্সফোর্ড অব বেঙ্গল' ঐতিহ্যের অধিকারী বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ।



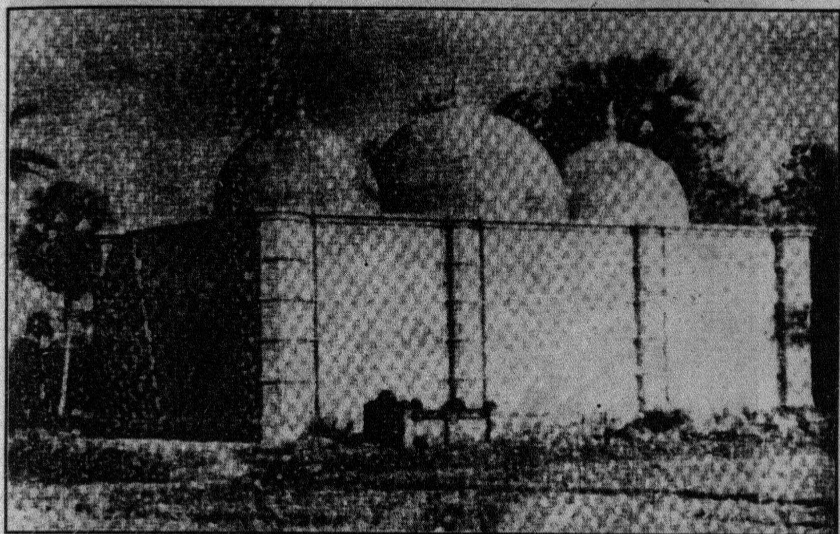
বরিশালের ঐতিহ্যবাহী অশ্বিনীকুমার হল



বরিশালের ঐতিহাসিক শ্রীশ্রী শংকর মঠ, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে যার ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা



চারণ কবি মুকুন্দ দাসের কালিবাড়ি



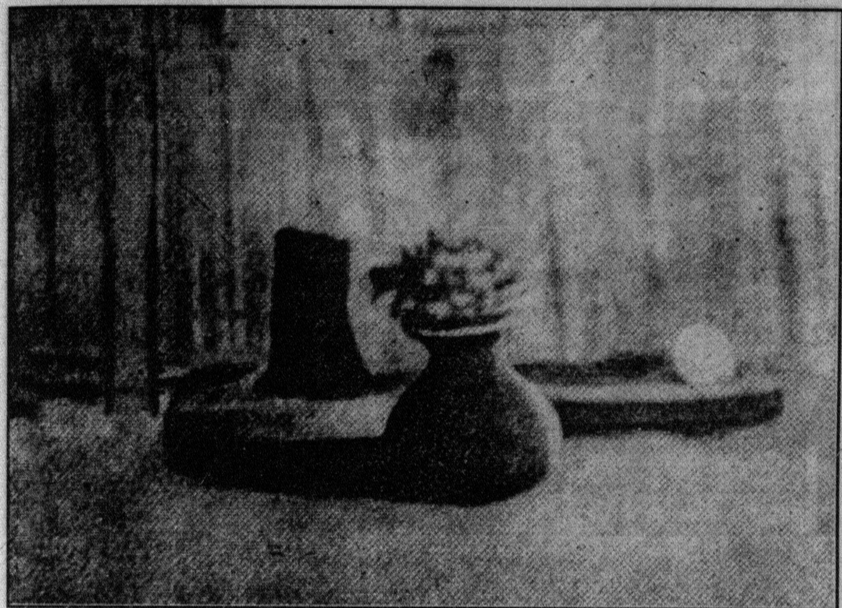
কমলপুর মসজিদ



দক্ষিণ বাংলার মৃৎ শিল্প।



কালাচাঁদ বিগ্রহ– পোনাবালিয়া



তারাবাড়ী- শিকারপুর



সিদ্ধেশ্বরী মন্দির– রায়েরকাঠী



দক্ষিণাঞ্চলের রাখাইন সম্প্রদায়



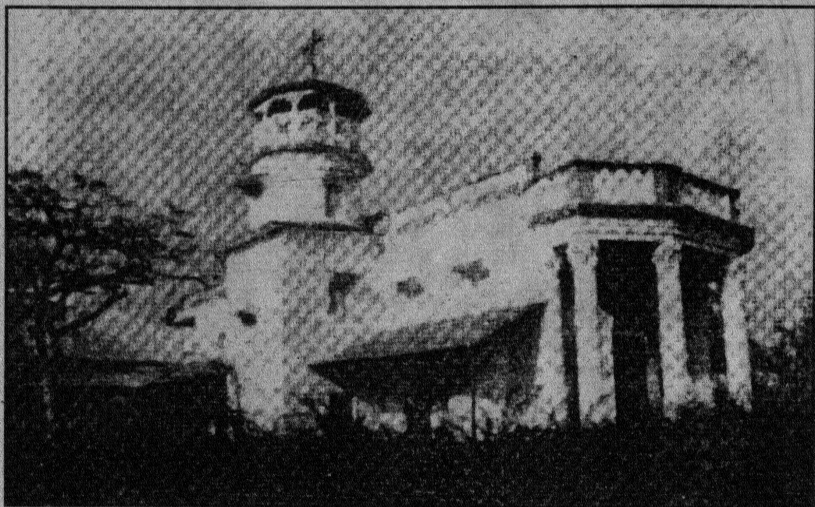
দুর্গাসাগর দিঘি



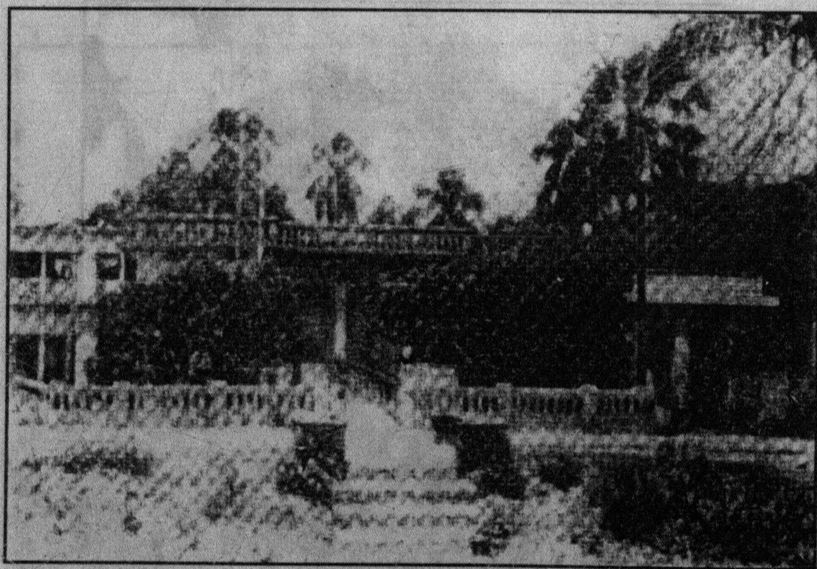
এ্যাম্বক ভৈরব– পোনাবালিয়া



রামভদ্ররায়ের প্রতিষ্ঠিত মন্দির – পোনাবালিয়া



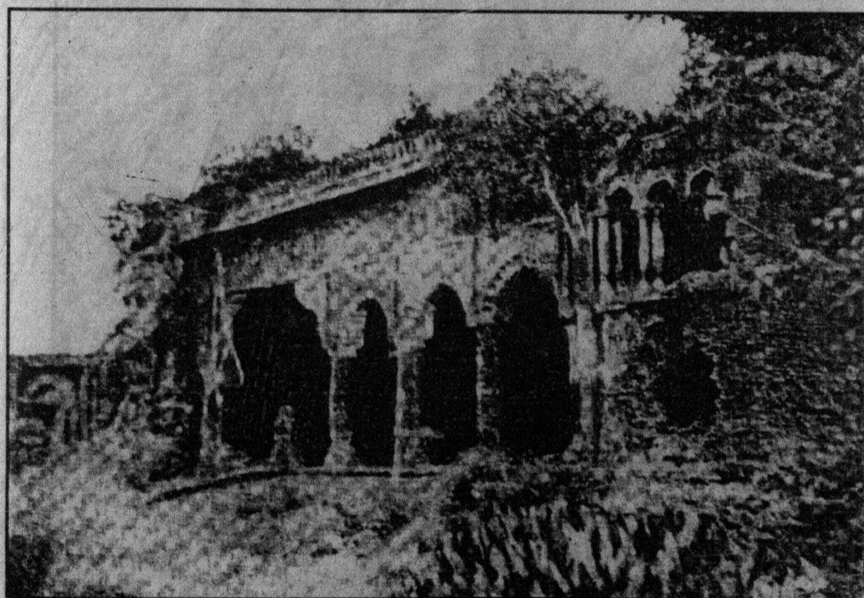
পাদ্রি শিবপুর গির্জা– আঠার শতক



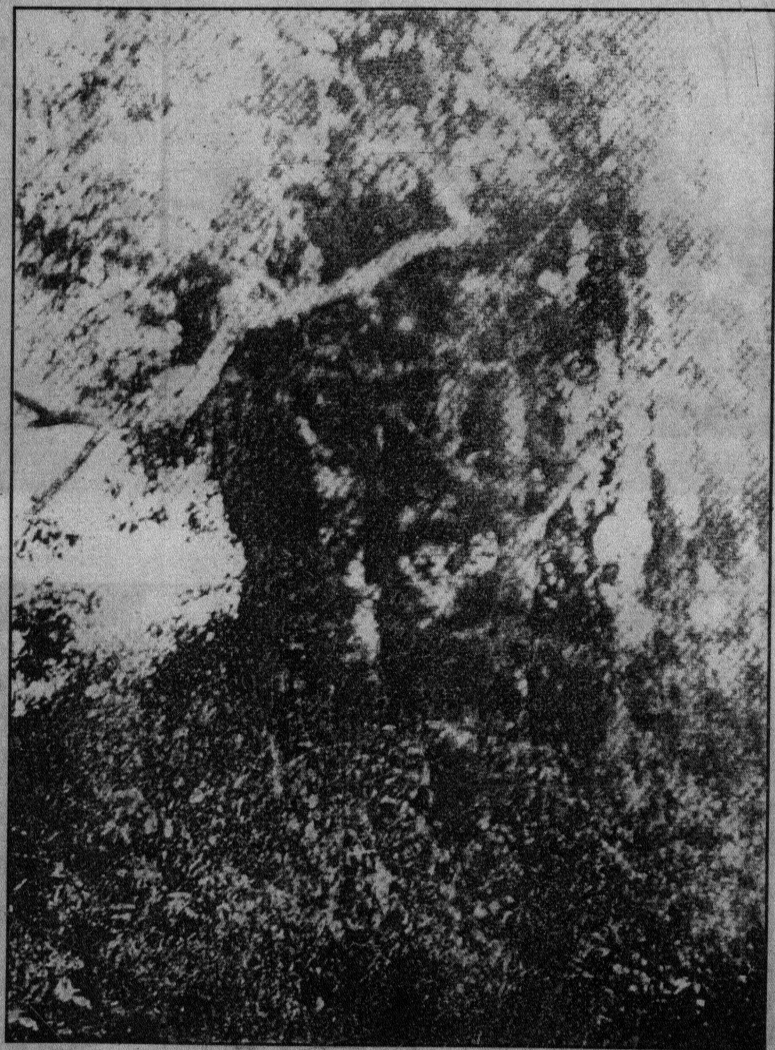
শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বাসভবন– চাখার



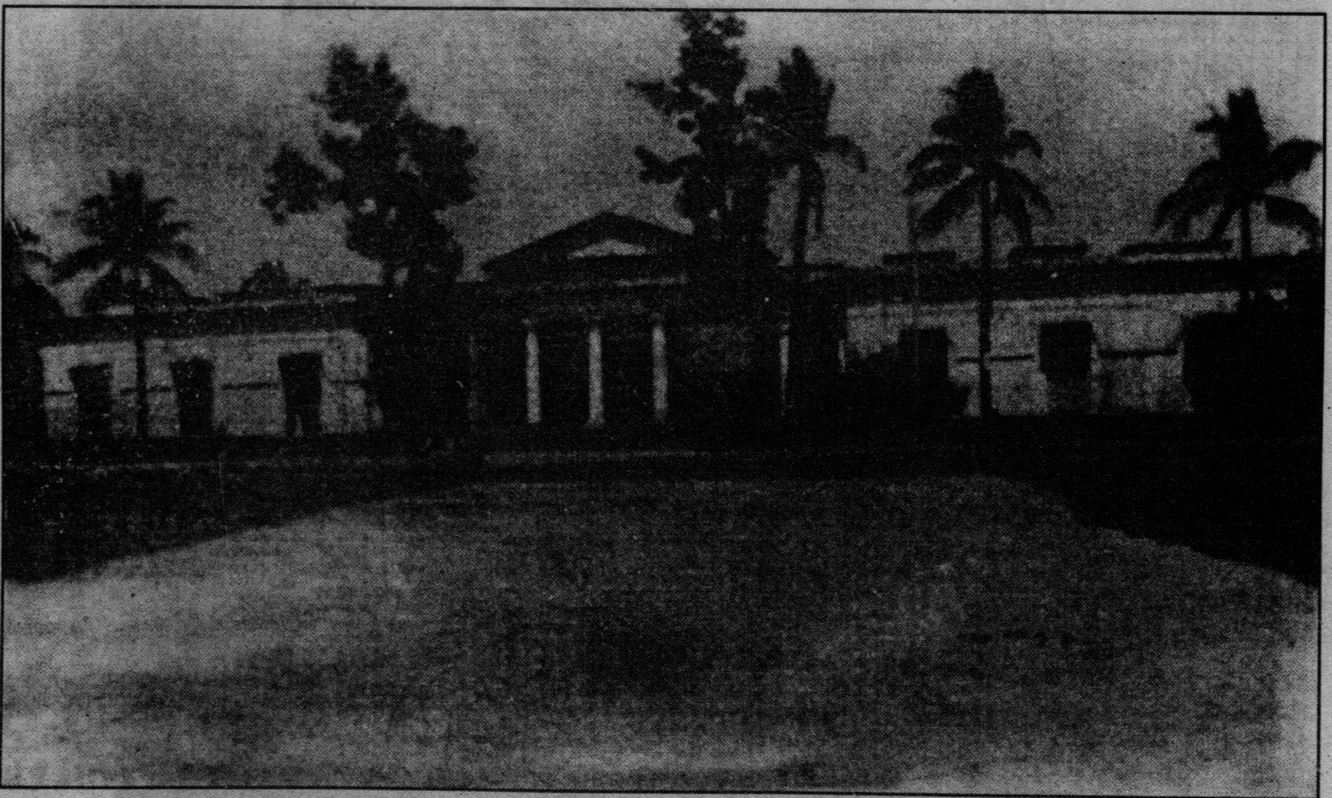
নবরত্ন – রায়েরকাঠী



রাজবাটী – মাধবপাশা



মঠবাড়ী – রুণ্‌সী



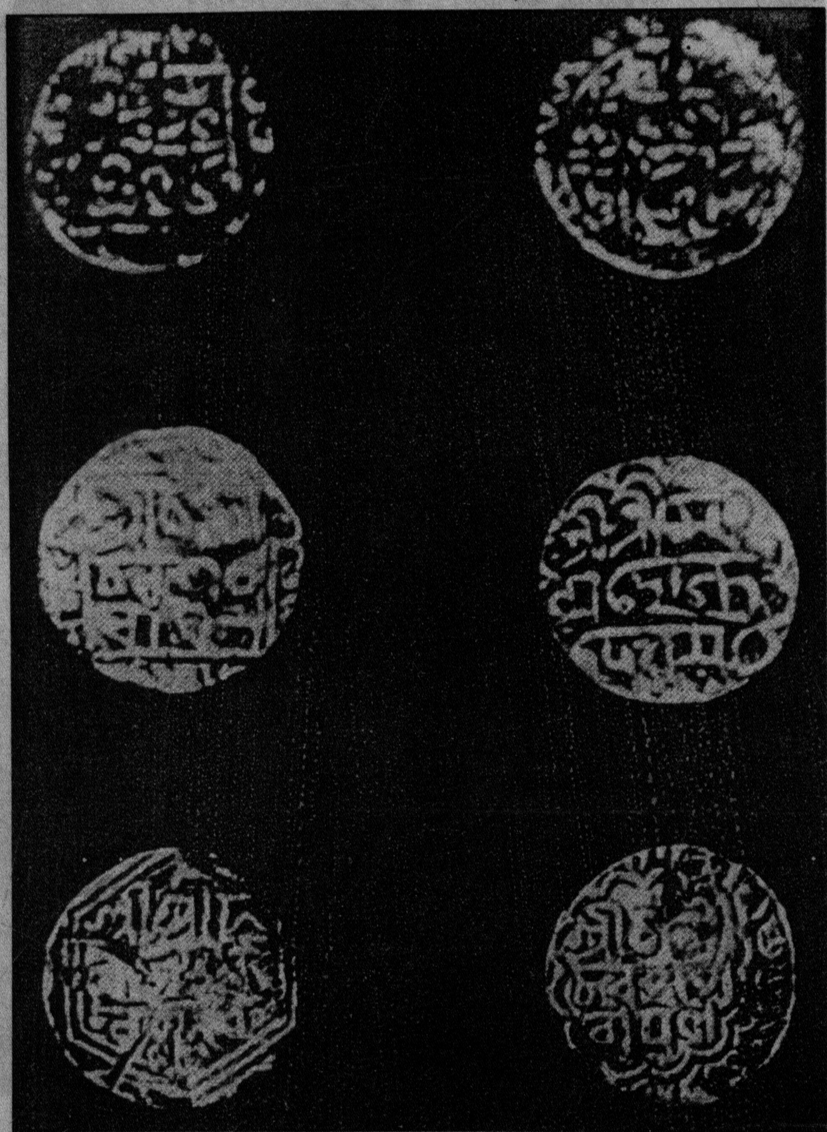
জেলা স্কুল বরিশাল



স্বদেশী আন্দোলনে সেবক সম্প্রদায়



অশ্বিনীকুমার দত্ত



মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন নামাঙ্কিত মুদ্রা



গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী



"আলো ও ছায়া"– রচয়িত্রী কামিনী দেবী

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ দাতা দেওয়ান কৃষ্ণরাম ও প্রাতঃস্মরণীয় রাজারাম সেনের বংশধর স্বর্গীয় জমিদার রোহিণীকুমার ১২৭৪ সনের বৈশাখ মাসে বরিশাল জেলার অন্তর্গত কীর্তিপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার স্বর্গীয় জনক প্রসন্নকুমার একজন শক্তিশালী তেজস্বী ও স্বনামধন্য জমিদার বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বাল্যকালে রোহিণীকুমারের পিতৃবিয়োগ হয়।

রোহিণীকুমারের জননী ষষ্ঠীপ্রিয়া দেবী নিরতিশয় বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। তিনি পতির মৃত্যুর পরে কিছুকাল জমিদারি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিয়াছেন। স্বীয় জনকজননীর চরিত্র হইতে রোহিণীকুমার দয়া, পরোপকার, লোকহিতৈষণা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ লাভ করিয়াছিলেন।

বিবিধ সদ্‌গুণভূষিত রোহিণীকুমার এদেশবাসী জমিদারবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, প্রজাপালন, সঙ্গীতশাস্ত্র, সাহিত্য, ফটোগ্রাফি, টাইপরাইটিং প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার অধিকার ছিল। এরূপ বহুগুণসম্পন্ন চরিত্রবান রোহিণীকুমারকে আমরা নিঃসঙ্কোচে এদেশবাসী জমিদারবর্গের আদর্শস্থানীয় বলিতে পারি।

বাল্যবয়সে রোহিণীকুমারের পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল, সুতরাং বয়োপ্রাপ্ত হইয়াই তাঁহাকে স্বীয় বিস্তৃত জমিদারি রক্ষা করিবার জন্য বিষয়কার্যে মনোনিবেশ করিতে হইল। এইসকল অনিবার্য কারণ পরম্পরায় রোহিণীকুমারের স্কুল ও কলেজে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটিল না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রসাদে বঞ্চিত হইলেও স্বীয় অসাধারণ অধ্যয়নানুরাগ রোহিণীকুমারকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি আমরণ একজন অধ্যয়নপরায়ণ ছাত্র ছিলেন। জটিল বিষয়কার্যের ভিতর সর্বদা ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি আপনার জ্ঞানার্জন স্পৃহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রায় প্রত্যহ ছয়, সাত ঘণ্টাকাল ইংরেজি ও বাংলা মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিকপত্র, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন।

শরীর, মন ও আত্মা এই তিন লইয়াই মানুষ। এই তিনের প্রকৃষ্টরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে ; রোহিণীকুমার এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি এই তিনের উৎকর্ষসাধনে সতত যত্নশীল ছিলেন। একদিকে শরীর কর্মক্ষম ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য তিনি ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে বালক ও যুবকদিগের সহিত নিয়মিতরূপে খেলিতেন, অপরদিকে সাহিত্য ও ধর্মপুস্তক পাঠক এবং ধ্যানধারণাদি দ্বারা মানসিক বৃত্তিনিচয় বিকশিত করিয়া মন ও আত্মার পরিপুষ্টি সাধন করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত অনেক যুবক সাধারণত যেরূপ ইংরেজি ও বাংলা লিখিয়া ও বলিয়া থাকেন, রোহিণীকুমার উক্ত উভয় ভাষায়ই লিখিতে ও বলিতে তদপেক্ষা সুনিপুণ ছিলেন। স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায়বলে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে সুলেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি উপন্যাস, নাটক ও ইতিহাসে সর্বশুদ্ধ পঞ্চদশ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে নয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে, অপর ছয়খানি অদ্যাপি অপ্রকাশিত

রহিয়াছে। স্বদেশপ্রেমিক রাজপুত বীরগণের পুণ্যময় জীবনকাহিনী অবলম্বনে তিনি "কিরণ সিংহ", "চণ্ডবিক্রম" ও "চিতোরউদ্ধার" নামক তিনখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়া মৃতপ্রায় বাঙ্গালির হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপনের চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের কোন কোন খানি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। ভাষার গৌরবে বা বর্ণনার চাতুর্যে উল্লিখিত পুস্তকগুলি বঙ্গ সাহিত্যভাণ্ডারে অত্যুজ্জ্বলরত্ন বলিয়া পরিগণিত না হইলেও লেখকের হৃদয়ের স্বদেশ-হিতৈষণার পরিচায়ক বলিয়া তাহা সর্বত্র আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। "কনকলতা", "প্রমোদবালা", "মায়াবিনী" ও "সুধামুখী" নামক চারিখানা সামাজিক উপন্যাসে সাহিত্য-সেবক রোহিণীকুমার সমাজের সমক্ষে সতীর গৌরব অসতীর নিগ্রহ ও ভালবাসার পবিত্র ছবি উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কুশল, নির্দোষ আমোদপ্রিয়, চরিত্রবান রোহিণীকুমার স্বীয় আত্মীয়-বন্ধুবর্গকে লইয়া শারদীয় দুর্গোৎসবকালে ও বৈশাখ মাসে নাটকাভিনয় করিতেন। এতদুপলক্ষে তিনি পুরাণ, শাস্ত্র ও দেবীমাহাত্ম্য অবলম্বনে "রাজসূয়", "প্রভাবতী", "দনুজদলনী", "ঊষাহরণ" ও "সুরথসমাধি" নাটকখানিতে তিনি দেবীমাহাত্ম্যের কঠোর আধ্যাত্মিক বিষয় সাধারণের বোধগম্য প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার এই নাটকখানি ও "দনুজ-দলনী" অভিনীত হইলে সত্যসত্যই লোকের মনে ধর্মভাব ও ভক্তিভাব জাগিয়া উঠিত। তাঁহার রচিত নাটকগুলির মধ্যে একমাত্র "রাজসূয়" মুদ্রিত হইয়াছে, অন্যগুলি অদ্যাপি অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে।

রোহিণীকুমারের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "বাকলা" নামে বাকরগঞ্জের একখানি ইতিহাস। এই জন্য তিনি বহুপুস্তক পাঠ, যথেষ্ট অর্থব্যয়, ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বহুকষ্ট স্বীকার করতঃ অনেক স্থানে গমন করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, অনেক ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন এবং কয়েকখানি তাম্রফলক সংগ্রহ করিয়া তৎসম্বন্ধে খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এই অভীপ্সিত গ্রন্থের জন্য শারীরিক ও মানসিক কঠোর পরিশ্রমে অকালে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তাই তিনি এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা বাকরগঞ্জবাসীদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য।

অধ্যয়নানুরাগী রোহিণীকুমার আপনাদের ব্যয়ে স্বীয় বাটিতে একটি সুবৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, উক্ত পুস্তকালয়ে ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন প্রকারের বহু সংখ্যক পুস্তক আছে। শব্দকল্পদ্রুম্ "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা", বিশ্বকোষ, এবং Historian's History of the World প্রভৃতি মূল্যবান পুস্তকও অনুসন্ধিৎসু রোহিণীকুমার ক্রয় করিয়াছেন। কেহ মনে করিবেন না, এ সকল পুস্তক কেবলমাত্র আলমারির শোভা সম্পাদনার্থ ক্রয় করা হইয়াছিল, জ্ঞানপিপাসু রোহিণীকুমারের জ্ঞানার্জনস্পৃহাই তাঁহাকে এ সকল পুস্তকক্রয়ে প্রণোদিত করিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফার বলিয়া প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে সুদূর অমরাবতী প্রদর্শনী সভা হইতে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর টাইপিস্ট ছিলেন। অসাধারণ চতুরতার সহিত তিনি ঘণ্টায় আট, দশখানি পত্র যন্ত্রের সাহায্যে ছাপিতে পারিতেন। এ বিদ্যাভ্যাসের জন্য তিনি কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি অসাধারণ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। এস্রাজ, হারমোনিয়াম, তবলা, পিয়ানো প্রভৃতি বহুযন্ত্রবাদনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। বেতনভোগী সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট প্রথমে তিনি এ বিদ্যা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন, পরিশেষে পুস্তকাদির সাহায্যে উত্তরোত্তর স্বীয় জ্ঞানের পরিসর বর্ধিত করিয়াছিলেন।

বিনয় বিদ্যাতরুর সুমধুর ফল, "বিদ্যা দাদাতি বিনয়ং"। রোহিণীকুমারের জ্ঞানবৃক্ষে বিবিধ রসাল ফল ফলিয়াছিল। তাই তিনি আপনার জ্ঞানগৌরবে নিরতিশয় বিনীত নিরহঙ্কারী ও অমায়িক

হইয়াছিলেন। সারল্যের প্রতিমূর্তি উলঙ্গ শিশু হইতে গলিতচর্ম পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই তাঁহার সদালাপ ও অমায়িকতায় পরিতৃপ্ত ছিলেন। সুবৃহৎ যুক্তপরিবারস্থ ভ্রাতাভগ্নী, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন, কর্মচারীবর্গ ও দাস দাসী, সকলেই তাঁহার সাধু ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলেন।

ধনাঢ্যব্যক্তি প্রায় অধিকাংশ স্থলেই বিলাসী হইয়া ওঠেন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হয়েন। রোহিণীকুমার চিরসম্পদের কোলে প্রতিপালিত হইলেও বিলাসিতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। পান ও আহার প্রভৃতি বিষয়ে তিনি চিরকাল মিতাচারী ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই রোহিণীকুমার সুবিস্তৃত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। এইরূপে জীবনের সন্ধিস্থলে যৌবন, ধন-সম্পত্তি ও প্রভুত্ব সমবেতভাবে চরিত্রবান, তেজস্বী রোহিণীকুমারের নিকট উপস্থিত হইল, ইহাদের একীভূত শক্তি ও ধীর পুরুষকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় তদবধি স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। যে যৌবন, ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব দুর্বলচিত্ত অবিবেকীকে নরকের পথে লইয়া যায়, উহারাই ধীর ও জ্ঞানীব্যক্তির ধর্মসাধনের উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়। রোহিণীকুমারের পক্ষে ঐ সকল উপাদান বিশেষ হিতকারী হইয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ দাতা কৃষ্ণরাম ও রাজারাম সেনের বংশধরগণ চিরদিনই দানশীল ও পরোপকারী। রোহিণীকুমার ইহাদের যোগ্য বংশধর ছিলেন। তাঁহার দান ও সদানুষ্ঠান সমূহের অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত হইত। তিনি ঢাক ঢোল বাজাইয়া দান করার পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়াই সর্বসাধারণের নিকট দানশীল বলিয়া বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু যাহারা তাঁহার বিবরণ বিশেষরূপ অবগত আছেন তাহারা জানেন রোহিণীকুমার কত ক্ষুধিতের অন্নসংস্থান করিয়াছেন, কত বস্ত্রহীনের লজ্জা নিবারণ করিতেন, কত পুত্রহীন জনকজননীর পুত্রস্থানীয় হইয়া তাহাদের পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ দান ও সদানুষ্ঠান তাঁহার পুণ্যময় জীবনের দৈনন্দিন কার্য ছিল।

রোহিণীকুমার স্বীয় অর্থে বহু দরিদ্র বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি শত শত দরিদ্র বালকের স্কুলের ও পুস্তকাদির ব্যয় বহন করিয়াছেন। রোহিণীকুমারের সাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসাশাস্ত্রে ও শিল্পবিদ্যায় এবং কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন।

কতিপয় বৎসর গত হইল, একবার শস্যের ভাণ্ডার বাকরগঞ্জে দুর্ভিক্ষের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। অন্নাভাবে শত শত নরনারী অস্থিচর্মসার হইয়া উঠিতেছিল। পরদুঃখকাতর রোহিণীকুমার তখন স্বীয় বাটিতে "অন্নসত্র" খুলিয়াছিলেন। সেই দুর্দিনে প্রত্যহ বহুসংখ্যক নরনারী তাঁহার অন্নে পরিতৃপ্ত হইয়া দুইবাহু তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিত। মাসাধিক কাল এই বিরাট ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পরোপকারী রোহিণীকুমার ও তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতৃগণের প্রযত্নে তাঁহার বাটিতে বহুকাল হইল একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্তী গ্রামসমূহের দরিদ্র, রোগ-ক্লিষ্ট নরনারী এখানে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ঔষধ পাইয়া থাকে।

অমায়িক ও করুণহৃদয় রোহিণীকুমারকে দারুণ দুর্যোগের দিনেও পার্শ্ববর্তী গ্রামের নিঃসহায় রোগীর শয্যাপার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যাইত। পরমাত্মীয়ের মত তাঁহাকে রোগীর পীড়ার অবস্থা, পথ্যাদির কথা এবং দরিদ্র হইলে কিরূপে চিকিৎসাদি চলিতেছে এ সকল খবর লইতে দেখা

যাইত। এরূপ সমদর্শন ও অমায়িকতা বর্তমান সময়ে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

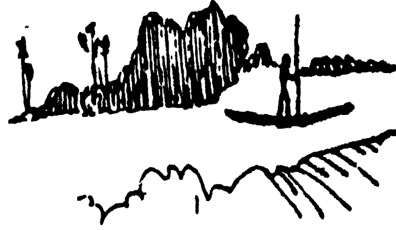
পরলোকগত পিতা প্রসন্নকুমার স্বকীয় মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, তাঁহার এই বাসনা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতৃভক্ত রোহিণীকুমার বহু অর্থ ব্যয় করিয়া স্বর্গীয় পিতার অভিলাষিত এই লোকহিতকর কার্য গত ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে সাধন করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত লোকহিতকর কার্য ব্যতীত দেশে ও বিদেশের যাবতীয় শুভানুষ্ঠানেই রোহিণীকুমারের আন্তরিক ও অর্থ সাহায্য পরিলক্ষিত হইত।

রোহিণীকুমার একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেব-দ্বিজে ভক্তিমান রোহিণীকুমার চিরকাল আপন ভক্তিবিশ্বাসানুমোদিত ধর্মসাধন করিয়া গিয়াছেন।

রোহিণীকুমার কিঞ্চিদধিক ৩৭ বৎসর বয়সে ১৩১১ সালের ২৯ শে ফাল্গুন সোমবার রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় আনন্দলোকে গমন করিয়াছেন।

শরৎকুমার রায়



সূচনা

বঙ্গদেশান্তর্গত বাকলা জনপদ বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যভাগে অবস্থিত। এই জনপদ অতি প্রাচীন এবং পুরাতত্ত্বের আকর, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ যাবৎ এই লোকবিশ্রুত রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা সম্বন্ধে কেহই বিশেষ অগ্রণী হ'ন নাই। রামায়ণ মহাভারতে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাই. জনকঋষির ধনুর্যজ্ঞে "বঙ্গ-রাজ্যের" কথা উল্লেখ আছে। মহাভারতে জরাসন্ধ-বধ-পর্বাধ্যায়ে, তাঁহার রাজত্ব বর্ণন সময়ে "বঙ্গ" কথা দেখিতে পাই। দিগ্বিজয় পর্বাধ্যায়েও "বঙ্গরাজ" কথাটা উল্লেখ আছে। আমরা মহাভারতে এই বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি তাহা পরে উল্লেখ করিব।

শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের মধ্যে বঙ্গদেশের সীমা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকিঃ।।

ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মপুত্র এবং সমুদ্রেব মধ্যবর্তী স্থানই পুরাকালে 'বঙ্গদেশ' নামে অভিহিত হইত।

পুরাণে বঙ্গদেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি তাহাও উল্লেখ করিতেছি।

চন্দ্রবংশীয় বলী রাজার পাঁচপুত্র জন্মে; যথা—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। ইহারা সকলেই বলী রাজার ক্ষেত্রজ পুত্র। ইহাদের মধ্যে বঙ্গ যে বিভাগে রাজ্য স্থাপন করেন তাহাই বঙ্গদেশ বলিয়া বিখ্যাত।

অতিপূর্বে বর্তমান সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে "বাঙ্গালা দেশ" বলিত না; যবন অভ্যুদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতে "বাঙ্গালা" নাম প্রচারিত হয়। খ্রিষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজেন্দ্র চোড়দেবের একখানি গিরিগাত্রে খোদিত আদেশে "বঙ্গাল" দেশের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

পূর্বকালে অস্মদ্দেশীয় রাজন্যবর্গ জলপ্লাবন নিবারণার্থ স্থানে স্থানে দশ হস্ত উর্ধ্ব বিংশ হস্ত প্রশস্ত এক একটি "আল" অর্থাৎ বাঁধ্ বাধিয়া, রাজ্যরক্ষা করিতেন। বঙ্গ + আল, এই দুই শব্দের যোগে সম্ভবত বাঙ্গালা হইয়া থাকিবে।[১]

ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণের বিবরণী মধ্যে "বেঙ্গালা"[২] নামক স্থানের উল্লেখ আছে। তাঁহারা এই নগরীকে অতীব সমৃদ্ধিশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান সময়ও ঢাকায় একটি বাজারের নাম "বাঙ্গালা-বাজার" দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব সময় এই সমগ্র বঙ্গদেশে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের (বর্তমান কামরূপ) অধীন ছিল; প্রবলপ্রতাপ মহারাজ ভগদত্ত এই প্রদেশেব রাজা ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরপ্রাঙ্গণে তিনি মহাবীর অর্জুন কর্তৃক নিহত হইলে তাঁহার বংশের ক্রমাগত তেইশ জন ভূপতি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন। উক্ত ঐতিহাসিকগণ এই সমস্ত ভূপতিগণের রাজত্বকাল ২২০০ বৎসর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[৩]

. রাজসূয় যজ্ঞসভায় শিশুপালবধ পর্বাধ্যায়ে বঙ্গ কথা উল্লেখ আছে, শিশুপাল কর্ণকে বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ বলিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তন্ত্রাদিতেও অনেক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশ যে অতি প্রাচীন তাহার আর সন্দেহ নাই।

বাকলা রাজ্য এই বঙ্গদেশের নিম্নভাগে অবস্থিত, ইহাও পৌরাণিক দেশ। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে ইহার নাম এবং সীমা পর্যন্ত উল্লেখ আছে।

"দিগ্বিজয়প্রকাশবিবৃত্তি" নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে বাকলার দুইটি সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে।

যথা .

পূর্বে মধুমতী সীমা পশ্চিমেচ ইচ্ছামতী।
বাদা ভূমি দক্ষিণে চ কুশোদ্বীপোহিচোত্তরে।।

আবার অন্যস্থানে যথা :

মেঘনানদী পূর্ব ভাগে পশ্চিমেচ বলেশ্বরী।
ইন্দিলপুরী যক্ষ সীমা দক্ষিণে সুন্দরং বনং।।
ত্রিংশৎ যোজন বিমিতো সোম কান্তাদ্রি বর্জিতঃ।
সোম কান্তেচ দ্বৌ দেশৌ বিখ্যাতৌ নৃপশেখর।।
জম্বুদ্বীপঃ পশ্চিমেচ স্ত্রীকারোহি তথোত্তরে।
বাকলাখ্য মধ্যভাগে রাজধানী সমীপতঃ।।

মেঘনা নদী পূর্ব সীমা, বলেশ্বর নদ পশ্চিমে, উত্তরে ইদিলপুর, দক্ষিণে সুন্দরবন; এই ভূভাগ মধ্যে ত্রিংশৎ যোজন পরিমিত পর্বতবিহীন সোমকান্ত দেশ, ইহার মধ্যে পশ্চিমে জম্বুদ্বীপ, এবং উত্তরে স্ত্রীকার, মধ্যস্থলে বাকলা নামক রাজধানী। এই সীমা গ্রহণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ স্বীকৃত নহি। বাকলা রাজ্য যখন উন্নতির শীর্ষ স্থানে তখন ইহার সীমা পূর্বে, পশ্চিমে ও উত্তরে, অনেকদূর বিস্তৃত ছিল। আমরা তাহার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা পরে দেখাইব।

সে যাহা হউক বাকলার প্রাচীন তত্ত্ব সম্বন্ধে যতটুকু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই বিবৃত করিতে সাধ্য মত চেষ্টা করিব।

তথ্যসূত্র

১. প্রকৃতিবাদ অভিধানে বঙ্গশব্দ দেখ।
Also see Gladwin's Translation of Ain-I-Akbari. vol.I

২. Early Travellers in India

৩. See Ain-i-Akbari. vol II Page 144
See also the English Translation of "Reysu-S-Salatin", by Moulavi Abdus Salaam M. A. Fac. I Page 50

৪. বঙ্গাঙ্গ বিষয়াধ্যক্ষ্যং সহস্রাক্ষ সমং বলে,
স্তুহিকর্ণ মিমং ভীষ্ম মহাপাপ বিকর্ষণম্।
সভাপর্ব শিশুপাল বধ পর্বাধ্যায় ৯ম শ্লোক।



প্রথম অধ্যায়

সীমা

পূর্ববঙ্গে, ঢাকা বিভাগের দক্ষিণ অংশে বাকলা অথবা বাকরগঞ্জ অবস্থিত। এই ভূখণ্ড মহাবিষুব রেখার উত্তরভাগে ২১° ৪৮´ ০´´ হইতে ২৩° ১৪´´ এবং ২৭´´ অক্ষাংশের মধ্যে, এবং গ্রীনউইচ পূর্ব ভাগে ৮৯° ৫৫´ ১০´´ হইতে ৯১° ৪´ এবং ৫০´´ দ্রাঘিমার মধ্যে রহিয়াছে।[১]

ইহার পূর্ব সীমা মেঘনা নদী, বঙ্গোপসাগরের কতক অংশ এবং নোয়াখালি ও ত্রিপুরার কতক ভাগ; পশ্চিমে বলেশ্বর, খুলনা এবং ফরিদপুরের কতকাংশ; উত্তরে ঢাকা, ফরিদপুরের কিয়দংশ ও পদ্মানদী; এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ইহার বিস্তৃতি ৪০৬৬ বর্গ মাইল,[২] উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ৮৯ মাইল, এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত প্রায় ৬০ মাইল হইবে।[৩]

এই গেল বর্তমান অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ লেখকগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমানা। একটু প্রাচীন কালের দিকে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাই যে, বঙ্গীয় ১১৬০ সালে, ইংরেজি ১৭৫৪ খ্রিঃ অব্দে যখন আগা বাখর খাঁ এই সমস্ত দেশের সর্বময় কর্তা ছিলেন; তখন বাকরগঞ্জের সীমা উত্তরে জাহাঙ্গীর নগর, অথবা জাহাঙ্গীরাবাদ, দক্ষিণে সুন্দরবন, এবং বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ভূষণা, যশোহর, এবং আরাকান;[৪] তারপর বৃটিশ-রাজ্য পত্তন হইবার কিছুকাল পরে (অর্থাৎ ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ) বাকরগঞ্জের এলাকা ঢাকা বিভাগান্তর্গত পদ্মা, এবং কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ পশ্চিম, এবং মেঘনা ও চাঁদপুর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমপ্রান্তে ভূষণা ও যশোহরের পূর্ব-সীমান্তবর্তী স্থানগুলিও বাকরগঞ্জের অন্তর্গত ছিল। কেবল সন্দ্বীপ তখন এই এলাকাভুক্ত ছিল না।[৫]

আগা বাখর খাঁর অনেক পূর্বে, এমন কি মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবারও পূর্বে প্রবল পরাক্রান্ত পাঠান নরপতিগণ দোর্দণ্ড প্রতাপে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন; সুবর্ণগ্রাম নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। ইলাইস শাহের বংশধর সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদশাহ, এবং তৎপুত্রপৌত্রগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের রাজত্ব সময় ১৪২৬ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১৪৮০ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত। ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জ, জেলালাবাদ এবং ফতিয়াবাদ নামে অভিহিত হইত।[৬] বর্তমান ঢাকা এবং ফরিদপুরের কতকাংশ জেলালাবাদ এবং বাকি অংশ ফতিয়াবাদ বলিয়াই দেশ প্রসিদ্ধ প্রবাদ রহিয়াছে। অনেক প্রাচীন দলিলে আমাদের বর্তমান বাকরগঞ্জ ''ফতিয়াবাদ'' বলিয়া উল্লিখিত আছে। এরূপ একখানি কীটদৃষ্ট বহু প্রাচীন দলিল আমার একজন বিশ্বাসী বন্ধু স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। দেশ প্রসিদ্ধ ''বার ভুইয়াগণের''[৭] অন্যতম কায়স্থবংশোদ্ভূত রাজা কন্দর্পনারায়ণ এবং তৎবংশধরগণ যখন এই দেশে রাজত্ব করিতেন, তখন বর্তমান বাকরগঞ্জের অধিকাংশ ভূমি

"সরকার বাকলা" নামে অভিহিত হইত। তখন তাহার সীমা পূর্বে সমুদ্রোপকূলস্থিত মগ রাজ্য, পশ্চিমে রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের পূর্ব সীমাব্যাপি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যমুনা[১] নদী, দক্ষিণে সমুদ্র, এবং উত্তরে ত্রিপুরা রাজ্য ও ভাওয়ালের কতকাংশ। বর্তমান সময়ে আমাদের জিলা যতটুকু, পূর্বে বাকলা ইহার দ্বিগুণ অথবা ততোধিক ছিল। আজ আর সেই বাকলা নাই, এবং কন্দর্পনারায়ণের সেই অতুল কীর্তি ও দিধীতিও নাই; যাহা আছে তাহা অনন্তকালসাগর-হৃদয়স্থ একটি ক্ষুদ্র বুদবুদমাত্র।

তথ্যসূত্র

১. Sir W. W Hunter's Statistical Account of Bengal —Bakarganj. Trubner & Co London. 1875

২. গত Census-এর সময় ৩৬৮৫ বর্গ মাইল।—বিকাশ, বরিশাল।

৩. Deducting the area of Kotwaliparah, Madaripur and Mulfatgunge

৪. Lectures on Bakarganj, Asiatic Researches vol. II

৫. Sixth Report of the House of Commons of 6th April, 1781

৬. (ক) অনেক প্রাচীন দলিলাদিতে "ফতিয়াবাদ" উল্লেখ আছে।

(খ) ১২০৪ সালের "কুইন কুইনাল" কাগজের নকলে সেলিমাবাদ, ফতেয়াবাদ উল্লেখ আছে।

(গ) During their reigns Sultan Mahomed Shah and his descendants *** the country round about Dacca, Faridpur, Bakarganj, was called Jalalabad and Fateabad —Sir W W Hunter's Statistical Account of Dacca, Page 119

৭.

১।	চাঁদরায়, কেদার রায়	শ্রীপুর।
২।	কন্দর্প নারায়ণ	চন্দ্রদ্বীপ (বাকলা)
৩।	প্রতাপাদিত্য	যশোহর।
৪।	ইশাখাঁ	খিজিরপুর।
৫।	মুকুন্দ রায়	ভূষণা।
৬।	লক্ষ্মণ মাণিক্য	ভুলুয়া।
৭।	ফজল গাজি	ভাওয়াল।
৮।	হাম্বিরমল্ল	বিষ্ণুপুর।
৯।	গণেশ রায়	দিনাজপুর।
১০।	কংসনারায়ণ	তাহিরপুর।
১১।	পীতাম্বর	পুঁটিয়া
১২।	রামকৃষ্ণ	সাঁতৈল (পাবনা)

[১] কেহ কেহ ইহাকে কপোতাক্ষ বলিয়া থাকেন।



দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন প্রাকৃতিক বিবরণ

পূর্বকালে যে এই বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিকাংশ ভূমি জলনিমগ্ন ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।[১] মাটি খুঁড়িয়া তিন চারি হস্ত পরিমাণ গর্ত করিলে যে মাটি পাওয়া যায়, তাহা জোব এবং কর্দমময়।

এই দেশে পুষ্করিণী পাঁচ সাত হস্তের অধিক গভীর করিবার সাধ্য নাই। কেননা খনিতগর্ত, ভূগর্ভস্থ জল দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

এই বিশাল পৃথিবী যে কোন দিন জলমগ্ন ছিল, তাহা সর্ব-জাতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি গ্রন্থে সময় এবং স্থান সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু মূল কথা একই। হিমালয় পর্বত যে কোন দিন সমুদ্রতটে বিরাজিত ছিল তাহার প্রমাণ দুরূহ নহে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র ছাড়িয়া দিতেছি; এই সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কি বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করা যা'ক।

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কয়েকজন অসমসাহসী পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ হিমালয়ে আরোহণ করেন। তথায় কযেক দিন নানাপ্রকার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া এক গুহামধ্যে কতকগুলি অস্থিপঞ্জর, শঙ্খ, এবং শম্বূকের কঙ্কাল প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত অস্থিপঞ্জরসমূহ, পরীক্ষা দ্বারা বৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণীর অস্থিপঞ্জর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, কোন্ কালে হিমালয় সানুস্থিত সমগ্র ভারতবর্ষ জলনিমগ্ন ছিল।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক সুপ্রসিদ্ধ হুয়েনসাঙ্গ (খ্রিঃ অঃ ৬৩৬—৬৪৬ খ্রিঃ অঃ) যখন ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে আগমন করেন, তখন গৌড় অতীব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তিনি জলপথে বাকলা, কামরূপ এবং আরাকান পর্যন্ত গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে গৌড় নগরের পূর্বভাগ জলমগ্ন ছিল। সুতরাং উপযুক্ত নৌযানে তাঁহাকে কামরূপ (আসাম) যাইতে হইয়াছিল।[২]

অতি প্রাচীনকালে অস্মদ্দেশে সুগন্ধা নাম্নী এক খরস্রোতা প্রবাহিনী প্রবাহিতা ছিল। আমরা মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলে সুগন্ধার নাম দেখিতে পাই, পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া জগন্মাতা দাক্ষায়ণী প্রাণ ত্যাগ করিলে, জায়াশোকোন্মত্ত ভগবান্ মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে মহাভাগ বিষ্ণু চক্র দ্বারা সেই দেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত করেন। যে যে স্থানে সেই খণ্ডগুলি পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান এক একটি পীঠস্থান হইয়াছে। আমাদের এই সুগন্ধায় দেবীর নাসিকা পড়িয়াছিল, সম্ভবত, সেইজন্যই নদীর ঐ প্রকার নাম হইয়া থাকিবে। রায়গুণাকর পীঠমালায় লিখিয়াছেন :

সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা।
ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা।।

বর্তমান শিকারপুর গ্রামে দেবীর প্রাচীন মঠ সহ পাষাণময়ী মূর্তি[৩] এবং পোনাবালিয়ার উপকণ্ঠস্থিত শ্যামরাইল নামক পল্লিতে অতি প্রাচীন পাষাণময় শিবলিঙ্গ মূর্তি স্থাপিত আছে। শিকারপুর এবং পোনাবালিয়া প্রায় দিনমানের পথ। সুগন্ধা নদী পূর্বকালে এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃতা ছিল; কিন্তু বর্তমান সময় তাহার গর্ভে বিশাল জনপদ।

সতী শিরোমণি প্রাতঃস্মরণীয়া বিপুলা (বেহুলা) সুন্দরী মৃত স্বামী পুনর্জীবিত করিবার জন্য, লক্ষ্মীন্দরের শবসহ সামান্য কলার মান্দাস আরোহণে উজানি হইতে জগন্মাতা মনসার ভবনে যাত্রা করেন। অনুকূল স্রোতে ভেলা কপোতাক্ষ বাহিয়া, উত্তাল তরঙ্গময়ী সুগন্ধায় পতিত হয়; পরে ধীরে ধীরে মেঘনা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রে উপস্থিত হয়।[৪]

প্রবাদ যে, বর্তমান "ধুবরি" পূর্বে মনসা সহচরী নেতা ধোপানীর আবাসস্থল ছিল।[৫]

সুগন্ধা নদী সম্বন্ধে এদেশে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ-স্বামীর নাম বোধ হয় প্রত্যেক হিন্দু মাত্রেই জানেন। কতিপয় বৎসর হইল এই মহাপুরুষের তিরোধান হইয়াছে। এই দেশের জনৈক ত্যাগী পুরুষ, স্বামীজীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, বহুদিন তাঁহার চরণ সেবা করিয়াছিলেন; এক দিন কথা প্রসঙ্গে মহাপুরুষ শিষ্যের বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রথমত তিনি নিজ গ্রামের নাম বলিলেন। মহাপুরুষ তাহাতে চিনিতে না পারায় শিষ্য "সোন্দার কূল" বলিলেন। মহাপুরুষ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "সুগন্ধা কি এই সময়ের মধ্যেই লুপ্তা হইয়াছেন?" শিষ্য গুরুদেবের কথায় সমধিক আশ্চর্যান্বিত হইলেন; স্বামীজি পোনাবালিয়ার শিবলিঙ্গ এবং শিকারপুরের দেবীমূর্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।[৬]

এখন দেখা যা'ক ভূমি উৎপত্তির কারণ কি? ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ স্রোতজলকেই ভূমির হ্রাসবৃদ্ধি এবং উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। পর্বত-গহ্বর বিদীর্ণ করিয়া নদী যখন সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন সেই প্রবল স্রোতবেগে ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখণ্ড মৃত্তিকা প্রভৃতি অতি বেগে ভাসিয়া আসে। ঐ স্রোতজল সমতল ভূমিতে আসিলে ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া থাকে, সুতরাং শিলাখণ্ড প্রভৃতি বারি বস্তুসমূহ নিম্নে পতিত হয়; এবং মৃত্তিকার সূক্ষ্ম অংশগুলি স্রোত-বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীর উভয় পার্শ্বে পতিত হয়। ক্রমশ ঐ মাটির উপর মাটি পড়িতে পড়িতে নদীর উভয় পার্শ্বে চল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে সাগরসঙ্গমস্থলে নদীর মোহানায় যে সমস্ত চর উৎপন্ন হয়, তদুপরি মুহুর্মুহু সমুদ্র-তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত বালুকারাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া অতি শীঘ্র সেই ভূমি উচ্চ হইয়া থাকে। এই কারণে মেঘনা, তেতুলিয়া, ইল্‌সা প্রভৃতি সাগরসঙ্গম স্থলে দক্ষিণ সাহাবাজপুর, বাদুরা, হাতিয়া, সন্দীপ, বড়বা'শদিয়া, কোরালিয়া, কুক্‌রিমুক্‌রি প্রভৃতি চর অথবা দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। যে স্থানে ভাগীরথী শতমুখী হইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই শতমুখীস্থলে সুন্দরবন উদ্ভূত হইবার কারণও ঐ প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত কারণে নদীগর্ভস্থ চর জলসীমা অতিক্রম করিয়া উঠিবার পূর্বে স্রোত অন্যদিকে ধাবিত হইলে বিল উৎপন্ন হয়। এই জেলায় বিলের সংখ্যাও কম নহে।

কবি-কর্ণপুর স্বর্গীয় বিজয় গুপ্তের সুপ্রসিদ্ধ মনসা মঙ্গলে আমরা দুইটি নদীর উল্লেখ দেখিতে পাই। কবিবর উক্ত গ্রন্থমধ্যে নিজ পরিচয় ও বাসস্থান নির্দেশ করিবার সময় লিখিয়াছেন—

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।।

ঘাঘর নদীর চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু ইহার আয়তন উল্লিখিত নৈসর্গিক কারণে পূর্বাপেক্ষা হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কোটালিপাড়া[৭] পরগনার বৃহদায়তন বিল এই ঘাঘর নদী হইতে উৎপন্ন। ফুল্লশ্রী গ্রামের অনেক পশ্চিমে যে ঘাঘর নদী এখন বর্তমান, তাহার স্রোত মন্দ, এবং আয়তনও অধিক নহে। উভয়পার্শ্বস্থ ভূমি দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে উহা নদীর চর, ক্রমশ মৃত্তিকা ও বালুরাশি দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"Bakarganj is the granary of Bengal" বলিয়া একটি কথা আছে, বস্তুত ইহা সম্পূর্ণ সত্য। এই জিলায় যে পরিমাণ শস্য জন্মে, বঙ্গদেশে আর এরূপ অপর্যাপ্ত রূপে কোথাও জন্মে

কিনা সন্দেহ। ইহার কারণ এই যে নূতন মাটিতে শস্য বেশি হয়। নদীজল হইতে পার্শ্ববর্তী চর কিয়দংশ উচ্চ হইলে, সেই ভূমি অতিশয় শস্যশালিনী হইয়া থাকে। বাকরগঞ্জের অধিকাংশ ভূমিই সদ্যোত্থিত; তাই শস্যও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বিল ভরিয়া মৃত্তিকাকারে পরিণত হইলে, তাহার উৎপাদিকা শক্তি হয়। মৃত্তিকা নদী হইতে যত উচ্চ হইতেছে, তাহার শস্যোৎপাদিকা শক্তি ততই হ্রাস পাইতেছে। তাই, আমাদের দেশীয় কৃষকগণ এখন পূর্বের ন্যায় আশানুরূপ শস্য না পাইয়া "বাদা" অর্থাৎ সুন্দরবনে জমি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মহাত্মা এইচ্, বেভারিজ্, (H. Beveridge) স্যার উইলিয়ম্ হান্টার (Sir William Hunter) প্রমুখ মনস্বী ইংরাজ লেখকগণ এই সমগ্র ভূখণ্ড গঙ্গা, মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত কথা বলিয়া অনুমিত হয়; কেননা বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যতগুলি শাখানদী, উপনদী দেখিতে পাই, সমস্তই উল্লিখিত নদীসমূহের অংশ, অথবা স্থানবিশেষে নামান্তর মাত্র।[৮]

আরও একটি কথা, অস্মদ্দেশে অপভাষায় নদীকে 'গাঙ্গ' বলে; তাই অনুমান হয় যে 'গাঙ্গ' শব্দ গঙ্গার অপভ্রংশ মাত্র[৯] কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে নিম্নবঙ্গের সমস্ত নদীই গঙ্গা অথবা তন্নিসৃত স্রোত মাত্র।

সুগন্ধা, ঘণ্টেশ্বর এবং ঘাঘর ব্যতীত বর্তমান বাকরগঞ্জে আর কোন প্রাচীন নদীর নাম জানিতে পারি নাই। এই দেশ দেবমাতৃক এবং নদীমাতৃক। তন্মধ্যে নদী বহুল থাকায় বৃষ্টি অপেক্ষা জল বৃদ্ধিতেই শস্যের বৃদ্ধি হয়।

এই দেশের প্রত্যেক নগর, উপনগর এবং গ্রাম, নদী অথবা তৎসংশ্লিষ্ট খাল এবং দোনের পার্শ্বে অবস্থিত; তাই দেশীয় লোক নৌযানে গন্তব্য স্থানে যাতায়াতের সুবিধা বলিয়া জ্ঞান করেন। বর্তমান সময় যে কয়েকটি প্রধান নদী অস্মদ্দেশে প্রবাহিতা; তাহাদেব বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

১। মেঘনা,—এই নদী বাকরগঞ্জের পূর্বপ্রান্ত বিধৌত করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহারই সঙ্গম স্থলে দক্ষিণ সাহাবাজপুর দ্বীপ। এই দেশে সকল নদী অপেক্ষা এই নদী গভীর, প্রশস্ত এবং অত্যন্ত তীব্র স্রোতময়ী। মেঘনা নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক গল্প আছে। গল্পটি পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তের জন্য নিম্নে সংক্ষেপে লিখিতেছি।

"নমুচি নামক দৈত্য তপোবলে অত্যন্ত বলীয়ান হইয়া স্বর্গ রাজ্য অধিকার করিল। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ কোনমতে তাহার সঙ্গে আঁটিতে না পারিয়া, ইন্দ্র নমুচির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। এইরূপে বহুকাল গত হইল; নমুচি ইন্দ্রের প্রতি পূর্বশত্রুতা ভুলিয়া তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। একদিন সুযোগ পাইয়া অতর্কিত অবস্থায় ইন্দ্র নমুচির শিরশ্ছেদ করিবামাত্র, ছিন্ন মুণ্ড বদন বিস্তার করিয়া ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। ইন্দ্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সমস্ত দেবতার শরণাপন্ন হইলেন; কিন্তু কেহই সেই ছিন্ন মুণ্ডের করাল গ্রাস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে প্রাণভয়ে ভীত সুরপতি দেবর্ষি নারদের পরামর্শমত সরস্বতী নদীতে স্নান করিলেন, ছিন্ন মুণ্ডও তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে পতিত হইল। ইন্দ্র সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা পাপ সর্বদা তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি কত দান, ধ্যান যজ্ঞ করিলেন কিন্তু কিছুতেই সেই মহাপাপ হইতে উদ্ধার পাইলেন না। অবশেষে পিতামহ ইন্দ্রকে গঙ্গা স্নান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ইন্দ্র গঙ্গোত্রীর নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র গঙ্গা দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। গঙ্গাকে কোথাও না পাইয়া ইন্দ্র তাঁহার তপস্যা করেন। গঙ্গা তপোপ্রভাবে সাক্ষাৎ হইয়া বলিলেন, 'হে ইন্দ্র, তুমি মেঘরূপে ধরাতলে গমনপূর্বক সমুদ্র সহ মিলিত হইয়া আমার স্পর্শ লাভ করিলে, এই মিত্রদ্রোহী মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।' ইন্দ্র দেবীর আদেশে জলরূপ ধারণ করিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে প্রবেশ করিলেন।"[১০]

সম্ভবত মেঘনা তীরবাসী কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাচীন তুলটের খালি পাতায় এইরূপ একটি গল্প লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; কালে এইটি পৌরাণিক গল্পমধ্যে স্থান পাইয়াছে।[১১]

এই গল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে, সামান্য একটু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। ইন্দ্র শব্দের ধাতু প্রত্যয় ইন্দ্ + রক্ অর্থাৎ যিনি বর্ষণ করেন। আবার ইন্দ্রের এক নাম মেঘবাহনও বটে। ইন্দ্র বৃষ্টির দ্বারা যে প্রকার ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করেন, সেইপ্রকার পূর্বকালে মেঘনা নদীর জলপ্লাবনে তৎপার্শ্বস্থ ভূমি শস্যশালিনী হইত ; এই কারণেই হয়ত এই গল্পের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

২। আড়িয়াল খাঁ,—পদ্মার শাখা নদী, বর্তমান গৌরনদী থানার পূর্বভাগ দিয়া মেঘনায় মিশিয়াছে।

৩। আড়িয়াল খাঁর যে অংশটি বর্তমান বরিশাল নগরের পূর্ব ভাগে অবস্থিত, তাহার নাম কীর্তনখোলা।

৪। বিশখালি নদী,—কালমেঘা ও ন্যামতির পার্শ্বে প্রবাহিতা, ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি কম নহে। এই মহানদী কীর্তনখোলা হইতে বহির্গত হইয়া হরিণঘাট মোহানায় পতিত হইয়াছে।

৫। বলেশ্বর নদ,—বাকরগঞ্জের পশ্চিম সীমাস্থ ফিরোজপুর মহকুমার পশ্চিম পার্শ্ব বহিয়া বরাবর দক্ষিণমুখে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। বলেশ্বর সাগরসঙ্গমে হরিণঘাটা বলিয়া খ্যাত।

৬। সাপলেজা নদী,—বর্তমান মঠবাড়িয়া পুলিশ স্টেশনের নিকট, এই নদীও অতীব গভীর ও তরঙ্গসঙ্কুল, দক্ষিণ মুখে বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে।

৭। ইল্সা এবং তেতুলিয়া,—মেঘনা নদীর নামান্তর মাত্র। এই উভয় নদীই দক্ষিণ সাহাবাজপুরের পশ্চিম পার্শ্বে প্রবাহিতা এবং এই উভয় নদীই সাহাবাজপুরকে দ্বীপে পরিণত করিয়াছে, এই নদীদ্বয় অত্যন্ত বিস্তৃত, দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচহাজার গজ হইবে।

৮। নোহালিয়া নদী,—কীর্তনখোলার শাখা খয়েরাবাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া পটুয়াখালি এবং গলাচিপার পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণ দিকে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।

৯। বিঘাই অথবা বাঘাই,—খয়েরাবাদ হইতে বহির্গত হইয়া মৃজাগঞ্জ, গুলিশাখালি এবং আমর্তলির নিকট দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

১০। কচানদী,—কাউখালি নদী এবং কালীগঙ্গার সঙ্গমস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া বলেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

১১। আয়লা নদী,—আয়লা এবং চাঁদখালির নিকট দিয়া বিঘাইর সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ নদনদী, দোন এবং খাল, এই দেশে সংখ্যাতীত। অস্মদ্দেশে হ্রদ নাই কিন্তু স্বভাবজাত বিল আছে, সেগুলির দৃশ্য বড়ই মনোহর। স্থির জলরাশি—মধ্যে মধ্যে শৈবালদলোপরি জলচর পক্ষিসমূহের মৃদুমধুর কখনও বা উচ্চ কোলাহল, স্ফটিকতুল্য স্থির জল মধ্যে মীনোল্লাস, দেখিতে বড়ই প্রীতিকর। ঈষৎ বাত্যান্দোলিত হইয়া যখন প্রস্ফুটিতা সরোজিনীগুলি মৃণালোপরি ধীরে ধীরে দুলিতে থাকে, ঈষত্তরঙ্গবিক্ষিপ্ত বারিকণা পদ্মপত্রোপরি পতিত হইয়া সূর্যকিরণে জ্বলিতে থাকে, তখন সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে-ই বুঝিয়াছে, অন্যের বর্ণনা করা অসাধ্য।

পূর্বে যতগুলি বিল ছিল তন্মধ্যে অনেকগুলি এখন উর্বর ভূমিখণ্ডে পরিণত, তবে যেগুলি এখনও বর্তমান তাহাদের আয়তন কম নহে। কোন কোন বিলের চতুঃসীমা প্রদক্ষিণ করিতে দুই তিন দিন অথবা ততোধিক সময় লাগে। ঘাঘর হইতে উৎপন্ন কোটালিপাড়ার বিল সর্ববৃহৎ; কিন্তু এই বৃহৎ জলাভূমি অনেক পরিমাণে উত্থিত হইয়াছে। ঐ স্থান এখন আর এ জেলার অধীন নাই। কতকগুলি বিল দেখিলে বোধ হয় যে, কোন প্রকার আকস্মিক প্রাকৃতিক কারণে ঐ প্রকার ঘটিয়াছে। "কালারাজাবিল"[১২] সম্বন্ধে তথাকার কেহ কেহ বলেন যে, ঐ স্থানে কালারাজা নামক চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয় কোন নৃপতির বাসস্থান ছিল। ঔদ্ধত্য বশত কালারাজা তদীয় গুরুদেবের প্রতি অসদাচরণ করায় তাঁহার অভিসম্পাতে এইরূপ ঘটিয়াছে।[১৩]

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাতন বিলগুলির মধ্যে অনেকগুলি শস্যপ্রদ হইয়াছে, শুধু পুরাতন নাম মাত্র দ্বারা স্থানের নিরাকরণ করা যায়।

স্বরূপকাঠি এবং গৌরনদী থানার অন্তর্গত ঝঞ্জনিয়া, স্বরূপকাঠি থানার মধ্যে বলদিয়া, মঠবাড়িয়া থানার অন্তর্গত চেচরির বিল, বাউফল থানার অন্তর্গত কালারাজার বিল, ধরনদি, আদমপুর, ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত খাজুরা, ডুমরিয়া প্রভৃতি কতক উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই সমস্ত বিলে যেরূপ মৎস্য ছিল, এখন তাহার তিন ভাগের একভাগও নাই। কই, মাগুর, শকুল প্রভৃতি মৎস্য অন্যান্য দেশে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইত। এখন অনেকের মধ্যে খাল উৎপন্ন হওয়াতে জোয়ার ভাঁটায় সেগুলির গভীরতা ক্রমশ হ্রাস পাইয়া ভূমি উত্থিত হইতেছে। ঝালকাঠির অন্তর্গত বিলগুলি বর্তমান সময় প্রায় মৃত্তিকাকারে পরিণত হইয়াছে। এখন সেই সমস্ত স্থানে, হোগোল, নল-খাগড়া প্রভৃতি বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

বিলগুলি মৃত্তিকাশালী হইতে আরম্ভ করিলে যখন স্বল্পতোয়া হয়, তখন নৈসর্গিক নিয়মেও তথায় হোগোল, নল-খাগড়া প্রভৃতি তৃণজাতীয় উদ্ভিদ আপনা হইতেই জন্মে। এই প্রকার কতিপয় বৎসর মধ্যে বিলগুলি সমভূমি হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, উল্লিখিত বিলগুলি খালের তীরে অবস্থিত; জোয়ারের জলে এই বিলগুলি পরিপূর্ণ হয় আবার ভাঁটার সময় শুষ্ক হয়। মৃত্তিকার সূক্ষ্ম অংশগুলি ঐ সমস্ত তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের মূলে পতিত হয়। এই প্রকার মাটি পড়িতে পড়িতে ক্রমে উচ্চ হইয়া উঠে। স্বরূপকাঠি থানার অন্তর্গত "উমারের পাড়" নামক স্থানে জলের প্রায় তিন চারি হাত নীচে একখানি বাঁধাঘাট পাওয়া গিয়াছে। সিঁড়িগুলি এখন ভগ্ন প্রায়, এক খানি ইট আমি দেখিয়াছি; দেখিলে বোধ হয় যে, বর্তমান ইট হইতে তাহার আকার অনেক ভিন্ন। দুর্ভাগ্যবশত ইটখানি সম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাই নাই; ভগ্নাবশেষ দেখিয়া অনুমান হয় যে ইহা বহুকালের। স্থানীয় প্রবাদ যে, যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ অতুল প্রতাপে বাকলায় রাজত্ব করিতেন, তখন রানী করুণাময়ী 'গোবিন্দ রায়' বিগ্রহের নামে দেবোত্তর দান করেন। তৎকালে ঐ বিল শস্যশালিনী ভূমি ছিল। হাট, বাজার, লোকালয় প্রভৃতি সমস্তই ছিল। উমর নামক জনৈক সমৃদ্ধিশালী মুসলমান ঐ দেবোত্তরাধীনে বাস করিত, তৎকর্তৃক ঐ ঘাট নির্মিত হইয়াছিল, পরে নৈসর্গিক কারণে উক্ত জনপদ অকস্মাৎ বিলে পরিণত হইয়াছে।

সার উইলিয়াম হান্টার বলেন যে ইংরেজি ১৭৬৯ খ্রিঃ অব্দে (১১৭৬ সালে)[১৪] বঙ্গদেশে তুমুল ঝড় বৃষ্টি ও তৎসহ সমুদ্রের জল উদ্বেলিত হইয়া অনেক স্থান প্রায় উৎসাদিত করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গেরও স্থানে স্থানে প্রবল ভূমিকম্প হওয়ায় অনেক স্থান একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। তাহার চিহ্ন এখনও বিরল নহে। সমুদ্রের তীরবর্তী অনেক লোকালয় সেই সময় জনপ্রাণী শূন্য হইয়াছিল, বর্তমান সময়ে সুন্দরবনের মধ্যে অনেক দিঘি, পুষ্করিণী, এবং অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।[১৫] বলদিয়ার বিলের উল্লিখিত কারণে এই দশা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ উল্লিখিত স্থানে ভগ্ন অট্টালিকার চিহ্ন জলমধ্যে দেখিয়াছিলেন। বর্তমান সময় তাহা অনেক নীচে বসিয়া গিয়াছে।

গ্রীষ্মারম্ভে আমরা দক্ষিণ বায়ু এবং শীতারম্ভে উত্তর বায়ু পাইয়া থাকি। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে, কখন কখন বা তৎপরে আমাদের এই দেশে নৈঋত কোণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে জলবৃদ্ধি হইয়া শস্যক্ষেত্রে প্লাবিত করায়, ভূমির উৎকর্ষ সম্যক্ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এবং সেই সঙ্গে বর্ষাও আগত হয়। এই স্বাভাবিক রীতির পরিবর্তন হইলে আমাদের দেশে শস্য জন্মিবার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন হইয়া থাকে।

বায়ুর এই প্রকার গতির কারণ সংক্ষেপে নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। পৃথিবীর ৮০ মাইল ব্যাপিয়া বায়ুমণ্ডলের অবস্থিতি, কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই বায়ুর গভীরতা ৮০ মাইলেরও অতিরিক্ত বলিয়াছেন। পৃথিবী নিয়ত ঘুরিতেছে, সেই বেগে বায়ুও ঘূর্ণিত হইয়া পৃথিবীর দেহ স্পর্শ করিতেছে। মুহূর্তের জন্য ত্যাগ করিতেছে না। কোন নৈসর্গিক কারণে সূর্যের তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক অথবা অগ্নুৎপাতে বায়ু লঘু হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা উর্ধ্বে উড়িয়া যায়, তৎস্থান পূরণার্থ অন্য স্থানের বায়ু বেগে সেই স্থানে আগমন করে। এই কারণবশতই ঝড়, ঘূর্ণ বায়ু প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কমলালেবুর মত একটু চাপা. এবং অত্যন্ত শীতল; আবার মহাবিষুব রেখার (Equator) নিকটবর্তী স্থানগুলি অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান, তাই তথাকার বায়ু হাল্‌কা ও উর্ধ্বগামী; তৎপরিপূরণার্থ দক্ষিণ ও উত্তর মেরুপ্রান্ত হইতে মহাবিষুব রেখার নিকট দুইটি বায়ুপ্রবাহ নিয়ত ধাবমান হইতেছে, মুহূর্তের জন্যও বিরাম নাই; এই বায়ু স্বভাবত দক্ষিণ এবং উত্তর দিক হইতে আসিতেছে। আমরা কিন্তু ঈশান এবং অগ্নি কোণ হইতে ঐ বায়ু পাইতেছি। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন যে পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক পৃথিবীর নিয়ত আবর্তনই ইহার কারণ। ইংরেজিতে এই বায়ুর নাম Trade wind অর্থাৎ বাণিজ্য বায়ু; স্থলভাগ স্বভাবত উষ্ণ, এবং পর্বতাদি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, ঐ বায়ু সমুদ্রেই অপেক্ষাকৃত বেশি অনুভূত হয়। বাণিজ্য-জাহাজসমূহ এই বায়ুতে নির্বিঘ্নে চালাইতে পারে বলিয়াই নাবিকগণ ঐ প্রকার নামকরণ করিয়াছে। ভারত মহাসাগরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বভাগ ভূখণ্ডবেষ্টিত এবং সর্বোপরি মহাপ্রাচীররূপ নগাধিরাজ হিমালয় উত্তরখণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছে, তাই ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য বায়ু প্রবাহিত হয় না; তৎপরিবর্তে অন্য এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে তাহাকে মৌসুমী বায়ু (Monsoon) বলে। এই বায়ু সমুদ্রে প্রধাবিত হইবার পূর্বে উল্লিখিত কারণে ভারতে পূর্বেই অনুভূত হয়। এই বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষাগত বায়ুর সংঘর্ষণে প্রায় ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীতও সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থান, বিশেষত বঙ্গোপসাগর স্বভাবত ঝটিকাবর্তপ্রদ; তাই ঐ প্রকার বায়ুর সহিত অস্মদ্দেশে জলবৃদ্ধি এবং বর্ষারম্ভ হইয়া থাকে।

পূর্বেই বলিযাছি যে এই দেশ নদী এবং দেবমাতৃক। বৃষ্টি এবং জলবৃদ্ধি উভয়ই শস্যপক্ষে বিশেষ উপযোগী। নৈঋত বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ জল বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাও আরম্ভ হইয়া থাকে। কোন নৈসর্গিক কারণে ইহার অন্যথা হইলে শস্যেব নিতান্ত ক্ষতি হয়। সমুদ্রের উপকূলস্থিত ভূখণ্ডে পূর্ব বর্ণিত কারণে সময় সময় এতাদৃশ জলবৃদ্ধি হয় যে তাহাতে গৃহ, শস্য প্রভৃতি সমস্ত ভাসিয়া যায়। এই প্রকার জল প্লাবনে বহুতর প্রাণী নষ্ট হইয়া থাকে।

যে ঋতুতে এই নৈঋত বায়ু প্রবাহিত হয় সেই ঋতুতে উহা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতক উপকারী। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের দারুণ নিদাঘে, অগ্নিতুল্য সূর্য তাপে, বায়ু অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া লঘু হয়। নৈঋত বায়ুর প্রায় এক চতুর্থাংশ জলপূর্ণ, তাই এই বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ু কতক পরিমাণে শীতল হয়। গ্রীষ্মোৎপন্ন রোগ এবং ক্লেদ এই বায়ুর সংস্পর্শে প্রশমিত হইয়া থাকে।

মেঘনা, ইল্‌সা, কালাবদর প্রভৃতি বড় বড় নদীতে সময় সময় "বান" (bore) হয়। অকস্মাৎ জলরাশি উদ্বেলিত হইয়া মুহূর্ত মধ্যে সৈকতভূমি প্লাবিত করিয়া তট পানে ধাবিত হয়। এই বান নৌচালনের পক্ষে অত্যন্ত ভীতিকর এবং সময় সময় এই জন্য বহু নৌকা জলমগ্ন হইয়া থাকে। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বর্ষাকালে বানের বেশি প্রাদুর্ভাব।

সকলেই জানেন যে চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার হইয়া থাকে, কেন না উভয়ই স্বাভাবিক নিয়মে সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে; কিন্তু সূর্য অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটবর্তী বলিয়া তাহার আকর্ষণও বেশি। পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সূর্য অপেক্ষা চন্দ্র ছয় গুণ অধিক আকর্ষণ করিয়া থাকে। উল্লিখিত কারণে সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইলেই নদীতে জোয়ার হয়, অন্যথায় নদীর নিম্নগতি অর্থাৎ ভাটা, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

এক্ষণে দেখা যাউক হঠাৎ জল বৃদ্ধির কারণ কি ? মহাবিষুব রেখার (Equator) দক্ষিণাস্থিত সমুদ্রের জল অত্যন্ত গভীর। চন্দ্রাকর্ষণে ঐ জলরাশি উদ্বেলিত হইয়া প্রবলবেগে উত্তরাভিমুখে ধাবিত হয়। দক্ষিণদিক হইতে উত্তরদিকে জোয়ার হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম। নদীমুখনিঃসৃত জলরাশির সহিত ঐ জলের প্রবল সংঘর্ষণ হইয়া অতি প্রবল বেগে উভয় জলরাশি প্রকাণ্ড প্রাচীরের ন্যায় নদীমধ্যে প্রবেশ করে ও মুহূর্তমধ্যে সৈকত, পুলিন প্লাবিত করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে,—ইহাই বান। তখন ইহার সম্মুখে যাহা পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমাদের বঙ্গোপসাগরের মুখ দক্ষিণ দিকে, তাই জোয়ারের তেজ অত্যন্ত প্রবল। ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত। কিন্তু ইহার বহু সহস্র বৎসর পূর্বে, আমাদের প্রাচীন মুনি ঋষিগণ যে

ইহা সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রে[১৬] তাহার বহু প্রমাণ আছে। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে আমাদের তিথিগুলি হইয়াছে। তজ্জন্যই পঞ্চমী তিথি হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত জল হ্রাস, তৎপর পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় জলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশস্থ যে সমস্ত বড় বড় নদী সাগরে মিশিয়াছে তাহাতে উল্লিখিত প্রাকৃতিক কারণে বান হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে পর্বত নাই; কেননা মৃত্তিকা প্রাচীন না হইলে পর্বতের উৎপত্তি হয় না। ভূকম্পে পৃথ্বীবক্ষের কোন কোন স্থান ঢিপির ন্যায় উচ্চ হয়, তারপর ক্রমশ মৃত্তিকার স্তর, ধাতুস্তর অথবা উদ্ভিজ্জ স্তর জমিতে থাকে। এইরূপে বহুকাল পরে ঐ সমস্ত পদার্থ কঠিন প্রস্তর রূপে পরিণত হইয়া ক্রমশ বর্ধিত হয়। আমাদের দেশ নদীগর্ভ হইতে সদ্যোত্থিত, মৃত্তিকা নরম, সুতরাং প্রস্তর উৎপত্তি হওয়ার সমূহ অন্তরায়।

যে সমস্ত বৃহৎ নদী বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে, তাহাদের মোহানায় কতকগুলি দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ সাহাবাজপুর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং একটি প্রকাণ্ড জনপদ। এতদ্ব্যতীত বাদুরা, মনপুরা, পাঁচখালি, কল্মী, বড় বা'শদিয়া, কোরালিয়া, রাঙ্গাবালি, চোপা, কুক্‌রিমুক্‌রি প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

বাত্যাবর্ত, জলপ্লাবন, সাময়িক ঝড়বৃষ্টি এই স্থানে অন্য দেশ অপেক্ষা বড় কম নহে। ঐতিহাসিকপ্রবর আবুল ফজল প্রণীত বিখ্যাত "আইন-ই-আকবরি"[১৭] গ্রন্থে এই দেশ সম্বন্ধে এক ভীষণ খণ্ড প্রলয়ের কথা উল্লেখ আছে।

যে সময় এই দেশের সৌভাগ্য ছিল, যখন পরম ধার্মিক হিন্দু রাজা এই দেশে ন্যায়, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতির সহিত অপত্য নির্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন, তখন কায়স্থ বংশোদ্ভব রাজা জগদানন্দ রায় রাজত্ব করিতেন। সেই সময় সমগ্র ভূখণ্ড বাকলা নামে অভিহিত হইত; বর্তমান তেঁতুলিয়া নদীর সাগরসঙ্গমস্থলে তাঁহার রাজধানী ছিল। কেহ কেহ বলেন বর্তমান কচুয়াই ঐ রাজধানী।

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই খণ্ড প্রলয় সংঘটিত হইয়াছিল, ব্লক্‌ম্যান্ সাহেব ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রাজধানীস্থ প্রায় যাবতীয় লোক এবং রাজা জগদানন্দ এই জলপ্লাবনে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। রাজপুত্র এবং তৎসহ অল্পসংখ্যক ব্যক্তিমাত্র ভগবানের এই সংহারিণী লীলা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

বঙ্গীয় ১১৭৬ সালে (খ্রিঃ ১৭৬৯) যে জলপ্লাবন হইয়াছিল তাহা উল্লিখিত খণ্ডপ্রলয় হইতেও ভয়ানক। কেননা এই জলপ্লাবনে প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশ উৎসাদিত হইয়াছিল। আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে প্রবল বায়ুর সহিত মুসলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রজল সহসা উদ্বেলিত হইয়া ভয়ঙ্কর বেগে নগর, উপনগর, গ্রাম প্রভৃতি প্লাবিত করিল। প্রায় এক সপ্তাহ কাল এই প্রাকৃতিক বিপ্লব স্থায়ী ছিল। এই ভীষণ দৈব দুর্বিপাকে যে কত কোটি প্রাণী শমনভবনে গমন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।[১৮] এই দুর্যোগে সমস্ত বঙ্গভূমিতে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, ও কোটি কোটি নরনারী অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল! দিবা ভাগে প্রশস্ত রাজবর্ত্মে মাংসাশী প্রাণীসমূহ নরদেহ লইয়া বিবাদ করিত। তখন স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি ভীষণ শ্মশান রূপে পরিণত হইয়া পিশাচগণের তাণ্ডবক্ষেত্র হইয়াছিল।

বঙ্গীয় ১২২৯ সালে[১৯] ইংরেজি ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে ৬ই জুন তারিখ আর একটি ভীষণ ঝড় ও তৎসঙ্গে জলপ্লাবন হয়, তাহাতে সমুদ্রোপকূলস্থিত দক্ষিণ সাহাবাজপুর, বাউফল, মঠবাড়িয়া, গলাচিপা প্রভৃতি স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল।

৬ই জুন তারিখ (২৯ জ্যৈষ্ঠ) বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হইতে প্রবলবেগে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে ক্রমে সেই প্রবহমান বায়ু প্রচণ্ড ঝটিকাকারে পরিণত হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঊর্মিমালা মস্তকে ধারণ করিয়া ভীষণ জলরাশি সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্বেলিত হইয়া অতি ভীষণ বেগে তটাভিমুখে ধাবিত হইল।

রাত্রি প্রহরের পর বাতাসের বেগ এত বৃদ্ধি হইল যে, তাহাতে অনেক ঘর, বাড়ি উড়িয়া

গেল। এদিকেও অত্যল্প কালমধ্যে সেই উচ্ছ্বসিত জলরাশি ভীষণতর হইয়া কল কল নাদে সমস্ত প্লাবিত করিয়া ফেলিল। অনেক নর-নারী প্রাণরক্ষার উপায় না দেখিয়া উচ্চ বৃক্ষচূড়ে আরোহণ করিতে লাগিল। প্রভাতে ঝটিকা-বেগ অনেকটা কমিল, কিন্তু প্রায় সপ্তাহ কাল পর্যন্ত জলরাশি স্থানে স্থানে ছিল। এই প্রলয়ে ১০৯৮৪ জন নরনারী, এবং ৯৭০০ শত গবাদি পশু ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।[২০]

ইংরেজ ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এ দেশে আরও একটি ঝড় ও তৎসহ জলপ্লাবন হইয়া বহু নরনারী ও পশু পক্ষী বিনাশ করিয়াছিল। এই ঝড় অনেকক্ষণ স্থায়ী ছিল না; যেরূপ প্রচণ্ড বেগে এই ঝটিকাবর্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছু কাল স্থায়ী থাকিলে পূর্বাপেক্ষাও গুরুতর সর্বনাশ সাধিত হইত।

বাংলা ১২৮৩ সালে (ইং ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ৩১ শে অক্টোবর) ১৬ই কার্তিক মঙ্গলবার শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে এই দেশে যে মহা ঝড় প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা অধিবাসীগণের বংশ পরম্পরায় অনেক দিন স্মরণ থাকিবে। এই জেলার এমন স্থান ছিল না, যে স্থানে ইহাতে বিস্তর ক্ষতি না হইয়াছিল। এই মহাঝড়ে দৌলতখাঁ নামক স্থান, এবং তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রায় ১০০০০০ নর নারী, তাহার দ্বিগুণ গবাদি পশু, এবং অন্যান্য বহু প্রাণী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের অন্তর্গত দৌলতখাঁ নামক স্থানে তখন একটি মহকুমা স্থাপিত ছিল[২১] এবং বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় সেই স্থানে সাবডিভিশনাল অফিসার (Sub Divisional Officer) ছিলেন। এই খণ্ড প্রলয়ে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র, ধন-ঐশ্বর্য প্রভৃতি সমস্তই ধ্বংস হইয়াছিল। তিনি একাকী মাত্র জীবিত ছিলেন। এই শোকাবহ ঘটনা শুনিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। শুনা যায় যে উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবম্বিধ সর্বনাশে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া কাশীধামে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে সময় এই খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হয়, সেই সময় বার্টন সাহেব এই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর ছিলেন। এই ভীষণ সংবাদ অবগত হইয়া সদাশয় সাহেব সরকারি স্টিম্‌লঞ্চে চাউল এবং বস্ত্রাদি লইয়া কতিপয় নৌকা সহ দৌলতখাঁয় উপস্থিত হন। সাহেব বাহাদুর আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত না হইলে যে কয়েকজন অবশিষ্ট লোক জীবিত ছিল, অনাহারে এবং শীতে নিশ্চয়ই তাহারা শমন সদনে গমন করিত। এই ভয়াবহ খণ্ডপ্রলয় সম্বন্ধে সাহেব বাহাদুর গবর্নমেন্টে যে সুদীর্ঘ রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"২রা নভেম্বর তারিখ বেলা প্রায় ৪টার সময় দৌলতখাঁ পৌঁছিলাম। পথে নদীর মধ্যে অসংখ্য শব আমার স্টিমারের দুই পাশ দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি পশ্বাদির মৃতদেহসহ নরনারী, বালকবালিকার শব মিশিয়া সমস্ত নদী ছাইয়া ফেলিয়াছিল; শকুনিগুলি সেই সমস্ত পচা মৃতদেহের উপর বসিয়া সেইগুলি খাইতেছিল। আমি কিছুদিন পূর্বে যে স্থানে স্টিমার লাগাইয়াছিলাম, এখনও সেই স্থানে স্টিমার রাখিলাম; কিন্তু এতগুলি মৃতদেহ আমার পথ অবরুদ্ধ করিল যে খালাসিগণ বাঁশ (লাঠি) দ্বারা সেইগুলি স্রোতে ভাসাইয়া দিলে পর আমার স্টিমার লাগিল। তীরের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আমার বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত ঘর, দ্বার, বৃক্ষ প্রভৃতি কিছুরই চিহ্ন নাই; যেন প্রকাণ্ড জনশূন্য প্রান্তর। তীরে উঠিবামাত্র এমন বিকট দুর্গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল যে তাহাতে আমার বমির উপক্রম হইল। যে স্থানে কাছারি ছিল, উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে তথায় তাহার কোনরূপ সামান্য চিহ্নও বর্তমান নাই; কেবল নিকটবর্তী যে দুই একটি বড় গাছ ছিল, তাহার উপর কতকগুলি মানুষের মৃতদেহ দেখিলাম। কোন কোন বৃক্ষে মানুষ, গরু, মহিষ, শূকর প্রভৃতিরও শব একত্রীভূত দেখিলাম। আমি জলের দাগ মাপিয়া দেখিলাম যে একুশ ফুট জল হইয়াছিল। যে কয়েকজন জীবিত মানুষ দেখিলাম, তাহাদের যে অবস্থা দর্শন করিলাম, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। এই সর্বনাশী ঝটিকায় তাহাদের সকলেরই জীবনান্তিক ক্লেশ হইয়াছিল, তদুপরি

অনাহারে চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট এবং কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, অনেকের দাঁড়াইবার শক্তি পর্যন্তও ছিল না। আবার তাহারা প্রায় নগ্ন, আমি তাহাদের আহারীয় সামগ্রী ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া সাবডিভিশনাল অফিসারের অনুসন্ধান করিলাম। বহু অনুসন্ধানে তাঁহাকে পাইলাম; এই ভীষণ দৈব দুর্বিপাকে, তাঁহার স্ত্রীপুত্র সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শোকে দুঃখে তিনি উন্মত্তপ্রায়। আমি তাঁহাকে বিশেষ সান্ত্বনা করিলাম।'

ঝালকাঠির অন্তর্গত বাউকাঠি নিবাসী পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয় দৌলতখাঁর রেজিস্ট্রি কেরাণি ছিলেন। তিনি ঐ প্রলয়ের সময় তথায় ছিলেন, তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাও নিম্নে বিবৃত হইল।

"১৬ই কার্তিক মঙ্গলবার বৈকালবেলা হইতেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প জল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমাদের রেজিস্ট্রি অফিস একটি ছোট একতলা দালান, দালানটি ৭।৮ হাতের বেশি উচ্চ হইবে না। দিবাবসানে বায়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলও বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় দেখিলাম যে আমাদের দালানের সম্মুখস্থ উঠান (চত্বর) জলে ভরিয়া গিয়াছে, তখন আমরা বড় ভীত হইয়া পড়িলাম। আমরা তিন জন কেরাণি, সঙ্গে একজন মাত্র ভৃত্য। প্রাণভয়ে দালানের কবাটগুলি বন্ধ করিলাম; কিন্তু অনুমান এক ঘণ্টার পর কবাটের ফাঁক দিয়া কল কল শব্দে অল্প অল্প জল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আমরা মনে করিলাম, যে ঘরের মধ্যে জলে ডুবিয়া মরা অপেক্ষা, জীবনরক্ষার জন্য একবার চেষ্টা করা উচিত। সকলে আঁটিয়া পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করতঃ কবাট খুলিয়া দিলাম, তখন অতি বেগে জলরাশি নিমেষ মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহ পরিপূর্ণ করিল। আমরা পূর্বেই প্রস্তুত ছিলাম, অতি কষ্টে সেই জলরাশি ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। যেদিকে ৮.ি্যা দেখি সেইদিকেই জল, জল! জল! জল—চতুর্দিকেই জল! পর্বতসদৃশ তরঙ্গ মাথায় লইয়া ভীষণ জলরাশি চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। প্রচণ্ড বায়ু সেই জলরাশিকে যেন ঊর্ধ্বে ফুলাইয়া উঠাইতেছে। আমাদের রেজিষ্ট্রি অফিসের অনুমান একরশি (প্রায় ১০০ হস্ত) দূরে একটি নাতিবৃহৎ দেবমন্দির ছিল। তন্মধ্যে কালিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠাতা, তাহার চূড়া তখন পর্যন্ত ডুবিয়া যায় নাই। জীবনরক্ষার আশায় সেই দিকে সাঁতার দিলাম। আমি বিলক্ষণ সন্তরণক্ষম ছিলাম। বহুকষ্টে সেই মন্দিরের নিকটে পৌঁছিয়া, তৎপ্রান্তস্থিত ইটের কোণা ধরিয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে শত শত তরঙ্গ আসিয়া আমাদের ডুবাইয়া দিতে লাগিল। দেখিলাম যে, মন্দিরের পার্শ্বে আমাদের ন্যায় আরও কয়েক জন ঐরূপ রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গীয় ভৃত্যটিকে আর দেখিলাম না। দেখিতে দেখিতে মন্দিরের প্রায় সমস্ত ডুবিয়া গেল, আমরা জনকয়েক মন্দিরের উপরস্থিত লৌহশলাকা ধরিলাম। সেই লোহার শলাকার উপর দিয়াও তরঙ্গ খেলিতে লাগিল; তখন আর জীবনের আশা করিলাম না। ঢলকে ঢলকে জল উদরস্থ হইতে লাগিল, শরীর ক্রমশ অবশ হইয়া পড়িল; চক্ষে কিছুই স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। যতদূর শক্তি ছিল ততদূর সামর্থ্য প্রকাশে উচ্চৈস্বরে দুর্গা দুর্গা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বাক্যস্ফুরণ হইল না; জিহ্বা ক্রমশ জড় হইয়া আসিতে লাগিল। অকস্মাৎ আমার সম্মুখে একখানি "চালা" ভাসিয়া যাইতেছে দেখিলাম, তখন অন্তিম বলের সহিত চেষ্টা করিয়া সেই ভাসমান চালার দিকে সাঁতরাইয়া গেলাম, বহুকষ্টে তদুপরি আরোহণ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা সেই চালার বাঁশের সঙ্গে কটিদেশ উত্তমরূপে বন্ধন করিলাম। এই চালার উপর আরও কয়েকজন ছিল। তখন আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। এক একবার ঝাপ্‌টা বাতাসে ও জলের ঢেউতে আমাকে যেন চালা হইতে ফেলিয়া দিতেছিল, কিন্তু কটিদেশ বদ্ধ থাকায় জীবনরক্ষা হইয়াছিল। অনেকক্ষণ এইরূপ ভাসিতে ভাসিতে একটা বৃহৎ তেঁতুল গাছ ও তৎপার্শ্ববর্তী একটা মাদার গাছের মধ্যে চালাখানা ঠেকিয়া গেল; তখন এক বাতাস ব্যতীত তরঙ্গে বড় একটা কষ্ট দিতে পারে নাই। এইরূপ যে কতক্ষণ গত হইল বলিতে পারি না; রাত্রিশেষে যেন ঝড় অনেকটা কমিতে লাগিল, এরূপ বোধ করিলাম। আমরা যে চালাতে ছিলাম, তাহার মধ্যস্থান ভাঙ্গিয়া গেল; আমরা সেই ভগ্ন চালার উপর দুই গাছের ডালের মধ্যে থাকিলাম। কিছুকাল পরে বোধ হইল যেন

জল ক্রমশ কমিতেছে, এবং পূর্বদিকে যেন উষার ঈষৎ শুভ্রালোক প্রভাসিত হইতেছে। এতগুলি প্রাণীর জীবন হরণ করিয়া সেই ভয়ঙ্করী নিশীথিনী যেন ভগবান সবিতৃদেবের ভয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। যখন অস্পষ্টালোক বেশ পরিষ্কার হইল, তখন দেখিলাম যে আমাদের আশ্রয়স্থান—সেই দ্বিখণ্ডীকৃত চালা—দুইখানি বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে; অল্পকাল পরেই সূর্যদেব উদিত হইলেন। আমরা উভয় চালায় আটজন মানুষ ছিলাম, সূর্য কিরণে আমাদের অবসাদ অনেকটা দূর হইল; ধীরে ধীরে বহু কষ্টে নীচে নামিলাম, কণ্টকে শরীরের অনেক স্থান ছিন্ন হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তখনও প্রায় এক হাঁটু জল ছিল, আমরা সেই আটজন লোক উক্ত বৃক্ষতলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম; অল্প সময়েব মধ্যেই সমস্ত জল কমিয়া গেল। আমরা যেস্থানে ছিলাম তাহার পশ্চাতেই নদী; সম্মুখে যেন অনন্ত প্রান্তর ধু ধু করিতেছে। গৃহ, পথ, বৃক্ষাদির চিহ্নমাত্র নাই; কেবল স্থনে স্থানে স্তূপাকার মৃতদেহ। নদীগর্ভেও অসংখ্য শব পরস্পর মিশিয়া রহিয়াছে। রৌদ্রোত্তাপে শরীরের গ্লানি অনেকটা কম বোধ হইতে লাগিল; তখন আশ্রয়ানুসন্ধানার্থ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কোথায় যাইব, কে আশ্রয় দিবে? কোথাও কোন গৃহাদি না পাইয়া আমরা বাজারের দিকে গমন করিলাম। তথায় দুই একখানি ভগ্নপ্রায় গৃহ ছিল; কিন্তু জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত দেখিলাম না।

আমরা একখানি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে কয়েক বস্তা চাউল রহিয়াছে। সকলেই তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত; উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া বস্তা হইতে কতেক চাউল বাহির করিলাম এবং কিঞ্চিৎ জলসংযোগে উক্ত চাউল ভক্ষণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসা কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত করিলাম। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কেহ কেহ আগুন অন্বেষণে গেল; আগুন কোথায় পাইবে? প্রায় দুই ঘণ্টা পরে তাহারা ফিবিল, দুই চারিজন জীবিত মনুষ্য ব্যতীত আর কোন জনপ্রাণীর চিহ্নও দেখিল না। এইরূপে সেইদিন কাটিয়া গেল; তার পরদিনও কোথাও আগুন না পাইয়া সেইভাবে চাউল দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি কবিলাম। আমাদের মধ্যে দুজনের কলেরায় মৃত্যু হইল। আমরা তখন ভীত হইয়া অতি সামান্য মাত্র চাউল খাইলাম। সন্ধ্যার পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আগমন করিলেন। তিনি আমাদের উপযুক্ত আহার ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া তাঁহার সঙ্গে বরিশাল লইয়া আসিলেন।'

এই জলপ্লাবনে আমাদের দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, পঁচিশ বৎসরেও তাহার পূরণ হয় নাই।

বর্ষার প্রারম্ভে দক্ষিণদিকে তোপধ্বনির ন্যায় এক ভীষণ শব্দ শ্রুত হয়; কিন্তু সমুদ্রোপকূলে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশি উপলব্ধি হয়। এই শব্দ আরম্ভ হইলে অত্যল্পকাল মধ্যেই বর্ষা ও বাতাস আরম্ভ হইয়া থাকে। বর্ষান্তে এই শব্দ শুনা যায় না; জ্যৈষ্ঠমাসে আরম্ভ হয়, কখন কখন আশ্বিন মাসেও শ্রুত হয়। প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি যে পূর্বে এই শব্দ যে প্রকার মুহুর্মুহু শুনা যাইত, এখন আর তদ্রূপ শুনা যায় না। প্রাচীনগণ ইহাকে বর্ষার অল্পতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন।

এই শব্দোৎপত্তির কোন কারণ এযাবত আবিষ্কৃত হয় নাই; গবর্নমেন্ট এই জন্য কমিশন বসাইয়া প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াও কোন কারণ ঠিক করিতে পারেন নাই। তবে এই শব্দটা যে বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত হয় তাহা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের কোন স্থান হইতে যে এই ভীষণ শব্দ উৎপন্ন হয়, এযাবত তাহা নিরকৃত হয় নাই। এই সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ বলে যে রাবণরাজার বাড়ির দরজা বন্ধের শব্দ; মুসলমানগণ বলেন যে, তাহাদের ধর্মবীর ইমামের আগমন সূচক তোপধ্বনি। প্রকৃত যে কি, তাহা এযাবত কিছুই স্থির হয় নাই। ইহাকে "বরিশাল গান" বলে।[২২]

প্রোথিতনামা বাদশাহ আকবরের রাজস্বসচিব মহাপ্রাজ্ঞ রাজা টোডরমল্ল, সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সাম্রাজ্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। তৎকর্তৃক নিয়োজিত মির জিম্মন্ খাঁ নামক জনেক কানুনগো বাকলার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিতে আগমন করিয়া বাকলা সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

"রাজা (রামচন্দ্র) বয়সে বালক হইলেও তাঁহাকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইল।

আমাদিগকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিলেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য ধনধান্যে পরিপূর্ণ, প্রজাপুঞ্জ সুখী, অধিবাসীগণ সুস্থদেহ এবং সবল, যুবকগণ প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্নে দলবদ্ধ হইয়া মল্লক্রীড়া করে। অনেককে অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী দেখিলাম। রাজাও এইজন্য সকলকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া থাকেন।" ইত্যাদি[২৩]

আইন-ই-আকবরি পাঠে জানিতে পারা যায় যে তৎকালে বঙ্গদেশের ফুল্‌সি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উর্বরাভূমিতে পাকা দুইমণ আড়াইমণ ধান্য উৎপন্ন হইত। রাজকোষে বিঘাপ্রতি মাত্র দশ সের ধান্য, অথবা তদনুযায়ী রাজকর গ্রহণ করা হইত[২৪] ইহা ব্যতীত যব, গম, ইক্ষু, রবিশস্য, নানা প্রকার সুমিষ্ট ফলও প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইত। সমস্ত সাম্রাজ্যে এই নিয়মে কর আদায় হইয়া তদদ্বারা এই বিশাল ভারতবর্ষের শাসনব্যয় ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ নির্বাহ হইয়াও রাজকোষে কোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং অননুমেয় মূল্যবান মণিমুক্তাদি মজুত থাকিত।

গত সার্দ্ধ তিনশত বৎসরের তুলনায় বর্তমান সময়ে উর্বর ভূমিখণ্ডে তাহার দ্বিগুণ শস্য উৎপন্ন হয়; এখন শস্যশালিনী ভূমির সংখ্যা অনেক বেশি, কেননা কাল পরিবর্তনে অনেক নতুন স্থান সৃষ্ট হইয়াছে। অনেক বিল উত্থিত হইয়াছে; অনেক দুর্গম সুন্দরবন জনপদে পরিণত হইয়াছে। পূর্বের তুলনায় বর্তমান সময়ে এই দেশ অধিকতর শস্যশালী হইলেও দেশের অভাব দূর হইতেছে না। যদিও ধনধান্যপূর্ণা শ্যামলা বাকলা শস্যসম্পদে বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে, তবুও এদেশের অধিবাসীগণ দুর্ভিক্ষের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন না। দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহার প্রতিকার সাধনে যত্নবান হওয়া কর্তব্য।

সম্রাট আকবরের সময়ে একমণ ধান্যের মূল্য পাঁচ ডাম অর্থাৎ দুই আনা ছিল।[২৫] নবাব শায়েস্তাখাঁ যখন ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন, তখন টাকায় আটমণ চাউল বিক্রয় হইত।[২৬]

ব্রিটিশ রাজ্য পত্তন হইলে আমাদের এই দেশে ধান চাউলের যে মূল্য ছিল, তাহাও শুনিলে অবাক হইতে হয়। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে এক টাকায় আড়াই মণ চাউল বিক্রয় হইত। তারপর ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে নিম্নলিখিত দরে ধান চাউল, এবং অন্যান্য শস্য বিক্রয় হইত।[২৭]

১ নং চাউল	...	...	টাকায়	১ মণ	১০ সের।
২ নং ঐ	...	...	,,	১ মণ	২০ সের।
৩ নং ঐ	...	...	,,	১ মণ	৩০ সের।
ধান	...	...	,,	২ মণ	২০ সের।
সরিষা	..	...	,,	১ মণ	২৯ সের।
তিল	...	...	,,	১ মণ	৩০ সের।
ঘোড়ার দানা, ছোলা বুট	...	...	,,	১ মণ	২৬ সের।
সোনামুগ	...	..	,,	১ মণ	১০ সের।
যব	...	..	,,	২ মণ	৩০ সের।
গম	...	...	,,	১ মণ	১০ সের।

তারপর ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে :

চাউল	...	...	এক টাকায়	প্রায় ১ মণ।
লবণ	...	.	চারি টাকায়	১ মণ।
তৈল	...	...	ঐ	ঐ

এই অনুপাতে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য ক্রমেই মহার্ঘ্য হইতে আরম্ভ করিল।

এইভাবে তুলনা করিতে গেলেও এখন শরীর শিহরিয়া উঠে। আমাদের বিন্দুমাত্র শস্যপ্রদ ভূমির নাশ হয় নাই, বরং অনেক ভূমি আরও উর্বরাশক্তি সম্পন্ন হইয়াছে; তবু প্রতি বৎসর এই স্থানে অনশনজনিত হাহাকার ধ্বনি। অন্নাভাব হেতু কত লোক যে অকালে শমন ভবনে যাইতেছে, কে তাহার অনুসন্ধান করে?

প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি, যে গত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এক টাকায় আড়াই মণ মোটা ধান্য বিক্রয় হইত; এবং তাহাতে সাধারণ পরিবারের প্রায় এক মাসের খোরাক অনায়াসে নির্বাহ হইত। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাস্ পর্যন্ত ধান্য বিক্রেতৃগণের নৌকায় এদেশ পরিপূর্ণ হইত; তাহারা প্রত্যেক বাড়িতে আসিয়া ক্রয়বিক্রয় করিত। চাষীপ্রজাগণ তখন অনায়াসে চতুর্থাংশ ধান্য ভূম্যধিকারীকে রাজকর প্রদান করিত; কেহই টাকাপয়সা দ্বারা রাজকর পরিশোধ করিত না। ভূম্যধিকারী টাকা চাহিলেও প্রজারা সহজে স্বীকৃত হইত না। তাহাতে অনেক সময় ভূম্যধিকারীগণ প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেন। এখন কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত; এখন প্রজাগণ প্রাণান্তেও ধান্য দিতে চায় না।

পূর্বকালে এ দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। বর্তমান সময়ে যেমন গ্রামে গ্রামে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি কঠিন ও দুশ্চিকিৎস্য রোগের আবির্ভাব হইতেছে, তৎকালে তাহার কোন চিহ্নও ছিল না। জ্বর, উদরাময় কাশি, আমাশয়, বেদনা প্রভৃতি রোগ প্রায়ই প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; কদাচিৎ যুবক কি বালক রোগাক্রান্ত হইত। যদিও সংক্রামক রোগের মধ্যে কদাচিৎ বসন্ত রোগের কথা শুনা যাইত; কিন্তু "টিকা" দেওয়ার প্রচলন থাকায় তৎকালে অল্পকাল মধ্যেই ঐ ভীষণ রোগের সংক্রামকতা দূরীভূত হইত। কলেরার অস্তিত্ব আদৌ ছিল না। ১৮১৭ খ্রিঃ অব্দে প্রথমত এই রোগ যশোহর জিলার অন্তর্গত নলডাঙ্গা নামক স্থানে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ, এশিয়া, এবং তারপর সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রতি বৎসর যে কত কোটি নরনারী ইহার করালকবলে পতিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

১৫৭৫ খ্রিঃ অব্দে এক ভীষণ সংক্রামক মহামারিতে গৌড় নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তদবধি সেই মহাসমৃদ্ধিশালী নগর একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল। ঘরে ঘরে মৃতদেহ পরিপূর্ণ ছিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার লোক পর্যন্ত ছিল না; যে দুই একজন জীবিত ছিল, তাহারা পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল।[২৮] তৎকালে বঙ্গদেশ এবং সমুদ্রোপকূলস্থিত অনেক জনপদ জনমানবশূন্য হইয়াছিল। বাখরগঞ্জের দক্ষিণে এবং পূর্বে যে বিস্তীর্ণ সুন্দরবন আছে, কেহ কেহ অনুমান করেন যে ঐ সমস্ত স্থান পূর্বে লোকালয় ছিল। ঐ প্রকার সংক্রামক রোগে জনশূন্য হইয়া কালে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। নিবিড় সুন্দরবনের ভিতর অনেক স্থানে অট্টালিকা, দিঘি, প্রশস্ত রাস্তা, সেতু প্রভৃতির চিহ্ন এখনও বর্তমান।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" পর সমগ্র বঙ্গভূমে ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়া প্রায় অর্ধেক অধিবাসী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্য-সম্রাট মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "আনন্দমঠে" এই ভীষণ মহামারি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত বিশেষত বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকা মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।"

ইংবাজ রাজ্য পত্তন হইলে পর ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে জ্বরের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু তাহা অধিকদিন স্থায়ী ছিল না; ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে এক প্রকার সংক্রামক জ্বর উপস্থিত হইয়া বহু লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল।[২৯]

গত ১২৮৩ সালে এই জেলায় অনেক স্থানে কলেরার এমন প্রকোপ হইয়াছিল যে তাহাতে অনেক গৃহ একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল।

গত ১৩০৬।১৩০৭ সালে গৌরনদী ও ঝালকাঠি থানার অধীনে এরূপ কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া চিকিৎসক ও ঔষধাদি পাঠাইয়া রোগ প্রপীড়িতগণের চিকিৎসা করাইয়াছিলেন।

অন্যান্য ব্যাধি অপেক্ষা বর্তমান সময়ে উল্লিখিত ভয়ঙ্কর রোগই প্রবল; এই রোগ গ্রামের মধ্যে পূর্বে শীতকালে এবং জেলা মহকুমায় গ্রীষ্মারম্ভে আরম্ভ হইত, এখন প্রায় বারোমাসই ইহাতে মানুষ

মরিতেছে। এই সর্বনাশকর ব্যাধিতে যে কত শতসহস্র লোক অকালে কালকবলে গমন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। গবর্নমেন্ট এই রোগোৎপত্তির কারণ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে কমিশন বসাইয়া বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, কিন্তু এ যাবত কোন কারণ এবং বিশেষ ঔষধ নির্ণীত হয় নাই।

অস্মদ্দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত এই তিন ঋতুবই বিশেষ উপলব্ধি হইয়া থাকে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, গ্রীষ্ম এবং আষাঢ়ের প্রায় অর্ধেক গত হইলে পর, বর্ষা আরম্ভ হইয়া প্রায় আশ্বিন মাসের অর্ধেক পর্যন্ত থাকে, তৎপর অতি অল্পকাল শরৎ ঋতু উপলব্ধি হয়; হেমন্ত ঋতু হইতেই শীত আরম্ভ হয় এবং এই শীতকাল প্রায় ফাল্গুন মাস পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। ঋতুরাজ কেবলমাত্র দেখা দিয়া অতি অল্প সময় মধ্যেই অসহ্য নিদাঘতাপে অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। আমরা কেবল

"সদ্যঃ প্রবালোদগমচারুপত্রে নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে।
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্ নামাক্ষরানীব মনোভবস্য।।"

অনুভব করিয়া থাকি; আবার কেহ কেহ বা

"চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকূজ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষং তদেব জাতং বচনং স্মরস্য।।"

অনুভব করেন কিনা, তাহা তাঁহারাই জানেন।

প্রাচীনদিগের মুখে শুনিতেছি যে অস্মদ্দেশে কালবিপর্যয় ঘটিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এদেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর যেরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন আর ততটা নাই। তাঁহারা বলেন যে বর্ষা এবং শীত উভয়ই ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে ও গ্রীষ্মের উত্তাপ দিনদিনই বৃদ্ধি হইতেছে।

তথ্যসূত্র

১. The whole district of Bakarganj is an alluvial formation, and the most general observation which can be made concerning it, is that the ground is everywhere flat H Beveridge, History of Bakarganj P 3
২. Early Travellers in India
৩. ৮।১০ বৎসর অতীত হইল ঐ মূর্তি একজন দুর্বৃত্ত মুসলমান কর্তৃক অপহৃত হইয়া খণ্ডীকৃত হইয়াছে।
৪ মহাকবি বিজয় গুপ্তের "মনসামঙ্গলে" কিন্তু বিপুলার মাঞ্জুসের পথাতিবাহন সম্বন্ধে বিশেষ কোন নদী অথবা কোন স্থানের উল্লেখ নাই। কানা হরি দত্ত প্রণীত একখানি বটতলার ছাপা মনসার ভাসান নামক ছোট বইতে সুগন্ধার নাম পাইয়াছি।
৫. ধোপা বুড়ির ঘাট, বর্তমানে "ধুবরি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। একরূপ অনেক স্থল আছে, যাহার প্রাচীন নামের স্থলে কালক্রমে নূতন নাম হইয়াছে।
৬. এই জনরবের সত্যাসত্য সম্বন্ধে পাঠক বিবেচনা করিবেন। তজ্জন্য লেখক দায়ী নহেন। অস্মদ্দেশ কিন্তু এখনও "সোন্দার কূল" বলিয়া অভিহিত।
৭. কোটালিপাড়া পরগনা পূর্বে বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১৮৭৩ সালে ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।
৮. I have said that the district is an alluvial formation In fact, it may be looked upon, as a conquest won by the Ganges and Meghna from the Bay of Bengal With its central depression, and its deeply indented southern boundary, it has somewhat the appearance of the outstretched palm of the hand Thus a fanciful eye might regard it as a glove flung down by the Ganges to the ocean, in gage of battle, and as an augury of future victories — H Beveridge's History of Bakarganj, Page 5
Bakarganj is a very typical part of the alluvial Delta formed by the Ganges and Brahmputra and their feeders. It exhibits an unbroken flat, traversed by countless streams and rivers twisted into a network of channels which are for ever changing their courses. * * * Each individual stream is given according to the local name, it bears at different parts of its course * * *
Sir W W Hunter's Statistical Account of Bakarganj

৯. The river Padma or Ganges formerly flowed through this district before the sudden opening out of the Kirtinasa, and its old bed is still visible in the N E of the district within the jurisdiction of the police out-post of Burirhat

Statistical Account of Bakarganj by W. W Hunter

১০. পরিব্রাজক প্রণীত ভারত-ভ্রমণ।

১১. রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের অভাব নাই।

১২. The Kalaraja is supposed to derive its name from one of the Chandradwip Rajas (H Beveridge)

১৩. Dead Sea সম্বন্ধে এই প্রকারের একটা গল্প আছে।

১৪. ইহাই "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১৫. এখন সেলিমাবাদে।

১৬ "চন্দ্রোদয়াৎ আপঃ সম্যক্ উদস্তি" ইত্যাদি।

১৭ "In the 29th year of the present reign one after noon at three o' clock, there was a terrible innundation which deluged the whole *Sarkr* (Bakla) The Rajah was at an entertainment from which he embarked in a boat, his son, Paramananda Roy with many people climed to the top of a Hindu temple, and the merchants betook themselves to a "Talar" (probably a Nahabat Khana) It blew a hurricane with thunder and lightning for five hours, during which time the sea (Bay of Bengal) was greatly agitated The houses and boats were all swallowed up, nothing remaining but the Hindu temple on the height Near 200,000 living creatures perished in this calamity."—Gladwin's Translation of Ain-I-Akbari.

[আবুল ফজেল রাজা জগদানন্দের পুত্র স্থানে তদীয় পিতা পরমানন্দকে (Paramananda) নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু রাজা কন্দর্পনারায়ণই জগদানন্দের পুত্র।]

১৮. Bengal, specially, the districts of Malda, Pabna, Rangpur, Dacca, Bakarganj and Chittagong were nearly depopulated, ennumerable souls perished.

—Stewart's History of Bengal

১৯. ইহাই এই দেশে "গোলোক যোগ" নামে প্রচলিত।

২০. Mr Cardew's Report—9th June, 1822

২১. এই মহকুমা এখন ভোলায় স্থাপিত হইয়াছে।

২২ "The only natural phenomenon in the district is a metrological one, and is called *Barisal Gun* It is a singular loud sound resembling the distant discharge of artillery, which is heard in the south of the district, and especially during the rains A paper was read on the subject by Babu Gour Das *Basak* before the Asiatic Society, some seven years ago. * * * * * * but no one has yet come forward with a satisfactory explanation of the cause of this courious phenomenon The statement, that it is caused by the action of the waves on the sea-shore, seems hardly tenable, as the sound is heard from inland, at such a distance from the coast as would preclude the possibility of this explanation, some times indeed as far north as Faridpur No caverns or hot-springs are situated in Bakarganj."—

W W Hunter's Statistical Account of Bakarganj, p 175.

It is not altogether impossible that it originates in that curious submarine depression in front of Jessore and Bakarganj which is known by the name of the "*Seatch of no ground*"—H Beveredge's History of Bakarganj P 14

২৩ Ain-I-Akbari-Ten Years' Settlement of Bengal by Raja Toder Mull

২৪. "His Majesty (Emperor Akbar) in return of the cares of the royalty, exacts an annual tribute of ten seers of grain from every bigha of cultivated land through out the empire, and granaries are erected in different parts of the kingdom from whence the cattle employed by the state are provided with subsistance They are also applied to the relief of indigent husbandmen, and in the time of scarcity the grain is sold at a low price, but the quantity is proportioned to the absolute necessities of the purchasers Likewise through out the empire, a great quantity of foods is dressed daily for the support of the poor and needy Proper officers are appointed to the charge of granaries and to keep accounts of the receipts and expenditures."—Ain-i-Akbari, Page 189.

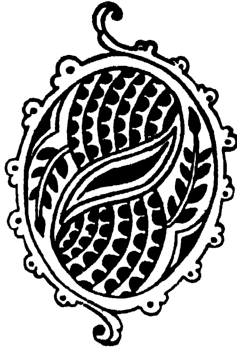
২৫. ডাম বর্তমান টাকার $\frac{১}{৪০}$ ভাগ।

২৬. Stewarts' History of Bengal.

২৭. Report of the Proceedings of the Provincial council from 1774-79

২৮. Stewart's History of Bengal (Published 1813)

২৯ H Beveredge's History of Bakarganj Page 12



তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহ

প্রাচীন আর্যজাতির ধারাবাহিক কোন জাতীয় ইতিহাস নাই, তাই আজ এই ভারতের যে সমস্ত আর্যকীর্তি পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, তৎসমুদয়ের প্রায়ই অসম্বদ্ধ। তন্মধ্যেও আবার অনেকগুলি বর্তমান পণ্ডিতসমাজে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যক্ত। তাই বর্তমান ঐতিহাসিকগণ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা সম্বন্ধে তাদৃশ যত্নবান নহেন। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ গবেষণা করিলে, আমাদের পুরাণে লুপ্ত ইতিহাসের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

যতগুলি পুরাণেতিহাস আছে, তন্মধ্যে রামায়ণ এবং মহাভারতই সর্বপ্রধান, কিন্তু মহাভারতে আমরা রামায়ণ অপেক্ষা তৎকালীন ভারতের অনেক নূতন তত্ত্ব ও ইতিহাস বিশদরূপে দেখিতে পাই। আমাদের বক্ষ্যমাণ প্রাচীন তত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাতে কিছু পাওয়া যায় কি না তাহা আলোচনা করা যা'ক।

সপ্তর্ষিমণ্ডলে যখন মঘা নক্ষত্র ছিল, তখন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।[১] সেই হিসাবে বর্তমান বর্ষ ধরিলে ৩৩৩৩ বৎসর হইয়াছে। এই সর্বনাশকর মহারণে ভারতবর্ষের যাবতীয় নৃপতি এবং রণপণ্ডিত পুরুষ কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অস্ত্র ধারণ না করিলেও অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন; ভগবান বলরাম এই যুদ্ধ সময় তীর্থ-পর্যটনে ছিলেন, সুতরাং তিনি কোন পক্ষই অবলম্বন করিতে পারেন নাই। গদাপর্বে এই তীর্থযাত্রার কারণ, এবং যে সমস্ত তীর্থ বলরাম ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশদ বর্ণনা আছে;—ভগবান বলরাম যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণান্তে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

এখন দেখা যা'ক এই গঙ্গাসাগরসঙ্গম কোথায়। আমরা মানচিত্রে দেখিতে পাই যে গঙ্গা নিম্নবঙ্গে প্রবাহিতা হইয়া শতমুখী নাম ধারণ করতঃ সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে যে স্থানে শতমুখী, তাহার নিম্নভূমির অধিকাংশ সুন্দরবনে পরিণত। বাকরগঞ্জের দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় নদী এবং শাখানদীর অভাব নাই; এই সমস্ত নদী গঙ্গা স্রোত-নিঃসৃতা, এই নিমিত্ত আমাদের প্রদেশে যতগুলি নদী আছে, সকলগুলিই "গাঙ্গ" বলিয়া প্রসিদ্ধ; "গাঙ্গ" গঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। দক্ষিণ সাহাবাজপুর, হাতিয়া, সন্দীপ প্রভৃতি দ্বীপসমূহ গঙ্গা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

গঙ্গাসাগরসঙ্গম যে ভারতবর্ষের একটি প্রধান তীর্থ, তাহার আর সন্দেহ নাই। সম্ভবত ভগবান হলায়ুধ প্রাচীন বাকলার পূর্ব-দক্ষিণ সীমায় গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্থলে স্নান করিয়াছিলেন।[২]

এই সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ আছে। রামায়ণে দেখিতে পাই যে ভগবতী গঙ্গাদেবী

সাগরসঙ্গম করিয়া পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন; আমাদের এই জেলার দক্ষিণ সীমায় যে বঙ্গোপসাগর বর্তমান আছে, তাহার একস্থান অতলস্পর্শ।[৩] ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে গঙ্গা এই স্থানেই পাতালপ্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক কারণে স্থানের নাম, এবং অবস্থার অনেক বিপর্যয় হইয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি পুরাণ বর্ণিত স্থান, এবং নদী কতকটা ঠিক আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

গঙ্গার পাতালপ্রবেশ স্থানই পুরাকালে সাগরসঙ্গম তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত ছিল, পরিশেষে নৈসর্গিক কারণে স্থান বিপর্যয় হওয়া অসম্ভব নহে।

মহাভারতের স্থানে স্থানে আমরা "বঙ্গরাজ" এবং "বঙ্গদেশের" উল্লেখ দেখিতে পাই; তন্মধ্যে সভাপর্বের দিগ্বিজয় পর্বাধ্যায়ে অন্যান্য পর্বাপেক্ষা বঙ্গদেশের একটু বিশেষ বর্ণনা আছে; রাজসূয় যজ্ঞকালে পাণ্ডবগণ যে যে স্থান জয় করিয়াছিলেন, তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যম পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেন, মগধ জয়ান্তে বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজন্যবর্গ ও সমুদ্রতীরবর্তী ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিয়া কর গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা সভাপর্বের সেই কবিতা কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম।

"উভৌ বলবৃতৌ বীর্যাবৃভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জিত্যাজৌ মহারাজ! বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ।।
সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা।।
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ।।
এবং বহুবিধান্ দেশান, বিজিত্য পবনাত্মজঃ।
বসু তেভ্য উপাদায় লৌহিত্যমগমদ্বলী।।
স সর্বান্ ম্লেচ্ছনৃপতীন্ সাগরানূপবাসিনঃ।
করমাহরয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ।।"[৪]

[অনুবাদ : এই দুই পরাক্রান্ত রাজাদের (পৌণ্ড্রাধিপতি ও কৌশিকী কচ্ছনিবাসী রাজা) সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহারাজ সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্তরাজ কর্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি, প্রভৃতিকে জয় করিয়া সমুদয় ম্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করিলেন। মহাবল পবননন্দন এইরূপে বহুদেশ বিজয় ও সর্বত্র ধন সংগ্রহ পূর্বক সাগরতীরবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া নানাবিধ ধনরত্ন এবং কর সংগ্রহ পূর্বক লৌহিত্যদেশে (ব্রহ্মপুত্র তীরে) উপস্থিত হইলেন]।

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল। বাকলার দক্ষিণ সীমায় যে সমুদ্র আছে বর্তমান সময়ে তাহার অনেকস্থান জনমানবশূন্য ও অরণ্যানীতে পরিণত হইলেও পুরাকালে যে সেই সমস্ত স্থানে লোকের বসতি ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখন দেখা যা'ক এইস্থানে ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল কি না। সংস্কৃত অভিধানে আমরা দেখিতে পাই যে ম্লেচ্ছশব্দের অর্থ যবন, কিরাত, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি; যাহারা অপভাষী, কদাচার এবং সর্বধর্ম রহিত, ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন, তাহাদের ম্লেচ্ছ বুঝায়। ম্লেচ্ছদেশ সম্বন্ধে ইহাতে লিখিত আছে :

"চাতুর্ব্বর্ণব্যবস্থানাং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
ম্লেচ্ছদেশঃ স বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্তস্ততঃ পরম্।।

(যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা নাই, অধিবাসীগণ শিষ্টাচার রহিত, এবং অসংস্কৃতভাষী, অর্থাৎ অপভাষা ব্যবহার করে তাহাই ম্লেচ্ছদেশ)।

এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন যে বাকলার দক্ষিণ সীমাবর্তী যে সুন্দরবন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তথায় পূর্বকালে নীচজাতীয় লোকের বসতি ছিল, উহাদিগকে "চণ্ড-ভণ্ড" বলিত। প্রতাপ বাবু চণ্ড-ভণ্ডের মলঙ্গি (অর্থাৎ যাহারা লবণে জ্বাল দেয়) বলিয়াছেন। আমাদের দেশেও অনেক হিন্দু ও মুসলমানদের মলঙ্গি পদবি দেখা যায়। পুরাকালে তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ লবণে জ্বাল দিত বলিয়া তাহাদের এই আখ্যা হইয়াছে। এই মলঙ্গি উপাধিধারী হিন্দুদিগের মধ্যে সকলেই চণ্ডাল অর্থাৎ নমঃশূদ্র জাতীয়। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন মুসলমান বলিয়া কোন জাতি এদেশে ছিল না। আমরা এই চণ্ড-ভণ্ড জাতির উল্লেখ আরও পাইয়াছি,[৫] বঙ্গেশ্বর লক্ষণসেনের অন্যতম পুত্র মহারাজ কেশব সেন প্রদত্ত তাম্রলিপিতে এই চণ্ড-ভণ্ডের যথোপযুক্ত শাসনের উল্লেখ আছে, আমরা এই তাম্রলিপির কথা পরে বলিতেছি।

চণ্ড-ভণ্ড জাতি যে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিল, তাহার কতক আভাস এই তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়, সম্ভবত ইহারা যথেচ্ছাচারী এবং দেবতা ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিল; তাই রাজা ইহাদের চরিত্র জ্ঞাত হইয়াই ইহাদের শাসনের ব্যবস্থা ব্রহ্মোত্তর-গৃহীতাকেই প্রদান করিয়াছেন।

এখন মহাভারত বর্ণিত "ম্লেচ্ছ," তাম্রশাসন লিখিত "চণ্ড-ভণ্ড" এবং মলঙ্গি উপাধিধারী "চণ্ডাল" এক জাতীয় কিনা তাহা আলোচনা করা যাক। অভিধানকার ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থে কিরাত এবং শবর প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। মহাকবি বাণভট্ট প্রণীত কাদম্বরী গ্রন্থে চণ্ডাল অর্থে শবর ব্যবহৃত দেখিয়াছি, ইহা দ্বারা অবশ্যই প্রতীয়মান হইতেছে যে শবরব্যবসা চণ্ডালগণের জাতীয় উপজীবিকা। মাংসাহার এবং মদ্যপান হেতু তাহাদের মস্তিষ্ক সর্বদাই উত্তেজিত, সুতরাং সামান্য কারণে বিচলিত হইলেই তাহাদের ক্রোধের অবধি থাকিত না, এই জন্যই সম্ভবত তাহাদের নাম চণ্ডাল (চণ্ + অল্) অর্থাৎ ক্রোধী হইয়া থাকিবে। ইহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি চতুর্বর্ণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চতুর্বর্ণের যাহা অকরণীয়, চণ্ডালগণের তাহাই কর্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। এই সমস্ত জাতি যে ভদ্রসমাজ হইতে অন্যস্থানে বাস করিত, তাহা মহাভারত এবং তাম্রশাসনেই সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে তাহারা বাস করিত এবং আবশ্যকমত তত্তীরব্যাপী সৈকতে এবং নিকটবর্তী অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিত; আবার কখনও কখনও ইহারা দলবদ্ধ হইয়া দস্যুতাও কবিত। বর্তমান সময়ে চণ্ডালগণের মধ্যে কেহ কেহ সুসভ্য হইয়া থাকিলেও একটু বিশেষ লক্ষ করিলে তাহাদের চরিত্র এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকটা পূর্বাভাষ পাওয়া যায়; বর্তমান সময়েও অনেকেই উদ্ধত, ক্রিয়াকাণ্ড বর্জিত, দুশ্চরিত্র এবং ধর্মাচরণ বিরহিত।

উল্লিখিত কারণে বোধ হয় ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে পুরাণবর্ণিত ম্লেচ্ছ, তাম্রশাসন লিখিত চণ্ড-ভণ্ড এবং বর্তমান চণ্ডাল একই জাতি, তবে ব্যবসাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইবার সম্ভব। বর্তমান বাকরগঞ্জের দক্ষিণ সীমাব্যাপী বঙ্গোপসাগরের তীরে সুন্দরবনে পুরাকালে এই ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল।

প্রথিতনামা চীনা পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙ্গ-এর ভারতভ্রমণে, আমরা বাকলা কথা দেখিতে পাই,[৬] তখন বাকলা একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। উক্ত মহাত্মা প্রায় দশ বৎসরকাল ভারতবর্ষে ছিলেন, ইতিহাসে ৬৩৬-৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার ভারতাবস্থানের উল্লেখ আছে। তিনি বাকলা আসেন নাই, কেননা তৎকালে বাকলার পশ্চিমভাগে উত্তালতরঙ্গময়ী সুগন্ধা নদী প্রবাহিতা ছিল। পরিব্রাজক মহাশয় উপযুক্ত নৌযানে জলপথে কামরূপ গিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু সুগন্ধা, ঘাঘর, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি অতিবাহিত করিয়া কামরূপে গিয়াছিলেন, না অন্য পথে গিয়াছিলেন, তাহা কিছুই জানা যায় নাই। তৎকালে আমাদের এই দেশের নদীসমূহে বিলক্ষণ দস্যুভীতি ছিল। দেশি ও বিদেশি দস্যুগণ তখন বিনা বাধায় লুণ্ঠনাদি করিত; কেহ কেহ বলেন যে

হুয়েনসাঙ্গের বাকলা না আসিবার ইহাই কারণ, কেননা তিনি একবার দস্যুহস্তে বিলক্ষণ বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাকলার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত "ইণ্ডোএরিয়ান" নামক ইংরেজি গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে বিগত ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইদিলপুর পরগনায় রাজা লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ইদিলপুর বর্তমান বাকরগঞ্জের মধ্যে একটি বিখ্যাত পরগনা, এবং এস্থানে অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থের বাসভূমি বর্তমান।

উক্ত তাম্রলিপি এখনও বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে বর্তমান আছে। এই তাম্রশাসন দেবনাগর অক্ষরে.উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তাম্রলিপির উপরিভাগে প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি দশহস্ত বিশিষ্ট এক দেবমূর্তি আছে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল ইহা মহাদেবের মূর্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন।[৭] এই মূর্তির নীচে ভগবান চন্দ্রদেবের স্তুতিবাচক একটি শ্লোক আছে, কেননা তিনি (রাজা কেশবসেন) এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণ চন্দ্রবংশ সম্ভূত*[৮] বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম বিজয়সেন নামক রাজার কথা লিখিত আছে। তিনি তৎকালীন সমস্ত রাজা অপেক্ষা বলবীর্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তৎপুত্র বল্লালসেন, ইঁহার শুভ্র যশে দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত হইত। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন, ইনি যেমন ধার্মিক, তেমন বীর ছিলেন; বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইনি অনেক স্থানে বিজয়স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জগন্নাথতীর্থে গদাপাণি, এবং মুশলধর বিগ্রহের সম্মুখে, গঙ্গা ও অসি নদীর সঙ্গমস্থলে সেই পরম পবিত্র শ্রীশ্রী বিশ্বেশ্বরধামে (কাশী), এবং ত্রিবেণীর তীরে (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সম্মিলন স্থানে) অনেকগুলি দেবভবন এবং চৈত্য ইঁহা দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। এই ত্রিবেণীতে পদ্মযোনি (ব্রহ্মা) সর্বপ্রথমে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই নবপতি (লক্ষ্মণসেন) স্বীয় ধর্মপত্নী মহারাজ্ঞী বসুদেবীর গর্ভে কেশবসেন নামক এক পুত্র লাভ করেন। মহারাজ কেশবসেন গজপতি, অশ্বপতি, এবং নরপতিগণের উপর স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে বনমালী শর্মার পুত্র ঈশ্বর দেবশর্মাকে বাগুতি[৯] (Baguti) এবং বেতগাতা (Bettagata) নামক গ্রামদ্বয় ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন; এবং চণ্ডভণ্ডদিগকে শাসন করিয়া এই ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। এখন প্রকৃত তাম্রশাসন-লিপির সঙ্গে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দ্বৈধ দেখা যায়। তিনি যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে বাগুতি ও বেতগাতা গ্রাম, মূল তাম্রশাসনে লতা এবং টগরাঘাট বলিয়া উল্লেখ আছে; আমরা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিলাম।

ওঁ নমো নারায়ণায়

বন্দে হরির্বিন্দবনবান্ধবমন্ধকারকারানিবদ্ধভুবনত্রয়মুদ্ধরন্তম্।
পর্য্যায়বিস্তৃতসিতাসিতপক্ষযুগ্মমুদ্যন্তমদ্ভুতখগং নিগমদ্রুমস্য।।১।।
পর্যন্তস্ফটিকাচলাং বসুমতীং বিশ্বগ্‌বিমুদ্রীভবন্,
মুক্তাকুড্মলমঙ্কিমম্বরনদীবন্যাবনদ্ধং নভঃ।
উদ্ভিন্নস্মিত মঞ্জরী পরিচিতা দিক্‌কামিনীঃ কল্পয়ন্,
প্রত্যুন্মীনতু পুষ্পশায়কযশো জন্মান্তরশ্চন্দ্রমাঃ।।২।।

১। অন্ধকার রূপ কারাগৃহ হইতে জগৎ উদ্ধারকারী, পর্যায়ক্রমে সিতকাসিত পক্ষদ্বয় (শুক্ল ও কৃষ্ণ) বিস্তারকর্তা, নিগম বৃক্ষের একমাত্র পক্ষীস্বরূপ পঙ্কজবনবান্ধবকে বন্দনা করি।

২। স্ফটিক পর্বতে যেন বসুমতীকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, স্ফুটিত মুক্তা সমূহের ন্যায় সমুদ্রকে বিভূষিত করিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় দিক কামিনীদিগকে মৃদু হাস্যযুক্ত করতঃ, নভোদেশকে স্বর্গীয় নদ জলে প্লাবিত পূর্বক কামদেব যশঃ ঘোষী ভগবান চন্দ্রদেব উদিত হউন।

এতস্মাৎ ক্ষিতিভারনিঃসহশিরোদর্বীকরগ্রামণী,
বিশ্রামোৎসবদানদীক্ষিতভুজা স্তে ভূভুজো জজ্ঞিরে।
যেষামপ্রতিমল্ল বিক্রম কথারব্ধ প্রবন্ধাদ্ভুত-
ব্যাখ্যানন্দবিনিন্দ্যসান্দ্রপুরকৈর্ব্যাপ্তাঃ সদস্যোর্দিশঃ।।৩।।
অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং,
সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যায়া।
যদঙ্ঘ্রিনখধোরণিস্ফুরিতমৌলয়ঃ ক্ষ্মাভূজো,
দশাস্যানতিবিভ্রমং বিদধিরে কিলৈকৈকশঃ।।৪।।
নীলাম্ভোরুহসোদরোঽপি দলয়নণ মর্মানি কার্দম্বিনা।
কান্তোবি জ্বলয়ন্ মনাংসি মধুপান্নিম্নোপি তন্বন্ ভযং।
নির্ণিক্তাঞ্জনসন্নিভোপি জনয়ন্ নেত্রক্রমং বৈরিণাং,
যস্যাশেষজনাদ্ভুতায় সমরে কৌশেয়কঃ খলতি।।৫।
ভাস্বন্নিস্ত্রিংশদ্রাবিরহর্বিলিসিতৈ বৈরিভূপালবংশ্যান্,
উচ্ছিদ্যোচ্ছিদ্য মূলাবধি ভুবমখিলাং শাসতো যস্য রাজ্ঞঃ।
আসীৎ তেজো জিগীষা সহ দিবসকরেণৈব দোষস্তুলাভৎ,
ভদ্রেরাশীবিষালামজনি দিগইধপৈরেব সীম্নোর্বিবাদঃ।।৬।।
খেলৎখড়্গলতাপমার্জনহৃতপ্রত্যর্থিদর্পজ্বরঃ,
তস্মাদপ্রতিমল্লকীর্তিরভবৎ বল্লালসেনো নৃপঃ।
যস্যায়োধনসীম্নি শোনিতসরিদ্দুঃ সঙ্করায়াং হৃতাঃ,
সংসস্কদ্বিপদন্তদণ্ডশিবিকামারোপ্য বৈরিশ্রিয়ঃ।।৭।।
শ্রীকান্তোপি ন মায়য়া বলিজয়ী বাগীশ্বরোপাক্করং,
বক্তুং নেত্যপটুঃ কলানিধিরপি প্রোন্মুক্তদোষগ্রহঃ।
ভোগীন্দ্রোপি ন জিহ্মগৈঃ পরিবৃতস্ত্রৈলোক্য বেশাদ্ভুত
স্তস্মাৎ লক্ষ্মণসেনভূপতিরভূৎ ভূলোককল্পদ্রুমঃ।।৮।।
প্রত্যূষে নিগড়স্বনৈর্নিয়মিতপ্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজাং
মধ্যাহ্নে জলপানমুক্তকরভ প্রোদগাল ঘণ্টারবৈঃ।

৩। যে সমস্ত ভূপতি এই চন্দ্রমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা স্বকীয় ভুজবলে, ধরণীভার প্রপাড়িত বাসুকি শিরকে বিশ্রামসুখ দান করিতেন। তাহারা অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী, তাঁহাদের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা নাই; তাঁহাদের এই প্রশংসাসূচক অদ্ভুত আনন্দে আনন্দিত পারিষদ এবং বন্ধুবর্গদ্বারা চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

৪। সুধা কিরণশেখর স্বয়ং মহাদেবের সদৃশ বিজয়সেন নামক এক নরপতি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজিত নৃপতিগণ যখন নতমস্তকে তাঁহার চরণে প্রণত হইতেন, তখন সেই সমস্ত ভূপতিগণের মুকুটমনির জ্যোতি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইত, তাহাতে বোধ হইত যেন দশাস্য রাবণ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে।

৫। এই বিজয়সেন, রণক্ষেত্রে যখন অসি চালনা করিতেন, তাহা দৃষ্টি করিয়া জনগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইত। তাঁহার খড়্গ নীল পদ্মের ন্যায় হইলেও শত্রুকুলের ধ্বংস সাধন করিত; নব জলধর তুল্য মনোজ্ঞ হইলেও তাহাদের মর্ম দলন করিত; ভ্রমর সদৃশ চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাহাদের ভীতি উৎপাদন করিত, এবং অঞ্জনসন্নিভ হইলেও বৈরীদিগের ক্লেশ উৎপাদন করিত।

৬। আলস্যবিহীন, দীপ্তিময় খড়্গ দ্বারা বিজয়সেন, প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতিগণকে সবংশে উচ্ছেদ করিয়া একচ্ছত্র রাজা হইয়াছিলেন। তেজঃ সম্বন্ধে একমাত্র মার্তণ্ড দেবই তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার বিশাল বাহুযুগল, অজগরের সঙ্গে উপমা করা হইত। তাঁহার এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সীমা লইয়া কেবল দিগ্‌পতিগণের সঙ্গে বিবাদ চলিত, অন্যের সহিত নহে।

৭। এই বিজয়সেনের অতুলনীয় কীর্তিমান বল্লাল সেন নামক একপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অযত্ন সম্ভূত লতা তুল্য বর্ধিত খড়্গ শত্রুগণের গর্ব খর্ব করিয়া শোণিত প্লাবিত যুদ্ধস্থল হইতে বিজয়লক্ষ্মীকে হস্তী দণ্ডোপরি শিবিকায় স্থাপিত করিয়া বহন করিয়াছিলেন।।

সায়ং বেশবিলাসিনীজনরণন্মঞ্জরীর মঞ্জুস্বনৈ
র্যেনাকারি বিভিন্ন শব্দঘটনাবন্ধ্য ত্রিসন্ধ্যং নভঃ।।৯।।
নূনং জন্মশতেষু ভূমিপতিনা সন্ত্যজ্য মুক্তিগ্রহং
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে ভবপ্রীণিতঃ
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধুবৈধব্যকৃত্য ব্রতো
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্বন্ধ্যো নৃপঃ।।১০।।
ন গগনতল এবং শীতরশ্মির্নকনকভূধর এব কল্পশাখী।
ন বিবুধপুর এবং দেবরাজো বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজী।।১১।
বাহুবারণহস্তকাণ্ডসদৃশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং,
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিযাং মদজলপ্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাঙ্গনপ্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা,
কো জানাতি কৃতঃ কৃতো ন বসুধা চক্রেহনুরূপো রিপুঃ।।১২।।
বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধর গদাপাণিসংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবিরুণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভনির্ব্যাজপূতে,
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমর জয়স্তম্ভমালান্যধায়ি।।১৩।।
যাং নির্ম্মায় পবিত্রপাণিরভবৎ বেধাঃ সতীনাং শিখা-
রত্ন যা কিমপি স্বরূপচরিতৈর্বিশ্বং যয়ালঙ্কৃত।
লক্ষ্মীর্ভূরপি বাঞ্ছিতানি বিদধে যস্যাঃ সপত্নৌ মহা
রাজ্ঞী শ্রীবসুদেবিকাস্য মহিষী সাভূৎ ত্রিবর্গোচিতা।।১৪।।
এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাভ্যামিব বভূব শক্তিধরঃ।
শ্রীকেশবসেনদেবো প্রতিমভূপালমুকুটমণিঃ।।১৫।।
দৃষ্টিস্থানমবাপ্য বিশ্বজয়িনো যস্য দ্বিজানাং পয়ঃ,
পাত্রৈর্লৌহময়ৈর্হিরণ্যপদবী প্রাপ্তাপি কো বিস্ময়ঃ।
এতস্মিন্ নিয়মাদ্ভুতায় মহতি প্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজাং,
যৎ পাত্রাণি হিরণ্ময়ান্যপি পুনর্যাতান্যয়োবর্ণতাং।।১৬।।

৮। এই বল্লালসেন, কল্পবৃক্ষ সদৃশ লক্ষ্মণসেন নামক এক পুত্র লাভ করেন। তাঁহার ধন অনন্ত, কিন্তু তা বলিয়া কোন প্রকার ছল অথবা প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থোপার্জন করেন নাই, বল দ্বারাই ধন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাক্‌শাস্ত্রে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়াও "না" শব্দ জানিতেন না। চন্দ্রের ন্যায় অশেষ গুণসম্পন্ন হইয়াও কলঙ্ক শূন্য ছিলেন। নাগরাজ তুল্য হইয়াও সর্পগণ দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন না। (অর্থাৎ সর্প সদৃশ ক্রূর পারিষদগণ দ্বারা চালিত হইতেন না)।

৯। এই বল্লাল সেন প্রত্যূষে বন্দী নরঘাতিগণের বন্ধনযুক্ত শৃঙ্খল শব্দ, মধ্যাহ্নে জলপান জন্য আগত করভ (হস্তিশাবক) এবং উষ্ট্রসমূহের গল ঘণ্টা শব্দ, সায়ংকালে সজ্জিতা কামিনীগণের নূপুরের মধুর শব্দ ত্রিসন্ধ্যায় আকাশপথে প্রেরণ করিতেন।

১০। বল্লালসেন সুপুত্র লাভেচ্ছায়, গঙ্গাতীরে মুক্তিবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া দেবাদিদেবকে তুষ্ট করিয়াছিলেন; তাহা না হইলে শত্রু কামিনীদের বৈধব্যকারী নৃপতিশেখর লক্ষ্মণ সেন জন্মগ্রহণ করিতেন না।

১১। এই লক্ষ্মণ সেন ধরাধামে বর্তমান থাকাতে সুধাকর কেবল গগনে বাস করিতেন না, কল্পতরু সুমেরু শিখরে বাস করিতেন না এবং দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে সর্বদা বাস করিতেন না। (অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনের শরীরে এই তিন গুণ বর্তমান ছিল।

১২। লক্ষ্মণসেনের বাহুযুগল করিশুণ্ডবৎ ছিল; বিশাল বক্ষস্থল প্রস্তরবৎ কঠিন, তাঁহার হস্তিসমূহের সৃক্কণি হইতে প্রচুর পরিমাণে মদস্রাব হইত; এবং তাহার নিক্ষিপ্ত বাণ রিপুগণের প্রাণ বিনাশ করিত। বিধাতা তাঁহার অনুরূপ যোদ্ধা আর ধরাধামে সৃজন করিয়াছেন কিনা তাহা কেহ অবগত নহেন।

আগৌমারমপারসঙ্গরভরব্যাপার তৃষ্ণাবশ
শ্রাস্তকসাস্য নিশম্য ধীরপরিষদ্ বন্দ্যাস্পদো বিক্রমং।
নিদ্রালুং দয়িতাং বিহায় চকিতৈর্দুর্গং প্রবিশ্য দ্রুতং
নির্গচ্ছদ্‌ভিররাতিভূপনিবহৈর্ভ্রাম্যান্তিরেবাস্যতে।।১৭।।
আকর্ণাঞ্চলমেলকারবিশিখক্ষেপৈঃ সমাজে দ্বিষাং
দানান্তঃ কণগর্ভদর্ভকলনৈর্গোষ্ঠীষু নিষ্ঠাবতাং।
নীবীবন্ধবিসরণৈঃ পরিষদি ত্রসৎ কুরঙ্গীদৃশাং
অব্যাপারসুখোষিতং ক্ষণমপি প্রাপ্নোতি নৈতৎ করঃ।।১৮।।
তাপিঞ্ছৈঃ পরিশীলিতেব সরিতাং কচ্ছস্থলী নীরদৈ
র্নীরন্ধ্রেব নভস্তটী মরকতৈঃ ক্লৃপ্তা ভুবঃ ক্ষ্মারুহঃ।
নীলগ্রীবকদম্বকৈরবিরলা ভোগেব মুক্তাবলী
লেখাসীদদসীয় যজ্ঞহুতভুগ্ ধূমাবলিঃ খেলতি।।১৯।।
কল্পক্ষ্মারুহকাননানি কনকক্ষ্মণাভৃদ্ বিভাগান্ নিধে
রত্নানাং পুলিনান্তরাণি চ পরিভ্রম্য প্রয়াসালসা
এতৎপাদপয়োধরপ্রণয়নীচ্ছায়াবিতানাঞ্চলে।
বিশ্রাম্যন্তি সতামনিদ্রবিদশোদ্ভ্রান্তা মনোবৃত্তয়ঃ।।২০।
কিমেতদিতি বিস্ময়কুলিতলোকপালাবলী,
বিলোকিত-বিশৃঙ্খল-প্রধনজৈত্রযাত্রাভরঃ।
শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিতবীরবর্গাগ্রণীঃ
সগন্ধপবনান্বয়ঃ প্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ।।২১।।
পদ্মালয়েতি যা খ্যাতির্লক্ষ্ম্যা এব জগত্রয়ে।
সরস্বত্যপি তাং লেভে যদাননকৃতালয়া।।২২
আরূহ্যাভ্রংলিহগৃহশিখামস্য সৌন্দর্য্য লেখাং,
পশ্যন্তীভিঃ পুরিবিহরতঃ পৌরসীমন্তিনীভিঃ।
বার্ত্তাকৃতৈর্নয়নচলিতৈর্বিভ্রমং দর্শয়ন্ত্যো
দৃষ্টাঃ সখ্যঃ ক্ষণবিঘটিতপ্রেমবন্ধৈঃ কটাক্ষৈঃ।।২৩।।

১৩। দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমিস্থ মুশলধারী ও গদাপাণির সন্নিকটে, বরুণা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল পবিত্র বারাণসীধামে, পদ্মযোনি কর্তৃক আরব্ধ যজ্ঞস্থলী ত্রিবেণীর তটে তিনি অত্যুচ্চ বিজয়স্তম্ভ এবং যজ্ঞবেদিকাসমূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

১৪। সতীকুল শিরোমণি বসুদেবী নাম্নী তাহার পটমহিষী ছিলেন; তাঁহাকে নির্মাণ করিয়া বিধাতা তাঁহার হস্ত পবিত্র করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুনির্মল চরিত্রে পৃথিবী অলঙ্কৃতা হইয়াছিলেন। লক্ষ্মী এবং ধরিত্রী তাঁহার সপত্নীরূপে সকল বাঞ্ছা করিতেন।

১৫। শশিশেখর মহাদেব ও গিরিজা পার্বতী হইতে যেমন শক্তিধর কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তদ্রূপ এই রাজদম্পতি হইতে, ভূপালগণের শিরোভূষণ স্বরূপ কেশব সেন দেব জন্মগ্রহণ করিলেন।

১৬। যে বিশ্ববিজয়ী নৃপতির দর্শনমাত্র আশ্রিত ব্রাহ্মণবর্গের লৌহ নির্মিত পানপাত্র সকল স্বর্ণ হইত, তাঁহাকে অবলোকন করিয়া বিপক্ষীয় ভূপালবর্গের স্বর্ণ নির্মিত পাত্র সমূহ যে লৌহত্ব প্রাপ্ত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

১৭। এই নরপতি কৌমার কাল হইতেই সর্বদা যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন; তাহার অতুলনীয় বিক্রম শ্রবণ করিয়া বিপক্ষীয় ভূপালবৃন্দ নিদ্রিত রমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতেন; ইহাতেও তাহাদের ভয় দূর হইত না, তাহারা চিন্তিত মনে চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেন।

১৮। তাহার হস্তদ্বয় কখনও বিশ্রাম সুখ লাভ করিত না, আকর্ণ আকর্ষিত বাণ সমূহের দ্বারা বিপক্ষ নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধ; নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণগর্ভদান এবং লজ্জাশীলা কুরঙ্গনয়না সুন্দরীগণের কটিবন্ধন বস্ত্র শ্লথ করা প্রভৃতি কার্যে তাহার হস্তদ্বয় সর্বদা নিযুক্ত থাকিত।

এতন্নোন্নতবেশ্মসঙ্কটভূবা স্রোতস্বতী সৈকত
ক্রীড়ালোলমরালকোমল কণৎক্কাণ-প্রণীতোৎসবাঃ।
বিপ্রেভ্যো দধিরে মহীমখবতানেক প্রতিষ্ঠাভৃতা
পারপ্রক্রমশালি-শালিসরলক্ষেত্রোৎকটাঃ কর্ব্বাটাঃ।।২৪।।

ইহ খলু জম্বুগ্রাম পরিসর শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ সমস্ত সপ্রশস্ত্যাপেত অরিরাজসূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বিজয় সেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যাপেত অরিরাজসূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লা সেন পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যাপেত অরিরাজ সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যাপেত অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপন্নদান কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ ঘাতক শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমৎকেশবসেন দেবপাদা বিজয়িনঃ সমুপাগতাশেষ রাজ রাজনাক রাজ্ঞী রণিক রাজপুত্র রাজামাত্য মহাপুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহাদৌঃসাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল হস্ত্যশ্ব গোমহিষাজাবিকাদি ব্যাপৃত গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক নেয়গপত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকল রাজ্যাধিপ জীবিনোহধ্যক্ষ প্রবরাংশ্চ চট্ট-ভট্ট জাতীয়য়ান্ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ যথার্হং মানয়তি বোধযতি সমাদিশতি চ। বিদিত মস্তু ভবতাং যথা : পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে প্রশস্তলতাটঘড়াঘাটকে পূর্বে সত্রকাধি গ্রামসীমা দক্ষিণে শাঙ্করবসা গোবিন্দবনান্তঃভূ সীমা পশ্চিমে পঞ্চকাপাগাদাগহুয় সঃ গ্রাম সীমা উত্তরে বাগুলীঞ্চিগাতা ভূদ্যমানভূঃ সীমা ঈত্থং যথাপ্রসিদ্ধস্বসীমাবচ্ছিন্না বৃহন্নপরিচরণৈঃ শুভবর্ষবৃদ্ধৌ দীর্ঘায়ুষ্ঠকামনয়া সমুৎসর্গিতা সচ্ছায়োৎপত্তিকা সাচ ভূমিঃ সসাদা বিবিধবাসগর্ত্তৌষরা সজলস্থলাখিল পলাশগুবাক নারিকেললতা চণ্ড-ভণ্ডা প্রবেশা তির্যন্তা আচন্দ্রার্ক ক্ষিতি সমকালং যাবদ্দিনং তৎ সজলনানাপুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা গুবাক নারিকেলাদিকং লগ্গায়িত্বা পুত্রপৌত্রাদিসন্ততিক্রমেণ সচ্ছন্দোপভোগেনউপভোক্তুং।। বাৎস্য সগোত্রস্য ভার্গবচ্যবন আপ্লুবৎ ঔর্ব্ব্য জামদগ্ন্য পঞ্চপ্রাবর পরাশব দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বাৎস্য সগোত্রস্য তথা পঞ্চপ্রবরস্য গর্ভেশ্বব দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বাৎস্য সগোত্রস্য তথা পঞ্চ প্রবরস্য বনমালিদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্য সগোত্রায়ভার্গবচ্যবন আপ্লবৎ ঔর্ব্ব্য জামদগ্ন্য পঞ্চপ্রবরায় শ্রুতিপাঠকায় শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় সদাশিব মুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা দূতীরাকীয় জ্যোষ্ঠাদিনা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন চণ্ড-ভণ্ড দণ্ডা তাম্রশাসনীকৃত্য প্রবত্তা যত্র চঃতুসীমাবচচ্ছিন্ন শাসন ভূমির্হি (৩০০) যদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানু মন্তব্যাং ভাবিভির্নৃপতিরপি হরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং ভবন্তি চত্রা ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ —

১৯। এই নৃপতির যজ্ঞীয় ধূমাবলী দ্বারা নদী এবং তত্তীরবর্তী বৃক্ষসমূহ ব্যাপ্ত থাকিত। আকাশমণ্ডল যেন গভীর মেঘদলদ্বারা আবৃত রহিয়াছে বৃক্ষসমূহ যেন মরকত মণি দ্বারা খচিত এবং মুক্তাবলী যেন নীলকান্তমণিরূপে পরিণত হইয়াছে এরূপ বোধ হইত।

২০। ধনলিপ্সু সাধুগণের নিদ্রা বিরহিত মনোবৃত্তি কল্পদ্রুম কানন সমুদ্রোপকূল প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া তাঁহার পাদপযোধর প্রণয়িনী ছায়াতলে বিশ্রাম লাভ করিতেন। (অর্থাৎ এই সমস্ত সাধুগণের সকল বাসনাই এই রাজা পূর্ণ করিতেন।)

২১। প্রলয়কালীন রুদ্রবৎ এই নরপতি রাজ্য শাসন করিতেন তিনি বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন: বিপক্ষ রাজন্যবর্গ, তাঁহাদের বিজয়ী সৈন্য, তৎ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে চাহিয়া দেখিতেন।

২২। লক্ষ্মীই কেবল এই জগতে পদ্মালয়া নামে খ্যাতা, কিন্তু অধুনা সরস্বতী তাঁহার (রাজার) মুখ পদ্মোপরি সর্বদা অধিষ্ঠান হেতু তিনিও 'পদ্মালয়া' নামে পরিচিতা হইয়াছেন।

২৩। পুরী বিহারকালীন সুন্দরীগণ অভ্রভেদী গৃহচূড়ায় আরোহণ করিয়া তাঁহাকে (রাজাকে) দেখিতেন: তিনি এই সমস্ত চলিতনয়না কামিনীগণের প্রতি ক্ষণমাত্র প্রেম কটাক্ষ করিতেন।

২৪। ইন্দ্রতুল্য এই রাজা বিপ্রদিগকে উৎকৃষ্ট গৃহ ক্রীড়মান হংসধ্বনি মুখরিত নদী সৈকতস্থ উৎকৃষ্ট ধান্যযুক্ত বিচিত্র ভূমি প্রদান করিতেন।

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্‌গয়ন্তি পিতামহাঃ।
ভূমিদোহস্মৎকুলে জাতঃ, স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি।।
ভূমিং য প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ।।
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং।।
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত্তু বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়া কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।।
ষষ্ঠিবর্ষসহস্রানি স্বর্গে তিষ্টন্তি ভূমিদাঃ।
আক্ষেপ্তা চাবমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ।।
সর্ব্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলং।
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ।।

সচিবশতমৌলিলালিতপদাম্বুজস্যানুশাসনভৃতঃ শ্রীযুতদত্তোত্তবগৌড় মহাভট্টকঃ খ্যাতঃ শ্রীমন্‌মহ্যসাকরণনি শ্রীমহামদনক করণনি শ্রীমৎ করণনি সং তিন জ্যৈষ্ঠ দিনে। * * (অস্পষ্টং)

এই বিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপ বিজেতা, বিপক্ষনরপতিনিহন্তা প্রশংসনীয় মহারাজ বিজয়সেনের পদযুগল তৎপুত্র মহারাজ বল্লালসেন সর্বদা চিন্তা করিতেন। তিনি সর্ববিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া "শঙ্করগৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রুকুল ধ্বংসকারী প্রশংসনীয় শঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন, তৎ পিতা বল্লাল সেনের পদযুগল চিন্তা করিতেন। সর্বপ্রকার প্রশংসাযুক্ত অশ্বপতি গজপতি, নরপতি, এই ত্রিবিধ নৃপতিপতি. সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর, সোমবংশ প্রদীপ, কর্ণ সদৃশ দাতা, ভীষ্মের ন্যায় সত্যব্রত, শরণাগতরক্ষক, অত্যন্ত ধনবান, মহাবীর, রাজাধিরাজ, অরিকুলনিহন্তা, শঙ্করগৌড়েশ্বর, শ্রীমৎ কেশব সেন, তৎপিতা লক্ষ্মণ সেন দেবের পদযুগল নিয়ত চিন্তা করিতেন। এই রাজাধিরাজ কেশব সেন, সমীপবর্তী রাজন্যবর্গ, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজমন্ত্রি, রাজ পুরোহিত প্রধান বিচারপতি, সন্ধি এবং বিগ্রহবিভাগের কর্মচারী, প্রধান সেনাপতি, মন্ত্র, গুপ্তচর, নৌবল, হস্তী, অশ্ব, ও মহিষ-পালকগণ, বস্ত্রাদি রক্ষকগণ, উদ্যানরক্ষকগণ রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক, ও তাহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ, চট্টভট্টগণ, ব্রাহ্মণদিগকে যথোপযুক্তরূপ জ্ঞাপন করিয়া নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করিতেছেন; আপনারা সকলে বিদিত হউন : পৌণ্ড বর্দ্ধন অন্তঃপাতী বঙ্গদেশে, বিক্রমপুর প্রদেশে, পূর্বসীমা সত্রকাধি গ্রাম, দক্ষিণসীমা শঙ্করবাসাগ্রামের বনান্তভূমি, পশ্চিম সীমা গঞ্চকা পাদাম্বয় সবগ্রাম, উত্তরে বাগুলী, এই সীমাবর্তী লতা ও চগড়াপাট ভূমিখণ্ড, নৃপতির শুভ বর্ষ বৃদ্ধি দিবসে দীর্ঘায়ু নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে উৎসর্গীকৃত করা হইল। সুনির্মল জলপূর্ণ সরসী, গৃহ সজলস্থল, পলাশ, গুবাক, নারিকেল বৃক্ষে এবং চমড়-ভণ্ড জাতির বসতি স্থল এই ভূমিখণ্ড সূর্যচন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত জলাশয় প্রভৃতি খনন করিয়া, নারিকেল ও গুবাক বৃক্ষ সমূহ রোপন করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করিবার জন্য বাৎস্য গোত্রোৎপন্ন, ঔর্ধ্ব্য চ্যবণ, জামদগ্ন্য প্রভৃতি পঞ্চ প্রবর যুক্ত পরাশর দেবশর্মার প্রপৌত্র, বাৎস্য গোত্র এবং উক্ত পঞ্চপ্রবরযুক্ত গর্ভেশ্বর দেবশর্মার পৌত্র, বাৎস্য গোত্র এবং উক্ত পঞ্চপ্রবরযুক্ত বনমালী দেবশর্মার পুত্র, বাৎস্য গোত্র, ভার্গব, চ্যবণ, আপ্লুবৎ, ঔর্ধ্ব্য, জামদগ্ন্য পঞ্চপ্রবরযুক্ত শ্রুতিপাঠ শ্রীঈশ্বর চন্দ্র দেবশর্মাকে জ্যোষ্ঠাদির সম্পূর্ণ দাবি হইতে মুক্তি দিয়া চণ্ড-ভণ্ডদিগের সম্পূর্ণ শাসনভার প্রদান করতঃ সদাশিব মুদ্রা (মোহর) দ্বারা মুদ্রাঙ্কণ পূর্বক এই তাম্রশাসন দ্বারা দান করা হইল। ইহার চতুঃসীমান্তর্গত ভূমির পরিমাণ ৩০০।। আমার এই আদেশ সকলে প্রতিপালন করিবে। ভাবী নৃপতিগণ দত্তাপহারির পাপ জন্য এই অনুজ্ঞা পালন করিবে।

বংশে ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করিলে, পিতৃগণ পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধার সাধন হইবে বলিয়া গৌরব প্রকাশ করেন। ভূমিদাতা ও ভূমি গ্রহণকারী উভয় পুণ্যবান এবং নিয়ত স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। সগর প্রভৃতি নৃপতিগণ এই পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন। স্বদত্ত অথবা পরদত্ত ভূমি হরণ করিলে পিতৃপুরুষগণের সহিত বিষ্ঠামধ্যে কৃমিজন্ম লাভ হয়। ভূমিদাতা ষাটি হাজার বৎসর স্বর্গে বাস করেন এবং ভূমি অপহরণ করিয়া ঐ কাল পর্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকেন। সকল দানকার্য্যেরই এক জন্ম পর্যন্ত ফলপ্রাপ্তি ঘটে। নলিনী দলগত জল বিম্ববৎ ধন জন জীবন ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান করিয়া জ্ঞানীগণ পরকীয়া কীর্ত্তি লোপ করিবেন না।

সহস্র মন্ত্রী-চুম্বিতপাদ মহারাজ গৌড়েশ্বরের এই তাম্রশাসনপত্র তদীয় মহাভট্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইল।

এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে যদিও কিঞ্চিৎ গোলযোগ দেখা যায় তথাপি মূল ঠিকই রহিয়াছে। ইহাতে মহারাজ বিজয়সেন হইতে কেশবসেন পর্যন্ত বংশতালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই তাম্রশাসন পাঠে বোধ হয় যে মাধব সেন জ্যেষ্ঠ এবং কেশব সেন কনিষ্ঠ ছিলেন; মাধব সেনই প্রথম রাজত্ব করেন; সম্ভবত অত্যল্প কালের মধ্যে তাঁহার জীবন লীলা শেষ হয়; তৎকনিষ্ঠ কেশব সেনও বেশিদিন রাজত্ব করেন নাই। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এতদুভয়ের রাজত্বকাল খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতেও অনেকের মতদ্বৈধ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষস্থিত প্রাচীন হিন্দু রাজগণের রাজত্বকাল নির্ণয় সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ; অনেকের অনেক প্রকার মত দেখিতে পাই, তবে প্রাচীন তাম্রশাসন অথবা প্রস্তরফলক প্রভৃতি অবলম্বনে যেগুলি নির্ণীত হইয়াছে তাহাই অধিকাংশ সত্য বলিয়া বোধ হয়। ইদিলপুরস্থিত বাগুতি ও বেতগাতা নামক যে গ্রামদ্বয় মহারাজ কেশব সেন ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছেন বহু অনুসন্ধান করিয়াও বর্তমানে তাহার ঠিকানা পাই নাই। সম্ভবত এখন অন্যনামে এই গ্রামদ্বয় পরিচিত। ১১৯৪ খ্রিঃ অব্দে[১১] যখন পাঠান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু স্বাধীনতা ধ্বংস হয় তখন রাজা লক্ষ্মণ সেন[১২] নবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। আমরা মিনহাজউদ্দিনের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে বক্তিয়ারের নবদ্বীপ আক্রমণের সময় রাজা লক্ষ্মণসেনের বয়স অশীতি বৎসর ছিল; পাঠানগণ অতর্কিত রূপে নগর ও রাজপুরী আক্রমণ করিলে মন্ত্রিবর্গের কৌশলেই হউক অথবা সৈন্য সেনাপতিগণের শিথিলতাবশতই হউক এক প্রকার বিনা যুদ্ধেই বক্তিয়ার খিলজি নবদ্বীপ অধিকার করিলেন। বৃদ্ধ রাজা রানীর সহিত অন্তঃপুরস্থ গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন করতঃ সমতট (পূর্ববঙ্গ) স্থিত বিক্রমপুরে প্রস্থান করিলেন। রাজপরিবারবর্গ, মন্ত্রি ও অন্যান্য রাজকর্মচারিগণ যে যে দিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন, আর যাহারা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহারা নির্দয় পাঠান হস্তে নিতান্ত নৃশংসরূপে নিহত হইলেন। এই যবন বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা করিতে রাজবংশীয় তরুণ সেন, অরুণ সেন, হরি সেন, বিজয় সেন প্রভৃতি রাজন্যগণ এবং অন্যতম সভাপণ্ডিত গোবর্ধনাচার্য[১২] বাকলায় পলায়ন করিয়া কতকটা স্বাধীনতা এবং মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেন রাজগণের অধিকৃত সাম্রাজ্যে বহুতর সমৃদ্ধশালী নগর এবং জনপদ ছিল, তন্মধ্যে সুবর্ণগ্রাম (সোনার গাঁ) এবং বাকলা উল্লেখযোগ্য। এই উভয় স্থান নবদ্বীপ ধ্বংসের পরও প্রায় একশত বৎসর স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।[১৩]

বাকলায় তখন কে রাজত্ব করিতেন তাহা জানা যায় নাই; সম্ভবত সেনরাজগণের অধীনস্থ কোন করদ মিত্র হিন্দু ভূপতি তৎকালে রাজত্ব করিতেন। ইদিলপুরের তাম্রশাসনে বোধ হয় যে তখন এই প্রদেশ, সেন রাজগণের সম্পূর্ণ অধীনে কোন সীমান্ত করদ ভূপতি দ্বারা শাসিত হইত।

স্বনাম প্রসিদ্ধ নিদান প্রণেতা মাধব করের[১৪] অন্য পরিচয় দিতে হইবে না, ইনি বৈদ্যবংশ সম্ভূত, বাকলায় ইহার জন্মভূমি, ইহার জ্ঞাতিগণ অদ্যাপি গৌরনদী থানার অন্তর্গত নলচিড়া গ্রামে বসতি করিতেছেন। "মাধব করের ভিটা" বলিয়া একখানা প্রাচীন বাড়ি এখনও তথায় বর্তমান।

"জাতিতত্ত্ব বারিধি" নামক গভীর গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে দেখিতে পাই যে, মাধব কর এবং চক্রপাণি দত্ত উভয়ই সমসাময়িক। শেষোক্ত মহাপুরুষ পালবংশীয়[১৫] রাজা নয়পাল দেবের চিকিৎসক ছিলেন।

এখন দেখা যা'ক, এই নয়পালের রাজত্বকাল খ্রিষ্টিয় কোন শতাব্দীতে বর্তমান ছিল। সেনবংশের পূর্বে এবং সমকালে যে পালবংশ গৌড়ে রাজত্ব করিতেন তাহা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই; কিন্তু এই বংশের ধারাবাহিক নাম এবং রাজত্ব নির্ণয় লইয়া বড় গোলযোগ চলিতেছে। ইংরাজ লেখকগণ প্রণীত যে কয়েকখানা বঙ্গ-ইতিহাস আছে, তাহাতে অনেকটা অনৈক্য দেখা যায়; কেহ কেহ বলেন যে নয়পাল ১০৩৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন, আবার কেহ কেহ সেই মত খণ্ডন করিয়া নিজ নিজ মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পাল

রাজাদের প্রস্তরলিপি এবং তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে রাজা নয়পাল ১০৪০ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১০৬০ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাকলা নিবাসী মাধব করেরও অভ্যুদয়কাল উল্লিখিত খ্রিষ্টাব্দ অবধারণা করা যাইতে পারে।[১৬] ইহাতেও প্রতীয়মান হয় যে, বাকলা জনপদ ইহার পূর্বেও ধনধান্য বিদ্বন্মণ্ডলীপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল।

বিক্রমপুর, বাকলা, নবদ্বীপ এই তিনটি স্থান সমস্ত বঙ্গভূমে পণ্ডিত এবং কুলসমাজ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে এই তিনটি স্থানের মধ্যে বাকলাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বিদ্বন্মণ্ডলী পরিপূর্ণ ছিল। যে সময় নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে মানব সমাগম বিরল ছিল, তখনও বাকলা বহু জনাকীর্ণ ছিল।[১৭] তথা হইতে বহু ছাত্র, কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড়, কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থানে ন্যায়, দর্শন, মীমাংসা, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রাভ্যাস করিতে যাইতেন। আবার দিগ্‌দেশীয় ছাত্রবৃন্দ সেইরূপ বাকলায় আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। রাজপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া বাকলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তখন অনন্যমনে শাস্ত্রচিন্তা করিতেন। তৎকালে কাশীধামের পূর্বদিকে বাকলায় যে প্রকার পণ্ডিতসমাজ ছিল, বঙ্গদেশে আর কোথাও সেইরূপ ছিল না।[১৮]

ন্যায়শাস্ত্র পূর্বে অস্মদ্দেশে প্রচলিত ছিল না; মৈথিলি পণ্ডিতগণ স্বস্থানে বসিয়া অধ্যাপনা করাইতেন। তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রগ্রন্থ শিষ্যগণকে দিতেন না। কেহ কোন প্রকার নকল করিয়াও আনিতে না পারে এই জন্য অধ্যাপকগণ বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। কালে নবদ্বীপ নিবাসী বাসুদেব সার্বভৌম চতুষ্পাঠীতে যাহা অধ্যয়ন করিতেন, অবিকল তাহাই তাঁহার বাসগৃহে আসিয়া লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপ ক্রমাগত ন্যায়শাস্ত্রের যাবতীয় গ্রন্থ তিনি লিখিয়া রাখিলেন। পরে পাঠ সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বক ন্যায়শাস্ত্র প্রচার করেন। তদবধি নবদ্বীপই প্রাধান্য লাভ করিল। এই প্রবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারি নাই।

গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়া ছিলেন। ইহার পূর্বে নবদ্বীপের উল্লেখ কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। নবদ্বীপের নূতনত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে; ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মৃত্তিকা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ঐ স্থান গঙ্গার পার্শ্বনিক্ষিপ্ত চর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।[১৯] সম্ভবত রাজা লক্ষ্মণ সেন তখন ঐ ভূমির উর্বরতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনে তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

বর্তমান সময়ে যেমন নবদ্বীপ হইতে ছাত্রগণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া উপাধি গ্রহণ করেন, বহু পূর্বে বাকলায় এই উপাধি দান করা হইত।

এই সম্বন্ধে আর একটি জনরব প্রচলিত আছে। মহারাজ আদিশূর যখন কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ করেন, তখন এই বঙ্গদেশের উপর বাকলার তৎকালীন সর্বপ্রধান পণ্ডিতকে "অর্ঘ্য" এবং সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতির বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অনেক প্রাচীন পণ্ডিত এবং ঘটকের মুখে এই কথা শুনিয়াছি। বহু অনুসন্ধান দ্বারা বাকলার কয়েকজন প্রাচীন পণ্ডিতের নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা কে, এবং কোন সময়ের লোক, তাহা কিছুই জানা যায় নাই। এই সমস্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মধুসূদন সরস্বতী।—ইনি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদগীতার অতি বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল টীকা প্রস্তুত করেন।

গৌরীনাথ।—ইনি "গৌরীনাথী-কূট" বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌরনদী থানান্তর্গত নলচিড়া গ্রামে ইহার বাসস্থান ছিল। শাস্ত্রে ইনি সাক্ষাৎ গৌতমের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন। অদ্যাপি ইহার "কূট" মীমাংসিত হয় নাই। প্রবাদ যে ইনি দৈবীবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মশাপে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল।

হরিনাথ।—ইহারও "কূট" আছে। ইনিও ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

আলোক, গোলক, রুদ্র, মঙ্গল।—এই চারিজনও নৈয়ায়িক, ইহারাও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন।

মধুসূদন সরস্বতী ভিন্ন আর কাহারও ঐপ্রকার গ্রন্থ কিংবা ভাষ্য আছে কি না তাহা জানা যায় না; থাকিলেও তাহা বিরল এবং দুষ্প্রাপ্য।

কদাচিৎ দুই একজন প্রাচীন পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কেহ নাম ধাম আত্মপরিচয় দেন নাই। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে তৎকালীন পণ্ডিতগণ বিদ্যাভিমানী এবং গর্বিত ছিলেন না। আমাদের দেশে যে সমস্ত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্ন তপন-কিরণবৎ জ্ঞানালোকে জগৎ বিমোহিত করিয়া ছিলেন, আজ তাঁহাদের স্মৃতি পর্যন্ত রক্ষা করিবার উপায় নাই। আমরা বিদেশি লোকের প্রতিভায় আত্মহারা হই, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত একবার নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করি না।

১৪২৬ খ্রিষ্টাব্দ হইতে অনুমান ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যখন পাঠান নৃপতি নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহ ও তৎবংশধরগণ পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁয়ে (সুবর্ণগ্রাম) রাজত্ব করিতেন; তখন প্রাচীন বাকলার পূর্ব অংশ ফতিয়াবাদ বলিয়া অভিহিত হইত। আমরা এই সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। এই সময় হইতে প্রাচীন বাকলা শ্রীহীন হইতে থাকে। মুসলমানাগমনে বাকলার রাজা ক্রমশ হীনবল হইতে লাগিলেন, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে রাজ্যস্থিত অনেক ভূখণ্ড পাঠানগণের আয়ত্তাধীনে আসিতে লাগিল। এই সময় হইতেই, ভারতবর্ষের অনেক স্থানের হিন্দুনাম পরিবর্তিত হইয়া মুসলমান প্রদত্ত নাম রক্ষিত হইল।

সাধকপ্রবর মহাকবি বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল অথবা পদ্মপুরাণে ফতিয়াবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। কবি-কর্ণপুর নিজ নামধামের পরিচয় সময় লিখিয়াছেন :

"রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত,
মুল্লুক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক্সিম।"

বাঙ্গরোড়া এই জেলার মধ্যে একটি বৃহৎ পরগনা। উল্লিখিত কবিতায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে বাঙ্গরোড়া ফতিয়াবাদ রাজ্যের অংশ মাত্র।

এই মনসা-মঙ্গল গ্রন্থে আমরা বাকলার প্রাচীনত্ব, গৌরব এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর পরিচয় পাই। কবি লিখিয়াছেন —

"যেন মনে পদ্মাবতী করিলা সন্নিধান,
তেন মতে করে বিজয় গীতের নির্ম্মাণ।
ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক,[২০]
সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি তিলক।
সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা, প্রভাবেতে রবি,
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী।
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত,
মুল্লুক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক্সিম।
পশ্চিমে ঘাঘর নদী, পুবে ঘণ্টেশ্বর,
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।
চারি বেদধারী তথাঁ ব্রাহ্মণ সকল,
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল।
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের সুর,
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর।
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়,
হেন, ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়।"

গৌড়নগরে যখন সুলতান হোসেন শাহ রাজত্ব করিতেন, তখন "ঋতু-শূন্য-বেদ-শশী" শকে এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয়। ইহা দ্বারা ১৪০৬ শক[২১] হইল (১৪৮৪ খ্রিঃ অব্দ)। বঙ্গীয় ইতিহাসে

দেখিতে পাই যে সুলতান হোসেন শাহ ১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।[২২] যতজন পাঠান নৃপতি অস্মদ্দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তন্মধ্যে হোসেন শাহই সর্বশ্রেষ্ঠ, ইনি যেরূপ ধার্মিক, তদ্রূপ বীর, ন্যায়দর্শী এবং তেজস্বী ভূপতি ছিলেন, তাই কবিবর লিখিয়াছেন :

"সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা, প্রভাবেতে রবি,
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী।"

অদ্য হইতে প্রায় ৪০০ বৎসরের কথা, সেই সময় এবং তাহারও অনেক পূর্বে বাকলা অতীব সমৃদ্ধিশালী জনপদ এবং পণ্ডিত সমাজ ছিল। অস্মদ্দেশে জনপ্রবাদ যে চন্দ্রপতি (চাঁদ বেনে) সওদাগর প্রভৃতি বণিকগণ বাণিজ্য করিতে যাইবার সময়, বর্তমান গৈলাফুল্লশ্রীর নিকটে একস্থানে পূজা দিয়া যাইতেন। এই স্থানের নাম জাহাজঘাটা, ইহা এখনও বর্তমান।

ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, শেষ পাঠান সম্রাট দাউদ খাঁর পিতা সুলেমান কিরাণীর রাজত্ব সময়ে, তদীয় সেনাপতি হিন্দু-বিগ্রহ-ধ্বংসকারী ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত দুর্বৃত্ত কালাপাহাড়, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় অনেক প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি চূর্ণীকৃত করিয়াছিল। কয়েক বৎসর অতীত হইল গৌরনদী থানার অন্তর্গত আটক গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে মানবাকার পরিমিত পাষাণময় মহাবিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।[২৩] ঐ মূর্তি এখন লক্ষ্মণকাঠি গ্রামে বর্তমান। ইহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে কালাপাহাড়ের ভয়ে ঐ মূর্তি তখন তথাকার অধিবাসী কর্তৃক লুক্কাইত হইয়াছিল।

পাঠান রাজত্ব সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে যে কয়েকজন ভূপতি শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তৎকালে বঙ্গদেশীয় সমৃদ্ধিশালী অধিবাসীগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন; চৌর ভয় এক প্রকার ছিল না। রাজা পরমানন্দ তখন সমগ্র বাকলার অধীশ্বর ছিলেন।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, পাঠান রাজগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর বহু শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ববঙ্গস্থ বিক্রমপুর এবং বাকলা স্বাধীন ছিল। মুসলমান অত্যাচার প্রপীড়িত বহু সংখ্যক স্বধর্মপরায়ণ হিন্দুসন্তান, এই সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ এই সকল স্থানে বাস করিতেছেন। ইহা দ্বারা অবশ্যই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তৎকালে অস্মদ্দেশ হিন্দু নরপতির অধীনে ছিল।

সেই সময়ে এই সমগ্র বঙ্গদেশে. বাকলায়ই অতি বিশুদ্ধরূপে দিনপঞ্জিকা প্রস্তুত হইত। সেন রাজগণ, সন্তুষ্টচিত্তে এই পঞ্জিকাকারগণকে যথেষ্ট পরিমাণ ভূমিবৃত্তি প্রদান করিতেন। এই পঞ্জিকানুসারে তখন বঙ্গের সমস্ত হিন্দুসন্তান, দেব এবং পিতৃকার্য নির্বাহ করিতেন।[২৪] আমার স্বর্গগত পূর্বপুরুষপ্রদত্ত ব্রহ্মোত্তরভোগী জনৈক দৈবজ্ঞ প্রতি বৎসর তালপাতায় লিখিত একখানি পঞ্জিকা দিয়া থাকেন। কোটালিপাড়া নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয় ঐরূপ একখানি প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে আমরা বাকলা এবং ফতিয়াবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে, আইন-ই-আকবরিই মুসলমান রাজত্বের প্রকৃত ইতিহাস। ইহার পূর্বে আমাদের দেশের কোন ভাল ইতিহাস ছিল কিনা জানা যায় না। জগদ্বিখ্যাত সম্রাট আকবরের রাজত্ব সময় তদীয় প্রধানামাত্য পণ্ডিতপ্রবর আবুল ফজল কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে রাজত্বের যাবতীয় বিষয়, এবং হিন্দুস্থানের প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি সমস্তই সংকলিত হইয়াছে। সম্রাট আকবর ১৫৪২ খ্রিঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সার্ধ শতাব্দী কাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করিয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহারই অনুজ্ঞাক্রমে আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে সরকার বাকলা ও ফতিয়াবাদের পরগনা বিভাগ এবং রাজস্ব বিশদরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতিয়াবাদ সম্বন্ধে আমরা তদন্তর্গত কতকগুলি মহালের নাম দেখিতে পাই; এই নামগুলির অধিকাংশই যাবনিক, দুই একটি ব্যতীত বুঝিবার সাধ্য নাই।

সরকার ফাতেয়াবাদ ৩১ মহালে বিভক্ত; ইহার রাজস্ব ৭,৯৬৯,৫৭৩ ডাম অর্থাৎ প্রায় ১৯৯,২৩৯ টাকা। মহালগুলির নাম এবং রাজস্ব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১।	জয় শিব আচার্য	...	...	৩৪,৩০৪	ডাম
২।	ফুলবানি	...	...	৩৮৪,৪৫২	”
৩।	বেলন	...	...	১২৪,৮৭২	”
৪।	ভাগলপুর	...	...	৬,১১৫	”
৫।	বদ্ধদিয়া	...	...	১,৪৪২	”
৬।	তৈলহাটি	...	...	৩৭৭,২৯০	”
৭।	চিরেন লক্কি	...	...	৩৫,৬৪৫	”
৮।	চর হাই	...	...	৩০,২০০	”
৯।	হাবেলি ফতিয়াবাদ	...	...	৯০২,৬৬২	”
১০।	হাবিল নিমক (লবণ মহাল)	...	...	২৭৭,৭৫৮	”
১১।	হজরতপুর	...	...	১১,৬৪০	”
১২।	হাট মহাল	...	...	১১,৪৬৭	”
১৩।	রসুলপুর	...	...	১০৩,৭৬৭	”
১৪।	সন্দ্বীপ	...	...	১,১৮২,৪৫০	”
১৫।	সির হরগরল	...	...	৭৮৮,৪৩০	”
১৬।	সিরসানি	...	...	১৭৩,৭৬৭	”
১৭।	সিরওয়া	...	...	৫৩,৮৮২	”
১৮।	সুধেওয়া	...	...	৩৭,১৬৭	”
১৯।	জালালপুর	...	...	১,৮৫৭,২৩০	”
২০।	সাহাবাজপুর	...	...	৭৩২,১৭২	”
২১।	খেরগপুর	...	...	১১৮,১৩৫	”
২২।	কুশ্‌দিয়া	...	...	১২,৪০৫	”
২৩।	কৌশা	...	...	৬৮,৩৫০	”
২৪।	মকরগঞ্জ	...	...	৩,১৫৭	”
২৫।	মুস্‌নেদ্‌গুড়	...	...	৫৫,৩১২	”
২৬।	মিরাণপুর	...	...	২২,১৭২	”
২৭।	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক	...	...	১২৩,৩৬৫	”
২৮।	লুকুট্‌লিসা	...	...	৪৯,৪২২	”
২৯।	ন্যামৎপুর	...	...	২০,৯৬০	”
৩০।	হেজারহাটি	...	...	২১,৫৯৭	”
৩১।	ইসবপুর	...	...	২৫৮,১২৫	”

এই সরকারের রাজকীয় ব্যবহারের জন্য আবশ্যকানুসারে ৯০০ অশ্বারোহী সৈন্য, এবং ৫০,৭০০ পদাতিক সৈন্য যোগাইতে হইত। এই মহালগুলির মধ্যে সন্দ্বীপ, সাহাবাজপুর, ন্যামৎপুর এবং রসুলপুরের পূর্ব নাম এখনও প্রচলিত আছে বলিয়া ইহাদের চেনা যাইতেছে। অনেকগুলি বর্তমান সময়ে ভিন্ন জেলাভুক্ত হওয়াতে তাহাদের নাম পরিবর্তিত হইয়াছে; সুতরাং জানিবার সাধ নাই।

আশ্চর্যের বিষয় আইন-ই-আকবরিতে জেলালাবাদের কোন উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি যে পাঠান রাজত্বসময়ে নিম্নবঙ্গ জেলালাবাদ ও ফতিয়াবাদ নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

১৫৫৬ খ্রিঃ অব্দে মহামতি আকবর সিংহাসনারোহণ করেন, এবং তাহার রাজত্বের প্রায় পঞ্চদশ বর্ষে টোডরমল্ল সমস্ত ভারতবর্ষের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। পাঠানগণ তাহাদের রাজত্ব সময়ে যে যে মহাল জেলালাবাদভুক্ত করেন, আমরা সরকার সোনারগাঁ মধ্যে তাহার অনেকগুলি মহাল দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে জেলালাবাদ নাম পরিবর্তিত হইয়া পূর্ব নাম সোনারগাঁ অথবা সুবর্ণগ্রাম রাখা হইয়াছিল। এই সরকারটি ৫২ মহালে বিভক্ত এবং রাজস্ব ১০,৩৩১,৩৩৩ ডাম, অর্থাৎ প্রায় ২৫৮,২৮৩ টাকা। এই সরকারকেও ১৫০০ অশ্বারোহী, ২০০ গজারোহী এবং ৪৬০০০ পদাতিক সৈন্য যোগাইতে হইত।

আবুল ফজল সরকার বাকলা সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গ অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।[২৫]

[সরকার বাকলা সমুদ্রের তীরে স্থিত এবং দুর্গটি চতুর্দিক বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। প্রতিপদ তিথিতে জলবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়া ১৪ দিন পর্যন্ত বর্ধিত হয়, তৎপর ক্রমান্বয় কমিতে থাকে।]

বর্তমান পটুয়াখালি মহকুমার অধীনে তেতুলিয়া নদীর তীরস্থিত কচুয়া নামক স্থানে পূর্বে বাকলার রাজধানী ছিল। এখন উহা ভগ্নাবশেষ মাত্র; কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ এবং জঙ্গলাকীর্ণ কয়েকটা পতনোন্মুখ ইষ্টক প্রাচীর অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্থানের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় যে ইহার অধিকাংশই নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বঙ্গোপসাগর অধিক দূরবর্তী নহে; নিশীথ সময় এখানে ইহার ভৈরব জলকল্লোল শুনা যায়। স্থানীয় অধিবাসীগণ বলেন যে, এক প্রহর কি তদূর্ধ্বকাল ভাটায় নৌকা বাহিলেই সমুদ্র পাওয়া যায়; এই স্থানের ধীবরগণের মধ্যে কেহ কেহ সাগরতীর পর্যন্তও মৎস্য ধরিবার জন্য গমন করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে এই স্থান সমুদ্রের তীরে ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে স্রোতজল ভূমির হ্রাসবৃদ্ধির কারণ, কিন্তু সমুদ্র হইতে স্বভাবত ভূমি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবুল ফজল যে সময়ের কথা লিখিয়াছেন, সেই হইতে প্রায় ৩১৮ বৎসর গত হইয়াছে; সুতরাং সমুদ্রের এত দূরে অপসারিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

আকবরের রাজত্বের উনত্রিংশদ্বর্ষে (অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) যে ভীষণ জলপ্লাবন হয়, তাহাতে রাজধানীস্থ বহুলোক এবং রাজধানীর বহু স্থান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেই জল প্লাবনের পর হইতে বরিশাল নগরের আট মাইল পশ্চিমে মাধবপাশা নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনও তথায় রাজবংশধরগণ বসতি করিতেছেন। মহাত্মা বেভারিজ তাঁহার অমরকীর্তি স্বরূপ বাকরগঞ্জের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"The Bacola has entirely disappeared, and it is only a conjecture, which identifies it Kachua, the ancient seat of the Chandradwip Rajes" [বাকলার একেবারে চিহ্ন নাই, তবে কচুয়া দেখিয়া অনুমান করা-যাইতে পারে যে এই স্থানে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী ছিল।] ১৮৭৪ খ্রিঃ অব্দে বেভারিজ সাহেব স্বয়ং কচুয়া দেখিয়া আসিয়াছিলেন।[২৬] সরকার বাকলা চারি মহালে বিভক্ত, ইহার রাজস্ব ৭১৩০৬৭৫ ডাম অর্থাৎ প্রায় ১,৭৮,২৬৬ টাকা। এই সরকারকেও ৩২০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ০০ পদাতিক সৈন্য যোগাইতে হইত।

সরকার বাকলা নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত ছিল

১।	বাকলা অথবা ইসমাইলপুর	...	...	৪,৩৪৭,৯৬০	ডাম
২।	শ্রীরামপুর	...	...	২৫২,০০০	"
৩।	সাহাজাদপুর	...	...	৯৭৭,২৪৫	"
৪।	ইদিলপুর	.	...	১,৫৫৩,৪৪০	"

এই গ্রন্থে আমরা ইসমাইলপুর বলিয়া বাকলার আর একটি নাম দেখিতে পাই, কিন্তু এই নামের আর কোথাও উল্লেখ আছে কিনা জানা যায় নাই। সম্ভবত বাদশাহি দপ্তরখানার জন্য এই নাম প্রস্তুত হইয়াছিল।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মুসলমান রাজত্ব সময় বাকলা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, যথা—ফতিয়াবাদ এব ইসমাইলপুর (বাকলা)। এই দুই বিভাগের সমীকরণ করিলে দেখা যায় যে, এই স্থল অতীব সমৃদ্ধিশালী ছিল; এবং ইহাদের সমষ্টিতে প্রায় ৩৭৭৫৫০৫ টাকা রাজস্ব, ১২২০ অশ্বারোহী এবং ৬৫৭০০ পদাতিক সৈন্য সম্রাটের আবশ্যকানুসারে যোগাইতে হইত।

বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের পূর্বে এদেশীয় রাজগণের স্থপতি-বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল কিনা তাহা লক্ষ করা যায় না। কেননা পাঠান রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্বে, হিন্দু রাজগণ প্রতিষ্ঠিত কোন অট্টালিকা অথবা উচ্চ দেবমন্দির দেখা যায় না। পটুয়াখালি মহকুমার অধীনে গুলিসাখালি থানার অন্তর্গত মস্‌জিদবাড়ি গ্রামে ইষ্টক নির্মিত একটি সুবৃহৎ মস্‌জিদ দৃষ্ট হয়। এই মস্‌জিদটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল; ভূতপূর্ব সুন্দরবন বিভাগের কমিশনার স্বর্গগত প্রত্নতত্ত্ববিৎ রেইলি সাহেব প্রথম উহা আবিষ্কার করেন। তিনি এই জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া মস্‌জিদটি সংস্কার করেন। ঐ মস্‌জিদটির সম্মুখভাগে একখানি প্রস্তর লিপি ছিল; গবর্নমেন্ট সেইখানি বহু যত্নে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাখিয়া দিয়াছেন। উৎকৃষ্ট পারস্য ভাষায় ঐ প্রস্তর লিপি লিখিত; তাহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

[ধর্মপ্রচারক (ঈশ্বরতুল্য) মহম্মদের জয় হউক। যে ব্যক্তি একটি ধর্মমন্দির প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, ঈশ্বর তাঁহার জন্য সত্তরটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিবেন। ধর্ম এবং রাজ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ সুলতান মহম্মদ শাহের পুত্র প্রবল প্রতাপান্বিত সুলতান আবুয়াল মোজাফর বারবাক শাহের রাজত্ব সময় তদীয় অনুজ্ঞাক্রমে হিজরা ৮৭০ (১৪৬৫ খ্রিঃ অঃ) মোয়াজ্জেম ওয়াজীল খান কর্তৃক নির্মিত হইল।]

ইতিহাসে আমরা সুলতান মহম্মদের পুত্র আবুয়ালের নাম দেখিতে পাই না। স্টুয়ার্ট সাহেব বলেন যে সুলতান বাববাক, নাসির শাহের পুত্র। তিনি ১৪২৬ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনারোহণ করেন এবং ১৪৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বারবাক শাহ সিংহাসনারোহণ করিয়া সপ্তদশবর্ষ অতীব সুখ্যাতি এবং সমৃদ্ধির সহিত রাজত্ব করিয়া ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, আইন-ই-আকবরিও এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। মুসলমান রাজন্যবর্গ যে স্বীয় নামের সঙ্গে, তাঁহাদের ধর্ম প্রচারকের নাম যোগ করিয়া, ধর্মপ্রাণ এবং ভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সম্ভবত বারবাক শাহের জনক নাসির শাহ, সুলতান মহম্মদ নাসির শাহ হইবেন, অথবা নাসির শাহের "মহম্মদ শাহ" বলিয়া অন্য আর একটি নাম থাকাও আশ্চর্য নহে।

এই মস্‌জিদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান ফকির বাস করেন, পর্বোপলক্ষে বহু মুসলমান এখানে আগমনপূর্বক ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এই মস্‌জিদ নির্মাতা মোয়াজ্জেম ওয়াজীল খাঁ কে, স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারাও তাহা অবগত হইতে পারি নাই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি বাদশাহের কর্মচারী ছিলেন, এবং তাঁহারই অনুজ্ঞায় রাজধানী হইতে আসিয়া এই মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

বাকরগঞ্জ থানার অধীন সিয়ালগুনী গ্রামে আর একটি ইষ্টক নির্মিত মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই মস্‌জিদটি স্থানে স্থানে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। প্রবাদ যে, নসবত গাজি নামক একজন ধনাঢ্য মুসলমান ঐ মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন স্মৃতিলিপি নাই; স্থানীয় অধিবাসীগণ বলেন যে, মস্‌জিদের দ্বারদেশে একখানি বৃহৎ প্রস্তরলিপি ছিল, ভূমিকম্পে পতিত হইয়া উহা শত সহস্রখণ্ডে চূর্ণীকৃত হইয়াছে।

নসরত শাহ নামক একজন পাঠান নৃপতি ১৫২১ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ে রাজত্ব করিতেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ হোসেন শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং সর্ব্বরূপে পিতৃগুণে বিভূষিত ছিলেন; ইনি বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অনেক রাজ্য জয় এবং প্রনষ্ঠ গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন। "গাজি" শব্দ জয় উপাধিবাচক. অনেক মুসলমান নৃপতি বিজয়সূচক গাজি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন; সম্ভবত নসরত শাহও এই গৌরব বিস্মৃত হন নাই। ইঁহার রাজত্ব সময় গৌড়ে একটি সুবর্ণ মস্‌জিদ ও বহু ধর্মভবন প্রস্তুত হইয়াছিল। সিয়ালগুণী গ্রামের মস্‌জিদও নসরত শাহ অথবা নসরত গাজি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই ভগ্নাবশেষ মস্‌জিদে নানা প্রকার কৃত্রিম ফুল, লতা প্রভৃতি অঙ্কিত; এখনও যাহা আছে, তাহাতে প্রাচীন স্থপতিবিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। সিয়ালগুণীর নিকট পিলখানা বলিয়া আর একটি গ্রাম আছে; স্থানীয় প্রবাদ যে এই স্থানে হস্তিশালা ছিল, সম্ভবত, সেই সময় হইতে এই গ্রামের নাম "পিলখানা" হইয়া থাকিবে।

ন্যামতি পুলিশ আউটপোষ্টর অধীনে বিবি চিনি গ্রামে ও গৌরনদী স্টেশনের অন্তর্গত রামসিদ্ধি গ্রামে দুইটি মস্‌জিদ আছে। প্রথমোক্ত মস্‌জিদটি ন্যামত খাঁর ভগ্নী "বিবি চিনি" কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, এবং তাহার নামানুসারে গ্রামের নাম পরিবর্তিত হইয়াছে। ন্যামত খাঁও ন্যামতপুরের স্থপয়িতা বলিয়া প্রবাদ। শেষোক্ত মস্‌জিদ স্বনামখ্যাত মহম্মদ ছবি খাঁ কর্তৃক নির্মিত, এই মহাপুরুষ যে কত সৎকার্য করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। অসংখ্য বর্ত্ম, দিঘি এবং বহুসংখ্যক মস্‌জিদ তাঁহার অক্ষয় কীর্তির চিরসাক্ষ্যস্বরূপ এখনও অনেক গ্রামে বর্তমান আছে। এই মস্‌জিদটি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত, এবং প্রথমোক্ত মস্‌জিদ অপেক্ষা দেখিতে মনোজ্ঞ। বহুসংখ্যক মুসলমান পর্বোপলক্ষে এই স্থানে সমবেত হইয়া থাকে। এই মস্‌জিদের স্তম্ভগুলিকে ভক্ত মুসলমানগণ আলিঙ্গন করিয়া থাকেন; তাঁহাদের বিশ্বাস যে ইহাতে তাহাদের কামনা সিদ্ধ হয়।

বর্তমান "ডালবাজারের" সংলগ্ন আর একটি মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার উপর একখানি স্মৃতিলিপি পারস্য ভাষায় কৃষ্ণ প্রস্তরোপরি খোদিত রহিয়াছে। ইহার নির্মাণ কৌশলও বড় বিচিত্র।

ঝালকাঠির অধীন এবং বর্তমান গুরুধামের নিকট সুতালড়ি নামক গ্রামে একটি অতি প্রাচীন মঠ বর্তমান আছে। ইহার উচ্চতা এখনও ১৫০ ফিটের উর্ধ্ব বলিয়া বোধ হয়, বিগত ১২৮৩ সালের মহা ঝড়ে উহার চূড়াটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে কোন স্মৃতিফলক দেখিলাম না। বর্তমান অবস্থা এবং নির্মাণ কৌশল দেখিলে বোধ হয় যে, ইহা প্রায় তিন চারি শত বৎসরের পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ যে ভাগ্যমন্ত রাজ নামক জনৈক সাহা জাতীয় ধনাঢ্য বণিক, তাহার মাতৃ সমাধিস্থলে ঐ মন্দির নির্মাণ করিয়া শিব প্রতিষ্ঠা করেন। সে আজ প্রায় চারিশত বৎসরের কথা; তখন এই বাকলা হিন্দু রাজার ন্যায়দণ্ডে পরিচালিত হইত। উক্ত বণিককৃত আরও কয়েকটি ভগ্ন অট্টালিকা, দিঘি ও ছোট ছোট কয়েকটি মঠ এবং একটি বৃহৎ নবরত্ন জঙ্গলাবৃত অবস্থায় আছে। এখনও উক্ত সাহার বংশধরগণ এই স্থানে অতি দীনভাবে বসতি করিতেছেন।

ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত রুন্‌সি গ্রামে "মঠবাড়ি" নামক স্থানে একটি অতি প্রাচীন মঠ আছে; ইহার মধ্যে ভগবান সদাশিবের লিঙ্গমূর্তি স্থাপিত ছিল।[২৭] ইহাতেও কোন স্মৃতিলিপি নাই; কিন্তু দেখিলে বোধ হয় যে ইহা অতি প্রাচীন কালের; মঠের উপরিভাগ ক্ষুদ্র বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং নিকটে শৈবালাদি পূর্ণ একটি প্রাচীন দিঘি অবস্থিত। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ। এখনও চৈত্র মাসে চড়ক পূজোপলক্ষে এখানে বহু লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই মঠ এবং শিবলিঙ্গ কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। স্থানীয় প্রাচীনদিগের মুখে শুনিতে পাই যে রায়ের কাঠীর রাজবংশোদ্ভব শত্রুজিৎ রায় কর্তৃক এই দেবমন্দির ও লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং স্থানীয় লোকের জলকষ্ট নিবারণার্থ উক্ত দীঘি খনন করা হইয়াছিল।[২৮]

উত্তর সাহাবাজপুরে গোবিন্দপুর গ্রামে একটি প্রস্তর নির্মিত অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্তি প্রাচীন কালাবধি বর্তমান আছে। স্বনামপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মহাত্মা চাঁদরায় এই বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বাটিতে ৮০ হস্ত উচ্চ, বহু কারুকার্যখচিত একটি সুন্দর মঠ আছে। এই মঠটি অতি প্রাচীন, স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তবু অদ্ভুত স্থপতি-বিদ্যা ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

গৌরনদী থানার অন্তর্গত মাহিলাড়া গ্রামে দক্ষিণ পার্শ্বে একটি প্রাচীন মঠ দৃষ্ট হয়। যখন এখানে সরকারবংশ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও পরাক্রান্ত ছিলেন, তখন এই বংশসম্ভূত রূপরাম সরকার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই অভ্রভেদী মঠ মাহিলাড়ার অতীত গৌরবের সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজমান।

গৌরনদী থানার নিকট "দেউলভিটা" নামক একটি স্থান আছে। প্রবাদ যে প্রাচীনকালে এই গ্রামস্থ জনৈক ব্রাহ্মণ তাহার মাতার মৃত্যুর পর একটি নাতিবৃহৎ দেউল নির্মাণ করিয়া মাতৃঋণ হইতে অব্যাহতিকল্পে তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ দেউলটি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। তদবধি ঐ স্থান "দেউলভিটা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানের নীচে অনেক পুরাতন ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে।

পোনাবালিয়া গ্রামের উপকণ্ঠস্থিত শ্যামরাইলের শিববাড়ি অতি প্রসিদ্ধ স্থান, এই স্থানও ঝালকাঠি স্টেশনের অন্তর্গত, এবং ভারতবর্ষের একটি তীর্থস্থান বলিয়া বিখ্যাত। পর্বোপলক্ষে এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। এই স্থানের শিবলিঙ্গ "ত্র্যম্বকেশ্বর শিব" বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরাকালে ইহারই পার্শ্ব বিধৌত করিয়া সরিদ্বারা সুগন্ধা[২৯] প্রবাহিতা ছিল। এই নদীর অপর তীরস্থিত শিকারপুর গ্রামে এই শিবের শক্তি উগ্রতারা (সুনন্দা) অধিষ্ঠিতা। ইহাও পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এই শিব এবং শক্তির আবির্ভাব সম্বন্ধে কোন কাল নির্ণয় করা অসাধ্য। প্রবাদ যে দেবীর নাসিকা এইস্থানে পতিত হইবার পর হইতে এই উভয়স্থানই পীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এই ত্র্যম্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে একটি জনরব আছে। যে স্থানে শিবলিঙ্গ এখন বর্তমান, অতি পূর্বকালে ঐ স্থানে নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। হিংস্র জন্তুগণ তন্মধ্যে নিরাপদে বাস করিত। ইহার অদূরবর্তী লোকালয়ে অনেক নীচজাতীয় লোকের বসতি ছিল। রাখালগণ দিবাভাগে গাভীর পাল লইয়া ঐ জঙ্গলের একটু দূরে চরাইত, কিন্তু অপরাহ্নে দোহনসময়ে দুগ্ধ পাওয়া যাইত না। এইরূপ অনেকদিন গত হইল; গো-স্বামীগণ ভাবিলেন যে রাখালগণই দুগ্ধপান করে, অথবা দোহন করিয়া অন্য কোথাও বিক্রয় করে; তজ্জন্য রাখালগণ যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত হইল। রাখালগণও বিনাকারণে এই প্রকার লাঞ্ছিত হইয়া প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একদিন তাহারা দেখিল যে কতিপয় পয়ঃস্বিনী গাভী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। রাখালগণও তৎপশ্চাৎ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে একটা বৃহৎ বিল্ববৃক্ষ মূলে গাভীগণ চারিদিকে ঘেরিয়া বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাহাদের স্তন (বান) হইতে অজস্র দুগ্ধধারা পতিত হইতেছে। রাখালগণ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিকটে আগমনপূর্বক দেখিল যে, কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃক্ষ পরিপূর্ণ একটি বল্মীকের উপর সেই ক্ষীরধারা পতিত হইতেছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বালস্বভাব রাখালগণ, ঐ বল্মীকের চতুষ্পার্শে শুষ্ক বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখা প্রভৃতি সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল। অচিরাত ধু ধু করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রাখাল বালকগণ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া এই রঙ্গ দেখিতেছিল; অকস্মাৎ সেই প্রজ্বলিত অনল হইতে একটি খর্বাকৃতা সর্বাঙ্গসুন্দরী কৃষ্ণবর্ণা নারীমূর্তি[৩০] নির্গতা হইয়া অতি বেগে নিকটবর্তী শৈবাল পরিপূর্ণ পুষ্করিণী মধ্যে ঝম্পপ্রদান পূর্বক অন্তর্হিতা হইলেন। রাখাল বালকগণ এই অস্বাভাবিক ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

নিশীথ সময়ে ভূস্বামী শ্রীরামরায়[৩১] স্বপ্ন দেখিলেন যে, শুভ্রকান্তি, দীর্ঘ জটাবিলম্বিত, ত্রিলোচন, নগেন্দ্রতুল্য দীর্ঘ অবয়ব, ত্রিশূলধারী জনৈক মহাপুরুষ আসিয়া বলিতেছেন যে তিনি শ্যামরাইলের জঙ্গলে বল্মীকের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; রাখালগণ ঐ জঙ্গলে অগ্নি প্রদান করায়, তাঁহার অঙ্গ স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে; তিনি (রায় মহাশয়) তাঁহাকে উদ্ধার করুন।

তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; বাকি নিশি জাগিয়া কাটাইলেন। প্রত্যুষে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সকলকে অবগত করাইয়া; বহু লোক সমভিব্যাহারে স্বপ্নকথিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাখাল বালকগণ প্রদত্ত অগ্নিতে বল্মীকের উপরিভাগ ও পার্শ্বস্থ জঙ্গল দগ্ধ হওয়ায় ভৃত্যগণ সেই বল্মীক খনন করিতে লাগিল, অকস্মাৎ খননাস্ত্রে কোন কঠিন পদার্থের স্পর্শ-শব্দ অনুভূত হইল। তখন সকলে অতি ধীরে ধীরে সেই মৃত্তিকা সরাইয়া দেখিল যে ভগবান দেবাদিদেবের এক লিঙ্গমূর্তি অবস্থিত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সেই লিঙ্গব্যাপী মৃত্তিকা অপসারিত হইলে মূর্তি বাহির হইল। তখন সকলে একত্রিত হইয়া সেই লিঙ্গ স্থানান্তরে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্থানান্তরিত করা দূরে থাক, সামান্যরূপ নাড়াইতেও পারিলেন না। রাত্রিতে পুনরায় স্বপ্নাদেশ হইল যে, এই লিঙ্গ পর্বতবৎ অচল, কোন প্রকারেই ইহা স্থানান্তরিত করিবার সম্ভব নাই। এই স্থানেই দেবালয় নির্মিত হইয়া পূজা হ'ক; কিন্তু শিবলিঙ্গের মস্তকোপরি যেন কোন আবরণ না থাকে।

আদেশানুসারে অতি অল্প সময় মধ্যেই তথায় একটি দেবালয় স্থাপিত হইল, কিন্তু শিবলিঙ্গের ঠিক মস্তকোপরি স্থানে আবরণ হইল না। সেই বৃহচ্ছিদ্র দ্বারা শিবের মস্তকোপরি সর্বদাই শিশির অথবা বৃষ্টিপাত হইত। উত্তরকালে শিবপ্রসাদ রায় মহাশয়ের কন্যা প্রাতঃস্মরণীয়া চাঁদমণি দেবী ত্র্যম্বকেশ্বরের নিমিত্ত একটি সুরম্য মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

পোনাবালিয়া চৌধুরীবংশের এখন আর পূর্ব সৌভাগ্য নাই। তাঁহাদের বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকাংশ বর্তমান সময়ে ঢাকার নবাব বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন। উক্ত নবাব বাহাদুর মুসলমান হইলেও চৌধুরী মহাশয়গণ প্রদত্ত এই দেবোত্তর ভূমি খাস করেন নাই; বরং পূর্ব মন্দির ভগ্ন হইলে তিনি আর একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়া হিন্দুগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শিকারপুর গ্রামের দেবীমূর্তি সম্বন্ধেও দেশ বিখ্যাত একটি জনপ্রবাদ আছে।[৩২] পঞ্চানন চক্রবর্তী নামক একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ একদা নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন যে, ভগবতী কালিকা দেবী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া সুগন্ধাগর্ভ হইতে তাঁহার পাষাণময়ী মূর্তি উদ্ধার করিয়া স্থাপন পূর্বক তাঁহার অর্চনা করিতে আদেশ করিতেছেন। রাত্রি প্রভাত হইলে স্বপ্নাদিষ্ট ভক্ত ব্রাহ্মণ সুগন্ধাগর্ভে অবতরণ পূর্বক প্রথম বার কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত বৃষভারূঢ় মহাদেব মূর্তি উঠাইলেন। ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে ব্রাহ্মণ স্বয়ং সেই মূর্তি বহন করিয়া স্থাপিত করিলেন, এবং যথাসাধ্য অর্চনা করিতে লাগিলেন। প্রবাদ যে, বাকলার তদানীন্তন রাজা[৩৩] এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তথায় আগমনপূর্বক মহা সমারোহে মহামায়ার পূজা করিলেন; এবং দেবীর সেবার জন্য "তারাবৃত্তি" নামে এক দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদান করিয়া একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দির নির্মাণ করাইলেন। পঞ্চাননের বংশধরগণ এখনও সেই বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন দুরবস্থাপন্ন, কেহ কেহ বংশহীন হইয়াছেন। রাজ প্রদত্ত মন্দিরটি এখন ভগ্নপ্রায়। দেবীমূর্তি কয়েক বৎসর অতীত হইল এক দুষ্ট যবন কর্তৃক চূর্ণীকৃত হইয়া সেই অবস্থায় মন্দির মধ্যেই রহিয়াছে। সেই হইতে ঘটের উপর দেবীর পূজা হয়। শিবমূর্তি অভগ্নাবস্থায় আছে, তাহারও নিত্যপূজা হইয়া থাকে।

এই তারাবাড়িও পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত; পর্বোপলক্ষে এস্থানে বহু সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হয়। স্থানটি দেখিতে যেমন মনোরম তদ্রূপ ভক্তিব্যঞ্জক।

যে সকল বিদেশি ভ্রমণকারী অস্মদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম রল্‌ফফিচ্ নানা জনৈক ইয়ুরোপীয় পরিব্রাজকের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বাক্‌লায় ভ্রমণ

করিতে আসেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বাকলা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

[বঙ্গদেশান্তর্গত চাটিগাঁও (চট্টগ্রাম) হইতে বাকলা আসিলাম; এই স্থানের রাজা হিন্দু এবং তাহার স্বভাব খুব ভাল।[৩৪] ইনি বন্দুক ব্যবহার করিতে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। ইহার রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ভূমি শস্যশালিনী; এই স্থানে বহু পরিমাণ রেশমনির্মিত ও সূত্রনির্মিত বস্ত্র এবং অনেক শস্যপরিপূর্ণ গোলা দেখিলাম। বাসগৃহগুলি দেখিতে সুন্দব, উচ্চ রাজপথ, বর্ত্মগুলি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অধিবাসীগণের কটিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত বস্ত্রাবৃত্ত, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনাবৃত। স্ত্রীলোকদিগের আকৃতি সুন্দর, তাহারা গলদেশে, নাকে, কানে, হাতে, পায়ে প্রায় সর্বাঙ্গে স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত; নানাপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে; আমি কয়েকজনের পরিধানে হস্তীদন্ত নির্মিত মূল্যবান অলঙ্কার দেখিলাম।]

এশিয়াটিক জরনেলে আরও কয়েকজন ভ্রমণকারী এবং খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তম্মধ্যে ১৫৯৮ এবং ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারক, ফ্রান্সিস্ ফারনেন্‌ডেজ্ (Francis Farnandaz) ডোমিনিক্ ডাসোসা, (Dominic dasosa) এবং এন্‌ড্রু, বাউস্ (Andrew Bows) প্রভৃতি বাকলায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহারা বাকলা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে তাহাদের আগমনে বাকলাধিবাসী খ্রিষ্টানগণ ধর্মোপদেশ গ্রহণের জন্য রাজাকে বলিয়া কতিপয় মাস তাহাদিগকে বহু যত্নে তথায় রাখিয়াছিল। রাজাও তাহাদের বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, এবং ধর্মপ্রচারার্থ অনুমতিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মেলকয়র ফন্‌সিক (Melchoir Fonseca) নামক জনৈক খ্রিষ্টধর্মযাজক বাকলায় আসিয়াছিলেন; তিনি রাজা এবং রাজসভা সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ নিম্নে লিখিত হইল।

* * *

[আমি তথায় (বাকলার রাজধানীতে) পৌঁছিলে, রাজা আমাকে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, আমার সমভিব্যাহারী পর্তুগিজগণও আমার সঙ্গে রাজদর্শন করিতে যাইতে পারিবে। আমি আমার সঙ্গীয় অনুচরবর্গসহ সভাগৃহে প্রবেশ করিলাম। সভাগৃহ দীর্ঘ এবং প্রশস্ত; নানা প্রকার স্বর্ণরৌপ্যাদি জড়িত বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত; সুদৃশ্য এবং মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা সমস্ত গৃহভিত্তি মণ্ডিত। ঠিক মধ্যস্থলে এক বিচিত্র উচ্চাসনে রাজা বসিয়াছিলেন; তাঁহার বয়স আট নয় বৎসরের বেশি বোধ হইল না।[৩৫] আমি প্রবেশ করিলে, সভাসদ, সর্দার এবং উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারিগণ দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে রাজার পার্শ্বে স্বতন্ত্রাসনে উপবেশন করাইলেন। নানাপ্রকার শিষ্টালাপের পর রাজা আমাকে কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিলাম যে আমি "চণ্ডীকানে"[৩৬] মহারাজের ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের রাজ্যে গমন করিব। ঈশ্বরের কৃপায় মহারাজের রাজধানী দিয়া যাইবার সময় আপনার সন্দর্শনলাভ করিতে আসিয়াছি। রাজা আমার আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে তিনি পূর্বেই তাঁহার রাজ্যস্থিত ফিরিঙ্গি (পর্তুগিজ) গণের প্রমুখাৎ আমার অনেক সদ্‌গুণের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছেন; এখন তাঁহার দ্বারা আমার কোন উপকার হইলে, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন। আমি তখন রাজার নিকট খ্রিষ্টানদের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ এবং তাঁহার রাজ্যমধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম; রাজা সন্তুষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ অনুমতিজ্ঞাপন পূর্বক আমাকে তৎসূচক অনুজ্ঞালিপি প্রদান করিলেন। রাজা বয়সে বালক হইলেও তাঁহার আলাপ, ব্যবহার প্রভৃতি শিষ্টতাপূর্ণ, বিজ্ঞ এবং প্রবীণ জনোচিত। আমি এই দেশে (ভারতবর্ষে) আসিয়াও এরূপ অভ্যর্থনা ও সদ্ব্যবহার আর কোথাও পাই নাই।]

আমরা যে সময়ের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিতেছি, সেই সময়ে সন্দ্বীপ বাকলা রাজত্বের অধীনে ছিল। ইহার সঙ্গে আমাদের বাকলার যেটুকু সম্বন্ধ আছে, তাহাই বর্ণনা করিতে হইবে।

পাঠান অভ্যুদয়ের পর হইতেই বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপতিগণের ক্ষমতা অল্পবিস্তর হ্রাস হইতে লাগিল; এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বিদেশি দস্যুগণ সময়ে সময়ে নিম্নবঙ্গে এবং সমুদ্রোপকূলস্থিত রাজ্যে লুণ্ঠনাদি করিত। এই দস্যুদিগের মধ্যে মগ এবং পর্তুগিজ দ্বারা এই দেশের যত ক্ষতি হইয়াছে, অন্যান্য জাতি কর্তৃক তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। এই দুই জাতি কখনও বা একত্র, কখনও বা বিভিন্নভাবে আক্রমণ করিয়া নগর ও গ্রাম প্রভৃতি উৎসাদিত করিত। রাজা তাহাদের সম্যকরূপে দমন করিতে পারিতেন না, কখন কখনও দস্যুগণ কর্তৃক রাজসৈন্য পরাজিত ও বিনষ্ট হইত। এই সময়ে মোগল রাজত্বের সূত্রপাত হইল। দেশমধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইল; এই সুযোগে মগ এবং পর্তুগিজগণও বাকলায় স্থানে স্থানে এরূপ নৃশংসভাবে লুঠ, হত্যা, প্রভৃতি নারকীয় কার্য করিতে লাগিল যে, তাহাতে হতাবশিষ্ট অধিবাসী অথবা তৎপার্শ্বস্থ গ্রামবাসীগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় হইতে বাকলার দক্ষিণ সীমাস্থিত সমুদ্রোপকূলে যতগুলি দেশ ছিল, তাহা একেবারে জনশূন্য হইয়া কালে সুন্দরবনে পরিণত হইল। আজ পর্যন্ত বর্তমান বাকরগঞ্জের দক্ষিণ সীমাস্থিত সুন্দরবনে অনেক ইষ্টক নির্মিত বাসভবন, বৃহৎ পুষ্করিণী, রাস্তা প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সন্দ্বীপ তৎকালে অতীব শস্যশালী এবং ধনজনপূর্ণ জনপদ ছিল। এই স্থানে যে লবণ প্রস্তুত হইত, সমগ্র বঙ্গদেশে সেই লবণ ব্যবহৃত হইত। উল্লিখিত অরাজকতা এবং দস্যুভীতির সময় শ্রীপুর নিবাসী দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক, চাঁদরায় ও কেদার রায়[৩৭] এই স্থান হস্তগত করেন; তাঁহারাও ইহা অনেকদিন ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে অথবা তৎপর বৎসর আরাকাননিবাসী মগ এবং পর্তুগিজ দস্যুগণের সঙ্গে সন্দ্বীপ উপলক্ষে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পাপিষ্ঠ আরাকানবাসীগণ ক্রীত দাসদাসীর জন্য সন্দ্বীপ এবং তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের প্রতি অত্যাচার করিত; এবং পর্তুগিজদের মধ্যে কয়েক জনকে এইরূপ কৃতদাসরূপে আরাকানে প্রেরণ করিয়াছিল, ইহাই বিবাদের কারণ। এই যুদ্ধে পর্তুগিজগণ পরাজিত হইয়া শ্রীপুর, চণ্ডীকান এবং বাকলায় বাস করিতে লাগিল। এই সকল পরাজিত পর্তুগিজগণের মধ্যে সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সিবাস্টিয়ান গঞ্জালের জীবনের সঙ্গে সন্দ্বীপের ইতিহাস জড়িত; তাই আবশ্যক বোধে তাহার জীবনী উল্লেখ করিতে হইল।

সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালের পর্তুগাল রাজ্যের রাজধানী লিসবন নগরের নিকট সেন্ট এন্টলিটোরজেল নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে। ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া বঙ্গদেশে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হয়। তারপর কিছুদিন পরে সৈনিক বৃত্তিত্যাগপূর্বক সন্দ্বীপে আসিয়া লবণের ব্যবসায় ব্রতী হইল। কিছু দিন পরে তাহার লবণের ব্যবসায় লাভ হওয়ায় সে নৌকাযোগে লবণ এবং অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্য ব্রহ্মদেশান্তর্গত আরাকান রাজ্যে চালান দিতে লাগিল। ব্যবসা দ্বারা ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যলিপ্সা তাহার হৃদয় অধিকার করিল।

এইসময়ে আরাকানরাজ সন্দ্বীপ আক্রমণ করিয়া তথাকার অনেক পর্তুগিজকে হতাহত করেন, এবং কতককে ক্রীতদাস করেন। সিবাষ্টিয়ান প্রভৃতি কয়েকজন পর্তুগিজ তখন বাকলায় আসিয়া রাজা রামচন্দ্রের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তথায় বাস করিতে থাকে। পরে রাজার সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি যদি সন্দ্বীপ জয়ের জন্য তাহার সাহায্য করেন, আর যদি কার্যোদ্ধার হয়, তবে সিবাষ্টিয়ান তাঁহাকে (রাজাকে) সন্দ্বীপের অর্ধেক আয় প্রদান করিবে। তদনুসারে রাজা তাহাকে কয়েকখানি সৈন্যপূর্ণ জাহাজ এবং বহুসংখ্যক অশ্বারোহী প্রদান করেন। সিবাষ্টিয়ান এইভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ১৬০৯ খ্রিঃ অব্দে সন্দ্বীপ জয় করেন। ক্রমে ক্রমে তাহার ক্ষমতা

এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে সমস্ত সন্দ্বীপের অধীশ্বর হইল। তাহার সৈন্য সংখ্যাও দেখিতে দেখিতে বর্ধিত হইল। সহস্রাধিক পর্তুগিজ সৈন্য, দ্বি সহস্র দেশি সৈন্য, দুইশত অশ্বারোহী এবং অশীতি রণতরী সর্বদাই তাহার আদেশার্থে প্রস্তুত থাকিত।

জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া গঞ্জালে নিকটবর্তী ভূম্যধিকারিগণের প্রতি বড় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সম্পত্তি নিজ রাজ্যান্তর্গত করিতে লাগিল।

নিকটবর্তী অন্যান্য রাজা এবং ভূম্যধিকারিগণ, অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া গঞ্জালের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার ঔদ্ধত্য এবং রাজ্যলিপ্সা হ্রাস পাইল না। যে বাকলারাজ দুর্দিনে এবং অসময়ে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সন্দ্বীপের অর্ধেক রাজকর দেওয়া দূরে থাক, বিশ্বাসঘাতক গঞ্জালে বাকলান্তর্গত সাহাবাজপুর জয় করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিল।

সাহাবাজপুর সন্দ্বীপ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; এই রাজ্য সিবিষ্টিয়ানের করায়ত্ত হইলে তাহার ধন এবং জনবল উভয়ই বর্ধিত হইল। এই সময়ে গৃহ বিবাদোপলক্ষে আরাকানরাজ তদীয় ভ্রাতাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলে, রাজভ্রাতা অনরগোরম সপরিবারে সন্দ্বীপে আগমনপূর্বক গঞ্জালের আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং গঞ্জালের বিশ্বাস স্থাপন জন্য তদীয় ভগ্নীকে তাহার নিকট বিবাহ দিলেন। বিশ্বাসঘাতক পাপাত্মা সিবাষ্টিয়ান কৌশলক্রমে অনরগোরমকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া তাঁহার বিধবা পত্নী এবং সকল ধন হস্তগত করতঃ নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা এন্টোনিটিবুর সহিত বিধবাকে বিবাহ দিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রাজরানী বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না।

এই প্রকার লোমহর্ষণ নারকীয় কার্যে সকলে এতদূর বিরক্ত হইল যে, অনেকে গোপনে রাজ্যত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া কথাটিও বলিতে পারিল না। কেহ কোন প্রকার অসন্তোষজনক ভাব প্রকাশ করিলে, সিবাষ্টিয়ান তৎক্ষণাৎ তাহাকে এরূপ নৃশংসভাবে কঠোর শাস্তি প্রদান করিত যে ভয়ে রাজ্যস্থ লোক সর্বদা কম্পান্বিত থাকিত।

ইহার অল্পদিন পরেই সিবাষ্টিয়ান পূর্ব শত্রুতা শোধের জন্য আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। এবারও ভাগ্যলক্ষ্মী পর্তুগিজরাজের অঙ্কশায়িনী হইলেন। সিবাষ্টিয়ান, আরাকান প্রদেশের প্রধান বাণিজ্যস্থান লুণ্ঠন করিবার পর সন্ধি সংস্থাপিত হইল।

এদিকে মোগল-সূর্য ভারতাকাশে উদিত হইয়া ধীরে ধীরে রশ্মিজাল বিস্তার করিতেছিলেন। সিবাষ্টিয়ান এবং আরাকানরাজ উভয়ই একযোগে মোগলদিগকে তাড়াইয়া দিবেন. সন্ধিপত্রে এরূপ একটি চুক্তিও থাকিল। প্রতিভূস্বরূপ সিবাষ্টিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র আরাকানরাজের নিকট রহিল।

ক্রমে আরাকানরাজের সহিত মোগলদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল; এই যুদ্ধে মোগলগণ পরাজিত হইলেন। সিবাষ্টিয়ান বিনা বাক্যব্যয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া পরাজিত মোগলসৈন্যদিগকে নির্বিঘ্নে পলায়ন করিতে দিল, এবং পুরস্কারস্বরূপ মোগল সেনাপতির নিকট প্রভূত অর্থপ্রাপ্ত হইল। পশ্চাদ্ধাবিত মগ সৈন্যগণ এবং তাহাদের যুদ্ধজাহাজ সমূহ তাহার নিকটবর্তী হইলে. গঞ্জালে হঠাৎ তাহাদের আক্রমণ করতঃ প্রায় সকলকেই নিহত করিয়া জাহাজগুলি হস্তগত করিল।

এই মিত্রদ্রোহিতা এবং কৃতঘ্নতায় তাহার পক্ষের অনেক লোক নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার আচরণ, আরাকানরাজের কর্ণগোচর হইলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া সিবাষ্টিয়ানের প্রতিভূস্বরূপ রক্ষিত ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিধনপূর্বক, তাহার শবদেহ সমুদ্রতীরে একটা উচ্চ লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমনকালে দুরাত্মা সিবাষ্টিয়ান তাঁহার সুকীর্তি প্রত্যক্ষ করিল, মনে কোনরূপ অনুতাপ হইল কিনা ভগবান জানেন।

আরাকানপতি প্রতিহিংসা লইবার জন্য তুমুল আয়োজন করিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য, যুদ্ধ জাহাজ, কামান প্রভৃতি লইয়া তিনি সন্দ্বীপ আক্রমণ করেন, সিবাষ্টিয়ানের পক্ষের অনেক লোক তাহার ঘৃণিত আচরণে পূর্বেই পক্ষত্যাগ করিয়াছিল। তথাপিও দীর্ঘকালব্যাপী তুমুল সংগ্রামের পর আরাকানরাজ, সিবাষ্টিয়ানের মুণ্ডচ্ছেদন পূর্বক স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন। পর্তুগীজদিগের সন্দ্বীপে কোন চিহ্ন রাখিলেন না, কতকগুলি কৃতদাসরূপে আরাকানে নীত হইল, কতকগুলি পলায়ন করিল, অবশিষ্টগুলি, তরবারি অথবা বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাইল। এইরূপে সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালের রাজত্ব ধ্বংস হইল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দ্বীপ হইতে পর্তুগীজের নাম লোপ হইল।

জয়োল্লাসোন্মত্ত আরাকানপতি তৎপর বাকলা আক্রমণ করিয়া অনেক স্থান বিধ্বস্ত করিলেন। তৎকালে রাজা রাজধানীতে ছিলেন না, রাজ্যস্থিত অন্যান্য লোক তখন অসমসাহসে মগদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল।

পলায়িত পর্তুগিজদিগের মধ্যে অনেকে শ্রীপুর, চট্টগ্রাম, ভুলুয়া, বাকলা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল। তাহাদের বংশধরগণ মধ্যে অনেকে, এই জিলার অন্তর্গত বাকরগঞ্জ থানার অধীনে পাদ্রী-শিবপুর এবং নলকিটী থানার অধীনে রাজাবাড়য়া প্রভৃতি স্থানে বসতি করিতেছে। পাদ্রী-শিবপুরের পর্তুগীজদের মধ্যে অনেকেই সমৃদ্ধশালী; তন্মধ্যে ডি, সিলভা পরিবারগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পর্তুগীজদের ন্যায় মগ জাতিও অস্মদ্দেশে যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও অনেক স্থানে বর্তমান আছে। তাহাদের উপর তখন অস্মদ্দেশীয় লোকের এরূপ একটা ঘৃণা এবং ভয় ছিল যে, প্রাণান্তেও কেহ তাহাদের নিকটে যাইত না। দৈবাত কোথাও দেখা হইলে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন কবিত। কোন মগ, কোন হিন্দুর বাড়ির উপর দিয়া চলিয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাহার জাতি নষ্ট হইত। এরূপ অনেক "মগে-ব্রাহ্মণ" "মগে-শূদ্র" "মগে-নাপিত" ইত্যাদি সাহাবাজপুর প্রভৃভি স্থানে বর্তমান আছে। সমাজে এখনও কেহ তাহাদের জল স্পর্শ করে না। স্বজাতির মধ্যে তাহাদের সমাজ পর্যন্ত বন্ধ।

দেশবিখ্যাত পণ্ডিত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় "সন্দ্বীপ" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি সন্দ্বীপকে প্রাচীন সোমদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিযাছেন। আমরা মহাভারতে একটি সোমদ্বীপের কথা দেখিতে পাই। মহাবীর পক্ষীন্দ্র গরুড়, স্বীয় বিমাতৃতনয় নাগদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে সকল দ্বীপ, উপদ্বীপে পক্ষীরাজ গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রমণীয়ক, এবং সোমদ্বীপের নাম উল্লেখ আছে।[৩৮] উল্লিখিত পণ্ডিতপ্রবর, বর্তমান আরাকানকে পুবাকালের বমণীয়ক, এবং সন্দ্বীপকে সোমদ্বীপ স্থির করিয়াছেন।[৩৯] মিঃ বেভারিজ্ও সন্দ্বীপকে সোমদ্বীপ অথবা সোমের দ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৪০]

সাহাবাজ খাঁ নামে জনৈক মুসলমান সেনাপতি[৪১] এদেশে আগমন করিয়া মগ এবং পর্তুগীজ দস্যুদের উৎপাত অনেকটা দমন করেন। তাঁহারই নামানুসারে সাহাবাজপুর নাম হইয়াছে। তিনি এই স্থানে গড়-বন্দি করিয়া বহু সৈন্যসহ অনেকদিন পর্যন্ত ছিলেন। অদ্যাপি সাহাবাজপুরের স্থানে স্থানে সেই চিহ্ন দেখা যায়। দস্যুদমন হইলে, সাহাবাজপুর খাঁ স্থানীয় রাজা ও অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণের প্রতি শান্তিস্থাপনেব ভার দিয়া রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

সেই সময় হইতে কয়েক বৎসর বাকলার রাজা এবং শ্রীপুরের রাজা, উভয়ই মগ দস্যুগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। মোগলকুল-গৌবব-রবি সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষ সময়ে, শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভৌমিকগণ বিদ্রোহী হ'ন। তাঁহাদের দমনার্থ সম্রাট জাহাঙ্গীর, অম্বরাধিপ মহারাজ মানসিংহকে বহু সৈন্যসহ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন; ফলে ভৌমিকগণ সমূলে নির্মূল হইলেন। তখন বাকলারাজ রাজা রামচন্দ্র বড় বিপন্ন ছিলেন; আমরা সে কথা পবে বলিব।

এই সময়ে সুযোগ পাইয়া মগগণ অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিল; দলে দলে বিভক্ত হইয়া, স্থানে স্থানে গৃহদাহ ও গৃহস্থের সর্বস্ব লুণ্ঠন প্রভৃতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল। এমন কি তাহারা বর্তমান খুলনা জেলায়ও যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছে, কোন কোন স্থানে তাহার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কখন বা নৌকারোহণে, কখন বা দলবদ্ধ হইয়া পদব্রজে গ্রামের মধ্যে অত্যাচার করিত। বর্তমান চন্দ্রদ্বীপ পরগনায়ই এই অত্যাচার অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল; এমন কি বর্তমান ঝালকাঠি থানার নিকটবর্তী প্রভৃতি স্থানেও অদ্যাপি তাহাদের পূর্ব অত্যাচারের চিহ্ন সকল পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, যে বারভূঁইয়ার মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য এবং চাঁদ রাজ ও কেদার রায়ের ধ্বংস হইতেই বাকলার রাজার ক্ষমতা এবং রাজ্য অনেক পরিমাণে হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার মগ দস্যুদের অত্যাচার নিবারণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। এই জন্য বাদশাহের সাহায্য লইতে হইত। সম্রাট জাহাঙ্গীর তখন ভারত-সিংহাসনে সমাসীন। সময় সময় সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বঙ্গদেশীয় রাজ প্রতিনিধি কদাচিৎ এই দস্যু দমন করিতেন; কিন্তু সৈন্য সামন্ত প্রত্যাগত হইলে, দৌরাত্ম্য পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইত। এই কারণে বাকলার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত অনেক গ্রাম একেবারে উৎসন্ন হইয়া বর্তমানে নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দেহাবসানের পর তদীয় পুত্র শাহজাহান ভারত সিংহাসনারোহণ করেন। তাহার মধ্যম পুত্র সুলতান সুজা ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া রাজমহলে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

মগ দস্যুগণ, তখন বর্তমান নলছিটি এবং তন্নিকটবর্তী অনেক স্থান অধিকারপূর্বক দলবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করিতেছিল। বর্তমান বাকরগঞ্জের পশ্চিম, খুলনা জিলান্তর্গত বাগেরহাট, পূর্বে সাহাবাজপুর, দক্ষিণে গলাচিপা এবং উত্তরে গৌরনদী পর্যন্ত তাহাদের অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি অবাধে সম্পন্ন হইত। অধিবাসীগণ, তাহাদের আগমনবার্তা শুনিলে, দ্রব্যাদি পরিত্যাগপূর্বক স্ত্রীপুত্রপরিবারাদি লইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশপূর্বক আত্মরক্ষা করিত।

বর্তমান নলছিটি নদীর উভয় তীরে তখন মগগণ রীতিমত গৃহাদি নির্মাণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তখন এই স্থান নদীর চর ছিল, তাহাদের উপনিবেশ স্থান বলিয়া "মগের গড়" নাম হইয়াছিল। এখন এই স্থান "মগর" নামে অভিহিত, এখানে অনেক সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ সন্তান বাস করিতেছেন। মগদিগের এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার রাজ প্রতিনিধির কর্ণগোচর হইলে, সুলতান সুজা মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং মগোপনিবেশের সন্নিকটেই গড়বন্দী করিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। নলছিটি নদীর উত্তরকূলে উক্ত গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। যদিও তাহার অধিকাংশ নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে, কোন ইষ্টকালয়ের চিহ্নও বর্তমান নাই, তথাপি মৃত্তিকানির্মিত উচ্চ প্রাচীর, দুইটি সুবৃহৎ জলাশয়, এখনও তাহার কীর্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুজা কর্তৃক শিবির সংস্থাপন হেতু তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম "সুজাবাদ" হইয়াছে।

মগদিগের সঙ্গে সুলতান সৈন্যের দুই দিবসব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, মগগণ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অনেকে হতাহত হইল, কতকগুলি পলায়ন করিল, কতকগুলি বন্দি হইল। এই যুদ্ধে মগগণ এরূপভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছিল যে, তাহারা একেবারে হীনতেজ হইয়া অনেকে এ দেশ হইতে পলায়ন করিল। সুলতান সুজা, তাঁহার নিস্থ যে সমস্ত সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের পরিবারগণকে মগাধিকৃত ভূমি জায়গিরস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। বরিশালের কালেক্টরীতে, বিগত ১৮৪৫ সালে উল্লিখিত ম র্ম এক দরখাস্ত প্রদত্ত হইয়াছিল।

আসমান সিংহ নামক জনৈক লোক, ঐ স্থানে বাস করিত; সুলতান প্রদত্ত ঐ জায়গির তাহারই ভোগ দখলে ছিল; তাঁহার মৃত্যুর পর এখন অন্যের সম্পত্তিভুক্ত হইয়াছে।

. এই আসমান সিংহের মৃত্যু সম্বন্ধে ঐ দেশে একটি গল্প আছে। আসমানের স্ত্রী কুলটা ছিল; একটা মুসলমান তাহার উপপতি, আসমান তাহা জানিতে পারিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাহার শয়নকক্ষের রুদ্ধদ্বারে উপস্থিত হইল। মুসলমান, আসমানের উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে ঐরূপ রুদ্র মূর্তি অবলোকন করিয়া পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। দ্বার উদঘাটনে বিলম্ব দেখিয়া আসমান সিংহ পদাঘাতে দ্বার ভগ্ন করতঃ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার স্ত্রীর ক্রোড়ে ছোট একটি শিশু সন্তান ছিল, ক্রোধান্ধ আসমান সিংহ, স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া তরবারির আঘাত করিল; কিন্তু দৈবাৎ সেই আঘাত পাপীয়সী রমণীর উপর না পড়িয়া নিরপরাধী শিশুর শরীর দ্বিখণ্ড করিল। কুলকলঙ্কিনী মৃত সন্তান ফেলিয়া পলায়নপূর্বক ঘৃণিত জীবন রক্ষা করিল।

হত্যাপরাধে আসমান সিংহের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইলে, তদীয় ভ্রাতা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া কলিকাতায় আপিল করিল। ফলে, বিচারক তাহাকে মুক্তি দিলেন। এই সংবাদ লইয়া তদীয় ভ্রাতা অতি দ্রুতগামী অশ্বারোহণে রওনা হইল। সে যে সময় আসিয়া পৌঁছিল, তাহার কিয়ৎকাল পূর্বে আসমান সিংহের ফাঁসি হইয়াছে। তাহার প্রাণহীন দেহ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতেছে।

এই শোচনীয় ঘটনা সম্বন্ধে অতি সুন্দর কয়েকটি কবিতা আছে। আসমান সিংহের বাড়ির চিহ্ন এখন আর নাই, সমস্তই নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

ঝালকাঠির নিকটবর্তী রূপসিয়া এবং রাজাপুর আউট পোষ্টের অন্তর্গত আরও দুইটি মৃত্তিকানির্মিত গড়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ইহাও মগ দস্যুদের দমনার্থ সৈন্য সমাবেশ করিতে নির্মিত হইয়া থাকিবে। এই উভয় গড়েরই অধিকাংশ নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও যাহা আছে, তাহাতে উহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রেনেল সাহেব কৃত বাকরগঞ্জের প্রাচীন মানচিত্রে গলাচিপার নিকট মৃত্তিকানির্মিত দুর্গের চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু সেই স্থানও নদীগর্ভে বিলীন হওয়াতে এখন উক্ত দুর্গের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। এই দুর্গ কাহার দ্বারা কোন সময় নির্মিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মগ অথবা পর্তুগিজ দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য যে এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল এরূপই সম্ভব।

বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ, ব্যতীত অন্য কোন নৃপতির রাজ্যে অথবা রাজধানীতে কোন দুর্গ নির্মাণের কথা শুনা যায় না। বাকলার রাজধানী কচুয়া হইতে মাধবপাশা স্থানান্তরিত হইলে তথায়ও কোন দুর্গ অথবা পরিখা দেখা যায় নাই। কেবল রাজধানীর দক্ষিণপশ্চিমপ্রান্ত-বেষ্টিত "রাজার বেড়" নামক একটি ক্ষুদ্র নদী দৃষ্ট হয়। বঙ্গীয় ভূপতিদিগের মধ্যে বাকলাধিপতি রাজ্যরক্ষা সম্বন্ধে কতকটা অসাবধান ছিলেন; তাই বিদেশি মগ এবং পর্তুগিজ দস্যুগণ অন্যান্য রাজ্যাপেক্ষা তাঁহার রাজত্ব মধ্যে অধিকতর অত্যাচার করিয়াছে।

যবন নরপতিগণের অভ্যুদয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে দস্যুৎপীড়ন, এবং সর্বাপেক্ষা রাজ্যরক্ষার শিথিলতাই বাকলা রাজ্য ধ্বংসের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার রাজত্বমধ্যে অসংখ্য পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কোন অস্ত্রশস্ত্রবিৎ যোদ্ধৃপুরুষ অথবা কোন উপযুক্ত সেনাপতি যুদ্ধস্থলে সৈন্য পরিচালনা করিয়া বিপক্ষদমন করিয়াছিলেন বলিয়া কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বতন্ত্র ইতিহাসে অনেকেরই উপযুক্ত সৈন্য এবং সেনাপতির পরিচয় পাওয়া যায়, কেবল দুর্ভাগা বাকলার বিষয়ে ইতিহাস সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। রণচণ্ডীর উলঙ্গ কৃপাণ করে তাণ্ডব নৃত্য অপেক্ষা, বোধ হয় বীণাপাণির বীণাঝঙ্কার বাকলাধিপতির অধিক মনোজ্ঞ ছিল; এবং এইজন্যই অত্যল্পকাল মধ্যে বাকলার অধঃপতন হইয়াছিল। প্রাচীন দ্বাদশ ভৌমিকগণের মধ্যে চারি পাঁচ জন ব্যতীত আর সকলের অস্তিত্ব এখনও বর্তমান রহিয়াছে; অভাগিনী বাকলা দীনা কাঙ্গালিনীর মত অনেক দিন হইল কালের বিশ্বব্যাপী চিত্রপটে মিলিত হইয়াছে।

১৭২৪ হইতে ১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রোক সাহেব বাকরগঞ্জের যে ম্যাপ প্রস্তুত করেন তাহাতে সমুদ্রের উপকূল প্রান্তে বাকলা দ্বীপ বলিয়া উল্লেখ আছে। মিঃ বেভারিজ্ সাহেব এই স্থানকে মাধবপাশার রাজগণের প্রাচীন রাজধানী কচুয়া বলিয়া নির্দেশ করেন। এই মানচিত্রাঙ্কিত বাকলার চিহ্ন এখন বর্ত্তমান নাই, কেবল কচুয়াস্থিত ভূতপূর্ব রাজধানীর কতক চিহ্ন দেখা যায় মাত্র।

বাস্তবিক বাকলার স্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ গোল দেখা যায়; কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই বাকলার রাজধানীর স্থিতি স্থিরনিশ্চয় করিতে পারেন নাই। আইন-ই-আকবরিতে আবুল ফজল লিখিয়াছেন "সরকার বাকলা সমুদ্রকূলে অবস্থিত" কিন্তু ইহা আরাকান রাজ্যে না বঙ্গ রাজ্যে, তাহা কিছুই স্থির করেন নাই। আবার পর্তুগিজ ভ্রমণকারী জেরিক সাহেব বলেন, "আরাকান এবং সন্দ্বীপ রাজ্যের মধ্যে বাকলা রাজ্য অবস্থিত"; ইহাতেও কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। তবে যত দূর স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, যে বাকলার তদানীন্তন রাজধানী সমুদ্রতীরবর্তী কচুয়া নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। বর্তমান সময় হইতে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে সমুদ্র যে কচুয়াব প্রান্তে অবস্থিত ছিল তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহ। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন, তাঁহার প্রণীত প্রথিতনামা "সৈয়র-অল-মুতক্ষরীন" গ্রন্থে বাকলা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে বাকলা সম্বন্ধে যতটুকু উল্লেখ আছে, মুতক্ষরীনেও প্রায় ততটা আছে। কিন্তু বাকলা নামস্থলে গোলাম হোসেন "হোগলা" লিখিয়াছেন।[৪২] বাকলা, কি প্রকারে "হোগলা" হইল বুঝিতে পারিলাম না; উক্ত গ্রন্থকার, নিম্ন বঙ্গের প্রায় সমস্ত অংশটাকেই "সরকার হোগলা" বলিয়া গিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, গোলাম হোসেন "ব" স্থানে ভুল বশত "হ" ব্যবহার করিয়া থাকিবেন; অথবা তৎকালে নিম্নবঙ্গে প্রভূত পরিমাণে হোগলা জন্মিত, হযত সেই কারণবশতই মুতক্ষরীন প্রণেতা, ঐরূপ নাম পরিবর্তন করিয়া থাকিবেন। বিশেষত আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ প্রায় সার্ধ দ্বিশত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে, এবং মুতক্ষরীন তাহারই অবিকল অনুবাদ; সুতরাং ব্লকম্যান সাহেব আইন-ই-আকবরিতেই অধিকতর বিশ্বাস করিয়াছেন।[৪৩]

মুতক্ষরীন গ্রন্থে বাকলা সম্বন্ধে বেশি কিছু উল্লেখ না থাকার একটি কারণ অনুমিত হইতেছে। যে সময়ে উক্ত গ্রন্থ শেষ-হইয়াছিল, তখন বাকলার অস্তিত্ব লোপ হইয়া "চন্দ্রদ্বীপ" নামকরণ হইয়াছে। ইহার অনেক পূর্বেই কচুয়া হইতে রাজধানী, বর্তমান মাধবপাশা গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বিশেষত মুতক্ষরীনে রাষ্ট্রবিপ্লব সময়েরই অধিকতর ঘটনা লিপিবদ্ধ; তাই বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া মোগলকুলপাংশুল ঔরঙ্গজেব ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ, দিল্লির সিংহাসন লইয়া যখন পরস্পরের হৃদয়শোণিত পানে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময় সুযোগ পাইয়া বিতাড়িত মগ এবং পর্তুগিজ দস্যুগণ পুনরায় দলবদ্ধ হইল এবং সাহাবাজপুর ও মেঘনা নদীর তীরবর্তী অন্যান্য স্থানে অমানুবিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। কি উপায়ে ঔরঙ্গজেব অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন;—দ্বারা, সুজা, মোরাদ প্রভৃতির কি দশা হইয়াছিল—ইতিহাসজ্ঞ পাঠক তাহা অবগত আছেন।[৪৪]

সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঔবঙ্গজেব ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; তাঁহার ন্যায় কর্মঠ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং রাজকার্যে পারদর্শী সম্রাট আকবরের পর আর কেহ সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। এই সমস্ত রাজোচিত গুণ থাকিলে কি হয়: তাঁহার ন্যায় মিত্রদ্রোহী, সর্বজনে অবিশ্বাসী, কুটিল, স্বার্থপর নরপতি মার্ক এন্টনির (Mark Antony) পর আর কেহ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ঔরঙ্গজেবের এই সমস্ত দোষ না থাকিলে, তাঁহার ন্যায় ভূপতি কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব তখন উক্ত দস্যুদমনার্থ বৈদ্যবীর সংগ্রাম সাহকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে পূর্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। তিনি সাহাবাজপুরে উপস্থিত হইয়া নূতন গড়বন্দি করিলেন, এবং পুরাতন গড় সংস্কার পূর্বক দস্যুদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন পর্যন্ত "সংগ্রামের-কেল্লা" বলিয়া তাঁহার নির্মিত দুর্গ সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। বর্তমানে এই প্রাচীন হিন্দুকীর্তি মেঘনার বিশাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দৈনন্দিন স্মৃতিলিপিতে সংগ্রামের এই গড়ের বিষয় উল্লেখ আছে। ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল।

মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত এবং ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত রূপসিয়ার নিকট দুইটি দুর্গের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রফেসর ব্লকম্যান সাহেব এই দুইটিকেও সংগ্রাম সাহ কর্তৃক প্রস্তুত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[৪৫] এই প্রবন্ধে প্রফেসর সাহেব, বাকলা সম্বন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি বাকলাকে একটি দ্বীপ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উল্লিখিত দুর্গ ব্যতীত সংগ্রাম সাহ কর্তৃক নির্মিত যে সমস্ত প্রাচীন কীর্তি এদেশে এখনও বিরাজিত আছে, তন্মধ্যে সংগ্রাম সাহের স্বনাম প্রতিষ্ঠিত, ঝালকাঠি থানান্তর্গত একটি গ্রাম, এবং তৎসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র খাল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।[৪৬] এই উভয় স্থান, "সংগ্রামনীল" এবং "সংগ্রামনীলের খাল" বলিয়া সর্বসাধারণে পরিচিত, বর্তমানে এই গ্রাম এবং খাল আমাদের স্বত্বাধীনে রহিয়াছে।

বরিশাল যাইবার পথে গৌরীপাশা এবং কুমারখালি হাটের মধ্যে আরও একটি মৃত্তিকা নির্মিত দুর্গের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। আমি যে কয়েকটি মৃদ্দুর্গ দেখিয়াছি, এক সুজাবাদ ব্যতীত, এইটিকেই বৃহত্তর বলিয়া বোধ হইল। ইহার অনেকাংশ এখন নদীগর্ভে বিলীন, তবুও যাহা আছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে এই দুর্গ নিতান্ত সাধারণ ছিল না। একটি জলাশয়ের চিহ্ন এবং উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ গত পূর্ব বৎসর দেখিয়াছিলাম।

এই দুর্গ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন সময়ে নির্মিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থানীয় প্রবাদ যে, ঐ স্থানে একজন প্রতাপশালী হিন্দু ভূস্বামী বাস করিতেন। এই মৃত্তিকা নির্মিত দুর্গ তাঁহারই বসতিস্থান। দুরাচার মগ দস্যুগণ, তাঁহার বাড়ি আক্রমণ করিলে, তিনি যুদ্ধে পতিত হন; তাঁহার পরিবারস্থ রমণীগণ মগদের হস্ত হইতে সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য পুষ্করিণীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। স্থানীয় একজন প্রাচীন গৃহস্থ, আমাকে এই গল্প বলিয়া, সেই পুষ্করিণী দেখাইয়া দিলেন। পুষ্করিণীর চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু তাহার চতুষ্পার্শে এত জঙ্গল এবং কাঁটাবন যে, তথায় যাইতে সাহসী হইলাম না।

মির জুম্লা, শায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি মোগল সুবেদারগণের সময়ে বাকলা সম্বন্ধে কোন ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, তদানীন্তন রাজা অত্যন্ত হীনপ্রভ হইয়াছিলেন, রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না; কেন না, রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন গুরুতর কার্য উপস্থিত হইলেই সুবেদার কর্তৃক মীমাংসিত হইত। তখন মোগল সুবেদারের মন যোগাইয়া রাজত্ব রক্ষা করিতে হইত। একবার ষড়যন্ত্রে পড়িয়া নবাবের কোপানলে চন্দ্রদ্বীপের রাজা উদয়নারায়ণ রাজত্ব হারাইয়াছিলেন; আমরা এই সম্বন্ধে পরে বলিব।

নবাব আলিবর্দি খাঁ যখন বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তখন আগা বাখর নামক জনৈক মুসলমান রাজপুরুষ, সেলিমাবাদ পরগনার সাড়ে এগার আনি এবং বোজরগউমেদপুরের সম্পূর্ণ অধিকার করেন। এই আগা বাখরে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, কেন না তাঁহারই নামানুসারে সমস্ত জেলার নাম হইয়াছে।[৪৭]

এখন এই আগা বাখর কে, তাহা একবার জানিতে চেষ্টা করা যাক্। টাইলর সাহেব বলেন যে, আগা বাখর বাকরগঞ্জের জনৈক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী; উক্ত সাহেব প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ ঢাকার ইতিহাসে (Topography of Dacca) এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

[নবাব আলিবর্দি খাঁর জামাতা নিবাইস মহম্মদ খাঁ, সরফরাজ খাঁর স্থলে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত

ছিলেন। প্রসিদ্ধ হোসেনকুলি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হোসেনউদ্দিন খাঁ নামক জনৈক রাজপুরুষকে তিনি ঢাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি খাঁ সিরাজদৌলাকে ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন, তখন মসনদ লইয়া সিরাজদৌলা ও সমৎজঙ্গ (সকৎজঙ্গ) প্রভৃতির সঙ্গে বিষম মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। ফলে সমৎজঙ্গের পক্ষীয় হোসেনকুলি খাঁ ও তৎভ্রাতুষ্পুত্র হোসেনউদ্দিন, সিরাজ কর্তৃক নিহত হইলেন। হোসেনউদ্দিনকে হত্যা করিবার জন্য সিরাজ, আগা সাদক নামে জনৈক মুসলমানকে নিযুক্ত করিলেন; এই আগা সাদক আগা বাখরের পুত্র। আগা বাখর খাঁ তখন বোজরগ উমেদপুরে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সর্বদাই ঢাকার শাসনকর্তা হোসেনউদ্দিনের নিকট বাস করিতেন। আগা সাদক ঢাকায় পৌঁছিয়া ভাবী নবাব সিরাজদৌল্লার আদেশ, এবং তৎকর্তৃক ঢাকার শাসনকর্তৃত্বপদ লাভ প্রভৃতি প্রলোভনসূচক বাক্য পিতার নিকট বলিলেন। পিতাপুত্র উভয়েই এই লোমহর্ষক পরামর্শ স্থির করিয়া নিশীথ সময়ে কয়েকজন সৈনিকসহ নিদ্রিত হোসেনউদ্দিনের অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। প্রভাতে এই পৈশাচিক কার্য সাধারণে ব্যক্ত হইলে, অধিবাসীগণ যারপরনাই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তখন আগা বাখর এবং আগা সাদক, সিরাজদৌলার আদেশে এই কার্য করিয়াছেন, এবং হোসেনউদ্দিনের পরিবর্তে আগা বাখরই শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন, এরূপ বলিলেন। অধিবাসীগণ গতপ্রাণ হোসেনউদ্দিনকে নিরতিশয় শ্রদ্ধা করিত; কেন না, তিনি ন্যায়, ধর্ম এবং দয়ার সহিত শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন। তাহারা তখন আগা বাখরের নিকট বৃদ্ধ নবাব অথবা প্রধানমন্ত্রী নিবাইস মহম্মদের সহী-মোহরযুক্ত পরওয়ানা দেখিতে চাহিল। হত্যাকারিগণ তখন চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন, পাপিষ্ঠের পাপ প্রলোভনে ভুলিয়া যে একজন নির্দোষের প্রাণহত্যা করিয়া চির নরকের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। ক্রোধান্ধ অধিবাসীগণ উত্তেজিত কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ সহী-মোহরযুক্ত পরওয়ানা দেখিতে চাহিল। কোথায় পরওয়ানা,—কে দেখাইবে? তখন সকলে উলঙ্গ কৃপাণ ক'রে সেই হত্যাকারিদ্বয়কে আক্রমণ করিল। দুরাত্মা আগা বাখর তখনই নিপাতিত হইলেন, কিন্তু তৎপুত্র আগা সাদক আহত হইয়া কোন মতে পলায়ন পূর্বক ঘৃণিত জীবন রক্ষা করিলেন।][৪৮]

স্ক্রাফ্টন সাহেবের সঙ্গে টাইলর সাহেবের ইহাতে সামান্য অনৈক্য দেখা যায়। তিনি বলেন যে, আগা বাখর চট্টগ্রাম বিভাগের শাসনকর্তা ছিলেন। রাজস্ব বাকি পড়ার জন্য, আগা বাখরের পুত্র আগা সাদক, নিবাইস মহম্মদের আদেশানুসারে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হন। উক্ত আগা সাদক ঘোরতর মদ্যপায়ী এবং তদ্ধেতু সামান্য পরিমাণ বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার প্রলোভনে সহজেই আগা সাদক উক্ত পাপকার্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং সিরাজও তদনুসারে তাঁহাকে পলায়ন করিতে দিলেন। ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর আগা সাদক ঢাকায় পৌঁছিয়া পিতার সঙ্গে পরামর্শপূর্বক দ্বাদশজন সৈনিকসহ রাত্রিতে হোসেনউদ্দিনকে বিনাশ করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন যে সিরাজদৌলার আদেশ তাহারা প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র। এদিকে নিবাইস মহম্মদ খাঁ, আগা সাদকের পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে ধৃত করিবার জন্য ঢাকায় লোক প্রেরণ করিলেন। এই লোক তথায় পৌঁছিলে, সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হইল; অধিবাসীগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া তখনই তাঁহাদের আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে আগা বাখর নিহত হইলেন, কিন্তু আগা সাদক পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।[৪৯]

সুপ্রসিদ্ধ গোলাম হোসেন খাঁ, সৈয়দ-অল-মুতক্ষীরনে আগা বাখর খাঁকে ঢাকা বিভাগের একজন ধনাঢ্য জমিদার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি হোসেনউদ্দিনের হত্যা সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, টাইলর ও স্ক্রাফ্টন সাহেবও প্রায় তাহাই বলিয়াছেন; প্রভেদ এই একটু যে, আগা বাখর স্বয়ং এই হত্যাকার্যে লিপ্ত ছিলেন না।[৫০] কোন ঐতিহাসিক আগা বাখর খাঁর পরিচয় দিতেছেন না। কেহ কেহ মাত্র বলেন যে আগা বাখর আফগান নাম, সম্ভবত ইনি পাঠানজাতীয় মুসলমান হইবেন। তিনি যে চট্টগ্রাম প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, তাহাই সত্য বলিয়া অনুমিত

হয়; এবং বোজরগ উমেদপুরে নিজ নামে "গঞ্জ" স্থাপন করিয়া সেলিমাবাদের সাড়ে এগারো আনি অংশ যে বলপূর্বক দখল করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকৃত। পরে তাঁহারই নামানুসারে সমস্ত জেলার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিল; কিন্তু ইতিহাসে এই আগা বাখর খাঁর, এমন কোন সৎকার্যের অথবা প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ দেখিলাম না, যাহাতে তাঁহারই নামানুসারে এই সমস্ত ভূখণ্ডের নামকরণ হইয়াছে। যতটুকু চরিত্র, ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তাহাতে আগা বাখর খাঁকে, নরকের কীট অপেক্ষাও জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। মিঃ বেভারিজ্ এবং সার হান্টার প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার কোন কারণ নির্দেশ করেন নাই।

সুপ্রসিদ্ধ এশিয়াটিক রিসার্চে আমরা এক আগা বাখরের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহাকে ঢাকার নবাব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে, কিন্তু তদ্বিপরীত পরিলক্ষিত হয়। এই আগা বাখর ও আমাদের পূর্বোল্লিখিত আগা বাখর এক ব্যক্তি কি না, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।[৫১]

বাকরকাঠি নামক একটি গ্রাম সাহেবগঞ্জ থানায় এখনও পরিলক্ষিত হয়; ইহা আগা বাখরের নামানুসারে হইয়াছে বলিয়া সম্ভব।

কেহ কোন দাম্ভিকতা অথবা ক্রোধের পরিচয় দিলে, অস্মদ্দেশে তাহাকে আগা বাখরের সঙ্গে উপমা দিয়া থাকে। ইতিহাস আগা বাখর খাঁ সম্বন্ধে যাহাই কেন বলুক না, এদেশে কিন্তু তিনি অন্যরূপে পরিচিত। আবাল-বৃদ্ধবনিতা, তাঁহাকে পাপিষ্ঠ, অত্যাচারী, পরস্বাপহারক, দাম্ভিক বলিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে এই জেলার স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ প্রচলিত, কিন্তু তিনি যে দুর্বৃত্ত ছিলেন, তাহা সর্ববাদী সম্মত। আবশ্যকবোধে একটি জনপ্রবাদ্ উল্লেখ করা গেল।

বোজরগ উমেদপুর ও সেলিমাবাদের সাড়ে এগার আনি অধিকারপূর্বক খাঁ সাহেব স্বনামে "গঞ্জ" স্থাপন করিয়া সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অধিকারস্থিত অধিবাসীগণ, কি ভদ্র, অভদ্র, ধনী, নির্ধন আবশ্যকবোধে সকলকেই শারীরিক বা আর্থিক সাহায্য করিতে হইত। প্রজাবর্গের মধ্যে কাহারও গৃহে সুন্দরী যুবতী দেখিলে, তাঁহার আদেশক্রমে কর্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া বলপূর্বক রাজান্তঃপুরে প্রেরণ করিত। কেহ কোন আপত্তি অথবা বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করিলে, তাহার দুর্গতির সীমা থাকিত না; ফৌজ আসিয়া গৃহস্থের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত, এবং কাহাকেও বা ধরিয়া লইয়া "নিমকের জ্বালে" চালান দিত।

ইহা অপেক্ষাও অমানুষিক অত্যাচারের কথা স্থানে স্থানে এখনও শুনা যায়। নবাব সিরাজদ্দৌলা যে প্রকার পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় দেখাইয়া ভারতকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন,—আগা বাখর তদপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলে কি হয়; তিনিও অত্যাচারে নবাব অপেক্ষা বড় কম ছিলেন না। এই সমগ্র ভূখণ্ড "বাকরগঞ্জ" নামে অভিহিত হইবার ইহাও একটি কারণ অনুমিত হয়। আগা বাখর, বোজরগ উমেদপুরেই প্রথমত স্বনামে "গঞ্জ" স্থাপন করায়, ঐ স্থানটুকু মাত্র তাঁহার নামানুসারে "বাকরগঞ্জ" নামে অভিহিত হইত। পলাশির যুদ্ধান্তে ব্রিটিশ রাজ্য পত্তন হইলে, প্রথমত স্থানীয় রাজধানী পূর্বোক্ত বাকরগঞ্জে স্থাপিত হইয়া শাসনকার্য সম্পন্ন হইতে থাকে; অনেক বৎসর পরে কর্তৃপক্ষগণ অনেক অসুবিধা দেখিয়া বর্তমান বরিশাল নামক স্থানে স্থানীয় রাজধানী পরিবর্তন করেন। সেই অবধিই বাকরগঞ্জ বলিয়া পরিচিত হওয়ায়, অদ্যাপি সর্বস্থানে ঐ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্থানান্তরে আমাদের এই সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে।

আগা বাখরের নিধনের অল্প পরেই এই দেশে আর একজন মুসলমানের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে: ইঁহার নাম মহম্মদ ছবি খাঁ। আগা বাখর কুকার্য এবং পাপাভিনয়ের দ্বারা এদেশবাসীদের যে প্রকার জ্বালাতন করিয়াছিলেন, ছবি খাঁ ততোধিক উপকার করিয়াছেন। এই জেলায় অনেক স্থানে তিনি প্রশস্ত বর্ত্ম, ইষ্টক নির্মিত সেতু, নির্মাণ করিয়াছিলেন; কেবল এ জেলায় কেন, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁহার নির্মিত বর্ত্ম এবং সেতু অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা "ছবি খাঁর জাঙ্গাল" বলিয়া পসিদ্ধ, অনেক স্থানে এই সমস্ত বর্ত্ম এখন আর পূর্বরূপ উন্নত অবস্থায় না

থাকিলেও, যাহা আছে, তাহা যেরূপ প্রশস্ত এবং উন্নত, বর্তমান সময়ের ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের প্রথম শ্রেণীর রাস্তাগুলিও ততদূর প্রশস্ত এবং উন্নত নহে। এই মহাপুরুষ যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কালে তাহার লোপ হইলেও লোকে তাঁহাকে সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষের কীর্তি ক্রমশই লোপ হইতেছে। সরকারি কাগজে যে যে স্থানে ছবি খাঁর জাঙ্গালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বর্তমানে এখন অনেক স্থানে তদ্বিপরীত পরিলক্ষিত হইতেছে। স্বার্থসিদ্ধির মানসে অনেকে ইচ্ছা পূর্বকই এই প্রাচীন কীর্তি লোপ করিতেছেন।

এই মহাপুরুষ যে কোন সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না; এমন কি তিনি যে কে, কোথায় আবাস ভূমি, এই দেশের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহাও জানা সুকঠিন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন, তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ইতিহাস সৈয়র-অল-মূতক্ষরীনে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। এক সেউকি খাঁর কথা আছে বটে, কিন্তু তিনি পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা; বঙ্গ দেশে অথবা অন্য কোন স্থানে তৎকর্তৃক কোন সাধারণ হিতকর কার্যের কোন উল্লেখই দেখিতে পাইলাম না। মেহেন্দিগঞ্জে একটি মস্‌জিদ আছে, তাহার উপরিস্থিত প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে যে, ছবি খাঁ কর্তৃক এই মস্‌জিদ বাংলা ১১৬১ সালে নির্মিত হইয়াছে। কোটালিপাড়ায় তৎকর্তৃক নির্মিত আরও একটি মসজিদ দেখা যায়, তাহাতেও ছবি খাঁর নাম ব্যতীত অন্য বিশেষ কিছু জানা যায় না।

এই মহাত্মার পরিচয় সম্বন্ধে দেশপ্রবাদ ব্যতীত, অন্য কিছুই জানিবার উপায় নাই; কিন্তু তাহাও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, ছবি খাঁ আলিবর্দিখাঁর পূর্বের লোক; সরফরাজ খাঁ যখন বঙ্গ-বিহারের সুবেদার, তখন এই ছবি খাঁ, পূর্ত বিভাগের জনৈক প্রধান কর্মচারী ছিলেন। একদিন নবাব সরফরাজ খাঁ, ছবি খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন্ কার্য করিলে সর্বসাধারণের চিরস্মরণীয় হওয়া যায়; ছবি খাঁ বলিলেন যে, যদি সর্ব সাধারণের উপকারার্থ, অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া স্থানে স্থানে প্রশস্ত বর্ত্ম, দিঘি, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করা যায়, তবে যেরূপ অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়, তদ্রূপ সর্বসাধারণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া অক্ষয় কীর্তিবান্ হওয়া যায়। নবাব সহাস্য বদনে বলিলেন যে যদি ছবি খাঁ স্বয়ং এই কার্যভার গ্রহণ করেন ও সুসম্পন্ন করিতে সম্মত হন, তবে তিনি অবশ্যই এই প্রকার অর্থ ব্যয় করিতে স্বীকৃত আছেন। ছবি খাঁ স্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে, টাকা নবাবের, কিন্তু যশ তাঁহারই হইবে। নবাব সেই কথায় কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। নবাব প্রদত্ত অর্থ লইয়া মহম্মদ ছবি খাঁ, নিম্ন বঙ্গে আগমন পূর্বক, নানাস্থানে নানা প্রকার দীঘি, পুষ্করিণী, প্রশস্ত বর্ত্ম, ধর্মমন্দির, পান্থশালা নির্মাণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্যসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরাত চতুর্দিকে তাঁহার নির্মল যশঘোষণা করিয়া নরনারীগণ ঊর্ধ্ব বাহুতে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। নবাবের কর্ণে এই সুখ্যাতি পৌঁছিল, তিনি ছবি খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লোকে এই শুভানুষ্ঠানের জন্য নবাবের সুযশ বিঘোষিত না করিয়া, তাঁহার (ছবি খাঁর) সুখ্যাতি করে কেন? ছবি খাঁ বলিলেন যে, তিনি যখন এই কার্যভার গ্রহণ করিয়া গমন করেন, তখন বলিয়াছিলেন যে টাকা নবাবের, যশ তাঁহার, কার্যেও তাহাই হইয়াছে! নবাব এই প্রকার স্পষ্টোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া ছবি খাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন।

ইহাতে নবাব যে কেন নির্দোষী ছবি খাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, তবে নবাবি চাল—চলতি আইনকানুন সকলই স্বতন্ত্র; কেননা মুসলমান নবাবদের মুখের কথাই আইন, এবং তাহাই প্রজাগণের বিনাবাক্যব্যয়ে শিরোধার্য।

মহাত্মা বেভারিজ্ সাহেব, ছবি খাঁ সম্বন্ধে একটি লোমহর্ষক বিস্ময়কর প্রবাদ উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ জন্য তাঁহার বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করা গেল।

। ছবি খাঁ পশ্চিম দেশবাসী একজন ধনাঢ্য মুসলমান বণিকের সন্তান। শৈশবে একদা তিনি মাতৃক্রোড় হইতে অপহৃত হন। তৎকালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ছেলেধরার ভয়ে সকলেই

শশব্যস্ত ছিলেন। চৌরগণ তাঁহাকে জনৈক নিঃসন্তান ধনবান মুসলমানের নিকট বিক্রয় করে। কয়েক বৎসর পরে একদা প্রাপ্তবয়স্ক ছবি খাঁ বহু লোক সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। অনেক দূর ভ্রমণ করিতে করিতে গভীর অরণ্য মধ্যে বৃক্ষমূলে এক পরমাসুন্দরী প্রৌঢ়া রমণী দেখিয়া, ছবি খাঁর অনুচরবর্গ নিকটে আগমনপূর্বক, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী বলিলেন যে, তিনি ধনাঢ্য লোকের স্ত্রী, এবং সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ; দস্যুগণ তাহাদের বাড়িঘর লুণ্ঠনপূর্বক, তাহার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে বিনাশ করায়, তিনি মানসম্ভ্রম রক্ষার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এইরূপ কিয়ৎকাল গত হইলে একদা ঐ রমণী ছবি খাঁর পদতলে কোন একটি বিশেষ চিহ্ন অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে ছবি খাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ছবি খাঁ বলিলেন যে বাল্যকালে তাঁহাকে তাঁহার মাতৃক্রোড় হইতে ছেলেধরার দল অপহরণ করিয়া আনিয়া এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছে। যাহাকে তিনি পিতৃ সম্বোধন করিতেন, তিনি তাঁহার জনক নহেন,—পালক পিতা মাত্র। প্রকৃত জনক জননীর নাম তিনি অবগত নহেন। এই কথা শ্রবণ মাত্র উক্ত রমণী শিবে করাঘাত পূর্বক বাত্যাহত কদলী বৃক্ষবৎ মূর্চ্ছিতা হইলেন। বহু শুশ্রূষায় তাহার চৈতন্যোৎপাদন হইলে, ছবি খাঁ তাহার এইপ্রকার আকস্মিক অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বমণী বলিলেন যে, সর্বনাশের কথা তিনি আর কি বলিবেন, বাল্যকালে যে জননীর অঙ্ক হইতে তিনি (ছবি খাঁ) অপহৃত হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার সেই পাপীয়সী জননী, ভ্রমান্ধে পতিত হইয়া তাঁহারা যে মহাপাপ করিয়াছেন, কখনও তাহা হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার লোমহর্ষক ও ভীষণ সংবাদ অবগত হইয়া ছবি খাঁর নিদারুণ মর্মবেদনা এবং অনুশোচনা উপস্থিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ি হইতে বহির্গত হইলেন এবং একজন ধার্মিক মুসলমান ফকিরের নিকট সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান জিজ্ঞাসা করিলেন। ফকির বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন যে যদিও অজ্ঞাতে তিনি এই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই; তবে ঈশ্বরোপাসনা এবং সাধারণের হিতকল্পে সর্বস্ব ব্যয় প্রভৃতি পুণ্যকার্য করিলে, কতক পাপ লাঘব হইতে পারে মাত্র। ফকিরের উপদেশানুসারে, ছবি খাঁ তখন তাঁহার বিপুল অর্থ সাধারণের হিতকর কার্যে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন; স্থানে স্থানে জলাশয়, পান্থনিবাস, ধর্মমন্দিব এবং প্রশস্ত বর্ত্ম প্রভৃতি তাঁহারই অর্থে নির্মিত হইতে লাগিল। এইপ্রকার তাঁহার সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইলে তিনি ফকিরি গ্রহণপূর্বক মক্কায় গমন করিয়া, ঈশ্বরোপাসনায় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিলেন।]

কেহ কেহ বলেন যে, ছবি খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কোটাল (শান্তিরক্ষক) ছিলেন। তাঁহার উপর এই প্রদেশের শান্তি রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। বর্তমান কোটালিপাড়া পরগনায় তাঁহার আবাসস্থান ছিল; তাঁহারই পদানুযায়ী এই স্থানের নাম পবিবর্তিত হইয়া "কোটালপাড়া" বর্তমান কোটালিপাড়া হইয়াছে।

উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল, সমস্তই কিম্বদন্তী মূলক। ছবি খাঁ যিনিই হউন না তিনি যে ধার্মিক এবং পরোপকারী ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের বর্তমান ইতিহাস লেখকগণ অনেক আবর্জনায় গ্রন্থের কলেবর পুষ্টি করেন, কিন্তু দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের জীবনী সঙ্কলনে তাদৃশ যত্নবান হন না। বর্তমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে হয়ত অনেকে ছবি খাঁর নাম পর্যন্তও শুনেন নাই। রত্নপ্রসূ ভারত ভূমে যে কত স্থানে কত মহার্ঘ রত্ন শোচনাতীত স্থানে পঙ্কিলাবস্থায় পড়িয়া আছে, কয়জনে তাহার খোঁজ করে?

পর্তুগিজ এবং মগদিগের উৎপীড়নে অস্মদ্দেশ যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল, তদপেক্ষা আরও এক দুর্ধর্ষ জাতি কর্তৃক বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতা যার পর নাই উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ইহারা মহারাষ্ট্রজাতি; ইহাদের অত্যাচার বাংলায় "বর্গির-হাঙ্গামা" বলিয়া অভিহিত। আজও ঘরে ঘরে বর্গির হাঙ্গামাব কথা শুনা যায়, জননী, ক্রোড়স্থিত শিশুকে ঘুম পাড়াইবার সময়ে বর্গির হাঙ্গামার ছড়া আবৃত্তি করেন।—

"খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গি এল দেশে;
বুলবুলিতে ধান খেয়ে যায়, খাজনা দিব কিসে।"

পারস্যাধিপতি নাদির শাহের ভারতাক্রমণ ও দিল্লি নগরী লুণ্ঠন এবং অধিবাসীগণের নৃশংসরূপে হত হইবার পর হইতে মোগল সম্রাটদিগের ক্ষমতা যার পর নাই হ্রাস হইয়াছিল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যবাসী মহারাষ্ট্রীয়গণ[৫২] যার পর নাই পরাক্রমশালী এবং দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। সুবিখ্যাত পেশোয়া বাজিরাও বল্লালের পুত্র বালাজি বাজিরাও এবং বেরারের অধীশ্বর রঘুজি ভোঁসলা তাহাদের নায়ক। তাহারা দলে দলে ভারতবর্ষের নানা স্থান আক্রমণ করিয়া যার পর নাই অত্যাচার করতঃ লুণ্ঠনাদি করিতে লাগিল। মহম্মদসাহ তখন দিল্লির সম্রাট, তিনি কিছুতেই এই দুর্ধর্ষ জাতির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাহারা দিল্লি নগরীর তিন মাইল দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত আক্রমণ পূর্বক করায়ত্ব করিয়াছিল।

সম্রাট অবশেষে মহারাষ্ট্র নায়কদিগকে "চৌথ" অর্থাৎ রাজস্বের এক চতুর্থাংশ দিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। সম্রাটকে হীনবল দেখিয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ সাম্রাজ্যের সকল স্থানেই চৌথ আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইল, প্রায় সমস্ত সুবেদারই এই চৌথ আদায় করিলেন।

বঙ্গদেশ হইতে চৌথ আদায় করিবার জন্য রঘুজি ভাস্কর পণ্ডিত নামা জনৈক সেনাপতির অধীনে বহু সহস্র সৈন্যসহ তাহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। তখন নবাব আলিবর্দি খাঁ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি; তিনি এই বিপদে দিল্লিশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহ সাহায্যার্থ আসিল না, কারণ তখন সম্রাট নিজেই মহারাষ্ট্র-ভয়ে ভীত। বহুদিন ব্যাপিয়া নানাস্থানে যুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া বেরারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পরবৎসর দ্বিগুণ সৈন্য সহ পুনরায় ভাস্কব পণ্ডিত বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ এবার অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে নিরীহ প্রজাপুঞ্জের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। মুর্শিদাবাদের পূর্ব প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রতীর পর্যন্ত তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে অনেক গৃহস্থের যথাসর্বস্ব নষ্ট হইয়াছিল। বর্গিগণের দুর্বিসহ অত্যাচার কাহিনী প্রখ্যাতনামা মেকলে (Macaulay) জ্বলন্ত ভাষায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। "Wherever their kettle drums were heard, the peasant through his bag of rice on his shoulder, hid his small savings in his girdle, and fled with his wife and children to the mountains or the jungles, to the milder neighbourhood of the hyaena and the tiger * * *. Even the European factors trembled for their magazines. Less than a hundred years ago it was thought necessary to fortify Calcutta against the horsemen of Berar and the name of the Mahratta Ditch still presserves the memory of the Danger [৫৩]

আমাদের এই জেলায়, রায়ের কাঠি, মহদিপুর, পোনাবালিয়া, হোসেনপুর প্রভৃতি গ্রাম, এই দস্যুদের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই দস্যুভয়ে এতদূর ভীত ছিল যে, "বর্গি আসিতেছে" বলিলে, সকলে বাড়ি ঘব পরিত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গ সহ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব আত্মরক্ষা করিত। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের তখন যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহাদের আত্মরক্ষা করাই কষ্টসাধ্য, সুতরাং রাজ্য রক্ষা অসম্ভব। স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণেব মধ্যে কেবল পোনাবালিয়া নিবাসী রামভদ্র রায় মহারাষ্ট্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ কবিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করতঃ সোন্দারকূল হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন।[৫৪] কেহ কেহ বলেন হোসেনপুরের বক্সিগণও বর্গিদের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিলেন।

ফিরোজপুর সাবডিভিশনের অন্তঃর্গত বলেশ্বর নদের পূর্বপ্রান্তস্থিত, নন্দীপাড়া, পোরগোলা প্রভৃতি স্থানগুলি বর্গিদিগের দৌরাত্ম্যে একেবারে জনহীন হইয়াছিল, তথায় এই দস্যুগণ সমবেত হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিভাগ করিত। তাহারা এই দেশ হইতে দূরীভূত হইবার অনেক পবে সেখানে লোকের বসতি হয়; নন্দীপাড়া গ্রামের পশ্চিমাংশে একখানি পতিত ভিটা আছে, লোকে তাহাকে 'বর্গির ভিটা' বলে। ইহাব অধিকাংশ এখন বলেশ্ববের কবলগত হইয়াছে।

এই দস্যুদিগকে বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিতে নবাব আলীবর্দিখাঁর যে প্রকার কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠকের নিকট তাহা অবিদিত নাই। দুরাচারগণ এই দেশে আরও কিছুকাল অত্যাচার করিতে পারিলে দেশবাসীর ভাগ্যে যে কি হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

সাক্ষাৎ প্রেমের অবতার মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের অস্মদ্দেশে পদার্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৫২৭ হইতে ১৫২৮ খ্রিঃ অব্দে কতিপয় শিষ্য এবং স্বীয় মাতুল সমভিব্যাহারে ইনি পৈত্রিক জন্মভূমি দর্শন মানসে তটপথে গমন করেন। কোটালিপাড়ার অন্তঃর্গত মুখডোবা নামক স্থানে তাঁহার শ্রীহস্ত প্রতিষ্ঠিত পাষাণময় বাসুদেব বিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজমান আছে, মহাপ্রভু স্বয়ং এই মূর্তিস্থাপন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুখডোবার অধিকারী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ, এবং বাসুদেব বিগ্রহের সেবাইতগণ, চৈতন্যদেবের মাতুলবংশীয় বলিয়া সগৌরবে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

এই সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, মহাপ্রভুর মাতুল তাঁহার নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হইতে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া এই দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু বিরত হওয়া দূরে থাক, ইনি ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না। চৈতন্যদেব, পিতৃভূমি দর্শনার্থ যখন শ্রীহট্টাভিমুখে প্রস্থান করেন, তখন একদা মধুমতী নদীর তীরস্থ এক বট মূলে, নিদাঘ তাপে তাপিত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া সঙ্গীয় সেবকগণের নিকট আহার্য সামগ্রীর যাচ্ঞা করিলেন। শিষ্যগণ অবিলম্বে নিকটবর্তী গ্রামে ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুল আনয়ন পূর্বক রন্ধন করতঃ তাঁহাকে আহার করাইলেন। পরে আহারাদি সমাপন হইলে, মহাপ্রভু শিষ্যদের নিকট মুখশুদ্ধি চাহিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন যে, তাঁহাদের নিকট সঞ্চিত কোন দ্রব্যই নাই, অনুমতি হইলে গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারে। মহাপ্রভু মাতুল মহাশয়ের নিকট মুখশুদ্ধি প্রার্থনা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্বদিনের সঞ্চিত অর্ধেক পরিমাণ হরিতকি বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। চৈতন্যদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার যখন হৃদয় মধ্যে এখনও বিষয় বাসনা জাগরূক রহিয়াছে, তখন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণে আপনি এখনও অধিকারী হন নাই।" তাঁহার মাতুল মহাশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন যে তিনি সমস্ত বিষয় বাসনা, ভোগ-লালসা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র কৌপীন গ্রহণে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন, তথাপি তাঁহার বিষয় বাসনা কোথা হইতে আসিল? চৈতন্যদেব বলিলেন যে, অর্ধখণ্ড হরিতকিই তাহার বিশেষ পরিচয়। অন্য দিনের জন্য যখন তিনি এই সামান্য হরিতকিখণ্ড পরিত্যাগ না করিয়া সঞ্চিত রাখিয়াছেন, তখন তাহার হৃদয় হইতে সঞ্চয়-বুদ্ধি এখনও তিরোহিত হয় নাই। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিতে হইলে, সুখ, দুঃখ, আহার, বিহার, জীবন, মরণ, সমস্তই সেই ভগবচ্চরণে ন্যস্ত করিতে হইবে। যতদিন না তাঁহার হৃদয় হইতে সঞ্চয়-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে, ততদিন পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কিন্তু মাতুল মহাশয় কোন ক্রমেই তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প প্রকাশ করায় মহাপ্রভু ঈষদ্ধাস্য সহকারে ধীরে ধীরে মধুমতী অবগাহনপূর্বক প্রস্তর নির্মিত এক বাসুদেব বিগ্রহ মাতুলের হস্তে প্রদান করিযা বলিলেন, "আমি আপনার ও আপনার সন্তানসন্ততির হিতকল্পে এই মূর্তি স্থাপন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিব, আপনি এই স্থানে থাকিয়া ইহার অর্চনা করুন। সময় উপস্থিত হইলে, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।"

উপযুক্ত স্থানে বিগ্রহ স্থাপন পূর্বক এই ভাবে মাতুলকে সেবার জন্য রাখিয়া তিনি অন্যান্য শিষ্যসেবক সহ গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বাকলার তদানীন্তন রাজা পরমানন্দ রায় এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বয়ং দেবদর্শনমানসে মুখডোবায় আগমন করেন, এবং মহাসমারোহে দেবপূজা নির্বাহপূর্বক, বিগ্রহসেবার্থ একখণ্ড দেবোত্তর ভূমি প্রদান করেন। কালের পরিবর্তনে বর্তমান সময়ে সেই দেবোত্তর সম্পত্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, এখনও অতীতের স্মৃতিস্বরূপ সামান্য কতকাংশ বর্তমান রহিয়াছে। আগা বাখর খাঁ ও তৎপুত্র আগা সাদকের মৃত্যুর পর, এই জেলাস্থ বোজরগউমেদপুরের সম্পূর্ণ অংশ

এবং সেলিমাবাদের সাড়ে এগার আনা অংশ রাজা রাজবল্লভের হস্তগত হয়। তিনি এই বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি রাজনগরের অন্তর্ভূত করিয়া যথাক্রমে স্থাপিত দুর্গা এবং লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহদ্বয়ের নামানুসারে দেবোত্তর প্রদান করেন।[৫৫]

মহারাজ রাজবল্লভ যদিও এই জেলার অধিবাসী নহেন, তথাপি এই মহাপুরুষের জীবনীর সহিত এদেশের যেটুকু সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা স্থানান্তরে তাহা বর্ণনা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিব।

তথ্যসূত্র

১ স্বর্গীয় বায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর কৃত "কৃষ্ণচরিত" অবলম্বনে কাল নিরূপিত হইল।

২. বর্তমানে গঙ্গাসাগবসঙ্গম তীর্থ চব্বিশ পরগনা জেলাব অন্তর্গত হইয়াছে।

৩ ইংবেজিতে ইহাকে Swatch of no Ground বলে।

৪. কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্তৃক অনূদিত এবং প্রকাশিত মূল সংস্কৃত মহাভারত, ১৭৯৩ শকাব্দ।

৫. "There lived in this part of Bengal, a semi-barbarous tribe named Chunda-Bhunda, very similar to the Malongis or salt manufacturers of the present day Their condition was little better than slaves In a copper plate inscription, found in lat ... Mr Hodge's map, near Bakarganj, Madhab, evidently a brother to Keshub ... the Sen Rajas of Bengal, made a grant of some villages to a Brahman, with the villages, the King conferred on the recipient the right of punishing and empolying the Chunda-Bhunda, a tribe that inhabited the place This tribe, I believe, gave the name of the uncultivated portion of the delta which they occupied "—Asiatic Society's Journal, Paper on Sundarban by Pratap Chandra Ghosh

৬. Early travellers in India

৭. See In Aryans Vol II page 236 1881

৮. ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল প্রমুখ অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন যে মহারাজ আদিশূর এবং সেন রাজগণ সকলেই ক্ষত্রিয়, এবং চন্দ্রবংশসম্ভূত। অনেকের কিন্তু বিশ্বাস যে তাঁহাবা বৈদ্য এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থবর্ণিত বিবরণ এবং "সেন' পদবিই ইহাব প্রমাণ। উল্লিখিত পণ্ডিতগণ বলেন যে "সেন" শব্দ শূরত্বব্যঞ্জক। ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বল্লালাদির "সেন" সংজ্ঞা যে আদিশূরেব "শূর" শব্দ অথবা বসুসেন (কর্ণ) ও ভীমসেনের "সেন" শব্দেব ন্যায় শূরত্বব্যঞ্জক নামৈকদেশ মাত্র নহে পরন্তু বংশোপাধি, তাহা তাম্রশাসন এবং দানসাগর গ্রন্থে সপ্রমাণ। ইদিলপুর প্রাপ্ত শাসনে কেশব সেন "সেনকুল কমল বিকাশ ভাস্কর সেনবংশপ্রদীপ" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিজয় সেন নিজবংশকে "সেনান্বয়" বলিয়াছেন। বল্লাল দানসাগর গ্রন্থে নিজ বংশকে "অবনের্ভূষণঃ সেনবংশ" বলিয়া বিঘোষিত করিয়াছেন। অতএব বল্লালাদি নৃপতিবৃন্দেব সেনই প্রকৃত বংশপদবি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা স্থানান্তরে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

৯. বাগ্মাদি নামে এক গ্রাম ইদিলপুরে আছে, সম্ভবত ইহাই বাগুতি।

১০. কেহ কেহ বলেন ১২০৩ খ্রিঃ অব্দ, কিন্তু Major Raverty "তাবকত-ই-নাসিরি"র অনুবাদে ৫৯০ হিঃ অর্থাৎ ১১৯৪ খ্রিঃ অব্দ বক্তিয়াব কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের কাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

১১. মতান্তরে তৎপুত্র কেশব সেন। হরিমিশ্রেব কারিকা দ্রষ্টব্য।

১২ ইহাব বংশধরগণ এখনও গৌবনদী থানাব অন্তর্গত বাসরাইল গ্রামে বসতি করিতেছেন।

১৩. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাংলাব ইতিহাস।
অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়াছেন —"The Bengal territory, conquered in 1203-4 by the Mohomedans, did not comprise the Eastern District *The Bangadesh* was still under Ballal's descendents till the end of the 13th century, when *Sovarganw* was occupied by the second son of the Emperor Bulban."—Blochman's History and Geography of Bengal

১৪. মাধব কর—ইনি স্বনাম প্রসিদ্ধ নিদান গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা, ঋষি প্রণীত চবক ও সুশ্রুতের পব এরূপ উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ কেহ প্রণয়ন করেন নাই। * * * ইনি মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের সমসাময়িক। জাতিতত্ত্ব বারিধি, ২২৪ পৃষ্ঠ।

১৫. নয়পালাদি নরপতিগণ প্রকৃতপক্ষে কোন বংশোদ্ভূত ছিলেন, তাহা নির্ণীত হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ ইহাদিগকে পালবংশীয় বলিয়াছেন, কিন্তু গোপাল, মহীপাল, নয়পাল প্রভৃতি পাল শব্দ নামৈকদেশ মাত্র—বংশোপাধি নহে। কারণ শুধু 'গো' 'মহী' 'নয়' কাহারও নাম হইতে পারে না।

১৬. দিনাজপুর ও সুন্দরবনের তাম্রফলক পাঠে জানা যায় যে, বৈদ্যকুলভূষণ মহাত্মা চক্রপাণির পিতা নারায়ণ দত্ত, এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর ভানু দত্ত বৈদ্যান্তরঙ্গ "গৌড়াধিনাথ" মহারাজ লক্ষ্মণসেনের অমাত্য ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তাহা হইলে মাধব কর লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে অর্থাৎ খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

১৭. বাচস্পত্যাভিধানের ভূমিকা।

১৮. H. Bevenge's History of Bakarganj. page 27.

১৯. Physical Geography by Dr. Rajendra Lal Mittra.

২০. স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে বঙ্গীয় ৮৯১ সনে শ্রাবণ মাসে সোমবারে শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয়।

২১. অঙ্কস্য বামাগতি।

২২. ষ্টুয়ার্ট সাহেব হোসেনের সিংহাসনারোহণ কাল ১৪৯৯ খ্রিঃ অব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বিজয় গুপ্তের মতে তিনি ইহার পঞ্চদশ বৎসর পূর্বেও বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবি-কর্ণপুর হোসেনের সমকালীন বলিয়া তাঁহার কথাই যথার্থ মনে হয়।

২৩. নলচিড়া গ্রামে বড় ভট্টাচার্য বাটির পুষ্করিণী খননকালেও এক নাসিকাহীন বাসুদেব মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

২৪. Mr. Taylor's Topography of Dacca.

২৫. Sarcar Bakla is upon the bank of the Sea. The fort is situated amongst trees On the first day of the moon, the water begins to rise, and continues increasing till the fourteenth, from which time to the end of the month it decreases gradually every day Gladwin's Translation. Page. 304.

২৬. I visited Kachua in the end of 1874, and found that the only remains of old building were a lonely and deserted temple standing on a high mound overlooking the river, and a series of vaulted chambers of very strong masonary, which are said to have been the *Rajbaree or palace* The temple is conical in shape and is double storied, which is, I believe, not commonly the case in modern Hindu temples It is evidently of considerable age, for there is a large tree (a pakoor) growing on the top, which is so branching as almost to conceal the temple underneath The *Rajbaree* is a little farther inland, and is surrounded with jungle —H. Beveridge's History of Bakarganj. Page 73

২৭. এই মূর্তি এখনও উক্ত গ্রামে রায়দের বাটি বর্তমান আছে এবং সেই স্থানেই ইহার দৈনিক পূজা হইয়া থাকে। কোনরূপ আপদ বিপদ অথবা মারীভয় উপস্থিত হইলে এই মূর্তি অতিদূর গ্রামান্তরেও নীত হয় এবং গ্রামবাসীরা ইহার অভিষেক ও স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া শান্তি কামনা করে। ইহার নিত্য পূজা প্রভৃতির জন্য অতি পূর্বকাল হইতে পূজারি ব্রাহ্মণ, মন্দিরের সেবক ও বাদক প্রভৃতির বংশধরগণ এখনও রাজ প্রদত্ত বৃত্তিভোগ করিতেছে।

২৮. প্রবাদ যে উক্ত দিঘি খননকালেই এই শিবমূর্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ভূস্বামীর অনুমতিক্রমে স্থানীয় লোকেরা ঐ স্থানে মন্দির নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে এই মূর্তি স্থাপিত করেন, এবং প্রত্যহ রীতিমত অর্চনা করিতে থাকেন। পরে কালক্রমে মন্দির অর্ধভগ্ন হইলে কোন কারণবশত উহার পুনঃসংস্কার করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা ঐ মূর্তি গ্রামাভ্যন্তরে আনয়ন করেন।

২৯. দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩০. জনশ্রুতি যে ইনিই ত্র্যম্বকেশ্বর-শক্তি সুনন্দাদেবী।

৩১. ইনি পোনাবালিয়া চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ।

৩২. শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ মহাকাব্য (সংস্কৃত) প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর কালীকান্ত শিরোমণি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক এই সংগ্রহ করিয়াছেন।

৩৩. কেহ কেহ বলেন, ইনিই রাজবংশের স্থাপয়িতা রামনাথ দনুজমর্দনের পুত্র।

৩৪. রাজা কন্দর্পনারায়ণ।

৩৫ রাজা রামচন্দ্র রায়: (কন্দর্পনারায়ণের পুত্র)।

৩৬. যশোহরের যাবনিক নাম, রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী। প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য এবং খুল্লতাত বসন্ত রায়, চাঁদখান নামক জনৈক পাঠান ওমরাহের নামানুসারে, সুন্দরবন প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করেন; পরে প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হইয়া উহা যশোহর নামে অভিহিত করেন।

৩৭. ইহাদের বংশধর-দের মধ্যে কেহ কেহ এখনও সাহাবাজপুরে বাস করিতেছেন।

৩৮ মহাভারত আদিপর্ব, আস্তীক পর্বাধ্যায়। (মূল)

৩৯. Asiatic Society's Proceedings, 1868.

৪০ H Beveridge's History of Bakarganj, Page 38

৪১. এই সাহাবাজ খাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক বিরোধ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে তিনি আকবরের সেনাপতি, আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, তিনি আকবরের পূর্বের লোক। আইন-ই-আকবরিতে কিন্তু সাহাবাজ খাঁর নাম নাই, অথচ সাহাবাজপুর মহাল আছে। ইহা দ্বারা অনেকে অনুমান করেন যে সাহাবাজ খাঁ, সম্রাট আকবরের অভ্যুদয়ের পূর্বে। এই বিষয়ে স্থানান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

৪২. The Sarkar of Bakla (is termed) in the Siyar-ul-Mutaakhirin, Hugla and said to be called so from the well-known grass of that name (Typha elephantina) which here abounds —Colonel Jarrett's Ain-I-Akbari. Vol II P 123. (foot note)

৪৩. There is a difficulty connected with the name Bakla. The manuscripts of the Ayin-i-Akbari in my hands give a "B" as the first letter of the name. But the author of the Siyar-ul-Mutaakhirin, who copies the above record of the Cyclone from the Ayin-i-Akbari has "Hogla" instead of Bakla and distinctly asserts that the coast of the lower Bengal was thus called from "Hogla" a weed used for thatching house. I have, therefore very little faith on him as he wrote two hundred years after Abul Fazel in 1788,—Asiatic Society's Proceedings, 1868 (Paper read by Mr Blochman).

৪৪. Bernier's Travels in India নামক ইংরাজি গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের রাজ্যলাভ, এবং তৎকর্তৃক নৃশংসভাবে জ্যেষ্ঠ সহোদর দারা ও তৎপুত্রের নিধন, সুলতান সুজার দুর্গতি এবং অবশেষে আরাকানরাজ কর্তৃক তাঁহার ও তৎপরিবারবর্গের নিধন, বৃদ্ধ সম্রাটের লাঞ্ছনা প্রভৃতি অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে পাঠককে অনুরোধ করি।

৪৫. Calcutta Review (Fringhees in Chattigang) Vol LIII, Page 73.

৪৬. বৈদ্যকুলপ্রদীপ মহারাজ রাজবল্লভের অন্যতম বংশধর আনন্দনাথ রায় মহাশয় বিগত ১৩০৮ সনের শ্রাবণ মাসের "প্রদীপে" 'সংগ্রামসাহ' শীর্ষক গভীর গবেষণাপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

৪৭. The district of Bakarganj derives its name from one Aga Bakar, who was a servant of the Nawab of Murshidabad—H Beveridge's History of Bakarganj Page 13

৪৮ Dr Taylor's Topography of Dacca, Page 83

৪৯ Scrafton's reflections on the Government of Hindustan, Page 40

৫০ Making no distinction between vice and virtue, and paying no regard to the nearest relations, carried diffilement, wherever he (Sheerajddaullah) went In a little time he became so detested as Pharas People on meeting him by chance, used to say 'God, save us from him"! And His insolence and pride growing to a height by impunity he set at naught, the important services rendered to his uncle and family by both Hossain Cooly Khan and his brother, Hyaderali Khan, and he undertook to put them both to death This was his "Coup-dessay", and to insure success to his design, he made use of some art to gain the heart of a young man, who having had mighty disputes with the officers employed by Hossain Cooly Khan, Deputy Governor of the Province of Dacca, had come over to Murshidabad to complain of them, and had found means to lay his case before Nowaiz Mahamed Khan, who concerned himself in his behalf His name was Aga Sadak, and his title Sadak at Mahamed Khan, son to Aga Bakar, a considerable zemindar of those parts. Sheerajddaulha engaged him to return to Decca in order to kill Hossinuddin Khan, nephew to Hossain Cooli Khan and the latter's, Deputy at Dacca, an young man who for some reasons had fallen into a melancholy that has disordered his senses The man did exactly as he was bid Such a murder, committed so bluntly, struck a terror and consternation in

the mind of all the inhavitants of that great city, who concluded that an action of that high nature would have never been perpitrated, had not some person of the first rank affomed its countenance. So that everyone remained silent, and thoughtful, until it became known that the perpetrator had no order, and no voucher in his hand. He was therefore set upon by the inhabitants and the friends of Hossain Cooli Khan, who missed the muderer, by mistake, killed his farther Aga Bakar The son having escaped so great a danger, fled to Murshidabad, and by such a step threw away both his peace of mind and the safety of his person.—Siyar-ul-Mutaakhirin, Page 122—123

৫১. See Asiatic Researches—"Arracan"

৫২. মহারাষ্ট্রীয়গণ হিন্দু, তাহাদিগের বাসভূমি বর্তমান বোম্বাই এবং বেরার প্রদেশ। বিক্ষিপ্ত মহারাষ্ট্র-শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি সহ্যাদ্রির উত্তুঙ্গ শিখর হইতে কতিপয় অনুচর মাত্র সমভিব্যাহারে অবতীর্ণ হইয়া অত্যাচারী মোগলের বিরুদ্ধে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ঔরঙ্গজেব মহারাষ্ট্র-বিজয়ে অসমর্থ হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রাণত্যাগ করেন। শিবাজীর তিরোধানের পর রাজারাম, বালাজি বিশ্বনাথ এবং বালাজিরাও বল্লালের সাধনাবলে মহারাষ্ট্রশক্তি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু বাজিরাও বল্লালের মৃত্যুর পর হইতেই মহারাষ্ট্র সর্দারগণ অতিশয় যথেচ্ছাচারী এবং প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তৃতীয় পানিপথের মহাযুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

৫৩. See Macaulay's Essay on Lord Clive

54. The City of Dacca was much alarmed on account of the approach of the Maharattas, who were coming by the *Sundarbans*, and had advanced as far as Sounderkul—(Long's Selections, 1748 A. D.)
Rambhadra Raj is said to have fought with the Maharattas or Bargis, and to have defeated them near Ponabalia.—H Beveridge's History of Bakarganj, P. 412.

৫৫. Lakshmi Narayan is a name of Vishnu and was the name under which Raja Raj Ballav recorded his Zemindary of Rajnagar and Buzrug-umedpur Raja Raj Ballav managed to retain possession of 11.½ annas (Silemabad) up to 1168 B. S etc —H. Beveridge's History of Bakarganj. page. 108-109.



চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন সমাজ

বহুশত বৎসর পূর্বে বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী বৃহৎ জনপদ, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হিন্দুনরপতিদের শাসনাধীন ছিল। তখন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ বাকলা নামে অভিহিত হইত।[১]

তৎকালে ভারতমাতার সর্ব বিষয়িনী প্রতিভায় সমগ্র পৃথিবী মুগ্ধ ছিল। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন সেনবংশীয় রাজগণ অপ্রতিহত প্রভাবে গৌড়ে অথবা নবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। বাকলা তখন পৃথক এবং স্বতন্ত্রভাবে বঙ্গেশ্বরের মিত্ররাজ্য অথবা স্বাধীন রাজ্য ছিল কিনা, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অস্মদ্দেশে যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই বাকলা রাজ্য তৎকালে বঙ্গেশ্বর সেনরাজগণের অধীন ছিল।

সেই প্রাচীন কালের আচার, ব্যবহার, সমাজ প্রভৃতি বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইলে, আরও প্রাচীনকালেব কথা উল্লেখ করিতে হয়, কারণ প্রাচীন হিন্দুগণ, তাঁহাদের ইতিহাস অথবা বিশেষ কোন স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যান নাই। তৎকালীন ধর্ম ও সামাজিক অবস্থা আমরা কেবল ঋষিপ্রণীত ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ, এবং কাব্যাদিতে দেখিতে পাই। এই সমস্ত গ্রন্থ, আবার বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হইয়াছে।

এই সকল আলোচনা করিলে, স্বাধীন হিন্দুরাজগণের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, এবং চাতুর্বর্ণের বিধান প্রভৃতি কতক কতক অবগত হওয়া যাইতে পারে। সেনরাজগণ, হিন্দু এবং বঙ্গের সার্বভৌম অধীশ্বর, বাকলা তাঁহাদেরই অধীনস্থ হিন্দুরাজ্য; সুতরাং বঙ্গেশ্বরের যে প্রকার সামাজিক পদ্ধতি ছিল, বাকলা রাজের কতকটা তাহাবই মত ছিল, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সেনরাজগণের সময়েবও এই সম্বন্ধে কোন গ্রন্থাদি পাওয়া যাইতেছে না। বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের সভা তখন পণ্ডিতগণের বাসভবন ছিল। বল্লালসেন স্বয়ং একজন প্রতিভাশালী কবি এবং "দানসাগর" গ্রন্থের রচয়িতা; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ অংশ কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সেনরাজগণের পবিচয় এবং রাজ্য সম্বন্ধীয় দুই একটি কথা ব্যতীত বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেন যখন নবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন, তখন তাঁহার সভায় যে কয়েকজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের নাম এবং কাহারও কাহারও প্রণীত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পশুপতি প্রণীত "ব্যবস্থা", হলায়ুধ প্রণীত "ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব", গোবর্ধনাচার্য প্রণীত "আর্যসপ্তসতী" এবং জয়দেব গোস্বামী প্রণীত "গীত-গোবিন্দ" গ্রন্থ এখনও বর্তমান আছে।

পূর্বোল্লিখিত পুস্তকগুলি ব্যবস্থাগ্রন্থ, এবং শেষোক্ত গ্রন্থখানি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমগীতি। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সামাজিক কোন কথাই দেখা যায় না। তবে কি এই সকল বিষয় জানিবার উপায় নাই? সেন-রাজগণের কি কোন ধর্মচর্চা, সমাজ, রাজনীতি ছিল না? এই সকলের আলোচনা করিতে হইলেই, প্রাচীনকালের সমাজ, ধর্মনীতি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা কর্তব্য। পাঠকদিগের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র বাকলার ইতিহাসে অত আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, প্রাচীন হিন্দুগণের আচার ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের এই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

বর্তমান কালের হিন্দুসমাজেরও কোন কোন আচার ব্যবহার, রীতিনীতির প্রতি একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, প্রাচীন রীতিনীতির সামান্য আভাষ পাওয়া যায়। তাই আমরা প্রাচীন কালের কথা বলিতে চেষ্টা করিব। অভিজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা হইলে ত্যাগ করিতে পারেন।

আর্য মুনিঋষিগণ, কাল এবং যুগানুসারে মানব ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তৎকালীন মানব হৃদয়ের ধর্মাধর্ম, লোভালোভের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সামাজিক নিয়ম প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে। অতি পুরাকালে পঞ্চনদতীরে যখন প্রাচীন আর্য ঋষিগণ সামগানে জগৎ বিমোহিত করিতেন, তখন ভারতে কোন সমাজ বন্ধন, বর্ণ, অথবা জাতিভেদ ছিল না।[২] তখন সর্বত্র সরলতা, ন্যায়পরায়ণতা, পবিত্রতা প্রভৃতি বিরাজ করিত। তারপর যখন প্রজাবৃদ্ধি হইয়া ব্রহ্মাবর্ত অতিক্রম করিয়া আর্যাবর্ত প্রভৃতি স্থানে আর্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন তখন সেই সরলতার রাজ্যে পাপপুরুষ তীব্র কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। মহামনস্বী আর্য ঋষিগণ, তখন সমাজ বন্ধনেব আবশ্যকতা বুঝিলেন। কাজেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি পৃথক করা হইল। সেই সময় হইতেই জাতিভেদের সূচনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে তাহা সমাজে বদ্ধমূল হইল। প্রকৃতপক্ষে পদ্মযোনি ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র সৃষ্টি হইয়াছে, একথা বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশ্বাস করিতে বড় রাজি হন না। তাঁহারা এই শাস্ত্রোক্তিকে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহা রূপক অথবা প্রকৃত কিনা, এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে আমাদের পৌরাণিক শাস্ত্রাদিতে ত্রেতাযুগের সময় হইতেই জাতিবিভাগের উল্লেখ দেখা যায়। যুগভেদে মানবচরিত্রের ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ করিল; আর্য ঋষিগণও তদনুযায়ী সামাজিক নিয়ম, ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করিলেন। যাঁহারা জপ, তপ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি রোধ পূর্বক ঈশ্বরোপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ হইলেন। বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষা করিতে যাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; শস্যোৎপাদন এবং বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ বৈশ্য এবং এই তিন জাতির সেবার জন্য যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে এই বর্ণ চতুষ্টয়েব ধর্ম, সমাজ, ব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ যে সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ না হইলেও কতক কতক বর্তমান হিন্দু সমাজে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে।

মন্বত্রি প্রভৃতি বিংশতি ঋষি ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা। এই মুনিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়া তৎকালীন সমাজানুসারে করণীয় কার্য প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সত্যযুগেব আচরণ যাহা ছিল, ত্রেতায় তাহার আংশিক পরিবর্তন হইল। তদ্রূপ দ্বাপর এবং কলিযুগেও পরিবর্তন ঘটিল। কারণ এই বিরাট বিশ্বসংসার নিয়ত পরিবর্তনশীল; ব্রহ্মাণ্ডস্থিত অণুপ্রমাণ পদার্থেরও নিত্য পরিবর্তন ঘটিতেছে; ইহা স্বাভাবিক, এবং ইহাই বিশ্বস্রষ্টার অলঙ্ঘ্য নিয়ম। যখন সকলই পরিবর্তনশীল, তখন সমাজের পরিবর্তন কেন হইবে না? তাই জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ দেখাইতে চেষ্টা করিব। বৈদিক যুগে বিবাহের কোন নামোল্লেখ, অথবা নিয়মের কথা দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন ইহাতে সমাজের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, তখন বিবাহ-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইল। পূর্বে আর্য সন্তানগণ মদ্য[৩] এবং গোমাংস[৪] ভক্ষণ করিতেন। পরবর্তী ঋষিগণ যখন ইহার অপকারিতা বুঝিতে পারিলেন,

তখন ইহার ভূয়ো ভূয়ো দোষোল্লেখ করিয়া এই প্রথা সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়া দিলেন। কলিযুগের প্রারম্ভেও পুরাণাদিতে আমরা ব্রাহ্মণকে অন্য বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। পরে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন যে দোষ ঘটিতে আরম্ভ করিল তাহা দেখিয়া শাস্ত্রকারগণ তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ বিভিন্ন সময়ের শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। অধিক বলিতে কি, কলিযুগের প্রারম্ভে চতুর্বর্ণের যে সমস্ত আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি ছিল, তাহারও কোন কোন অংশ কাল সহকারে পরিবর্তিত হইয়াছে। একটু গবেষণা করিয়া দেখিলে বোধহয় প্রতীয়মান হইবে যে ইংরাজ অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় আমাদের সমাজ বন্ধন যেরূপ ছিল, বর্তমান সময়ে তাহা শিথিল হইয়াছে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, আমাদের এই বাংলা রাজ্য বঙ্গেশ্বর সেনরাজগণের অধীন ছিল। তাই গৌড়েশ্বরের সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বাংলার কতকটা বুঝিতে পারা যাইতে পারে। সাড়ে সাতশত বৎসরের সমাজনীতি পবিশুদ্ধ ভাবে সঙ্কলন করাও দুরূহ; তবে, তৎকালীন যে কয়েকখানি ব্যবস্থা গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের উপর মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়া যতদূর সম্ভব বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ব্রাহ্মণ লইয়াই আমাদের হিন্দুসমাজ, এবং সাধু ব্রাহ্মণই আমাদের সমাজের অস্থিমজ্জা। এই ব্রাহ্মণগণকে আচারভ্রষ্ট দেখিয়া অম্বষ্ঠকুলপ্রদীপ সম্ভূত মহারাজ আদিশূর[৫] ৯৯৯ সম্বৎ অর্থাৎ ৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্বক আরব্ধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্বে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন ছিল। মহারাজ আদিশূর হিন্দুসমাজ পুনঃ গঠনের অভিপ্রায়ে এই ব্রাহ্মণগণের সহিত অস্মদ্দেশীয় শ্রেত্রীয় ব্রাহ্মণ কন্যাগণেব পরিণয় সম্পাদন করিয়া, তাঁহাদের বঙ্গদেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন। বর্তমান কুলীন ব্রাহ্মণগণ, তাঁহাদেরই বংশোদ্ভূত। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও মহারাজ আদিশূর পূর্বে যেমনটি ছিল, তেমনটি করিতে পারিলেন না। মহারাজ আদিশূরের তিরোধানের পর তদ্বংশীয় কন্যাগর্ভজাত মহারাজ বল্লালসেন আদিম ব্রাহ্মণ এবং কান্যকুব্জজাত ব্রাহ্মণগণের সন্তান সন্ততিগণের আচার, ব্যবহার, ধর্ম প্রভৃতির পরীক্ষা করিয়া যাঁহারা হীনাচারী, তাঁহারা মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সময় হইতেই কুলীন ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি হইল। বল্লালসেন যে কেবল ব্রাহ্মণগণের কুলমর্যাদা প্রদান করিলেন, তাহা নহে, বৈদ্যকায়স্থাদি অন্যান্য প্রায় সমস্ত জাতিকে এই প্রকার পরীক্ষা করিয়া আচারানুসারে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করিলেন।[৬] সেনরাজগণ কর্তৃক এই প্রকাব সমাজ গঠিত হইবার পর হইতেই ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতি সমূহ সদাচারী হইতে যত্নবান হইলেন। ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বেদমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন; কিন্তু বৈদিক যুগের মত তাঁহারা ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন; তবে পাঠ সমাপন না করিয়া কেহই বিবাহ করিতেন না। বেদাভ্যাসেব সঙ্গে সঙ্গে কেহ কেহ বা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুদেবের অনুমতিক্রমে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক যথাশাস্ত্র বিবাহিত হইয়া পাঠোপযোগী ব্যবসা করিতেন। নিতান্ত অর্থাভাব না হইলে কেহ ব্রাহ্মণেতর ব্যবসা গ্রহণ করিতেন না।[৭]

শাস্ত্র পারদর্শী সুযোগ্য ব্রাহ্মণরাজার নিকট হইতে ভূমিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিত মনে বিদ্যালোচনা করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। একটু পরিণত বয়সে কোন কোন ধার্মিক ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতেন। ইহাই তৎকালীন ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক নিয়ম, এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্তানের অবশ্য কর্তব্য ছিল। অন্যথা তাঁহারা সমাজে পতিত হইতেন এবং অন্য কোন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের অন্নস্পর্শ করিতেন না। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণই যে সাধু, বিদ্বান এবং সত্যব্রত ছিলেন, তাহা নহে, তবে বর্তমান ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সন্তান যে প্রকার নবালোকে আলোকিত হইতেছেন, তৎকালে সেরূপ ছিল না। কদাচিৎ কেহ আচারভ্রষ্ট হইলে তাহাকে সামাজিক বিচারালয়ে কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হইত। বর্তমান সভ্যসমাজে সেন রাজগণের জাতিবিচার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। 'সেন' উপাধি হেতু বৈদ্যসন্তানগণ, সেনরাজগণকে বৈদ্য

বলিতেছেন, এবং মিশ্রীগ্রন্থ, কুলপঞ্জিকা, অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকা প্রভৃতি হইতে নানাবিধ শ্লোক বা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের সত্যতা প্রমাণ করিতেছেন। কায়স্থগণও সেন রাজগণকে তাঁহাদের দলে আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

বিশ্বকোষ প্রণেতা শ্রদ্ধেয় বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, তাঁহার 'বিশ্বকোষ' মধ্যে সেনরাজগণকে স্পষ্টই কায়স্থ বলিয়াছেন। অধিকন্তু, তিনি বাকলার কায়স্থ রাজ্যস্থাপয়িতা রামনাথ দনুজমর্দন দে কে গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের প্রপৌত্র বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।[৮]

চন্দ্রদ্বীপের স্থাপয়িতা রামনাথ দনুজমর্দনের সহিত রাজা লক্ষ্মণসেনের কোন সম্বন্ধ আছে কি না আমরা এই সম্বন্ধে যতটুকু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা চন্দ্রদ্বীপ পরগনার ইতিবৃত্তে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

সেনরাজগণ প্রদত্ত যে কয়েকখানি তাম্রশাসন দেখা যায়, তাহাতে তাঁহাদের "সোমবংশপ্রদীপ" "ওষধিনামবংশ" বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাই। ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যেই সূর্য এবং চন্দ্রবংশের উল্লেখ আছে। অন্য কোন জাতিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত ঐতিহাসিকগণ বল্লালাদি নৃপবৃন্দকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিতে অভিলাষী। কিন্তু দেবীবরের সমকালীন চট্টোপাধ্যায় নুলোপঞ্চানন আপন গোষ্ঠীকথায় লিখিয়া গিয়াছেন :—

একদিন রাজা (বল্লাল) জিজ্ঞাসিল পঞ্চ গোত্রীয়ে।
মহাবংশ কুলীন আর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে।।
কহ সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত।
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্যে ছিলে পুরোহিত।।
উত্তরিল মহেশাদি যতেক সুকৃত।
নিত্য যাজ্যে রত নহি নৈমিত্তিকে ব্রতী।।
অস্ত হল দশকর্মা, শ্রাদ্ধে পিণ্ডভোজী।
দ্বিজের স্থণ্ডিলে ঋত্বিক, নহি শূদ্রযাজী।।
আদিশূর রাজা বৈদ্য বৈশ্যে তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি।।
ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্তি।
সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি।।
রাজা হলে রাজন্য সে না ভাবে অন্যথা।
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা।।
ভূপাল, অনঙ্গপাল, আর মহীপাল।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র নহে, রাজন্য প্রবল।।
তারাও বিভা করিত তিন জাতি মেয়ে।
ব্রাহ্মণ পুরোধা সাত শতী দেখ চেয়ে।।
তাই তারা ক্রিয়া কাণ্ডে বেদ জ্ঞানহীন।
যাজক, পিণ্ডভোজী, প্রথা ত অপ্রাচীন।।
বল্লাল লয়, যবে পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথা ত দেখিনা।।
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে।।
ইথে উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃষলেগণ্য অত্রত্য তত্রত্য।।

তাই কান্যকুব্জ বৈদ্য যাজন না করে।
পূর্বেও ত অগ্ন্যাধানে স্বধামাত্র ধরে।।

* * *

বেদিল রাজা মম পূর্ব পিতমহে।
দ্য হলেও রাজন্য আচরণে রহে।।

* * *

বৈদ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্যে মাতৃ ব্যবহার।।

এখন দেখা যাক, এই প্রবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তম্মধ্যে তপনদিঘি, সুন্দরবন এবং আনুলিয়ার শাসনে তিনি "রাজন্য ধর্মাশ্রয়" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। যথা—

সম্ভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণগুণা ভোগপ্রলোভাদ্দিশা,
মীশৈরংশ সমর্পণেন ঘটিতস্তৎতৎ প্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুক্ষ্মক্ষপিতরি সঙ্গররসো রাজন্য ধর্মাশ্রয়ঃ,
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাহজনি।।

বল্লালসেন নিজগ্রন্থ মধ্যে আত্মপরিচয়দানস্থলে, "ক্ষত্রচারিত্রচর্যা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৭] তাঁহারা জাতিতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয় হইলে "রাজন্য ধর্মাশ্রয়" এবং "ক্ষত্রচারিত্রচর্যা" কেন বলিতে যাইবেন। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে তাঁহারা বস্তুত রাজন্য বা ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজন্যধর্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয় না হইলেও রাজ্যশাসনাদি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যকার্য সম্পাদন করিতেন। তাম্রশাসনগুলিতে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে সেনবংশপ্রভব বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন যথা, "তস্মিন্ সেনান্ববায়ে" "সুজ্জেহি সেনান্বয়ঃ" "সেনকুলকমল-বিকাশভাস্কর"। বঙ্গদেশে বৈদ্য, কায়স্থ, নবশায়ক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েতর জাতিসমূহের মধ্যেই "সেন" উপাধি পরিদৃষ্ট হয়।

সেনরাজগণ আদিশূরবংশীয় অম্বষ্ঠ নরপতিগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতেন, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহারাজ বল্লালসেনের জননী অম্বষ্ঠকন্যা ছিলেন। লঘু ভারতকার লিখিয়াছেন :—

আদিশূরাৎ কুলেজাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরে।
কনকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না শ্রীশ্রীরিবশুভা।।
বেদোহি তদ্বচঃ শ্রুত্বা তাং কন্যাং স উদূববান্
কালে তদগর্ভতো জাতো বল্লালসেন ভূপতিঃ।।

আমরা মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থেও দেখিতে পাই যে, সেনরাজগণ বৈদ্যজাতির সহিত বৈবাহিক ক্রিয়াদি নির্বাহ করিতেন যথা :—

ধরাধরসুতো জাতো নিত্যানন্দ ইতি স্মৃতঃ।
বল্লালসেনদৌহিত্রঃ সেনভূপস্য সত্ততৌ।।—১৮৯ পৃঃ, চন্দ্রপ্রভা।
সুতৌ জাতবিসেনস্য জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ।
সূর্য্যসেনস্তদীয়াদ্যঃ কনিষ্ঠো বিজয়াহ্বয়ঃ।।
রাজ্ঞঃ কেশবসেনস্য তনয়াগর্ভসম্ভবৌ।।—২২২ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।
ত্রয়ো মণ্ডলদাশস্য পুত্রা উদ্ধরণোহগ্রজঃ।
বল্লালসেননৃপতে স্তনুজাগর্ভসম্ভবঃ।।—৩১৯ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

সুতৌ মন্মথদাশস্যাচ্যুত শ্রীমন্তদাশকৌ।
সেনভূপকুলোদ্ভূত সেনলক্ষ্মণসূনুজৌ।।—৩৬৪ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।
শ্রীপতেস্তনয়া জাতা জ্যেষ্ঠো গদাধরঃ কৃতী।
সাগরো ভগিগুপ্তোহমী ভূপকেশব সূনুজাঃ।।—৪৪২ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

অতএব বল্লালাদি নরপতিবৃন্দ বৈদ্যবংশাবতংস বলিয়া বঙ্গদেশে পাঠান যুগ হইতে ব্রাহ্মণ[১০] বৈদ্য[১১] কায়স্থ[১২] এবং সুবর্ণ বণিক সমাজে[১৩] যে প্রাচীন কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না।

তবে সেনরাজগণ ক্ষত্রিয়, বৈদ্য অথবা যে জাতিই হউন না কেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহারা যে ক্ষত্রজনোচিত সমস্তকার্য, রাজ্যশাসন প্রভৃতি করিতেন, তাম্রশাসন লিখিত কবিতাগুলিই তাহারা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাকলার কায়স্থ রাজগণের মধ্যে অনেকের বীরত্বকাহিনী শুনা যায়; মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র, উদয়নারায়ণ প্রভৃতির বাহুবল, শস্ত্রবিদ্যা বিশেষ প্রশংসার্হ। বঙ্গের সেনরাজগণের অধীনে যতগুলি জনপদ ছিল, সমস্তই গৌড়েশ্বরের আচার এবং নিয়মাদিতে পরিচালিত হইত।

বঙ্গদেশের হিন্দুরাজত্ব সময় হইতেই এইদেশে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। দুই একজন থাকিলে তাহাও বিরল। প্রাচীন বাকলায় বঙ্গজ যে সমস্ত জাতি ছিলেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থই প্রধান। নবশায়ক এবং অন্যান্য জাতিও যথেষ্ট ছিল, এবং যিনি প্রধান তিনিই সমাজপতি ছিলেন। সর্বোপরি রাজা নেতা ছিলেন। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে রাজা তাহার সুবিচার করিয়া দিতেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কায়স্থরাজাকেও ক্ষত্রিয়বৎ আচার ব্যবহার করিতে হইত। ব্রাহ্মণগণ বহুকাল পর্যন্ত যথা৮.:ী ছিলেন। রাজকার্যেও তাঁহাদের উপদেশ শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা বলিয়া পরিগৃহীত হইত।

বঙ্গীয় লেখক কুলচূড়ামণি স্বর্গীয় রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর যথার্থই লিখিয়াছেন যে বঙ্গীয় কুলললনাগণ রমণীরত্ন। প্রাচীনকালের হিন্দুললনাগণের আচার, ব্যবহার, গৃহকার্য প্রভৃতির সঙ্গে বর্তমান সময়ের পর্যালোচনা করিলে হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ এবং বিষাদ উপস্থিত হয়। এখনও যাহা আছে, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। হিন্দুসমাজে পরগৃহ অলঙ্কৃত ও পরের সঙ্গে দেহপ্রাণ মিশাইয়া অক্ষয়.ধর্ম এবং কীর্তি উপার্জন করিতেই যেন নারীজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তাই জননী, শৈশব হইতেই দুহিতাকে সেইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। সম্ভবত এই সমস্ত শিক্ষালাভের জন্যই কুমারী অবস্থায় নারীজাতির কতগুলি ব্রত নিয়ম পালনের প্রথা হইয়াছে। অতি প্রত্যুষে গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া বালিকা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে, এবং নিজেই সমবয়স্কাসহ মিলিতা হইয়া এই সমস্ত ব্রতাদি নির্বাহ করিয়া থাকে। একটু বড় হইলে জননী তখন গৃহকার্যশিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালোপযোগী আর কয়েকটি ব্রতে ব্রতী করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ব্রত, শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর, দেবর প্রভৃতির প্রতি ভক্তি, স্নেহ, প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষাপোযোগী সুন্দর উদাহরণপূর্ণ গল্পে পরিপূর্ণ।[১৪] বাল্যকাল হইতেই এইরূপ সৎশিক্ষায় সুশিক্ষিতা হইয়া, কুমারী যখন বিবাহিতা হয় তখন গৃহকার্য সম্বন্ধে তাহার অন্য কোন শিক্ষার বিশেষ দরকার হয় না। এইপ্রকার নববধূর আগমনে সেই গৃহ, সুখশান্তি এবং ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়।

হিন্দু রমণীদিগের স্বামীই সর্বস্ব; ইহকাল পরকালের একমাত্র নিয়ন্তা। তাই তাঁহার বিবাহের দিন হইতেই অতি গোপনে, মনে মনে তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। স্বামী যদি রুগ্ন, কদাকার, দরিদ্র, অথবা কটুভাষী হন, হিন্দুরমণীর পক্ষে তথাপি তিনি জীবন সর্বস্ব;[১৫] স্ত্রী কায়মনোবাক্যে তাহারই পদ সেবাকারিণী দাসী। আজকাল যেমন আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা সকল সময়ে যথেচ্ছভাবে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ এবং আলাপ করিয়া থাকেন, আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে তাহা ছিল না। দিবাভাগে স্বামী কদাচিৎ স্ত্রীর দর্শন পাইতেন। তৎকালে স্ত্রীলোকের এরূপ একটা ধারণা ছিল যে, স্বামী, দিবাভাগে স্ত্রীমুখ দেখিলে, উভয়ই ভাগ্যহীন হয়।

তাই, স্ত্রী পুরুষ উভয়ই সতর্ক থাকিতেন। যাবতীয় গৃহকার্য নির্বাহ করিয়া রমণী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও ভাসুর প্রভৃতিকে আহার করাইতেন; তৎপর স্বামীর আহার হইলে সেই উৎসৃষ্ট পাত্রে আপনি ভোজন করিতেন। কিন্তু সকলের আহারের পূর্বে অতিথি, ব্রাহ্মণ, রুগ্ন এবং বালক বালিকাগণকে আহার প্রদান এবং সেবা শুশ্রূষা করিতে হইত। প্রাচীন হিন্দুগণ জানিতেন যে অতিথি দেবতা স্বরূপ। হিন্দুগণ, স্বয়ং উপবাসী থাকিয়াও অতিথিসেবা পরম ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন।[১৬] রাত্রিতে সকল গৃহকার্য সমাপ্ত করিয়া, স্ত্রী স্বামী সন্দর্শনে যাইতেন। স্বামী শয্যায় শয়ান থাকিলে, স্ত্রী তাহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া শয্যায় গমন করিতেন। স্বামীর সুষুপ্তি না হইলে স্ত্রী কখনও নিদ্রিতা হইতেন না। বর্তমান কালের বঙ্গকুলললনাদের, গৃহকার্য, পরিবারবর্গের সেবা, স্বামীর প্রতি প্রেম প্রভৃতির সঙ্গে পূর্ব সময়ের তুলনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ জ্ঞান হয়। এখন যে আদর্শ বঙ্গ রমণী নাই তাহা নহে; তবে পূর্বকালের ন্যায় পাওয়া দুরূহ। এখনকার অনেক রমণী পাশ্চাত্যধরনের শিক্ষিতা, গৃহকার্য, রন্ধন, সংস্থান প্রতিপালন প্রভৃতির বড় ধার ধারেন না। যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, তাঁহারা চাকর চাকরাণী অথবা পরিবারস্থ বৃদ্ধাগণের প্রতি গৃহকার্য, সন্তানরক্ষা ভারার্পণ করিয়া নাটক, উপন্যাস, অথবা উলপ্যাটার্ন লইয়া বসেন; কখনও কখনও বা, পাঁচজন মিলিয়া তাস অথবা অন্যান্য অকিঞ্চিৎকর খেলা খেলিয়া, অথবা মিথ্যা গল্প গুজব করিয়া সময়াতিবাহিত করেন। বর্তমান সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার মধ্যে কেহ কেহ হয়ত স্বামীকে উপন্যাসের নায়কের ন্যায় জ্ঞান করিয়া 'তিলোত্তমা' 'কুন্দ' 'মৃণালিনী' প্রভৃতির ন্যায় ভালবাসিয়া থাকেন। স্বামীর প্রতি এরূপ ভালবাসা যদি ভক্তি মিশ্রিত হয় তবে তাহা অপার্থিব। কিন্তু পুরাকালের রমণীর প্রতি-প্রেম, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় হৃদয়াভ্যন্তরীণ অস্থিপঞ্জরে স্বামীর পবিত্র মূর্তির সহিত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল থাকিত। তৎকালে 'হে প্রাণনাথ' 'হে জীবন সর্বস্ব' এই সকল সম্বোধন খুব বিরল ছিল। স্ত্রী নীরবে হৃদয়ের গুপ্তমন্দির মধ্যে স্বামীর মূর্তি অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দ্বারা সর্বদা অর্চনা করিতেন। কিন্তু সকলেই যে তৎকালে সতী সাবিত্রী ছিলেন তাহা নহে। সুগন্ধ পুষ্পোদ্যানে দুই একটি কণ্টকী বৃক্ষও দৃষ্ট হয়। কুলটা, অপ্রিয়ভাষিণীও যে না মিলিত তাহা নহে, তবে তৎকালীন সমাজের কঠোর শাসনভয়েই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক এরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব অল্পই দেখা যাইত। দৈবাৎ কোন পরিবারে এইরূপ কোন কুলটা রমণী দৃষ্ট হইলে, তাঁহাদের চিরদিনের তরে সমাজ অথবা জাতিচ্যুত হইয়া থাকিতে হইত। বিধবাবিবাহ কোন কোন শাস্ত্রানুমোদিত[১৭] হইলেও তৎকালীন সমাজে তাহা প্রচলিত ছিল না; পরন্তু ইহা অতীব ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইত। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং ভদ্রকায়স্থ জাতির বিধবাগণ, যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য প্রতি-পালন করিতেন। কিন্তু শূদ্রাদি অন্ত্যজ জাতি, বেশভূষা সম্বন্ধে বৈধ আচরণ করিলেও আহারাদি সম্বন্ধে সধবার ন্যায় আচরণ করিত। বর্তমান সময়েও ইতর-হিন্দুজাতির মধ্যে এই নিয়ম বিদ্যমান আছে। পুরাকালে অস্মদ্দেশে ইতর জাতির মধ্যে দুই একটা বিধবা বিবাহের কথা শুনা যায় কিন্তু তাহারও কোন প্রমাণ নাই। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ, তাঁহাদের প্রণীত অনেক ধর্মগ্রন্থে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বহুতর যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। ঋগ্বেদে ইহার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। মৃত স্বামীর পার্শ্ববর্তিনী রোরুদ্যমানা রমণীকে কোন আত্মীয় হস্ত ধারণ পূর্বক উত্তোলন করিয়া বলিবে যে, হে রমণী! তুমি মৃতের জন্য আর শোক করিও না, যিনি এখন তোমাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ কর এবং সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সুখভোগ কর।[১৮]

বিষ্ণুসংহিতায় সন্তানবতী বিধবার পত্যন্তরগ্রহণে নিষেধ আছে, কিন্তু বালবিধবার পুনঃপত্যন্তর গ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখ দেখা যায়। পরাশরসংহিতায় বিধবা বিবাহের অনুকূলে একটিমাত্র বচন দেখিতে পাই। সম্ভবত সমাজের বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ সন্তানের পিতৃনির্ণয়, উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ প্রভৃতি উপস্থিত দেখিয়া বিধবা বিবাহ সমাজ হইতে দূরীভূত হইয়াছে। এই নিয়ম রহিত হওয়াতে বর্তমান সমাজের কোন কোন বিষয়ে যেমন সুবিধা হইয়াছে,

তেমন অন্যপক্ষে ঘোরতর পাপস্রোতও বৃদ্ধি হইতেছে। ইতরজাতির এবং ভিন্নদেশের বিবাহ বন্ধন ঐহিক সুখ সম্পদপ্রদ বলিয়া বোধ হয়; কেননা বর্তমান সভ্যসমাজে এবং বিচার আদালতে আমরা "বিবাহের চুক্তিভঙ্গ" সূচক মোকদ্দমা (Divorce Suit) অনেক দেখিতে পাই। হিন্দুজাতি, বর্তমান সময়ে হীন, দুর্বল এবং পরপদলেহী হইলেও, তাঁহাদের সমাজবন্ধন, ধর্মনীতি প্রভৃতি এখনও এত দৃঢ় এবং একতাবদ্ধ যে তাহা শীঘ্র ছিন্ন হইবার সম্ভব নাই। তাহাদের বৈবাহিক ধর্ম এবং তন্নিবন্ধন আচার সম্বন্ধে বিদেশির অনেক বিষয় লিখিবার আছে। হিন্দুগণ বিবাহকে ঐহিক সুখপ্রদ মনে করেন না, পরন্তু ইহাকে অক্ষয় ধর্মোপার্জনের পথ বলিয়া মনে করিয়াছেন। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ জীবনে মরণে তুল্য ভাবেই বর্তমান থাকে। উভয়ের দেহ ভিন্ন হইলেও আত্মা এক হইয়া যায়; তাই হিন্দুগণ স্ত্রীকে সহধর্মিণী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এক বৃন্তে দুইটি ফুলের মত, তাহারা এই সংসারোদ্যানে ফুটিয়া থাকে। বিশাল সহকার বেষ্টিত, ক্ষুদ্রাবল্লরীর ন্যায়, হিন্দুরমণী স্বামীকে বেষ্টন করিয়া, তদাশ্রয়েই বাঁচিয়া থাকেন। ভীষণ প্রবাহে মহামহীরুহ ধরাশয়ী হইলে, ক্ষুদ্রাব্রততী যেরূপ আপনা হইতেই নীরবে শুকাইয়া যায়; স্বামীর চিরবিরহে, সতীর পক্ষে জীবন ধারণও তদ্রূপ একান্ত অসহনীয়; তাই বোধহয় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সহমরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন।[১৯] হিন্দুরমণী বিধবা হইলে তিনি শত পুত্রবতী এবং জগতের সম্রাজ্ঞী হইলেও হতভাগিনী। প্রতিদিন তিল তিল পরিমাণে তাহার শরীর ক্ষয় হইতে থাকে। স্বামীর স্বর্গগমন হইতেই সতীর আত্মা তৎসহ গমন করে; অস্থিমাংসাবশেষ দেহমাত্র পড়িয়া থাকে। সহমরণ, রমণীগণের পরম ধর্ম, কারণ ইহকালে এবং পরকালে তিনি স্বামীর সেবাকারিণী দাসী; স্বামী যেখানে যাইবেন তিনিও সেইখানে ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হইবেন, ইহাই শাস্ত্রোক্তি এবং ইহাই তাঁহাদের পরম বিশ্বাস। তাই সতীনারী সহাস্যবদনে স্বামী সহগামিনী হইতেন।

লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বর্তমান বাকরগঞ্জ জেলাস্থ অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং ভদ্র কায়স্থ সতীগণ সহমরণ গিয়াছেন; তৎকালে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে ভদ্র পরিবারের সীমন্তিনীগণ মধ্যে অনেকেই স্বামী সহগামিনী হইতেন।

বর্তমান সময়ে যেমন বিবাহ সম্বন্ধে বর কন্যার বয়স এবং কালাকাল বিচার নাই, আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সেই সময় তজ্জন্য বিশেষ বিধান ছিল। পুরুষ ত্রিংশ এবং স্ত্রীলোক দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম না করিলে, বিবাহিত হইতেন না।[২০] তাই উপযুক্ত বয়সে সন্তান হইলে, সেই সন্তান নীরোগ এবং দীর্ঘজীবী হইত। সেই নিয়ম এখন প্রচলিত থাকিলে, বাঙ্গালি এরূপ দুর্বল, ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। অতি কুক্ষণেই আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আমরা শাস্ত্রার্থ ভিন্নভাবে বুঝিয়া, "গৌরী" "রোহিণী" দান করিতে সর্বস্বান্ত হইয়া থাকি। এখন বালকের ষোড়শ অথবা কিঞ্চিদধিক বয়স হইলেই পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন একটি "গৌরী" অথবা "রোহিণী" আনিয়া তাঁহাকে উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ চিরকালের তরে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথে কন্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন। এই উদ্বাহ বৃক্ষে যে বিষময় ফল প্রসূত হইতেছে, বর্তমান সমাজই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

আজকাল যেমন পুত্রকন্যার উদ্বাহ ক্রিয়া লইয়া যুগ প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে, তৎকালে তাহা ছিল না। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান এখন কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকেন; কেহ কেহ বা এই প্রকার বিবাহের জন্য সর্বস্বান্ত হইতেছেন; প্রাচীনকালে এদেশে এরূপ রীতির কথা শুনা যায় না। "শুল্ক বিক্রয়' মহা পাপ; যে করে তাহার চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হয়।[২১]

. এই মহাপাপজনক কার্য অতি কুক্ষণেই আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। তৎকালে যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইভাবে যথাশাস্ত্র কন্যা সম্প্রদান করিতেন। কৌলীন্য প্রথা এই দেশে প্রচলিত হইবার পর হইতেই এই জঘন্য প্রথা প্রবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে কন্যা বিক্রয় যত অধিক দেখা যায়, অন্যান্য জাতি তত্তুলনায় অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। ইদানীং ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সম্মতি আইন (age of consent act) বিধিবদ্ধ করিয়া অস্মদ্দেশের মহোপকার

করিয়াছেন, তদ্রূপ উল্লিখিত কুপ্রথা রহিতের কোন নিয়ম অবধারিত করিলে, বর্তমান সমাজের মহদুপকার সাধিত হইত।

তৎকালে বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল; কিন্তু তা বলিয়া কেহ ইচ্ছা পূর্বক একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতেন না। স্ত্রী রুগ্না, গৃহকার্যে অশক্তা, কিম্বা বন্ধ্যা হইলে স্ত্রীর অনুমত্যানুসারে অন্য পত্নী গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ সমাজে 'মেলবন্দী' হইলে অনেক ব্রাহ্মণের বাধ্য হইয়া বহু বিবাহ করিতে হইত। এই কুপ্রথা বশত ব্রাহ্মণ সমাজে অহরহ যে কত কুকাণ্ডের অভিনয় হইতেছে তাহা বর্ণনা করা দূরে থাক, স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

অস্মদেশীয় হিন্দুসমাজ তৎকালে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক সম্প্রদায় শক্ত্যুপাসক ও অপর বৈষ্ণব ছিলেন।[২২] এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় বর্তমান "বৈরাগী" নহেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু শত বৎসর পূর্বে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময় হইতেই পুরাণোক্ত বৈষ্ণব ধর্ম অস্মদ্দেশে প্রচলিত ছিল; এবং বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি এই পবিত্র ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তন্ত্রোক্ত সাধনকার্যে এবং "পঞ্চমকারে" অস্মদ্দেশীয় শাক্তগণ বিশেষ তৎপর ছিলেন। অনেকে এই উপায়ে সিদ্ধ হইয়াছিলেন এরূপ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

বিকৃত মস্তিষ্ক এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের হাতে পরম পবিত্র তন্ত্রশাস্ত্র বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছে। তাই অনেকে ইহাকে অশ্লীল বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে এই ভ্রম সহজেই অপনীত হইয়া থাকে।

তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালী সাধকের নিকট বড় অল্পায়াসে সিদ্ধ; ইন্দ্রিয় দমনপূর্বক কি প্রকার শুচি হইয়া ভগবচ্চিন্তা করিতে হয়, তন্ত্র তাহার পথ অতি সহজ করিয়া দিয়াছে। মুসলমানাক্রমণের পূর্বে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ব্যতীত, অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর পরিচয় পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণগণ যেমন যজন, যাজন, এবং অধ্যাপনা করিতেন, সেইরূপ তদিতর জাতি সমূহও স্বীয় স্বীয় জাতীয় ব্যবসা করিতেন। বৈদ্যগণ, চিকিৎসা এবং আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা, লিপিবৃত্তি এবং অন্যান্য অসবর্ণ জাতি আপন আপন জাতীয় ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। মুসলমানাক্রমণের বহুশত বৎসর পর পর্যন্তও এই নিয়ম এদেশে প্রচলিত ছিল। মহাকবি বিজয় গুপ্ত তাঁহার পদ্মপুরাণে এই সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল।।
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের সুর।
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর।।

আজকাল যেমন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং অন্যান্যজাতি সমূহ, ইচ্ছানুসারে জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিতেছেন, তৎকালে তাহা ছিল না; কেহ নিতান্ত দায় না পড়িলে, অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিতেন না। কার্যোপলক্ষে অথবা ইচ্ছানুসারে কোন উচ্চ জাতীয় ব্যক্তি তদিতর জাতীয় কাহারও বাটিতে গমন করিলে, তিনি স্বীয় মর্যাদানুসারে অভ্যর্থিত হইতেন; সেইরূপ নীচ জাতিরও উচ্চ জাতিদের নিকট উপযুক্ত আদর লাভ হইত।

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির গার্হ্যস্থ জীবনের প্রধানগুণ ভাসিয়া গিয়াছে। একটু বর্ষীয়ান পাঠককে বোধ হয় ইহা বলিতে হইবে না যে এই প্রধান গুণের নাম রন্ধন। তৎকালে রানীতুল্যা রমণীকেও মধ্যে মধ্যে পাকশালার কার্য করিতে হইত। শত সহস্র কিঙ্করকিঙ্করীসেবিতা হিন্দুরমণীও অন্তত পক্ষে স্বামী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গের জন্য স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। আজকাল যেমন "পাকপ্রণালী" "পাকবাজেশ্বর" না হইলে আমাদের কুললক্ষ্মীগণ সামান্য ডাল, সুক্তা প্রভৃতি পাক করিতে পারেন না, পাকা উনানে 'হিট্‌গজ' (heat ganze) না হইলে জ্বাল বুঝিতে পারেন না, তৎকালে এ সকল কিছুই ছিল না। সুক্তা হইতে মাংস, পিষ্টক, পরমান্ন প্রভৃতি আমাদের পূর্ববর্তী রমণীগণ, বিনা ক্লেশে বিনা উপদেশে স্বহস্তে অপূর্ব রন্ধন

করিতেন। কোন গ্রামে কোন বৃহৎ নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে, দুই তিনজন স্ত্রীলোক রন্ধনশালার যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিতেন, একটু বর্ষীয়সী হইলে নিজেরাই পরিবেশন করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের ক্ষমতা এবং গুণানুসারে প্রশংসা হইত। তাঁহারাও অদম্য উৎসাহে প্রাণভরা আহ্লাদে এই সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতেন। কারণ হিন্দুরমণী জানিতেন যে পর্যাপ্ত ভোজন করাইয়া কাহাকেও তৃপ্ত করিতে পারিলে দেবতা পূজার ফল লাভ হয়। বর্তমান সময়ে দুই তিন গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়াও এই প্রকার দুই একটি রমণী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

ভূম্যধিকারীগণ যে স্থানে বাস করিতেন, তাহার চতুষ্পার্শে ব্রাহ্ম ।, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি নিত্যাবশ্যকীয় জাতি বাস করিত এবং সকলেই সেই ভূম্যধিকারীর আশ্রিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিপালিত হইত। এইরূপ বসতিস্থান "খানাবাড়ি" বলিয়া অভিহিত হইত। এখনও অস্মদ্দেশে বহু পুরাণ ভূম্যধিকারীগণের বসতবাড়ির চতুষ্পার্শ্বেই একরূপ খানাবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক দেবার্চনা এবং অন্যান্য যাবতীয় গৃহকার্য নির্বাহ হইত; তাহারা পুরুষানুক্রমে কেবলমাত্র ভূমিবৃত্তি ভোগ করিত।

বৈষ্ণব এবং শাক্তদিগের যতগুলি দেবার্চনা প্রথা এবং পার্বণ আছে, তাহার প্রায় সকলই বহুকাল হইতে এই দেশে প্রচলিত ছিল। অস্মদ্দেশে শাক্তদিগের সংখ্যা অনেক বেশি, তাই বহুপূর্বেও বর্তমান সময়ের মত শক্তি পূজা মহাসমারোহে নির্বাহ হইত। শ্রীশ্রী° শারদীয় মহাপূজা, শ্যামা, লক্ষ্মী, বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে সম্পন্ন শাক্তগৃহস্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেন। বিজয়ার দিনে হিন্দুসন্তান সমস্ত শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া পরমশত্রুকেও সাদরে আলিঙ্গন করতঃ বয়োজ্যেষ্ঠগণ ধান্য দুর্বাদ্বারা এইভাবে আশীর্বাদ করিতেন যে, এই উভয় দ্রব্যের ন্যায় তুমি অক্ষয় হও। এই শুভদিনে সকলে একত্র হইয়া নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ করিতেন, এখনও উক্ত প্রথা সকল এই দেশে সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান আছে।

বর্তমান সময়ে এইদেশে "নবান্ন" যে প্রকার প্রসিদ্ধ এবং গৃহে গৃহে প্রচলিত, পূর্বেও এই প্রকার ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে প্রত্যেক হিন্দু সন্তানকে "পার্বণ-শ্রাদ্ধ" করিতে হয়। সম্ভবত শস্য-প্রধান দেশ বলিয়াই নবান্নোপলক্ষে আমাদের দেশে অন্যান্য দেশাপেক্ষা অধিকতর আড়ম্বর হইয়া থাকে।

নবান্ন-শ্রাদ্ধের ন্যায় আরও দুইটি পার্বণ বহুপূর্ব হইতে এই দেশে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি শ্রীশ্রী° মনসা পূজা ও অপরটি পৌষপার্বণ এই উভয় ক্রিয়াই অস্মদ্দেশে প্রায় ঘরে ঘরে নির্বাহ হইয়া থাকে। মনসা পঞ্চমী তিথিতে জগন্মাতা মনসা দেবীর ঘটসম্মুখে, বহুপূর্বে নানাস্থান হইতে গুণী মালবৈদ্যগণ একত্রিত হইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ বিষধর সর্পসমূহ লইয়া ক্রীড়া কবিত। প্রত্যেক হিন্দুসন্তান তখন ভক্তিভরে সপুষ্পাঞ্জলি নাগমাতার অর্চনা করিতেন; এমন কি অনেক মুসলমান সন্তানও দেবীকে নানা প্রকার ফল পুষ্প প্রভৃতি প্রদান করিতেন। প্রাচীন বাকলায় "মানসী" নগর[২৩] তখন এই সমস্ত কার্যের লীলানিকেতন ছিল। সাধকপ্রবর মহাত্মা বিজয় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত ভগবতী মনসাদেবীর সম্মুখে তখন লোকারণ্য হইত। ত্রিপুরা, আসাম, চট্টগ্রাম, যশোহর প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক বিষবিশারদ মালবৈদ্য একত্রিত হইয়া স্বীয় স্বীয় গুণগ্রাম প্রকাশ করতঃ যথাসাধ্য উপচারে দেবীপূজা করিতেন। এখন আর এইদেশে কোথাও কোন মালবৈদ্য দেখা যায় না। এই দেশে এখন অনেক বিষবৈদ্যের কথা শুনা যায় যে তাহারা সাতদিনের সর্পদষ্ট মৃতবৎ রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। এই সমস্ত মালবৈদ্যগণ কাহারও নিকট হইতে অর্ধ পয়সাও গ্রহণ করিতেন না; জনশ্রুতিতে কোথাও সর্পাঘাতের কথা শুনিলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া রোগীর চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতেন। মানসী নগরে মনসা পঞ্চমীর উৎসব সম্বন্ধে টাইলর সাহেবের মিনিটে কতক আভাস পাওয়া যায়।[২৪] উক্ত সাহেব বাহাদুর সম্ভবত মালবৈদ্যগণের বিদ্যায় ততটা বিশ্বাস করেন নাই। তিনি স্বয়ং বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের গুণপণায় আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মালবৈদ্যগণের চিকিৎসা অপেক্ষাও জগন্মাতা মনসাদেবীর প্রতি অবিচলিত ভক্তিই

অধিক। হিন্দু-সন্তানকে বোধ হয় আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না; ঐশী শক্তির সহিত বিজ্ঞানের আকাশ পাতাল প্রভেদ।

অন্যান্য স্থানের পৌষ পার্বণ অপেক্ষা এই দেশে একটু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ভূম্যধিকারী স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে পৌষ সংক্রান্তির দিন পূজা দিয়া থাকেন। বহুপূর্ব হইতেই এই পূজা প্রচলিত। বিচার আদালতে ইহাই দখলের অন্যতম প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহার একটু বিশেষত্ব এই যে, শস্যক্ষেত্র এবং অনাবৃত স্থানেই এই পূজা হয় বটে, কিন্তু কাফিলা গাছ না হইলেই চলে না; তাই অনেক ক্ষেত্র মধ্যে কৃষকগণ একটি কাফিলাগাছ যত্নপূর্বক রোপণ করে। যে ক্ষেত্রে উক্ত বৃক্ষ নাই, কৃষকগণ সেখানেও পূজার দিনে, অন্যস্থান হইতে উহার একটা ডাল আনিয়া রোপণ করে, পরে তৎসম্মুখে ঘটস্থাপন পূর্বক পূজা দিয়া থাকে। অন্যান্য পূজোপকরণের সঙ্গে মৃত্তিকা নির্মিত একটা প্রকাণ্ড কুম্ভীর প্রস্তুত করিতে হয়; কোন কোন স্থানে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরও মূর্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাস্তুভূমির অধিষ্ঠাত্রী রণচণ্ডী দেবীর পূজা হয় বলিয়া এই দেশে ইহা 'বাস্তুপূজা' নামে অভিহিত; কুম্ভীর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি দেবীরই পরিবার বলিয়া ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখ আছে। কোন কোন স্থানে ইহার পরিবর্তে কালী মূর্তির পূজা হইতেও দেখা যায়। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে অতিপূর্বে এই সমস্ত স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল; কাঠুরিয়াগণ, হিংস্র জন্তুর উপদ্রব হইতে প্রাণ রক্ষার জন্য এইরূপ অর্চনা করিত, সেই হইতে এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। কৃষকগণ এই দিনে স্ব স্ব গবাদিকে নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি প্রদান করে, এবং নানাবর্ণে তাহাদের দেহ রঞ্জিত করিয়া থাকে।

তৎকালে স্থানীয় ভূম্যধিকারীগণ এক প্রকার স্বাধীন ছিলেন, তাঁহাদের অধিকারস্থ প্রজাবর্গের ফৌজদারি আদালত প্রভৃতি যাবতীয় বিচার কার্য তাঁহারাই নির্বাহ করিতেন। প্রত্যেকের বহু সংখ্যক লাঠিয়াল, তীরন্দাজ এবং ঢাল সড়কিওয়ালা থাকিত; এই সমস্ত লোক দ্বারা ভূম্যধিকারী, প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে যেমন প্রাপ্য কর আদায় করাইতেন, সেই প্রকার দস্যুভীতি অথবা পরের আক্রমণ হইতেও আত্মরক্ষা করিতেন। তৎকালে লাঠিখেলা, তরবারিচালনা প্রভৃতি পুরুষোচিত কার্য অল্পবিস্তর প্রত্যেকেরই জানা ছিল।

পূর্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে বাকলা পণ্ডিতপ্রধান স্থান। এই স্থানে অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া বীণাপাণির অর্চনা দ্বারা অমর হইয়াছেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহু সংখ্যক ছাত্র এই স্থানে অধ্যয়নার্থ আগমন করিতেন। নলচিড়া, উজিরপুর, মানপাশা, শিকারপুর, কীর্তিপাশা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ একদা সমগ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। বিদেশ হইতে আগত ছাত্রবৃন্দ অধ্যাপকের গৃহে আহার করিতেন এবং তাঁহারই পরিজন মধ্যে গণ্য হইতেন; পাঠ সমাপনান্তে ছাত্রেরা অধ্যাপকের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দেশে গমন করিতেন। কোন কোন অধ্যাপক "গুরুদক্ষিণা" স্বরূপ কদাচিৎ যৎসামান্য অর্থ গ্রহণ করিতেন, আর কেহ কেহবা তাহাও লইতেন না। হিন্দু সন্তানের নিকট বিদ্যাদান, অন্নদান প্রভৃতি এখনও পরম পুণ্যময় কার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে এই জেলায় বর্তমান সময়েও এইরূপ দুই একটি চতুষ্পাঠী পাওয়া যায়। এই সকল চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য সন্তানগণ ব্যতীত অন্য কোন জাতিকে গ্রহণ করা হইত না। মুসলমানাক্রমণের অনেক পরে দুই একটি কায়স্থ সন্তানের প্রবেশাধিকারের জনশ্রুতি শুনা যায়। প্রত্যেক হিন্দুই পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রের বিদ্যারম্ভ করাইতেন; তদুপলক্ষে দেবার্চনা হইত; গুরু অথবা পুরোহিত প্রথমে একখণ্ড খড়ি দিয়া কৃষ্ণপ্রস্তরে বালককে বর্ণমালা শিখাইতেন; ইহাই 'হাতেখড়ি' বলিয়া অভিহিত। অন্যান্য জাতির শিক্ষা দেওয়ারও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। আমরা সেকালের গুরু মহাশয়েরও অনেক গল্প শুনিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে তৎকালে, গ্রামস্থ কোন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য সন্তান, "চৌপাড়ি"[২৫] স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। পঞ্চমবর্ষীয় বালক হইতে বিংশবর্ষীয় যুবক পর্যন্ত এই চৌপাড়িতে

লেখাপড়া অভ্যাস করিত। এইস্থানে বাংলাভাষা, গণিত, এবং সংস্কৃতাভিজ্ঞ শিক্ষক, ব্যাকরণ ও কাব্যাদি শিক্ষা দিতেন; বালকেরাও যৎকিঞ্চিৎ অর্থ, অথবা দ্রব্যসামগ্রী, গুরুমহাশয়কে উপঢৌকন দিত। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য বর্তমান ছাত্রগণের অভিভাবকগণ যেরূপভাবে কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়াও সময় সময় বিফল মনোরথ হইয়া থাকে, তৎকালে সেরূপ ছিল না। চৌপাড়ির ছাত্রদের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত শিক্ষক কর্তৃক উপদেশ পাইত, তাহারা অনেকেই বিজ্ঞতা লাভ করিত। আজকাল যেমন বিদ্যাশিক্ষার গৌরব এবং আবশ্যকতা পঞ্চমবর্ষীয় বালকও উপলব্ধি করিতে পারিতেছে, তৎকালে শিক্ষাসম্বন্ধে সকলের ততটা প্রবৃত্তি ছিল না। ব্রাহ্মণ বৈদ্য এবং সম্ভ্রান্ত কায়স্থদিগের বাধ্য হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত, কিন্তু তদিতর জাতির মধ্যে সহজে কেহ লেখাপড়া অভ্যাস করিত না। স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাস, তৎকালে সমাজে নিতান্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন কোন প্রতিভাময়ী রমণী গোপনে পিতা অথবা স্বামীর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন।

মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ বিজিত হইবার পর হইতেই আমাদের পূর্বকালীন সমাজবন্ধন, রীতিনীতি প্রভৃতি যে প্রকার ক্রমশই শিথিল হইতে আরম্ভ করিল, তদ্রূপ আমাদের অন্যান্য আচরণও ধীরে ধীরে নানাভাবে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে যাবনিক আচার এবং কতকগুলি যাবনিক শব্দ আমরা অতর্কিতরূপে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। বর্তমান বঙ্গীয় সমাজের অনেক রীতিনীতির প্রতি একটু লক্ষ করিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মোগল রাজত্বের পূর্ব হইতেই ইহা ঘটিয়াছে, আমরা তৎপূর্বের যে সকল বঙ্গীয় কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি তাহাতে অনেকগুলি বৈদেশিক শব্দ উল্লেখ আছে। এমন কি আমরা এখন সাধুভাষায় অনেকগুলি যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। তন্মধ্যে দোয়াত, কলম, তক্‌সিম্‌, পরগনা, ওলন্দে, এতমাম্‌, সাকিম, ফুরছি, আবাদ, জঙ্গল, কাগজ, সেরেস্তা, নাজির, কানুনগো, বাহাদুর, নবাব, খাজানা, খানা প্রভৃতি শব্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান রাজকীয় কাগজে এখনও এইরূপ যাবনিক শব্দ বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন দেশের রাজা মুসলমান, তখন বাধ্য হইয়া দেশবাসীর রাজভাষা শিক্ষা করিতে হইত। তাই সম্ভ্রান্ত এবং রাজসম্ভ্রমাভিলাষীগণ মৌলবী রাখিয়া বালকগণকে পার্সি ও আরবি ভাষা শিক্ষা দিতেন। আজকাল যেমন ইংরেজি না শিখিলে, "পাদমেকং ন গচ্ছতি", তদ্রূপ তৎকালে পার্সি অথবা আরবি না শিখিলে চলিত না। বিশেষত রাজকীয় যাবতীয় কার্য যাবনিক ভাষায় নির্বাহ হইত, সুতরাং দেশীয় সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীকে দায় পড়িয়া ইহা শিখিতে হইত।

মুসলমান রাজগণ হিন্দুদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত; তন্মধ্যে দুইটি অত্যাচার হিন্দুজাতির মধ্যে যে পর্যন্ত একজনও জীবিত থাকিবে, সে পর্যন্ত বিস্মৃত হইবে না। ইহাদের প্রথম অত্যাচার স্ত্রীজাতির উপর! এই পশুপ্রকৃতি নরপতিগণের অত্যাচারে সুন্দরী হিন্দুললনাগণ যে কতদূর উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, ইতিহাসই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সুন্দরী কন্যা, সুন্দরী স্ত্রী কিম্বা সুন্দরী ভগ্নী লইয়া কাহারও সংসার করিবার সাধ্য ছিল না। দৈবাৎ নবাবের কানে এই কথা পৌঁছিলে, তখনই তাহার সর্বনাশ হইত। দুরাত্মাগণ ছলে বলে অথবা কৌশলে স্বীয় স্বীয় পাপাভিষ্ট পূরণ করিত। এইরূপে যে কত সোনার সংসার ছারখার হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সম্ভবত এই অত্যাচার হইতে মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্যই দূরদর্শী হিন্দুগণ, নারীজাতির অবগুণ্ঠনের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। সেই হইতেই অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে।[২৬] ইহার পূর্বে সম্ভ্রান্ত হিন্দুকুলললনা, আবশ্যক হইলে সঙ্গিনী লইয়া গৃহের বাহির হইতেন, অতিথি এবং আগন্তুককে যথারীতি অভ্যর্থনাও করিতেন। বর্তমান সময়ের কুলবতীগণের ন্যায় তাঁহারা গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতেন না। আসাম এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও অনেকটা পূর্বভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মুসলমানদিগের আর একটি অত্যাচার, হিন্দু সন্তানগণের ধর্মনাশ। হিন্দুদ্বেষী মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই কার্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার এই দুর্নীতিতে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে যে ভীষণ সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতেই সুবিশাল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য, শতাব্দীর মধ্যে ভস্মে পরিণত হইয়াছিল। আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশও উক্ত অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

অস্মদ্দেশে বর্তমান সময়ে যে সমস্ত নীচজাতীয় মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রায় অনেকেই পূর্বে হিন্দু ছিল। ব্রাহ্মণ হইতে নীচ চণ্ডাল পর্যন্তও জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে। কখন বা তোষামোদ, কখন বা ভয় প্রদর্শন, আবার কখন বা জোরপূর্বক কার্য উদ্ধার করা হইত। পটুয়াখালি সাব্‌ডিভিশনের অন্তর্গত শ্রীরামপুরস্থ মিঞাগণের যে বংশতালিকা পাইয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবানন্দ মজুমদারকে নবাব জোরপূর্বক মুসলমান করায়, তিনি "শিবানখাঁ" নামে পরিচিত হন। ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত, রুণসীর "রাজা"দের এবং শিরজুগের খাঁ বংশের সম্বন্ধেও এরূপ শুনা যায়।

পূর্বকালে অস্মদ্দেশীয় যুবকগণ প্রায় সকলেই রীতিমত মল্লবিদ্যা, অস্ত্রশস্ত্র পরিচালন করিতে শিক্ষা করিতেন। পর্বোপলক্ষে, সকলে একত্রিত হইয়া নানাপ্রকার মল্লক্রীড়া এবং অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করিতেন। যাঁহারা জয়লাভ করিতেন, তাঁহারা রাজা অথবা ভূম্যধিকারী কর্তৃক সসম্মানে পুরস্কৃত হইতেন। তাঁহাদের শরীর সবল, মাংসপেশিগুলি দৃঢ় ছিল। গ্রামের মধ্যে কোথাও কোন হিংস্র জন্তুর উপদ্রব হইলে, নিজেরাই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহা নিবারণ করিতেন। এমন অনেকের পরিচয় পাওয়া যায় যে তাহারা একমাত্র বংশদণ্ড অবলম্বন করিয়া, তৎসাহায্যে সময়ে সময়ে অসম সাহসিক কার্য উদ্ধার করিতেন; কেহ কেহ বা রিক্তহস্তেই শূকর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র প্রভৃতি শিকার করিতেন। এমন দিন গিয়াছে যখন এই ভীরু বাঙ্গালি জাতির সিংহনাদে দিগন্ত কম্পিত হইত; তাঁহাদের স্বদেশপ্রিয়তা, একতা, বীরত্ব এবং রণকৌশলে একদিন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত সিংহল দ্বীপ পর্যন্তও কম্পিত হইয়াছিল।[২৭] বর্তমান সময়ে হয়ত অনেকেই একথা বিশ্বাস করিবেন না; কারণ বর্তমান সময়ের বাঙ্গালিগণের শারীরিক বল, সাহস প্রভৃতি দেখিলে বিশ্বাস না হইবারই কথা। আমাদের শারীরিক দৈর্ঘ্য দিন দিন যেরূপ হ্রস্ব হইতেছে, এবং তৎসহ শরীরের মাংসপেশি যে প্রকার স্ত্রীলোকের শরীর হইতেও কোমল হইতেছে, তাহাতে এক শতাব্দী অন্তে আমাদের বংশাবলীর যে কি প্রকার অবস্থা হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। সামান্য একটু আঘাতে আমরা মূর্চ্ছিত হই, কুকুরের চীৎকারে আমাদের প্রাণে ভয় উপস্থিত হয়; কিন্তু এমন একদিন গিয়াছে যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ রণোন্মত্ত হইয়া উন্মুক্ত কৃপাণ করে, শত্রুব্যূহে প্রবেশপূর্বক অকুতোভয়ে অরাতি দলন করিয়া চরমে বীর গতি লাভ করিয়াছেন। আজ সেই সমস্ত কাহিনী মনে হইলেও, কেমন একটা অশ্রুতপূর্ব আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।[২৮] তখন বৃদ্ধগণ নিশ্চিন্ত মনে ধর্মালোচনা করিতেন। সংসারে তখন অর্থাভাব, অথবা অন্যপ্রকার অশান্তি প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত না; কারণ তখন গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, ও বাগানভরা [illegible]রি ছিল। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তখন কাহারও বড় একটা পরিশ্রম করিতে হইত না। তখন [illegible]ষ্টর, মার্কিন, সিফিন্ড প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। দেশীয় বস্ত্রে এবং অস্ত্রে আমাদের মানসম্ভ্রম ও প্রাণ রক্ষা হইত। উজিরপুর, মাধবপাশা, গাবখান প্রভৃতি স্থানে তখন অত্যুৎকৃষ্ট মূল্যবান বস্ত্র এবং ইস্পাত নির্মিত শাণিত অস্ত্রশস্ত্রসমূহ প্রস্তুত হইত; সুদূর আরাকান, মণিপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হইত। বর্তমান সময়ে এই সকল ব্যবসায়ীদিগের অস্তিত্ব নাই; কারণ ইহাদের কৃত অস্ত্র আর আমরা খরিদ করি না, এখন সমস্তই বিদেশি বণিকের 'একচেটিয়া' হইয়া গিয়াছে। তৎকালে কাহারও বিশেষ একটা অভাব পরিলক্ষিত হইত না, কেন না তখন দেশের টাকা দেশেই থাকিত; দেশে দুর্ভিক্ষ, অথবা সাধারণের কোন হিতকর কার্য উপস্থিত হইলে দেশবাসিগণ বদ্ধপরিকর হইয়া স্বীয় স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতেন।

এখন আমরা বাণিজ্য, অথবা প্রধান প্রধান রাজকার্য দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জন করিতেছি; তথাপি আমাদের অভাব দূর হইতেছে না। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত অর্থের জন্য লালায়িত। আমাদের যথেষ্ট অর্থাগম হইতেছে, ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতেছে, তথাপি আমাদের অভাব ঘুচিতেছে না; বরং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা আছে তিনিও 'হা অর্থ, যো অর্থ' করিতেছেন; আর যাহার নাই, তাহার ত কথাই নাই। হায়! কি পাপে যে ভগবান আমাদের জাতির প্রতি এই কঠিন দণ্ড প্রদান করিয়াছেন তাহা কে বলিবে?

প্রাচীন হিন্দুরাজগণের রাজস্বগ্রহণ, ভূমির কর নিরূপণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে কতক কতক উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তৎসমুদয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রণীত বলিয়া করগ্রহণ ও করধার্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিতে দেখা যায় যে, ভূম্যধিপতি উৎপন্ন শস্যের একষষ্ঠাংশ গ্রহণ পূর্বক তাহার একভাগ ব্রাহ্মণ ও অতিথি সেবার জন্য রক্ষা করিয়া, অবশিষ্টাংশ নিজে গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ, কেহবা এক পঞ্চমাংশ, আবার কেহ বা এক চতুর্থাংশ উৎপন্ন দ্রব্য কর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বোধ হয় প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন হিন্দু রাজগণ অবস্থানুসারে উৎপন্ন শস্য রাজকর স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। রামায়ণে ইহার কতক আভাস পাওয়া যায়; ইক্ষ্বাকুবংশের রাজধানী, রাজ্যশাসন প্রভৃতি বর্ণনাসময়ে মহর্ষি বাল্মীকি রাজকর গ্রহণ সম্বন্ধে অতি সামান্য আভাস প্রদান করিয়াছেন।[২৯]

মহাভারতে ইহার কতক বিকাশ দেখিতে পাই। মহারাজাধিরাজ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালীন যে সমস্ত বিজিত নৃপতি যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যথাযোগ্য 'রাজকর' প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে দাস, দাসী, মণি, মুক্তা, অশ্ব, হস্তি প্রভৃতির উল্লেখ সময়ে দুই একস্থানে মুদ্রা শব্দেরও প্রয়োগ দেখিতে পাই। বর্তমান রাজস্ব আদায়ের নিয়ম পূর্বকালে এইভাবে প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রাচীন রাজগণ যে ভূমি পরিমাণ করিয়া তৎসংখ্যা নির্দেশ করতঃ রাজকর ধার্য করিতেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ আমাদের শাস্ত্রে মাণপরিমাণ (Measure) স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমরা তাহার আর্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োহষ্টৌ চ পুস্কলং।
পুস্কলানিচ চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্তিতঃ।
চতুরাচকঃ ভবেদ্দ্রোণ খাড়ি দ্রোণ চতুষ্টয়ঃ।।"

৮ মুষ্টি	...	..	১ কুঞ্চি।
৮ কুঞ্চি	...	...	১ পুস্কল।
৪ পুস্কল	...	...	১ আঢ়ক।
৪ আঢ়ক	...	...	১ দ্রোণ।
৪ দ্রোণ	...	...	১ খাড়ি।

"পলমেব সমং মুষ্টিঃ কুরবস্তচ্চতুষ্টয়ং
চত্বারঃ কুরবা প্রস্থশ্চতুপ্রস্থ মমাঢ়কম্।
দ্বারাঢ়কৌ ভবেদ্দ্রোণঃ দ্বিদ্রোণঃ সূর্প উচ্যতে
সার্দ্ধ সূর্পো ভবেৎখাড়িদ্বে খার্য্যে গৌণ্যদাহৃতা।"

১ পল	...	...	১ মুষ্টি।
৪ মুষ্টি	...	...	১ কুরব।
৪ কুরব	...	...	১ প্রস্থ।
৪ প্রস্থ	...	...	১ আঢ়ক।
২ আঢ়ক	...	...	১ দ্রোণ।
২ দ্রোণ	...	...	১ সূর্প।
১ সূর্প	...	...	১ খাড়ি।
২ খাড়ি	...	...	১ গৌণী।

ইহা ব্যতীত আয়ুর্বেদে ঔষধাদি পরিমাণ সম্বন্ধে অনেকগুলি মাণপরিমাণের বচন দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত ভূমির মাণপরিমাণের সংজ্ঞাসূচক দুই একটি প্রাচীন শব্দ এখনও আমাদের দেশে অতি অপভ্রংশ ভাবে প্রচলিত আছে। প্রাচীন কুরব এবং দ্রোণ শব্দ আমাদের দেশে চলিত ভাষায় কুড়া এবং দরুণ নামে প্রচলিত। ভূমির উৎপন্ন শস্য রাজকর গ্রহণ এখনও এদেশে বহুল প্রচলিত আছে।

আমাদের এই জেলায় যে প্রকার প্রভূত পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়, বঙ্গদেশে আর কোন স্থানে সে প্রকার হয় না। তাই পূর্বের ভূম্যধিকারীগণ প্রজার নিকট হইতে কর স্বরূপ মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া তৎপরিবর্তে অবস্থানুসারে কোথাও উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ অথবা ষষ্ঠাংশ আদায় করিতেন। ইহাই "ধান কড়ারি জমি" নামে প্রসিদ্ধ। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, বৃত্তি, জায়গির প্রভৃতি সম্পত্তির খাজনা এই নিয়মে এখনও প্রায় অনেক স্থানে আদায় হইতেছে। ইহা ব্যতীত কোন কোন প্রাচীন ভূম্যধিকারীর ঘরে, আম, কাঁঠাল, নারিকেল, গুবাক, শশা, কুমড়া, ইক্ষু, কদলি প্রভৃতিও করস্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে। বিগত ১৮৮৫ সালের "প্রজা ভূম্যধিকারী বিষয়ক আইনের" অনুগ্রহে এই সকল আর অনেক দিন ভোগ করিতে হইবে না।

এই প্রকার কর সংগ্রহার্থ পূর্বকালে গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, তাহারা 'মণ্ডল' নামে অভিহিত হইতেন। দশ, বিশ, পঞ্চাশ, শত, সহস্র গ্রামের উপর যোগ্যতানুসারে মণ্ডল থাকিতেন; এবং সংগৃহীত রাজকরসমূহ, এই সমস্ত মণ্ডল দ্বারা রাজসদনে প্রেরিত হইত। প্রজাপুঞ্জ মধ্যে ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ, অথবা কোন প্রকার অশান্তি উপস্থিত হইলে, মণ্ডলেরাই তাহার বিচার-নিষ্পত্তি করিতেন। প্রজাগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট থাকিলে, রাজার নিকট সুবিচার প্রাপ্ত হইত। শত এবং সহস্র গ্রামের উপর যে মণ্ডল থাকিতেন, তাঁহার ক্ষমতা বড় কম ছিল না। বর্তমান সময়ে আমাদের বৃটিশ গবর্নমেন্টের অধীনে যে সমস্ত করদ রাজা বাস করেন, তাঁহাদের সহিত তুলনায়, তৎকালীন মণ্ডলগণ বড় ন্যূন ছিলেন না। কোন মণ্ডলের দেহান্তর ঘটিলে, তৎপুত্র তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য করিতেন; কেবল রাজার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত মাত্র। কেহ নিঃসন্তান থাকিলে, গ্রামস্থ প্রকৃতিপুঞ্জ, একজনকে মনোনীত কবিয়া ঐ ক্ষমতা প্রদান করিত। তৎকালীন ইহাই প্রথা ছিল এবং এই নিয়মানুসারেই সকলকে চলিতে হইত। এই সমস্ত মণ্ডলগণ বহিঃশত্রু আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য, দুর্গ প্রাকার, পরিখা প্রভৃতি নির্মাণ কবাইতেন, প্রাণপাত করিয়াও স্বদেশ রক্ষা করিতেন।[৩০]

রাজা যে প্রকার ভূমির ষষ্ঠাংশ উৎপন্নদ্রব্য রাজকর গ্রহণ করিতেন, তদ্রূপ পণ্যদ্রব্য ও বাণিজ্যশুল্কও প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ইহার একটা বড় বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না: লাভের দশাংশ, বিশাংশ, কখনও বা তন্ন্যূনও গ্রহণ কবিতেন। উত্তরাধিকারী বিহীন স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি রাজকোষে পর্যবসিত হইবার পূর্বে রাজত্ব মধ্যে ঘোষণা করা হইত। কোন উত্তরাধিকারী তিন বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত হইবে এরূপ প্রমাণ পাইলে, রাজা তাহাকে ঐ সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতেন। প্রাচীন রাজগণের রাজ্যশাসন, মন্বাদি, স্মৃতির নিয়মানুসারে চালিত হইত। রাজা রাজকার্য নির্বাহার্থ, সদ্বংশজাত, বিশ্বাসী, স্পষ্টবক্তা, সাহসী, এবং ধার্মিক সপ্তজন সদস্য নিযুক্ত করিতেন। এই কয়েকজনেব মধ্যে সর্বশাস্ত্রবিৎ একজন ব্রাহ্মণ থাকিতেন, এবং এই ব্রাহ্মণকে তিনি অবিচলিতভাবে বিশ্বাস করিতেন। আবার এই সাতজনের মধ্যে একজন প্রধানমন্ত্রী অথবা অমাত্য থাকিতেন, রাজা এই সমস্ত কর্মচারীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈন্যগণকে উপযুক্ত শিক্ষিত করিযাছেন কিনা এবং তাহারা রীতিমত বেতন পাইতেছে কিনা, প্রত্যহ রাজকার্যারম্ভের পূর্বে রাজা স্বয়ং তাহা পর্যবেক্ষণ করিতেন। তৎপর সিংহাসনারোহণ করিয়া, নিত্যনৈমিত্তিক রাজকার্য সম্পন্ন করিতেন।

রাজা অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্বক উল্লিখিত প্রকার রাজকার্য নির্বাহান্তে, গূঢ়মন্ত্রণা থাকিলে, বিশ্বস্ত মন্ত্রীবর্গ পবিবৃত হইয়া, স্তম্ভ, গবাক্ষ, স্ত্রী এবং শুকপক্ষী বিহীন

স্থানে, অভিভাবিত মন্ত্রণা নির্বাহ করিতেন।[৩১] এই সমস্ত রাজকার্য সম্পন্ন করিয়া, রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্নানাহার নির্বাহ করতঃ অন্তপুর পরিদর্শনপূর্বক যথাবিধি ব্যবস্থা করিতেন। অপরাহ্নে পুরুষজনোচিত মল্লক্রীড়া ইত্যাদি নির্বাহান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতেন· তৎপরে কিয়ৎকাল বিশুদ্ধ এবং নির্মল বায়ু সেবনান্তর, সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদ্দি সমাপন পূর্বক গুপ্তচরপমুখাৎ রাজ্যসম্বন্ধীয়, অথবা শত্রু পক্ষের সংবাদ গ্রহণ করিতেন। তারপর অন্তঃপুরে :গমনপূর্বক মহিষীসহ সুখাসীন হইয়া, সুরতানলয় বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শ্রবণ, এবং নৃত্যাদি দর্শন করিতেন; পরে সার্ধপ্রহর মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র ভোজন করিয়া নিদ্রা যাইতেন। প্রজাদিগের মূলধনের কোন প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত না হয়, এরূপ ভাবে বিশেষ বিবেচনাপূর্বক রাজা কর ধার্য করিতেন, এবং বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্য, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ও পাথেয় প্রভৃতির প্রতি লক্ষ রাখিয়া শুল্ক গ্রহণ করিতেন। পশু এবং সুবর্ণ সম্বন্ধীয় বাণিজ্যের লাভের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ধান্যাদি শস্যের কর, ক্ষেত্রের অবস্থা এবং কৃষকের পরিশ্রমের ন্যূনাধিক্যের প্রতি লক্ষ রাখিয়া ষষ্ঠাংশ, অষ্টমাংশ, অথবা দ্বাদশাংশের একাংশ রাজা গ্রহণ করিতেন। ন্যায়, ধর্ম এবং অপরাধের তারতম্য অনুসারে সূক্ষ্ম বিচার করিতেন। নিজের পুত্র অপরাধীন হইলে, রাজা তাঁহাকেও সমুচিত দণ্ড বিধান করিতেন। ব্যাধিবশত অথবা অন্য কোন কারণে স্বয়ং বাজকার্য করিতে অসমর্থ হইলে, অমাত্য প্রভৃতি বিশ্বাসী কর্মচারীর উপর সকল ভার অর্পণ করিতেন।[৩২]

বর্তমান সময়ে যেমন এই দেশে ভূমি সম্বন্ধে বহু প্রকার স্বত্ব অবধারিত আছে, বহু পূর্বেও ইহার কতক আভাস পাওয়া যায়। আমরা দুই প্রকার প্রজা সাধারণের স্বত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই: যথা স্থায়ী, এবং অস্থায়ী প্রজা। রাজার নিকট হইতে যে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া আনা হইত, সেই প্রকার স্বত্ব পুরুষানুক্রমে স্থায়ী হইত। আর যাহারা মণ্ডল মধ্যে ভূমি ভোগ করিত, তাহারা অস্থায়ী প্রজা বলিয়া গণ্য হইত। গ্রামপতি (মণ্ডল) ইচ্ছানুসারে তাহা কাড়িয়া লইতে পারিতেন। আমরা যে সমস্ত প্রজা চিরকাল পুরুষানুক্রমে স্বগ্রামে বসতি করিয়া ভূমি চাষ রোপণ করিত, তাহারাও স্থায়ী প্রজা বলিয়া গণ্য হইত। ভিন্ন গ্রামবাসী কোন প্রজা অন্যস্থানে অর্থাৎ ভিন্ন গ্রামে ভূমি চাষরোপণ করিলে, তাহাকে অস্থায়ী প্রজা বলা যাইত। ইহা ব্যতীত যে সমস্ত লোক উচ্চজাতিসম্ভূত, স্বহস্তে হলচালনা করিতে পারেন না, অথবা তাঁহারাও অন্যান্য প্রজাগণের ন্যায় অপেক্ষাকৃত কম খাজনায় ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতেন। এই প্রজাগণ, অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া চাষ রোপণ করিতেন।[৩৩]

উল্লিখিত প্রকার স্বত্ব বর্তমান সময়েও কতকাংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক ভদ্রলোক, বর্তমান সময়েও গবর্নমেন্ট অথবা স্থানীয় ভূম্যধিকারী মধ্যে জমি রাখিয়া স্বীয় স্বীয় তত্ত্বাবধানে, লোক দ্বারা চাষ আবাদ কবাইয়া থাকেন। ইংরাজ রাজত্ব আবন্তের পরও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত বাকরগঞ্জে, বর্তমান সময়ের ন্যায় নানা প্রকার জটিল প্রজা-স্বত্ব অথবা হকিয়ত সমূহের উল্লেখ দেখা যায় না। যখন প্রাচীন হিন্দু রাজগণ শাস্ত্রানুসারে বাজ্যরক্ষা এবং প্রজাপালন করিতেন, তখন বঙ্গের হিন্দুরাজগণ অবশ্যই অন্যরূপ আচরণ করিতেন না; তাঁহাদের কৃত গ্রন্থাদি এবং তাম্রশাসন গুলিই তাহাব জ্বলন্ত উদাহবণ। প্রাচীন বাকলা অবশ্যই তৎকালীন এই প্রকার শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে মহারাজ কেশব সেন প্রদত্ত তাম্রশাসনের মূল এবং ব্যাখ্যা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে যে, তৎকালীন বাজ্যশাসন, ভূমি রক্ষা, এবং কর নির্ধারণ ও গ্রহণ সম্বন্ধে যথাবিধ নিয়ম দৃঢ়ভাবে প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ে হতভাগ্য ভারত সন্তান দেবতুল্য পূর্ব পুরুষগণের মহিয়সী শক্তি, অসাধারণ দিগ্নীতি, লোকবিশ্রুত ধর্ম এবং ন্যায়পরতা ধীরে ধীরে বিস্মৃত হইতেছে।

পূর্বকালে বিচার ও ভূমির বন্দোবস্ত প্রভৃতি, প্রজা এবং ভূমির অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখিয়া, ন্যায় এবং ধর্মানুসারে নির্বাহিত হইত। তখন আইনেব কূটার্থ ছিল না, এখনকার মত তখন রামের বিত্ত শ্যামের হইত না। এখন আইনও যেমন কূট হইয়াছে, প্রজাবাও তেমনটি হইতে শিখিতেছে।

সেই জন্যই এখন বিচার আদালতের নথিতে এত গলদ, সঙ্গে সঙ্গে জাল জুয়াচুরিরও এত ছড়াছড়ি। আইন আরও কূট হউক, মোকদ্দমার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হউক, জাল জুয়াচুরির সংখ্যা তৎ সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে; ইহাই বর্তমান সময়স্রোতের অবশ্যম্ভাবী গতি। সদ্য কলেজ প্রত্যাগত, ভ্রমর কৃষ্ণ নবীন গুম্ফশ্মশ্রু বিভূষিত, চশমাধারী, চোগা চাপকান পরিহিত মহাশয়গণের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি হইবে। বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, অনেক স্থানের আহার্য দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে,—আদালত গৃহে কদাচিৎ কোন দর্শক উপস্থিত হইলে, প্রায় কালীঘাটের কাণ্ড উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রকার দুই একজন নবাগত নিজের নাম জাহির করিতে সময়ে সময়ে কত যে জঘন্য উপায় অবলম্বন করেন, তাহা স্মরণ করিতেও মনে ঘৃণার উদয় হয়। অনেক স্থলে এরূপ দেখা গিয়াছে যে ব্যবহারজীবীগণের কৃট্যর্থে, মোকদ্দমাকারিগণের মধ্যে উভয় পক্ষই হৃতসর্বস্ব এবং হৃতমান হইয়াছেন।

কেন এরূপ হয়? অনেকে রাজাকে অথবা আইন বিধিবদ্ধকারিগণকে নিন্দা করেন; আমরা কিন্তু এই কথার সম্পূর্ণ বিরোধী। রাজা, প্রজাদের পিতৃতুল্য, এবং সর্বদা ন্যায় ধর্মানুসারে প্রজা রক্ষা করিতে ঈশ্বরের নিকট দায়ী; প্রজাগণের সর্বস্ব হরণ, কখনই তাঁহার করণীয় নহে। তবে আমরা এরূপ আত্মহত্যা করিতেছি কেন? বাকরগঞ্জের লোক বড় মোকদ্দমা এবং কলহপ্রিয় বলিয়া সর্বস্থানে প্রচলিত; এমন কি গবর্নমেন্ট পর্যন্ত এই জন্য বিরক্ত। ইহার যে কতকাংশ সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। তবে ঢাকা বিভাগের মধ্যে বর্তমান ময়মনসিংহ, এবং খুলনা জেলান্তর্গত বাগেরহাট এবং মোরলগঞ্জ প্রভৃতি স্থান, ২৪ পরগনারও কোন কোন স্থানে এই বিষয়ে বাকরগঞ্জকে পরাস্ত করিয়াছে; ইহার সত্যাসত্য বিগত দশ বৎসরের সরকারি রিপোর্টেই প্রকাশ পাইবে। একটু গবেষণা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের জেলায় যত প্রকার ফৌজদারি মোকদ্দমা, তাহার প্রায় অধিকাংশই নীচজাতীয়দিগের মধ্যে ঘটিতেছে। কারণ এই সমস্ত লোক যে প্রকার অশিক্ষিত, তদ্রূপ উদ্ধত; সুতরাং অতি সামান্য কারণেও উত্তেজিত হইলে আর হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

দেওয়ানি ঘটিত যত প্রকার কূট মোকদ্দমা এদেশে সচরাচর ঘটিতেছে, তাহার অধিকাংশই বিদেশি ভূম্যধিকারী এবং এই দেশবাসিগণের মধ্যে দেখা যায়। ইহার ফলে, অনেক প্রাচীন ঘর নিঃস্ব হইতেছে। একদিন যাঁহাদের অন্নে শত শত লোক প্রতিপালিত হইত, আজ হয়ত সেই সমস্ত ক্ষণজন্মা পুরুষের বংশধরগণ, মলিন মুখে দারুণ মনস্তাপ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ হৃদয়ে ধরিয়া দাসত্বে ব্রতী হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে কালস্রোতের যে প্রকার আবর্তময়ী তীব্রগতি, তাহাতে আরও কি হয় বলা যায় না। যেমনটি যায় তেমনটি কি আর হয়? এদেশে অনেকে বড় মানুষ হইতেছেন, অনেক ক্রীড়া কর্ম, দান ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু পূর্বে যেমন ছিল সেইরূপ কি হইতেছে? সেই স্থল অবশ্যই পূর্ণ হইয়াছে, কেননা যিনি সর্ব গুণের আধার, সর্বাংশে পূর্ণ, তাহার সৃষ্ট পদার্থ অবশ্যই অঙ্গহীন নহে। কিন্তু কই আমরা ত তাহা বুঝিয়াও বুঝি না, সময়ে সময়ে যেন মনে হয় যে, কোন মহাপাপে জগদীশ্বর এই বাকরগঞ্জকে অভিশপ্ত করিয়াছেন? প্রতিদিন তিল তিল করিয়া আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, ধর্মই মানব জীবনের সারবস্তু। আমাদের কি সেই সারবস্তুর দিকে লক্ষ আছে? আমাদের পূর্ব পুরুষগণের ধর্মে যে প্রকার অবিচলিত বিশ্বাস এবং দৃঢ়ভক্তি ছিল, আমাদের কি ততটা আছে? একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে যাহার সামান্য জ্ঞানও আছে, তিনি অবশ্যই নিজের নিকট নিজে লজ্জিত হইবেন। আমরা কেবল মুখে 'হিন্দু' 'হিন্দু' বলিয়া যতই বড়াই করি না কেন, আমাদের কি ধর্ম এবং শাস্ত্রের প্রতি তাদৃশ্য আস্থা আছে? হিন্দুজাতি একদা যেমন জগতের শীর্ষস্থানে ছিল, আজ আবার তেমনই অধঃপাতে গিয়াছে। মুসলমান, পার্সি খ্রিষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি হইতে কয়জন ধর্মান্তর গ্রহণ করিতেছে? বর্তমান সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্ক অনেক হিন্দুসন্তান, স্বেচ্ছাক্রমে ধর্মান্তর গ্রহণ করিতেছেন; কারণ ধর্মান্তরে তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিসমূহ বিনা বাধায় নরকের পথ উন্মুক্ত

করিয়া দিতেছে। বাকরগঞ্জে পূর্বে ইহা ছিল না; চব্বিশ পরগনা, যশোহর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি হইতে এই ধর্মসংহারক মহামারির বীজাণু এদেশে আমদানি হইয়াছে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেজস্বি, কর্তব্যপরায়ণ পিতার ন্যায় হিন্দুসমাজ এই সমস্ত কুপুত্রগণকে চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। বিধর্মী পাষণ্ডগণের অত্যাচারে যাবনিক খাদ্য পর্যন্তও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। পৈত্রিক শালগ্রাম ঠাকুর, গোসেবা, অতিথিসেবা উঠিয়া গিয়াছে; আরও কত কি হইতেছে, তাহা লিখিয়া লেখনি কলঙ্কিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষে কোন ক্রয় বিক্রয়ের মুদ্রা প্রচলিত ছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে অনেক গোলযোগ চলিতেছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহামনস্বী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে কিছুই মীমাংসা করেন নাই। মিঃ ওয়েবর, উইলসন, টড্, হান্টার, এলফিনষ্টোন প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে গ্রীক আক্রমণের পূর্বে এদেশে কোনপ্রকার মুদ্রা (Coin of Standard Value) প্রচলিত ছিল না। সেকেন্দর সা, (Alexander) সেলিউকাস প্রভৃতি মাসিদনীয় বীরগণের প্রচলিত সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাও অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারতসম্রাটগণের প্রচলিত মুদ্রাগুলির লিপি, গ্রিক ও সংস্কৃত মিশ্রিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৩৪] গ্রিকাধিকৃত ক্ষুদ্র ব্যাকট্রিয়া (Bactria) রাজ্য, মুদ্রা নির্মাণের জন্যই প্রসিদ্ধ। ভারতাক্রমণকারী গ্রিক রাজগণের সঙ্গে ব্যাক্‌ট্রিয়াবাসীগণ থাকিতেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই মুদ্রা নির্মিত হইত। প্রসিদ্ধ চিনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি নির্মিত কোন মুদ্রাই প্রচলিত ছিল না; বাণিজ্য প্রভৃতি বিনিময় দ্বারা নির্বাহ হইত।

বঙ্গের সুসন্তান, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সম্ভবত সর্বদা সাধারণ কার্যের জন্য (মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেও) ব্যবহৃত হইত না।[৩৫]

পূর্বোল্লিখিত মহামহোপাধ্যায়গণ যাহাই কেন বলুন না, আমাদের শাস্ত্রে এবং পুরাণে, ক্রয় বিক্রয় এবং বিনিময়ের জন্য মুদ্রা প্রচলনের উল্লেখ দেখিতে পাই। ভগবান মনুর সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত যখন অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) আছে, তখন যে কোন প্রকার মুদ্রা প্রচলন ছিল না, ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এক পণ্যবস্তুর পরিবর্তে অন্য বস্তু গ্রহণ যেমন বাণিজ্যের পক্ষে অসুবিধা, তেমন ব্যবসা চালাইবার পক্ষেও নিতান্ত অপ্রীতিকর। প্রাচীনকালের রাজন্যবর্গ অসভ্য ছিলেন না, কোন কোন বাণিজ্য দ্রব্যে রাজা কি প্রকার শুল্ক গ্রহণ করিবেন, তাহাও আমাদের ধর্মশাস্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। অন্যান্য বস্তু যথা—ধান্য, নারিকেল, অন্যান্য ফল, এবং অন্যান্য খাদ্য বস্তু, বিনিময়ে চলিতে পারে, কিন্তু অশ্ব, হস্তি, যান, দাস, দাসী প্রভৃতির শুল্ক, রাজা এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিতেন। অবশ্য এই সমস্ত বিক্রয়ের দ্বারা যে লাভ হইত, রাজা শুল্কস্বরূপ তাহার পঞ্চমাংশ কর লইতেন, কোন কোন শাস্ত্রকার বলেন যে বাণিজ্য বস্তু আগত হইলে, বিক্রয়ের পূর্বে রাজকর্মচারিগণ যথাযোগ্য শুল্ক আদায় করিয়া পরে বিক্রয়ের অনুমতি দিতেন। ইহা দ্বারাও কতকটা বোধ হইবে যে, বিক্রেয় বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করিয়া পরে শুল্ক গ্রহণ করা হইত, এই মূল্যই তৎকালীন প্রচলিত সুবর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রা।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইক্ষ্বাকু বংশের ইতিহাসের সঙ্গে আমরা ভারতবর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক তত্ত্ব কতক দেখিতে পাই। সেই সময় হইতেই চতুর্বর্ণের বিধান, রাজধর্ম, রাজ্য শাসন প্রভৃতির সুচারু নিয়মাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই রামায়ণেই উল্লেখ আছে যে, ভগবান রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণসহপিতৃবাক্য পালনার্থ অরণ্য গমনের পূর্বে মহর্ষি বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞকে বহু ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন। এইস্থলে সুবর্ণমুদ্রা দক্ষিণা প্রদানের উল্লেখও দেখিতে পাই।[৩৬]

টীকাকার শেষ দুইটি পংক্তির যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে কোন গোলই থাকে না, আমরা তাহাও উদ্ধৃত করিলাম।

"শত্রুঞ্জয়ো নাম তথা প্রসিদ্ধং যং গজং মাতুল মম দদৌ তং গজং তে দদামি নিষ্ক সহস্রেণ স্বনামাঙ্কিত নিষ্ক (সুবর্ণ মুদ্রা) সহস্র দক্ষিণয়া।"

স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক অনুদিত রামায়ণে বর্ণিত আছে :

* * * * *

"শত্রুঞ্জয় নামে হস্তী মাতুলের কাছে
পাইয়াছি আমি যাহা মম গৃহে আছে,
দক্ষিণা সহস্র নিষ্ক[৩৭] সহিত এখন
সে করী তোমাব করে কৈনু সমর্পণ।"

টীকাকার কিন্তু স্পষ্টই বলিতেছেন, যে "স্বনামাঙ্কিত নিষ্ক" দক্ষিণাস্বরূপ দান করা হইল। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তৎকালে, বর্তমান সময়ের ন্যায় রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা সর্বসাধারণে প্রচলিত ছিল।

আমরা মহাভারতেও সুবর্ণ মুদ্রার উল্লেখ পাইয়াছি, শকুনির সহিত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন কপট পাশাক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হ'ন তখন তাঁহার পণ্য দ্রব্যের মধ্যে আমরা প্রথমেই "নিষ্ক" সহ "ভাণ্ডিন্যে" উল্লেখ দেখিতে পাই।[৩৮]

কতিপয় বৎসর অতীত হইল, বেঙ্গল গবর্নমেন্টের নিয়োগানুসারে ধ্বংসশীল প্রাচীন কীর্তিরক্ষার্থে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। বঙ্গের গৌরবান্বিত হিন্দু রাজধানী গৌড়নগর এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত; যে সমস্ত অভ্রভেদী অট্টালিকাচূড়া, শরৎকালীন শুভ্রমেঘমালাকে তিরস্কার করিত, আজ তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। যে রাজধানী জনকোলাহলে সংক্ষুব্ধ ছিল, এখন তাহা শ্মশানাপেক্ষাও নীরব। কেবলমাত্র অট্টালিকা সমূহের ভগ্নস্তূপ, শৈবালাদি আচ্ছাদিত প্রকাণ্ড দীর্ঘিকাগুলি অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ এখনও বর্তমান রহিয়াছে।

যে স্থানে রাজপ্রসাদ ছিল, তাহার কোন কোন ভগ্নস্তূপ হইতে কতকগুলি প্রস্তরনির্মিত দ্রব্যের ভগ্নাবশেষ, কতিপয় স্বর্ণরৌপ্য নির্মিত দেবপ্রতিমা এবং কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাগুলি বিভিন্ন আকারের, কতকগুলি গোল, কতকগুলি চতুষ্কোণ। লিপিগুলির এখন পর্যন্তও ভালরূপ পাঠোদ্ধার হয় নাই। পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই বিভিন্ন জাতীয় মুদ্রা সেনরাজা এবং তৎপূর্ববর্তী পালবাজগণেব নামাঙ্কিত হইবাব সম্ভব। ইহা ব্যতীত সুবর্ণগ্রামের রাজধানীব ভগ্নাবশেষ মধ্যে কতকগুলি তাম্রখণ্ড পাওয়া গিয়াছে; সেইগুলিতে কোন লিপির চিহ্ন নাই, পণ্ডিতগণ তাহাও হিন্দুরাজগণের প্রচলিত বলিয়া অনুমান করেন।

হিন্দু স্বাধীনতা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে পাঠান নৃপতিগণ বাহুবলে সমগ্র ভারতবর্ষ করায়ত্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। যে পর্যন্ত মোগল কুলগৌরব রবি মহাপ্রাজ্ঞ আকবর আবির্ভূত হ'ন নাই, সেই পর্যন্ত পাঠান রাজন্যবর্গ অপ্রতিহত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। পাঠান নরপতিগণের মধ্যে শেবশাহ সর্বপ্রথম রাজস্ব বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার পরমায়ু শেষ হওয়ায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম রহিত হইল। মহামতি আকবর, শেরশাহ প্রচলিত রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য দৃঢ়ভাবে প্রচলিত করেন, ইহাই বর্তমান ইতিহাসে প্রথম রাজস্ব বন্দোবস্ত।[৩৯]

১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে এই রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়, মহামনস্বী টোডরমল্ল রাজস্বসচিব ছিলেন; সম্রাটের আজ্ঞানুসারে, তিনিই ভারতের মোগলাধিকৃত যাবতীয় রাজ্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্তে "খালিসা" অর্থাৎ খাসের সম্পত্তি ১৯টি সরকার এবং ৬৮২ টি পরগনায় বিভক্ত করা হয়, মোগলাধিকৃত বাকলা তখন সুবর্ণগ্রামের অন্তর্ভূত হইয়া ৫২ পরগনায় বিভক্ত ছিল।[৪০]

আইন-ই-আকবরি পাঠে আরও জানা যায় যে, সমগ্র বঙ্গদেশ যে ভাবে পরিমাপ করতঃ কর

ধার্য করা হইয়াছিল, বাকলাও তদ্রূপ নিয়মান্তর্গত ছিল; তবে এই দেশ ধান্য উৎপত্তির প্রধান স্থান, তজ্জন্য ফুল্‌সী জমিতে ডাম এবং ধান্য কোন কোনস্থানে অবস্থানুরূপ আদায় হইত। বাকলার পূর্বসীমাবর্তী দক্ষিণ সাহাবাজপুর তখন সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু, সেলিমাবাদ পরগনা প্রভৃতি বাকলারই অন্তর্ভূত ছিল। কেহ কেহ বলেন যে এই পরগনা তখন সরকার বাজুহা'র[৪১] অন্তর্গত ছিল, উক্ত বন্দোবস্ত হইবার পর বোজরগ উমেদপুর নামকরণ হইয়াছে।[৪২] ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে বর্তমান বোজরগ উমেদপুর পরগনা তখন ঘোরতর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, এবং তদুৎপন্ন বৃহৎ কাষ্ঠফলক দ্বারা নৌযান এবং কড়ি বর্গা প্রভৃতি নির্মিত হইত।

সম্রাট শাহজাহানের পুত্র, শাহজাদা সুজা যখন বঙ্গের সুবেদার ছিলেন, তৎকালে তিনি বঙ্গদেশের দ্বিতীয়বার রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এই বন্দোবস্ত শেষ হয়। বাকরগঞ্জের দক্ষিণ সীমাব্যাপী বিস্তীর্ণ সুন্দরবন, "মুরদখানা" নামে এই দেশান্তর্ভূত হয়। পটুয়াখালি মহকুমার অন্তর্গত মুরদিয়া গ্রাম, এই মুরদখানা নামের পরিচয় দিতেছে। প্রকৃতপক্ষে পটুয়াখালির অন্তঃর্গত অনেক স্থান যে অল্প দিন হইল বসবাসের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আকবর শাহ বাকলার যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, শাহ সুজা তাহা হইতে বিশেষ কোন পরিবর্তন করিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু এই বন্দোবস্তে সমগ্র বঙ্গদেশ ৩৪টি সরকার এবং ১৩৫০টি পরগনায় বিভক্ত করা হয়। সম্রাট আকবর যে প্রণালীতে রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহার কোন কোন অংশে তাহার সামান্য পরিবর্তন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখা যায় না।

সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজত্ব সময়ে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গের রাজধানী, ঢাকা (জাহাঙ্গিরনগর) হইতে মুর্শিদাবাদে পরিবর্তিত হয়। ইহার চতুর্দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭২১ খ্রিষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ পুনরায় সমগ্র বঙ্গদেশের বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্তে বঙ্গদেশ ১৩টি চাক্‌লা এবং ১৬০০ পরগনায় বিভক্ত হয়। বাকলা, তখন জাহাঙ্গির নগর (ঢাকা) চাক্‌লার অন্তর্গত হইয়া ২৩৬টি পরগনায় বিভক্ত হয়। বোজরগ উমেদপুর (মুরদখানা) তখন অনেকটা আবাদ হইয়া জনগণের বসতি, এবং শস্য শালিনী ভূমিখণ্ডে পরিণত হওয়ায় বাকলার সঙ্গে একত্রীভূত হয়।

বঙ্গের শেষ মুসলমান নৃপতি নবাব কাসেম আলি খাঁ ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় বন্দোবস্ত করেন। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁ কৃত বন্দোবস্তের বিশেষ কোন পরিবর্তন করেন নাই বটে; তবে খাসের ভূমিব কতক কতক অংশ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাতে চাক্‌লা, জাহাঙ্গিরনগরের নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু নূতন কোন প্রকার বন্দোবস্ত দেখা যায় না।

ইহাই মুসলমান রাজাদের শেষ বন্দোবস্ত; কারণ তাহার কিছুদিন পরেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সনদ গ্রহণ করিয়া বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান হইলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই হইতেই ইংরাজ রাজত্ব রীতিমত আরম্ভ হয়। বোর্ড অফ রেভিনিউর আদেশানুসারে ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মে হইতে দশশালা বন্দোবস্ত আইন (Decennial Settlement) প্রচলিত হয়। কিন্তু দশশালা বন্দোবস্ত ততটা কার্যে পরিণত না হওয়ায়, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে প্রজাপক্ষের যে প্রকার উপকার হইয়াছে তদ্রূপ গবর্নমেন্টও অনেকটা ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনেক পরে কেবল জমিদারগণের উপর আর একটি কর ধার্য হয়। ইহা "জমিদারি ডাক-ছেছ" নামে অভিহিত। রাজকীয় ডাকের যাবতীয় ব্যয় এই কর হইতে নির্বাহ হইয়া থাকে।

লর্ড নর্থব্রুক মহোদয়ের সময়ে বিগত ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে পথ কর ও পাবলিক কর নামক দুইটি কর পূর্তবিভাগের উন্নতিকল্পে ধার্য হইবার প্রস্তাব হয়। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে উহা আইনরূপে পরিণত হইয়া, রাজকীয় কর এবং উপস্বত্বের প্রতি টাকায় দুই পয়সা হিসাবে মোট চারি পয়সা আদায়ের আজ্ঞা প্রচারিত হইল। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্টন সাহেবের সময়ে বরিশাল জেলায় উক্ত কর প্রথম আদায় হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু পরবর্তী বৎসর (১২৮৩ সালে) ভীষণ ঝটিকায়

এই জেলাস্থ আপামর সাধারণ সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অনেকস্থান হইতে জমিদারগণ স্বীয় স্বীয় দেয় খাজনা পর্যন্ত আদায় করিতে পারেন নাই। দয়ার্দ্রহৃদয় মিঃ বার্টন, প্রকৃতিপুঞ্জের এই দুরবস্থা গবর্নমেন্ট সন্নিধানে জ্ঞাপন করাইয়া উল্লিখিত উভয় কর চারি পয়সা স্থলে দুই পয়সা ধার্য করেন। তদবধি ঐ নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু দরিদ্র অধিবাসীদের এই যৎসামান্যস্বচ্ছলতা কতিপয় দেশদ্রোহীর সহ্য হইল না। তাঁহার গবর্নমেন্ট হইতে রাজসম্মান পাইবার আশায় পুনরায় উভয় কর আদায় করিতে গবর্নমেন্টকে উত্তেজিত করেন। পরদুঃখকাতর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ কয়েকজন দেশহিতৈষী এই সম্বন্ধে তুমুল প্রতিবাদ ও বাগবিতণ্ডা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে পুনরায় চারি পয়সাই ধার্য হইল। সেই হইতে রিভ্যালুএসন (Re-valuation) অনুসারে ভূম্যধিকারীগণের আয়ের প্রতি টাকায় দশ পয়সা হিসাবে মিলকিয়াতি জমার উপর এই কর ধার্য হইয়া এযাবত আদায় হইয়া আসিতেছে। একেত নানা কারণে এই দেশের ভূম্যধিকারীগণ অন্তঃসারশূন্য; তদুপরি এই প্রকার করভারে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী হৃতসর্বস্ব হইতেছেন।

পথ কর ও পাবলিক কর ধার্য হইবার কিছু পূর্বে আয়কর (Income Tax) নামক আর একটি কর ধার্য হয়; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ইহা উঠিয়া যাইয়া লর্ড ডফ্রিনের সময়ে পুনরায় প্রবর্তিত হয়। বার্ষিক ৫০০৲ টাকা আয়ের উপর কর আদায় হইতে থাকে। গত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের সময়ে উহা সহস্রাধিক টাকা আয়ের উপর ধার্য হইয়া বর্তমান সময় পর্যন্তও আদায় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই কর ভূমির রাজস্ব অনুসারে নহে, তেজারতি, চাকুরি এবং বাজে আয়ের উপর আদায় হইতেছে। ইহা ব্যতীত গ্রামে চৌকিদারি ট্যাক্স, জেলা ও মহকুমা প্রভৃতি স্থানে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, আবগারি বিভাগের ট্যাক্স প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর আদায় হইতেছে।

সদাশয় ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আমাদের নিকট হইতে যতগুলি ট্যাক্স আদায় করিতেছেন, তন্মধ্যে দুই চারিটি বাদে, বাকিগুলির আয়ের দ্বারা দেশের প্রচুর মঙ্গল সাধিত হইতেছে। পথকর, পাবলিককর দ্বারা দেশে দেশে উৎকৃষ্ট রাস্তা, জলাশয়, দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময়ে যে আমাদের দেশে কোন ট্যাক্স ছিল না, তাহা নহে; বর্তমানে তবু আমাদের টাকা আমরা খরচ করিয়া দেশের কার্য করিতে পারি, কিন্তু মুসলমান রাজত্বে সে সুবিধাও ছিল না। যে সমস্ত ট্যাক্স আদায় হইত, তাহা রাজকোষে মজুত হইয়া রাজার ইচ্ছানুরূপ খরচ হইত। আইন-ই-আকবরি, সৈয়র-অল-মুতক্ষরীন প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে আমরা কয়েকটি বাজেকর অর্থাৎ ট্যাক্স আদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা :—

১। মোল্লা-সেলামি।—এই ট্যাক্স মোল্লাগণের উপাসনা, রোজা, নমাজ প্রভৃতি নির্বাহার্থ আদায় হইত।

২। গাজর।—বস্ত্র ধোলাইকারক অর্থাৎ রজকগণের এই কর দিতে হইত।

৩। বাজন্ত্রী।—বাদ্য ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে এই কর আদায় হইত।

৪। ধুমধারী।—যাহারা বাজিকর, বেদে, এবং ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহাদের এই কর দিতে হইত।

৫। মছাই।—মৎস্যজীবীগণের এই কর দিতে হইত।

৬। চাপ্পা জমাদানি।—কার্পাস এবং বস্ত্র ব্যবসায়িগণের এই কর দিতে হইত।

৭। ঘাধ চলন্তর।—নৌ ব্যবসায়িগণের বাণিজ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিক্রয় করিতে হইলে তাহাদের এই কর দিতে হইত।

৮। চরমুকুন্দিয়া।—তরকারি বিক্রেতৃগণের নিকট এই কর গ্রহণ করা হইত।

৯। নগদ হাসিল।—নারিকেল-সুপারি ব্যবসায়িগণের এই কর দিতে হইত।

১০। রাজুহিয়া।—কাষ্ঠ ব্যবসায়িগণের এই কর দিতে হইত।

১১। জিজিয়া—মুসলমান ব্যতীত, যে কোন জাতিমাত্রকেই এই কর প্রদান করিতে হইত। ধর্মভীরু, শান্তিপ্রিয় হিন্দুগণ এই করভারে যারপরনাই প্রপীড়িত হইয়াছিলেন।

'জিজিয়া' মুসলমান শাসনের দুরপনেয় কলঙ্ক, মুসলমান ভূপতিগণের অনুদারতা এবং অদূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাদশাহগণের মধ্যে কেবল মাত্র সম্রাট আকবরশাহ এইরূপ অনুদগার নীতির বিষময় ফল সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিচক্ষণ সম্রাট এই করের দোষ আলোচনাপূর্বক সুবিশাল মোগলরাজ্যের সর্বত্র ইহা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। জাহাঙ্গির ও শাহজাহান মহামতি আকবরের সকল কার্যের অনুমোদন না করিলেও, এই উদার নীতি পরিবর্জন করিতে অভিলাষী অথবা সাহসী হ'ন নাই। কিন্তু হিন্দুদ্বেষী, ক্রুরচরিত্র ঔরঙ্গজেবের ইহা সহ্য হইল না। তিনি 'জিজিয়া' কর পুনরায় প্রবর্তিত করিয়া হিন্দুজাতির প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইহাই মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। যে মহাজাতির অসাধারণ বীর্য প্রভাবে সুদূর কাবুল হইতে যশোহর পর্যন্ত মোগলের বিজয়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই রাজপুতগণ এই ঘৃণিত আচরণে মোগলের পরম শত্রু হইয়া উঠিলেন। রাজপুত কেন, ভারতের যাবতীয় হিন্দুসন্তান এই অন্যায় করভারে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালীন যবন অত্যাচার-প্রপীড়িত হিন্দুদের অবস্থার সম্যক্ বিবরণী পাঠ করিলে মনে এক অনির্বচনীয় ক্রোধ ও ক্ষোভ উপস্থিত হয়।

আমরা ইন্‌কাম্-ট্যাক্স প্রভৃতির বিরুদ্ধে খবরের কাগজে, অথবা সভা-সমিতিতে আন্দোলন করিয়া গবর্নমেন্টের নিকট মেমোরিয়াল পাঠাই, কিন্তু গবর্নমেন্ট কর্তৃক যে উপকার পাইতেছি, তজ্জন্য কয়জন মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকেন?

মুসলমান শাসন সময়ে যে লোকহিতকর কার্য হইত না, তাহা নহে। তবে বর্তমানে যেরূপ করগুলি কোন বিশেষ কার্যের জন্য সংগৃহীত হইয়া সেই কার্যেই ব্যয়িত হইয়া থাকে, মুসলমানদের সময়ে এইরূপ কোন বিধান ছিল না। রাজস্ব ব্যয় বিষয়ে মুসলমান শাসনকর্তাগণ যথেচ্ছচারী ছিলেন। প্রজার নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ অনেক সময়ে তাঁহাদের আত্মসুখের জন্য ব্যয়িত হইত; তবে কেহ কেহ সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া রাজপথ নির্মাণ, দীর্ঘিকাখনন প্রভৃতি লোকহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ পাঠান সম্রাট শেরশাহ এই সকল কার্যের নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। মহামতি ছবি খাঁ উল্লিখিত বহুবিধ সৎকার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা অস্মদ্দেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

তথ্যসূত্র

১ প্রথম অধ্যায় দেখ।

২. ঋগ্বেদিয় পুরুষ-সূক্ত দেখ।

৩. মহাভারতের মৌষলিক পর্বাধ্যায়।

৪ অতিথির একনাম "গোঘ্ন"। শব্দকল্পদ্রুমের গো শব্দ দেখ।

৫. ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ আদিশূর, ভূশূর প্রভৃতি নরপতিগণকে শূরবংশীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু "আদি" ও "ভূ" কাহারও নাম হওয়া অসম্ভব। বস্তুত আদিশূরাদির নামের শূরভাগ শৌর্যব্যঞ্জক নামৈকদেশ মাত্র,—বংশোপাধি নহে। মহারাজ আদিশূর অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্যবংশীয় ছিলেন যথা :—

অম্বষ্ঠ কুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ় গৌড় বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্বভূমীশ্বরো যথা।।

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত দেবীবর ঘটক বাক্য)

৬. পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূত বল্লালসেন মহীভুজা।
ব্যবস্থাপি চ কৌলীণ্যং দুহিসেনাদি বংশজে।।
(কবিকণ্ঠহার সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা ২ পৃষ্ঠা)
অথ বল্লাল ভূপস্য অম্বষ্ঠ কুলনন্দনঃ।
কুরুতে ইতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্র নিরূপনং।
(রামানন্দ শর্মাকৃত কায়স্থকুল দীপিকা)

৭. বৃদ্ধ পিতামাতরৌ চ স্বাধ্বী ভার্যা সুতঃ শিশুঃ
অপকার্য শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুবব্রবীৎ।
(মনুসংহিতা)

৮. বিশ্বকোষের চন্দ্রদ্বীপ শব্দ দেখ।

৯. ছন্দোভিশ্চৈকবন্দ্যো শ্রুতিনিয়মগুরু ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।
সদ্ভৃত্তস্বচ্ছবর্ষোজ্জলপুরুষ গুণাচ্ছিন্নসন্তানধারা
বৃন্দৈর্মুক্তামরস্ত্রী নিরগমদবনের্ভূষণং সেনবংশঃ।।—দানসাগর আরম্ভ বাক্য

১০. ততো বহুতিযেকালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ। বল্লালসেন নৃপতিরজায়ত গুনোত্তরঃ।।
(বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জী)

১১. পুরাবৈদ্যকুলোদ্ভূত বল্লালেন মহীভূজা। ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্যং, দুহিসেনাদি বংশজে।।
(কবিকণ্ঠহার, সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা)

১২. অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ। কুরুতেহতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং।।
(কায়স্থঘটক রামানন্দ শর্মকৃত কায়স্থকুলদীপিকা)
বল্লালসেন নৃপতি হইল পশ্চাৎ। অম্বষ্ঠবংশেতে জন্ম, ব্রহ্মপুত্রজাত।।
(চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা পরমানন্দ রায়ের সমকালীন হস্তলিখিত কায়স্থঘটককারিকা)

১৩. বৈদ্যবংশাবতংসোয়ং বল্লালোনৃপপুঙ্গবঃ। তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লাচরিতং শুভং।।
(গোপালভট্ট বিরচিত বল্লাচরিত, উত্তরখণ্ড)

১৪. মাঘমণ্ডল, সেজুতি, যমপুকুর প্রভৃতি ব্রত কুমারীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত।

১৫. দরিদ্রং ব্যাথিতং মূর্খং ভর্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতাং জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
(পরাশর সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোক)

১৬. ন পৃচ্ছেদ্ গোত্রচরণং ন স্বাধ্যায় ব্রতানিচ
হৃদয় কল্পয়ে তস্মিন সর্ব্বদেব ময়োহিসঃ।
(পরাশর সংহিতা, ১ম অধ্যায় ৪১ শ্লোক)

১৭ নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।
(পরাশর সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক।)

১৮. উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষএহি।
হস্ত গ্রীভস্যাদিধিষোস্ত বেদং পত্যুর্জ নিত্বযভিসংবভূথ।। —ঋগ্বেদ

১৯. তিস্রঃ কোট্যদর্ধ কোটীচ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।।
(পরাশর সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক)

২০. ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ ভার্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং।
ত্র্যষ্ট-বর্ষোহষ্টবর্ষাম্বা ধর্মে সীদতি সত্বরঃ।।
(মনুসংহিতা)

২১. ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াং শুল্ক মম্বপি,
গৃহ্ন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোহপত্য বিক্রয়ী।
(মনুসংহিতা)

শুল্কে ন যে প্রযচ্ছন্তি স্ব সুতাং লোভমোহিতাঃ
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপাঃ মহাকিল্বিষকারিণঃ
তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী।

(স্মৃতি সংগ্রহ)

২২. মহারাজ আদিশূরের পূর্বে বৌদ্ধ ধর্ম এবং আদি সেননৃপতিগণের রাজত্ব সময়ে অর্ধনারীশ্বরের উপাসনা বঙ্গদেশে প্রবল ছিল।

২৩. বর্তমান গৈলা ফুলশ্রী।

২৪. I stood just outside the temple. There was a huge concourse of people of both the sexes. On a dozen of *Bamboo Machaus* half naked men and women were heard to utter something quite incomprehensible to others. Soon after one of the men drew out a black snake from an earthen pot, which soon expanding its hood, bit the man twice or thrice on his arms. After a few minutes the man fell down and I was horor stricken to find that he shewed all the symptoms venomous snake poisoning * * * A woman, an ugly looking creature of the same *Machan*, coming up to prostrate man uttered some mystic words, and with her hands made some mesmeric motions over the face of the patient. Soon after, the dying man opened his eyes, which at the first glance looked blood shot Several handful of cold water was then sprinkled over his face and eyes and within quarter of an hour the man was all right, as if nothing had happened to him—I personally saw the snake which was indeed of venomous type—Ext. From Mr Taylor's Minutes, August 28th, 1790.

২৫. বোধ হয় চতুষ্পাঠীর অপভ্রংশ।

২৬. It is supposed that the 'purdanashin system' was introduced after the Mahamadan conquest. Ex. from the essay on female emancipation by Rev. W. Early.

২৭. বিজয় সিংহ কর্তৃক সিংহলবিজয় দেখ।

২৮. মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত দ্রষ্টব্য।

২৯ রাজার এক নাম ষষ্ঠ ভাগ।

৩০. His (King's) internal administration is to be conducted, by a chain of civil officers, consisting of Lords of single townships or villages, Lords of 10 towns, Lords of 100 and Lords of 1000 towns —Elphinstone's History of India, p. 22.
Each township conducts its own internal affairs. It levies on its members the revenue due to the estate, and is collectively responsible for the payment of the full amount It manages its police, and is answerable for any property plundered within its limits. It administers justice to its own members as far as punishing small offences and deciding disputes in the first instance It taxes itself to provide funds for its internal expenses, such as repairs of the wall and temple and the cost of public sacrifices and charities, as well as of some ceremonies on festivals.—Elphinstone's History of India Page 68

৩১. নিস্তব্ধে নির্গবাক্ষে চ প্রাসাদাগ্রে হত্যারণ্যেবা
গিরিপৃষ্ঠঃ সমারোহ্য মন্ত্রয়েৎ অভিভাবিত। (শিশুপাল বধ।)

৩২. মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়,—৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৯, ১০২, ১০৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫১, ২১৬, ২১৭, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৫, শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩৩. In all villages there are two descriptions of tenants, who, rent the lands of the village-land holders (where there are such), and those of the government, where there is no such intermidiate class. The tenants are commonly called *Royats*, and are divided into two classes; permanent, and temporary. The permanent *Rayats* are those, who cultivate the lands of the village, where they reside, retain them during their lives, and transmit them to their children * * * The temporary tenant cultivates the lands of a village different from that to which he belongs, holding them by an annual lease, written or understood. * * * * There is another sort of tenant who deserves to be mentioned, though of much less inportance than either of the other two These are persons whose cast on condition in life prevents their engaging in mannual labour, or their women from taking part in any employment, that requires their appearing before men. In consideration of these disadvahtages they are allowed to hold land at a favourable rate, so as to admit of their availing themselves of their skill of capital by the helps of hired labourers.—Elphinstone's History of India, Page 73-75

৩৪. Besides the immense number of bilingual coins, there are also some inscriptions in a similar character of vases etc, found on topes These letters have been hitherto but imperfectly deciphered, but the earlier series of coins presents few difficulties and the value of the letters has been clearly determined The language of the coins during the existence of the Greek Princes and their immediate successors, was a vernacular dialect of Sanskrit to all the varieties of which the appellation *Prakrit* is applicable. With the Indo-Scythian Kings, words berrowed from Truks or other Asiatic dialects may possibly have been intermixed with those of Indian currency, and we have in the inscriptions on the vases possibly a different dialect, sparingly intermingled with words of Sanskrit origin —Foot Note of Elphinstone's History of India, Page 268.

৩৫. Commercial transactions were carried on by barter, goods being exchanged for other goods Hwen Tsang even says that no gold or silver coins were known It is probable that none were generally used for ordinary transactions.—R C. Dutt's Ancient India. Vol IV, P 145.

৩৬. মূল রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড, দ্বাত্রিংশ স্বর্গ, ৬—১০ম কবিতা।

৩৭. বত্রিশ রতি স্বর্ণনির্মিত মুদ্রা।

৩৮. মূল মহাভারত—সভাপর্ব, একষষ্ঠিতম অধ্যায়।

৩৯. Akbar's revenue system, though so celebrated for the benefits it cenferred on India presented no new invention. It only carried the previous system into efiict with greater precision and correctness; it was in fact, only a continuation of a plan commended by Sher Shah, whose short reign did not admit of his extending it to all parts of his kingdom -Elphinstone's History of India Page 541.

৪০. This settlement was made in 1582. The *khalisa* or State Lands were divided into 19 Sarkars, which included 682 *Parganas* Bakarganj (Bakla) was no doubt included in the Sarkar of Sonargang which comprised 52 Parganas * * * —Sir W. W. Hunter's S. A. of Bengal, Vol V, Page 221

৪১. Sarkar Bozooha,—The forests of this Sarkar supply timbers fit for building boats and for the beams of houses and here is an iron mine,—Gladwin's Ain-i-Akbari, Page 304.

৪২. H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 51.



পঞ্চম অধ্যায়

পরগনা

বর্তমান সময়ে এই জেলা প্রায় ৪৭টি পরগনায় বিভক্ত; কিন্তু হিন্দু, পাঠান এবং মোগল রাজত্বের প্রারম্ভ পর্যন্তও কোথাও কোন পরগনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুরাজত্ব সময়ে কেবল মাত্র বাকলা নামে এই সমগ্র ভূখণ্ড অভিহিত হইত। পাঠানরাজত্ব সময়ে ঢাকা বিভাগের যাবতীয় স্থান খলিফাবাদ ও ফতিয়াবাদ নামে বিখ্যাত ছিল। সম্রাট আকবরের সময়েও পরগনার নাম নাই; তখন সরকার শব্দ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। তখনও রাজস্ব হিসাবে সরকার বাকলা বলিয়া এই দেশ পরিচিত ছিল।

পরগনা বৈদেশিক শব্দ, পারস্য ভাষা হইতে উৎপন্ন; কিন্তু কোন মুসলমান নৃপতি, এই সমগ্র ভূখণ্ড পরগনায় বিভক্ত করেন, তাহা জানা যায় না। মহাত্মা বেভারিজ, হাণ্টার, টাইলর প্রভৃতি মনীষীগণও তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। এই বিভাগ যে মুসলমান রাজত্ব সময়ে হইয়াছে, তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষত অধিকাংশ পরগনাগুলির নাম যাবনিক, অধিকন্তু পরগনার অন্তর্গত উপপরগনাগুলিও যাবনিক নামের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই; যথা—"তপ্পে" 'তরফ" "গ্রেদ" ইত্যাদি।

পার্সি ভাষায় পরগনা শব্দে কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি বুঝায়; এলফিনষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন যে ১০০টি গ্রামের সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রকে পরগনা বলে।[১] এই দেশস্থ পরগনাগুলির মধ্যে উল্লিখিত প্রকারের দুই চারিটি যে না আছে তাহা নহে, কিন্তু কোন কোন স্থানে ১০০/১৫০গ্রাম অথবা ততোধিক গ্রামেরও সংখ্যা পাওয়া যায়। উপপরগনাগুলির অধীনে, ২০/২৫ থেকে ৫০/৬০ টি গ্রামের বেশি নাই। আবার কোন কোন পরগনা বর্তমান সময়ে অন্য জেলার অধীন হইলেও তন্নিম্নস্থ তালুকের রাজস্ব বরিশালের কালেক্টরিতে দাখিল হয়। সর্বসমেত ৪৭টি পরগনার মধ্যে ১০টি পরগনা উল্লিখিত প্রকারের, বাকি ৩৭টি পরগনার মধ্যে ও আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র, এবং উপপরগনা; তাই বরিশালের ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর বেভারিজ্ সাহেব, বর্তমান সময়ে বাকরগঞ্জ, পরগণা সমূহের দ্বারা নিম্নলিখিত রূপে বিভাগ করিয়াছেন।

উত্তরে বাঙ্গরোড়া, বীরমোহন, ইদ্রাকপুর, এবং চন্দ্রদ্বীপ; পূর্বে উত্তর এবং দক্ষিণ সাহাবাজপুর, ইদিলপুর, সুলতানাবাদ, নাজিরপুর, এবং বতনদি-কালিকাপুর; মধ্যভাগে চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ, বোজরগ উমেদপুর এবং অরঙ্গপুর; পশ্চিমে সেলিমাবাদ এবং সৈয়দপুর; দক্ষিণভাগে সমুদ্রতীরব্যাপী সুন্দরবন।[২] সুন্দরবন কোনও পরগনাভুক্ত হয় নাই; কিন্তু ইহা সরকার "বাজুহা"র অন্তর্গত ছিল।

বর্তমান বাকরগঞ্জের প্রত্যেক ভূমিখণ্ড কোন না কোন পরগনার অধীন, এবং প্রায় প্রত্যেক

স্থানই সরকারি কাগজে দেখা যায়; সুতরাং প্রত্যেক পরগনার রাজস্ব, এবং তৎসংশ্লিষ্ট ইতিহাস লিখিতে হইলে সরকারি কাগজপত্রের সাহায্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। মহাত্মা বেভারিজ্ সাহেব, এই জেলার প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন; তিনি এই জেলার ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া পরগনা বিভাগ এবং রাজস্ব যে প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ। সুন্দরবন আবাদ হইয়া যে সমস্ত স্থান লোকালয়ে পরিণত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি; তাহা ক্রমান্বয়ে বলিতে চেষ্টা করিব।

পরগনাগুলির নাম

ও

সরকারি রাজস্ব

	নাম।		সরকারি রাজস্ব
১।	চন্দ্রদ্বীপ	.....	৮২,৫৬২ টাকা ।৷৶৪।।
২।	গ্রেদ বন্দর[৩]	...	
৩।	বোজরগ উমেদপুর	....	৩৪,৫৪৬।।১১
৪।	সেলিমাবাদ	...	৯৮,২২৭ ১
৫।	তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদ	...	১১,০৫৫।। ৫
৬।	তপ্পে হাবিলী	...	৬৪৪।।১০
৭।	ইদিলপুর	...	৬৫,৯০৪।১১
৮।	তপ্পে নাজিরপুর	...	২৮,৭৮৩ ৪।।০
৯।	রতন্দি কালিকাপুর	...	২৫,২৩৭।। ৪
১০।	উত্তর সাহাবাজপুর	...	৭,৬৪৫ ৯।।
১১।	দক্ষিণ সাহাবাজপুর	...	৪৪,৪১৩ ৫
১২।	কৃষ্ণদেবপুর	...	৮১৬
১৩।	আলিনগর	...	১,৫৭৮। ৫
১৪।	রামনগর	...	৫,১৮৭। ৬
১৫।	রামহরি চর	...	...
১৬।	কল্মি চর	..	.
১৭।	সুলতানাবাদ	...	২১,১২৮ ৫
১৮।	কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়া	...	১,৬৩৩।। ১১
১৯।	খাঞ্জা বাহাদুর নগর	...	৬৪।।৬।।
২০।	শ্রীরামপুর	...	৪১১/১।। ০
২১।	তপ্পে আবদুল্লাপুর	...	৩,৫৫১।। ৬
২২।	তপ্পে কাদিরাবাদ	...	৯৬২ ১০।।
২৩।	তপ্পে আজিমপুর	...	২৭৪৮। ৮।।
২৪।	জাহাপুর	...	৮৫৩।। ১০
২৫।	ইদ্রাকপুর	...	৩,২৭৮।। ১০
২৬।	রসুলপুর	...	...
২৭।	বাঙ্গরোড়া	...	৩৬৫।৶৯।।
২৮।	বীরমোহন	...	...
২৯।	তপ্পে বীরমোহন	...	১৩। ৪
৩০।	হবিবপুর	...	৮৭৮ ১১।।
৩১।	মৈজরদি	...	৩৪৫ ৬

৩২। জালালপুর	...	৩৬৫। ৪
৩৩। শায়েস্তাবাদ	...	১,০৪০ ।।
৩৪। শায়েস্তানগর	...	১,৫৩৭ ৬
৩৫। সাহাজাদপুর	...	৬,৮৯৭.৩।।
৩৬। তপ্পে বাহাদুর	...	৪৯১৩ ১
৩৭। অরঙ্গপুর	...	১৪,৩৬৪। ৬
৩৮। সৈয়দপুর	...	৬৫৭০ ৯
৩৯। বৈকুণ্ঠপুর	...	...
৪০। তপ্পে রাজনগর	...	..
৪১। রাজনগর	...	...
৪২। তপ্পে সফিপুর কোপা	...	...
৪৩। আমিরাবাদ	...	...
৪৪। বিক্রমপুর	...	...
৪৫। গোপাল নগর	...	...
৪৬। দুর্গাপুর	...	...
৪৭। কাশিমপুর সেলাপট্টি	...	...[৪]

ইহাই বর্তমান সময়ের পরগনা। কিন্তু সরকারি কাগজপত্রে বাকলা শব্দের কোন উল্লেখ নাই। আগা বাখরের সমগ্রদেশ সমগ্রদেশ অভিহিত হইবার পর হইতেই, বাকলা শব্দের অস্তিত্ব লোপ হইয়া গিয়াছে। আইন-ই-আকবরিতেও ইস্‌মাইলপুর বলিয়া বাকলার আর একটি যাবনিক নামের উল্লেখ আছে; কিন্তু তৎসময়ে বাকলা নামই প্রচারিত ছিল। বেভারিজ্ সাহেব বলেন যে বাকলা এবং চন্দ্রদ্বীপ একই পরগনা।[৫]

আমাদের দেশের অধ্যাপকমণ্ডলী—সমগ্র জেলাকে পাঁচটি পরগনায় বিভক্ত করেন। যথা—বাকলা, বাঙ্গরোড়া, সোন্দারকূল, অরঙ্গপুর ও শায়েস্তানগর। অদ্য পর্যন্তও এই নিয়মে উল্লিখিত পরগনাবাসী অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী, দ্রাবিড় প্রভৃতিস্থানে অদ্যাপি বাকলা বলিয়া এই দেশ পরিচিত; বাখরগঞ্জ অথবা বরিশাল বলিলে, অনেকে চিনিতে পারেন না।

আইন-ই-আকবরিতে সরকাব বাকলার সহিত যে চারটি সরকারের নামোল্লেখ আছে, বর্তমান পরগনা বিভাগেও সেই গুলি দেখিতে পাওয়া যায়; তবে বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ পরগনায় পরিণত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। বেভারিজ্ সাহেব ২২টি পরগনা নির্দেশ করেন; যথা:—

১। বোজরগউমেদপুর	১২। খোর্দ সফিপুর।
২। বাঙ্গরোড়া	১৩। সাহাজাদপুর।
৩। খাঞ্জা বাহাদুর নগর।	১৪। কাশিমপুর সেলাপট্টি।
৪। অরঙ্গপুর।	১৫। রসুলপুর।
৫। শায়েস্তা নগর।	১৬। শায়েস্তাবাদ।
৬। বাহাদুরপুর।	১৭। ফরোক্কাবাদ।
৭। ফেদাইনগর।	১৮। তপ্পে বীরমোহন।
৮। উত্তর সাহাবাজপুর	১৯। নাজিরপুর।
৯। আজিমপুর।	২০। সুলতানাবাদ।
১০। রামনগর।	২১। সফিরপুর কোলা।
১১। ইদ্রাকপুর।	২২। বীরমোহন।

এই দ্বাবিংশতি পরগনার মধ্যে আমরা ফেদাইনগর, ফরোক্কাবাদ এবং খোর্দ সফিপুর নামে আরও নূতন পরগনার নাম দেখিতে পাই, কিন্তু রতন্‌দি কালকাপুরের কোন নামোল্লেখ নাই।

বেভারিজ্ সাহেব বলেন যে নাজিরপুর এবং নিকটবর্তী অন্যান্য পরগনা হইতে রতন্দি কালিকাপুর বাহির হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে সেলিমাবাদ ব্যতীত, অন্যান্য যাবতীয় পরগনা চন্দ্রদ্বীপ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে।[৬] কেননা, চন্দ্রদ্বীপ হইতেই এই দেশের প্রাধান্য, এবং ইহারই গৌরবে অদ্য পর্যন্ত এই দেশবাসী গৌরবান্বিত। সম্ভবত শাসন এবং রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য অন্যান্য পরগনাগুলি বাহির করা হইয়াছে। আবার ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে যে চন্দ্রদ্বীপ-রাজগণ হীনবল হইলে, অধীনস্থ প্রজাগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় নামানুসারে নূতন পরগনা সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যতগুলি পরগনা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রায় সকলগুলিতেই নাম সংযোজিত আছে; তন্মধ্যে অধিকাংশই যাবনিক। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রদ্বীপ পরগনা হইতে উল্লিখিত পরগনাগুলি বাহির হইবার কোন কারণ এযাবৎ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। বর্তমান ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগনাও চন্দ্রদ্বীপ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। অন্য জেলাভুক্ত বলিয়া বেভারিজ্ সাহেব তৎকৃত গ্রন্থমধ্যে ইহার উল্লেখ করেন নাই।

চন্দ্রদ্বীপ এবং অন্যান্য পরগনা, ও তদন্তর্গত প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং উল্লেখযোগ্য বংশাবলীর ইতিহাস যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা প্রকাশিত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক স্থলে এই সমস্ত সংগ্রহ করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছি। বলিতে লজ্জা হয় যে, কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। দেশের ইতিহাস সঙ্কলন একজনের সাধ্য নহে, দশজনের সাহায্য আবশ্যক, জানি না, আমাদের স্বদেশবাসীগণ কখন এই সত্য উপলব্ধি করিবেন। এই হতভাগ্য দেশে সেই শুভদিন কখনও আসিবে কি?

১ চন্দ্রদ্বীপ

বাকরগঞ্জে যতগুলি পরগনা আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন; হিন্দু রাজত্বের সময়েও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন সময়ে যে ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রাচীন ভৌগোলিকগণ রাঢ় এবং বঙ্গ দেশকে দ্বাদশ ভাগে[৭] বিভক্ত করিয়া তাহাদের স্থিতি নির্ণয় করিয়াছেন; চন্দ্রদ্বীপ তন্মধ্যে অন্যতম। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সমাজপতিগণ ইহাকে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের প্রধান সমাজ স্থান এবং বহু সৎক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। ইহার অন্যতম নাম যে বাকলা তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার অন্তর্গত প্রদেশগুলি সমুদ্রতীরবর্তী; সময়ে সময়ে জল মগ্ন হইত, আবার উত্থিত হইত। মিশ্রী গ্রন্থে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়, যথা . —

রত্নাকরো মহাতীর্থ দক্ষিণস্যাং দিশিস্থিতঃ।
মুক্তবেণী মধ্যদেশে পদ্মাযস্যোত্তবা সদা।।
বলেশ্বর পূর্ব্বভাগে চন্দ্রদ্বীপ সমন্বিতঃ।
দেশোহয়ং পুণ্যতীর্থস্তু ব্রাহ্মাণ্য ইতিকথ্যতে।।

এডু মিশ্র আরও একটু স্পষ্টভাবে চন্দ্রদ্বীপ স্থিতি এবং উক্ত প্রকার নামের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি। —

চন্দ্রদ্বীপস্য সীমায়াং রত্নাকরো বিরাজতে।
চন্দ্রবৎ ক্ষীয়তে তস্য চন্দ্রবৎ বর্দ্ধতে বপুঃ।।
তস্য তদ্‌গুণযোগেণ চন্দ্রদ্বীপ ইতিস্মৃতঃ।
গুহক ইতি বিখ্যাতোনাম্না সর্বনৈরয়ম্।।

ভবিষ্য পুরাণে চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ভূখণ্ড সর্বদা জলসিক্ত এবং আর্দ্র থাকিত; ভগবান ভবানীপতির ললাটস্থ অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক হইয়া ত্বরায় প্রবীণ জনপদে পরিণত হওয়ায় শৈবদিগের আবাস নিকেতন হইল। অপিচ মহাদেবের ভালস্থিত শশিকলা ভূখণ্ডকে অগ্ন্যুত্তাপ হইতে পুনরায় শীতল করিল। ভবিষ্য পুরাণ, উপপুরাণের মধ্যে গণ্য; অনেকে অনুমান করেন যে, এই গ্রন্থের বয়স দুই শত বৎসরের অধিক হয় নাই। ইহার মধ্যে মগ, পর্তুগিজ

যবন, ইংরাজ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি অনেকের কথা আছে। অন্যান্য পুরাণের ছায়াবলম্বনে দেবাসুরের যুদ্ধ সম্বন্ধেও যে দুই একটা গল্প লিখিত না আছে তাহা নহে। আবার রাজনীতি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম, চাতুর্বর্ণ প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভাষা দেখিলে বোধ হয় যে কোন আধুনিক পণ্ডিত নানা গ্রন্থ হইতে কতক কতক সংগ্রহ করিয়া সাময়িক কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থমধ্যে যাহা পাইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, ইহার সত্যাসত্য পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। —

চন্দ্রদ্বীপে পুরা বিপ্রাস্তোয় পূর্ণাচ ভূমিকা।
মহাদেব প্রসাদেন শুষ্ক ভূতাহি মৃত্তিকা।।
ললাটনলদাহেন বিলীনং হি জলংবহু।
স্থলীভূতাচ্ছ পৃথিবী শৈবানাং সুখকারিকা।।
মহাদেবং মৃড়ানীচ পপৃচ্ছ সারদান্বিতা।
পূর্ণচন্দ্রং বিহায়ের ধার্য্যতে শশিনঃ কলা।।

পুনশ্চঃ—
মহাদেব উবাচ—

"অনাদি পৌর্ণমাস্যন্তাঃ যা এব শশিনঃ কলাঃ।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতা ষোড়শৈব বরাননে।।
অমা ষোড়ষভাগেন দেবীপ্রোক্তা মহাকলাঃ।
সংহিতা পরমামায়া দেহিনাং দেহধারিণী।।
অমানাম্নী কলামধ্যে খাবাসাং ত্বং প্রতিষ্ঠিতা।
অতোহি ত্বং মমাধার্য্যা কলাকাল প্রথাথিনী।।
তস্যাকলায়াঃ কিরণৈঃ স্থিতা দ্বীপাচ ভূসুরাঃ।
অতো প্রজাঃ কলা চন্দ্রদ্বীপে ধর্ম্মপরায়ণা।।"

উল্লিখিত যে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আমরা শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, প্রাচীনত্ব না থাকিলেও মিশ্রী গ্রন্থের বচনগুলিতে ভৌগোলিক আভাস পাওয়া যায়। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, চন্দ্রদ্বীপ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার আর যে কয়েকটি সীমা দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান সময়েও সেই স্থানগুলি আছে; এই চতুঃসীমাবর্তী চন্দ্রদ্বীপ যে একটা বৃহৎ জনপদ এবং প্রধান সমাজস্থল তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভবিষ্য পুরাণোক্ত বচনগুলির ঐতিহাসিক তত্ত্ব ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে প্রাকৃতিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, চন্দ্রদ্বীপ ভূখণ্ড কোন সময় সম্যক্ প্রকার জলমগ্ন ছিল, ইহা প্রকৃত; কেননা সাগরতীরব্যাপী অনেক স্থল যে সাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

বর্তমান বাকরগঞ্জের অধিকাংশ সুগন্ধা নদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নদীর অস্তিত্ব এখন নাই, তবে ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত পঞ্চকরণের সম্মুখবর্তী ক্ষুদ্র খালকে অনেকে সুগন্ধা নদীর একটি বেণি বলিয়া উল্লেখ করেন। আবার কেহ কেহ কালীজিড়া নদীর অংশবিশেষকেও সুগন্ধা বলিয়া নির্দেশ করেন। মিঃ রেনেলকৃত মানচিত্রেও[৮] সুগন্ধার উল্লেখ আছে। বর্তমান ঝালকাঠি নদী এবং কালীজিড়ার কোন কোন অংশকে তিনি সুগন্ধা নদী বলিয়াছেন; কিন্তু মানচিত্র দেখিলে বোধ হয় যে তৎকালে ঐ নদীর অনেক স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে এদেশে দুইটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মহাত্মা বিভারিজ্, ডাক্তার ওয়াইজ এবং বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরাও পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ উহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। যখন এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রায় অধিকাংশস্থল সুগন্ধার গর্ভে বিলীন ছিল, তখন বিক্রমপুর পরগনায় চন্দ্রশেখর নামে একজন ধার্মিক, শুদ্ধাচার এবং তপানুশীল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহাকে

সুপাত্র দেখিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত স্বীয় সর্বগুণসম্পন্না সর্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ দিলেন। সম্প্রদানের সময়ে চন্দ্রশেখর সভয়ে শুনিলেন যে তাঁহার নবোঢ়া পত্নীর যে নাম, তাঁহার উপাস্যা দেবীরও সেই নাম; ব্রাহ্মণের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। যে উপাস্যাদেবীকে তিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে শয়নে স্বপনে সর্বদা আরাধনা করিয়া থাকেন, আজ সেই উপাস্যদেবীকে চিন্তা করিলে স্ত্রীর নাম স্মৃতিপথে উদয় হইবে, যাহাকে মা বলিয়া ডাকিলে স্ত্রীর নাম মুখে আসিবে, আজ তিনি কেমন করিয়া সেই স্ত্রীসহবাসে মহাঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইবেন? অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের হৃদয়ে এই সকল চিন্তা উপস্থিত হইলে, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন; তাঁহার হৃদয় দুরদুর করিতে লাগিল অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্বজন্মার্জিত মহাপাপে এই প্রকার সংঘটিত হইয়াছে। এখন প্রাণত্যাগ ব্যতীত কিছুতেই ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিতে স্থির সংকল্প করিলেন।

ধীরে ধীরে বিবাহকার্য সম্পন্ন হইল, স্ত্রী-আচাব পর্যন্ত নির্বাহ হইয়া গেল; বর-কন্যা বাসরঘরে যাইবার পূর্বে চন্দ্রশেখর কৌশলে পলায়ন করিলেন। বরবেশেই সেই গভীর নিশীথ সময়ে ধার্মিক ব্রাহ্মণ একাকী স্বগৃহে আসিয়া, একখানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণপূর্বক একমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষেপণি সহযোগে উত্তালতরঙ্গ সমাকুল সমুদ্রতুল্য নদীবক্ষে ভাসমান হইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল; চতুর্দিকে অনন্ত জলরাশি,—স্ফীতবক্ষে দিগ্‌দিগন্তপানে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথায়ও উদ্বেলিত তরঙ্গগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া জলের সহিত মিশিতেছে, আবার কোথাও উশৃঙ্খল গতিতে পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে। এই ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতের শ্রবণভীতিকর শব্দেও কিঞ্চিৎমাত্র ভীত না হইয়া, ব্রাহ্মণ একাকী সেই ক্ষুদ্র তরণী লইয়া স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। জনমানব দূরে থাকুক, এমনকি আকাশে কোন উড্ডীয়মান পক্ষী পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। এইরূপ দুইদিন গত হইল, তৃতীয় দিনে সূর্যোদয়ের পর ব্রাহ্মণ অনতিদূরে ক্ষুদ্র তরণী আরূঢ়া অসামান্য রূপবতী এক কিশোরীকে দেখিতে পাইলেন। এই সমুদ্রতুল্য ভীষণ নদীগর্ভে একাকিনী এই রমণীকে দেখিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন এবং কৌতূহলী হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার তরণী উক্ত রমণীর নিকটবর্তী হইলে, চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন সাহসে একাকিনী এই সমুদ্র মধ্যে আসিয়াছ? তোমার কি প্রাণের ভয় নাই?"

ব্রাহ্মণের কথা শেষ হইলে কিশোরী বলিল "আমি ধীবরকন্যা, নদীতে বাস করাই আমার ব্যবসা; আমি ইহাতে কোনপ্রকার ভীতা বা সঙ্কুচিতা হই নাই। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যান্বিতা হইলাম যে আপনি একাকী এই ভয়ঙ্কর নদীতে আসিয়াছেন; আপনারও কি প্রাণের ভয় নাই?"

রমণীর এই কথা শুনিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকাল চিন্তাপূর্বক তাঁহার মনোগতভাব ব্যক্ত করিলেন।

ধীবরকন্যা তাঁহার কথায় হাস্য করিয়া বলিল "ঠাকুর, দেখিতেছি আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শাস্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি অনেক অধ্যয়ন করিয়াছেন; এই সামান্য রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন? আপনি কি জানেন না যে জগন্মাতা ভগবতী প্রত্যেক নারীতে অংশরূপে অধিষ্ঠিত। আপনার মাতা, পিতামহী, মাতামহী, স্ত্রী, কন্যা, প্রভৃতি যাবতীয় নারীতেই তিনি সমভাবে বিরাজ করেন, ইহা কি বুঝিতে পারেন না? আবার যে প্রত্যেক পুরুষদেহে ভগবান মহাদেব অংশরূপে বিরাজিত, তাহাও কি ভুলিয়া গিয়াছেন? ইহাতে যদি পাপ হইত তবে বিধাতা কিছুই সৃষ্টি করিতেন না। যান ঠাকুর! বাড়ি গিয়া স্ত্রীর সহিত স্বধর্ম পালন করুন।"

ধীবরকন্যার বাক্য শেষ হইলে ব্রাহ্মণের ভ্রমান্ধকার কাটিয়া গেল। অল্প বয়স্কা, অশিক্ষিতা, ধীবরকন্যার মুখ হইতে এইপ্রকার সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার দিব্যজ্ঞান উদয় হইল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একলম্ফে ধীবরকন্যার নৌকায় গিয়া দুই হস্তে তাঁহার পদযুগল বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার কথায় আমার মোহ ঘুচিয়াছে। ধীবরকন্যার মুখ হইতে এই প্রকার সারগর্ভ কথা কিছুতেই বাহির হইতে পারে না, তুমি নিশ্চয়ই কোন দেবী, ছল করিয়া আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ; তোমার সত্য পরিচয়

প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।" এই বলিয়া চন্দ্রশেখর তাঁহার চরণদ্বয়ের উপর স্বীয় মস্তক স্থাপনপূর্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ধীবরকন্যা ব্রাহ্মণের এবম্বিধ আচরণে ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল "আমি অস্পৃশ্যা ধীবরকন্যা, আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া কেন আমার অকল্যাণ করিতেছেন? শীঘ্র আমার পদদ্বয় পরিত্যাগ করুন।"

চন্দ্রশেখর কিছুতেই পদত্যাগ না করিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা, আমার বিশ্বাস হইতেছে তুমি নিশ্চয়ই দেবী; অভাগাকে ভুলাইতে আসিয়াছ। তোমার প্রকৃত পরিচয় না পাইলে পদযুগল পরিত্যাগ করিব না। এখনই তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিব। তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ ঘটিবে।

রমণী তথাপিও আত্মপরিচয় দিতে স্বীকৃতা হইল না। এইপ্রকার অনেকক্ষণ গত হইলে যখন চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে ইনি কিছুতেই আত্মপরিচয় দিবেন না, তখন আত্মত্যাগ করবার জন্য নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। তখন সেই রমণী বলিল "বৎস চন্দ্রশেখর! আমি এতক্ষণ তোমার ভক্তি ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতেছিলাম। তুমি যাঁহাকে দিবানিশি ভক্তিসহকারে আরাধনা কবিয়া থাক, আমিই তোমার সেই উপাস্যা দেবী। বৎস, আত্মহত্যা মহাপাপ, তুমি নৌকায় আরোহণ কর।"

চন্দ্রশেখর অতীব আহ্লাদের সহিত দেবীর আদেশ অনুসারে নৌকায় উঠিলেন ও ভক্তিভরে উপাস্যা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। যাঁহাকে মনে মনে অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন চিন্তা করিয়া থাকেন, যাঁহার শ্রীপদ পাইবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ দিবানিশি আরাধনা করেন, ব্রাহ্মণ আজ সেই দেবদুর্লভ চরণ দর্শন পাইয়া পুনঃ পুনঃ সেই চরণে প্রণতিপূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন ভক্তিরসে ভিজিয়া উঠিল। দেবী স্তবে তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। প্রণতি-শিরোধরাংসা চন্দ্রশেখর ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা, যাঁহার স্বরূপ হৃৎপদ্মে বিকশিত হইলে সর্ববিধ বাসনা পরিপূর্ণ হয়, আজ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আমার সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে। মাগো, কৃপা করিয়া এ দাসকে একবার স্বরূপে দেখা দাও।"

ভক্তবৎসলা দয়াময়ী তৎক্ষণাৎ স্বরূপ ধারণ করিয়া ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতঃ বলিলেন 'বৎস, আজ যে স্থানে তুমি আমার দর্শন পাইলে আমার বরে অতি সত্বরই এই বিপুল জলরাশি সর্বশস্যময়ী মেদিনীতে পরিণত হইবে, এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তুমিই রাজত্ব করিবে।"

চন্দ্রশেখর পুনঃ প্রণত হইয়া বলিলেন "মাতঃ! যখন পূর্বপুণ্যফলে এ পবিত্র চরণ দর্শন পাইয়াছি তখন রাজ্যভোগে আর আমার স্পৃহা নাই কেবল এই বর দাও যেন বারংবার আর এই পাপময়ী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। রাজ্যভোগে বিন্দু মাত্র স্পৃহা নাই, তবে এই কর মা যেন এই ভূখণ্ড তোমার এই দীন সন্তানের নামে প্রসিদ্ধ হয়।" দেবী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এবং চন্দ্রশেখরও হৃষ্টমনে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেবীর আশীর্বাদে অতি শীঘ্র সেই বিশাল জলরাশি অপসারিত হইল। সেই নবাবিষ্কৃত ভূমি চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

২। —চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী[১] কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। রামনাথ দনুজমর্দন দে নামে তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্যও সঙ্গে ছিলেন। একদা এই সুগন্ধা বক্ষে সকলেই রাত্রিযোগে নৌকামধ্যে সুষুপ্ত আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মচারী স্বপ্নে দেখিলেন যেন জগদম্বা কালিকাদেবী, তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন যে, যেস্থানে চন্দ্রশেখরের নৌকা রহিয়াছে তাহার অনতিদূরে তিনটি পাষাণময়ী দেবমূর্তি জলনিমগ্ন অবস্থায় আছে; ব্রহ্মচারীর প্রিয় শিষ্য দনুজমর্দন কর্তৃক ঐ মূর্তিত্রয় উদ্ধৃত হইলে, এই বিশাল নদী সত্বরই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পরিণত হইবে।

স্বপ্নান্তে চন্দ্রশেখর জাগ্রত হইলেন, অবশিষ্ট রাত্রি আর নিদ্রা গেলেন না। রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি প্রিয় শিষ্য দনুজমর্দনকে গোপনে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া তদনুযায়ী কার্য করিতে আদেশ

প্রদান করিলেন। দনুজমর্দন গুরুর আজ্ঞানুসারে স্বপ্নকথিত স্থানে ডুব দিলেন। প্রথমবার দেবী কাত্যায়নীর পাষাণময়ী মূর্তি উঠাইলেন।[১০] গুরুদেব পুনরায় ডুব দিতে আদেশ করায় শিষ্য তদনুসারে দ্বিতীয়বার মদনগোপালের পাষাণময়ী মূর্তি উঠাইলেন। গুরুদেব আবার ডুব দিতে বলিলেন, কিন্তু দনুজমর্দন আর ডুব দিতে সাহসী হইলেন না। চন্দ্রশেখর বলিলেন, — "ভগবতী কালিকার প্রসাদে এই বিশাল জলরাশি অতি সত্বর সর্বশস্যময়ী মেদিনীতে পরিণত হইবে এবং তাঁহার আদেশে তুমিই এই দেশের রাজা হইবে। তৃতীয়বার ডুব দিলে মহালক্ষ্মীর পাষাণময়ী মূর্তি পাওয়া যাইত, তুমি ডুব না দিয়া অতিশয় অবিমৃশ্যকারিতার কার্য করিয়াছ।"

এই দনুজমর্দন চন্দ্রদ্বীপরাজ্য স্থাপয়িতা। ইনি গুরুর নামানুসারে নূতন রাজ্যের নামকরণ করেন; তাই এই দেশ 'চন্দ্রদ্বীপ' বলিয়া বিখ্যাত।

রামনাথ দনুজমর্দন দে'র আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা বড় দুরূহ। "চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ" প্রণেতা বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় বলেন যে ইনি মহারাজ বল্লালসেনের কিছু পরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।[১১] বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, তৎপ্রণীত "বিশ্বকোষে" লিখিয়াছেন যে দনুজমর্দন গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র! পাঠান সম্রাট বুলবন্ যখন মঘিসুদ্দিন তুগ্রলকে তাড়াইয়া পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন, তখন দনৌজা নামে এক রাজা সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেন।[১২] নগেন্দ্র বাবু ইহাকেই চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যস্থাপয়িতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এখন এই উভয় ঐতিহাসিক, দনুজমর্দনের আবির্ভাবকাল যাহাই নির্দেশ করুন না কেন, বল্লাল সেনের আবির্ভাবকালের সহিত দনুজমর্দনের আবির্ভাবকাল হিসাব করিলে, অন্যূন সার্ধশতাব্দিক বৎসরের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আমাদের দেশে ৩০ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করা যায়, এবং ইহাই ঐতিহাসিকদিগের মত। রাজা জগদানন্দ, দনুজমর্দনের সাত পুরুষ অধস্তন, সুতরাং অনুমান ২০০ বৎসর পরবর্তী। তিনি সম্রাট্ আকবরের সমকালীন; উক্ত সম্রাট্ ১৫৪২ খ্রিঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ১৫৪২ হইতে ২০০ বৎসর বাদ দিলে ১৩৪২ খ্রিঃ অব্দ অর্থাৎ খ্রিষ্টিয় চতুর্দ্দশ করা যাইতে পারে। ডাঃ ওয়াইজও এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলে দনুজমর্দন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "he lived according to their pedigree in the fourteenth Century."[১৩] মহারাজ বল্লাল সেন ইহার ২৫০ কি ৩০০ বৎসর পূর্বে খ্রিষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র বাবু দনুজমর্দনকে পাঠান সম্রাট বুলবনের সমকালীন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; এই উক্তি সম্বন্ধে আমরা এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলে যাহা উল্লেখ পাইয়াছি তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—। —

" It is currently believed that the sons of the five Kayasthas who accompanied the five Brahmins of Kanuj in the reign of Ballal Sen (!!!) settled in Bakla-Chandradwip, a purgana which included the whole of the modern zilla of Backergunge with the exception of Mahal Selimabad. The first of the Chandradwip family was Danujamardan Dey. He was styled by the Ghatakas as Raja and was the first Samajapti or President of the Bangaja Kayasthas.

He lived according to their pedigree in the fourteenth Century. The Ghatakas enumerate seventeen Rajas of Chandradwip up to the present day, while they name twenty three generations since the immigration of the Kayasthas from Kanuj.

It is not improbable that the founder of this family is the same person as the Rai of Sonargong by name Dinuja Rai, who met emperor Bulbon on his march against Sultan Mahisuddin Tughluk (Tugral?) in the year 1280 A D. It is not likely that the Mahomedan usurper would have allowed a

Hindu to remain in independence at his capital Sonargong. If the principality of Chandradwip extended to the river Meghna, the agreement made with the emperor, that he would guard against the escape of Mahisuddin to the west becomes intelligible."[১৪]

এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অনুমান মাত্র। অনুমানটি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে সুবর্ণগ্রামের 'দনৌজা' যে রামনাথ দনুজমর্দন দে নহেন, পরন্তু সেনবংশীয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহা হরি মিশ্রের কারিকা ও আইন-ই-আকবরি প্রভৃতি গ্রন্থে সপ্রমাণ। কেবলমাত্র 'দনুজ' ভাগের সাদৃশ্য বশত উভয়কে এক মনে করা অসঙ্গত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে বক্তিয়ার কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের পরেও কেশব সেন প্রমুখ সেনরাজবংশধরগণ একশত বৎসরের অধিক কাল বিক্রমপুর এবং সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্রাট বুলবনের পুত্রের সময় পর্যন্ত সুবর্ণগ্রাম সেনবংশীয়গণেরই করায়ত্ব ছিল।[১৫] হরি মিশ্র, মহারাজ কেশব সেনের পরবর্তী সেনরাজগণের মধ্যে স্পষ্টভাবে দনৌজামাধব[১৬] সেনের উল্লেখ করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরিতে ইনি 'নৌজ' সেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

নগেন্দ্র বাবু বলেন যে, সুবর্ণগ্রামরাজ দনৌজামাধব সেনই দনুজমর্দন দে এবং দনুজমর্দন মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র !!!

এখন দেখা যাক দনুজমর্দন দে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র কিনা। কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে আমরা এই বঙ্গদেশে দুই শ্রেণি দেখিতে পাই; যথা—রাঢ় এবং বঙ্গজ। এই উভয় শ্রেণির মধ্যে পদবিতে কতক কতক অসামঞ্জস্য দেখা যায়। ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, ভিন্ন অন্যান্য কায়স্থগণের কোন কোন পদবিতে বঙ্গজ এবং রাঢ়ীয় গণের কিছু প্রভেদ আছে। রাঢ়ীয় মৌলিকগণের পদবির সঙ্গে বঙ্গজগণের বিশেষ অনৈক্য আছে। দেব, দে, দাম, (দাঁ, হেঁশ) প্রভৃতি উভয় কায়স্থ কুলের পদবি, কেননা মৌলিক ও কুলবিহীনগণের পদবি অসংখ্য।

এই সমস্ত পদবির মধ্যে কতকগুলি (দে, দাস, নন্দী, হোড়, বল, ভদ্র, রুদ্র প্রভৃতি) বঙ্গদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। ইহাদের সঙ্গে রাঢ়ীয়গণের কোন প্রকার বৈবাহিক ক্রিয়া নির্বাহ হয় না। বর্তমান বাকরগঞ্জ জেলায় দুইটি কায়স্থ সমাজ, চন্দ্রদ্বীপ এবং সেলিমাবাদ; চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের সহিত এই দেশীয় কায়স্থগণের ক্রিয়াকর্ম হয়। কিন্তু সেলিমাবাদস্থ রায়ের কাঠির কায়স্থগণের সহিত দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের ক্রিয়া হইয়া থাকে। রায়ের কাঠির রাজবংশ বাসুকি গোত্রোৎপন্ন সেনবংশ, ইহারা দক্ষিণরাঢ়ীয়। দনুজমর্দন "দে" উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। সেন রাজগণের যতগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার দুই একটাতে "সেনদেব' ইতি ভাষা লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়; এইস্থলে "সেন" শব্দই রাজগণের বংশোপাধি, "দেব" বিশেষণবাচক শব্দমাত্র।[১৭] বিজয়বল্লালাদি নরপতিগণ নিজ বংশকে সেনান্ববায়, সেনবংশ, সেনকুল সেনান্বয় ভিন্ন কভুও দেবান্ববায়, দেববংশ, দেবকুল কি দেবান্বয় বলিয়া বর্ণন করেন নাই। যথা:—

তস্মিন সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী।
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।।

পৌরঢ্যাশ্চপুরীঃ শ্মশান বসতে র্ভিক্ষার্ভুজস্যাক্ষয়াং।
লক্ষ্মীং স ব্যতনোৎ দরিদ্রভবনে সুজ্ঞোহি সেনান্বয়ঃ।।
(রাজসাহীর প্রস্তরফলক)

হেমন্তঃ স্ফুটমের সেনজননক্ষেত্রৌঘপূণ্যবণী।
শালিশ্লাঘ্য বিপাকপীবর গুণস্তেষামভূৎ বংশজঃ।।
(লক্ষ্মণসেনী তাম্রশাসন।)

মহারাজ বল্লাল সেন দানসাগর গ্রন্থে নিজ বংশকে "অবনের্ভূষণং সেনবংশ" বলিয়া বিঘোষিত

করিয়াছেন। ইদিলপুরের তাম্রশাসনেও মহারাজ কেশবসেন "সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। লক্ষ্মণ তাম্রশাসনে স্পষ্টত আপনাকে "সেন" বলিয়াছেন—সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবর্ণী। সেনের প্রপৌত্র "দে" (বা দেব) ইহাও কি কখনও সম্ভব?

তারপর গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণের মধ্যে যাহারা মুসলমান ভয়ে পলায়ন করিয়া বাকলায় গিয়াছিলেন,[১৮] তন্মধ্যে রামনাথ দনুজমর্দন নামধেয় কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। কায়স্থ জাতির মধ্যে "সেন" পদবিও আছে, কিন্তু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় দনুজমর্দন দে কে "**ভরদ্বাজ**" গোত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১৯] কায়স্থ বংশাবলি গ্রন্থে **সেনবংশের "ভরদ্বাজ"** গোত্র নাই, কিন্তু দে এবং দেব বংশে ভরদ্বাজ গোত্র আছে।[২০] "বিশ্বকোষ" এবং "চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ" প্রণেতা উভয়ই কুলীন কায়স্থ, এখন আমরা কাহার কথা বিশ্বাস করিব?

বর্তমান সময়ে কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রমাণ কবিতেছেন যে, তাঁহারা ক্ষত্রিয় জাতির অন্যতম শাখা এবং সেনারাজগণ ক্ষত্রিয়-কায়স্থ। তন্নিমিত্ত, অনেকে সংস্কৃত রচনাদি উদ্ধৃত করিয়া বহু প্রবন্ধ এবং পুস্তক রচনা করিতেছেন। এই সমস্ত বচন প্রমাণের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে গেলে, অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। বর্তমান সময়ের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ সমস্ত বচনের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে যাইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় হইতে কায়স্থ যে ভিন্ন জাতি, আমরা দুই একটি কথায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

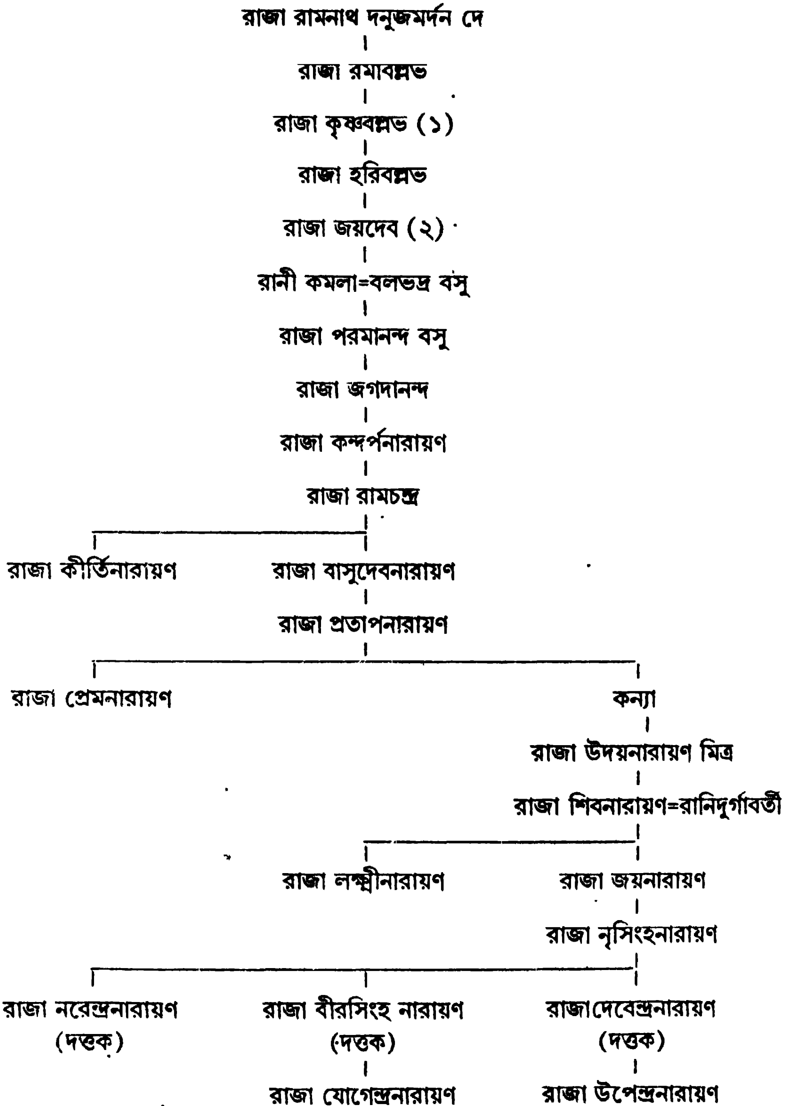
অতি প্রাচীন কাল হইতে ক্ষত্রিয় জাতি দুইটি শাখায় বিভক্ত যথা; চন্দ্রবংশ এবং সূর্যবংশ। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে যতগুলি ক্ষত্রিয় রাজা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ পাইয়াছি, তাঁহারা এই দুই শাখার অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু কায়স্থগণের জাতির ইতিবৃত্ত এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই, মন্বাদি স্মৃতিতেও ইহার অনুকূলে কোন বচন দেখা যায় না। তারপর অশৌচব্যবস্থায় আরও গোল। ভগবান মনু চারিজাতির অশৌচ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—

"বিপ্রঃ শুদ্ধঃ দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন, শূদ্রঃ মাসেন শুদ্ধতি।।"

এই বচনে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে ভূমিপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু কায়স্থসন্তানগণ কি দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি লাভ করেন, না মাসান্তে শুদ্ধিলাভ করেন? ক্ষত্রিয়গণের মত তাঁহাদের দ্বিজত্ব কই? আব একটা কথা; কারস্থগণ চিত্রগুপ্তের সন্তানের অন্যতম শাখা বলেন, এবং ক্ষত্রোচিত অসিচর্ম পরিত্যাগ করিয়া মানবহিতার্থে মসি ও লেখনি ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের জাতিগত অশৌচ এবং দ্বিজত্ব লোপ হইল কেন? ইহাতে কোন সামাজিক অপরাধ থাকিলে হয়ত সমাজে হীনমর্যাদা হইবে, কিন্তু তা বলিয়া ক্ষত্রজাতিগত নিত্যক্রিয়া লোপ হইল কেন? বঙ্গদেশে বর্তমান সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ অনেক ক্ষত্রিয় সন্তান বাস করিতেছেন; তাঁহারা কিন্তু কাযস্থগণের স্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজন করা দূবে থাক, তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল দ্বারা সন্ধ্যাবন্দনাদি পর্যন্ত করেন না। কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ এই দেশে স্থিতি লাভ করিলে, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ কিন্তু পিত্রাদির ন্যায় সম্মানার্হ হইলেন না। তাঁহারা এই দেশস্থিত শূদ্রাদির সহিত বিবাহাদি দ্বারা ক্রমশ হীনত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ভাণ্ডারি শ্রেণির শূদ্রগণ ধনশালী হইলেই কুলীন কায়স্থগণের সহিত আদান প্রদান করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশস্থ প্রধান প্রধান কায়স্থ সমাজে ইহা এখন প্রচলিত। যে সমস্ত ভাণ্ডারী শ্রেণির শূদ্রগণ চিরকাল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সন্তানগণের দাসত্ব করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে আদান প্রদান করিয়াও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া মনে করেন; ইহা তাঁহাদের পক্ষে কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। ঐতিহাসিকের কর্তব্য অতি কঠোর, তন্নিমিত্ত অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে হইল।

বঙ্গের সেন রাজগণের জাতিবিচার সম্বন্ধে বড় গোল। আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তবে তাঁহারা যে কায়স্থ ছিলেন, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নাই; এবং ভরদ্বাজগোত্রীয় কায়স্থ দনুজমর্দন দে যে, সেনরাজ লক্ষ্মণের বংশধর নহেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুত দনুজমর্দনের পিতৃপুরুষগণের প্রকৃত পরিচয় অদ্যাপি জানা যায় নাই।

দনুজমর্দন হইতে যে কয়জন রাজা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছেন তাঁহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।



রামনাথ দনুজমর্দন দে রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া কচুয়া[২১] নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ রাজবাটির ভগ্নাবশেষ এখনও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি কত বৎসর রাজত্ব করেন তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে তাঁহার সময়ের ঘটনা পর্যালোচনা করিলে কতকটা বুঝা যায় যে

বেভারিজ সাহেবের মতে (১) ইঁহার নাম শ্রীবল্লভ, (২) ইঁহার নাম কৃষ্ণবল্লভ।

তিনি অল্পকাল রাজত্ব করেন নাই। ঘটকগণের কুলগ্রন্থে প্রকাশ যে, দনুজমর্দন রাজ্য স্থাপনপূর্বক যথাশাস্ত্র অভিষিক্ত হইয়া এবং দুর্গ, পরিখা, অশ্ব, হস্তি, সৈন্য প্রভৃতিতে পরিবৃত থাকিয়া সর্ববিধ স্বাধীনতাসহ দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই প্রথমত বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ স্থাপিত হয়।[২২] এই সমাজের সীমা উত্তরে ঢাকা জেলাস্থ ইচ্ছামতী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, এবং পশ্চিমে তেনিহাটি ও সেলিমাবাদ। এই সীমার বাহিরে কোন কুলীন বসতি করিলে তাহার কুল নষ্ট হইত। যাহাতে কুলীন কায়স্থগণ স্বশ্রেণি ব্যতীত বৈবাহিক ক্রিয়া না করেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। ইদিলপুর পরগনার কায়স্থগণের কুলাচার্যগণকে ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়া সেখানে স্থিতি করেন। অদ্যাপি তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ ঘটক-স্বর্ণমত্য বলিয়া কায়স্থসমাজে বিশেষ পূজ্য। তৎকালে কুলীন কায়স্থগণ হীনকর্ম কবিলে যেমন তাঁহারা রাজশাসনাধীনে থাকিতেন তদ্রূপ ঘটক-স্বর্ণমত্যগণ, রাজ নিমন্ত্রিত কুলীন কায়স্থগণ ভোজন সময়ে, কে রাজার দক্ষিণে বা কে বামে বসিবেন, কুলগ্রন্থ দেখিয়া তাহার নির্দেশ করিয়া দিতেন, তদনুসারে কুলীনগণ অভ্যর্থিত হইতেন। রাজার স্থাপিত কায়স্থ সমাজের মধ্যে কাহারও পুত্রকন্যার বিবাহ উপস্থিত হইলে পূর্বে রাজাব অনুমতি লইয়া কিঞ্চিৎ কর দিতে হইত। ইহাকে "রাজ-মধ্যস্থ" বলে। কেহ এরূপ না করিলে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইত।[২৩]

ব্রাহ্মণদিগকে রাজা "মনস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ" পাঠে পত্রাদি লিখিতেন এবং কুলীনগণকে "সানুগ্রহ পত্র মিদং" ইত্যাদি লিখিতেন। কোন ব্রাহ্মণ বা কুলীন, রাজাকে পত্র লিখিলে— " আর্দান শ্রী অমুক ... " এই ভাবে লিখিতেন। কায়স্থগণ রাজসভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে রীতিমত কুর্নিশ করিতে হইত। বয়ঃকনিষ্ঠগণ রীতিমত নমস্কাব কবিত। বহুকাল পর্যন্ত এই নিয়ম চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

দনুজমর্দনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রমাবল্লভ রাজাসনে আসীন হইলেন। কায়স্থগণের সামাজিক ক্রিয়াদি দর্শন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিভুক্ত করেন, এবং তাঁহাদের বৈবাহিক কুলসম্বন্ধে কতগুলি নিয়ম প্রচার করিয়া সমাজের মধ্যে আরও দৃঢ়তা স্থাপন করেন। ঘটকগণ তাঁহার আবির্ভাবকাল বঙ্গীয় অষ্টম শতাব্দী বলিয়া নির্ধারণ করেন। তাঁহার ক্ষমতা এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল যে তাঁহার রাজ্যের বহির্ভূত ভূম্যধিকারীগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে রাজ্যের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিযাছিল।

তিনি যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞ, তদ্রূপ অস্ত্রশস্ত্রবিশারদও ছিলেন। তিনি রাজধানীকে উৎকৃষ্টরূপে গড়বন্দি করিয়া বহিঃশত্রু হইতে বাজ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। নৌবল, অশ্ব, সৈন্য ও হস্ত্যাদিতে পরিবৃত হইয়া স্বনামে একটি নগর স্থাপন করিযাছিলেন বলিয়া ঘটকগণের কুলগ্রন্থে উল্লেখ আছে। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়াও এই নগর কোথায় এবং ইহার বর্তমান কি নাম তাহা সম্যক অবগত হইতে পারি নাই। কেহ কেহ বলেন যে কচুয়াই "রমাবল্লভপুর" নামে অভিহিত হইত। কিন্তু ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রমাবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ এবং তাঁহার পর তৎপুত্র হরিবল্লভেব কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে ঘটকগণের কুলগ্রন্থে প্রকাশ যে, তাঁহারা উভয়ই সদাচাবী, ধার্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহারাও কায়স্থসমাজে আরও কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত কবেন। সমাজ হইতে বিবাহের কন্যা-পণ উঠাইয়া দেন, কেবলমাত্র পাত্রপাত্রীর মর্যাদানুসারে সামান্য অর্থ "মর্যাদা-পণ" রূপে ধার্য করিয়া দেন।

হরিবল্লভের তিরোধানের পর তাঁহার পুত্র জয়দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই, রাজ্যপ্রাপ্তির অল্প পরেই স্বর্গারোহণ করেন।

অপুত্রক জয়দেবের মৃত্যুর পর কমলা নাম্নী তাঁহার সর্বগুণসম্পন্না কন্যা, কিছুকাল স্বামীসহ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রানী কমলা সাতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না রমণী ছিলেন। তিনি রাজ্যের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন এবং লোকহিতকর কার্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "কমলার দিঘি" নামক একটি কীর্তি, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অদ্যাপি কচুয়ার বিলুপ্ত প্রায় রাজধানীতে এই

দিঘির চিহ্ন বর্তমান আছে। ইহাতে এখন আর জল নাই, কিন্তু চারিদিকের পাড়গুলি পর্বতের মত উচ্চ, এবং নানাবিধ বৃক্ষারাজিতে পরিপূর্ণ। এই দিঘি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন দ্রোণ তের কালী হইবে; ইহা খনন করিতে প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

এই দিঘির উৎপত্তি সম্বন্ধে, একটি আশ্চর্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দীর্ঘিকা খননের স্থান নির্বাচিত হইলে কমলা আজ্ঞা করিলেন যে; তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে গমন করিতে করিতে যে স্থানে ক্ষান্ত হইবেন, সেই স্থান পর্যন্ত খনন করিতে হইবে। কমলা চলিতে আরম্ভ করিলেন; বহুদূর গমন করিয়াও থামিলেন না। তখন কোন এক কর্মচারির আদেশে জনৈক অনুচর একটা পারাবত ছিন্ন করিয়া আনিয়া কমলার পাদমূলে অলক্ষ্যে রক্ত সিঞ্চন করিয়া দিল, কমলা চমকিতা হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইলেন। অনুচরগণও সেই খানে দিঘির সীমা স্থির করিল।

এইরূপে প্রকাণ্ড জলাশয় খনিত হইল, কিন্তু জল আসিল না। ইহাতে রাজ্যস্থিত নানালোক নানাকথা কানাকানি করিতে লাগিল। কমলার কানে নানারূপ জনরব পৌছিল, তিনি অতীব বিষণ্ণা হইলেন। চিন্তাক্লিষ্টা কমলা একদা স্বপ্নে দেখিলেন যেন, সর্বাভরণযুক্তা, পট্টবস্ত্র পরিহিতা একটি সুন্দরী রমণী বলিতেছেন "কমলা, যদি তুমি স্বয়ং দীর্ঘিকায় নামিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাও, তবে দীর্ঘিকা জলপূর্ণ হইবে।"

প্রভাতে এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত চতুর্দিকে প্রচারিত হইলে, রাজ্যস্থিত অগণ্য নরনারী এই অদ্ভুত কার্য দর্শনে আসিল। রাজ্ঞী কমলা শুদ্ধচিত্তে দেবপূজা করতঃ পট্টবস্ত্র এবং নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া ধীরে ধীরে জলশূন্য দীর্ঘিকায় নামিলেন। মধ্যদেশ অতিক্রম করিতে না করিতে, চতুর্দিক হইতে ভৈরব বেগে জলরাশি দীর্ঘিকায় পতিত হইতে লাগিল। কমলার স্বামী[২৩] পত্নীকে প্রায় নিমজ্জিতা দেখিয়া সত্বর তাঁহাকে উঠিয়া আসিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু সন্তরণাক্ষমা কমলার আর সে সাধ্য রহিল না। স্বামী উন্মত্তবৎ জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যোগী হইলে কমলা তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। স্বামী বলিলেন "তুমি তোমার শিশুপুত্রকে ফেলিয়া যাইও না; তোমার অভাবে কে তাহাকে প্রতিপালন করিবে?" কমলা বলিলেন যে, প্রত্যহ প্রত্যুষে যদি কেহ শিশুকে এই সোপানোপরি রক্ষা করে, তবে তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কমলা আর কথা বলিতে পারিলেন না, বিশাল জল রাশির মধ্যে বিলীন হইলেন।

কমলার স্বামী পত্নীশোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। কমলার বাক্যানুসারে প্রত্যহ প্রত্যুষে একজন ধাত্রী, শিশুকে সোপানোপরি রক্ষা করিয়া যাইত। এক দিন প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া রাজা দেখিলেন যে, একটি স্ত্রীলোক আসিয়া শিশুটিকে স্তন্য দান করিতেছেন। "কমলা" "কমলা" বলিয়া উন্মত্তভাবে তিনি তাহাকে ধরিতে গেলেন; অমনি রমণী ক্রোড়স্থিত বালককে নিম্নে রক্ষা করিয়া বিদ্যুৎবেগে জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করতঃ নিমগ্না হইলেন। সেই অবধি উক্ত রমণীকে আর দেখা গেল না।

কমলার এই শিশুপুত্র পরমানন্দ তৎপরে সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি বসু বংশোদ্ভব। বরিশাল সদর স্টেশনের অন্তর্গত দেহের গতি [২৪] গ্রামে ইহার পিতা পিতামহাদির বাসস্থান। অদ্যাপি তাঁহাদের বাড়ি রাজবাড়ি নামে অভিহিত হয়। ইষ্টকাদির চিহ্ন ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানালা প্রভৃতি পূর্বগৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বসুবংশীয় যে কয়েক ঘর কায়স্থ এখনও বসতি করেন, তাঁহারা সগর্বে রাজবংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজা পরমানন্দ [২৫] সিংহাসনারূঢ় হইয়া, পূর্ববর্তী রাজগণের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি কুলীন কায়স্থদের সম্বন্ধে কতিপয় নূতন নিয়ম বিধান করেন। পূর্বে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এইরূপ গণনা করা হইত, কিন্তু তাঁহার সময়ে বসু, গুহ, মিত্র এরূপ গণনা আরম্ভ হইল। তিনি স্বয়ং বসুবংশোদ্ভব বলিয়া নিজের বংশমর্যাদা, সকল কুলীন হইতে শ্রেষ্ঠ করিবার জন্য বোধ হয় এই নিয়ম করিয়াছিলেন। তিনি রাজা এবং সমাজপতি; সুতরাং বিনা বাধায় ইহা সমাজে প্রচলিত হইল। অন্যান্য কুলীনগণ ইহাতে আন্তরিক বিরক্ত হইলেও মুখে কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

পরমানন্দ কচুয়াতে সকল সময়ে বাস করিতেন না; বৎসরের মধ্যে কতক সময়ে সবান্ধবে পৈত্রিক বাসভূমিতে অবস্থান করিতেন। দেহেরগতি গ্রামে যে সমস্ত ভগ্নাট্টালিকার চিহ্ন বর্তমান আছে, তথাকার অধিবাসীগণ উহা পরমানন্দের অট্টালিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজভবনে কোন উৎসব ক্রিয়া উপস্থিত হইলে দেহেরগতির বসুবংশীয়গণ বিশেষ সম্মানিত হইয়া থাকেন।

পরমানন্দের তিরোধানের পর তদীয় পুত্র জগদানন্দ সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সরলচিত্ত ও ঈশ্বরভক্ত পুরুষ ছিলেন। সর্বদা ইষ্টদেবী-চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন কার্যে তাঁহার বড় প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি আশ্চর্যজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাজা সর্বদা ইষ্টদেবী চরণে প্রার্থনা করিতেন যেন তিনি অন্তকালে গঙ্গার পবিত্র ক্রোড়ে জীবন ত্যাগ করিতে পারেন। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন যে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া নগর অতিক্রমপূর্বক ভীমবেগে তাঁহার প্রাসাদভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। জগদানন্দ এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনমানসে প্রাসাদশিখরে দণ্ডায়মান হইলেন, উত্তাল জলরাশি তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিল এবং সেই উদ্বেলিত জলরাশি হইতে চুতর্ভুজা শ্বেতবরণা, মকরবাহিনী গঙ্গামূর্তি আবির্ভূতা হইয়া রাজার দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। ভক্ত জগদানন্দ বুঝিলেন যে, দয়াময়ীর কর্ণে তাঁহার চির অভিলষিত প্রার্থনা পৌঁছিয়াছে, তাই তাঁহাকে লইতে জননী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়াছেন। কাল পূর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া তিনি অবিলম্বে নদীতে ঝম্পপ্রদান করিলেন, জলরাশি রাজাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।

কেহ কেহ বলেন যে জনৈক দৈবজ্ঞ রাজার মৃত্যু দিন অবধারিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অমুক দিন গঙ্গাগর্ভে তাঁহার মৃত্যু হইবে। রাজা ভীত হইয়া সর্বদা রাজপ্রাসাদে থাকিতেন এবং কখনও নদী বা জলাশয়ের নিকটবর্তী হইতেন না। দৈবজ্ঞকথিত দিবসে সহসা নদীর জল উদ্বেলিত হইয়া রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল এবং রাজাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল।

"আইন-ই-আকবরিতে সরকার বাকলায় আমরা এক ভীষণ ঝটিকাবর্ত ও জলপ্লাবনের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই ভয়ঙ্কর খণ্ড প্রলয়ে প্রায় লক্ষাধিক প্রাণী বিনষ্ট হয়। রাজা তখন গীতাবাদ্যাদিতে মগ্ন ছিলেন। তিনি আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না পাইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন, কিন্তু প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন না; নৌকাসহ অচিরাৎ জলমগ্ন হইলেন। রাজপুত্র এক উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করেন।[২৬]

আবুল ফজল, রাজপুত্রের নাম নির্দেশ লইয়া একটু গোলে পড়িয়াছেন; তিনি জগদানন্দের পুত্রস্থানে, তদীয় পিতা পরমানন্দের নাম নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা ভুল হইবার সম্ভব কেননা চন্দ্রদ্বীপের স্থাপিত ঘটকস্বর্ণমত্যগণের কুলগ্রন্থে এবং চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ তালিকায় আমরা পরমানন্দকে, বসুবংশের প্রথম রাজা বলিয়া দেখিতে পাই। তাঁহার পুত্রের মৃত্যু সম্বন্ধে উল্লিখিত কিংবদন্তী ঘটকগণের কুলগ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে।

এই দুর্ঘটনার কিছুকাল পর হইতেই দুরন্ত মগ ও পর্তুগিজ দস্যুগণের অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হয়। সমুদ্র ও বৃহৎ নদীর তীরস্থ স্থানগুলি তাহাদের অত্যাচারে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছিল। বর্তমান সময়েও এই সমস্ত স্থানের অরণ্যানী মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ নদীর অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, জলাশয় ও প্রশস্ত রাজবর্ত্মাদির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

জগদানন্দের পুত্রের নাম কন্দর্পনারায়ণ। রাজা কন্দর্পনারায়ণ এই সমস্ত মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইলেন। তাহাদের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ করিয়াও তাহাদের আক্রমণ হইতে অব্যাহতির কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। পিতার শোচনীয় নিয়তি এবং পঙ্গপালতুল্য জলদস্যুগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণহেতু কচুয়াতে রাজধানী রক্ষা করা কিছুতেই নিরাপদ নহে স্থির করিয়া, রাজা কন্দর্পনারায়ণ বর্তমান বরিশাল নগরীর উত্তরপূর্বে বাসুরিকাঠি নামক গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিলেন। সে স্থান হইতে পুনরায় হোসেনপুর, পরে ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সকল স্থানের স্বাস্থ্য ও সমাজ দোষণীয় জ্ঞান করিয়া অবশেষে মাধবপাশা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।[২৭] তৎকালে এইখানে গাজি উপাধিধারী একজন

মুসলমান বাস করিতেন। তিনি প্রতিবন্ধক হইলে রাজা তাঁহাকে বিনাশ করিয়া মাধবপাশায় রাজধানী নির্মাণ করিলেন।[২৮]

মহাবল কন্দর্পনারায়ণ মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করিয়া, চতুর্দিক পরিখা, এবং সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টন করিলেন। তৎপর যুদ্ধোপযোগী সৈন্য এবং উৎকৃষ্ট নৌযানসমূহ নির্মাণ করাইতে লাগিলেন। রাজার সঙ্গে সামাজিক কায়স্থগণও নিকটবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণের বহু কীর্তির লুপ্তপ্রায় চিহ্নসমূহ এখনও বর্তমান আছে; তন্মধ্যে পিতল নির্মিত একটি কামান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৯] ইহার দৈর্ঘ্য পৌনে আট ফিট, পরিধি সাড়ে উনত্রিশ ফিট; ইহার উপর তৎকালীন বাংলা অক্ষরে ইহার নির্মাতা ও রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম লেখা আছে। কামানটির শেষভাগে কয়েকটি অঙ্ক খোদাই আছে, বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা পড়িতে পারিলাম না। ইহার গঠন ও নির্মাণ-প্রণালী প্রশংসাযোগ্য। মাধবপাশার 'কামানতলা' নামক একটি পুষ্করিণী আছে, অনেকে অনুমান করেন যে, এইস্থানে এখনও বহুসংখ্যক কামান আছে।

কন্দর্পনারায়ণের রাজত্বের সময় পর্তুগিজ ভ্রমণকারীগণ প্রথম এই দেশে পদার্পণ করেন। এই সকল ভ্রমণকারীগণ খ্রিষ্ট-ধর্ম প্রচারক, রেলফ্ ফিচ ইহাদের নেতা; ইনি কন্দর্পনারায়ণ কর্তৃক বিশেষ অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন এবং ইহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে বাকলা রাজ্য ও রাজার সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।[৩০]

ভূলুয়া পরগনাধিপতি রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য, রাজা কন্দর্পনারায়ণের শ্রীবৃদ্ধি ও লোকাতীত যশে ঈর্ষাবশত তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। মধ্যে মধ্যে সুযোগ মত সৈন্যসামন্ত লইয়া চন্দ্রদ্বীপ আক্রমণ করিতেন। কন্দর্পনারায়ণও মধ্যে মধ্যে বৈরনির্যাতন মানসে ভূলুয়া আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ লইতেন। এই বিবাদে উভয় পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল।

এই অনর্থক বিবাদের কারণ কেহ কেহ বলেন যে, রাজা কন্দর্পনারায়ণের ইষ্টদেব উজিপুর নিবাসী সিদ্ধপুরুষ দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য মহাশয়কে জোর করিয়া লক্ষ্মণমাণিক্য ভূলুয়ায় লইয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রবাদ এই যে. দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য সস্ত্রীক যে স্থানে অবস্থান করিতেন লক্ষ্মণমাণিক্যের অনুচরগণ সেই স্থানের ঘর বাড়ি, বৃক্ষাদি পর্যন্ত লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহাকেই "ভূলুয়া-লুঠ" বলে। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য অমিত বলশালী যোদ্ধা ছিলেন; রাজা কন্দর্পনারায়ণও দুর্বল হস্তে অসি ধারণ করেন নাই; মাঝে মাঝে উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিতেন না।

রাজা কন্দর্পনারায়ণের সময়ে মোগল-কুল-গৌরব-রবি সম্রাট আকবর স্বীয় প্রতিভাবলে চতুর্দিকে যশঃরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিলেন। চন্দ্রদ্বীপ মোগল সাম্রাজ্যান্তর্গত করদ মিত্র রাজ্য ছিল। রাজ্যশাসন, প্রজা পালন, বিদ্রোহদমন প্রভৃতি রাজাকেই করিতে হইত; কেবল বাৎসরিক রাজকর, এবং যুদ্ধ সময়ে নিয়মানুযায়ী সৈন্য বাদশাহকে পাঠাইতে হইত।[৩১] এইটুকু অধীনতা ব্যতীত চন্দ্রদ্বীপরাজ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন।

এই সময়ে মোগলের বাহুবলে পাঠানশক্তি প্রায় উন্মুলিত; তথাপি তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারার্থ সময়ে সময়ে নানাস্থান আক্রমণ করিত। যখন মোগল সেনাপতির পরাক্রমে পাঠানগণ পূর্ববঙ্গ হইতে উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করে, তখন তাহারা চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হইয়া রাজা কন্দর্পনারায়ণের নিকট কর প্রার্থনা করে এবং রাজা মোগলের বশীভূত হইয়াছেন বলিয়া রাজ্যমধ্যে নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করে। বীরহৃদয়, তেজস্বী কন্দর্পনারায়ণ সসৈন্যে পাঠানগণকে আক্রমণ করিয়া একপ্রকার বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন যে, হতাবশিষ্ট পাঠানেরা বহুকষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। আকবর, কন্দর্পনারায়ণের অসাধারণ বাহুবল ও রণপাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে প্রশংসালিপিসহ বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। মাধবপাশার নিকটবর্তী হোসেনপুর নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, দুর্দান্ত মগ দস্যুগণ রাজ্যমধ্যে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে। রাজা কন্দর্পনারায়ণ, ইহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন।

মাধবপাশার অতি নিকটেই এই খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। বর্তমান "মাণিকমুদির ভারানি" নামক খাল যেস্থানে কালীজিরা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, কেহ কেহ ঐস্থানকেই যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ যে কয় বৎসর সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, প্রায় সকল সময়েই তাঁহাকে যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হইত।

এই সময়ে আর একজন বীরপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া, লোকাতীত শক্তি, অসীম বাহুবল, অসাধারণ প্রতিভা, অনুপম স্বদেশ হিতৈষীতায় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এই ক্ষণজন্মা বীরপুরুষ কায়স্থকুলশেখর মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়। প্রতাপ স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষার্থে, যে অতুলনীয় বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিতে গেলেও দুর্বল হীনদশাপ্রাপ্ত বাঙ্গালির হৃদয় গর্বিত ও স্ফীত হইয়া উঠে। যে বীরপুরুষের অসির ঝঞ্জনায় একদিন মোগলসম্রাটশ্রেষ্ঠ আকবর শাহের হৃদয় পর্যন্তও কম্পিত হইয়াছিল, যাহার বাহুবলে, অসংখ্য মোগল সেনা-সেনাপতির রক্তে কপোতাক্ষের জল রঞ্জিত হইয়াছিল, হায়! কুটিল সংসারচক্রের আবর্তনে, কতিপয় স্বদেশদ্রোহী, স্বার্থান্ধ, কাপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই প্রতাপ অকালে কালসাগরে লীন হইয়াছেন। তৎসঙ্গে বঙ্গের স্বাধীনতা, বাঙ্গালির আশাভরসা, জাতীয় গৌরব বুদবুদের ন্যায় চিরতরে অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে। জ্ঞাতিদ্রোহিতা ও স্বার্থপরতা যে জাতীয় অধঃপতনের মূল, তাহা এই প্রতাপাদিত্যের জীবনে সম্যক প্রতিফলিত হইয়াছে।[৩২]

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কন্দর্পনারায়ণ ও রাজা প্রতাপাদিত্য রায় উভয়ই বীর ও সমধর্মী; ত্বরায় উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইল। উভয় রাজা পরস্পরকে বিবাদ বিসম্বাদে বন্ধুজ্ঞানে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রতাপ স্বীয় রাজধানীতে সমাজ স্থাপন জন্য, চন্দ্রদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ আনাইয়া ঐকান্তিক যত্নসহকারে স্থাপন করিলেন।[৩৩] এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য রাজা প্রতাপাদিত্য, কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের সহিত স্বীয় দুহিতার উদ্বাহের প্রস্তাব করেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ এই শুভ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন, সম্বন্ধ যথাশাস্ত্র ধার্য হইয়া গেল; বরকন্যার অল্প বয়স হেতু তৎকালে বিবাহ স্থগিত রহিল মাত্র, কিন্তু উভয় রাজার মধ্যে কুটুম্ববৎ আচার ব্যবহার হইতে লাগিল।

এই ঘটনার অল্প পরেই কন্দর্পনারায়ণ স্বর্গারোহণ করিলেন। রামচন্দ্র তখন সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয় বালক। এই দুর্দিনে রাজা প্রতাপাদিত্য মধ্যে মধ্যে ভাবী জামাতার তত্ত্ব গ্রহণ করিতেন। রাজা রামচন্দ্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গর্ভধারিণী, মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সমস্ত রাজকার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা রামচন্দ্র বয়সে বালক হইলেও তাঁহার বয়োচিত চপলতা ছিল না। তিনি স্থির ও গম্ভীরভাবে গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস এবং অস্ত্রবিদ্যাবিশারদগণের নিকট যুদ্ধ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অত্যল্প দিনের মধ্যেই তিনি শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেন।

এই সময়ে আর একজন পর্তুগিজ ভ্রমণকারী চন্দ্রদ্বীপে উপনীত হইয়া বালক রাজা রামচন্দ্র কর্তৃক যেরূপে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই ভ্রমণকারীর নাম মেলকয়র ফনসিকা (Melchior Fonseca)। ইনি ১৫৯৯ খ্রিঃ অব্দে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়াছিলেন। রাজা রামচন্দ্র তখন অষ্টমবর্ষীয় বালক। তিনি সভাসদগণসহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ধীর ভাবে বিদেশি ধর্মযাজককে অভ্যর্থনাপূর্বক উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিলেন এবং রাজ্যমধ্যে ধর্মমন্দির প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। প্রাচীন তত্ত্ব-সংগ্রহাধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালে প্রভৃতি কয়েকজন দস্যু তখন রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাঁহারই সাহায্যে সন্দ্বীপ উদ্ধার করিয়া যে কৃতঘ্নতার কার্য করিয়াছিল তাহাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার কয়েক বৎসর পরে বিবাহার্থী রাজা রামচন্দ্র বহু সংখ্যক অনুচর লইয়া মহাসমারোহে যশোহরে আগমন করিলেন। যে বিবাহ-সম্বন্ধে উভয় রাজ্যের সৌহার্দ্য চিরস্থায়ী হইবে ভাবিয়া উভয় রাজা স্থির করিয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে তাহার ফল বিপরীত হইল।

শুভলগ্নে রাজা রামচন্দ্রের সহিত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিমলার[৩৪] বিবাহক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল। স্ত্রী-আচার ও অন্যান্য মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমাপনান্তে মহাসমারোহে বরকন্যা বাসর ঘরে নীত হইল। হঠাৎ রামচন্দ্র শুনিলেন যে রাজ্যলোলুপ প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রদ্বীপ স্বরাজ্যভুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করিবেন। এই বজ্রপাততুল্য ভীষণ সংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যে প্রতাপাদিত্যের অসীম স্নেহগুণে তিনি পিতার অকাল বিয়োগব্যথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন সেই হৃদয়বান পুরুষ, গৃহাগত আত্মীয়কে—স্বীয় জামাতাকে—এই ভাবে হত্যা করিবেন, এই চিন্তা রামচন্দ্রকে শত বৃশ্চিকবৎ দংশন করিতে লাগিল। প্রথমত আদৌ তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তাহার পর নব পরিণীতা স্ত্রীর নিকট শুনিলেন যে, তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা উদয়াদিত্য এই বিপদে মুক্তির উপায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভাই ভগ্নি ক্ষণকাল পরামর্শ করিলেন, তারপর উদয়াদিত্য ভগ্নিপতিকে মশালধারীবেশে সজ্জিত করিয়া তৎসহ রাজা বসন্তরায়ের ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন; ছদ্মবেশ হেতু প্রহরীগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

রাজা রামচন্দ্র এই প্রকার মুক্তিলাভ করিয়া, কৌশলে স্বীয় অনুচরগণকে বিপদ বার্তা জ্ঞাত করাইলেন। রামমোহন মাল (মল্ল) নামক একজন অমিত বলশালী প্রভুভক্ত ভৃত্য, রাজা রামচন্দ্রের শরীর রক্ষক ছিল; রাজা তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বিদ্যুৎবেগে স্বীয় নৌকায় আসিলেন। অনতিবিলম্বে নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়া সকলে সভয়ে দেখিলেন যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ দ্বারা জলপথ একেবারেই রুদ্ধ করা হইয়াছে। রাজা এবং অনুচরবর্গ প্রমাদ গণিলেন। অমিত পরাক্রমশালী বীর রামমোহন, রাজার সেই সুবৃহৎ দ্বিষষ্ঠিতম দাঁড়ের নৌকা বৃক্ষাদির উপর দিয়া টানিয়া প্রশস্ত নদীতে আনয়ন করিল। এই প্রকার সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, রাজা রামচন্দ্র শত্রুপক্ষকে তাঁহার নির্বিঘ্নে পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত করাইবার নিমিত্ত, সজ্জিত কামান শ্রেণিতে অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ করিলেন। নিশীথিনীর গম্ভীর শান্তি ভগ্নকরতঃ কামান শ্রেণি দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ভীমনাদে গর্জন করিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ কামানের এই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া, মহারাজ প্রতাপাদিত্য অনুচরগণকে কারণ সন্ধানের জন্য চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন। অচিরাৎ তাহারা প্রত্যাগত হইয়া রাজ-জামাতার পলায়ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। প্রতাপাদিত্য, রামচন্দ্রকে প্রত্যাবর্তন করিতে বিস্তর অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনিলেন না, বরং শ্বশুরের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্বিঘ্নে চন্দ্রদ্বীপে পৌঁছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে এই প্রকার দুরপনেয় কলঙ্কের কথা লইয়া অনেকের মতদ্বৈধ আছে, রাজা রামচন্দ্রের জনৈক বিদূষক নরসুন্দর জাতীয় রমাইভাঁড় স্ত্রীবেশে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক রাজমহিষীর সহিত বাক্য রহস্য করিয়াছিল; পরিশেষে এই কথা প্রতাপের কর্ণগোচর হইলে, তিনি জামাতা এবং তাঁহার অনুচরবর্গের প্রাণনাশ করিয়া এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে বাসনা করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন প্রতাপ জামাতাকে নিহত করিয়া তদীয় রাজ্য অধিকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে প্রতাপের ন্যায় চরিত্রে এই সকল কথা কতদূর সত্য জানি না। শত্রুপক্ষ হইতে প্রতাপের সম্মান খর্ব করিবার জন্য হয়ত মিথ্যা রটনা মাত্র। তাঁহার এই লোকাতীত প্রতিভা, অসাধারণ বাহুবল, দিঙ্মণ্ডল বিঘোষিত শুভ্র যশোরাশি অবলোকন করিয়া ঈর্ষাপরবশ শত্রুগণ, আত্মীয়বিচ্ছেদমানসে প্রতাপের নামে অনর্থক এই প্রবাদের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার শুভ্র যশোরাশিতে কালিমা ঢালিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বিশেষত তাঁহার খুল্লতাত বসন্ত রায়ের পুত্রগণের সহিত প্রতাপের বিন্দুমাত্র সদ্ভাব ছিল না; তাঁহারাই এই জনপ্রবাদের মূল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। যশোহর রাজ্য যে প্রকার ক্ষমতাশালী, তৎকালে চন্দ্রদ্বীপও সেই উপমায় কোন অংশে ন্যূন ছিল না; এই উভয় রাজ্য কুটুম্বিতাসূত্রে একত্রীভূত হইলে প্রতাপের শত্রুপক্ষ হীনবল হইবে, এই বিবেচনায় তাঁহারা এইপ্রকার মিথ্যা কথা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর করাইলেন। কিন্তু

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, রাজা রামচন্দ্র ইহার সবিশেষ তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়াই, শত্রুপক্ষ প্রচারিত এই জঘন্য নারকীয় প্রবাদ সত্য বলিয়া ধারণা করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাস এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তিনি শ্বশুরের নাম পর্যন্ত শ্রবণ করিতে পারিতেন না। তিনি শ্বশুরের সহিত যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করিলেন।

আমরা প্রতাপাদিত্যের জীবনী যাহা পাঠ করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার ন্যায় মহানুভব, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী, ন্যায়পরায়ণ, নীতিজ্ঞ দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত নরপতি তৎকালে বিরল ছিল। ঘটককারিকা গ্রন্থ তাঁহার রাজধানীকে পুণ্য ভূমি কাশীধামের সহিত তুলনা করেন; যথাঃ—

"যশোহর পুরী কাশী, দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ।।"

তাঁহার রাজত্ব এবং প্রতাপ সম্বন্ধে তদ্দেশে এখনও অনেকে বলেনঃ—

"স্বর্গে ইন্দ্রদেব রাজা, বাসুকী পাতালে,
প্রতাপ আদিত্য রায় অবনী মণ্ডলে।"

প্রকৃতপক্ষে প্রতাপের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন নৃপতি সুদুর্লভ। তাঁহার নামে এই প্রকার ঘোরতর নারকীয় কথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

রাজা রামচন্দ্র রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া পত্নীর কোন সংবাদই লইলেন না। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর অতীত হইল; রাজ্ঞী বিমলা পতি সহবাসলাভেচ্ছায় গোপনে স্বামীর নিকটে দুত পাঠাইলেন; কিন্তু রামচন্দ্র শ্বশুরের ব্যবহারে এতদূর কুপিত হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই জন্য তাঁহার নিরপরাধিনী ভার্যাকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না।

রাজ্ঞী বিমলা পতির এই নিদারুণ সঙ্কল্প অবগত হইয়া নীরব শোকাগ্নির মুহুর্মুহু দাহনে দিবানিশি দগ্ধীভূতা হইতে লাগিলেন। দুষ্মন্ত-পরিত্যক্তা শকুন্তলার ন্যায় স্বীয় অদৃষ্ট লিপি জানিয়া তিনি এক অসমসাহসিক কার্যে ব্রতী হইলেন। কাশী যাত্রাচ্ছলে রাজনন্দিনী বিমলা, বহুসংখ্যক অনুচর ও তরণী সমভিব্যাহারে, পতিরাজ্যে উপস্থিত হইয়া মাধবপাশার নিকটবর্তী স্থানে নৌকা রক্ষা করিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত রাজসমীপে ব্যক্ত না করাইয়া রাজধানীর সন্নিকটে নৌকার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। বোধ হয় তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে রাজা তাঁহার আগমনবার্তা জানিতে পারিলে তাঁহাকে সমাদরে স্বগৃহে লইয়া যাইবেন। তিনি যে স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহার আগমন এবং বহু সংখ্যক জনসমাগম হেতু, সেস্থানে প্রতি সপ্তাহে দুইদিন করিয়া হাট বসিতে লাগিল। ইহাই প্রসিদ্ধ "বউ ঠাকুরাণীর হাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এইরূপ কিছুকাল গত হইল, কিন্তু রামচন্দ্র কোন তত্ত্বই লইলেন না; রাজমহিষী সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সারসী গ্রামের নিকট নৌকা রক্ষা করিলেন। তিনি কখনও কখনও তীরে বৃহৎ তাম্বু ফেলিয়া, তন্মধ্যে অবস্থান করিতেন। দীন দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে আশাতিরিক্ত দান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে, সেখানে এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তাঁহার এই কীর্তিসমূহ অচিরাৎ রাজা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তিনি অনুসন্ধান দ্বারা সকল তত্ত্ব অবগত হইলেন, তথাপি স্বীয় ধর্মপত্নীকে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন না। রাজমাতা (রামচন্দ্রের জননী) পুত্রবধুর আগমন বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে যত্ন পূর্বক গৃহে আনয়ন করিবার জন্য পুত্রকে বলিলেন। রামচন্দ্র জননীর আদেশ পালনের কোন উদ্যোগ করিলেন না। ইহাতে রাজমাতা নিতান্ত ক্ষুব্ধা হইয়া, পুত্রবধূকে স্বভবনে আনিবার জন্য স্বয়ং তাঁহার নৌকায় গমন করিলেন। শ্বশ্রূকে সমাগতা দেখিয়া রাজমহিষী বিমলা দেবীর পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি অবগুণ্ঠনে মুখচন্দ্র আবৃত করিয়া স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ এক সুবর্ণ থালা তাঁহার চরণপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাজমাতা বহুমূল্য অলঙ্কার পরিপূর্ণ গজদন্ত নির্মিত পেটিকা, বধূর হস্তে দিয়া আশীর্বাদ করতঃ তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক মুখচুম্বন করিলেন। বধূর ভ্রমর-কৃষ্ণ-পক্ষ-পংক্তি অশ্রুনিষিক্ত দেখিয়া, তিনিও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; পরে মহাসমারোহে বধূকে লইয়া রাজধানী মাধবপাশায় প্রত্যাগতা হইলেন।

রাজা রামচন্দ্র প্রতাপের ব্যবহারে যারপরনাই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পত্নীর সহিত তিন দিনের মধ্যে সাক্ষাৎ করেন নাই; পরিশেষে জননীর অনুরোধ ও ভর্ৎসনায় এবং পত্নীর রোদনে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধেও দুই মত দেখা যায়; কেহ কেহ বলেন যে, রাজ্ঞী বিমলা শুশ্রূ কর্তৃক ভর্তৃ-ভবনে নীতা হইয়াও স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। সেখানে কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করিয়া, সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণকে চন্দ্রদ্বীপে স্থাপন করিয়া, চিরজীবনের মত কাশী যাত্রা করিয়াছিলেন।[৩৫] আবার কেহ কেহ বলেন যে, রামচন্দ্র অল্প কয়েক দিন পরে পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়; কেন না, কায়স্থকারিকা স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে প্রতাপ-দুহিতার গর্ভে রাজা রামচন্দ্রের মহাবলশালী দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বার্ধক্যে রাজমহিষীর কাশীবাসিনী হওয়াও সম্ভবপর, কিন্তু রাজা রামচন্দ্র যে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মিঃ বেভারিজ্, তৎকৃত গ্রন্থে রামচন্দ্রের পলায়নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে,—

"Afterwards Pratapaditya relented and sent his daughter to Ramchandra and the place where she landed near Madhabpasa, is still called "Badhumata-hat" or the bride's market, as a market was established there in her honour.''

রাজমহিষী বিমলা, পিতৃনিয়োগানুসারে স্বামীভবনে আসিয়াছিলেন, না, কাশী যাত্রাব্যপদেশে চন্দ্রদ্বীপে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না।

রাজা রামচন্দ্রের পিতৃবৈরী ভুলুয়াধিপতি দুর্দান্ত লক্ষ্মণমাণিক্য, রামচন্দ্রকে বালকজ্ঞানে সর্বদা তুচ্ছ এবং অবজ্ঞা করিতেন। দূতমুখে রাজা রামচন্দ্রের এই কথা কর্ণগোচর হইলে, তিনি যুদ্ধার্থ সসৈন্যে ভুলুয়ায় গমন করেন; এবং ভীষণ সংগ্রামের পর লক্ষ্মণমাণিক্যকে পরাস্তপূর্বক বন্দি করিয়া মহাসমারোহে মাধবপাশায় আগমন করিলেন।

লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্দি করিয়া আগমন করার সম্বন্ধে "চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ" প্রণেতা বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন যে, যখন লক্ষ্মণমাণিক্য শুনিলেন যে তাঁহার অবজ্ঞেয় বালক, যুদ্ধার্থে তাঁহার দ্বারদেশে উপস্থিত, তখন ক্রোধে তাঁহার সর্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং রামচন্দ্রকে হত্যা করিবার জন্য, কর্মচারীবর্গকে কিছু না জানাইয়া, একাই খড়্গহস্তে ধাবমান হইলেন।

ক্রোধ ও জিঘাংসায় প্রণোদিত হইয়া লক্ষ্মণমাণিক্য যেমন নৌকায় উঠিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিলেন, অমনি পদস্খলনবশত নৌকার ডহরের মধ্যে পতিত হইলেন। রামচন্দ্রের আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণ লক্ষ্মণমাণিক্যকে উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া নৌকা খুলিয়া দিল। অতি অল্পদিন মধ্যেই রামচন্দ্রের নৌকা তদীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইল।

পূর্ববৈরতা প্রতিশোধার্ত রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যকে এক লৌহ-পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রহরী আসিয়া উপযুক্ত সময়ে বন্দিকে স্নানাহার করাইয়া যাইত। একদিন রাজা রামচন্দ্র স্নানার্থ বর্হির্বাটিতে বসিয়া তৈলমর্দন করিতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণমাণিক্যও স্নানার্থ বাহিরে আনীত হইলেন। রাজা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহার নিকটেই একটি নারিকেল বৃক্ষ ছিল; হস্তপদবদ্ধ লক্ষ্মণমাণিক্য বৈরনির্যাতনমানসে সেই নারিকেল বৃক্ষের উপর সমস্ত শরীর দ্বারা এরূপ চাপ দিলেন যে, ঐ বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া সশব্দে রাজার অতি নিকটে পতিত হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় রাজার প্রাণ রক্ষা হইল। রাজমাতা এবম্বিধ দুর্ধর্ষ শত্রুকে জীবিত রাখা নিতান্ত আশঙ্কাপ্রদ বিবেচনায়, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য পুত্রকে বলিলেন। অচিরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যের বধাজ্ঞা প্রদান করিলেন।

রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা কীর্তিনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনিই রাজা প্রতাপাদিত্যের দৌহিত্র। কীর্তিনারায়ণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতা-

পিতামহাদির পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইনি যে প্রকার বীর, তদ্রূপ নৌযুদ্ধবিশারদ ছিলেন, এবং মগ ও ফিরিঙ্গিগণকে, বহুযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতঃ মেঘনা নদী পর্যন্ত বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন। মোগলসম্রাট জাহাঙ্গিরের প্রতিনিধি, ঢাকা নগরীর নবাব এই সমস্ত ফিরিঙ্গি ও মগ দ্বারা নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। তিনি, রাজা কীর্তিনারায়ণ কর্তৃক এইরূপ উপকৃত হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং তারপর কীর্তিনারায়ণের সহায়তায় বহু শত্রু পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[৩৬]

একদা রাজা কীর্তিনারায়ণ, নবাবের সঙ্গে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে কোন বিশেষ সামরিক পরামর্শ জন্য, নবাব তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। কীর্তিনারায়ণ গৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, নবাব আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি বহির্দেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদর্শনে নবাব তাঁহাকে ভিতরে আসিবার অনুমতি করিলে, কীর্তিনারায়ণ বস্ত্র দ্বারা নাসাপুট আচ্ছাদিত করিয়া নবাবের নিকট স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট হইলেন। নানা বাক্যালাপ এবং যুদ্ধ সম্বন্ধীয় গূঢ় মন্ত্রণার পর নবাব, কীর্তিনারায়ণকে নাসাপুট আচ্ছাদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কীর্তিনারায়ণ তদুত্তরে বলিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে, যাবনিক খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ গ্রহণ করিলেও ধর্মচ্যুতি হয়। নবাব আর কোন কথা বলিলেন না, কীর্তিনারায়ণকে বিদায় দিলেন।

পরদিন অন্য কার্যোপলক্ষে নবাব আবার কীর্তিনারায়ণকে ডাকিলেন। তখন নবাব বাহিরে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার নিকটে মুসলমান সূপকারগণ হিন্দুর অখাদ্য, নানা প্রকার অস্পৃশ্য মাংস জ্বলন্ত চুল্লির উপর রন্ধন করিতেছিল। কীর্তিনারায়ণ আসন গ্রহণ করিলে পর, সূপকারগণ নবাবাদেশে পাত্রাবরণী সকল উন্মোচন করিল, পাক-দ্রব্যের গন্ধও অমনি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইল; কীর্তিনারায়ণ ঘ্রাণ পাইয়া তৎক্ষণাৎ বস্ত্র দ্বারা নাসাপুট আবৃত করিলেন। নবাব ব্যঙ্গহাস্য করিয়া বলিলেন, "রাজন! গতকল্য আপনারই মুখে শুনিয়াছি যে, যাবনিক খাদ্যের আঘ্রাণ গ্রহণ করিলেও হিন্দুদের ধর্মচ্যুতি হয়। আপনি এই মাত্র আপনাদের অখাদ্য দ্রব্যের গন্ধ পাইলেন, এখন অবশ্যই হিন্দুশাস্ত্রানুসারে আপনার ধর্মচ্যুতি ঘটিয়াছে। অতএব আপনি আর হিন্দু নন, এখন আমাদের সহিত একত্রে আহার করিতে আর দ্বিধা করা উচিত নহে।"

রাজা কীর্তিনারায়ণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। উপস্থিত সকলেই নবাবের বাক্য অনুমোদন করিলেন, কাজেই রাজা কীর্তিনারায়ণ অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বাসুদেবনারায়ণকে রাজ্যার্পণ করিয়া স্বয়ং তদবস্থায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে হিন্দুসমাজের বন্ধন এরূপ সুদৃঢ় ছিল যে, যবনস্পৃষ্ট পানীয় স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুচি হইতে হইত। মগ ও ফিরিঙ্গী নামে তৎকালে এরূপ ঘৃণা ছিল যে পথে কোন হিন্দুর সঙ্গে তাহাদের দেখা হইলে; হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। মিঃ বেভারিজ্ এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

কোন নদীর তীর দিয়া একদা অনেক মগ যাইতেছিল, তখন কতিপয় গ্রাম্য স্ত্রীলোক নদীতে স্নান করিতেছিল। মগ আসিতেছে দেখিয়া কয়েকজন স্ত্রীলোক পলায়ন করিল, একজন পালাইতে না পারিয়া নদী তীর মধ্যে ডুব দিয়া রহিল। মগ মনে করিল, হয়ত এই স্ত্রীলোকটি ডুবিয়া মরিল; সে তৎক্ষণাৎ ঝম্প প্রদানপূর্বক নদীতে পতিত হইয়া স্ত্রীলোকটিকে উঠাইল। এই কথা সমাজে প্রচারিত হইলে, জাতি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই স্ত্রীলোক সমাজচ্যুত হইল। এইরূপে জাতি নষ্ট হইলে কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিতেন, কেহ কেহ বা মগদের সঙ্গে মিলিয়া বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত হইতেন।

কীর্তিনারায়ণ প্রতাপান্বিত রাজা ও প্রাচীন হিন্দুজনপদের সমাজপতি, তাই তিনি বাধ্য হইয়াই কনিষ্ঠের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন।

পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে যবন-সংস্পর্শদোষী অনেক হিন্দুপরিবার এখনও আছেন, তাঁহাদের "পীরালী" বলে। মুন্দিয়ার মজুমদারবংশের পূর্বপুরুষগণ সুব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু যবনদোষে তাঁহারা

জাতিচ্যুত হইয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহারা হিন্দুর ন্যায় আচার-ব্যবহার করিতেছেন বটে কিন্তু হিন্দুসমাজ-পরিত্যক্ত। কলিকাতার ঠাকুরবংশও এই দোষে সমাজে অচল হইয়াছিলেন, এখন অনেকটা সমাজভুক্ত হইয়াছেন।

"পীরালী" ধর্মের একটি ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়। আকবরের অভ্যুত্থানের প্রায় একশতবৎসর পূর্বে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খাঞ্জা আলি নামক জনৈক ধার্মিক মুসলমান, বর্তমান বাগেরহাটের সন্নিহিত কোন এক গ্রামে বাস করিতেন।[৩৭] তাঁহার লোকাতীত চরিত্র, অসীম ধর্মপ্রাণতা ও অপ্রতিহত ক্ষমতায়, তদ্দেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ জাতিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট মহম্মদীয় ধর্ম গ্রহণ করেন। খাঞ্জা আলির তিরোধানের পর উক্ত ব্রাহ্মণযুবক "পীরালী" নাম ধারণ করতঃ হিন্দু ও মুসলমান ধর্মমিশ্রিত এক নূতন ধর্ম আবিষ্কার করিলেন। কেহ কেহ এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় না।

মাধবপাশার বর্তমান "বড় রাজা" মহাত্মা বীরসিংহনারায়ণ রায় বলেন যে, রাজা কীর্তিনারায়ণ জাতিচ্যুত হইলে একেবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করতঃ পূর্বস্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া যবনী বিবাহ করেন। ইহাতে যে কায়স্থ সমাজে কিছু কিছু গোলযোগ উপস্থিত না হইয়াছিল তাহা নহে; তবে কীর্তিনারায়ণ, আর কখনও চন্দ্রদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন নাই। নবাবের অধীনে, কখনও বা ঢাকা কখনও বা রাজমহলে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া কতকাল কোথায় কি ভাবে যে বাস করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে প্রকাশ যে, তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং চন্দ্রদ্বীপ অথবা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সহিত তাঁহার আর কোন সংশ্রব ছিল না।

রাজা বসুদেবনারায়ণের রাজত্বকালে কোন বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। "ঘটকারিকা" ও "কায়স্থকারিকা" গ্রন্থে ইহার বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু এই সময় হইতেই যে রাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিল না, তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। বসুদেবনারায়ণ, স্বীয় পিতা ও ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বয়ং কোন শত্রুদমনে বিজয়বাহিনীর অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন নিদর্শন নাই। কীর্তিনারায়ণ কর্তৃক মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যু বিতাড়িত হওয়ায় রাজ্য নিরাপদ ছিল বটে, তথাপি উক্ত দস্যুগণ সুযোগ পাইলেই অতর্কিত আ[illegible] মধ্যে যথেষ্ট উৎপাত করিত।

রাজা বসুদেবনারায়ণ স্বয়ং যেরূপ বিদ্বান ছিলেন, তাঁহার বিদ্যাচর্চায় আগ্রহও তদ্রূপ প্রবল ছিল। এরূপ প্রবাদ যে, তাঁহার যত্নে ও ব্যয়ে রাজপুরীতে এক বৃহৎ চতুষ্পাঠি স্থাপিত হইয়াছিল; তাহাতে ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হইত। অতি অল্পকাল মধ্যেই দিগদিগন্ত হইতে বহুসংখ্যক বিদ্যার্থী সে স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন। নলচিড়া, উজিরপুর এবং কোটালিপাড়া নিবাসী ভট্টাচার্যগণ অধ্যাপকের কার্য করিতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ, এখনও রাজপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

রাজা বসুদেবনারায়ণের তিরোধানের পর তদীয় পুত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহাসনারোহণ করিলেন। এই ভূপতি নিতান্ত ভীরুস্বভাব ছিলেন এবং রাজকার্য নির্বাহ করিতে সময়ে সময়ে অলসতা প্রদর্শন করিতেন। এই সুযোগে শত্রুগণ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতে লাগিল, এবং রাজকর্মচারীগণও সুবিধা বুঝিয়া প্রজার রক্তশোষণ করিতে ত্রুটি করিল না। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত এতকাল যে বন্ধুত্ব ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে দাসত্বে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল। দেশীয় মোগল শাসনকর্তা, রাজাকে সামান্য ভূম্যধিকারীজ্ঞানে, তাঁহার সহিত সময়ে সময়ে অন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সমাজপতির এবম্বিধ ভীরুতায় সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। পরস্পর কলহহেতু অনেক ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থ সেলিমাবাদ, তেলিহাটি ও অন্যান্য স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রতাপনারায়ণ এই লোকদিগকে শাসন করিতে বিশেষ সমর্থ হইলেন না। কিন্তু রাজাশাসনে ততটা দক্ষতা না থাকিলেও, তিনি নিরতিশয় ধার্মিক ও সরলস্বভাবসম্পন্ন দয়ালু ভূপতি ছিলেন; কেহ

গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহাকে কঠিন দণ্ড প্রয়োগ করিতেন না। তাঁহার এই প্রকার দয়া, দুষ্ক্রিয়াকারিগণের আনন্দ স্বরূপ হইয়াছিল, কারণ অপরাধীগণ প্রায়ই বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ করিত।

রাজা প্রতাপনারায়ণের জীবনলীলা সাঙ্গ হইলে তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র প্রেমনারায়ণ অমাত্যগণ কর্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার অদৃষ্টে অধিক দিন রাজ্যভোগ ঘটিল না; দুরন্ত কালকীট মুকুল অবস্থায়ই তাঁহার জীবন-কুসুম ছিন্ন করিয়া দিল। রাজা প্রেমনারায়ণই বসুবংশীয় শেষ নৃপতি। রাজা পরমানন্দ হইতে রাজা প্রেমনারায়ণ পর্যন্ত আটজন নৃপতি রাজা দনুজমর্দনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রীতিমত রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনপূর্বক অনন্ত কালসাগরে সামান্য বুদবুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের তেজ, বীর্য, উল্লাস, প্রভৃতি কিছুই নাই, আছে কেবল সামান্য স্মৃতি; তাহাও হয়ত সময়স্রোতের ভীষণ ঘূর্ণিপাকে একদিন অনন্তে মিশিয়া যাইবে।

সিংহাসন শূন্য দেখিয়া রাজামত্যগণ প্রেমনারায়ণের ভাগিনেয়, মিত্রবংশীয় গৌরীচরণের পুত্র উদয়নারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ঢাকার অন্তঃপাতী উলাইল গ্রামে এই মিত্রবংশীয়গণের বাসস্থান। ইহাদের বহু জ্ঞাতি ছিলেন, তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে কেহ কেহ তথায় এখনও বাস করিতেছেন।

রাজা উদয়নারায়ণের রাজনারায়ণ নামে আর এক সহোদর ছিলেন। মাতামহের সিংহাসন লইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, রাজনারায়ণ "রাজমাতা" নামক এক বৃহৎ তালুক, এবং চন্দ্রদ্বীপান্তর্গত "মহাল হিম্যাজাত" ও "মহাল উজুহাত" নামে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যাশা প্রত্যাহার করতঃ মাধবপাশার সন্নিকট প্রতাপপুর নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করিলেন। এই সম্পত্তিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং লাভপ্রদ। রাজনারায়ণের অধস্তন তিন চারি পুরুষ এই বৃহৎ সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর সে সম্পত্তি নাই, সামান্য অংশ মাত্র বর্তমান আছে। এই বংশে মোহননারায়ণ রায় মহদ্ব্যক্তি ছিলেন। মাধবপাশার রাজাদের ন্যায় ইহারাও ইহাদের নামের সঙ্গে "নারায়ণ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

রাজা উদয়নারায়ণ, চাখারনিবাসী, মেন্দি মজুমদার ও সরফ মজুমদার নামক দুই ব্যক্তি কর্তৃক রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হন। এই মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয়, নবাবের সহিত তাঁহাদের সুন্দরী ভগ্নির বিবাহ দিয়া তৎপরিবর্তে এই রাজত্ব প্রাপ্ত হন। নিরুপায় উদয়নারায়ণ, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য নবাবের নিকট দরবার করিতে গেলেন। যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা একদিন নবাবের সমকক্ষ ছিলেন যাঁহার বাহুবলে মোগলসাম্রাজ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভ পূর্ব রাজ্যে প্রোথিত হইয়াছিল; আজ তাঁহারই বংশধর নবাবসমীপে দীন প্রজার ন্যায় উপস্থিত হইলেন, দীন প্রজার ন্যায় আবেদন করিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

একদিন নবাব উদয়নারায়ণকে বলিলেন যে, তিনি যদি খড়গ চর্ম ধারণ করিয়া একাকী একটি ভীষণ শার্দূল নিহত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করা যাইতে পারে। তৎকালীন নবাবদের প্রায়ই এই প্রকার খামখেয়ালির কথা শ্রুতিগোচর হয়। রাজা উদয়নারায়ণ একজন শিক্ষিত শস্ত্রবিদ্ যোদ্ধা এবং অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, যদি রাজ্যলাভই না হয়, তবে অপমান সহ্য করিয়া জীবনধারণাপেক্ষা শার্দুলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা সহস্র গুণে শ্রেয়। তিনি বাহুবলের পরীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

এই কথা নগরমধ্যে ঘোষিত হইল; এই প্রাণ সংহারক অদ্ভুত ক্রীড়াদর্শনার্থ নবনারী, দলে দলে নবাববাড়ি সমাগত হইতে লাগিল। দুর্গসম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ক্রীড়োপযোগী স্থান নির্মিত হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারী এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের বসিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আসন নির্মিত হইল, সকলের সম্মুখে নবাব, নবাবপত্নী ও পুরমহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্রাকারে একটি উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত হইল।

নির্দিষ্ট দিনে দ্বিতীয় সঙ্গীবিহীন উদয়নারায়ণ একমাত্র অসিচর্ম ধারণ করিয়া দ্বিতীয় শেরখাঁর

ন্যায় রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কমনীয় অথচ বীরকান্তি দর্শন করিয়া অনেক দর্শক নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রঙ্গভূমির কেন্দ্রস্থলে পিঞ্জরাবদ্ধ এক ভীষণ শার্দূল, মধ্যে মধ্যে ভীম গর্জন সহকারে চতুর্দিক বিকম্পিত করিতেছিল। উদয়নারায়ণ ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া রক্ষীকে পিঞ্জরাবরণ উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন সেই জনসমুদ্র একেবারে নিস্তব্ধ হইল।

ব্যাঘ্র উদয়নারায়ণের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবকে প্রতিযোগী জ্ঞান না করিয়া উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্বেষণে রঙ্গভূমির চতুর্দিকে ধীরে ধীরে পরিভ্রমণ করিতেছিল। উদয়নারায়ণ এক সিংহনাদ করিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইলেন। শার্দূল তখন ভীষণ গর্জন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হস্তস্থিত সুদৃঢ় চর্মের বিচিত্র আন্দোলনে সেই আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া উদয়নারায়ণ ব্যাঘ্রের কুক্ষী লক্ষ করিয়া ভীষণ আঘাত করিলেন। ব্যথায় ভীম আর্তনাদ করিয়া শার্দূলও লম্ফ প্রদানপূর্বক আততায়ীকে আক্রমণ করিল। বিদ্যুৎগতিতে উদয়নারায়ণ লম্ফ দিয়া সেই আক্রমণ ব্যর্থ পূর্বক, ব্যাঘ্রের স্কন্ধদেশ লক্ষ করিয়া আর এক আঘাত করিলেন। দারুণ বেদনায় অস্থির হইয়া ব্যাঘ্র বিদ্যুৎবেগে উদয়নারায়ণের উপর পতিত রইল। হস্তস্থিত চর্ম দ্বারা সম্পূর্ণরূপ আত্মরক্ষাপূর্বক উদয়নারায়ণ প্রভূত বলের সহিত ব্যাঘ্রের মস্তকোপরি তরবারির আঘাত করিলেন। একাঘাতে ব্যাঘ্রের মুণ্ড দ্বিধাবিভক্ত হইল।

তখন সেই নিস্তব্ধ জনমণ্ডলী জয়সূচক তুমুল কোলাহল উত্থিত করিল। অনেকে বাহু উত্তোলন পূর্বক বিজয়ী বীরকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ, রক্তাক্ত কলেবরে মঞ্চের তলদেশে আসিয়া নবাবের কাছে পুরস্কার প্রার্থনা করিলেন। মজুমদার ভগিনী-নবাবের সেই নবপরিণীতা বেগম, এতক্ষণ শার্দূলদংষ্ট্রায় উদয়নারায়ণের মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এখন তাঁহাকে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত ও পুরস্কার প্রার্থনা করিতে দেখিয়া নিম্নস্থিত কতকগুলি পক্ক কদলীর বাক্‌লা উঠাইয়া তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি উদয়নারায়ণ সেই নিক্ষিপ্ত বাক্‌লা উঠাইয়া মস্তকে ধারণ পূর্বক বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রাপ্য বাকলা রাজ্যই পুরস্কারস্বরূপ পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। নবাব পূর্বেই উদয়নারায়ণের আসাধারণ বাহুবল এবং সাহস দেখিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এখন তঁহার উপস্থিত বুদ্ধিচাতুর্য দেখিযা অতীব আহ্লাদিত হইলেন। তখনই স্বীয় শ্যালকদ্বয়ের কবল হইতে চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যভার তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করিলেন, তৎসঙ্গে সুলতান প্রতাপ নামক পরগনারও ষষ্ঠাংশেব অধিকার প্রদান করিলেন।

মিত্রবংশীয় যে কয়জন নরপতি চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজা উদয়নারায়ণ নানাগুণে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও সদ্বিবেচক ছিলেন, এবং সর্বদা রাজ্যোন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার মাতামহের সময়ে রাজ্য মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি তৎসমুদয় দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্তিত করিয়া অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে সর্বদা এই আশা ছিল যে তিনি চন্দ্রদ্বীপকে পূর্ববৎ বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, উদয়নারায়ণ তাঁহার সংকল্প সাধন করিবার পূর্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে রাজশ্রীও অন্তর্হিতা হইলেন।

রাজা উদয়নারায়ণের পর শিবনারায়ণ পিতৃসিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র পিতার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া উঠিল। তিনি যেরূপ অলস, অত্যধিক উন্মনা এবং নিরতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। রঘুবংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণের ন্যায় তিনি সকল সময়েই স্ত্রীগণ-পরিবৃত হইয়া অন্তঃপুরে বাস করিতেন। কেবল বিবাহিতা পত্নীগণে তিনি পরিতৃপ্ত হইতেন না, কন্যাসমা পালনীয়া প্রজাপত্নীগণও তাঁহার পাপনয়নের পথবর্তিনী হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পাশববৃত্তির বশীভূত হইয়া তিনি গ্রাম্যমহিলাদিগের সর্বনাশসাধনে ত্রুটি করিলেন না। এই প্রকার পাশবিক অত্যাচারে প্রজা ও অন্যান্য গ্রামবাসীগণ স্বীয় স্বীয় মানমর্যাদা রক্ষার্থ আবাসস্থান পরিত্যাগ করিতে

আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে গ্রাম জনশূন্য হইতে লাগিল। যে সমস্ত শত্রু ও দুষ্টাশয় অমাত্যবর্গ রাজা উদয়নারায়ণের শাসনে ভীত ও ত্রাসিত ছিল, তাহারা অবসর বুঝিয়া মস্তকোত্তলনপূর্বক যথাসাধ্য স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইল। রাজা শিবনারায়ণের প্রধানা মহিষী দুর্গাবতী স্বামীর এবম্বিধ উচ্ছৃঙ্খলতায় অত্যন্ত মর্মাহতা হইলেন। প্রতিদিনই তাঁহার কর্ণে রাজ কর্মচারীগণের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ ও প্রপীড়িত প্রজাদের আর্তনাদ পৌঁছিতে লাগিল। রাজ্যের হিতের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং কতিপয় বিশ্বস্ত কর্মচারীসহ রাজকার্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনেকটা অশান্তি নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু পূর্ববৎ সুশৃঙ্খলা আর হইল না।

শিবনারায়ণের স্বর্গীয় পিতা, স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন করিয়া নবাবের নিকট, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের অংশ হইতে সুলতান প্রতাপ পরগনার যে ষষ্ঠাংশ পাইয়াছিলেন, তাহার ও পরগনার সম্পূর্ণ অংশের স্বয়ং মালিক-দখলকার বলিয়া শিবনারায়ণ, রামগোপাল নামক এক ব্যক্তিকে উহা ইজারা দিলেন। ফলে উহা লইয়া উলাইলনিবাসী জ্ঞাতিবর্গের সহিত তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে লর্ড ক্লাইভ, সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলেন। তারপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে রাজত্ব চলিতে থাকে। উক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য উলাইলের মিত্রগণ জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। ইহাতে রাজা রাজবল্লভের পুত্র গঙ্গাদাস দুই পক্ষ কর্তৃক মধ্যস্থ নির্বাচিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। রামগোপাল তখন বাধ্য হইয়া ইজারা ইস্তাফা দিলেন, তারপর গোলমাল মিটিয়া গেল। এই মোকর্দ্দমায় মিঃ এ. গ্লোভার (N. Glover) এবং হরিরাম মল্লিক জজ ছিলেন। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর ইহা নিষ্পত্তি হয়।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবাজনিত উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিতে শিবনারায়ণের মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় তিনি উন্মাদ হইলেন। সর্বদা প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাকে বন্দি অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইত। কোন প্রকারে ছুটি পাইলে তিনি সকলের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেন।

এক দিন নিশীথ সময়ে তিনি কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া সুপ্তরাজবাটির প্রায় সকল গৃহেই অগ্নিপ্রদান করিলেন। অনুকূল বায়ুর সাহায্যে অগ্নিদেব শীঘ্রই প্রচণ্ডমূর্তি ধারণ করিলেন, রাজবাড়ির বৃহৎ অট্টালিকাসমূহ ভস্মে পরিণত হইল। অনেক বহুমূল্য জিনিস, পুরাতন দলিল পত্র[৩৮] এই সঙ্গে ভস্মীভূত হইয়া গেল। কেবলমাত্র কাত্যায়নী ও মদনগোপালের মন্দির এবং নহবতখানা রক্ষা পাইয়াছিল। রাজপরিবারগণ ও অন্যান্য ভৃত্যবর্গ কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা শিবনারায়ণের মৃত্যুর পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অতি অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়নারায়ণ রাজা হইলেন।

জয়নারায়ণ নিতান্ত বালক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মাতা, রানী দুর্গাবতী রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। হোসেনপুরনিবাসী বক্সীবংশের আদিপুরুষ শঙ্কর বক্সী, রাজ্যের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি অন্যান্য কতিপয় কর্মচারীকে সহায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে সর্বময়কর্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি যাহা করিতেন তাহাই হইত। নিরীহ প্রজাপুঞ্জের প্রতি অত্যাচার করিয়া এই সমস্ত দুর্বৃত্তগণের বহুতর অর্থসঞ্চয় হইতে লাগিল। রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক, রানী দুর্গাবতী স্ত্রীলোক; সুতরাং তাঁহারা ইহার কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেন না।

এইভাবে প্রায় সাত বৎসর পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীগণ অবাধে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। পরিশেষে রানী দুর্গাবতী, বিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের[৩৯] সাহায্যে দুর্বৃত্তগণকে দূর করিয়া রাজত্ব স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রানী দুর্গাবতী অনেকগুলি লোকহিতকর কার্য করিয়াছিলেন, এবং অনেকগুলি দেবালয় ও দিঘি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সমস্ত কীর্তির মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা এখনও বর্তমান

আছে; উহা "দুর্গা সাগর" নামে বিখ্যাত। বর্তমানে এই দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্ব এবং কিনারা নানাবিধ শৈবাল, নল প্রভৃতি পরিপূর্ণ। ইহার তীরে দাঁড়াইলে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস স্মৃতিপথারূঢ় হয়। এই বিস্ময়কর দৃশ্য অদ্যাপি ইহাদের অসীম কীর্তি ও লোকাতীত ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। একদিন সমস্তই ছিল; প্রতিভা, তেজ, বাহুবল, দীধিতি প্রভৃতি সমস্তই এখন কাল-সাগরেব ঘূর্ণিপাকে অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল সামান্য স্মৃতিটুকু এখন পর্যন্তও যায় নাই; তাহাও যে অধিক দিন স্থায়ী থাকিবে তাহারই বা বিশ্বাস কি?

রাজা জয়নারায়ণের রাজত্ব সময়ে সুপ্রসিদ্ধ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপ হইতে কোটালিপাড়া, সুলতানাবাদ, বোজরোগ উমেদপুব, ইদিলপুর, রতনদিকালিকাপুর, বাঙ্গড়োর প্রভৃতি পরগনা পৃথক কবা হইল। ইহাতে রাজ্যের আয় প্রায় অর্ধাপেক্ষাও কমিয়া গেল; তবুও যাহা রহিল, তাহাও প্রকাণ্ড জমিদারি। ইহাই রাজা জয়নারাযণের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইল।

এই সময় হইতেই রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইল। শিবনারায়ণের সময় হইতেই ইহার সূত্রপাত; তৎপর শঙ্কর প্রভৃতি কর্মচারী কর্তৃক রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য হইয়াছিল। রানী দুর্গাবতী রাজ্যের এই প্রকার অর্থাভাব দেখিয়াও প্রায় তিন চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিযা, দীর্ঘিকা খনন, দেবালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিয়াছিলেন। ইহাতে যেমন প্রচুর অর্থ খরচ, তদ্রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে কতকগুলি পরগনা বাহির হইয়া যাওয়ায় রাজ্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় হইতেই চন্দ্রদ্বীপের সৌভাগ্য-সূর্য রাহু-কর-কবলিত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কয়েক বৎসর পরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিলামের আইন জারি হইল। নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে দেয় রাজকর প্রদান না করিলে সম্পত্তি নিলাম-বিক্রয় দ্বারা টাকা আদায় করা হইত। দেশীয় ভূম্যধিকারীগণ সে সময়ে খাজনার টাকা ধার্য দিনে আদায় করিতে ততটা অভ্যস্ত ছিলেন না বলিয়া অনেকে ইহাতে হৃতসর্বস্ব হইলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ হইলে অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত "ফিরিঙ্গিকে খাজনা দিতে হইবে" এরূপ কার্য নিতান্ত পাপের এবং গর্হিত বিবেচনায় উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইতেন না। ফলে তাঁহাদের বংশধরগণ, বর্তমান সময়ে চাকুরি অথবা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বহুক্লেশে পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন।

রাজা জয়নারায়ণ একে বালক, তদুপরি স্বার্থপূর্ণ আত্মীয়কুটুম্বগণে পরিবৃত। এই সমস্তলোক, নির্দিষ্ট তারিখে কালেক্টরিতে[৪০] টাকা না দিয়া আত্মসাৎ করিতে লাগিল। প্রথমত ১২০০ সালে চন্দ্রদ্বীপ জমিদারির ষোল আনির ১৭ ক্রান্তি নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। তৎপরে ক্রমাগত ঐ কারণে ১২০২ এবং ১২০৪ সালে ১২।। ও ১৭।। অংশ নিলাম-বিক্রয় হইয়া গেল। রাজাকে তাঁহার দুষ্ট কর্মচারী ও কুটুম্বগণ বুঝাইলেন যে, টাকা দিয়া শীঘ্রই আবাব তাঁহার জমিদারি আনিতে পারিবেন। তাঁহারা যেরূপ বুঝাইলেন রাজা তাহাই বিশ্বাস করিলেন। ফলে, অবশিষ্ট ।।১২।। অংশ নিলাম-বিক্রয হইয়া গেল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চন্দ্রদ্বীপের জমিদারি নিলামে ক্রয় করিয়াছেন।

রামমাণিক্য মুদি (মাণিকমুদি)	।।১২।৶
পানিয়াটি সাহেব . . .	৶১০
দাল সিংহ . . .	।১৭৶
	সমষ্টি ১ ষোল আনা

রামমাণিক্য মুদি রাজার "খানাবাড়ি"র প্রজা; এবং রাজসরকারের একান্ত অনুগত দোকানদার ছিল। প্রবাদ যে, মুদিগণ এই সম্পত্তি রাজার আজ্ঞানুসারে তাঁহারই টাকা দ্বারা বেনামিতে ক্রয় করে। স্বনামে খরিদ হইলে এই অংশও বাকি করের দায়ে নিলাম হইয়া যাইবে, এই ভয়ে রাজমাতা, মুদিকে বিশ্বাস করিয়া এই জমিদারি ক্রয় করিবার জন্য টাকা প্রদান করেন। এই প্রবাদটার সত্যাসত্য সম্বন্ধে পাঠক বিবেচনা করিবেন।

দুর্নাম দূব কবিবার জন্যই হউক, অথবা স্বেচ্ছায়ই হউক, মুদিগণ, তাহাদের ক্রীত অংশ হইতে,

মাত্র এক আনা অংশ রাখিয়া বাকি অংশ সমস্তই রাজাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু দুষ্টাশয় ভৃত্যবর্গ এবং কুটুম্বগণ রাজাকে বুঝাইলেন যে, খানাবাড়ির মুদির সঙ্গে একত্রে জমিদারি ভোগ করা নিতান্ত অপমানের বিষয়; সুতরাং অপরিণামদর্শী অলক্ষ্মীর দৃষ্টিতে দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। রাজা উক্ত অংশ রাখিলে, তাঁহার বংশধরগণ আজ এই দুরবস্থায় পতিত হইতেন না।

এই নিলাম রহিত করিবার জন্য রাজা জয়নারায়ণ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলে, তিনি জয়লাভ করিলেন। মুদিগণ সদর দেওয়ানি-আদালতে আপিল করিল। তাহাতে রাজা পরাস্ত হইলেন। পুনরায় রাজার পক্ষ হইতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করা হইল।

বিলাত আপিলের ফলাফল শীঘ্র জানিবার উপায় নাই; বর্তমানকালেও শীঘ্র ফলাফল বাহির হইলে অন্যূন তিন চারি বৎসরের মধ্যে কিছুই জানা যায় না। তৎকালে ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘ সময় লাগিত। এদিকে রাজার এবং রাজপরিবারবর্গের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হইতে লাগিল, সম্পত্তি হইতে টাকা আদায় এক প্রকার বন্ধ হইল। রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য; যাহা ছিল, মোকর্দ্দমাদিতে তাহাও প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

বিপদ কখনও একাকী আসে না; এই সময়ে রাজা জয়নারায়ণ পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা নৃসিংহনারাযণ তখন বালক; তদীয় মাতা, রানী করুণাময়ী বালককে বুকে লইয়া কঠোর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনিই নাবালকের পক্ষ হইতে প্রিভিকাউন্সিলে মোকর্দ্দমা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। মুদিগণ জমিদারির অধীন কয়েকখানা নিষ্কর তালুক ও লাখেরাজ সম্পত্তি ছাড়িয়া নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু রাজপরিবারের তখন এতদূর ক্লেশ যে, সময়ে সময়ে গ্রাসাচ্ছাদনেরও অভাব হইত; সুতরাং রানী করুণাময়ী, মুদিগণের প্রস্তাবানুসারে নিষ্পত্তি করিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই প্রিভিকাউন্সিলের হুকুম প্রচারিত হইল। ইহাতে রাজা নৃসিংহনারায়ণই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং মুদিগণের নিকট খরচ ও ওয়াশিলাতেও ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; চন্দ্রদ্বীপের বিস্তীর্ণ জমিদারি, রাজাদের হস্ত হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

রামমাণিক্য মুদির বংশধরগণ অদ্যাপি রাজার খানাবাড়িতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা বর্তমান সময়ে বিশেষ ধনাঢ্য হইলেও রাজাদের বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাড়িতে কোন কার্য উপস্থিত হইলে, রাজাকে রীতিমত নজর দিয়া অনুমতি গ্রহণান্তে কার্য নির্বাহ করেন।

রাজা নৃসিংহনারায়ণ তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ ছিলেন; তাঁহার অলৌকিক রূপরাজিদর্শনমানসে বহুদূর হইতে নরনারী আগমন করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার সৌভাগ্য তদনুরূপ ছিল না, দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পীড়ন এবং নৈরাশ্যের ভীষণ হুঙ্কার তাঁহাকে অহর্নিশি যন্ত্রণা প্রদান করিত।

বিজয়া দশমীর পরদিন, রাজা নৃসিংহনারায়ণ, তাঁহার পূর্বপুরুষের ন্যায় বহুজনসমভিব্যাহারে নৌযাত্রা করিতেন। প্রজাবর্গ ও অন্যান্য সকলে যথাযোগ্য উপঢৌকন দিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিত। কেননা অনেকের বিশ্বাস যে, বিজয়ার পরদিন রাজদর্শন শুভকর।

রাজা নৃসিংহনারায়ণ ধীর, গম্ভীর এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি সরল এবং অমায়িক ব্যবহার দ্বারা সকলের মনস্তুষ্টি করিতেন। কেহ তাঁহার নিকট কোন ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে অবস্থানুরূপ দানে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

রাজা নৃসিংহনারায়ণের দুই বিবাহ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন রানীই সন্তানবতী ছিলেন না বলিয়া বংশরক্ষার জন্য প্রথমত একজন দত্তকপুত্র গ্রহণ করা হয়; তাঁহার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ, কিন্তু তিনি শীঘ্রই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তৎপর জ্যেষ্ঠা মহিষী রাজেশ্বরী এবং কনিষ্ঠা মহিষী অন্নপূর্ণার জন্য এক সময়েই দুইজন দত্তক গ্রহণ করা হয়। তাঁহারা "বড় রাজা" এবং "ছোট রাজা" নামে বিখ্যাত।

রাজা বীরসিংহনারায়ণ, জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর পুত্র; তাই ইনি "বড় রাজা" বলিয়া অভিহিত। ইহার দেবোপম আকৃতি, সর্বজনপ্রিয় উদারতা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র প্রভৃতি সদ্‌গুণ ইহার বংশের উপযুক্তই বটে। নানাবিধ মনোক্লেশে, তদুপরি পত্নীবিয়োগজনিত দুঃখে, ইন সর্বদাই ম্রিয়মাণ। ইনি সন্ধ্যাহ্নিক এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া সময়াতিবাহিত করিয়া থাকেন।

কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর পুত্র রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ একজন বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। পুরুষোচিত ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, বন্দুক-চালনা প্রভৃতি তাঁহার নিত্যকার্য ছিল। কথিত আছে যে, তিনি রিক্তহস্তে একদা একটি চিতাবাঘকে ধৃত করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, দৃপ্ত যৌবনের মধ্যভাগেই তাঁহার মানবলীলা শেষ হয়।

এই উভয় রাজপরিবারের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরস্পর গৃহবিবাদ এবং অন্যান্য কারণে জমিদারির অধীন যে কয়েকখানি তালুক ছিল, তাহাও ক্রমে নিলাম-বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এখন একমাত্র নিষ্কর খানাবাড়ি এবং লাখেরাজ সম্পত্তিই এই রাজবংশের গ্রাসাচ্ছদনের সম্বল। ভূতপূর্ব লেফ্‌টেনেন্ট্‌ গবর্ণর সার চার্লস্‌ ইলিয়ট, রাজা বীরসিংহ নারায়ণের পুত্র রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণকে সব্‌রেজেষ্ট্রার পদে নিযুক্ত করিয়া দুঃস্থ রাজপরিবারের যে মহদুপকার করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে একমাত্র বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ লইয়াই বর্তমান বাকরগঞ্জ জেলা গঠিত হইয়াছে। যতগুলি পরগনা আছে, তন্মধ্যে সেলিমাবাদ ও তেনিহাটি ব্যতীত সকলগুলিই কোন সময়ে এই চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্ভূত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং অন্যান্য কারণে অনেকগুলি পৃথক করা হইয়াছে। কোটালিপাড়া এবং মলফৎগঞ্জ এখন আর এই জেলায় নাই, বহু বৎসর হইল ফরিদপুর জেলাভুক্ত হইয়াছে। যেগুলি এখনও বর্তমান আছে, তন্মধ্যে অনেকটা, ব্রিটিশসাম্রাজ্য পত্তন হইবার পরে সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের প্রাচীন তত্ত্ব বিশেষ কিছুই নাই।

এই চন্দ্রদ্বীপে তিয়াত্তর খানি পৃথক তালুক আছে, ইহাদের রাজস্ব ৫৮,১০৪।।৮।।পাই। এই পরগনাস্থিত যে সমস্ত ভূম্যধিকারী আছেন, তন্মধ্যে ভারুকাঠির মজুমদারবংশ, রহমৎপুরের চক্রবর্তীবংশ এবং লাখুটিয়ার রায়বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারুকাঠির মজুমদারগণ মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় বৈদ্য। এই বংশের রামজীবন দাশগুপ্ত প্রথমে বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া ভারুকাঠিতে আগমন করেন। ভারুকাঠি, বরিশাল সদরের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। অধিবাসীর সংখ্যা সহস্রপ্রায়। মৌদ্‌গল্য ও ভরদ্বাজগোত্রীয় দাশগণ এবং অম্বষ্ঠ শ্রেণীর দত্তগণ এই গ্রামেব প্রধান অধিবাসী।

রামজীবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোপাল, চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজ্য সম্বন্ধীয় সকল বন্দোবস্ত করিতেন, এবং তাঁহার হস্তেই রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল। তিনিই রাজসরকার হইতে 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ মজুমদার উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া তদর্জিত বিপুল 'জর্নার্দন দাশ' নামক তালুক ভোগ করিতেছেন। মহাত্মা রামগোপাল ধর্ম, কর্ম ও পরহিতে রত ছিলেন। তিনি জ্ঞাতি, পুরোহিত, গুরু এবং অধীনস্থ ভৃত্যগণকে যে সকল ব্রহ্মোত্তর এবং জায়গির প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহারা তাহা ভোগ করিতেছেন। তিনি ভারুকাঠির চতুর্দিকে যে সকল সুবৃহৎ রাস্তানির্মাণ ও দীর্ঘিকাখননন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহারা তাঁহার যশোগান করিতেছে। "গোয়াচোৎরা" নামক বিশাল দীর্ঘিকা তাঁহারই কর্মজীবনের আংশিক পরিজ্ঞাপক। কথিত আছে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জনার্দন দাশ সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইলে মহাত্মা রামগোপল, পুত্রহস্তে বিপুল বিষয়ভার সমর্পণ করিয়া পুণ্যভূমি কাশীধামে অবস্থিতি করেন, এবং আকণ্ঠ জাহ্নবীজলে নিমজ্জিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে এ পৃথিবী হইতে তিরোধান করিলেন।

অধুনা ভারুকাঠি সংস্কৃতচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। গ্রামের মধ্যে অনেকেই বিশেষরূপে সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞ; কবিরাজ সারদাকান্ত দাশগুপ্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে একটি আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে ইংরাজি শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটগণের সংখ্যাও দিন দিন বর্ধিত হইতেছে। গ্রামে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিতরণের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। শিক্ষিত যুবকগণ ক্রমশ রাজসরকারে অধিষ্ঠিত হইয়া গ্রামের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সুখসৌহৃদ্যে গ্রামে সুখশান্তি বিরাজিত। গ্রাম্য যুবকগণের যত্ন ও পরিশ্রমে নিদাঘশ্রান্ত পথিকগণের পথশ্রান্তি ও তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য গ্রামের প্রান্তভাগে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তার উপর একটি জলছত্র ও বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চৈত্র মাসের শেষভাগে যখন মার্তণ্ডদেব অগ্নিমূর্তিকে অনলরাশি বর্ষণ করেন, সেই নিদাঘ-মধ্যাহ্নে পথিকগণ, 'বরিশাল-বানরিপাড়া রোডে' গমন সময়ে মাধবপাশার পর প্রায় দেড় ক্রোশ পর্যন্ত স্থানে পানীয় জলাভাবে সাতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া যে ভীষণ পথক্লান্তি অনুভব করেন; তাহা অপনয়ন করিবার জন্যই জলছত্র খোলা হইয়াছে। গ্রামে কয়েকটি প্রাচীন দেবালয় ও বিগ্রহ বর্তমান আছে; তন্মধ্যে 'বিষহরিবাড়ি' এবং 'হরিখোলাই' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রহমৎপুরের চক্রবর্তীবংশ চন্দ্রদ্বীপ পরগনার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বংশ বলিয়া সর্বত্র পরিচিত। ইহাদের পূর্বপুরুষ নারায়ণ চক্রবর্তী এই বংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা। নারায়ণ চক্রবর্তীর আদি বাসস্থান চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত কাঁচরাপাড়া। চন্দ্রদ্বীপের দেওয়ান সেরাই আচার্য তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। একদা ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া আচার্য মহাশয় জীবনে হতাশ হন এবং মৃত্যুকালে গুরুর পাদপদ্মদর্শনমানসে নারায়ণ চক্রবর্তীকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করেন। সেই সময়ে নারায়ণ চক্রবর্তী কথা প্রসঙ্গে আচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে চন্দ্রদ্বীপ রাজ সরকারের অনেক ঘটনা অবগত হন।

সেরাই আচার্য দীর্ঘকাল রুগ্নাবস্থায় থাকাতে রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। এমন কি, দেয় রাজস্ব অনাদায় হেতু নবাব-সরকার হইতে কৈফিয়তনামা চন্দ্রদ্বীপ প্রেরিত হয়। রোগক্লিষ্ট চলচ্ছক্তিরহিত দেওয়ান বিপদে পড়িলেন। তাঁহার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া গুরু নারায়ণ চক্রবর্তী তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ নবাব-সরকারে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হইলেন। তারপর অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথায় গমনপূর্বক চন্দ্রদ্বীপের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজধানী হইতে নারায়ণের প্রত্যাগমনের পূর্বেই আচার্য মহাশয় প্রাণত্যাগ করিলেন। নারায়ণের ঈদৃশ নিঃস্বার্থ পরোপকার এবং তীক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজা অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে সর্বাংশে উপযুক্ত মনে করিয়া দেওয়ানপদে বরণ করিলেন। দেওয়ানি লাভ করিয়া নারায়ণ চক্রবর্তী সপরিবারে কাঁচরাপাড়া হইতে মাধবপাশার সন্নিকটে রহমৎপুর গ্রামে স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করেন। রহমৎপুর, বরিশাল হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামটির প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর, অনতিপ্রশস্ত তিনটি খাল তিন দিক হইতে আসিয়া রহমৎপুরে সম্মিলিত হইয়াছে এবং গ্রামটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। বর্তমানে ঐ তিনভাগকে যথাক্রমে "উত্তরপাড়া" "পূর্বপাড়া" ও "দক্ষিণপাড়া" বলা হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে উত্তরপাড়া "হুজুরি" এবং পশ্চিমপাড়া "গোশাসন" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হুজুরি প্রথমে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। রহমৎ আলি এবং পুর আলি নামক দুই সহোদর এই স্থানের প্রথম অধিবাসী। তাহারা প্রবল পরাক্রান্ত ছিল এবং দস্যুবৃত্তিই তাহাদের জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় ছিল। চতুর্দিকে লুণ্ঠন করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ তাহারা এই অরণ্য মধ্যে রক্ষা করিত। রাজা কন্দর্পনারায়ণের রাজত্বকালে এই দস্যুদ্বয় ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের যুক্তনাম (রহমৎ+পুর) হইতেই এই গ্রামের নামোৎপত্তি হইয়াছে।

ত্রিশ বৎসর দেওয়ানি করিয়া নারায়ণ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র রঘুদেব ও রামদেব। পিতার মৃত্যুর পরে রঘুদেব উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাঁহার যত্নে নানা স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বৎসরান্তে ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ এবং পারিতোষিক বিতরণ জন্য বাকলা, বাঙ্গড়োরা, সোন্দারকূল, অরঙ্গপুর এবং সায়েস্তানগর এই পঞ্চ স্থান নির্বাচিত হয়।

রঘুদেবের মৃত্যুর পরে তদীয় কনিষ্ঠ রামদেব উক্ত পদ লাভ করেন। তিনি প্রত্যহ রহমৎপুর হইতে পাল্‌কি আরোহণে রাজদরবারে গমন করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের তদানীন্তন রাজা শিবনারায়ণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি এবং বিলাসপরায়ণ ছিলেন। একদা রাজা কোন কারণবশত কাহাকেও সেই সময়ে ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিতে দ্বারপালগণকে নিষেধাজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে রামদেব পাল্‌কি বাহনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, প্রহরীগণ বাহকদিগকে বাধা দিল। কিন্তু বাহকেরা তাহাদের নিষেধবাক্যে দৃক্‌পাত না করিয়া যেমনি প্রবেশোন্মুখ হইল, অমনি তাহারা পাল্‌কি লক্ষ করিয়া তরবারি নিক্ষেপ করিল। রামদেব নিদ্রাভিভূত ছিলেন। তরবারি তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল, তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রাজা এই সংবাদ অবগত হইয়া মর্মাহত হইলেন। নিজের অবিমৃষ্যকারিতার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া যারপরনাই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে রঘুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র রামভদ্রকে দেওয়ানি প্রদান করিলেন। দেওয়ান রামভদ্রের যত্নে রাজকীয় অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল। তদানীন্তন প্রজাসমূহ অনেকেই গোরক্ষা করিয়া স্বীয় স্বীয় ভূমি কর্ষণ করিত। দেয় রাজস্ব রীতিমত আদায় না হইলে তাহাদের গোরু ক্রোক করিয়া খাজনা আদায় করা হইত। এই উপলক্ষে অনেকগুলি গোরু একত্র করা হইত, কাজেই গোরুগুলি সযত্নরক্ষিত হইত না। রামভদ্র এই অভাব দূর করিবার জন্য রহমৎপুরের পশ্চিমপাড় গোরক্ষার জন্য নির্দেশ করেন। এই সময় হইতেই উক্ত স্থানের নাম "গোশাসন" হইয়াছিল। গোরুগুলি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত বলিয়া রামভদ্র সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য কবিতা প্রচলিত ছিল, যথা—

"তঙ্কাতে তিনটি গোরু, একটি তার ফাও,
কেন যদি গোরু, রামভদ্র কাছে যাও।
সরসরানী, সরসরানী, সরসরানী সর,
রাজমন্ত্রী বেচে গোরু শীঘ্র করি চল্।।"

রামভদ্রের শেষ অবস্থায় রাজকীয় অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটে। তাঁহার মৃত্যুসময়ে দেয় রাজস্ব সাত লক্ষ টাকা বাকি পড়িয়াছিল।

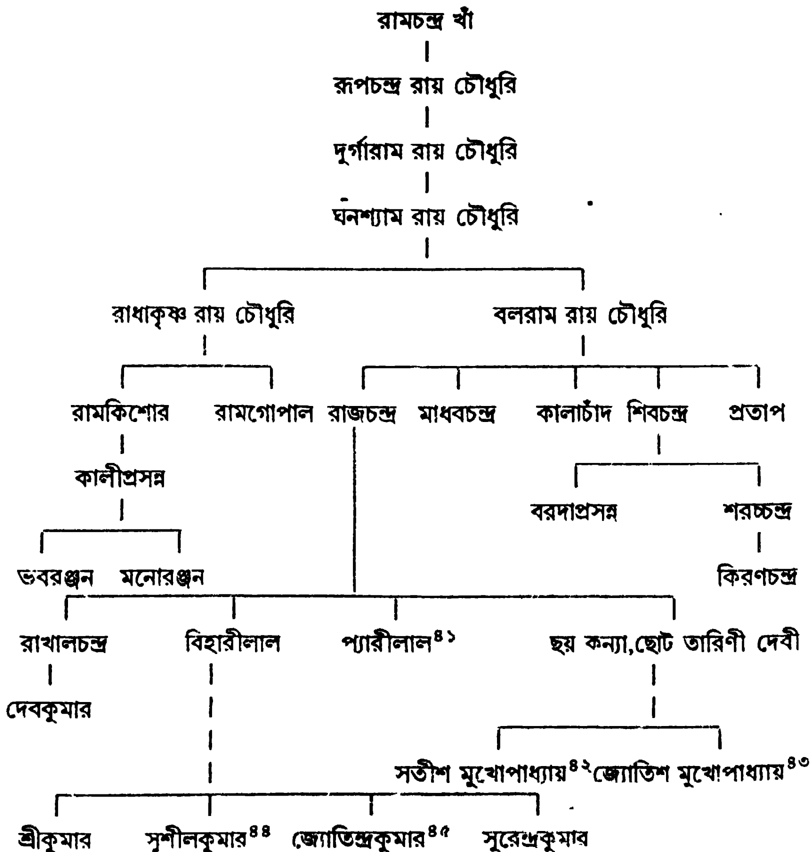
রামভদ্রের তিন পুত্র। তন্মধ্যে রামজীবনই সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি মাত্র ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেওয়ানি কার্যভার গ্রহণ করেন এবং স্বীয় প্রতিভা ও কার্যদক্ষতাগুণে অল্পকাল মধ্যেই দেয় রাজস্ব সাত লক্ষ টাকা নবাব-সরকারে দাখিল করেন।

চন্দ্রদ্বীপের তদানীন্তন রাজা শিবনারায়ণের মৃত্যুর অত্যল্প দিন পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন রাজ্য মধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইল; কতিপয় স্বার্থপর কর্মচারী শত্রুপক্ষে যোগদানকরতঃ গোপনে নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিল। অবিলম্বে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে চন্দ্রদ্বীপ খাসরাজ্যভুক্ত করার জন্য নবাব-সরকার হইতে এক পরওয়ানা দেওয়ান রামজীবনের নিকট প্রেরিত হয়। পরওয়ানা হস্তগত হইলে প্রভুভক্ত রামজীবন যারপরনাই চিন্তিত হন। তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সকলের অজ্ঞাতে নবাব দরবারে গমন করেন এবং আবেদন করেন যে, রাজ্য অরাজক নহে, শত্রুর ষড়যন্ত্রজনিত অমূলক জনরব মাত্র। রাজা শিবনারায়ণের আর এক নাবালক পুত্র বর্তমান। রানী দুর্গাবতীই স্বীয় পুত্র 'দুর্গাকুমার' নামে রাজ্য শাসন করিতেছেন, নবাব যেন সেই নামেই রাজত্ব বহাল রাখিবার অনুমতি দেন। নবাব এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া রামজীবনকেই রাজত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রামজীবন কিছুতেই তাহা স্বীকার করিলেন না। নবাব তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং রামজীবনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। রানী দুর্গাবতী রামজীবনের এই জ্বলন্ত প্রভুভক্ত ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার পরিচয় পাইয়া পুরস্কারস্বরূপ রামজীবনের নিজ সম্পত্তির রাজস্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়া দেন এবং চন্দ্রদ্বীপের দেয় রাজস্বের সহিত তাঁহার রাজস্ব পৃথক ভাবে নবাব সরকারে দাখিল করিবার অনুমতি প্রদান করেন।

রহমৎপুরের ভূম্যধিকারীগণের উদারতা, মহত্ব, প্রভুভক্তি এদেশের ইতিহাসে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহারা ভূসম্পত্তি প্রাপ্তির পর হইতেই বহুবিধ লোকহিতকরকার্য করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে অস্মদ্দেশে ব্রাহ্মণকুলে এই বংশই সর্বাপেক্ষা সৎক্রিয়ান্বিত। ইহাদের পূর্ব গৌরব এখন আর নাই, তবে স্মৃতিটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, ভৈরব চক্রবর্তী, বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী, বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, সারদাচরণ চক্রবর্তী, আনন্দমোহন চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লাখুটিয়ার রায়বংশ বঙ্গদেশের গৌরববর্ধন করিয়া সর্বত্র সর্বথা প্রখ্যাত হইয়াছে। মহামতি রামচন্দ্র খাঁ, সর্বপ্রথমে বাকরগঞ্জ জেলায় এই বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী দেশ সমূহের শাসনকর্তা ছিলেন। কালক্রমে দূরদৃষ্টনিবন্ধন নবাবের রোষানলে পতিত হইয়া এই জেলার দক্ষিণপ্রান্তে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাই জগন্নাথদেবের স্মরণার্থে এই স্থানের নাম "পুরী" রাখিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ইহারই সহায়তায় বঙ্গদেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'পুরী' বর্তমান পটুয়াখালির বাউফল থানার অধীনে অবস্থিত।

রামচন্দ্র খাঁ-এর সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।



রামচন্দ্রের প্রপৌত্র ঘনশ্যাম রায় ধাত্রী কর্তৃক পুরী হইতে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী মাধবপাশায় নীত হ'ন। তৎকালে দস্যুদের অমানুষিক অত্যাচারে বাকরগঞ্জের দক্ষিণদিকস্থিত অনেক স্থান বিপর্যস্ত হইত, তাই পিতৃমাতৃহীন ঘনশ্যামকে রক্ষা করিবার জন্য মাতৃস্বরূপা স্নেহময়ী ধাত্রী তাঁহাকে মাধবপাশায় লইয়া আসেন। রাজা অনুসন্ধান পূর্বক শিশু ঘনশ্যামের বিখ্যাত বংশের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি দিয়া লাখুটিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গ্রাম বরিশাল শহরের আড়াই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে পূর্বে অসংখ্য টিয়া বা শুকপাখি বাস করিত বলিয়া এই গ্রাম লাখটিয়া (লাখুটিয়া) নামে কীর্তিত হইয়াছে।

ঘনশ্যামের পৌত্র রাজচন্দ্র রায় চৌধুরি একজন অসাধারণ লোক ছিলেন।[৪৬] ইনি পারস্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। জীবনের প্রারম্ভ কালে তিনি পুলিশবিভাগে কর্ম করেন কিন্তু এই বিভাগের কার্যকলাপের প্রতি বিবিধ কারণে একান্ত বীতরাগ হইয়া কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক বরিশাল জজ-আদালতে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হ'ন। দৈবানুগ্রহে এবং স্বীয় অনন্য-সাধারণ প্রতিভাপ্রভাবে ইনি অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত সম্পত্তির অধিপতি হইয়া অসংখ্য শুভ কর্মানুষ্ঠান দ্বারা সমগ্র পূর্ববঙ্গে স্বীয় পুণ্য-নাম চিরস্মরণীয় রাখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে মানবের ত্রিবিধ ঋণ নির্দিষ্ট আছে—দেবঋণ, ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষ শাস্ত্রবিহিত যাবতীয় কর্তব্য অনাবিল ও একাগ্রনিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া, উক্ত ত্রিবিধ ঋণ হইতেই মুক্তিলাভ করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। দুঃস্থ ও নিঃসহায় ব্যক্তিগণের দুঃখবিমোচনের জন্য অকাতরে ও মুক্তহস্তে ইনি দান করিতেন। বাকরগঞ্জ জেলার জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা বিধানকল্পে ইনি বরিশাল শহর হইতে লাখুটিয়া গ্রামের প্রান্তবাহী নদী পর্যন্ত সুপ্রশস্ত পথ ও খাল, প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-ধর্মানুমোদিত সামাজিক ক্রিয়াদি দ্বারা হিন্দুসমাজে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার স্বোপার্জিত অর্থে লাখুটিয়ায় যে রাজপ্রাসাদতুল্য ভবন নির্মিত হয় এবং লাখুটিয়ার চতুষ্পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামস্থ অধিবাসীগণের জলকষ্ট নিবারণার্থ যে সকল তড়াগ খনিত হয়, তাহা পূর্ববঙ্গের—বিশেষত এই জেলার পরম গৌরবের বিষয়। জ্ঞানে, কর্মে ও চিন্তায়, এরূপ সুসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন এ সংসারে দুর্লভ।

রাজচন্দ্র রায় চৌধুরির সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরি। যৌবনারম্ভেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং সেই সময় হইতেই ধৈর্য, নিপুণতা ও যোগ্যতার সহিত ইনি পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবর্ধন করিয়াছিলেন। ইনি পারস্য, সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাকরগঞ্জ জেলায় লোক-মত সংগঠনের ও সর্ববিধ অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ইনি বরিশাল শহরে জনসাধারণের সভা (Peoples' association) প্রতিষ্ঠিত করেন। সমগ্র বঙ্গদেশে যতগুলি সভাসমিতি আছে, প্রায় সকলগুলির সহিত ইনি সহানুভূতির সহিত যোগদান করিতেন। কতিপয় বৎসর ইনি বরিশাল ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান (vice chairman) পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশবাসীর বিবিধ উপকার করিয়াছেন। জনসমূহের জলপথে গমনাগমনের অসুবিধা নিবারণ করিবার জন্য ইনি নিজ অর্থে বরিশাল হইতে পটুয়াখালি পর্যন্ত "ভারত-কুসুম" ও "চারু-কুসুম" নামক দুইখানি স্টিমার চালাইতেন। ইঁহার সরল ও উদার ব্যবহারে, পরম শত্রুর মনেও ইঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইত। দরিদ্রের প্রতি দয়া, আর্তের প্রতি অনুকম্পা, আশ্রিতের প্রতি বাৎসল্য, ধর্মের প্রতি নির্বিকার আসক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি অচপল অনুরাগ ও অবিচলিত বিশ্বাস প্রভৃতি লোক-দুর্লভ সদ্‌গুণ-ভূষণে ইঁহার জীবন অলঙ্কৃত ছিল।

রাখালচন্দ্রের একমাত্র পুত্র দেবকুমার রায় চৌধুরি ১২৯২ সালের ১১ই মাঘ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক এবং সাহিত্য জগতে একজন সুকবি বলিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার "অরুণ", "প্রভাতী", "মাধুরী" প্রভৃতি গীতিকাব্য আমাদের সাহিত্য-জগতের গৌরবস্বরূপ। ইনি সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীগণের একজন প্রধান উৎসাহদাতা।

আমরা আশা করি, নবীন কবি স্বীয় প্রতিভাবলে একদিন কবিবর রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হইতে পারিবেন।

রাজচন্দ্রের মধ্যম পুত্র বিহারীলাল রায় চৌধুরি। বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডের সদস্য এবং মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান হইয়া ইনিও দেশের অনেক শুভকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ, ইঁহারই অধ্যবসায় ও যত্নে বরিশাল শহরে "রাজচন্দ্র কলেজ" সংস্থাপিত হয়। বরিশাল জেলায় ইহাই সর্বপ্রথম শিক্ষানুষ্ঠান। এইরূপ প্রথম শ্রেণির উচ্চ বিদ্যালয় সংস্থাপন ও পরিচালন করিতে ইঁহার বহুসহস্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে।

রাজচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীলাল রায় চৌধুরি ; সাধারণত ইনি পি এল রায় নামে খ্যাত। বাল্যবয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তৎপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ইনি বর্ধিত হ'ন। প্রথমত কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইনি ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংলান্ডে যাত্রা করেন। তথায় কেম্ব্রিজের 'ডনিং' কলেজে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হ'ন, পরে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে সবিশেষ যোগ্যতার সহিত ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি-ব্যবসায়ে অতি অল্পকালমধ্যেই ইনি অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাকরগঞ্জ জেলার অধিবাসীগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর কতিপয় বৎসরের মধ্যে আইন ব্যবসায়ে পরম যশস্বী হইয়া উঠিলে, গভর্নমেন্ট ইহাকে হাইকোর্টের "লিগাল রিমেম্ব্রান্স" পদে নির্বাচিত করেন। ইতিপূর্বে আর কোন ভারতবাসী এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ও একান্ত সম্মানিত উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন নাই। মিঃ রায়, কয়েক বৎসর এই কার্য সম্যক যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন ; কিন্তু আর্থিক ক্ষতিনিবন্ধনে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে গভর্নমেন্ট ইঁহাকে, ইঁহার কর্মদক্ষতার জন্য, প্রভূত প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার সাধু চরিত্র, সরল ব্যবহার ও অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা ইঁহার জীবনকে গৌরব-প্রভা-মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

২. গ্রেদ-বন্দর

গ্রেদ-বন্দর, কীর্তনখোলা নদীর তীরবর্তী চন্দ্রদ্বীপের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ। বর্তমান বরিশাল বন্দর লইয়াই এই "গ্রেদ" অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরগনার সৃষ্টি হইয়াছে।[৪৭]

মেজর রেনেল্ কৃত মানচিত্রদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তাঁহার সময়েই বরিশাল এতদ্দেশের একটি প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বস্তুত নবাবি আমলেই বরিশাল বন্দরের ভাবী সমৃদ্ধির সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭৬২ খ্রিঃ, ২৬শে ডিসেম্বর নবাব মীরকাসিম, গভর্নর বান্সিটার্ট (Vansittart) সাহেবের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তৎকালে বরিশাল লবণের একটি প্রধান 'চৌকি'[৪৮] ছিল বলিয়া তাহাতে উল্লেখ আছে। আমরা নিম্নে এই পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম।

"In the parganas of Gopalpur and Dakhanbarpur (Dakhin Shahibazpur), and other district where salt is made, the people of the Company's factory work the saltpans ; and they take possession of all the salt which the molunghies of other parganas have made, by which means I suffer a very great loss. Moreover, they oblige the ryots to receive money from them for purchasing rice, and by force and violence they take more than the market price affords, and the ryots all run away on account of these oppressions. For many years it has been customary for the Casmere merchants to advance money at Sunderbund, and provide molunghies to work the salt-pans there : they paid the rents for the salt-pans at several parganas ; and the duties on the salt which were paid at *Burry-saul Chokey*, belonging to the Shahbunder, amounted to near Rs. 30,000. At present the

people of the factory have dispossessed the Cashmere merchants, and have appropriated all the salt to themselves''[৪৯]

১৮০১ খ্রিঃ অব্দে উইন্টেল (Mr. Wintle) সাহেব বাকরগঞ্জ হইতে বরিশালে স্থানীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ; এই সময়েই গ্রেদ-বন্দর সৃষ্ট হয়। এই গ্রেদের যাবতীয় ভূমি লইয়া 'হরি রাধানাথ দাস' নামক তালুক গঠিত হইয়াছে। এই তালুক যথেষ্ট লাভজনক, ইহার সরকারি রাজস্ব ৫৩।/৪ পাই মাত্র। বরিশালের আদালত, কালেক্টরি, গির্জা প্রভৃতি এই তালুকে অবস্থিত। রেনেলের সময়ে বরিশালের সীমা শুধু জেলখানা-নদীব দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; কিন্তু বর্তমান সময়ে বরিশাল, গ্রেদ-বন্দরের সীমা অতিক্রম করিয়া বগুড়া, আমানতগঞ্জ, আলেকান্দা, কাউনিয়া এবং কাশীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রান্ত দিয়া সরিদ্বরা কীর্তনখোলা কুলকুলনাদে বহিয়া চলিয়াছে। এই নদীর তটদেশ অতি মনোরম। কলিকাতার ষ্ট্রান্ডরোডের মত প্রশস্ত একটি রাস্তা জন-কোলাহল বক্ষে লইয়া প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্যের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই পথটির দুই পার্শ্বে সারি সারি ঝাউগাছ এবং শিকরসিক্ত মন্দ পবন ইহাকে সর্বদা স্নিগ্ধ রাখিয়াছে। নদীর স্ফীতবক্ষ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া বালারুণ যখন প্রভাতাকাশে উদিত হয়, কূলে বৃক্ষশাখাস্থিত অগণিত পাখিকলরবে সমগ্র শহরটি যখন নিদ্রাবেশ হইতে উত্থিত হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয়, বিশাল স্টিমারগুলি যখন আপনাদের বিশাল বপু ইতস্তত সঞ্চালিত করিতে করিতে নদীর গলায় অসংখ্য উর্মিমালা পরাইয়া চলিতে থাকে, তখন মনে হয় যেন সৌন্দর্যভার প্রপীড়িতা প্রকৃতিরানী, আপনার অপরিসীম সৌন্দর্যের কিয়দংশ সেখানে ঢালিয়া রাখিয়াছেন।

সমগ্র বঙ্গদেশে বরিশাল একটি প্রধান স্টিমার স্টেশন। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কাছাড় নোয়াখালি, খুলনা, কলিকাতা প্রভৃতি যাবতীয় স্থানের স্টিমার প্রত্যহই এখানকার পোতাশ্রয়ে আশ্রয় লইয়া থাকে।

বর্তমান বরিশাল, নিকটস্থ গ্রামগুলি লইয়া বর্ধিতায়তন হইয়াছে। ইহার বিস্তৃতি প্রায় ছয় বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিষ্টান এই তিনশ্রেণির লোকের বাস। শহরটির মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য মন্দির, মসজিদ ও গির্জা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

৩ বোজরগ উমেদপুর

বর্তমান সময়ে বাকরগঞ্জে এই পরগনা যেরূপ বিস্তৃত, তদ্রূপ লাভজনক। ইহার বিস্তৃতি প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত এবং প্রায় সমুদয় ভূখণ্ডই শস্যশালিনী।

মোগলরাজত্ব সময়ে ইহার অধিকাংশ স্থান নিবিড় অরণ্যানীতে পরিণত ছিল। ভীষণ শ্বাপদকুল ভীমগর্জনে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া, দিবাভাগেই শিকারানুসন্ধানে নির্ভয়ে বিচরণ কবিত। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই পরগনা "সরকার বাজুহা" অর্থাৎ সংরক্ষিত বন ছিল। এই স্থান হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি ছেদিত হইয়া দিল্লিতে রাজসরকারে প্রেরিত হইত। কখনও কখনও বা সাধারণের নিকট বিক্রীত হইত এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাজকোষে প্রেরিত হইত। তৎকালে সরকার বাজুহা মহালে বিলক্ষণ লাভ ছিল। বর্তমানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, সংরক্ষিত বনের (Reserve Forest) জন্য যে সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সময়েও এইরূপ বিশেষ কোন আইন প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে ১৬৬৪ খ্রিঃ অব্দে সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হ'ন। তিনি তের বৎসর যাবৎ এই দেশে ছিলেন।[৫০] তাঁহার সময়ে নিম্নবঙ্গের অনেক জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কৃত হইয়া লোকালয়ে পরিণত হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ যে কেবল রাজ্যশাসন করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন তাহা নহে, রাজ্যশাসনের সহিত মগ ও পর্তুগিজ দস্যুগণের উৎপীড়ন হইতে রাজত্বরক্ষণ বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্র করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত দস্যুদিগকে দমন

করিবার জন্য তিনি কখন বা ঢাকা, কখনও বা চট্টগ্রাম থাকিতেন। সেই সময় দুর্দান্ত দস্যুদের অত্যাচারে এই দেশের নিরীহ অধিবাসীগণ যারপরনাই নিগৃহীত হইতেছিল। এই অত্যাচার-কাহিনী সায়েস্তা খাঁর কর্ণগোচর হইলে, তিনি স্বীয় পুত্র বোজরগ উমেদ খাঁকে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ এদেশে প্রেরণ করেন।[৫১] বোজরগ উমেদ খাঁ এই কার্য নির্বাহার্থ কয়েক বৎসর এদেশে ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও উৎসাহে এই দেশের অনেক জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কৃত হইয়া মানববসতিতে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে এই পরগনার নাম হইয়াছে।

বোজরগ উমেদ খাঁ কিছুদিন নানাস্থানে খণ্ডযুদ্ধ করিয়া দস্যুদিগকে এই দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। কিন্তু পুনরায় নববলে বলীয়ান ও দলবদ্ধ হইয়া দস্যুগণ দ্বিগুণতেজে এই দেশবাসীগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। তখন বোজরগ উমেদ খাঁ, ঢাকায় পিতৃসমীপে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তথা হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য আনাইয়া 'গোলাবাড়ি' নামক স্থানে ছাউনি করিলেন। তারপর ক্রমাগত কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে দস্যুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোলাবাড়ি বর্তমান বাখরগঞ্জ স্টেশনের নিকটবর্তী। এই স্থানে এখনও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ,[৫২] রাজবর্ত্মের চিহ্ন প্রভৃতি বর্তমান আছে।

লোকহিতকর কার্য করিয়াও বোজরগ উমেদ খাঁ যশস্বী হইতে পারেন নাই, বরং কলঙ্ক-কালিমায় তাঁহার যশোরাশি মলিন হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়দোষে মুসলমান-নবাবগণ কলঙ্কিত, বোজরগ উমেদ খাঁও সেই দোষে কলঙ্কিত ছিলেন।[৫৩] তাঁহার পৈশাচিক ব্যবহারে ধনী হইতে দীন দরিদ্র পর্যন্ত কেহই অব্যাহতি পায় নাই। পুত্রের এবম্বিধ কুক্রিয়া সায়েস্তা খাঁর কর্ণগোচর হইলে, তিনি পুত্রকে অবিলম্বে ঢাকায় আসিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং তৎস্থলে অন্য কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে এই পরগনা সম্পূর্ণরূপে আগা বাখবের হস্তগত হয়। আগাবাখর খাঁ[৫৪] এই পরগনাস্থিত যাবতীয় নিমকের কারখানার উপর এক প্রকার নূতন কর স্থাপন করত অধিবাসীগণের বহু কষ্টোপার্জিত শস্যশালিনী ভূমি জোরপূর্বক কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। কতক জমি অন্যায়রূপে কর বৃদ্ধি করিযা প্রজাগণকে ভোগ করিতে দিলেন, কতক বা স্বীয় অনুচরবর্গকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিলেন। ইহার ফলে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেক দরিদ্র অধিবাসী ঘরবাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। কেবল যে ভূমি গ্রহণ কবিয়াই আগা বাখর ক্ষান্ত হইলেন, তাহা নহে, হতভাগ্য অধিবাসীগণের অনেক সুন্দরী যুবতী তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রের বিলাস-বাসনার সামগ্রী হইতে লাগিল।

পাপিষ্ঠ আগা বাখরের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনাতীত , কিন্তু এই দুরাচার এবং তৎপুত্র মহাপাপিষ্ঠ আগাসাদক এই পরগনাস্থিত একজন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর যে প্রকার সর্বনাশ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমরা সেই ঘটনাটি উল্লেখ করিতেছি।

বোজরগ উমেদপুর যখন জঙ্গলাকীর্ণ, তখন দয়াল চৌধুরি নামক জনৈক ব্যক্তি শ্বাপদগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এই স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। দয়াল চৌধুরি নবাব-নাজিমের নিকট হইতে রীতিমত ফরমান গ্রহণ করিয়া জঙ্গলাবাদে প্রবৃত্ত হ'ন। বহুদিনে, বহু অর্থব্যয়ে এবং ব্যাঘ্র-নিহত-নরশোণিতে ভূমি রঞ্জিত করিয়া দয়াল চৌধুবি কতকটা স্থান পরিষ্কাব করিতে সমর্থ হইযাছিলেন।

যখন আগা বাখর সদববলে বোজরগ উমেদপুর অধিকার করিতে আসিলেন, দয়াল চৌধুরী নানাপ্রকার উপঢৌকনসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আগা বাখর পূর্ব হইতেই দয়াল চৌধুবীর কথা শুনিযাছিলেন, এবং তাঁহাবই অদম্য অধ্যবসায়ে ও যত্নে যে উক্তস্থানে জনসমাবেশ হইযাছে, তাহাও জানিতেন। বিশেষত দয়াল চৌধুরী যে একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, তাহাও আগা বাখরের অবিদিত ছিল না।

খলপ্রকৃতির একজাতীয় মানুষ আছে, পরের ক্ষতি করাই যেন তাহাদের জীবনের এক মহাব্রত ; তারপর যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেহ এই প্রকৃতির লোক হ'ন, তবে যে কত অনর্থ, অত্যাচার, অবিচার হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আগাবাখর এবং তৎপুত্র আগাসাদক এই প্রকৃতির মানুষ। দয়াল চৌধুরির প্রভুত্ব এবং সম্মান কিসে খর্ব হইবে, ইহাই তখন তাঁহাদের লক্ষ্য হইল। কি উপায়ে দয়াল চৌধুরির সর্বনাশ হইবে, দিবারাত্র পারিষদগণসহ এই পরামর্শ হইতে লাগিল। নিরীহ দয়াল প্রায়ই আসিয়া দেখাসাক্ষাৎ করিতেন।

এদিকে আগাবাখর ও আগাসাদকের দৌরাত্ম্যে হিন্দু-মুসলমান প্রজাগণের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। জাতিপ্রাণরক্ষার্থে অনেকে সপরিবারে পলায়ন করিতে লাগিল। বোজরগউমেদপুরের ঘরে ঘরে তুমুল আর্তনাদ উপস্থিত হইল। আগাবাখর ও তাঁহার পুত্র যেন ক্ষুদ্র নবাব, কাহারও সুন্দরী কন্যা, ভগ্নী অথবা স্ত্রী তাঁহাদের ইচ্ছামত উপস্থিত না করিলে, প্রজার কাঁধে মাথা থাকিত না। ঘরবাড়ি অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিয়া দুরাত্মাদের পিশাচ অনুচরবর্গ রোরুদ্যমানা যুবতীগণকে ধরিয়া আনিত।

দয়াল চৌধুরির একটি সুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল, আগাসাদক তাহা টের পাইয়া, তাঁহার পাপযজ্ঞে ইন্ধনস্বরূপ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। দয়াল চৌধুরির মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি একদিন অতি বিনীতভাবে মর্মব্যথা আগাসাদককে জানাইলেন। তাঁহার প্রার্থনা ত অগ্রাহ্য হইল, অধিকন্তু জনৈক পারিষদ ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত বলিল যে, প্রজার কন্যা জমিদারের অঙ্কশায়িনী হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে। এহেন ঘৃণিত উক্তি শ্রবণ করিয়া দয়াল চৌধুরির হৃদয়ে যুগপৎ ঘৃণা ও দুর্দমনীয় ক্রোধের উদয় হইল। মনে মনে স্থির করিলেন যে, প্রাণ দিয়া কুলসম্মান রক্ষা করিবেন। তিনি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া নীরবে চলিয়া আসিলেন।

অপরাহ্নে কতিপয় ফৌজ দয়াল চৌধুরির কন্যাকে লইতে আসিলে, তিনি তাহাদের প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। আগা সাদক আবার লোক পাঠাইলেন, তাহারাও পূর্বদশা প্রাপ্ত হইল। দয়াল চৌধুবি যেরূপ সম্মানিত, তদ্রূপ তাঁহার ধনবল ও জনবলও ছিল। কিন্তু তিনি ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, যখন আগা সাদকের ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজপুরুষের সহিত বিরোধ ঘটিয়াছে, তখন সপরিবারে অন্যত্র গমন না করিলে, পরিত্রাণের আর উপায় নাই। কাজেই তিনি পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পাপাত্মা আগা সাদক, পিতার সহিত যুক্তি করিয়া নবাব নাজিমের নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, বোজরগ উমেদপুরে দয়াল চৌধুরি নামক একজন তালুকদার বিদ্রোহী হইয়াছে; তাহাকে দমন করিতে কতক ফৌজ আবশ্যক।

সামান্য একটা তালুকদার, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে কিনা, নবাব তাহা তদন্ত করিলেন না; তিনি প্রার্থনানুসারে ফৌজ প্রদান করিলেন। অতি সত্বর সৈন্য আসিয়া দয়ালের পলায়নপথ রুদ্ধ করিল। দয়াল চৌধুরী তখন পরিবারবর্গকে উপস্থিত বিপদের কথা জানাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি মুসলমানের করস্পৃষ্ট হইবার পূর্বেই যেন ইহলোক পরিত্যাগ করে। এই বলিয়া তিনি, আগতপ্রায় নবাব সৈন্যকে বাধা দিতে অমিতবলশালী কয়েকজন অনুচরসহ সশস্ত্রে ধাবমান হইলেন।

এদিকে দয়াল চৌধুরির পরিবারস্থ সমস্ত স্ত্রীলোক, বালকবালিকাসহ অন্তঃপুরস্থ দীর্ঘিকাবক্ষে একখানির সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দয়াল চৌধুরি, মুক্ততরবারিহস্তে মুষ্টিমেয় সঙ্গী লইয়া নবাবের অসীম সেনাতরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন। বর্তমান সময়ে বাঙ্গালি জাতি ভীরু এবং দুর্বল বলিয়া যে প্রকার উপহাসাস্পদ হইয়াছেন, আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তৎকালে বাঙ্গালির বাহুতে বল ছিল, তাঁহাদের তরবারিতে অনেক শিক্ষিত সৈন্যের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইত, তাঁহাদের রণোল্লাসজনিত সিংহনাদে শত্রুহৃদয় কম্পিত হইত। তৎকালে বঙ্গবীরগণ যে প্রকার অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতেন, বঙ্গকুললক্ষ্মীরাও তদ্রূপ হাসিতে হাসিতে স্বামীপুত্রের অনুগামিনী হইতেন।

কিছুকাল অসুরপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া দয়াল চৌধুরি ও তৎসঙ্গীগণ বীরগতি লাভ করিলেন; জনৈক মুসলমান সৈনিক তাঁহার ছিন্ন মস্তক বর্শায় বিদ্ধ করতঃ উচ্চ করিয়া ধরিল। সেই মুহূর্তে সরসীবক্ষোপরি ভাসমান নৌকার তলদেশ ছিদ্র করা হইল। বেগে জলরাশি নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অনতিবিলম্বে সব ফুরাইয়া গেল।

দয়াল ও তাঁহার পরিবারবর্গ ধর্মরক্ষার্থ যেরূপ অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও কীর্তি, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে কোন উল্লেখ না থাকিলেও, অমরধামে পরমধর্মময়ের পূতসিংহাসনতলে আগ্নেয়াক্ষরে চিরকাল খোদিত রহিবে।

দয়াল চৌধুরির বিস্তীর্ণ বাড়ি এখন জঙ্গলাকীর্ণ। এখনও স্থানে স্থানে ইষ্টকাদি দেখা যায়। যে দিঘিতে দয়ালের পরিবারবর্গ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্তমান, তবে এখন প্রায় সমভূমি হইয়াছে। স্থানীয় লোকে এখনও উহাকে 'দয়ালের দিঘি' বলিয়া থাকে। এই পরগনার অন্তর্গত সরমহল গ্রামে "জগানন্দের দিঘি" নামে এইরূপ আর একটি প্রাচীন দিঘি দৃষ্ট হয়। জগানন্দের সম্বন্ধেও পূর্বোক্তরূপ কাহিনী স্থানীয় লোকমুখে শুনা যায়। জগানন্দের দিঘির পার্শ্বেই "ঝিনুইর পুষ্করিণী" নামে আর একটি দীর্ঘিকা সরমহলের সেনবংশের স্বত্বাধীনে আছে। সম্ভবত সরোবরের আধিক্য বশতই এই অঞ্চল "সরমহল" নামে অভিহিত হইয়াছে। সরমহলের সেনবংশ এই পরগনার প্রসিদ্ধ তালুকদার। এই বংশের আদিপুরুষ মদনগোপাল সেন,[৫৫] মহারাজ রাজবল্লভের নিকট সরমহল তালুক প্রাপ্ত হইয়া নলচিড়া হইতে এস্থানে আগমন করেন।

দয়াল চৌধুরির মৃত্যুর পর জয়োন্মত্ত আগা বাখর খাঁর ভীষণ পাপস্রোত অবাধে বর্ধিত হইতে লাগিল। দয়ালের ন্যায় শক্তিশালী বীরপুরুষের লোমহর্ষণকর পরিণাম ভাবিয়া নিরুপায় অধিবাসীগণ নিঃশব্দে এই পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। আগা বাখরের ন্যায় ক্ষমতাশালী দুর্দান্ত রাজপুরুষের বিরুদ্ধে, মুর্শিদাবাদ নবাব-নাজিমের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করা, তাহাদের মত দুর্বল দরিদ্রের একেবারেই সাধ্যাতীত ছিল। কেবলমাত্র তাহারা গলদশ্রুলোচনে সর্বসুখদুঃখনিয়ন্তা জগদীশ্বর সমীপে তাহাদের কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

আর্তের করুণ ক্রন্দন করুণাময়ের শ্রীচরণে পৌঁছিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই দুরাত্মা আগা বাখরের পাপজীবনের যবনিকা পতন হইল। অত্যাচার-পীড়িত জীবন্মৃত অধিবাসীগণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

আগা বাখরের শাসনাধীনে এই পরগনা তৎকর্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত হয়। নিমকমহাল নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া তিনি অন্য মহালের শাসনভাব তৎপুত্র আগা সাদকের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। পিতাপুত্র কেহই এক কপর্দকও মুর্শিদাবাদে অথবা ঢাকায় প্রেরণ করেন নাই; সুতরাং ধৃত হইয়া রাজধানীতে নীত হইলেন। পরে তাঁহাদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

আগা বাখর এবং তৎপুত্র আগা সাদক নিহত হইলে, তাঁহাদের অধিকৃত ভূসম্পত্তি সমস্তই মহারাজ রাজবল্লভের হস্তগত হয়। রাজবল্লভ এই দেশবাসী না হইলেও, আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সেই সময়ে তাঁহার সহিত অস্মদ্দেশের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; সুতরাং তাঁহার সংক্ষিপ্তজীবনী যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিব।[৫৬]

কোন সালে যে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারি নাই। তবে রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি নবাব আলিবর্দী খাঁর সমকালীন হইলেও বয়ঃকনিষ্ঠ; কারণ আলিবর্দি খাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা নিবাইস মহম্মদ যখন ঢাকার সুবেদার ছিলেন, রাজা রাজবল্লভও সেই সময়ে তদাধীনে নায়েব ছিলেন। এই হিসাবে ধরিতে গেলে রাজবল্লভের জন্মকাল ১৭০৭ থেকে ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে অনুমান করা যাইতে পারে।

রাজবল্লভের পিতার নাম কৃষ্ণজীবন মজুমদার, ইনি ধন্বন্তরীগোত্রীয় বৈদ্যবংশসম্ভূত; বিক্রমপুর পরগনায় ইহার পৈতৃক বাসস্থান। কৃষ্ণজীবনের চারি পুত্র; রাজবল্লভ পিতার তৃতীয় সন্তান। কৃষ্ণজীবনের যৎকিঞ্চিৎ নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্বসময়ে রাজবল্লভ রাজকীয় কার্যে উন্নতির

শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়েই তিনি রাজসম্মানসূচক মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন তিনি মহারাজা রাজবল্লভ ছৌলজঙ্গ বাহাদুর নামে সর্বত্র সম্মানিত হইয়াছিলেন।

ঢাকার কার্য আরম্ভ করিয়া মহারাজ রাজবল্লভ, স্বজাতির উন্নতিকল্পে বিস্তর চেষ্টা এবং প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কার্যের মধ্যে বৈদ্যসন্তানগণের, পুনঃ বৈদিক-সংস্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাঢ়বাসী বৈদ্যগণ যে প্রকার রীতিমত বৈদিক আচরণ করিয়া আসিতেছেন, পূর্ববঙ্গ বাসী বৈদ্যসন্তানগণ, এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন হইতেই সেই সংস্কারবিহীন হইয়াছিলেন।[৫৭] রাজা রাজবল্লভ, ইহার উদ্ধাবকল্পে কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মিথিলা, কনৌজ, নবদ্বীপ, বাকলা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী আনয়নপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্বের এই দেশস্থ বৈদ্যসন্তানগণ শূদ্রাচারী ছিলেন, এবং শূদ্রবৎ একমাস অশৌচাদি পালন করিতেন; দেবার্চনা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াও তদ্রূপ নির্বাহ হইত। এই সমস্ত কার্যোদ্ধারে রাজা রাজবল্লভের বিশেষ শ্রম এবং অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, রাঢ়দেশবাসী সাধকপ্রবর মহাপুরুষ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, এই কার্য নির্বাহার্থ রাজবল্লভকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আলিবর্দী খাঁর স্বর্গারোহণের পর হইতেই রাজবল্লভের ভাগ্যাকাশ নিবিড় জলদাবৃত হইল। সিরাজদ্দৌল্লা, তাঁহাকে বিষনয়নে দেখিতেন, এবং নির্যাতনমানসে নানা উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, সিরাজদ্দৌলার মাতৃস্বসা—নিবাইস মহম্মদের পত্নী, ঘসেটি বেগমের সহিত রাজবল্লভের অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে সিরাজদ্দৌলা বিশেষ সন্দিহান ছিলেন।[৫৮] ক্রমে এই সন্দেহ সিরাজের হৃদয়ে এতদূর বদ্ধমূল হইল যে, তিনি ইহা সত্য বলিয়াই ধারণা করিলেন। বাজবল্লভ নূতন নবাবের মনোভাব পূর্ব হইতেই জানিতেন, সুতরাং তিনি সর্বদাই অন্তরালে থাকিতেন। এই জনপ্রবাদ সত্য কি না তাহা জানা দুরূহ; তবে কোন কোন ঐতিহাসিক ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া, রাজবল্লভের ক্ষমতা ও ধনহরণই সিরাজের মুখ্য উদ্দেশ্য, এইরূপ লিখিয়াছেন। সে যাহা হউক রাজবল্লভকে নির্যাতন করাই তখন সিরাজদ্দৌলার প্রধান কর্ম। রাজনগরে রাজদূত আসিলে, রাজবল্লভ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া তদীয় মধ্যমপুত্র কৃষ্ণদাসকে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণদাস, বহুমূল্য রত্ন, বহুলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি সঙ্গে লইলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট না যাইয়া কলিকাতায় ইংরাজের শরণাপন্ন হ'ন। নবাব, কৃষ্ণদাসকে পাঠাইবার জন্য ইংরাজ অধ্যক্ষকে পত্র লিখিলেন; কিন্তু ইংরাজগণ, শরণাগতকে রক্ষা করা পরম ধর্ম বলিয়া কৃষ্ণদাসকে পরিত্যাগ করিলেন না। এই অবমাননার প্রতিশোধার্থ সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের নিকট তাহা অবিদিত নাই। এই সময় হইতেই পলাশীর যুদ্ধের সূচনা। ব্রিটিশ গৌরব-রবির উদয়োন্মুখ ঊষার স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় কিরণে তখন বঙ্গাকাশ ঈষৎ উদ্ভাসিত। ভাগ্য-বিধাতা, তখন অলক্ষিতরূপে ইংরাজ-রাজলক্ষ্মীর করকমলে, উৎপীড়িতা কঙ্কালাবশিষ্টা ভারতমাতাকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণের মধ্যে রাজবল্লভ অন্যতম; কিন্তু তিনি প্রচ্ছন্নভাবে কার্য করিতেন। সিরাজের শোচনীয় অধঃপতন এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাজবল্লভকে, বিশেষ কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। মীরজাফরের পর যখন মীরকাসিম আলি খাঁ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কোন কোন রাজনৈতিক কার্যে রাজবল্লভের নাম আছে। তিনি কখন বা ঢাকা, কখন বা মুঙ্গের, আবার কোন কোন সময়ে মুর্শিদাবাদে রাজকার্যে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নবাব মীরকাসিম, সিরাজের বিরুদ্ধ-ষড়যন্ত্রকারীগণকে সর্বদা সন্দেহ-চক্ষে দেখিতেন; বিশেষত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ প্রভৃতিকে তিনি ইংরাজের লোক বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহারা কেহই নিরাপদ ছিলেন না। মীরকাসিম সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণকে সর্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন, এমন কি, অনেকেই এক প্রকার 'নজরবন্দি'র মত ছিলেন। ইংরাজের সহিত কাটোয়াযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মীরকাসিমের এক দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হইল; তিনি মুঙ্গের দুর্গে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথমত বন্দি ইংরাজগণকে হত্যা করিলেন,

পরে রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়, রামনারায়ণ, রায়দুর্লভ প্রভৃতিকেও নিহত করিলেন। রাজবল্লভ প্রভৃতির মৃত্যু বড় শোচনীয়; তাঁহাদিগকে বালুকাপরিপূর্ণ এক বৃহৎ থলিয়ার ভিতর পুরিয়া মুঙ্গের দুর্গ-প্রাকার হইতে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।[৫৯] ১৭৬৩ খ্রিঃ অব্দে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

রাজবল্লভের বিষয় যতটুকু জানা যায়, তাহাতে তিনি যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইলেই পাপ এবং পুণ্যের ভাগী হইতে হয়। রাজবল্লভও মনুষ্য, সুতরাং তিনিও সেই নিয়মের অধীন। তবে যে তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের সর্বনাশ করিয়াছেন, এরূপ কোন উল্লেখ পাই নাই। নিবাইস মহম্মদ খাঁ, রাজবল্লভকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, এবং প্রায় সমস্ত কার্যেই তাঁহাকে নিয়োজিত করিতেন; সম্ভবত দুষ্ট লোকে ঈর্ষাবশত নিবাইস মহম্মদের পত্নী খসেটি বেগমের সহিত রাজবল্লভের অবৈধ প্রণয়কলঙ্ক রটনা করিয়া থাকিবে।

রাজা রাজবল্লভ মৃত্যুর পূর্বে, রাজনগর এবং বোজরগ উমেদপুরের জমিদারি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, স্থাপিত বিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণ এবং দুর্গা এই দুই নামে দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করেন।[৬০] তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এই দেবোত্তরের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। এখনও অনেক পুরাতন দলিল-পত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

রাজা রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ সমাজে পুনঃপ্রচলন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার নবম কি দশমবর্ষীয়া একটি কন্যা, বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিধবা হয়। বালিকা-কন্যার এই অবস্থা দর্শন করিয়া রাজবল্লভ বড়ই ব্যথিত হইলেন। কিন্তু সমাজচ্যুতির ভয়ে কোন বৈদ্য-সন্তান তদীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন রাজবল্লভ, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত কিনা, তাহার ব্যবস্থা জানিবার জন্য স্বয়ং নবদ্বীপ গমন করিলেন।

রাজার আগমনবার্তা পাইয়া নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী, তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা কেন যে স্বয়ং নবদ্বীপ আগমন করিয়াছেন, অধ্যাপকগণ তাহা জানিতে পারিয়া বিষম বিপদে পড়িলেন। বিধবা-বিবাহ স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত, সুতরাং ব্যবস্থা চাহিলে পণ্ডিতগণের বাধ্য হইয়া ব্যবস্থা দিতে হয়, অথচ বিধবা-বিবাহ প্রথা বহুকাল হইতে সমাজবর্জিত। পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া পরামর্শপূর্বক এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

অপরাহ্নে অধ্যাপকগণ ও গ্রামস্থ অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলী, রাজার আহারের জন্য নানা প্রকার ভোজ্যবস্তু উপঢৌকন লইয়া রাজবল্লভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নানাপ্রকার শিষ্টালাপের পর পণ্ডিতগণ, তাঁহাদের আনীত আহার্যসামগ্রী রাজসমীপে আনয়ন করিলেন। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে একটি গো-শিশু ছিল। রাজা আহার্যসামগ্রীর মধ্যে গো-শাবক দর্শন করিয়া বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক পণ্ডিত বলিলেন যে, উহা মহারাজের আহারার্থ আনীত হইয়াছে।

রাজবল্লভ যেমন বিস্মিত তদ্রূপ চমকিত হইলেন। ক্ষণকাল চিন্তাকরতঃ পণ্ডিতবর্গের কৌশল বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আমি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলাম তাহা সিদ্ধ না হইলেও আমি আপনাদের নিকট যথেষ্ট উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম। জানিতাম যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও বহুকাল হইতে সমাজে রহিত হইয়াছে, কিন্তু বালিকা-কন্যার বৈধব্য-দর্শনে শোকে অধীর হইয়া, তাহাকে পুনরায় পাত্রস্থ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলাম। আপনারা মুখে কিছু না বলিয়া, আমার আহারার্থ গো-বৎস আনিয়াই যথার্থ উত্তর প্রদান করিয়াছেন।"

সমাগত পণ্ডিতদিগের মধ্যে জনৈক প্রাচীন বলিলেন, "মহারাজের আগমন উদ্দেশ্য পূর্বেই জানিতে পারিয়া আমরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। বিধবা-বিবাহ যেমন শাস্ত্রসঙ্গত, গো-ভক্ষণও তদ্রূপ অশাস্ত্রীয় নহে। কিন্তু বর্তমান সময়ে গোমাংস ভক্ষণ করা দূরে থাক, হিন্দুমাত্রই

এই কথা শ্রবণ করিলে হস্ত দ্বারা কর্ণাচ্ছাদন পূর্বক সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। যুগভেদে ধর্ম এবং তদনুসারে সমাজ গঠিত হইয়াছে। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রে উল্লেখ থাকিলেও বহুকাল হইতে সমাজ কর্তৃক তাহা রহিত হইয়াছে। পরন্তু উহা রহিত হওয়ায় সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। মহারাজ স্বয়ং অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ এবং মহাবিচক্ষণ, আপনাকে আমরা আর কত বুঝাইব?"

রাজা ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ, বস্ত্র এবং দীন দরিদ্রগণকে নানা প্রকার দান করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রাজা রাজবল্লভের কোন কোন কীর্তির শেষ চিহ্ন এখনও এদেশে দৃষ্ট হয়। নলছিটি বন্দরে তাঁহার স্থাপিত পাষাণময়ী এক তারামূর্তি অদ্যাপি বর্তমান আছে। প্রতিমাখানি খর্বাকৃতি এবং কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত; দেখিলে প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য পালবাবুগণ এই দেবী প্রতিমার বর্তমান স্বত্বাধিকারী। ঝালকাঠির নিকট সুতালড়ি গ্রামে রাজার কাছারি বাড়ির কতক কতক চিহ্ন আছে। জলাশয়টি প্রায় সম্পূর্ণ সমভূমি হইয়াছে, ইষ্টকালয়ের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, গোলাবাড়ি বোজরগ উমেদপুরের রাজধানী স্বরূপ ছিল। এই স্থানে ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে অনেক ধনাঢ্য বণিক বাস করিত। কতিপয় ইউরোপীয় বণিকও এই স্থানে নানাবিধ ব্যবসা করিত; তাহাদিগকে কুঠিয়াল বলিত। মিঃ বেভারিজ্ এই সমস্ত ইংরাজ বণিকের যে প্রকার অমানুষিক অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বড় ভয়ানক। কুঠিয়ালগণ স্থানীয় প্রজাবর্গকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া সুন্দরবনে অথবা লবণের খালে কাজ করিতে দিত; তাহাদের প্রায়ই পারিশ্রমিক দিত না, কখনও বা অর্ধাংশ প্রদান করিত। জমিদারের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া, অথবা কোন প্রকার পাট্টা গ্রহণ না করিয়া লবণের "তাফাল" প্রস্তুত করিত। কর চাহিলে দেওয়া দূরে থা'ক, স্থানীয় নায়েব ও তদনুচর প্রভৃতির উপর যথেষ্ট পীড়ন হইত। কোন কোন কুঠিয়াল "আমাদের কুঠিতে চুরি হইয়াছে" বলিয়া ভাণ করতঃ জমিদারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করিত, টাকা না দিলে পেয়াদা পাঠাইয়া অত্যাচার করিত; এবং প্রত্যেক পেয়াদার দৈনিক খরচ বাবদ তলবানা আদায় করিয়া লইত। জমিদারের খাজনা না দিয়া, প্রজারা কুঠিতে আশ্রয় লইলে, কুঠিয়ালগণ তাহাদের ছাড়িয়া দিত না, সুতরাং খাজনা আদায়ের ব্যাঘাত হইত। কুঠিয়ালের মধ্যে ডবিন নামক জনৈক ইংরাজের অত্যাচার অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। এই পিশাচের পাশবিক অত্যাচারে স্থানীয় কুলললনাগণ দেবদুর্লভ সতীত্বরত্ন হইতে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন। এই জন্য অনেক প্রজা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, সুতরাং জমিদারের রাজস্ব অনেক পরিমাণে বাকি পড়িল।

মিঃ বেভারিজ্ সরকারি কাগজ হইতে, জমিদারগণের প্রদত্ত একখানি দরখাস্তে উল্লিখিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[৬১] আমরা তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"By reason of the oppressions of the factories of the Company and many other English traders, all the inhabitants fled: the people of the factories take from the merchants what they please at half price; cut down bamboos and trees belonging to the inhabitants, and take them away by force; if any one complain they punish him for it. They press the inhabitants, and carry them in the woods of Sundarban, paying them only half their wages. They take possession of land in the Sundarban and make *tafalls* of salt for which they pay no rent. They seize the salt of the tafalls of the pargana and of the inhabitants. They force the inhabitants to take tobacco, salt, and other articles, and refuse to pay the legal duties on the trade which they carry on. If we demand a sight of the Company's *dustak*, they beat us with bamboos. Some of them pretend that they have been robbed and insist on our making restitution, placing peons upon us, and putting us to a good expense. They judge causes, impose and exact fines. They send peons and seize the Naib of the pargana, taking for *talabana* (peons' fees) one rupee every

day. They grant guards to many of the taluqdars and mahajuns in the country, by which means we are prevented from collecting the King's revenues; and many inhabitants take shelter in the factories, and thereby avoid paying the rents. There is little chunam made within the distance of four days journey from hence, the whole quantity made within the pargana not exceeding 2000 maunds. Notwithstanding, Mr. Dobins has established two factories within my pargana, committing every species of injury and oppression, and violating the women of the inhabitants, and erecting factories in places where none ever were before, drives away the inhabitants, and upon the information of many poeple he takes upon him to recover debts of five and ten years standing."

রাজা রাজবল্লভের সাত পুত্র,"[৬২] সকলেই কৃতিমান; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র রাজোপাধি ধারণ করিতেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস, নবাব কর্তৃক 'রাইরাইয়া জঙ্গবাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজবল্লভের মৃত্যুর পর তদীয় বংশধরগণের মধ্যে ভয়ানক অর্ন্তবিপ্লব উপস্থিত হইল। এই গৃহবিবাদই তাঁহাদের সর্বনাশের মূল।

রাজবল্লভের মৃত্যুর সময়ে তাঁহার সাতপুত্র মধ্যে কেহ জীবিত ছিলেন কিনা, ইহা লইয়া কতক মতদ্বৈধ দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ মুতক্ষরীনপ্রণেতা গোলাম হোসেন খাঁ বলেন যে, মীরকাসিম, রাজবল্লভকে তাঁহার সাতপুত্রসহ একই সময়ে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।[৬৩] কিন্তু মিঃ বেভারিজ্ বলেন যে একমাত্র কৃষ্ণদাস, পিতার সঙ্গে নিহত হইয়াছিলেন।[৬৪] রায় গোপালকৃষ্ণের পুত্র পীতাম্বর সেন, বিগত ১৭৯৮ খ্রিঃ অব্দে জুন মাসে মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের নিকট, দুঃখকাহিনীপূর্ণ এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন। সেই দরখাস্তে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি রাজবল্লভের বংশধর; কোম্পানি বাহাদুরের হিতকামনা এবং সাহায্য করার জন্য রাজবল্লভকে এবং তৎপুত্র কৃষ্ণদাসকে নবাব মীরকাসিম গঙ্গায় ডুবাইয়া বধ করিয়াছিলেন, তৎপর আগা রেজা নামক জনৈক কর্মচারী পাঠাইয়া তাঁহার (রাজবল্লভের) সম্পত্তি প্রভৃতি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। আমরা সেই দরখাস্তের ইংরাজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

"In a petition of Pitambar Sen, Dated June 1798, he says "We are the descendants of Maharajah Raj Ballab, who was a wellwisher of the Company, in consequence of which Kassim Ally Khan drowned him and his son Kisse Das Bahadur in the Ganges, and having deputed Aka Reza, confiscated to the State his house and Property."[৬৫]

নবাব মীরকাসিম যখন এই সকল অমানুষিক হত্যাকাণ্ড সংসাধিত করেন, তখন গোলাম হোসেন খাঁ মুঙ্গেরে ছিলেন না। এই সকল ঘটনা তিনি শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে রাজবল্লভ যেমন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তৎপুত্র কৃষ্ণদাসও তদ্রূপ ছিলেন; অধিকন্তু কৃষ্ণদাসই সকল অনর্থের মূল; সুতরাং কেবলমাত্র তাঁহারই, তদীয় পিতার সহিত নিহত হওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মিঃ বেভারিজ্ যে দরখাস্তের অনুবলে লিখিয়াছেন, সেই দরখাস্ত রাজবল্লভেরই পৌত্র কর্তৃক লিখিত। পিতামহের কথা পৌত্রেরই অধিক জানিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আমরাও উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের শোচনীয় পরিণামের পর তাঁহাদের সম্পত্তি রায় গোপালকৃষ্ণের কর্তৃত্বাধীন হয়। কিন্তু তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, ১১৯৪ বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর এই বিপুল সম্পত্তির কেহ অধিনায়ক রহিলেন না। গোপালকৃষ্ণের পুত্র ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে এই সমস্ত সম্পত্তির কর্তৃত্ব লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। কেহ কাহারও অধীনে না থাকিয়া, সকলেই স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। যাহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি তাহা পরিচালনা করিয়া জমিদারি হইতে নিজ নিজ দখলে পৃথক পৃথক তালুক করিতে লাগিলেন। সর্বনাশ উপস্থিত হইলে যেমন বিচক্ষণ বুদ্ধিমানেরও

মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, ইহাদের তাহা ঘটিল। তখন প্রপীড়িত অংশীদারগণ কোম্পানি বাহাদুরের নিকট অংশানুসারে জমিদারির বণ্টন প্রার্থনা করিলেন।

বহু গোলযোগ ও অনেক মোকদ্দমার পর ঢাকার সহকারি কালেক্টর (Assistant Collector) মিঃ টম্‌স্‌ন বহু শ্রম ও আয়াসে বণ্টনকার্য নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই জমিদারগণ এক দরখাস্ত দাখিল করেন যে টমসন সাহেব জমা পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়াইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা রাজকর দিতে অশক্ত। বিশেষত ঝড়বৃষ্টি এবং জলপ্লাবনে প্রচুর শস্যহানি হইয়াছে, সুতরাং কোনমতেই ধার্য কর আদায় করিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সেই বৎসর জলপ্লাবন প্রভৃতিতে শস্যের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল তদপেক্ষা জমিদারি বিভাগের পূর্বে রাজবল্লভের বংশধরগণ কর্তৃক শস্যশালিনী জমিগুলি স্বীয় স্বীয় তালুকভুক্ত হওয়ায় বেশি ক্ষতি হইয়াছিল। রায় গোপালকৃষ্ণের কর্তৃত্বাধীনে ইহার প্রথম সূচনা হয়। তৎকালে বোজরগ উমেদপুর পরগনার অধিকাংশস্থল সুন্দরবন ছিল; তাহাকে জঙ্গলবাড়ি তালুক বলিত। এই তালুকের কোন কর ছিল না বলিয়া গোপালকৃষ্ণ জমিদারির লাভজনক অংশসমূহ অতি গোপনে এই তালুকের অন্তর্ভুক্ত করেন।

টম্‌স্‌ন সাহেব জমিদারি বিভাগ সময়ে ইহা জানিতে পারেন নাই, এখন অনুসন্ধান দ্বারা প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া বড় অপ্রতিভ হইলেন। বাস্তবিক জমিদারির সদর খাজনা ঠিকই ছিল, কিন্তু শালিনী ভূমি প্রায় সমস্তই উল্লিখিত জঙ্গলবাড়ি তালুক এবং পক্ষগণের স্বীয় স্বীয় তালুকের অন্তর্গত ছিল। টমসন সাহেব বিষম গোলে পড়িলেন। এই সমস্ত গোলযোগ মীমাংসা করিয়া পুনরায় বণ্টন করা এক প্রকার অসম্ভব হইল।

বোজরগ উমেদপুর শীঘ্রই বাকি করের দায়ে নিলামে উঠিল। ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মেসি সাহেব (Mr. Massie) এই জমিদারি নিলামে উঠাইলে কোন ক্রেতাই অগ্রসর হইল না। এই প্রকার প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া তিন দিন যাবৎ নিলাম ডাকাডাকি হইল। কেহই খরিদ করিতে আসিল না দেখিয়া ১৭৯৯ খ্রিঃ অব্দে অধীনস্থ তালুকগুলিও নিলাম করাইলেন। এই তালুকগুলিব তৎকালীন সংখ্যা ৫৪৯।

গভর্নমেন্ট প্রথমত এই তালুকগুলির রাজস্ব, খাসে আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে যেমন বিস্তর অর্থব্যয় তদ্রূপ অন্যপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইল। তখন এই সমস্ত তালুক পৃথক করিয়া পৃথক নম্বরে তৌজীভুক্ত করা হইল; ইহাই বোজরগ উমেদপুরের খারিজা তালুক। এই খারিজা তালুকগুলিই বিশেষ লাভজনক, কারণ ইহার অধিকাংশ ভূমিই শস্যশালিনী। এই তালুকগুলির মধ্যে আয়লা, ফুলঝুরি, বুড়ামজুমদার, বামনা, পাদ্রিশিবপুর এবং শ্রীরামপুর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাদ্রিশিবপুর সম্বন্ধে একটু প্রাচীন ইতিহাস আছে। রাজবল্লভের সময়ে এই পরগনার কতক প্রজা বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করে। এই প্রজারা যেরূপ ধনাঢ্য তদ্রূপ দুর্ধর্ষ। মহারাজা রাজবল্লভ অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। তখন জাতিনাশের ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য কয়েকজন পর্তুগিজ আনয়ন করেন। এই খ্রিষ্টানগণ রাজাজ্ঞাক্রমে বিদ্রোহী প্রজাদের বাটির পার্শ্বে স্বীয় স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাদের ধর্মকার্য নির্বাহার্থ একজন যাজক আনাইলেন। ধর্মযাজকের গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহের জন্য ইহারা রাজার নিকট কতক ভূমি প্রার্থনা করিলেন। রাজবল্লভ প্রার্থনানুসারে কতক ভূমি হাওলা স্বরূপ প্রদান করেন। রাজবল্লভের মৃত্যুর পর ১৭৬৪ খ্রিঃ অব্দে তদীয় অন্যতম পুত্র গোপালকৃষ্ণ এই হাওলা এবং তৎসংলগ্ন আরও অনেক ভূমি তালুকস্বরূপ পাট্টা প্রদান করেন। পেদ্রু গণসেলভ্ (Pedro Gonsalvis) নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম তথাকার গির্জা নির্মাণ করেন। পাট্টা গ্রহণের পূর্বে খ্রিষ্টানদের মধ্যে পরস্পরের মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে [illegible] রেফেল ডেস্ এঞ্জুস (Fray Raphail Das Anjos) নামক ধর্মযাজক নামে পাট্টা গৃহীত হয়, ইনিই, সর্বপ্রথম ধর্মযাজক নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

বর্তমান ডিসিল্‌ভা সাহেবগণের পূর্বপুরুষ ডোমিঙ্গে ডিসিল্‌ভা যে প্রকার ধর্মপ্রাণ পুরুষ ছিলেন, তদ্রূপ বৈষয়িক কার্যেও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শিবপুরস্থিত সাহেবদিগের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর উদয় হইল।

বোজরগ উমেদপুরের ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূমধ্যধিকারীর সংখ্যা অনেক; তন্মধ্যে ঢাকার ও সায়েস্তাবাদের নবাব, জলায়ের চন্দ্রকান্ত বাবু, রহমৎপুরের বরদাপ্রসন্ন ও সারদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী প্রভৃতি বামনার আফ্‌সারউদ্দিন চৌধুরি, বরিশালস্থ মিঃ এডওয়ার্ড ব্রাউন, গ্রন্থকার ও তদীয় ভ্রাতৃগণ, শিবপুরের ডিসিল্‌ভাগণ এবং খিদিরপুরের রাজাবাহাদুর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পরগনার মোট ৩০০৪৪৵।৶৹৪ পাই মাত্র।

৪। সেলিমাবাদ

যৎকালে চন্দ্রদ্বীপ ধনধান্যপূর্ণ বিশাল জনপদ, তৎকালে তাহার পশ্চিমদিকে তত্তুল্য আর একটি বিশাল ভূখণ্ড জলা অবস্থায় পতিত ছিল ; ইহাই সেলিমাবাদ। কেহ কেহ বলেন, যে চন্দ্রদ্বীপ হইতেই সেলিমাবাদ বাহির হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে, চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলে প্রকাশ যে, সেলিমাবাদ চন্দ্রদ্বীপ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সংশ্রব রহিত।[৬৬]

এই পরগনার অধিকাংশস্থল, একদা উত্তাল তরঙ্গময়ী সুগন্ধার গর্ভে বিলীন ছিল। নৈসর্গিক কারণে, ইহা ক্রমশ উত্থিত হইয়া কালে মৃত্তিকাকারে পরিণত হইয়াছে। তাই ইহার অধিকাংশ স্থান "সোন্ধার কূল" বলিয়া বিখ্যাত।

আমরা সুগন্ধার অবস্থিতি লইয়া একটু গোলে পড়িয়াছি। এই নদী পূর্বে যে, অতীব বিস্তীর্ণা এবং বেগবতী ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। অতি পুরাকালে, অস্মদ্দেশে একমাত্র সুগন্ধা ব্যতীত অন্য কোন নদ-নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সুগন্ধা পতিতপাবনী জাহ্নবীর শাখানদী এবং সর্বপাপ বিনাশিনী। পীঠমালা এবং কালিকা পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এই সুগন্ধার উল্লেখ স্পষ্টই আছে।।[৬৭]

কিন্তু এই সুগন্ধার কোন অস্তিত্ব এখন পাওয়া যায় না। তবে এই সেলিমাবাদ পরগনার মধ্যে যতগুলি নদীর চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে কেহ কেহ বর্তমান ঝালকাঠির প্রান্তবাহী নদীকে সুগন্ধা বলিয়া নির্দেশ করেন। বাস্তবিক ইহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

এই নদীর বিস্তৃতি সম্বন্ধে সর্বজনসম্মত এক জনপ্রবাদ আছে। পোনাবালিয়া গ্রামের সন্নিহিত শ্যামরাইলের শিবলিঙ্গ এবং শিকারপুরের উগ্রতারা দেবী এই নদীর উভয় তটে স্থাপিত। ইহার মধ্য দিয়া বেগবতী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা ছিল। 'গুপ্তপ্রেস' পঞ্জিকা-প্রণেতা কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে সুগন্ধাকে গঙ্গার শাখা এবং বর্তমান পোনাবালিয়ার সন্নিহিত প্রবাহিনীই বলিয়াছেন।।[৬৮]

চন্দ্রদ্বীপ পরগনা হইতে সেলিমাবাদ যে আধুনিক তাহার আর সন্দেহ নাই। খ্রিষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দের পূর্বভাগে ইহা জনসমূহের বসতিরূপে পরিণত হয় ; ইঁহার পূর্বে কোন কোন স্থান বিল, এবং সুন্দরবনে পরিণত ছিল।

যখন যুবরাজ সেলিম বিদ্রোহী হইয়া অস্মদ্দেশে আগমন করেন, তাঁহারই আদেশানুসারে তদীয় অনুচরবর্গ কর্তৃক এই পরগনার অধিকাংশ স্থল আবাদ হয়। তাই তাঁহারই নামানুসারে এই ভূভাগের নামকরণ হইয়াছিল। ঐতিহাসিক প্রবর আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে সেলিমাবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এই পরগনা উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রিঃ অব্দের[৬৯] পরে গঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ১৬০৫ খ্রিঃ অব্দে যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গির নামধারণপূর্বক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেলিমাবাদ তাঁহার যৌবরাজ্যের সময়ে তাঁহারই পূর্ব নামানুসারে গঠিত হইয়াছে, অতএব ১৬০৩-১৬০৫ খ্রিঃ অব্দ সেলিমাবাদের সৃষ্টিকাল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, পূর্বে এই পরগনা সুলইমানাবাদ নামে অভিহিত হইত। সুলইমান নামক জনৈক রাজপুরুষ পূর্বেই এই স্থান আবাদ করাইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ নামের পরিবর্তে ভাবী সম্রাটের সন্তোষার্থে তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম রাখিয়াছিলেন।

সুলইমান নামক কোন রাজপুরুষ মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন কিনা তাহা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আগা সুলইমান নামক একজনের কথা, সিয়ার-অল-মুতক্ষরীণে আছে, কিন্তু তিনি সম্রাট মহম্মদ শাহের উজির ছিলেন। আকবরের সময়েও সুলইমান নামক এক রাজপুরুষের উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি উড়িষ্যাপ্রদেশের একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন। মোগল রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশের রাজকার্য অথবা যুদ্ধবিগ্রহাদিতে আমরা সুলইমান নামক কাহাকেও দেখিতে পাই না।[৭০] ব্লকম্যান সাহেব কোথা হইতে এই সুলইমানকে উপস্থিত করিলেন তাহা বুঝিতে পারি না। সুলইমানাবাদ বলিয়া এই পরগনার উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং সেলিম কর্তৃক এই স্থান আবাদ হওয়াই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। এই পরগনার বিস্তৃতি বড় কম নহে। পূর্বে চন্দ্রদ্বীপ, পশ্চিমে খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট, উত্তরে বাঙ্গরোড়া এবং দক্ষিণে বোজরগ উমেদপুর। এই পরগনা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটি পরগনা বাহির হইয়াছে।

বাদশাহী আমলে এই পরগনার অনেক স্থলে লবণের জ্বাল ছিল, এবং তজ্জন্য রাজকোষে বিলক্ষণ অর্থাগম হইত। আইন-ই-আকবরিতে সরকার ফতিহাবাদ অন্তর্গত "হাসিল নিমক" বলিয়া একটি মহলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রাজস্ব বার্ষিক ২৭৭,৭৫৮ডাম, অর্থাৎ ৬৯৪৩ আনা ; ইহা হইতেই বোধহয় সেলিমাবাদের সৃষ্টি। সেলিমাবাদে যে পূর্বে লবণের জ্বাল ছিল এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ।[৭১] যাহারা পূর্বে লবণের জ্বাল দিত তাহাদের বংশধরগণ এখনও মলঙ্গী নামে অভিহিত। এই পরগনার অধিকাংশ স্থল যখন বসতিহীন অবস্থায় পতিত ছিল তখন কলিকাতার সন্নিহিত দেবগ্রাম (দিগঙ্গা) নিবাসী জনৈক কায়স্থ সন্তান এইস্থানে আগমন করেন। ইনিই বর্তমান রায়েরকাঠির রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ইহার নাম ও অভ্যুত্থানের সময় লইয়া বড় গোল দেখিতে পাওয়া যায়। বেভারিজ সাহেবের মতানুসারে ইঁহার নাম শত্রাজিত রায়। কিন্তু বর্তমান রায়েরকাঠীর রাজবংশের অন্যতম বংশধর রাজা অদ্বৈতনারায়ণ যে বংশতালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে শত্রাজিত শ্রীনাথ রায়ের চারি পুরুষ অধস্তন।

কথিত আছে, শ্রীনাথ রায় একটি দরিদ্র বালক ছিলেন। দারিদ্র্যের কঠোর নিপীড়নে উহার জননী একমাত্র শিশুপুত্র ক্রোড়ে লইয়া ভিখারিনীর ন্যায় গৃহ হইতে বাহির হইলেন। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এক ব্রাহ্মণের দাসীবৃত্তি স্বীকারপূর্বক জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথও ব্রাহ্মণের দৈনিক পূজার জন্য পুষ্প প্রভৃতি আহরণ করিয়া মধ্যাহ্নে গরু চরাইতে মাঠে গমন করিতেন। ব্রাহ্মণের অনেকগুলি গাভি ছিল। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ, দুগ্ধদোহন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য শ্রীনাথ নির্বাহ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার জননী সাহায্য করিতেন মাত্র।

একদিন শ্রীনাথ পরিশ্রমাতিশয্যে এবং প্রখর সূর্যোত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া নিকটবর্তী এক বটবৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইলেন। সূর্য ক্রমশ মধ্যাকাশ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, তথাপি বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। দেখিতে দেখিতে পশ্চিম গগনস্থ সূর্যকিরণ বৃক্ষকাণ্ড এবং স্বল্পাচ্ছাদিত পত্রাবলীর মধ্য দিয়া নিদ্রিত বালকের মুখোপরি পতিত হইল। নিকটে এক গর্ত ছিল, তথা হইতে এক বিষধর কৃষ্ণসর্প বহির্গত হইয়া ছত্রের ন্যায় স্বীয় ফণা বিস্তারপূর্বক প্রখর সূর্যকিরণ হইতে বালকের মুখে ছায়া প্রদান করিতেছিল। জনৈক ব্রাহ্মণ অনতিদূরে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া এই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া হউক, অথবা অন্য কোন কারণবশতই হউক, সর্প গর্তমধ্যে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ নিদ্রিত শ্রীনাথের নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন যে, বালক গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছে। প্রথম তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বালক সর্পদষ্ট হইয়া মৃতাবস্থায়

পড়িয়া আছে। কিন্তু তাহাকে অক্ষত শরীরে নিদ্রিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন। মনে ভাবিলেন, এই বালক সাধারণ মনুষ্য নহে, কালে নিশ্চয়ই একজন ভাগ্যবান পুরুষ হইবে। বালকের প্রশস্ত ললাট, আজানুলম্বিত বাহু এবং সুঠাম গৌরকান্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। তিনি ধীরে ধীরে নিকটে আগমন করিয়া বালকের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন এবং তাহ[illegible] নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসা ইত্যাদি সম্যক জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনাথও ধীর নম্রভাবে যথাযথ [illegible] প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, বালকের আকৃতি পুনরায় পর্যবেক্ষণ করিলেন এবং একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "তোমার অদৃষ্ট ভাল ; আমি ব্রাহ্মণ, তোমার নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।"

শ্রীনাথ বলিলেন, "ঠাকুর, আমার জননী ব্যতীত এজগতে আমার আর কেহ নাই। তিনি ঐ ব্রাহ্মণবাড়ি দাসীত্ব করিতেছেন, আমি ব্রাহ্মণের গো পালন করিয়া থাকি ; আমাদের ন্যায় দরিদ্র আপনাকে কি ভিক্ষা প্রদান করিবে? অনুগ্রহ পূর্বক যদি আমার সহিত জননীর নিকট গমন করেন, তাহা হইলে তিনি যে প্রকার আদেশ করিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাই শিরোধার্য করিব।"

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "তাহাই হউক, তোমার জননীর নিকট চল।"

এদিকে সন্ধ্যাও সমাগতা হইল, বালক শ্রীনাথ গাভিগুলি লইয়া ব্রাহ্মণের সহিত গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বাড়ি উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, শ্রীনাথের জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা, তোমার এই বালক সামান্য নহে। ইহার যে সকল সুলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে এই বালক নিশ্চয়ই অতুল ঐশ্বর্যশালী হইবে। আমি তোমার পুত্রের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু সে তোমার বিনা আদেশে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইতেছে না, তাই তোমার নিকটই আগমন করিয়াছি।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া শ্রীনাথের জননী যারপরনাই আশ্চর্যান্বিতা হইলেন। তিনি প্রথমে কোন উত্তরই প্রদান করিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন "ঠাকুর, আমাদের ন্যায় দীন দরিদ্র বোধ হয় আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। আমি ভদ্রবংশ-মহিলা, এই বালকও ভদ্রবংশ-জাত কায়স্থ সন্তান ; দুরদৃষ্ট বশত এখন এই অবস্থা। আমাদের এমন কি আছে যে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া কৃতার্থ হইব"?

ব্রাহ্মণ তখন শ্রীনাথের জননীর নিকট, সর্পের ফণা বিস্তার ও শ্রীনাথের সামুহিক লক্ষণগুলি বলিলেন। শ্রীনাথের জননী বিশেষ বুদ্ধিমতী ; স্থির মনে সকল শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ঠাকুর, আপনার আশীর্বাদে যদি ইহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, তবে আপনিই ইহার কুলপুরোহিত হইবেন, এবং এতদিন যাঁহার অন্নে শরীর ধারণ করিতেছি, এবং যিনি পিতার ন্যায় পালন করিতেছেন ভগবানের কৃপায় যদি কখনও সুদিন উপস্থিত হয়, তবে তিনিই বালককে দীক্ষা প্রদান করিবেন।"

শ্রীনাথের গর্ভধারিণীর এই প্রকার সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ, তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক উভয়কে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।।[৭২]

এই ঘটনার কতিপয় বৎসর পরে নবাব সদলে "সফরে" বহির্গত হইলেন। যে গ্রামে শ্রীনাথ বাস করিতেন সে স্থানে নবাবের তাঁবু পড়িল। একদিন দৈবাৎ শ্রীনাথ রায় নবাবের সম্মুখবর্তী হইলে, তাহার প্রতি নবাবের কেমন একটা স্নেহদৃষ্টি পড়িল। তাহাকে নিকটে আনয়ন করিয়া সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনাথ ধীর এবং বিনম্রভাবে তাঁহাকে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। স্নেহশীল নবাব তাহার বিনয় ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। জননীর বিনানুমতিতে শ্রীনাথ কোন উত্তর করিলেন না। নবাব তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া তাহাকে জননীর অনুমতি লইয়া আসিতে বলিলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীনাথ জননীর নিকট সকল কথা বলিলেন। সর্পফণা বিস্তারের ঘটনা

ও ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার অন্তরে সর্বদাই জাগরূক ছিল ; এখন নিজ তনয়ের প্রতি নবাবের হঠাৎ অনুগ্রহের সংবাদে ভারী শুভলক্ষণ বোধ করিলেন। তিনি পুত্রকে নবাবের সমভিব্যাহারে গমন করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে অনুমতি প্রদান করিলেন।

নবাব, মির মুন্সিকে ডাকিয়া বালককে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে আদেশ করিলেন। শ্রীনাথ ইতিপূর্বে অবকাশমত যৎসামান্য বাংলা লেখাপড়া অভ্যাস করিয়াছিলেন। মির মুন্সির অনুগ্রহে এবং অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে অতি অল্পকাল মধ্যেই পার্সি ভাষায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিলেন।

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে নবাব তাহাকে একটি কার্যে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীনাথ রাজাদেশে অতি অল্পকাল মধ্যেই সেই কার্যটি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন। নবাব পূর্বেই তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার এই প্রকার জটিল কার্যে কৃতকার্যতা লাভে তাঁহার স্নেহ শতগুণ বর্ধিত হইল। তিনি শ্রীনাথকে নিকটে আনয়ন করিয়া বলিলেন "শ্রীনাথ, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, পুরস্কার প্রার্থনা কর।" তখন মির মুন্সি নবাবকে বলিলেন, "জাঁহাপনা, শ্রীনাথের প্রতি হজুরের যথেষ্ট অনুগ্রহ হইয়াছে। সম্প্রতি সেলিমাবাদ নামক স্থান জঙ্গলাকীর্ণ এবং বিল অবস্থায় পতিত আছে। ইহা শ্রীনাথকে প্রদান করিলে বোধ হয়, ইহার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার হইতে পারে।"

নবাব তখনই সেইরূপ আজ্ঞা করিলেন, অচিরাৎ পাঞ্জাঙ্কিত পরওয়ানা প্রদান করিয়া নবাব পুনরায় শ্রীনাথকে বলিলেন, "যে ভূসম্পত্তি তোমাকে জমিদারি প্রদান করিলাম, বিবেচনা করিয়া চলিলে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে; যদি কখনও কোন বিপদে পতিত হও তখন আমার নিকট আসিও।"

জমিদারির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনাথ সানন্দচিত্তে জননীর নিকট আগমনপূর্বক মাতৃচরণে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। আহ্লাদে জননীর হৃদয় নাচিয়া উঠিল এবং আপনা আপনি চক্ষুদ্বয় হইতে হর্ষাশ্রু বাহিতে লাগিল। সর্পের ফণা বিস্তার এতদিনে সার্থক হইল, আজ সত্য সত্যই তাঁহারই শ্রীনাথ রাজ্যেশ্বর হইতে চলিল।

শ্রীনাথ এই দেশে আগমন করিয়া নবাব প্রদত্ত অর্থদ্বারা সুন্দরবন আবাদ করিলেন, এবং খাল কাটাইয়া জলাভূমির উর্বরতা সাধন করিতে লাগিলেন। তখন দলে দলে প্রজাগণ আসিয়া তথায় আবাস ভূমি স্থাপন করিতে লাগিল। শ্রীনাথের যত্নে অচিরাৎ এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য জনপরিপূর্ণ বিশাল ভূখণ্ডে পরিণত হইল।

উল্লিখিত বিবরণ কিম্বদন্তী মাত্র। সর্পের ফণা বিস্তার, ব্রাহ্মণ কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি কতকটা অনৈসর্গিক বোধ করিলে পাঠক তাহা ত্যাগ করিতে পারেন। আমরা রায়েরকাঠির রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

রায়েরকাঠিস্থ রাজবংশীয়গণ কিঙ্কর ভূঁঞার বংশধর। তিনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় সেন বংশোদ্ভব কায়স্থ ছিলেন। হুগলী জিলাস্থিত দিগঙ্গা গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। পরে জগদীশপুরে গড় নির্মাণ করতঃ তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি চন্দননগরের নিকট কিঙ্কর সেনের গড় বলিয়া একটি স্থান আছে।[৩] অনেকগুলি মহল তাঁহার শাসনাধীন ছিল। পূর্ববঙ্গে, — বনগাঁ, মধুদিয়া, হোগলা, সোন্দারকূল প্রভৃতি চতুর্দশী ভূখণ্ড তিনি ক্রমে হস্তগত করেন। এই সময় মহারাজ প্রতাপ আদিত্য বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চিরুলিয়া ভিন্ন অন্য ত্রয়োদশটি দখল করিয়া লইয়াছিলেন, কিঙ্কর ঐ সকল পরগনা পুনরায় হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেন না।

যুবরাজ শাহজাহান যখন এদেশে আগমন করিয়াছিলেন তখন কিঙ্কর ভূঁঞার পুত্র মদনমোহন এদেশজাত নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্যসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ পারস্য ভাষায় তাঁহার গুণ বর্ণনা করেন। শাহজাহান তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সেরেস্তাদারের কার্যে নিযুক্ত করিয়া "রায় রাইয়া" উপাধি ও খেলাৎ প্রদান করেন। কিছুকাল

পরে তিনি ফৌজদার ছবি খাঁর সহিত পূর্ববঙ্গের পরগনা সমূহের রাজস্ব আদায় এবং দস্যুদমনের জন্য কতিপয় সৈন্য এবং কামান সহ প্রেরিত হন। মদনমোহন পূর্ববঙ্গে আসিয়া জমিদারগণের নিকট বাকি রাজস্বের দাবি করিলেন, ফলে অনেক জমিদার জমিদারি ইস্তফা দিতে বাধ্য হ'ন। একমাত্র চন্দ্রদ্বীপ-রাজের সহিত বাকি রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া মদনমোহন বে-ওয়ারিসি পরগনা সকল খাসে আনয়ন করেন। অতঃপর নানাবিধ উপঢৌকনসহ তিনি জাহাঙ্গীরনগরে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আদায়ী রাজস্ব এবং হিসাবনিকাশ দাখিল করিলেন। নবাব তাঁহার কার্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মদনমোহন খাস পরগনাগুলির পাট্টা প্রার্থনা করেন। বাদশাহের অনুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া, নবাব তাঁহার প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। তদনুসারে মদনমোহন তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে সেলিমাবাদ প্রভৃতি পরগনার সনন্দ প্রাপ্ত হন।

১০২৫ সালে মদনমোহন যখন অস্মদ্দেশে আগমন করিতেছিলেন, তখন বিশখালি নদীতে দোলযাত্রার দিনে তিনি দক্ষিণচক্র নামক বিগ্রহ প্রাপ্ত হ'ন। সেই তারিখই তিনি মহাসমারোহে উক্ত বিগ্রহ নথুল্লাবাদ গ্রামে স্থাপিত করিয়াছিলেন। পরে ঠাকুরের সেবার জন্য ছয়শত বিঘা জমি দেবোত্তর প্রদান করিয়া সমাদ্দার উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণকে ইঁহার সেবাইত নিযুক্ত করেন। তাঁহার বংশধরগণ আজও উক্ত দেবোত্তর ভোগ করিয়া ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত আছেন।

মদনমোহনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীনাথ রায় জমিদারির বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। নবাবের কৃপায় তিনি আরও কয়েকটি পরগনা এবং ফরমানের সহিত রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা শ্রীনাথ ঐ সকল জমিদারি শাসনসংরক্ষণের জন্য নুৎফাবাদ (নথুল্লাবাদ) গ্রামে কাছারি বাড়ি নির্মাণ করিয়া অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করেন এবং সন্নিকটস্থ নদীতীরে একটি মৃন্ময় গড় প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীরাম নামক পুত্র রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

রাজা শ্রীরাম[১৩] বিশেষ দানশীল লোক ছিলেন। তাঁহার সময় এতদঞ্চলে মগের অত্যাচার আরম্ভ হয়। এই দুর্বৃত্তদিগের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণ বিশেষ প্রপীড়িত হইতে থাকে। তিনি এই দস্যুদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

শ্রীরামের পুত্র রাজা রুদ্রনারায়ণ বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল নুৎফাবাদে অবস্থান করেন। পরে স্বদেশ হইতে গমনাগমন বিশেষ কষ্টকর এবং সময় সাপেক্ষ বিবেচনা করিয়া চিরুলিয়া পরগনাস্থিত কোঁদাল গ্রামে বাড়ি প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিবেন এইরূপ মনস্ত করতঃ পরিবারবর্গকে আনিবার জন্য দিগঙ্গা রওনা হইলেন। একদিন রাত্রে রুদ্রনারায়ণ স্বপ্নে দেখিলেন যেন ভগবতী বিশ্বজননী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন যে বলেশ্বর নদের পূর্ব তীরবর্তী এক বিশাল ভূ-খণ্ড জঙ্গলাবস্থায় পড়িয়া আছে এবং ঐ অরণ্যানীর এক বৃক্ষমূলে জগদম্বার পাষাণময়ী দশভূজা মূর্তি প্রোথিত আছে। রুদ্রনারায়ণ স্বপ্নোদ্দিষ্ট স্থানে আগমন করিয়া দেবী প্রতিমা[১৪] উদ্ধার করিলেন। অচিরে এই বিশাল ভূ-খণ্ড বহুজনপূর্ণ লোকালয়ে পরিণত হইল এবং রুদ্রনারায়ণ রায় তথায় রায়েরকাঠি নামক রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রাজা রুদ্রনারায়ণের কুল-পুরোহিত রূপরাম চক্রবর্তীর নামে ঐ মূর্তি স্থাপিত করেন। এই কার্য ১৬০৫ সনে বৈশাখ মাসে সম্পূর্ণ হয়।[১৫] পাঁচটি নরমুণ্ড দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া উক্ত বেদিকে পঞ্চমূর্তি অথবা রত্নবেদি বলে। এই বেদিকা প্রস্তুত সম্বন্ধে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, রাজা রুদ্রনারায়ণ পাঁচ জন চণ্ডালকে ধন রত্ন দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাদের মস্তক ক্রয় করেন। ক্রমে এই কথা রাষ্ট্র হওয়ায় চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রোষপরবশ হইয়া রুদ্রনারায়ণের নামে নবাব সমীপে নরহত্যার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। তদনুসারে রুদ্রনারায়ণ নবাব সমীপে নীত হইয়া কারারুদ্ধ হ'ন। কবে বিচার হইবে তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং রুদ্রনারায়ণকে বাধ্য হইয়াই বহু দিবস কারাবাস করিতে হয়। কি উপায়ে নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন, রাজা রুদ্রনারায়ণ

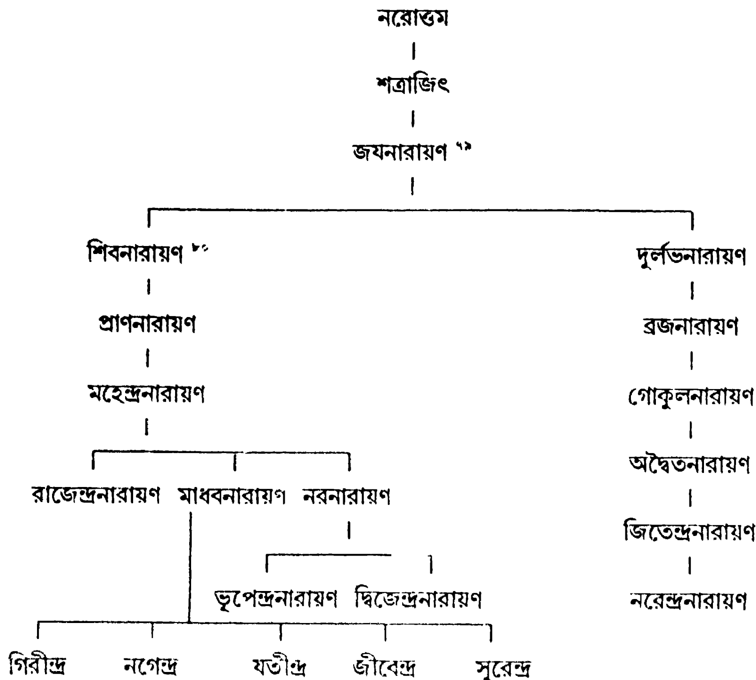
তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। নবাব এক দিন মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে রুদ্রনারায়ণও কোন প্রকারে কারাধ্যক্ষকে বাধ্য করিয়া গোপনে নবাবের সহিত গমন করেন এবং নবাব সমীপেই তরবারি দ্বারা একটি ব্যাঘ্র নিহত করেন। এই বীরোচিত কার্যে নবাবের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, তখন নবাব তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। রুদ্রনারায়ণও উত্তম সুযোগ বুঝিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহার বন্দি হইবার কারণ সবিস্তারে নবাব সমীপে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে তিনি ধনরত্ন দ্বারা বশীভূত করায় পাঁচ জন চণ্ডাল স্বেচ্ছায়ই তাহাদের মস্তক বিক্রয় করিয়াছিল। চন্দ্রদ্বীপ-রাজ বৈরনির্যাতনমানসে তাঁহার নামে এইরূপ মিথ্যাভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। নবাব, রুদ্রনারায়ণের বংশগৌরব ও বীরত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন, এবং তাহাকে সৈয়দপুর পরগনার সনন্দ প্রদান করেন।

এই কালীবাড়িতে রূপরাম চক্রবর্তী সিদ্ধিলাভ করায় উক্ত বিগ্রহের নাম 'সিদ্ধেশ্বরী' হয়। রাজা রুদ্রনারায়ণ সিদ্ধেশ্বরীর দৈনিক পূজা এবং প্রতি মঙ্গলবার ও প্রতি অমাবস্যাতে বলি প্রদানের জন্য ছয় শত বিঘা দেবোত্তর দান করিয়া গিয়াছিলেন। সেবাইত ব্রাহ্মণ ও চাকরদিগের বেতনের পরিবর্তে লাখরাজ জমি এবং পুরোহিত রূপরামকে দুই শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া পুরুষানুক্রমে জীবিকানির্বাহের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। রুদ্রনারায়ণ রায়েরকাঠিতে একটি সমাজ স্থাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তজ্জন্য অনেককে লাখরাজ জমি দান করিয়া বসবাস এবং জীবিকানির্বাহের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেলিমাবাদের পূর্ব আবাদকার শ্রীমন্ত রায় এবং অনন্ত রায়কে বাইসারি গ্রামে একখানি নিষ্কর বাড়ি দান করেন এবং বঙ্গজ কুলীনশ্রেষ্ঠ গোপালকৃষ্ণ বসু মিরবহরকে বিশেষ আদরের সহিত নুৎফাবাদ গ্রামে নিষ্কর বাড়ি ও তালুক প্রদান করেন।[১৭] অতঃপর রাজা রুদ্রনারায়ণ সাগরদাড়ি গ্রামে যাইয়া পিতৃগুরু, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, সিদ্ধপুরুষ অবিলম্ব সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কিছু কাল পরে সস্ত্রীক কাশীধামে গমন পূর্বক মানবলীলা সংবরণ করেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণের চারি পুত্র—নরোত্তমনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ, কন্দর্পনারায়ণ এবং গন্ধর্বনারায়ণ। নরোত্তম বিষয়কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পর ভ্রাতৃগণের মধ্যে ক্রমে ক্রমে মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, পরগনা বনগাঁস্থিত শ্রীপুর কাছারি বাড়িতে, রাজা কন্দর্পনারায়ণ পরগনা কাশিমপুরস্থ চিংড়াখালি কাছারিতে এবং রাজা গন্ধর্বনারায়ণ চিরুলিয়া পরগনাস্থিত কোঁদলা বাটিতে স্বস্ব পরিবারসহ বাস করিতে থাকেন। রাজা গন্ধর্বনারায়ণ কিছু কাল পরে কোঁদলা হইতে উঠিয়া গিয়া মঘিয়া গ্রামে বাস করেন। এইরূপে রায়েরকাঠির রাজবংশ হইতে বনগ্রাম চিংড়াখালি, এবং মঘিয়াস্থিত রাজবংশের উদ্ভব হয়।

রাজা রুদ্রনারায়ণের বংশাবলী অতীব বিস্তৃত এবং তাঁহার বংশধরগণ বিভিন্নস্থানে অবস্থিত, তাই বাহুল্যভয়ে অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের বংশতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কিঙ্কর ভূঁঞা
|
মদনমোহন
|
শ্রীনাথ
|
শ্রীরাম
|
রুদ্রনারায়ণ[১৮]
|
নরোত্তম



নরোত্তমের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শত্রাজিৎ রাজ্যলাভ করিলেন। কনিষ্ঠ শূরনারায়ণ পৈত্রিক বাড়ি ত্যাগ করিয়া উহার কিছু উত্তরে বাড়ি প্রস্তুত করতঃ বাস করেন। তদবধি উক্ত বাড়ি ছোট রাজবাড়ি বলিয়া খ্যাত। তাঁহার বংশধরগণ এখনও সেই বাড়িতে বাস করিতেছেন। রাজা শত্রাজিতের সময়ে রায়েরকাঠির বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার সময়েই সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের কার্যারম্ভ, নিজ বাড়ির প্রাচীর, ফটকের উভয় পার্শ্বে নহবৎখানা নির্মাণ, দীর্ঘিকা খনন, অতিথিশালা স্থাপন প্রভৃতি বহুবিধ সৎকার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন রাজা শত্রাজিৎ নুৎফাবাদ গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন পূর্বক গ্রামবাসীর জল কষ্ট দূর করিয়াছিলেন। তিনি নিজ নামানুসারে শত্রাজিৎপুর গ্রাম স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধমন্ত্র রামগোবিন্দ সরস্বতীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কালীঘাটে মন্ত্র পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। পরে পুত্র জয়নারায়ণকে বিষয়ভার অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন।

রাজা জয়নারায়ণ অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ আগা বাখর, জমিদারির কতকাংশ বলপূর্বক দখল করিবার চেষ্টা করায় সুতালড়ী কাছারিতে তাঁহার সহিত জয়নারায়ণের এক যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে জয়নারায়ণ বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া, বারইকরণের কেল্লা আক্রমণ করতঃ দখল করেন। আগা বাখর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বারইকরণাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে জয়নারায়ণের লোকের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং শেষ বারইকরণে উপস্থিত হইলে রাজা জয়নারায়ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জয়নারায়ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এবং আগা বাখর এই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বাইশটি সঙ্গে লইয়া রায়েরকাঠিতে প্রত্যাগমন করেন।

জয়নারায়ণ রায়ের সময়ে এই দেশে বর্গির হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। এই দুরাত্মা মহারাষ্ট্র দস্যুগণ যে প্রকার নির্মমতা প্রদর্শনপূর্বক নরহত্যা ও লুণ্ঠন প্রভৃতি দ্বারা নগর গ্রাম ভস্মাবশেষ, করিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞের অবিদিত নাই। এই দুর্বৃত্তগণ, জনসাধারণের এরূপ ভীতিজনক হইয়াছিল যে, ইহাদের আগমনাশঙ্কা জনরবে প্রকাশ হইলেও গ্রামবাসীগণ স্ব স্ব পরিবারবর্গ লইয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। এই অত্যাচারে সেলিমাবাদ পরগনার রাজস্ব অনেক বাকি পড়িয়া যায়।

বর্তমান সময়ে যেমন বঙ্গীয় প্রজা-ভূম্যধিকারী আইনের বলে (Bengal Tenancy Act) ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী হইতে সামান্য জোতদারের প্রাপ্য কর আদায় করিয়া লইতে হয়, নবাবি আমলে সেই রূপ ছিল না। দেয় রাজস্ব রাজকোষে দাখিল না হইলে জমিদারকে নবাব সরকার হইতে ধরিয়া আনা হইত; এবং বহুবিধ যাতনা দিয়া দেয় কর আদায় করা যাইত। যদি একান্ত পক্ষে ভূম্যধিকারী রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হইতেন; তাহা হইলে জমিদারি ইস্তফা দিলেই টাকার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন।

সেলিমাবাদ পরগনার রাজস্ব বাকি পড়িলে, নবাবের অনুচরগণ আসিয়া জয়নারায়ণকে ধরিয়া লইয়া গেল। এই সময় আলিবর্দী খাঁ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ মুর্শিদাবাদে বিরাজ করিতেছিলেন। ঢাকা নগরী তখন পূর্ব বঙ্গের রাজধানী ছিল; আলিবর্দীর জামাতা নিবাইস্ মহম্মদ খাঁ সুবেদার স্বরূপ তথায় অবস্থান করিতেন। রাজা জয়নারায়ণ বন্দি অবস্থায় তথায় নীত হইলেন, এবং কি জন্য তাঁহার রাজস্ব বাকি পড়িয়াছে তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি প্রকৃত অবস্থা সম্যক্ রূপে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। নিবাইস্ মহম্মদ অত্যন্ত হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন; জয়নারায়ণ কেন রাজস্ব দিতে পারিতেছেন না তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু প্রভুর আদেশ পালন করিতে হইবে, তাই বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি জয়নারায়ণকে বলিলেন "যেমন করিয়া পারেন রাজস্ব দাখিল করুন, অথবা আইনানুসারে জমিদারি ইস্তফা দিন্।" জয়নারায়ণ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, সুতরাং আইনানুসারে কারারুদ্ধ হইলেন।

কয়েক মাস কারাগারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জয়নারায়ণ জমিদারি ইস্তাফা দিয়া অব্যাহতি পাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তৎকালে শুধু ভূস্বামীর ইস্তফাপত্র দস্তখতে উহা শুদ্ধ হইত না, দেওয়ানেরও দস্তখত আবশ্যক হইত। জয়নারায়ণ ইস্তফা পত্রে স্বাক্ষর করিতে প্রতিশ্রুত হইলে দেওয়ানের জন্য পরওয়ানা বাহির হইল।

মহাত্মা কৃষ্ণরাম সেন[৮] তখন রায়েরকাঠির দেওয়ান ছিলেন, তিনি জয়নারায়ণ প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং তাঁহার এই প্রকার কার্যের জন্য তাঁহাকে কথঞ্চিৎ ভর্ৎসনাও করিলেন। অল্প দিন পরে রাজানুচরগণ দেওয়ানকে ধৃত করিয়া ঢাকায় লইয়া গেল। যথা সময়ে কৃষ্ণরাম রাজপ্রতিনিধি সমক্ষে দরবারে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।

সুবেদার বলিলেন "দেওয়ান, তোমার প্রভু জয়নারায়ণ বাকি রাজস্ব দায়ে জমিদারি ত্যাগ করিয়া ইস্তফা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এখন সেই ইস্তফা পত্রে তোমার স্বাক্ষর আবশ্যক, তুমি স্বাক্ষর করিয়া প্রস্থান করিতে পার।"

কৃষ্ণরাম তখন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন "জাঁহাপনা, আমার প্রভু রাজা জয়নারায়ণ সেলিমাবাদ পরগনার একমাত্র ভূম্যধিকারী; তিনি ও তাঁহার স্বর্গগত পিতৃ পুরুষগণ চিরকাল রাজ ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক, সাধ্যানুসারে হুজুরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন; এবং চিরকালই নিয়মিত সময়ে তাঁহাদের দেয় রাজস্ব রাজকোষে দাখিল করিয়া আসিয়াছেন। কতিপয় বৎসর যাবৎ মহারাষ্ট্র দস্যুগণের উৎপীড়নে জমিদারির অনেক অংশ এক প্রকার ধ্বংস হইয়াছে, অনেক সমৃদ্ধশীল প্রজা প্রাণ লইয়া ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সমস্ত দুর্লঙ্ঘ্য কারণেই রাজস্ব যে এত বাকি পড়িয়াছে তাহা জাঁহাপনা সম্যক্ অবগত আছেন। অতএব অনুগ্রহপূর্বক যদি এই দীন প্রজাকে দুই বৎসরের অবকাশ প্রদান করেন, তাহা হইলে বাকি রাজস্ব সম্পূর্ণ আদায় করিতে পারি।

নিবাইস মহম্মদ উত্তর করিলেন "দেওয়ান, তুমি বুদ্ধিমান হইয়া কেন নির্বোধের ন্যায় কথা বলিতেছ? রাজস্ব বাকি পড়িলে জমিদারি রক্ষা হয় না। অতি সত্বর রাজস্ব দাখিল কর অথবা ইস্তফা পত্রে স্বাক্ষর কর, অন্যথায় সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, হয়ত প্রাণদণ্ডও হইতে পারে।"

কৃষ্ণরাম তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"জনাব, হিন্দু সন্তান কর্তব্য পালন ও প্রভু রক্ষার্থ প্রাণ ত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ গ্রহণ করিয়া যদি প্রভুর জমিদারি প্রদান করেন তবে এই দণ্ডেই হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি। যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার দ্বারা এই ইস্তফা পত্রে স্বাক্ষর করাইতে ইচ্ছা করেন তবে পূর্বেই আত্মঘাতী হইব।"

কৃষ্ণরামের এই নির্ভীক উত্তর শ্রবণ করিয়া সভাসদগণ চমকিত হইলেন। সুবেদার তৎক্ষণাৎ প্রহরীগণকে আদেশ করিলেন "ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও, যতক্ষণ পর্যন্ত ইস্তফা . এ স্বাক্ষর না করে, ততক্ষণ ইহাকে যন্ত্রণা প্রদান করিবে।"

প্রহরীগণ অবিলম্বে কৃষ্ণরামকে কারাগারে লইয়া গেল। এই প্রভুভক্ত ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ কারাগারে যে কতদূর যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। প্রহরে প্রহরে প্রহরীগণ তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়া হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় মধ্যাহ্ন সূর্য কিরণে অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত বালুকাপরি রাখিয়া দিত। সময় সময় উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা শরীরের স্থানে স্থানে পোড়াইয়া দিত এবং কখন কখন বিষ্ঠা মূত্র পরিপূর্ণ কূপের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। দুই এক দিন অন্তর সামান্য আহার্য প্রদান করিত, কিন্তু যবনস্পৃষ্ট বলিয়া কৃষ্ণরাম তাহা স্পর্শও করিতেন না।

যখন রাজাজ্ঞায় ধৃত হইয়া কৃষ্ণরাম ঢাকায় নীত হইয়াছিলেন তখন কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার সঙ্গে তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক ব্রাহ্মণ[১২] কারাধ্যক্ষকে কিছু কিছু উৎকোচ প্রদান করিয়া কৃষ্ণরামকে সময় সময় সামান্য আহার্য প্রদান করিতেন।

এদিকে কৃষ্ণরামের কারাবাসের বৃত্তান্ত রায়েরকাঠিতে পৌঁছিল। জয়নারায়ণ পূর্বেই মুক্ত হইয়া রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণরামের এই প্রকার আত্মত্যাগের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি কৃষ্ণরামের আহার ও প্রহরীগণকে উৎকোচ দিবার জন্য কতিপয় সহস্র মুদ্রা গোপনে কৃষ্ণরামের নিকট প্রেরণ করিলেন।

একদা জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে কৃষ্ণরাম হস্তপদবদ্ধাবস্থায় সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত বালুকা শয্যায় পতিত আছেন, এবং অনতি দূরে প্রহরী শীতল পাদপচ্ছায়ায় তৃণ শয্যোপরি নাসিকাধ্বনি করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময়ে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান সেই স্থানে আগমন করিলেন। কৃষ্ণরামকে তদবস্থ দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে, এবং কেনই বা এই অবস্থায় এখানে পতিত রহিয়াছেন?"

কৃষ্ণরামের চৈতন্য তখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, ব্রাহ্মণের কথায় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন "ঠাকুর, আমার পরিচয়ে আপনার কি আবশ্যক? এই নিদারুণ রৌদ্রে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? যদি বলিতে বাধা না থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া বলিতে পারেন।"

ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত, শুনিয়াছি রায়েরকাঠির দেওয়ান কীর্তিপাশা নিবাসী কৃষ্ণরাম সেন বড় দাতা, তিনি এখানে আছেন, আমি তাঁহারই নিকটে আগমন করিয়াছি।"

কৃষ্ণরাম তখন আত্মগোপন করিয়া বলিলেন "ঠাকুর, কৃষ্ণরাম রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে অশেষ লাঞ্ছনায় কালাতিপাত করিতেছে। তাহার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?"

ব্রাহ্মণ কৃষ্ণরামের কারাবাসের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "হায়! আমাদেরই দুরদৃষ্ট নহিলে অমন পুণ্যবান ব্যক্তি রাজরোষে পতিত হইয়া কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় লোকের অদৃষ্টেও বিধাতা কারাবাস লিখিয়াছেন?" এইরূপ কিয়ৎকাল দুঃখ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন "মহাশয়, আমার তিনটি কন্যা বয়স্থা এবং একটি মাত্র পুত্রের যজ্ঞোপবীত কাল প্রায় গত হইয়া আসিয়াছে, আমার এমন অর্থ নাই যাহা দ্বারা এই কন্যা তিনটির কুলক্রিয়া ও পুত্রের যজ্ঞোপবীত কার্য সম্পন্ন করিতে পারি। আমি এই কার্য নির্বাহার্থ বহুস্থানে ভিক্ষার্থী হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যাহা পাইয়াছি তাহাতে যে এই সমস্ত কার্যের এক চতুর্থাংশ ব্যয়ও সম্পন্ন হয় এরূপ সম্ভব নহে। শুনিয়াছিলাম যে কৃষ্ণরাম এখানে আছেন; তাঁহার নিকট আমার দুঃখকাহিনী বলিলে আমার কষ্ট দূর হইবে ভাবিয়া এতদূর পথ পর্যটন করিয়া আসিয়াছি। আমার দুর্ভাগ্য, তাই তিনি কারারুদ্ধ।"

পরদুঃখকাতর কৃষ্ণরামের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "ঠাকুর, কত টাকা হইলে আপনার কার্য সম্পন্ন হইতে পারে?"

ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "কোনক্রমে সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যতীত হইতে পারে না।"

কৃষ্ণরাম কোন কথা বলিলেন না, তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণকে নিকটে ডাকিয়া জানিলেন যে বায়েরকাঠি হইতে তাঁহার জন্য দুই সহস্র মুদ্রা প্রেরিত হইয়াছে। কৃষ্ণরাম তখন সেই ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলি[illegible] "আ[illegible]নি এতদূর ক্লেশ স্বীকার করিয়া যাহার নিকট আগমন করিয়াছেন, আমিই সেই হতভাগ্য কৃষ্ণরাম, রাজরোষে পতিত হইয়া আমার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। আমি যে ভ[illegible]লাতিপাত করিতেছি, তাহা আপনি স্বচক্ষে দেখিতেছেন, তাই আশানুরূপ দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলাম না। ঐ যে নিকটে তোড়া বান্ধা টাকা রহিয়াছে, উহা সমস্তই আমার; আমি ঐ সমস্ত মুদ্রাই আপনাকে দান করিলাম; আশীর্বাদ করিবেন যেন শীঘ্র এই পাপদেহের পতন হয়।"

ব্রাহ্মণ এতক্ষণ কৃষ্ণরামের পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন না; এখ[illegible] জানিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই প্রকার অবস্থায় এতাদৃশ দান দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা রহিল না; তিনি একদৃষ্টে কৃষ্ণরামের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণকে [illegible]স্তব্ধ দেখিয়া কৃষ্ণরাম পুনরায় বলিলেন "ঠাকুর বোধহয় আপনার আশানুরূপ দান হয় নাই, তাই মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিতেছেন না। আমার একমাত্র এই মুমূর্ষু জীবন ব্যতীত আর কিছুই নাই; যাহা দান করিয়াছি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিলে কৃতার্থ বোধ করিব।"

এই প্রকার কথোপকথনে নিকটস্থ নিদ্রিত প্রহরী জাগরিত হইয়া সমস্ত ঘটনা শ্রবণ পূর্বক অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল।

ক্রমে ক্রমে এই কথা প্রচার হইয়া পড়িল এবং সকলেই এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া একবাক্যে এই লোকাতীত দানের প্রশংসা করিতে লাগিল। প্রথমত কারাধ্যক্ষ তৎপর অন্যান্য রাজকর্মচারী এবং সর্বশেষে সুবেদার নিবাইস মহম্মদ ইহা শ্রবণ করিলেন। এই প্রকার অলৌকিক আত্মত্যাগের কথা শ্রবণপূর্বক তিনি যারপরনাই পুলকিত হইয়া কৃষ্ণরামকে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং অচিরে তাঁহার বন্ধনমুক্তির আদেশ প্রদান করিলেন। তারপর সুবেদার কৃষ্ণরামকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দেওয়ান, লোকমুখে তোমার যে অসাধারণ দান এবং প্রভুভক্তির কথা শুনিয়াছি তাহা কি সত্য?" কৃষ্ণরাম কোন উ[illegible] করিলেন না; কেবল করজোড়ে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

কৃষ্ণরামকে নিস্তব্ধ দেখিয়া জনৈক প্রৌঢ় রাজকর্মচারী করপুটে বলিলেন, "জাঁহাপনা, আপনি যাহা শ্রবণ [illegible]য়াছেন তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে; বর্তমানে পৃথিবীতে যে এতাদৃশ আত্মোৎসর্গের

জীবন্ত দৃষ্টান্ত আছে, তাহা চক্ষে দেখা দূরে থাক, কর্ণেও শ্রবণ করি নাই। আমরা এই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।"

নিবাইস মহম্মদ তখন কৃষ্ণরামের সঙ্গী এবং ভিক্ষার্থী উভয় ব্রাহ্মণের নিকট সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাঁহারাও যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বলিলেন ; প্রহরীগণও প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাপন করিল। অত্যন্ত হর্ষাগমে নিবাইস মহম্মদের সর্বশরীর কণ্টকিত হইল ; তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক কৃষ্ণরামকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "দেওয়ান, আজ যাহা শুনিলাম, এরূপ লোকাতীত অদ্ভুত পূত কাহিনী আমি আর কখনও শ্রবণ করি নাই। তোমার ন্যায় যে একজন পুণ্যবান পুরুষ এই রাজ্য মধ্যে বাস করিতেছে, সেই জন্য এই রাজ্যও পবিত্র হইল। তোমার ন্যায় একজন ধার্মিক পুরুষের সমাগমে আমিও আপনাকে ধন্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর বল আমি তাহা পূর্ণ করিয়া তোমার সৎকার্যের কতক পুরস্কার প্রদান করি।"

কৃষ্ণরাম তখন জানু পাতিয়া যুক্ত করে বলিলেন—'জাঁহাপনা, দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা, প্রভুসেবা হিন্দুগণের অবশ্য কর্তব্য কার্য; আমি তাহা পালন করিয়াছি মাত্র। এই জন্য আমি প্রশংসার যোগ্য নহি ; কিন্তু হুজুর যে এ দাসকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, ইহাই আপনার ঔদার্যের পরিচয়। জাঁহাপনা, যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ দাসকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন যদি অনুগ্রহ পূর্বক, আমার প্রভু রাজা জয়নারায়ণের পরিত্যক্ত জমিদারি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত জ্ঞান করিব। হুজুরের নিকট আমার ইহা ভিন্ন অন্য প্রার্থনা নাই।"

নিবাইস মহম্মদ কৃষ্ণরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় সানন্দচিত্তে বলিলেন "দেওয়ান, তুমি ধন্য ; জয়নারায়ণ যাহাতে পুনরায় তাঁহার জমিদারি প্রাপ্ত হইতে পারেন তজ্জন্য আমি মুর্শিদাবাদ নবাব-নাজিমের নিকট অনুরোধ করিব ; তিনি উদারচেতা এবং ধার্মিক, অবশ্যই তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে। দেওয়ান, তুমি নিজে কিছু প্রার্থনা করিলে না?"

কৃষ্ণরাম বলিলেন—"জাঁহাপনা, প্রভুর জমিদারি রক্ষাই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার ; রাজা জয়নারায়ণের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিলে আমি ও আমার সন্তানসন্ততিগণ তাঁহারই অন্নে জীবন ধারণ করিতে পারিব। আমি দরিদ্র, আমার অধিক ধনে প্রয়োজন কি?"

অতি সত্বরই মুর্শিদাবাদ হইতে নবাব-নাজিমের অনুমতি পত্র পৌছিল, সুবেদার মুক্তিপত্রসহ কৃষ্ণরামকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

কৃষ্ণরামের এই অভূতপূর্ব পুণ্যকাহিনী পূর্বেই রায়েরকাঠিতে প্রচারিত হইয়াছিল ; তিনি যথা সময়ে পৌছিয়া সমস্ত অবস্থা রাজা জয়নারায়ণের নিকট ব্যক্ত করিলেন।

জয়নারায়ণ বলিলেন "দেওয়ান, আমি ইচ্ছাপূর্বক এই জমিদারি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন আপনার অসাধারণ পুণ্যবলে এবং প্রভুভক্তি গুণে ইহা পুনরুদ্ধার হইয়াছে ; আমার ইহাতে কোন স্বত্ব নাই, আপনি উদ্ধার করিয়াছেন, আপনিই ভোগ করুন।"

রাজার এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, সকলে তাঁহাকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণরাম বলিলেন "রাজন্! আপনি আমার প্রভু, আপনারই অন্নে এই শরীর পুষ্ট, আমি কর্তব্য করিয়াছি মাত্র। রাজ্য আপনারই ; আমাকে এইরূপ আদেশ করিলে আমি মর্মান্তিক কষ্ট পাইব।"

রাজা জয়নারায়ণ পুনরায় বলিলেন "আপনি যে উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আমার বংশাবলীসহ আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। কিন্তু এই মহদুপকারের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আপনাকে পুরস্কৃত না করিলে আমাকে গুরুতর অধর্মে পতিত হইতে হইবে।"

কৃষ্ণরাম বলিলেন "আমাকে পুরস্কার প্রদান করাই যদি আমার অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে আপনার এই জমিদারির মধ্যে আমাকে কতক ভূ-সম্পত্তি প্রদান করুন, যদ্দারা আমার সন্তানসন্ততিগণের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে।"

রাজা, কৃষ্ণরামের প্রার্থনানুসারে তৎপুত্র রাজারামের নামে এক বৃহৎ তালুক অর্পণ করেন।[৮৩] এই সময় হইতেই কীর্তিপাশার জমিদারির সূত্রপাত হইল।

রাজা জয়নারায়ণ অত্যন্ত ধার্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুণ্য কীর্তিসমূহ অদ্যাপি এদেশের প্রায় স্থানেই প্রচলিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনারায়ণ রাজা হইলেন।

রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহাব পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ৬পস্থিত হওয়ায় প্রত্যেকে পৃথক পৃথক বাড়ি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারা পৃথগান্ন হইলেও জমিদারির আদায়-তহশিল একত্র নির্বাহিত হইত।

এই সময় দুর্বৃত্ত আগা বা‹৭. বোজরগ উমেদপুর সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া, সেলিমাবাদও গ্রাস করিল। রায়েরকাঠির রাজাদের এমন শক্তি সামর্থ ছিল না যে বলপূর্বক আগা বাখরের নিকট হইতে অপহৃত সম্প.ও পুনরায় উদ্ধার করেন। তাঁহারা তখন অনন্যোপায় হইয়া মুর্শিদাবাদে নবাব-নাজিমের নিকট নালিশ উপস্থিত করিলেন। আগা বাখর এবং তৎপুত্র আগা সাদক তখন বঙ্গ সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী সিরাজদ্দৌলার একান্ত প্রিয় পাত্র। বাজারা আগা বাখরের বি.দ্ধে যে অভিযোগ করিযাছিলেন তাহা টিকিল না ; বহু চেষ্টা, অর্থ ব্যয় ও কঠোব পরিশ্রমের পর মাত্র সাড়ে চারি আনা প্রাপ্ত হইলেন। এই অংশ আবার রায়েরকাঠির সমস্ত রাজবংশ মধ্যে দশ ভাগে বিভক্ত হইল। ১৭৫৩ খ্রিঃ অব্দে দুরাত্মা আগা বাখব, রাজদ্রোহী অপবাদে নিহত হইলে, মহাবাজ রাজবল্লভ ˋক্ত সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হ'ন।

এই সময় হইতে বৃটিশ-কেশরী গম্ভীর গর্জনে বঙ্গদেশে স্বীয় অখণ্ড আধিপত্য বিস্তাব করিতেছিলেন। বাণিজ্য-ব্যবসার জন্য কলিকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানটি প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামেব অধিকার প্রাপ্ত হ'ন। এই সময়েই পলাশী ক্ষেত্রে ইংবাজের বাহুবলে মুসলমান-শক্তি লয় প্রাপ্ত হইল এবং হতভাগ্য সিরাজদৌলাকে পদচ্যুত ও নিহত কবিয়া লর্ড ক্লাইভ, নবকুল-কলঙ্ক মীরজাফরকে বঙ্গসিংহাসন প্রদান করিলেন। ক্রমশ ইংরাজ সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। রাজা জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনারায়ণ এবং তাঁহার অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ, তদানীন্তন কুঠিযাল (গভর্নর) মিঃ ভিরেলস্ট (Verelst) সাহেবের নিকট আবেদন কবিলেন। চট্টগ্রামে সেই সময় গোকুলচন্দ্র ঘোষাল দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার সহিত চুক্তি হ২ল য, যদি তিনি জমিদারিব বাকি সাড়ে এগার আনা পুনরুদ্ধার করিয়া দিতে পারেন তবে শিবনারায়ণ তাঁহাকে অর্ধেক জমিদারি পুরস্কার দিবেন।

বহু চেষ্টার পর সেই সাড়ে এগার আনা শিবনারায়ণ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেন, সুতরাং প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁহারা গোকুলচন্দ্রকে পৌনে ছয় আনি অংশ প্রদান করিলেন। ১৭০২ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত এই সাড়ে এগার আনা জমিদাবি রাজা শিবনারায়ণ প্রভৃতি এবং গোকুল ঘোষাল একত্রে ভোগ-দখল করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। তখন উভয় পক্ষের মতানুসারে ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ বারওয়েল (Barwell), জমিদারি পৃথক করিয়া দেন এবং উভয় অংশই, পৃথক পৃথক নম্বরে কালেক্টরির তৌজীভুক্ত হয়।

গোকুল ঘোষালের মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পরে দেনার দায়ে তাঁহার পৌনে ছয় আনি অংশ নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। কাশীনাথ চৌধুরি নামে এক ব্যক্তি ২৯,১০০ টাকায় উহা ক্রয় করিলেন, কিন্তু কাশীনাথ রায় চৌধুরি ঘোষালদেব বেনামদার মাত্র।

ইহার কিছুকাল পূর্বে রাজস্ব বাকি পড়ায় রায়েরকাঠির জমিদারির অর্ধেক (দুই আনা সাড়ে সতের গণ্ডা) নিলামে বিক্রয় হইল। গোকুল ঘোষালের পৌত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল উহা ক্রয় করেন। ক্রমে ক্রমে ১৭৯৬ খ্রিঃ অব্দে সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) মতানুসারে কাশীনাথের অংশও বিক্রয় হইয়া গেল। তখন রাজা রাজবল্লভের পৌত্র রাজকৃষ্ণ আসিয়া তাহা খরিদ করিলেন; এবং ঝালকাঠির সন্নিহিত সুতালড়িতে কাছাবি স্থাপন করিয়া জমিদারি দখল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইলেন না। পরে তাঁহার পুত্র নবকৃষ্ণ স্বীয় অংশ ঘোষালদের

নিকট বিক্রয় করিলেন। সুতরাং ঘোষালগণ সেলিমাবাদের আট আনা সাড়ে বার গণ্ডা দুই ক্রান্তির মালিক হইলেন।

ঘোষালবাবুগণ এদেশবাসী নহেন, কিন্তু তাহা না হইলেও, এই দেশের সঙ্গে তাঁহাদের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। খিদিরপুর সন্নিহিত ভূ কৈলাস নামক স্থানে ইঁহাদের বাসস্থান। এই বংশজাত ব্যক্তিগণ বঙ্গদেশে প্রায় সর্বত্র প্রসিদ্ধ। দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে ইঁহাদের ধর্মনিষ্ঠা এবং যশ যেরূপ সর্বত্র ঘোষিত, অন্যের তদ্রূপ নহে। কেবল যে এই জেলায় ইঁহাদের জমিদারি আছে, তাহা নহে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, চব্বিশপরগনা, বারাণসী (কাশী), গয়া প্রভৃতি স্থানেও আছে ; ইঁহাদের ভূ-সম্পত্তির আয় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা হইবে। দেবসেবা, অতিথিসেবা, বিপন্নের সাহায্য, আশ্রিতপালন প্রভৃতি সদ্‌গুণে ইঁহারা সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। রাজদ্বারেও ইঁহারা বিশেষ সম্মানিত।

স্বর্গীয় কালীশঙ্কর ঘোষাল, গভর্নমেন্ট হইতে "রাজাবাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন ; সেই হইতেই "রাজাবাহাদুর" বলিয়া এই বংশপরম্পরা সর্বত্র পরিচিত। ইঁহারা শান্তিপ্রিয় ; অন্যের ভূ-সম্পত্তি বলপূর্বক গ্রহণ বা প্রজাপীড়নজনিত কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে ইঁহারা বিরত। স্বর্গীয় গোকুল ঘোষাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।

গোকুলচন্দ্র ঘোষাল
|
জয়নারায়ণ ঘোষাল
|
রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর
|
রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর
|
রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর
|
রাজা সত্যশ্রী ঘোষাল বাহাদুর প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয়

বর্তমান ঝালকাঠির[৮৪] নিকট গুরুধাম নামক স্থানে রাজা বাহাদুরের কাছারি স্থাপিত ; স্বর্গীয় রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর স্বয়ং এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারই যত্নে এই স্থানে রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, আপন সমাকুল প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, স্বচ্ছ স্ফটিক তুল্য নির্মল জলরাশি পরিপূর্ণ প্রশস্ত জলাশয় প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে ঝালকাঠি বন্দর পূর্ববঙ্গ মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য স্থান ; রাজা সত্যশরণই ইহার প্রথম স্থাপয়িতা। তিনি স্বয়ং অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া বর্ত্মগুলি নির্মাণ এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণের নিমিত্ত গৃহাদি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন।

রাজা সত্যশরণের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই গৃহ-বিবাদ-বহ্নি নির্ধূমভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সকলেই স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারে ব্যস্ত হইলেন। শান্তির কোমল কুসুমে অশান্তি কীট ধীরে ধীরে প্রবেশপূর্বক আবাসস্থান স্থাপন করিল। এমন কি, দুই একটি ছোটখাট ফৌজদারি মোকদ্দমাও উপস্থিত হইল। গভর্নমেন্ট এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া স্টেটের একজন 'রিসিভার' (Receiver) নিযুক্ত করতঃ যাবতীয় কর্তৃত্ব ভার তাহার উপর অর্পণ করেন। গত ১৩০৬ সালে হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে 'রিসিভার' রহিত হইয়া অংশীদারগণ নিজ নিজ অংশ পৃথক রূপে বণ্টন করিয়া লইলেন।

সেলিমাবাদের অন্তর্গত দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগনা ছিল। ক্রমে ক্রমে ইহার মধ্যে অনেকগুলি অন্য পরগনা ভুক্ত হয়, কতকগুলির অস্তিত্ব লোপ হয় এবং কতকগুলি অন্য জেলাভুক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কালেক্টরিতে পৃথক পৃথক তৌজিভুক্ত হয়।

বিগত ১৮০৫ খ্রিঃ অব্দে বর্তমান 'ডিসিল্‌ভা' সাহেবগণের পূর্বপুরুষ 'ডমিন্‌গো ডিসিলভা' (Domingo D Silva) জজ সাহেবের নিকট একখানা দরখাস্ত করেন ; তাহাতে প্রকাশ যে, সেলিমাবাদ পরগনার অন্তর্গত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগনা ছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলি অন্য পরগনা ভুক্ত হইয়াছে, কতকগুলির অস্তিত্বই নাই, দুই একটা অন্য জেলা ভুক্ত হইয়াছে। আবার কেন কোন পরগনা, স্বতন্ত্রভাবে কালেক্টরিতে পৃথক তৌজী ভুক্ত হইয়াছে। আমরা নিম্নে সেই ১০টি পরগনার নাম উল্লেখ করিতেছি—

১। তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদ
২। সোন্দারকূল।[৮৫]
৩। রুদ্রপুর তপ্পে জাহানপুর।
৪। বনগাঁও।
৫। তপ্পে সুলতানাবাদ।
৬। তপ্পে সুলতানপুর।
৭। কাশিমপুর।
৮। নাজিমপুর।
৯। রাজোর।
১০। শিবপুর।

ইহা ব্যতীত "পরগনা নিমকমহাল" বলিয়া আর একটি পরগনার উল্লেখ দেখা যায়। ১৮০৫ খ্রিঃ অঃ পূর্বে, উল্লিখিত পরগনাগুলি সেলিমাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদ ব্যতীত অন্যান্য পরগনাগুলি কোন সময়ে এবং কেন যে পৃথক করা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না।[৮৬] তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদের নয় আনা অংশ এখনও সেলিমাবাদ পরগনার অন্তর্গত। বনগাঁও বর্তমান সময়ে খুলনা জেলার অন্তর্গত এবং কাশিমপুর ফরিদপুরের অন্তর্গত হইয়াছে। শিবপুর বোজরগ উমেদপুর ভুক্ত হইয়াছে কিন্তু তপ্পে সুলতানাবাদ এখনও বর্তমান আছে।

সেলিমাবাদ পরগনার জমিদারির অংশগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পৃথক পৃথক রূপে গভর্নমেন্টের তৌজীভুক্ত হইয়াছে। রাজা বাহাদুরের অংশ ব্যতীত অন্যান্যগুলি এত জটিল এবং বিষমংশে পরিণত যে, তাহার সকলগুলি ঠিক করিয়া ষোল আনি হিসাব করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। আবার এই সমস্ত জমিদারির রাজস্ব আদায়েও সময় সময় নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন কোন অংশের রাজস্ব জমিদারের দণ্ড দিতে হয়। আমরা এই জমিদারির অংশ সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তৎসহ রায়েরকাঠির খ্যাতনামা কয়েকজন জমিদারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদান করিলাম।

সমগ্র সেলিমাবাদ পরগনার জমিদারির বৃহৎ এবং বিষম অংশ সমষ্টি করিলে ষোল আনা হইতে এক কড়া অংশ বেশি হয়। কোন জমিদারির অধীনে যে এই এক কড়া অংশ অধিক হইয়াছে অদ্যাপি তাহা নির্ণীত হয় নাই।

ইহা ব্যতীতও ৩৮৩৮ নং তৌজিভুক্ত দেড় আনা অংশ 'লুকাজ' সাহেবদের আছে ; কিন্তু এই অংশ বিগত ১৮৬৮ খ্রিঃ অব্দে খুলনার কালেক্টরি ভুক্ত হইয়াছে।

সেলিমাবাদ পরগনা বিভাগ[৮৭]

তৌজী নং	অংশ	মালিক	রাজস্ব
৩৮৪০	।/১৫	রাজা বাহাদুর	৪১৯৩১ ।/১০।।
৩৮৪১	./১০।।	ঐ	১৮০২৯./৭
৩৮৪২	।১৮।।	কিরণচন্দ্র রায় প্রভৃতি	৫০৯৮।।/০।।

৩৮৪৩	১৩	অন্নদাকুমার রায় চৌধুরি ও •বীনচন্দ্র রায় চৌধুরি প্রভৃতি	৩৫৯৯।।০।।
৩৮৪৪	১৩	চণ্ডীচরণ রায় প্রভৃতি	ঐ
৩৮৪৫	১৩	দুর্গানারায়ণ রায় ও জগৎনারায়ণ রায়	ঐ
৩৮৪৬	১২	বৈকুণ্ঠনাথ ্বাস প্রভৃতি	৩৬৮০./১০।।।২
৩৮৪৭	৯।	কিরণচন্দ্র রায় প্রভৃতি	২৯৮৮।১০
৩৮৪৮	৯।	গ্রন্থকার ও তাহার ভ্রাতৃগণ	ঐ
৩৮৪৯	৯।	দুর্গানারায়ণ রায় ও জগৎনারায়ণ রায়	ঐ
৩৮৫০	১০।।	ভুবনেশ্বর রায় প্রভৃতি	৬৩২৩/২
৩৮৫১	১৫।	মিঃ নলিনীমোহন গুপ্ত প্রভৃতি	৩২৮৫৭
৩৮৩৪	৬।	বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী প্রভৃতি	১৮৩৩।/১০।।
৩৮৩৫	৫	মঘিয়ার জমিদারগণ ও গ্রন্থকার এবং তাহার ভ্রাতৃগণ	১৭২০./৮।।
৩৬৩৬	৭	ইন্দুভূষণ মিত্র প্রভৃতি	২০৭৯./০।।
৩৮৩৭	৪	কিরণচন্দ্র রায় প্রভৃতি	৯২৪./৬।।
৩৮৩১	।	বৃন্দাবনচন্দ্র রায় প্রভৃতি	২৭./৬।।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল ; এবং অতি সত্বরই সকলে পৃথগান্ন হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়েই জমিদারির গোলযোগ উপস্থিত হয়। ষোল আনি জমিদারি হইতেই এই প্র ার অংশগুলি বাহির হইবার পর সকলের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইতে আরম্ভ করিল। শিবনারায়ণেরও চারি পুত্র ; তাঁহারাও পৃথক পৃথক বাড়ি করিলেন।

শিবনারায়ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণনারায়ণের জীবনের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যায় না ; কিন্তু প্রাণনারায়ণের পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ বড় তেজস্বী এবং বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন। তিনি অনেকগুলি সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনারায়ণের তৃতীয় পুত্র মাধবনারায়ণের ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার অনন্য সাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল, এবং এই জন্য অনেকে শ্রুতিধর বলিত। মাধবনারায়ণ এই জেলার মধ্যে একজন বিশেষ সম্মানিত লোক ছিলেন। যখন ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হইলেন তখন বরিশালের দরবারে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি উদারতাবশত তাহা চন্দ্রদ্বীপের রাজাকে প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। সেইজন্য তিনি বিশেষ সম্মানিত ও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। মাধবনারায়ণ ধীর, কর্মঠ, মিতভাষী এবং ধার্মিক ছিলেন।

রাজা মাধবনারায়ণের কনিষ্ঠ রাজা নবনারায়ণ জ্যেষ্ঠের ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ না হইলেও তাঁহার ন্যায় সুপুরুষ সর্বত্র দৃষ্ট হয় না। কলাবিদ্যায় নরনারায়ণ সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী মৃদঙ্গ বাদ্যে তিনি সিদ্ধহস্ত ; যখন সংস্কৃত স্তোত্রগুলি মুখে আবৃত্তি করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেন, তখন বোধ হইত যেন সেই স্তোত্রাবলী মৃদঙ্গমুখ হইতে অতি পরিষ্কাররূপে নিঃসৃত হইতেছে। নানা দেশ হইতে কলাবিদ্যাভিলাষী ছাত্রগণ তাঁহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন। কলাবিদ্যা ব্যতীতও নরনারায়ণ মাতৃভাষার বিশেষ অনুরাগী ; এদেশে যখন কবিতা রচনা এক প্রকার অপ্রচলিত ছিল, সেই সময়ে রাজা নরনারায়ণ কতকগুলি শ্রুতিমধুর কবিতা প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি বড়ই হৃদয়স্পর্শী এবং ভাবোদ্দীপক।

রাজা নরনারায়ণের বিদূষী পত্নী রানী বসন্তকুমারীও বঙ্গভাষার অনুরাগিণী। তিনি রুগ্ন শয্যায় শায়িতাবস্থায় "রোগাতুরা বসন্তকুমারী" নাম্নী একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। কবিতাগুলি বড় সুন্দর এবং হৃদয়ের আবেগ পরিপূর্ণ।

রাজা জয়নারায়ণের তৃতীয় পুত্র দুর্লভনারায়ণের সন্তানগণের মধ্যে রাজা অদ্বৈতনারায়ণ প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ। বৈষয়িক কার্যে ইহার অসাধারণ দক্ষতা ; কিন্তু ভাগ্যদোষে ইহার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইয়াছে। দুই তিনখানি সামান্য তালুক আছে ; তাহারই আয় দ্বারা অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হইতেছে।

জয়নারায়ণের চতুর্থ পুত্রের সন্তানগণ মধ্যে দুর্গানারায়ণ ও জগৎনারায়ণ জমিদারির সওয়া নয় গণ্ডা অংশ ভোগী ; তাঁহারাও বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।

শিবনারায়ণের চতুর্থ পুত্রের সন্তানগণ মধ্যে চন্দ্রনাথ রায় একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, পৈত্রিক জমিদারির মধ্যে তাঁহারই উপযুক্ত পুত্রগণ সওয়া নয় গণ্ডা অংশ এখনও ভোগ করিতেছেন।

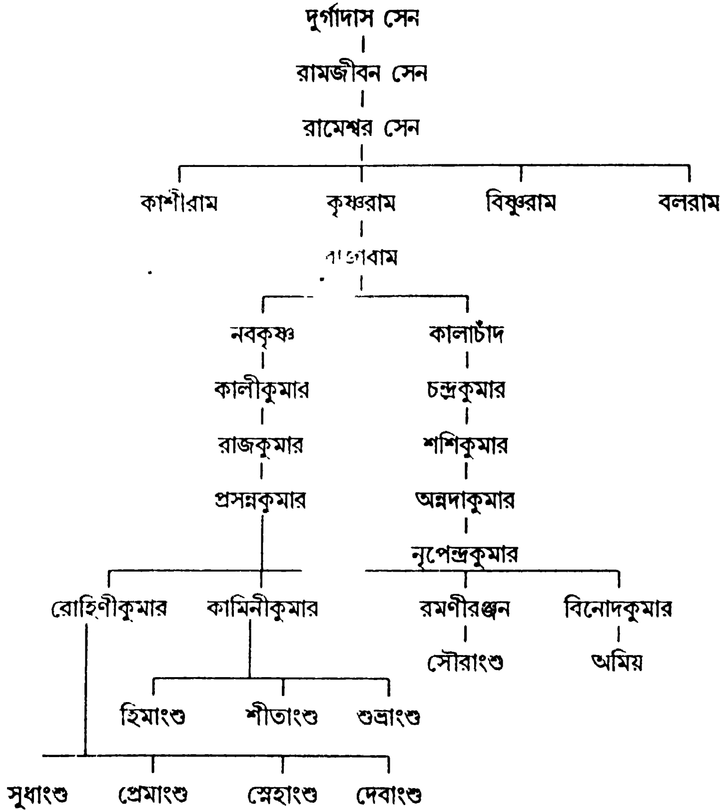
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রুদ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অপর পুত্রগণ পৈত্রিক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালস্রোতের ভীষণ আবর্তে, একমাত্র নরেন্দ্রনারায়ণের বংশধরগণ ব্যতীত আর সকলেই নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতীপুরুষ ছিলেন ; তন্মধ্যে স্বর্গীয় রাজা মহিমাচন্দ্র রায় এবং নকুলেশ্বর রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা স্ব স্ব ক্ষমতায় বিপুল সম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন। মহিমাচন্দ্রের মৃত্যুর পর রানী কমলকুমারী চৌধুরানী বিষয়কার্য নির্বাহ করিতেছেন। এই রমণী যে প্রকার বুদ্ধিমতী, তদ্রূপ তেজস্বিনী। স্টেটের সমস্ত কার্যভার কর্মচারীবর্গের উপর নির্ভর না কবিয়া স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতেছেন ; ইঁহার কার্যকুশলতায় অনেক ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশত ইঁহার কোন পুত্র নাই ; দুইজন দৌহিত্র বর্তমান আছেন, উভয়েই শিক্ষিত, বিনয়ী এবং ধার্মিক।

রায়েরকাঠির রাজবংশ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ; সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থগণের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক ক্রিয়া নির্বাহ হয় না বলিয়া কলিকাতার জঙ্গল [illegible] প্রভৃতি স্থানের স্বঘর কুলীনের সঙ্গে আদানপ্রদান কবিতে হয়। এই প্রকার অনেক ঘর কুলীনসন্তান বৈবাহিক ক্রিয়া করত রায়েরকাঠি গ্রামে রাজাদের আশ্রিত হইয়া বাস করিতেছেন। কয়েকজন হবিবকাঠি গ্রামেও রাজাদের বৃত্তিভোগী হইয়া বসতি করিতেছেন। ইঁহাদের অবস্থা রায়েরকাঠির রাজাদের সঙ্গে সঙ্গে শোচনীয় হইয়াছে। এই সমস্ত কুলীনগণের মধ্যে শশিভূষণ মিত্র, সখানাথ মিত্র, প্রিয়নাথ মিত্র প্রভৃতির আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে।

সেলিমাবাদের অন্তর্গত বহুসংখ্যক তালুক বর্তমান আছে। এই সমস্ত তালুকের রাজস্বও কম নহে, কোন কোন তালুক যথেষ্ট লাভজনক। এই পরগনার ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে কীর্তিপাশার মজুমদার, বাসণ্ডার মহলানবিশ, কেওয়ার চৌধুরি ও কবিবল্লভ বংশ জলাবাড়ির বিশ্বাস, সাতুরিয়ার মিঞা এবং মরাজুড়ির দত্ত প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কীর্তিপাশার মজুমদারগণ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কৃষ্ণরাম সেনের বংশধর। সেলিমাবাদের ইতিহাসের সঙ্গে এই মহাত্মার অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। এই মহাপুরুষই স্বীয় দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা সেলিমাবাদের জমিদারি পুনরুদ্ধার করিতে কিভাবে কৃতকার্য হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থানে কৃষ্ণরামের সন্তানসন্ততিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

কৃষ্ণরামের প্রপিতামহ দুর্গাদাস সেন বিক্রমপুরের অন্তর্গত পোড়াগাছা গ্রাম হইতে কীর্তিপাশায় আগমন করেন। দুর্গাদাসের পুত্র ও পৌত্র তাদৃশ বিখ্যাত ছিলেন না। তাঁহার প্রপৌত্র কৃষ্ণরামই এই বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত করেন। ইনি সর্বপ্রথম 'মজুমদার' উপাধিপ্রাপ্ত হ'ন। ইঁহার সময় হইতেই কীর্তিপাশার জমিদার বাড়ি 'মজুমদার বাড়ি' বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহাদের বংশ তালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।



কৃষ্ণরামের পুত্র রাজারাম সেন পিতার ন্যায় উদার হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরামের জ্বলন্ত কীর্তিসমূহ রাজারামের হৃদয়ে সম্যক প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

রাজারামের সম্যক জীবনী পাওয়া যায় না ; তবে ইঁহার পূত জীবনের অলৌকিক দান ও ক্ষমাশক্তিজ্ঞাপক বহু আখ্যায়িকা এতদঞ্চলে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। দেবদ্বিজের উপর ইঁহার অচলা ভক্তি ছিল। ইনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে জীবনকে এতদূর উন্নত করিয়াছিলেন যে এদেশের লোকের বিশ্বাস, তিনি জগন্মাতা ভগবতী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সাক্ষাৎলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধার্মিক রাজারামের উপর স্থানীয় জনসাধারণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অদ্যাপি সামান্য সামান্য ঘটনায় প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোন গাছে ফল না জন্মিলে গৃহস্থ মানত করে যে ফল হইলে প্রথম ফলটি রাজারামের নামে উৎসর্গ করিবেন। বিশ, পঁচিশ বৎসর পূর্বে বালকগণ গুরুজনকে প্রণাম করিলে "রাজারামের মত হও" বলিয়া তাঁহারা আশীর্বাদ করিতেন।

রাজারাম রায়েরকাঠিতে পৈত্রিক চাকরি করিতেন। রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর যখন রাজপরিবারে আত্মকলহ উপস্থিত হয়, তখন অপক্ষপাতী রাজারাম মনোকষ্টে রাজসংসার হইতে বিদায় লইয়া কীর্তিপাশায় ফিরিয়া আসেন। রাজপরিবারের জন্য তিনি সর্বদাই মনোদুঃখে সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যেক পুণ্যাহ তিথিতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে দীন, দুঃখী ও ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে অকাতরে দান করিয়া ভগ্নহৃদয়ে শান্তি আনিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কথিত

আছে কোন এক পুণ্যাহ তিথিতে রাজারাম এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব দান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

রাজারামের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ নাবালক ছিলেন বলিয়া সম্পত্তি রক্ষণের ভার তদীয় পত্নী রামমালার উপর পতিত হয়। তারপর মাতার জীবদ্দশায় প্রাপ্তবয়স্ক নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ বিষয়কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এই উভয় ভ্রাতার মধ্যে এতদূর সম্প্রীতি ছিল যে তাহাদের সৌভ্রাত্র আদর্শস্থানীয় বলিয়া কীর্তিত হইতে পারে।

নবকৃষ্ণ একটি মহৎ কার্য করিয়া অস্মদ্দেশে কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহাসমারোহে তাঁহার ভ্রাতৃকন্যাদ্বয় ও নিজের কন্যার বিবাহে "চন্দন" করিয়াছিলেন। বৈদ্যসমাজের যাবতীয় কুলীনগণকে নিমন্ত্রণপূর্বক, তাঁহাদের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়া প্রত্যেকের ললাটে চন্দনের টিপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি একদিকে যেমন ব্যয় সাধ্য তেমনি শ্রমজনক। পূর্বে মহারাজ রাজবল্লভ ও পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণ এই কার্য করিয়া অতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন ; তারপর নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ ব্যতীত কেহ অস্মদ্দেশে এই কার্য করিয়াছেন কিনা এইরূপ শুনা যায় না।

পত্নীর প্ররোচনায় ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ ভ্রাতৃপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হইলেও তাঁহাদের পত্নীদ্বয়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। কালাচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী পোষ্যপুত্রসহ পৃথক হইয়া গেলেন। কালাচাঁদ মৃত্যুকালেও ভ্রাতৃপ্রেমের অমোঘ প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথমত তিনি পোষ্যগ্রহণে বিরোধী ছিলেন, কিন্তু পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের প্ররোচনায় শেষে স্বীকৃত হইলেন। নবকৃষ্ণের পুত্র কালীকুমারকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার অংশের এক চতুর্থাংশ যৌতুক-স্বরূপ প্রদান করেন। সেই হইতে নবকৃষ্ণের বংশধরগণ পৈত্রিক সম্পত্তির দশ আনা ও কালাচাঁদের বংশধরগণ ছয় আনা অংশ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ বিবিধ লোকহিতকর কার্য সাধন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কীর্তিপাশা হইতে ঝালকাঠি পর্যন্ত একটি প্রশস্ত বর্ত্ম নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কর্তৃক এই রাস্তাটি সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। কালাচাঁদের স্ত্রী তেজস্বিনী তারিণী চৌধুরানী 'তুলা' করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তুলাদণ্ডের একপার্শ্বে নিজে দাঁড়াইয়া সেই ওজনের স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন।

নবকৃষ্ণ কতিপয় বৎসর পরে তাঁহার বাৎসরিক পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ করিবার বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুদূর হরিদ্বার বদরিকাশ্রম হইতে মণিপুর পর্যন্ত এবং নেপাল হইতে কুমারিকা পর্যন্ত যাবতীয় শাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে প্রসিদ্ধ কর্মকার আনাইয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ দ্বারা দুইটি "দানসাগর" নির্মাণ করাইলেন। মণিমুক্তাখচিত মহার্ঘ্য চন্দ্রাতপ কাশ্মীর হইতে নির্মিত হইয়া আসিল। শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন হইল, নিরূপিত দিবসে পণ্ডিতগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের দিন ফুরাইয়া আসিল। কঠোর পরিশ্রমে তিনি অতিশয় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে রোগ কঠিনতর হইল এবং পরিশেষে ১২১৩ সালে নবকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। ইহার পত্নী অন্নপূর্ণা দেবীও অনুমৃতা হইলেন।

পিতার আরব্ধ কার্যের ভার অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র কালীকুমারের হাতে পড়িল। তিনি দুর্বিসহ পিতৃ-মাতৃ-শোকরাশি ভস্মাবচ্ছন্ন অগ্নিবৎ হৃদয়মধ্যে নিহিত রাখিয়া এই মহৎ কার্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করিলেন। এবং সমাগত পণ্ডিতবর্গকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। কালীকুমারের দানে ও সদ্ব্যবহারে নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলী আশাতিরিক্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট আশীর্বাদপূর্বক সকলে প্রস্থান করিলেন। ভট্ট কবিগণের সুললিত কবিতায় কালীকুমারের কীর্তিগাথা অদ্যাপি এতদঞ্চলে গীত হইয়া থাকে।

সংসারে প্রবেশ করিয়া কালীকুমার চারি বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। সহসা দুশ্চিকিৎস্য 'নিউমোনিয়া' (Pneumonia) রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

হইলে কালীকুমার বুঝিলেন যে তাঁহার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে। পত্নী হরসুন্দরী স্বামীর পদপ্রান্ত হইতে মুহূর্তের জন্যও স্থানান্তরিত হইতেন না। প্রেম, ভক্তি, প্রীতির মূর্তিমতী প্রতিকৃতি সতী হরসুন্দরীর বদন মণ্ডলে এক অপূর্ব জ্যোতি সর্বদাই ফুটিয়া থাকিত। পতিভক্তিতে এই ষোড়শবর্ষীয়া রমণীর হৃদয়খানি পরিপূর্ণ ছিল। স্বামীর মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া সাধ্বী হরসুন্দরী মুহূর্তের জন্যও হতাশ হইলেন না, বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত স্বামীর পরিচর্যা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

একদা নিশীথ সময়ে যখন সকলে সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিরামলাভ করিতেছিলেন, তখন পতিসেবাপরায়ণা সাধ্বী রোগক্লিষ্ট স্বামীকে বলিলেন "বহুজন্ম তপস্যার ফলে তোমা হেন স্বামীরত্ন পাইয়াছি, তোমার প্রসাদে এই অল্প দিনেই অশেষ সুখ সম্ভোগ করিয়াছি। এতদিন আমার কোন সাধই অপূর্ণ রাখ নাই, আজ একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে।" হরসুন্দরীর হৃদয় তখন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহা দমন করিয়া তিনি স্বামীর অনুমতি প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া হীনপ্রভ বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কালীকুমার ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "তোমার ন্যায় সাধ্বী রমণী-রত্ন লাভ করা কয়জনের অদৃষ্টে ঘটে জানিনা। মনে বড় দুঃখ রহিল যে তোমাকে অনাথিনী করিয়া চলিলাম। এতদিন হৃদয় ঢালিয়া তোমাকেই ভালবাসিয়াছি; তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই, অকপট চিত্তে তোমার প্রার্থনা জ্ঞাপন কর।" হরসুন্দরী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন "আমি তোমার সহধর্মিণী; সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে চিরদিনই তোমার সহচরী, তুমি চলিয়া গেলে আমি কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না, অনুমতি দাও, দাসীও তোমার সহগামিনী হইবে।" উচ্ছ্বসিত বাষ্পরাশি তরল হইয়া হরসুন্দরীর দু'নয়নে ছাপাইয়া পড়িল। কালীকুমার এই ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতীর মুখে এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং প্রথমত তাঁহাকে এ কঠোর সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বলিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে সতীর প্রতিজ্ঞা পর্বতবৎ অটল, তখন কালীকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। হরসুন্দরীর বদনমণ্ডল মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং হর্ষ চিত্তে স্বামীর চরণযুগল বক্ষে ধরিয়া ধ্যানস্তিমিতনেত্রে বসিয়া রহিলেন। পরদিন কালীকুমার বাইশ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সকলে শব লইয়া শ্মশানে গেল, অনতিবিলম্বে তথায় সর্বাবরণভূষিতা আলুলায়িতকুন্তলা একটি জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি উপনীতা হইলেন। হরসুন্দরী তদবস্থায় তথায় সমাগতা হইয়া সর্বজনসমক্ষে স্বামী-সহগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সহসা চারিদিকে হাহাকার উত্থিত হইল। সতীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কুলগুরু প্রমুখ বৃদ্ধগণ নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সতীর মন টলিল না। সিন্ধুর উদ্দেশে বেগবতী স্রোতস্বিনীর গতিরোধ করিতে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রভাতে কুলগুরু আবার বলিলেন "মা, তোমার স্বামী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, তুমি পোষ্য গ্রহণ না করিয়া সহমৃতা হইলে তোমার বিপুল সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে?" সতী তাহাতে স্বীকৃতা হইয়া বলিলেন "আপনারা অবিলম্বে সর্বগুণসম্পন্ন একটি পুত্র আনয়ন করুন আমি ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।" সতীর আদেশানুসারে পুত্র অন্বেষণার্থে লোক বাহির হইল। একদিন দুইদিন করিয়া ছয়দিন কাটিয়া গেল। মৃতদেহ পচিয়া গেল, অসংখ্য কীট উদ্ভূত হইয়া শব ছাইয়া ফেলিল। সতী এই কয়দিন কোন খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিলেন না; কেবল সূর্যাস্তের অত্যল্প পূর্বে মৃতদেহের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধৌত করিয়া সেই জল পান করিতেন। সপ্তম দিবসে আনীত একটি শিশু পুত্রকে যথাশাস্ত্র পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে বহুমূল্য[৮৮] মুক্তাহার পুত্রকে প্রদান করিলেন, পরিশেষে শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন "বাপ, তুমি যে বংশে আসিয়াছ, আশীর্বাদ করি সেই বংশের উপযুক্ত সন্তান হও।"

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন সতীদাহ-প্রথা নিবারণের চেষ্টা চলিতেছিল। সতীর অনিচ্ছায় কেহ তাহাকে দগ্ধ না করে ইহা দেখিবার জন্য প্রত্যেক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কীর্তিপাশার এই সংবাদ বরিশালে পৌঁছিলে তত্রত্য ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব প্রমুখ কয়েকজন সাহেব তথায় আগমন করেন। সাহেবগণ শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন

অগ্নির ন্যায় তেজস্বিনী আলুলায়িতকুন্তলা মূর্তিমতী সতী সহাস্যবদনে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সাহেবগণ যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া সতীকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। সতী কিছুতেই ফিরিলেন না। অতঃপর চিতা সজ্জিত হইল। হরসুন্দরী সস্নাতা হইয়া ক্রমে ক্রমে গাত্রস্থিত অলঙ্কারগুলি একে একে সমাগতা সধবা রমণীদিগকে বিলাইয়া দিলেন, তারপর সকলের নিকট হাস্যমুখে বিদায় লইয়া ধীর ধীরে স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন। চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইল। ধূ ধূ করিয়া অগ্নিরাশি জ্বলিয়া উঠিল। হরিধ্বনির গম্ভীর রবের সহিত অচিরে পুণ্যময় দেহ দুইটি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। সমাগত সাহেবগণ এবম্বিধ অলৌকিক কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ১২৩৫ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে সতীশিরোমণি স্বামীসহ অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবার জন্য মহাপ্রস্থান করিলেন।

রাজকুমার বৈষ্ণবগণের সঙ্গে হরিনাম-কীর্তনে মাতিয়া থাকিতেন; সংসারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারিতেন না। এদিকে অবসর পাইয়া কতিপয় বিদ্রোহী কর্মচারী জমিদারি আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

অতি অল্প বয়সেই রাজকুমার ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি একটা কঠিন ব্যাধিতে প্রায় অনেক সময়ই মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। এই রোগেই ইহার মৃত্যু হয়। ইহার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে ইহার পত্নীর মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন যে বিষপ্রয়োগে রাজকুমারের মৃত্যু হইযাছিল।

রাজকুমারের মৃত্যুকালে আমার পিতৃদেবের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। শত্রুরা অবসর পাইয়া স্বীয় স্বীয় অভীষ্টসাধনে যত্নবান হইল। অতি শৈশবে পিতৃমাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পিতৃদেব চিরবিশ্বস্ত অনুচর রাজচন্দ্র ভদ্র দ্বারা পালিত হইতে লাগিলেন। এই ভদ্র মহাশয় শত্রুদিগের যড়যন্ত্র পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন, তাই রাজকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই একমুহূর্ত কালও তাঁহাকে নয়নান্তরাল করেন নাই।

রাজকুমারের পত্নীর মৃত্যুসংবাদ প্রচাবিত হইবামাত্র সদাশয় ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের আদেশানুসারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রেলি তৎক্ষণাৎ কীর্তিপাশায় আগমন করেন। তিনি আসিয়া সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকা করিয়া অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্‌এর (Court of Wards) অধীনে আনিবার জন্য হুকুম প্রদান করতঃ পিতৃদেবকে সঙ্গে লইয়া বরিশাল চলিয়া আসেন। মহাত্মা রেলি সাহেব আমার পিতৃদেবের ও জমিদারির সম্যক্ অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া আমাকে এক বিস্তৃত চিঠি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য তাহার কতকাংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

"আমি যখন তোমাদের বাড়ি পৌঁছাছিলাম, তখন বেলা দশটার অধিক হয় নাই। সিংহদ্বার দিয়া পুর-প্রবেশ করিলে পর প্রথমত কয়েকজন কর্মচারী আমাকে সেলাম করিলেন। আমি তোমার পিতামহের বৈঠকখানায় পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, ঘরের বারান্দায় অনেকগুলি খট্টার উপর সামান্য মাদুরের বিছানা রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাষ্ঠ নির্মিত চাবি-বন্ধ সিন্দুক রহিয়াছে। আমি চাবি চাহিলে পর ... ... আমাকে চাবি দিলেন না। তারপর কামার ডাকিয়া তালা ভাঙ্গিয়া আমি সর্বসমক্ষে সেই সিন্দুক উদঘাটন করতঃ নগদ টাকা যাহা ছিল, তাহা গণিয়া তোড়া বন্ধনপূর্বক গভর্নমেন্টের সিলমোহর করিয়া আমার বিশ্বস্ত পেশকারের নিকট দিলাম। তোমার পিতাকে সে পর্যন্ত আমি দেখিতে পাই নাই, আমি তাহাকে দেখিতে চাহিলাম। অনতিবিলম্বে রাজু তাহাকে কোলে করিয়া আমার নিকট আনিল। তোমার পিতার বাহ্য চেহারা দর্শনে আমার যুগপৎ ক্রোধ এবং কষ্ট উপস্থিত হইল। তাহার সমস্ত শরীর অতিশয় শীর্ণ, পেট উঁচু এবং তাহাতে কাল কাল বড় শিরাসমূহ স্ফীত। অঙ্গের বর্ণ কালিমা প্রাপ্ত হইয়াছে, গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম যে শরীর উষ্ণ। প্রকৃতপক্ষে তোমার পিতার তখন যে প্রকার অবস্থা ছিল, তাহাতে যে সে অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহার আর কোন সন্দেহ ছিল না। আমি তারপর তোমাদের উত্তরের দ্বিতল কক্ষে গমন করিয়া দেখিলাম যে, কক্ষের প্রান্তভাগে একখানি মূল্যবান পালঙ্কোপরি সুন্দর শয্যা বিছান রহিয়াছে। ভাবিলাম, বোধ হয় তোমার পিতা ঐ শয্যায় শয়ন করিতেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ঐ শয্যায় তোমাদের ইষ্টদেবতা ঠাকুরগণ শয়ন করিতেন। এই কথা

জানিতে পারিয়া আমার বড়ই রাগ হইল। তখন প্রতীতি জন্মিল যে, নিশ্চয়ই ... ... তোমার পিতাকে নিহত করিবার জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছে, নচেৎ কেন তাহাকে নীচের তলায় অন্ধকূপের ভিতর রাখিয়া, নিজেরা মহাসুখে দোতলায় বাস করিবে? আমি অবিলম্বে স্বহস্তে শয্যা নিম্নে নিক্ষেপ করিলাম। আমার রাগ দর্শনে, ... অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। তারপর আমি তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'তুমি আমার সঙ্গে যাইবে।' সে আমার আকৃতি এবং রাগ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। তাই প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। আমার নৌকায়, আমার ছেলেদের খেলিবার কয়েকটা পুতুল ছিল; আমি তাহা আনাইয়া তোমার পিতাকে দিলাম। সে তখন মহাহর্ষান্বিত হইয়া, ধীরে ধীরে আমার ক্রোড়ে আসিল। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এখন আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত কিনা। তোমার পিতা প্রফুল্লবদনে স্বীকৃত হইল, কিন্তু রাজুকে কিছুতেই ছাড়িল না। রাজু, তোমার একজন জ্ঞাতি, তোমার পিতার মাতামহ এই কয়েকজন মাত্র সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তোমার পিতাকে আমার নৌকায় লইয়া আসিলাম। নৌকা খুলিবার সময় দেখিলাম যে, তীর হইতে কতকগুলি ঢাল-সড়কিওয়ালা লোক, আমার নৌকা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আমার সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল ছিল মাত্র। আমি একটা রিভলভার (Revolver) হাতে লইয়া নৌকার ছাদের উপর উঠিলাম। আমার হাতে বন্দুক দেখিয়া, ঢাল-সড়কিওয়ালার দল পিছে হটিল। আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে এই অস্ত্রধারী লোক ... ... প্রেরিত। আমার নিকট হইতে তোমার পিতাকে লইয়া যাওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমার স্বর্গত সহধর্মিণী তোমার পিতাকে পাইয়া অতিশয় যত্নপূর্বক লালনপালন করিতে লাগিলেন। আমার অন্যান্য পুত্র কন্যাদিগকে তিনি যে প্রকার স্নেহ ও যত্ন করিতেন, তোমার পিতাকেও তদপেক্ষা ন্যূন আদর করিতেন না। বর্তমানে যে দ্বিতল প্রকোষ্ঠে বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কাছারি করেন, তোমার পিতা রাজুর সহিত ঐ ঘরে বাস করিতেন। কোন শত্রু কর্তৃক রাত্রিতে তোমার পিতার প্রাণ বিনষ্ট না হয় এই জন্য আমার অনুমতি ক্রমে আটজন সঙ্গীনধারী কনস্টেবল প্রহরীর কার্যে সর্বদা দণ্ডায়মান থাকিত। এই প্রকার দুই তিন বৎসর তোমার পিতা বরিশালস্থ গভর্ণমেন্ট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন।"

সাহেবের ক্রোড়ে সুশিক্ষিত হইয়া উত্তরকালে সংসারক্ষেত্রে ইনি পাশ্চাত্য যুবজনোচিত কর্মদক্ষতা, সুশৃঙ্খলতা, সৌন্দর্যানুরাগ ও নিয়মপরায়ণতা প্রভৃতি গুণের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত পিতৃদেব 'নাবালক বাবু' নামে অভিহিত হইতেন।[১৯] সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি পরগনা সেলিমাবাদের জমিদারির একাংশ ক্রয় করেন।

স্বকীয় গ্রামবাসী ভদ্রলোকগণের সন্তানসন্ততির শিক্ষার সুবিধার্থ সুশিক্ষিত পিতৃদেব নানাবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৮৬৩ খ্রিঃ অব্দে ১লা জানুয়ারি একটি মধ্য-ইংরাজি স্কুল স্থাপন করিলেন।[২০] যদিও প্রথমত গ্রামবাসীগণের কাছে কোন সহানুভূতি পাইলেন না, তথাপি অচিরেই ইহা দ্বারা সুফল ফলিয়া উঠিল। ইহার পর দরিদ্র গ্রামবাসীগণের সুবিধার জন্য নিজ ব্যয়ে ১৮৭২ খ্রিঃ অব্দে একটি সুবৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

পিতৃদেব বহুগুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহবার চরিত্রে পরহিতৈষণা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা, লোকপ্রিয়তা ও সৌন্দর্যপরায়ণতা সম্যকরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১২৮৩ সনে ৩রা অগ্রহায়ণ তাঁহার মৃত্যু হয়।

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আমরা চারিভ্রাতা নাবালক ছিলাম, তাই মাতৃদেবী স্বহস্তে জমিদারির ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত কার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী ও দয়াবতী ছিলেন।

রায়েরকাঠির রাজা মাধবনারায়ণ আমাদের ষ্টেটের দশ হাজার টাকা ঋণী হইয়াছিলেন। এই টাকা সম্যক আদায় করিতে হইলে তাঁহার জমিদারি বিক্রয় না করিলে সঙ্কুলান হইবার সম্ভাবনা ছিল না; কারণ তখন তাঁহাদের জমিদারির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তিনি কৃপাপ্রার্থী হইয়া মাতৃসন্নিধানে আগমন করিলেন। জননী প্রকৃতই দয়াময়ী ছিলেন, তিনি সাহ্লাদে রাজাকে সেই দশ

হাজার টাকা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া খতখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মাধবনারায়ণ যতকাল জীবিত ছিলেন ততকাল পর্যন্ত এই উপকার বিস্মৃত হন নাই। তিনি সর্বসমক্ষে মাতৃদেবীর এই অসীম কীর্তিপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কালাচাঁদ পত্নীর প্ররোচনায় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমারকে যখন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একবৎসর কি দুই বৎসরের অধিক নহে। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার মাতা তারিণী চৌধুরাণী এবং ভগ্নীপতি বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

তারিণী চৌধুরাণীর স্বর্গারোহণের পর চন্দ্রকুমার স্বয়ং বিষয়কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন বলিয়া বৈষয়িক কুটিলতা বুঝিতে সমর্থ হইতেন না। তাঁহার সহধর্মিণী অত্যন্ত তেজস্বিণী এবং বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। চন্দ্রকুমারকে বৈষয়িক কার্যে অসমর্থ দেখিয়া, কর্মচারীগণ নানা প্রকার চাতুরি দ্বারা অর্থাপহরণ করিতে লাগিল। চন্দ্রকুমারের স্ত্রী এই সমস্ত জানিতে পারিয়া, স্বহস্তে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধি এবং তেজস্বিতা প্রশংসা যোগ্য। নিজ হস্তে বিষয় কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া, তিনি অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমারের কোন পুত্র হইল না দেখিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়। শশিকুমার চন্দ্রকুমারের পোষ্যপুত্র।

শশিকুমার বৈষয়িক কার্যভার গ্রহণ করিয়া, স্বীয় সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান এবং সদ্বক্তা ছিলেন; ইংরাজি এবং বাংলা লেখাপড়ায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে, তিনি অতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; পাখোয়াজ এবং তবলা বাজাইতে রায়েরকাঠির রাজবংশের অন্যতম বংশধর রাজা নরনারায়ণ রায় মহাশয়ের পর তাঁহার ন্যায় বাকরগঞ্জ জেলায় আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। শশিকুমার একজন সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন; তাঁহার প্রণীত হরিসঙ্কীর্তন বড়ই মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী।

বাসণ্ডার মহলানবীশগণ এই জেলায় বৈদ্য জমিদারগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বংশের জয়দেব মহলানবীশের কন্যা রামমালার সহিত কীর্তিপাশার মহাত্মা রাজারাম সেনের বিবাহ হইয়াছিল এবং এই সূত্রে জয়দেবের চারিপুত্র ও পৌত্র কিশোরচন্দ্র কীর্তিপাশার জমিদারের অধীনে কার্য করিতেন। কিশোরচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র জগবন্ধু অত্যন্ত সদাশয় ও পরোপকারী ছিলেন; জনসাধারণের অশেষবিধ উপকার সাধন করিয়া তাহাদের আশীর্বাদভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যোগেশচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

পুরাতন বাটির কালীকুমার সেন মহাশয় ঢাকা নবাব বাহাদুরের দেওয়ানি কার্য করিতেন, তদ্দ্বারা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত কর্মঠ, ন্যায়পরায়ণ এবং বিচক্ষণ ছিলেন। বর্তমানে তাঁহার বংশধরগণই বাসণ্ডার জমিদারগণের অন্যতম।

পরবর্তী জমিদারগণের মধ্যে চন্দ্রনাথ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইনি নিজ ব্যয়ে বরিশালে একটি 'কলেরা ওয়ার্ড' স্থাপন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উপেন্দ্রনাথ যোগ্যতার সহিত জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

পরাক্রান্ত মহলানবীশবংশের বাসস্থান বলিয়াই বাসণ্ডার প্রধান গৌরব নহে। বাসণ্ডা বঙ্গভাষার গৌরব চণ্ডীচরণ সেনের জন্মভূমি। ইনি ও ইহার কন্যা শ্রীমতী কামিনী সাহিত্যসমাজে দুইটি অনন্যাসাধারণ প্রতিভা। ইহার দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী যামিনী এল্. এম্. এস্. পাশ করিয়া এই জেলার বিশেষ গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। ইহাদের সম্যক্ বিবরণ স্থানান্তরে উল্লেখ করিব।

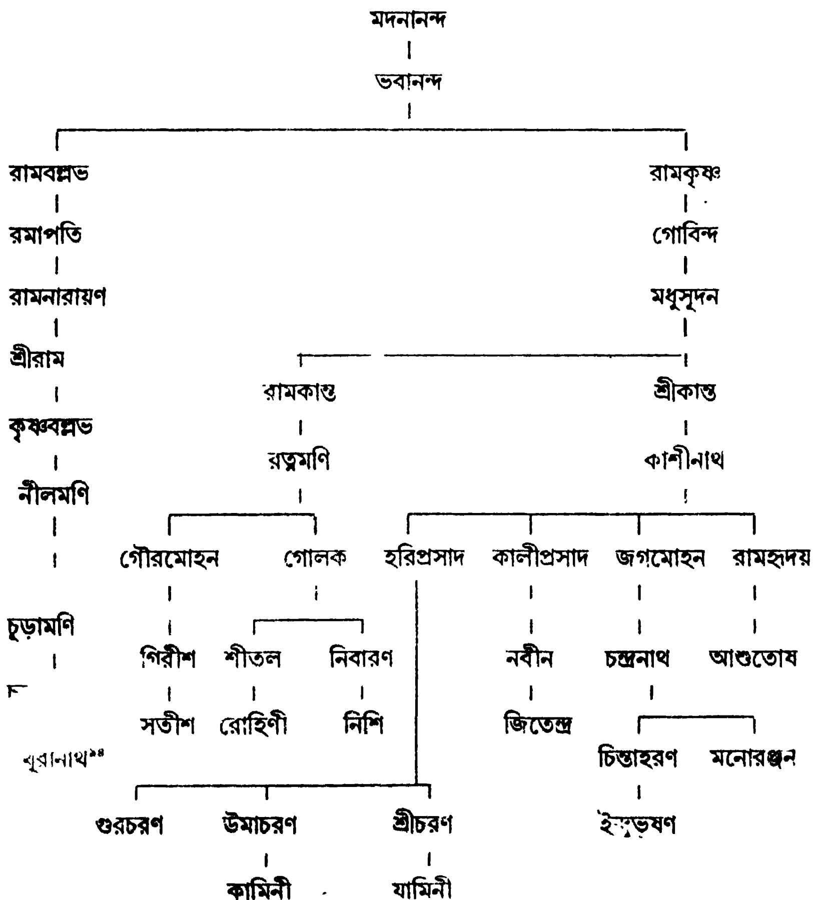
বাসণ্ডার গ্রাম্যদৃশ্যটি অতীব মনোরম। দেখিলেই মনে হয় যেন প্রকৃতিরানী বনরাজিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্যসম্ভার ঢালিয়া রাখিয়াছেন।

কেওরার চৌধুরিবংশ পোনাবালিয়ার বিখ্যাত জমিদারবংশের শাখা মাত্র। সেনভূমিপতি রাজা শ্রীহর্ষ সেনের অন্যতম বংশধর রামকৃষ্ণ হাবিলী সেলিমাবাদের জমিদার নরেন্দ্র রায় গুপ্ত চৌধুরির শিবদা ও সারদা নাম্নী কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করিয়া পোনাবালিয়া সন্নিহিত দেউরি গ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র গোপীবল্লভ,[১১] রাজীবলোচন বিশারদ, শ্রীরাম, রামজীবন[১১]

ও গোবিন্দ। শ্রীরাম ও গোবিন্দই যথাক্রমে পোনাবালিয়া ও কেওরার চৌধুরিগণের আদিপুরুষ। শ্রীরামের কীর্তিমান বংশধরগণের বিস্তৃত বিবরণ হাবিলী সেলিমাবাদের ইতিহাসে প্রদত্ত হইবে, গোবিন্দের বংশধরগণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গোবিন্দ মাতামহের (নরেন্দ্র চৌধুরির) স্বর্গারোহণের পর তাঁহার সম্পত্তির একাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র নারায়ণ, মধুসূদন ও জনার্দন। গোবিন্দের পুত্রগণ পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ হন নাই। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কঠোর শাসনে তাঁহারা জমিদারি ইস্তাফা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

জমিদারি ইস্তফা প্রদান করিয়া গোবিন্দের সন্তানগণ কেওরা গ্রামে আগমন করেন। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের ভ্রাতুষ্পুত্র রমাপতি সেন কবিবল্লভ পূর্বেই কবিকঙ্কণ গুপ্তের কন্যা বিবাহ করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। এইক্ষণে গোবিন্দের সন্তানগণ আসিয়া কবিবল্লভবংশের সহিত মিলিত হইলেন। গোবিন্দের বংশধরগণ বুদ্ধিবলে নূতন ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারে বহুল পরিমাণে কৃতকার্য হন। বর্তমান সময়ে কেওরার চৌধুরিগণ সেলিমাবাদ পরগনার একটি শ্রেষ্ঠ জমিদার বংশ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের ও রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রমাপতি সেন কবিবল্লভের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।



গোবিন্দের প্রপৌত্রতনয় কালীপ্রসাদ চৌধুরি পাড়েরহাট, গারুড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটি জমিদারির বরিশালস্থ প্রধান কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামহৃদয় ওকালতি করিতেন। ভ্রাতৃদ্বয় প্রভূত অর্থ ও ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া নিজ গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। পূর্বে কেওরায় লোক সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। কালীপ্রসাদ ব্রহ্মোত্তর এবং বৃত্তি প্রভৃতি প্রদান করতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি নানাজাতীয় অনেক লোক আনয়ন করিয়া অধিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি লোকহিতার্থ নিজ গ্রামে একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। কমিশনার বাহাদুর তাঁহার বহুবিধ সৎকার্যদর্শনে প্রীত হইয়া সুন্দরবনস্থিত সূতালড়ি, গজালিয়া প্রভৃতি সাতটি চক তাঁহাকে পাট্টা প্রদান করেন। এই সকল স্থান আবাদের নিমিত্ত কালীপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুচরণ ব্রতী হইলেন। বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, গুরুচরণ আরব্ধ কার্যে সাফল্য লাভ করেন। অগ্রজের দৃষ্টান্তে রামহৃদয়ও সূতালড়িতে একটি অতিথিশালা স্থাপন করেন। তিনি দশ গণ্ডা জমিদারি ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর কালীপ্রসাদের পুত্র স্বনামখ্যাত নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরি দশ গণ্ডা অংশ ক্রয় করেন। পিতা, পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠতাতভ্রাতা গুরুচরণের মৃত্যুর পর তিনি একাকী সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি স্থানীয় অধিবাসীগণের সুশিক্ষার নিমিত্ত কেওরায় একটি মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং অবস্থানুসারে অর্থ সাহায্য করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের ভ্রাতুষ্পুত্র রমাপতি সেন কবিবল্লভের বংশধরগণ সেলিমাবাদের ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই বংশের চন্দ্রমোহন সেন বিশেষ প্রসিদ্ধ। চন্দ্রমোহনের বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশ বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতৃস্বসা যশোদাদেবীর স্বামীও ঐ সময়ে লোকান্তরিত হন। পতির মৃত্যুর পর স্নেহময়ী যশোদা শিশুপুত্র গুরুদাস গুপ্তকে লইয়া পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহে আগমন করেন। প্রতিভাবলে চন্দ্রমোহন ও গুরুদাস অনেক ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া শীঘ্রই গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিলেন। চন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মথুরানাথ সেন বি. এল্ বরিশাল ডিষ্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডের সদস্য পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিবিধপ্রকার লোকহিতকর কার্যানুষ্ঠান দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন।

জলাবাড়ির বিশ্বাসবংশ বর্তমানে এই জেলার কায়স্থ জমিদারগণের শীর্ষস্থানীয়। ইহাদের পূর্বপুরুষ প্রাণনারায়ণ ও প্রতাপনারায়ণ রায়েরকাঠির রাজসরকারে কার্য করিতেন। রাজা জয়নারায়ণের স্বর্গারোহণের পর যখন তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়, তখন ইহারা জ্যেষ্ঠ শিবনারায়ণের পক্ষাবলম্বন করেন। রাজা শিবনারায়ণ, প্রাণনারায়ণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। প্রাণনারায়ণও বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কর্তব্যকার্য সম্পাদন করিয়া রাজানুগ্রহ লাভ করেন। এই সময়ে সেলিমাবাদের অনেক উর্বর ভূমিখণ্ড অরণ্য ও বিলে সমাচ্ছন্ন ছিল; প্রাণনারায়ণ, রাজার নিকট এইরূপ কতিপয় স্থানের জিম্মা প্রার্থনা করিলেন। রাজা শিবনারায়ণ পূর্বেই তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট ছিলেন সুতরাং অবিলম্বে তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এই সময় হইতেই জলাবাড়ির জমিদারির সূত্রপাত হয়। কথিত আছে প্রাণনারায়ণ যখন জলপথে সেলিমাবাদের পশ্চিম অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন একস্থানে কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। পূর্বকালে বঙ্গের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ দস্যু তস্করের ভয়ে মৃত্তিকা মধ্যে তাহাদের সঞ্চিত ধন রাখিতেন। প্রাণনারায়ণ সম্ভবত এই রূপ কোন সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

প্রাণনারায়ণের দুই পুত্র, কৃষ্ণসুন্দর ও দ্বারিকানাথ। দ্বারিকানাথের পাঁচ পুত্র, কালীনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, তারকনাথ, উপেন্দ্রনাথ এবং কৈলাসনাথ; ইহারা বর্তমান সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত জমিদারির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

প্রাণনারায়ণের ভ্রাতা প্রতাপনারায়ণের বংশধরগণও বিশেষ সমৃদ্ধশালী। ইহাদের মধ্যে শ্রীনাথ,

ক্ষেত্রনাথ, হরিমোহন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিমোহন একজন প্রসিদ্ধ উকিল। এই বিশ্বাস পরিবার বরিশাল জেলায় বিশেষ সমৃদ্ধশালী।

আমড়াজুরির দত্তগণ সেলিমাবাদের কায়স্থ ভূস্বামীগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের পূর্বপুরুষ সর্বপ্রথম 'নিমক মহালের' দারোগার কার্য করিতেন। পরে রায়েরকাঠির রাজবংশের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। এই বংশের কাশীনাথ দত্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেলিমাবাদ ব্যতীত সাহাজাদপুর পরগনায়ও ইহাদের ভূসম্পত্তি আছে। কাশীনাথের পুত্র হরনাথ দত্ত ঐতিহাসিকপ্রবর বেভারিজের সময়ে সাহাজাদপুর পরগনার একজন প্রধান অংশীদার ছিলেন।

সাতুরিয়ার মিঞাগণের পূর্বপুরুষ সেখ সাহাবুদ্দিন রায়েরকাঠিতে চাকরি করিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজসরকার হইতে কতক তালুক প্রাপ্ত হইয়া সুক্তাগড় নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি একজন স্বধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং এদেশে ফকির বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহার নয় পুত্র ছিল। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান পূর্বক সুক্তাগড় হইতে সাতুরিয়ায় বাসস্থান স্থাপন করেন এবং অনেক ভূসম্পত্তি সঞ্চয়পূর্বক বিশেষ বিখ্যাত হইয়া পড়েন। পিতার জীবদ্দশায়ই উপযুক্ত পুত্রগণ জমিদারির উন্নতিকল্পে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন।

এই সমৃদ্ধিশালী মিঞাগণের আদিপুরুষ সাজেদাঁ একজন ফকির ছিলেন। যখন স্বনামপ্রসিদ্ধ খাঞ্জেআলি এদেশে আগমনপূর্বক বিবিধ লোকহিতকর কার্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন সাজেদাঁ ফকির তাঁহার সহচর ছিলেন। এই উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ছিল, এবং উভয়ই অত্যন্ত সদাশয় ও পরোপকারী ছিলেন। খাঞ্জেআলির সহিত সাজেদাঁ এদেশে আগমন করিয়া বাগেবহাটের অন্তর্গত হাবেলি গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। এই স্থানে তাঁহার সন্তানসন্ততিগণও ফকিরি করিতেন। কতিপয় বৎসর পরে ঐ বংশের সাহাবুদ্দিন রায়েরকাঠিতে চাকরি করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার সময় হইতেই ইহাদের জমিদারির পত্তন হয়।

এই বংশের দ্রোহতুল্লা ও আবদুল আজিজ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন, তাঁহাদের বিবিধ কার্যাবলী এখনও এ জেলার অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। এই মুসলমান পরিবার বরিশাল জেলায় বিশেষ সম্মানিত; সায়েস্তাবাদের সম্ভ্রান্ত মীরগণের সহিত ইহাদের বৈবাহিক ক্রিয়াদি হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে বিবি মেহেরুন্নসা খাতুনের নাম বিশেষ বহুলোকের আশীর্বাদের পাত্রী হইয়াছেন। ইহারই যত্নে ও অর্থব্যয়ে সাতুরিয়ায় পোস্টাফিস, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ইঁহার জামাতা, সায়েস্তাবাদের জমিদারবংশের অন্যতম বংশধর সৈয়দ ওবেদুল্লা সাতুরিয়ায় বাস করিতেছেন। ইনি পরোপকারী, বিনয়ী ও শিক্ষিত।

৫ হাবেলি সেলিমাবাদ

এই পরগনা পূর্বে সেলিমাবাদের অন্তর্গত ছিল। মিঃ বেভারিজ্ লিখিয়াছেন—This has evidently been formed out of pargana Selimabad. The Word havili implies that the tract was stipendiary or demesne land of the Zemindar—that is, it was the land appropriated to his own use. অর্থাৎ তন্মে হাবেলি সেলিমাবাদ, সেলিমাবাদ হইতে গঠিত হইয়াছে। জমিদারের নিজ ব্যয় নির্বাহার্থ এই স্থান নির্দিষ্ট ছিল। অদ্যাপি ইহার নয় আনা অংশ সেলিমাবাদের জমিদারির অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।[৩৩] অবশিষ্ট সাত আনা মূল সেলিমাবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র পরগনায় পরিণত হইয়াছে।

সৈদয়পুর পরগনা পূর্বে হাবেলি সেলিমাবাদের অন্তর্গত ছিল। ভগীরথ সিং নামক জনৈক কানুনগোই কর্তৃক ইহা পৃথকীভূত হইয়া গিয়াছে।[৩৪] অন্যথা এই পরগনার আকার দ্বিগুণ অপেক্ষাও বৃহৎ হইত। ইহার বার্ষিক রাজস্ব ১১০৫৫।।৵৬ পাই মাত্র।

ভারতপ্রথিত ত্রম্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ[৩৫] এই পরগনায় শ্যামরাইল বা হাজরাগাতি নামক স্থানে অবস্থিত। এই স্থান "পোনাবালিয়া শিববাড়ি" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারই প্রান্ত বিধৌত করিয়া

সুগন্ধানাম্নী গঙ্গাস্রোত প্রবাহিত ছিল। বহুকাল হইল এই নদীর অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, কিন্তু পোনাবালিয়া শ্যামরাইল প্রভৃতি স্থান অদ্যাপি সোন্দারকূল বলিয়া পরিচিত। সম্ভবত প্রাচীন "সোন্দারকূল" পরগনা এই সমস্ত স্থান ও সুগন্ধাগর্ভোৎপন্ন ভূখণ্ড লইয়া গঠিত হইয়াছিল। সেলিমাবাদ সৃষ্টি হইলে এই পরগনার নাম বিলুপ্ত হইয়া সেলিমাবাদভুক্ত হইয়া থাকিবে।

বাদশাহী আমলে নরেন্দ্র রায় গুপ্তচৌধুরি নামক জনৈক বৈদ্যসন্তান তপ্পে হাবেলি সেলিমাবাদের চারি আনা জমিদারি লাভ করিয়া ঝালকাঠির অধীন পোনাবালিয়া গ্রামের সন্নিহিত আতাকাঠি নামক স্থানে আগমন করেন।[৯৮] আতাকাঠি এখনও তাঁহার কীর্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি এই স্থানের অরণ্য পরিষ্কৃত করিয়া সুবৃহৎ অট্টালিকা, নির্মল সলিলা দীর্ঘিকা, প্রশস্ত রাজবর্ত্ম নির্মাণ করিয়াছিলেন গুপ্তচৌধুরির বাটির ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। ইহারই সিংহদ্বার হইতে দেউরি গ্রামের নামোৎপত্তি। গুপ্তচৌধুরির দিঘি এই দেউরি গ্রামে অবস্থিত। এই দিঘি এইক্ষণে ভরিয়া গিয়াছে, ইহার দক্ষিণ তীর হইতে শিববাড়ি, চাঁদপুরা, সেওতা, খুলনার মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্বে বহুদূর একটি রাস্তা বিস্তৃত রহিয়াছে, উহা "গুপ্তচৌধুরির জাঙ্গাল" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নরেন্দ্র চৌধুরির দৌহিত্রবংশোদ্ভব কুলকাঠি ও পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের বংশতালিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার সময় হইতে বর্তমানে (১৯০৪ খ্রিঃ অব্দ) একাদশ পুরুষ (generation) অতিক্রান্ত হইয়া দ্বাদশ পুরুষ চলিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি ঐতিহাসিকগণ এক পুরুষে ত্রিশ বৎসর গণনা করেন। ১১×৩০ = ৩৩০, এই হিসাবে ১৯০৪–৩৩০ = ১৫৭৪ খ্রিঃ অব্দ নরেন্দ্র চৌধুরির জন্মকাল হয়।

অরবিন্দকুলসম্ভূত রামকান্ত দাশ কবিকণ্ঠহার ১৫৭৫ শকে[৯৯] অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রিঃ অব্দে সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। নরেন্দ্র ইহার তিন পুরুষ (generation) পূর্ববর্তী,[১০০] ইহাতে ৩০×৩ = ৯০ বৎসর ধরা যায়। এই হিসাবে ১৬৫৩–৯০ = ১৫৬৩ খ্রিঃ অব্দ নরেন্দ্র চৌধুরির সময় হয়। অতএব ১৫৬৩—৭৪ খ্রিঃ অব্দ নরেন্দ্র চৌধুরির আবির্ভাব কাল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

১৬০৩ খ্রিঃ হইতে ১৬০৫ অব্দের মধ্যে সেলিমাবাদ সৃষ্ট হয়[১০১]। তপ্পে হাবেলি সেলিমাবাদ সেলিমাবাদ হইতে গঠিত, অতএব ইহার সৃষ্টি ১৬০৫ খ্রিঃ অব্দের কিয়ৎকাল পরে হইয়াছে বলিতে হইবে। ১৬৫৩ খ্রিঃ অব্দে রচিত সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকায় নরেন্দ্র গুপ্ত "রায়" ও "সেলিমাবাদবাসী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।[১০২] অতএব গুপ্তচৌধুরি ১৬০৫ হইতে ১৬৫৩ খ্রিঃ অব্দের মধ্যে হাবেলি সেলিমাবাদের জমিদারি (চারি আনা) লাভ করিয়া অস্মদ্দেশে আগমন করেন ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সেই সময়ে সুতালড়ির ঘোষ চৌধুরিগণ তিন আনা অংশ প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট নয় আনা রায়েরকাঠির রাজবংশের অধীন ছিল। উত্তরকালে নরেন্দ্র গুপ্ত চৌধুরির দৌহিত্র-তনয় রামভদ্র রায় চৌধুরী ঘোষ, চৌধুরিগণের অংশ গ্রহণ করায় গুপ্ত চৌধুরির দৌহিত্রবংশ সাত আনা জমিদারির মালিক হইলেন।

নরেন্দ্র চৌধুরী উচলিবংশীয় শ্রীনায়কাখ্য শ্রীরাম রায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার এক কন্যার সহিত উচলিবংশোদ্ভব রমানাথ সেনের পুত্র রামচন্দ্র সেনের বিবাহ হয়. শিবদা ও সারদা নাম্নী অপর দুই কন্যাকে রোষবংশোদ্ভব রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব বিবাহ করেন। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব হইতেই পোনাবালিয়া, কুলকাঠি, বারইকরণ, দেউরি ও কেওরার চৌধুরি বংশের উদ্ভব হইয়াছে।

ধন্বন্তরি বংশোদ্ভব রাজা শ্রীহর্ষ সেন, রায়কৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের আদি পুরুষ। রাজা শ্রীহর্ষ বর্তমান মানভূম জিলার অন্তঃপাতী সেনভূমে কাঞ্চীগাঁ নগরে রাজত্ব করিতেন।[১০৪] তাঁহার দুই পুত্র কমল ও বিমল। জ্যেষ্ঠ কমল পিতৃরাজ্য লাভ করেন, বিমল মহারাজ বল্লাল সেন প্রদত্ত কৌলীন্য গ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশে আগমন করেন ; তৎপুত্র বিনায়ক সেন গৌড়েশ্বর হইতে গজ, কনকছত্র এবং

বহুবিধ রত্ন প্রাপ্ত হইয়া ভাগীরথী তীরস্থ মালঞ্চ গ্রামে বাসস্থান নির্ধারণ করেন।[১০৫] বিনায়কের তিন পুত্র রোষ, ২য় ধন্বন্তরি, কাপড়ি[১০৬] রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে মহামতি রোষ কুলেশীলে, গুণে বৈদ্য জাতির শীর্ষস্থানীয় ছিলেন : —

পিতেব বৈদ্যেষ বভুবমুখ্যঃ কুলেন শীলেন গুণৈঃ শিয়াচ।
যো রোষসেনোহস্য মহামহিয়ঃ বংশাবলীং শ্রীভরতো জগাদ।। (রত্নপ্রভা ২৬ পৃঃ)
বিনায়কস্য পুত্রো যো জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠো বিষক্‌কুলে।
রোষসেনোহত্র মালঞ্চ তদ্বংশ্যাঃ সুপ্রতিষ্ঠতা।। (চন্দ্রপ্রভা ১৬ পৃঃ)

রোষের পুত্র নারায়ণ, তৎ পুত্র সাঙু সেন।[১০৭] সুবিখ্যাত বৈদ্যক-গ্রন্থ চক্রদত্তের সংগ্রহ-তত্ত্বচন্দ্রিকা নামক টীকাকার রোষকুলপঙ্কজ শিবদাস সেন নিজ পূর্বপুরুষগণের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে সাঙু সেন (সাহিসেন) শিখরভূমির রাজসভায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সার্বভৌম কবিকে পরাভূত করিয়া প্রভূত যশ অর্জন করেন।[১০৮] তাঁহার কুমার, কাকুৎস্থ প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মে। কুমারের পৌত্র কৃষ্ণখাঁ ও হরিহরখাঁ বংশপ্রভব রোষসেনগণ অদ্যাপি রাঢ়দেশে সর্বোচ্চ শ্রেণীর কুলীন বলিয়া সম্মানিত। কাকুৎস্থকেও কবি কণ্ঠহার 'কুলভূষণ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[১০৯] তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীধর (লক্ষ্মীপতি), তৎপুত্র শুভঙ্কর, শুভঙ্করের পুত্র মদন সেন। কুলকাঠিব চৌধুরিগণের মতে ইনিই রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের পিতামহ মদনানন্দ সেন কবিভূষণ।[১১০] মদন সেনের পুত্র ভবানন্দ কবিচন্দ্র। ভবানন্দের সহধর্মিণী কমলা দেবীর গর্ভে রামবল্লভ ও রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব জন্মগ্রহণ করেন।

রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের কুলগ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বিনায়ক হইতে কাকুৎস্থ পর্যন্ত রামকৃষ্ণের পূর্বপুরুষগণ ভাগীরথী তীরস্থিত মালঞ্চ নগরে বাস করিতেন।[১১১] শিবদাস সেন কৃত চক্রদত্ত টীকায় লিখিত আছে কাকুৎস্থপুত্র লক্ষ্মীধরও মালঞ্চ নিবাসী ছিলেন।[১১২] লক্ষ্মীধরের কনিষ্ঠ পুত্র শুভঙ্কর ও তৎপুত্র মদন কোন স্থানে বাস করিতেন তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। প্রবাদ যে মদনানন্দ বিক্রমপুরান্তর্গত কাঁচাদিয়া গ্রামে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে তদীয় পৌত্র রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব অস্মদ্দেশে আগমন করেন। অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন লক্ষ্মীধরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র বিদ্যাধবেব সন্তানগণ বিক্রমপুরে গমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মদনানন্দ প্রমুখ রোষসেনগণের বিক্রমপুববাসের কোন প্রমাণ নাই। কণ্ঠহারও লিখিয়াছেন—

বিক্রমপুরেহি তিষ্ঠন্তি বিদ্যাধরকুলোদ্বহাঃ।
অন্যেচ রোষকুলজা নানাস্থানমুপাগতাঃ।।

পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের কুলপুরোহিত নাগপাড়ার চক্রবর্তীগণ রাঢ়দেশ (বাঁশবেড়ে) হইতে সমাগত। কুলকাঠির চৌধুরিগণের গুরুগণও (যশোহরের কাজুলিয়া) উক্ত প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছেন। অতএব পোনাবালিয়া ও কুলকাঠির চৌধুরিগণের পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণের রাঢ় হইতে আগমন অসম্ভব নহে।

রামকৃষ্ণ এদেশে আগমন করিয়া নবেন্দ্র চৌধুরির শিবদা ও সারদা নাম্নী কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন। শিবদাস গর্ভে গোপীবল্লভ, সারদার গর্ভে রাজীবলোচন, শ্রীরাম, রামজীবন ও গোবিন্দ এই পাঁচ পুত্র জন্মে।

নরেন্দ্র চৌধুরির স্বর্গারোহণের পর তাঁহার দৌহিত্রগণ তদীয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। গোপীবল্লভ জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন এক আনা অংশ প্রাপ্ত হইয়া বারইকরণ গ্রামে বাসস্থান নির্ধারণ করেন। অবশিষ্ট তিন আনা অন্যান্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হয়। যতদূর জানা যায় রাজীবলোচন, শ্রীরাম, রামজীবন ও গোবিন্দ দেউরি গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীরামের কীর্তিকলাপের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।[১১৩] তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তৎপুত্র রামভদ্র রায় চৌধুরি অতি যোগ্যতার সহিত পৈত্রিক সম্পত্তি বক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে এইরূপ কার্য

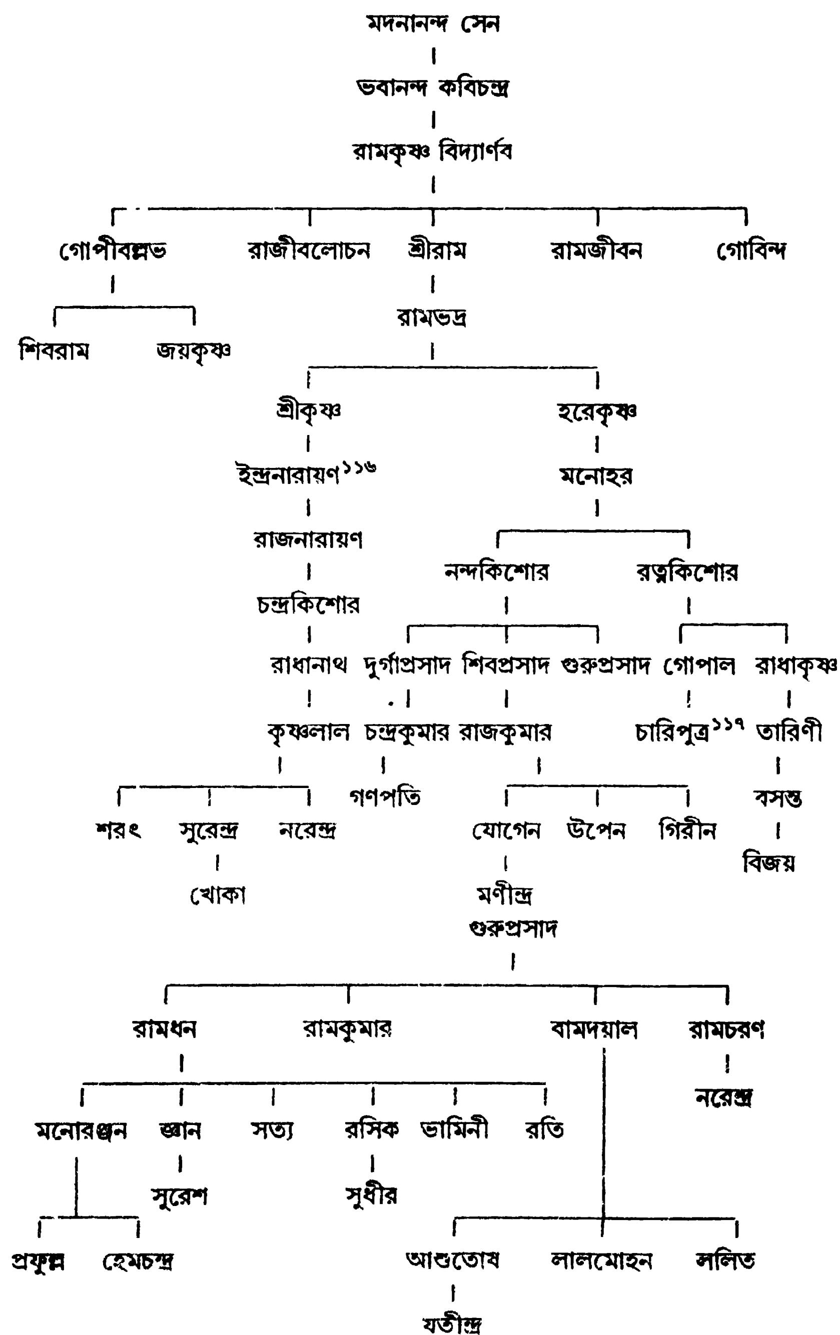
নিতান্ত সহজ ছিল না, কারণ এই সময়ে বঙ্গীয় জমিদারকুলের কৃতান্ত স্বরূপ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সুবেবাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে যে দৃঢ়নীতি অবলম্বন করেন তাহাতে হাবেলি সেলিমাবাদের জমিদারবর্গের মধ্যে অনেকেই জমিদারি ইস্তফা দিতে বাধ্য হ'ন। গুপ্ত চৌধুরির দৌহিত্রবংশে কেবল গোপীবল্লভের পুত্র শিবরাম এবং শ্রীরামতনয় রামভদ্র রায় নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবাব রামভদ্রের শৌর্য, বীর্য ও কার্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া শিবরাম ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর জয়কৃষ্ণের এক আনা অংশ ব্যতীত গুপ্ত চৌধুরীর দৌহিত্র বংশের অপর তিন আনা অংশ তাঁহাকে প্রদান করেন ; সুতালড়ির ঘোষ চৌধুরিগণের তিন আনাও এই সময়ে রামভদ্রের প্রতি অর্পিত হয়। এইরূপে রামভদ্র পরগনার প্রায় সমুদয় অংশের আধিপত্য লাভ করিলেন। তিনি দেউরির সন্নিহিত কিসমৎ নবরঙ্গপুরে বাটি প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহাই বর্ত্তমান পোনাবালিয়া। এই সময় হইতেই পোনাবালিয়া হাবিলী সেলিমাবাদের রাজধানী স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।[১১৪]

উল্লিখিত ঘটনার পর রামভদ্র রায় চৌধুরি সেলিমাবাদ হইতে নিজ সম্পত্তি পৃথক করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শিবরামের কনিষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ এই কার্য সাধনার্থ মুর্শিদাবাদে গমন করেন; রায়েরকাঠির পক্ষ হইতে দেওয়ান মহাত্মা কৃষ্ণরাম সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীরাম সেন প্রেরিত হইলেন। অসাধারণ বুদ্ধিবলে জগন্নাথ নিজ কার্যোদ্ধারে সমর্থন হইলেন। ফলে তপ্পে হাবেলি সেলিমাবাদের সাত আনা অংশ (রামভদ্রের ছয় আনা শিবরাম ও জয়কৃষ্ণের এক আনা) মূল পরগনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র পরগনায় পরিণত হয়। পোনাবালিয়ার অদূরবর্তী মধিপুর গ্রামে রামভদ্র কাছারিবাটি সংস্থাপিত করেন।

মহামতি রামভদ্র জমিদারির উন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পরগনার অধিবাসী সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। বহুস্থল পদ্মবনসমাকীর্ণ সলিলরাশি অথবা হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। রামভদ্র ও তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় বাঁশবেড়ে, হরিষণা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থসন্তান আনয়ন পূর্ব্বক অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দেউরির জ্ঞাতিবর্গকে তালুকাদি প্রদান করিয়া তাহাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে চৌষট্টি খানি তালুক সৃষ্ট হয়। রামভদ্র ও তৎবংশধরগণ ত্র্যম্বক ভৈরবের নিয়মিত সেবার জন্য যে সকল দেবোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এখনও বর্তমান আছে।

রামভদ্রের জীবনের শেষভাগে অস্মদ্দেশে বর্গিয় হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। যখন দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণের অত্যাচারের নিম্নবঙ্গ প্রায় উৎসাদিত, অধিবাসীগণ বর্গীয় ভয়ে স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষার্থ অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত হইত, তখন রামভদ্র রায় অকুতোভয়ে এই দুর্বৃত্তদিগের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে সোন্দারকূল হইতে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন।[১১৫] আজকাল আমরা ভীরু এবং অকর্মণ্য বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমাদিগের পিতৃপুরুষগণের ইতিহাস এবং কীর্তি সমালোচনা করিলে বোধহয় প্রতীয়মান হইবে যে বাঙ্গালি পূর্বে ভীরু এবং অকর্মণ্য ছিল না; তখন তাহাদিগের বাহুতে শক্তি এবং হৃদয়ে সাহস ছিল। রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, শিখ, গুর্খা প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য মহাজাতির যে কারণে অধঃপতন হইয়াছে, বাঙ্গালির প্রতিও সেই কারণ উপলব্ধি হইতে পারে, তবে রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়াদি জাতির পতন আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু বাঙ্গালির অবস্থা পাইতে এখনও বিলম্ব আছে।

রামভদ্র রায়ের কর্মবহুল জীবনের অনেক বিষয় অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত, হাবেলি সেলিমাবাদের জমিদারগণ মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ; তাঁহার পত্নী সুন্দরী দেবী পুণ্যবতী রমণী ছিলেন। রামভদ্রের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।


মদনানন্দ সেন
ভবানন্দ কবিচন্দ্র
রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব
গোপীবল্লভ
রাজীবলোচন
শ্রীরাম
রামজীবন
গোবিন্দ
শিবরাম
জয়কৃষ্ণ
রামভদ্র
শ্রীকৃষ্ণ
হরেকৃষ্ণ
ইন্দ্রনারায়ণ১১৬
মনোহর
রাজনারায়ণ
নন্দকিশোর
রত্নকিশোর
চন্দ্রকিশোর
রাধানাথ
দুর্গাপ্রসাদ
শিবপ্রসাদ
গুরুপ্রসাদ
গোপাল
রাধাকৃষ্ণ
কৃষ্ণলাল
চন্দ্রকুমার
রাজকুমার
চারিপুত্র১১৭
তারিণী
গণপতি
বসন্ত
শরৎ
সুরেন্দ্র
নরেন্দ্র
যোগেন
উপেন
গিরীন
বিজয়
খোকা
মণীন্দ্র
গুরুপ্রসাদ
রামধন
রামকুমার
বামদয়াল
রামচরণ
নরেন্দ্র
মনোরঞ্জন
জ্ঞান
সত্য
রসিক
ভামিনী
রতি
সুরেশ
সুধীর
প্রফুল্ল
হেমচন্দ্র
আশুতোষ
লালমোহন
ললিত
যতীন্দ্র

রামভদ্র রায়ের দুই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় ও হরেকৃষ্ণ রায়। হরেকৃষ্ণ পিতার স্বর্গারোহণের অত্যল্পকাল পরেই মানবলীলা সংবরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ রায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া হাবেলি সেলিমাবাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কার্যদক্ষতা ও বিষয়বুদ্ধিতে তিনি পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সময়ে শিববাড়িব অনেক অরণ্য পরিষ্কৃত হইয়া লোকালয়ে পরিণত হয়। বিখ্যাত কালাচাঁদ বিগ্রহেব নিয়মিত সেবা নির্বাহার্থ অনেক দেবোত্তর প্রদত্ত হয়। সেলিমাবাদের বৈদ্য জমিদারগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ রায়ই সর্বপ্রথম কুলক্রিয়া আরম্ভ করেন।[১১৮]

হরেকৃষ্ণের স্বর্গারোহণকালে তদীয় পুত্র মনোহর কিশোরবয়স্ক ছিলেন। হরেকৃষ্ণের পত্নী জানকী দেবী সম্ভবত পতির পূর্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত এবং এক ধাত্রী ভিন্ন পিতৃমাতৃহীন বালকের আপনার বলিতে কেহই ছিল না। একদা শ্রীকৃষ্ণ রায় জ্ঞাতি ও কর্মচারীবর্গের সাক্ষাতে বলিলেন "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, শীঘ্রই আমাকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা যে আমার পাঁচ পুত্র (ইন্দ্রনারায়ণ, প্রেমনারায়ণ, কৃষ্ণকিঙ্কর, শিবচন্দ্র ও রাজচন্দ্র) এবং মনোহর স্বর্গীয় পিতৃদেবের সম্পত্তি সমভাগে বিভক্ত করিয়া ভোগ করে।" মনোহর জ্যেষ্ঠতাতের বাক্য শ্রবণ করিয়া নতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কুলকাঠির জগন্নাথ চৌধুরির জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রনারায়ণ বলিলেন "মনোহর, যদি আমাদেব কাহারও সহিত পরামর্শ করা অভিপ্রেত হয় তবে আগমন করিতে পার।" শ্রীকৃষ্ণ রায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, কিন্তু তিনি মনোহরকে রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। মনোহর হরেকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র, জমিদারির অর্ধাংশের অধিকারী, তিনি কেন ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিবেন? রুদ্রনারায়ণ মনোহরকে ইহাই বুঝাইতে লাগিলেন। লস্করবংশীয় বৃদ্ধ দেওয়ান ও কুলপুরোহিত রামচন্দ্র চক্রবর্তী[১১৯] রুদ্রনারায়ণের বাক্য অনুমোদন করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রায় তখন সর্বেসর্বা, কাহার সাধ্য তাহার ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়? মনোহরের অন্তঃকরণ চিন্তাভারক্লিষ্ট হইল, তিনি পোনাবালিয়ার শিকদারগণের[১২০] সাহায্যে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) গমন করিলেন। জাহাঙ্গীর নগরে গমনের পর ঘনশ্যাম সেন তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন। ইহারই বুদ্ধিবলে এবং খলিশাকোটার রায়গণের সাহায্যে মনোহর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজ অনুগ্রহে তিনি শীঘ্রই তাঁহার প্রাপ্য অর্ধাংশের অধিকার লাভ করিয়া পোনাবালিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। মহামানী শ্রীকৃষ্ণ রায় ভ্রাতুষ্পুত্রকে তুল্যাংশের অধিকার প্রদান করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে মনোহর জ্যেষ্ঠতাতকে এক আনা অংশ জ্যেষ্ঠোত্তর প্রদান করিলে বিবাদের মীমাংসা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ রায় এই ঘটনার পর কতকাল জীবিত ছিলেন বলা যায় না। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে প্রেমনারায়ণ বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কুলক্রিয়া উপলক্ষে মহারাজ রাজবল্লভের সহিত প্রেমনারায়ণের বিবোধ উপস্থিত হয়. এই বিবাদে প্রেমনারায়ণ জয়ী হইয়াছিলেন। রাজবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া চৌধুরিগণের সহস্রাধিক টাকা জমা বৃদ্ধি করেন। শ্রীকৃষ্ণরায়ের বংশধরগণের ভূসম্পত্তি বর্তমান সময়ে ঢাকার নবাব বাহাদুরের হস্তগত হইয়াছে।

জ্যেষ্ঠতাতের সহিত বিরোধের মীমাংসা করিয়া মনোহর চৌধুরি বাড়ির দক্ষিণাংশে নূতন বাড়ি প্রস্তুত করেন। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি যেরূপ ধৈর্য ও সাহসের সহিত জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা সবিশেষ প্রশংসনীয়। দুরন্ত কালকীট যৌবনেই তাঁহার জীবনকুসুম ছিন্ন করিয়া দিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই নিজ সম্পত্তির সর্বত্র সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রামভদ্র বংশে একমাত্র তাঁহার অংশই নবাবের করকবলিত হয় নাই। তিনি অনেক সুরম্যহর্ম নির্মাণ করিয়াছিলেন। বড় হিস্যার কালাচাঁদ মন্দির এবং ছোট হিস্যার দুর্গামন্দির তাঁহারই সময়ে নির্মিত হয়। এই মন্দিরগুলির কারুকার্য বিশেষ প্রশংসনীয় কিন্তু বর্তমানে ইহাদের পূর্বশ্রী বহুলাংশে বিনষ্ট হইয়াছে।

দেবী দিনমণির গর্ভে মনোহর রায়ের নন্দকিশোর ও রত্নকিশোর নামক দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। কন্যার সহিত পয়োগ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশোদ্ভব কৃষ্ণচন্দ্র সেনের বিবাহ হয়।

নন্দকিশোর রায় পোনাবালিয়ার বড় হিস্যার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অতীব শান্ত ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার বদান্যতা প্রসিদ্ধ ছিল। অদ্যাপি এদেশবাসীগণ বলিয়া থাকেন :—

নন্দকিশোর রায় দানে কল্পতরু।
তনয় যাহার দুর্গা, শিব, গুরু।।

নন্দকিশোর সরলতা, বদান্যতা প্রভৃতি সৎগুণে বিভূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হইত। সহধর্মিনী জগদীশ্বরী চৌধুরানী অতীব বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী ছিলেন। তিনি বিষয়কার্যে প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়া সর্বত্র যশস্বিনী হইয়াছিলেন। নন্দকিশোরের সময়ে তাঁহার পুত্র দুর্গাপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ একটি সুন্দর জলযান নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহার সম্মুখভাগে অপূর্ব কারুকার্যখচিত একটি দারুময় মকরমূর্তি সংযোজিত ছিল। এই জলযান বহুদিন হইল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু মকরটি বর্তমান রহিয়াছে।

দুর্গাপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ ইহারা তিনজনেই উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন, সর্বদা শাস্ত্রীয় আলাপ এবং সঙ্গীতচর্চা করিতে ভালবাসিতেন। পার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় ইহাদের অসাধারণ অধিকার ছিল। কনিষ্ঠ গুরুপ্রসাদ ১৭৯৪ খ্রিঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ চরিত্রগুণে সর্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রোষবংশের উজ্জ্বলরত্ন মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক রোষ, ধন্বন্তরি ও কাপড়ি বংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

অদ্যপি যেষাং বর্তন্তে বংশ্যাঃ সর্বত্রভূষিতাঃ।
সদ্ধর্মকর্মনিপুণা কুলকার্যপরায়ণাঃ।। (রত্ন ভা ৭ পৃঃ)

গুরুপ্রসাদের চরিত্রে রোষবংশোচিত গুণরাশির অপূর্ব সমাবেশ দৃষ্ট হইত। অস্মদ্দেশে শারদীয়া মহাপূজার সময় মহিষাদি পশুর প্রতি যে দারুণ নির্মমতা প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। করুণহৃদয় গুরুপ্রসাদের প্রাণে ইহা সহ্য হইত না। তিনি পোনাবালিয়া চৌধুরি বাটিতে পশুবলি রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি গুরুপ্রসাদের এই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ১২৪৭ সালে সেলিমাবাদ পরগনার জমিদার ভূকৈলাসনিবাসী স্বর্গীয় রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর মহারাজগঞ্জে আগমন করিলে স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। গুরুপ্রসাদও এই সময়ে রাজসকাশে গমন করেন : রাজাবাহাদুর গুরুপ্রসাদের লোকোত্তর চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া একখানি যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে রাজাবাহাদুর চৌধুরি মহাশয়কে ঝালকাঠি বন্দর তালুকস্বরূপ প্রদান করিতে চাহিলে গুরুপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, আমার পূর্বপুরুষগণ এক সরকার বাহাদুর ব্যতীত অপর কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন নাই, অতএব আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না।"

গুরুপ্রসাদ রায়ের কুলকার্যপরায়ণতার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। তিনি স্বয়ং সেনহাটি নিবাসী অরবিন্দ বংশোদ্ভব রামচন্দ্র দাশের কন্যা হরসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রাসমণি ও ভ্রাতুষ্পুত্রী চাঁদমণি ও ব্রজমণির সহিত যথাক্রমে পয়োগ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশোদ্ভব গৌরীদাস সেন, কালিমোহন সেন ও হরনাথ সেনের বিবাহ হয়। মধ্যমা কন্যা নিস্তারিণীর সহিত সেনদিয়া নিবাসী বিষ্ণুদাস বংশোদ্ভব কালিমোহন মজুমদার এবং কনিষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীর সহিত সেনহাটি নিবাসী অরবিন্দ বংশোদ্ভব বিষ্ণুচন্দ্র মজুমদারের বিবাহ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামধন বেন্দানিবাসী ঘটকবিশারদ বংশোদ্ভব গুরুচরণ দাশের কন্যা বামাসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে চৌষট্টি বৎসর বয়সে গুরুপ্রসাদ রায় সজ্ঞানে জাহ্নবীজলে দেহত্যাগ করেন।

মহামতি গুরুপ্রসাদ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী (শিবপ্রসাদের কন্যা) প্রাতঃস্মরণীয়া চাঁদমণি দেবীই একান্ন পীঠের অন্তর্গত শ্যামরাইলের ত্র্যম্বকভৈরবের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উহা

জীর্ণ হইলে, ঢাকার নবাব বাহাদুরের নায়েব বিক্রমপুর নিবাসী আনন্দচন্দ্র চৌধুরি একটি নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

মনোহর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রত্নকিশোর অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে ইনি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের ন্যায় কদাপি পরস্ত্রীর মুখাবলোকন করিতেন না। ইহার পুত্রই স্বনামখ্যাত গোপালকৃষ্ণ রায়। গোপালকৃষ্ণ যেরূপ বিক্রমের সহিত চৌধুরিবংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা হাবিলী সেলিমাবাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

গৃহবিবাদ চৌধুরিবংশের কালস্বরূপ উপস্থিত হইয়া তাহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী বিদূরিত করিয়া দিল। যে পর্যন্ত অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল ততকাল পর্যন্ত তাহাদের অখণ্ড প্রতাপে সমগ্র পরগনা কম্পিত হইত। কথিত আছে মহারাজ রাজবল্লভের তিরোধানের পর বৈদ্যসমাজে এই চৌধুরিবংশই সংক্রিয়ান্বিত, কুলীন সমাজের সহিত আদান প্রদান, তুলা, চন্দন প্রভৃতি নিষ্পন্ন করিয়া সমাজে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন।[১২১]

ঢাকার স্বনামখ্যাত নবাব বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ রায়ের বংশধরগণের চারি আনা ও ছোট হিস্যার কতক অংশ দেনডিক্রিতে খরিদ করিযাছেন। এই জমিদারির অংশ দখল উপলক্ষে গোপালকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে নবাব সাহেবের অনেক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। গোপালকৃষ্ণ যেরূপ তেজস্বী তদ্রূপ কার্যদক্ষ ছিলেন। শুনিয়াছি যে অনেক সময়ে গোপালকৃষ্ণেব বুদ্ধিকৌশলে নবাবকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল। অবশেষে নবাবেব দেওয়ান বাসণ্ডার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কালীকুমার সেন মহাশয়ের চেষ্টায় এই বিবাদ মীমাংসা হয়।

গুরুপ্রসাদ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামধন রায়চৌধুরি মহাশয়ের কল্যাণে নন্দকিশোরের জমিদারি অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তিনি ১২২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার চরিত্র হইতে ধর্মপ্রাণতা, সংস্কৃতানুরাগ প্রভৃতি সমস্তগুণই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পোনাবালিয়াব চৌধুরিগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। চারি আনা ও ছোট হিস্যার জমিদারির এক তৃতীয়াংশ পরহস্তগত, বড় হিস্যার জমিদারগণও ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন। বামধন ঋণ পরিশোধপূর্বক আদায় তহশিল প্রভৃতির উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিয়া বড় হিস্যার জমিদারি রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সম্পত্তি পবহস্তগত হইলেও গোপালকৃষ্ণ ও রামধন রায়ের প্রতিজ্ঞাবলে মনোহরের সম্পত্তি রক্ষা পাইল।[১২২]

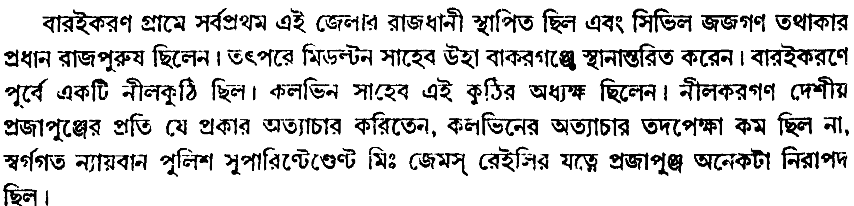
১৩০৫ সালে ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে রামধন রায়চৌধুরি স্বর্গারোহণ করেন। তিনি ভগবানের কিরূপ একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যু বিবরণেই স্পষ্টীকৃত হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দারুণ রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিলেন। বিশে ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রে তিনি ভ্রাতা পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "আমার আর সময় নাই, শীঘ্র নারায়ণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া আমাকে তথায় লইয়া যাও।" কেহ কেহ বলিলেন "মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশের পূর্বে কিরূপে নারায়ণ ক্ষেত্রে লওয়া যাইতে পারে।" চৌধুরি মহাশয় তখন অবিলম্বে আদেশ পালন করিতে বলিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইলে নারায়ণ ক্ষেত্রে মৃগচর্ম দেখিয়া বলিলেন "মৃগচর্ম এ সময়ে উপযোগী নহে, কুশাসন আনয়ন কর।" কুশাসন আনীত হইলে তদুপরি উপবেশন পূর্বক দারুণ রোগযন্ত্রণা সত্ত্বেও অবিচলিতভাবে ভগবদারাধনায় নিমগ্ন হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পরম পুণ্যময়ের পবিত্র ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল। কুলকাঠি নিবাসী চিকিৎসক তারকনাথ রায় মহাশয় তৎকালে সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি বলেন "মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার অশেষ যন্ত্রণা হইয়াছিল, সেরূপ যন্ত্রণা লোকের সচরাচর হইতে দেখা যায় না। যত যন্ত্রণা অধিক হইতে লাগিল, ততই যেন দৃঢ়তার সহিত তিনি ঈশ্বরমুখী হইতে লাগিলেন। সেই ভীষণ যন্ত্রণা যেন তাঁহাব ঈশ্বরপ্রেমের সাহায্য করিয়াছে। এরূপ ঈশ্বরভক্তির দৃঢ়তা আর দেখি নাই।"

বর্তমানে হাবেলি সেলিমাবাদের চারি আনা নবাবের এবং প্রায় দুই আনা চৌধুরি বংশের দখলে আছে। অবশিষ্ট এক আনার অর্ধাংশ কুলকাঠির চৌধুরি এবং অপর অংশ বারইকরণের চৌধুরিদিগের অধিকারে ছিল।

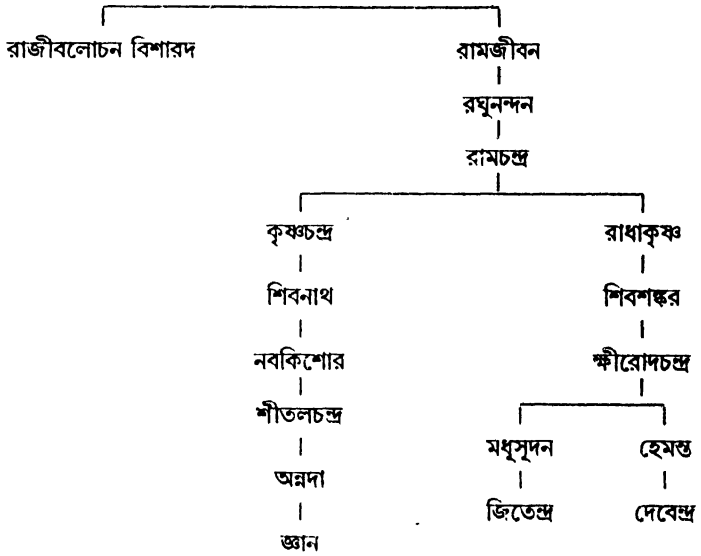
(কুলকাঠি ও বারইকরণের চৌধুরি বংশ)

- রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব
  - গোপীবল্লভ
    - শিবরাম
      - রামশরণ
        - বাণেশ্বর
          - জয়চন্দ্র
            - হরচন্দ্র
              - রমণকৃষ্ণ
                - কালীকান্ত
                  - অশ্বিনী
              - মোহনচন্দ্র
                - শ্রীকান্ত
                  - সুরেন্দ্র
                    - সুশীল
      - কৃষ্ণজীবন[১২৩]
      - জগন্নাথ[১২৪]
        - রাজকৃষ্ণ
          - রামগতি
            - কমলকৃষ্ণ
              - রত্নকৃষ্ণ
                - চণ্ডীচরণ
                  - যতীন্দ্র
        - কেবলকৃষ্ণ
          - ব্রজকিশোর
            - পূর্ণচন্দ্র
              - তারকনাথ
                - নরেন্দ্র
                - উপেন্দ্র
          - রাজকিশোর
            - অভয়াচরণ
              - চিন্তাহরণ
    - জয়কৃষ্ণ
      - রাজারাম
        - দুর্লভনারায়ণ
          - শিবনারায়ণ
            - কৃষ্ণমোহন
              - তারিণীমোহন
                - ভুবন
                - আনন্দ

পূর্বেই বলিয়াছি রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীবল্লভ মাতামহের সম্পত্তির এক আনা অংশ প্রাপ্ত হইয়া বারইকরণ গ্রামে গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র, শিবরাম ও জয়কৃষ্ণ শিবরাম কুলকাঠি গ্রামে বাসস্থাপন করেন, জয়কৃষ্ণ বারইকরণেই বাস করিতে লাগিলেন। ইহারাই কুলকাঠি ও বারইকরণের চৌধুরিগণের আদিপুরুষ। বর্তমানে ইহাদের সম্পত্তির অধিকাংশ পোনাবালিয়া ও কেওরার চৌধুরি এবং অন্যান্য অনেক ভূম্যধিকারীর হস্তগত হইয়াছে। এবং বংশের চণ্ডীচরণ বি. এল; চিন্তাহরণ এম. এ; এবং আনন্দমোহন এল. এম. এস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



বারইকরণ গ্রামে সর্বপ্রথম এই জেলার রাজধানী স্থাপিত ছিল এবং সিভিল জজগণ তথাকার প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। তৎপরে মিডল্টন সাহেব উহা বাকরগঞ্জে স্থানান্তরিত করেন। বারইকরণে পূর্বে একটি নীলকুঠি ছিল। কলভিন সাহেব এই কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। নীলকরগণ দেশীয় প্রজাপুঞ্জের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, কলভিনের অত্যাচার তদপেক্ষা কম ছিল না, স্বর্গগত ন্যায়বান পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জেমস্ রেইলির যত্নে প্রজাপুঞ্জ অনেকটা নিরাপদ ছিল।



রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের পুত্রগণ মধ্যে রাজীবলোচন বিশারদ ও রামজীবন দেউড়ি গ্রামে বাস করিতেন। রাজীবলোচনের প্রপৌত্রতনয় দীনবন্ধু চৌধুরি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্র রত্নকিশোরের সহিত বিশারদের বংশ লোপ হইয়াছে। রামজীবনের বংশধরগণের মধ্যে মাত্র দুই ঘর বর্তমান।

বিদ্যার্ণবের বংশে একমাত্র গোবিন্দের সন্তানগণ কেওরা গমন করতঃ বুদ্ধিবলে নূতন ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারে বহুল পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছেন। গুপ্তচৌধুরির উচলিবংশীয় দৌহিত্র কালীচরণের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। মুর্শিদকুলি খাঁর কঠোর শাসনে জমিদারি ইস্তফা প্রদান করিয়া তিনি বেঁদা গ্রামেই বাস করিতে থাকেন।

তপ্পে হাবেলি সেলিমাবাদের তালুকদারগণের মধ্যে পোনাবালিয়ার মজুমদারগণই প্রধান। ইহাদের আদিপুরুষ যাদবেন্দ্র সেন হরিষণা হইতে চৌধুরিগণ কর্তৃক এই স্থানে আনীত হন। ইহার বংশধরগণ পোনাবালিয়া জমিদার সরকারে কার্য করিয়া কৃষ্ণজীবন সেন ও রামদেব সেন নামক তালুক লাভ করেন। কথিত আছে রামবল্লভ দেব নামক এক ব্যক্তি বাকাই হইতে আগমন করিয়া নিজ নামে "রামদেব" তালুকপ্রাপ্ত হইয়া এই পরগনার মালুহার গ্রামে বাস করেন; এই সময়ে মজুমদার বংশীয় রামদেব সেনের পিতা পোনাবালিয়ার দেওয়ান ছিলেন। তিনি রামবল্লভ দেবের পরিবর্তে তৎপুত্র রামদেব সেন নামে পাট্টা গ্রহণ করেন এবং নবাবের নিকট হইতে এই তালুক (পরগনার প্রায় চতুর্থাংশ) খারিজ করিয়া লইলেন। তৎপর রামবল্লভ দেবের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ মজুমদার বংশের গুরু শ্রীকান্ত সিদ্ধান্তের[১২৫] শরণাগত হইয়া তাঁহার ব্রহ্মোত্তরের অধীনে ভাটারাকান্দার উত্তর চরকাঠি মৌজা ওসৎ তালুক লইয়া সেই স্থানে বাস করেন। এই প্রবাদ কতদূর সত্য বলা যায় না। মজুমদারগণ বলেন যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষের বুদ্ধিবলে রামভদ্র রায় সূতালড়ির ঘোষ চৌধুরিগণের জমিদারি ও কালাচাঁদ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত রামভদ্র রায় সন্তুষ্ট হইয়া উল্লিখিত তালুক পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করেন।

আশ্রয়দাতা জমিদার চৌধুরিগণের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মজুমদারদিগেরও পূর্বগৌরব অস্তমিত হইয়াছে।

৬ তপ্পে হাবেলি

এই পরগনাও সেলিমাবাদের ক্ষুদ্রতম অংশ, কিন্তু কোন সময়ে কাহার দ্বারা পৃথকীভূত হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা যে তপ্পে হাবেলি সেলিমাবাদ হইতে আধুনিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্তমান সময়ে এই পরগনার যাবতীয় ভূমি নলছিটি এবং বাকরগঞ্জ থানার অধীনে অবস্থিত।

এই পরগনার জমিদারি দুই ভাগে বিভক্ত; ইহার এক ভাগ দশ আনা এবং অপর ভাগ ছয় আনা লইয়া গঠিত হইয়াছে। চরামদ্দি নিবাসী প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার আছ্মত আলি খাঁ চৌধুরি ও ফজল আলি খাঁ চৌধুরি এবং বাকাইর ঘোষ ও বামরাইলের বসুবংশীয় জমিদারগণ দশ আনা অংশের অধিকারী। অপর অংশ উল্লিখিত আছ্মত আলি খাঁ সাহেব এবং গৌরনদী থানার অন্তর্গত পিঙ্গলাকাঠি গ্রামের ব্রাহ্মণ ভূস্বামীগণ ভোগ করিতেছেন। এই পরগনার রাজস্ব ৬৪৪।।১০ মাত্র।

আছ্মত আলি খাঁ সাহেব এই জেলার মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্তমানে তাঁহার পুত্র ইসমাইল খাঁ চৌধুরি জমিদারি কার্যভার পরিচালন করিতেছেন।

৭ ইদিলপুর

ইদিলপুর[১২৬] বাকলার একটি প্রাচীন এবং বিখ্যাত পরগনা। অদ্যাপি এই স্থানে বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের বাসভূমি বর্তমান। ইহার অন্তর্গত দেবাইখালি নামক গ্রামে উৎকৃষ্ট কোষ নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্তমানে এই পরগনার কিয়দংশমাত্র বাকরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত, অপর অংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইদিলপুরের পূর্বপ্রান্ত বিধৌত করিয়া মহানদী মেঘনা প্রবাহিত। ইহার ভূমি বাকরগঞ্জের অনেক স্থানের তুলনায় অতিশয় উচ্চ এবং অরণ্যসঙ্কুল। প্রশস্ত রাজবর্ত্ম অতিশয় বিরল, ক্ষুদ্র প্রবাহিনীও অধিক দৃষ্টগোচর হয় না। পূর্বকালে এই পরগনা দস্যুগণের প্রিয় বাসস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল।

অস্মদ্দেশের মধ্যে ইদিলপুর পরগনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। এই স্থলেই বঙ্গেশ্বর মহারাজাধিরাজ কেশব সেনের সুবিখ্যাত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১২৭] মহারাজ কেশব সেন ঈশ্বর দেবশর্মাকে কতিপয় গ্রাম ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন; তিনি চণ্ড-ভণ্ডদিগকে শাসন করিয়া এই সম্পত্তি ভোগ করিবেন। উক্ত তাম্রশাসন হইতে ইদিলপুরের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা এবং শাসনপ্রণালী কতক অনুমান করা যাইতে পারে।

মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বে, ইদিলপুর প্রভৃতি নিম্নবঙ্গান্তর্গত ভূখণ্ড প্রবল পরাক্রান্ত সেন নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তৎকালে এই সকল স্থানে চণ্ড-ভণ্ডাদি ক্রুরকর্মা অনার্য জাতি সমূহ বাস করিত। এই সকল দুর্দান্ত জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য সেনরাজগণ বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। ভুবনবিখ্যাত রোমানগণ দুর্দান্ত ইতালীয় জাতিসমূহকে বশীভূত রাখিবার নিমিত্ত যে প্রকার ইতালির স্থানে স্থানে রোমান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেনবংশীয় হিন্দুনরপতিগণও বোধ হয় তদনুরূপ নীতির অনুবর্তন করিয়া চণ্ড-ভণ্ডাদি অনার্য জাতিকে দমন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গের সর্বত্র পাঠানের অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা সগর্বে উড্ডীন হইয়াছিল। এই সময়ে চণ্ড-ভণ্ডাদি অনার্যগণ দলে দলে হিন্দুদ্বেষী পাঠানের ধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের নিষ্পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। সম্ভবত এই হেতু নিম্ন বঙ্গে

নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে মুসলমানগণের সংখ্যা এত অধিক দৃষ্ট হয়। ইদিলপুরে যুদ্ধবিগ্রহ এবং দুর্গাদির বহু চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যামান রহিয়াছে।

ইদিলপুর, শ্রীরামপুর, সাহাজাদপুর, এবং ইস্‌মাইলপুর এই মহাল চতুষ্টয়ই মহারাজ টোডরমল্লের সময়ে সরকার বাকলা বলিয়া অভিহিত হইত। অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেন এই পরগনার প্রকৃত নাম আদিলপুর। আদিল শব্দের অর্থ ন্যায়পরায়ণ। বিখ্যাত পাঠান সম্রাট্ শেরশাহেব পুত্র ইস্‌লাম শাহের মৃত্যুর পর তদীয় শ্যালক মহম্মদ সাহস্রব "আদিল" উপাধি ধারণ পূর্বক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আদিল, ইব্রাহিম্ সুর কর্তৃক পরাজিত এবং উত্তরভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া বঙ্গ-বিহারে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই আদিলের সহিত আদিলপুর অর্থাৎ ইদিলপুরের কোন সংশ্রব আছে কি না তাহা অবগত হইতে পারি নাই। তবে ইহা সত্য যে এই মহান আইন-ই-আকবরি প্রণয়নের পূর্বে বর্তমান ছিল। কত পূর্বে তাহা অবশ্য নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

রঘুনন্দন চৌধুরি ইদিলপুরের কায়স্থ জমিদারগণের পূর্বপুরুষ, তিনি চাঁদরায়-কেদার রায়ের সেনাপতি ছিলেন। ইদিলপুরের চৌধুরিবংশের ইতিহাস অতি বিচিত্র। এই প্রাচীন জমিদার বংশের সহিত, বাকলার অন্যান্য প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইদিলপুরের চৌধুরিগণ কায়স্থ জাতীয়; কিন্তু ইহারা মাধবপাশা এবং রায়েরকাঠির কায়স্থ রাজগণের ন্যায় সুখ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হন নাই। কথিত আছে যে ইহারা পরস্বাপহারক দস্যুগণের আনুকূল্য করিতেন।[১২৮]

১৭৬৪ খ্রিঃ অব্দে রামবল্লভ রায় এই পরগনার অধীশ্বর ছিলেন। ইহার চতুর্দশ বৎসর পর হইতেই ইদিলপুরের রাজস্ব সম্বন্ধীয় গোলযোগের সূত্রপাত হয়। প্রথমত কোম্পানি বাহাদুর মাণিক বসু নামক এক ব্যক্তিকে সাত বৎসরের জন্য জমিদারি পত্তন প্রদান করেন। তাহাতেও রাজস্বের কোন সুবন্দোবস্ত হইল না দেখিয়া গবর্নমেন্ট পুনরায় চৌধুরি বংশীয় কৃষ্ণবল্লভ রায়, নরসিংহ রায় প্রভৃতির সহিত বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু গোলযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহানদী মেঘনার আক্রমণে পরগনার বহুস্থান নদীগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় রাজস্বের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। শুধু তাহাই নহে, বহু প্রজা ইদিলপুরের অনুর্বর উচ্চ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া মেঘনাবক্ষস্থিত অনুর্বর দ্বীপপুঞ্জে বাসস্থান স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলে, পরগনার অধিকাংশ স্থান দুর্গম অরণ্যে আচ্ছন্ন হইয়া হিংস্র শ্বাপদ এবং তদধিক হিংস্র দস্যুগণের আলয়ে পরিণত হইতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসানে এক ভীষণ মহামারি আবির্ভূত হইয়া ব্যাপার আরও গুরুতর করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিদিন শত শত নরনারী এই দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতে লাগিল। সর্বেশ্বর পাল নামক জনৈক বণিকের গৃহেই সপ্তদশ জন এই মহামারির করালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

কালেক্টর আর্মষ্ট্রিং সাহেব কোন বিষয়েই সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তিনি পদত্যাগ করিলে মিঃ ম্যাছি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। ১৮০৪ খ্রিঃ অব্দে চৌধুরিগণ বাকি রাজস্ব প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে পর, গবর্নমেন্ট পুনরায় তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে অভিলাষী হ'ন। কিন্তু গবর্নমেন্টের এই সাধু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অবশেষে ১৮১২ খ্রিঃ অব্দে ইদিলপুরের জমিদারি নিলাম হইলে সুবিখ্যাত মোহিনীমোহন ঠাকুর এই পরগনা ক্রয় করেন। ইহার তিন বৎসর পরে ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পূর্বজমিদারগণের বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়, এই নিমিত্ত ইদিলপুর পরগনা ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাকরগঞ্জ এবং তৎপরে ফরিদপুরের এলাকাভুক্ত হইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশীয়েরাই ইদিলপুর পরগনার বর্তমান ভূমধ্যাধিকারী। এই পরগনায় ১১৯ খানি তালুক বর্তমান এবং ইহার রাজস্ব ৬৫৯০৪। ১১ মাত্র।

৮ তপ্পে নাজিরপুর

এই পরগনার বহু অংশ সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু হাণ্টার সাহেব বলেন যে তপ্পে নাজিরপুর পূর্বে সেলিমাবাদের অন্তর্গত ছিল।[১২২]

গাজিপুর নিবাসী আল্‌ফত্‌ গাজি[১৩০] নামক জনৈক উজির সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের সময়ে রাজকার্য উপলক্ষে এই দেশে আগমন করিয়া জাহাঙ্গীরনগরে (বর্তমান ঢাকা) বাস করেন। তিনি কোন বিশেষ কার্যে বাদশাহের মনোরঞ্জন করাতে পুরস্কারস্বরূপ এই পরগনা প্রাপ্ত হন। আল্‌ফত্‌ গাজি নিজ নামে সনন্দ গ্রহণ করিয়া সমগ্র পরগনা অধিকার করেন। কিন্তু সেলিমাবাদ হইতে এই পরগনা কেন বিচ্ছিন্ন করা হইল, এবং কে ইহা পৃথক্‌ করিলেন তাহা জানিতে পারা যায় না।

আল্‌ফতের সন্তান সন্ততিগণ বহুকাল পর্যন্ত অতীব সম্মান এবং সমৃদ্ধির সহিত এই জমিদারি ভোগ করিতেছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্য কাহারও চিরস্থায়ী হয় না; কমলা চঞ্চলা নামের সার্থকতা করিতে যেন সর্বদা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ১৮১৯ খ্রিঃ অব্দে বাকি রাজস্বে এই পরগনা নিলামে বিক্রীত হইলে, পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরগণ ইহা ক্রয় করেন। নিম্নে আল্‌ফত্‌ গাজির সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।

আল্‌ফত্‌ গাজি
।
সৈয়দজান
।
হোসেনজান
।
আইনউদ্দিন
।
সামসুদ্দিন
।
হোসেনউদ্দিন
।
ইমামউদ্দিন
।
সিরাজউদ্দিন
।
মীর মমতাজউদ্দিন

গাজিবংশোদ্ভব মুসলমান ভূম্যধিকারিগণের বিশেষ কোন কার্য দৃষ্ট হয় না, তবে অনেক মুসলমান এখনও তাঁহাদের প্রদত্ত চেরাকী ভূমি ভোগ দখল করিতেছেন।

সৈয়দজান পিতার মৃত্যুর পর, ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া তেরচর নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র আইনউদ্দিন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া নলচিড়া গ্রামে আবাস ভবন নির্মাণ করেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ সেই গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের অবস্থা বর্তমান সময়ে বড়ই শোচনীয়; অতি সামান্য আয়ের ভূসম্পত্তি দ্বারা কোন প্রকার গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহিত হইয়া থাকে। প্রকাণ্ড সৌধগুলি প্রায় পতনোন্মুখ, দুই একটি ইষ্টালয় ভূমিসাৎ হইয়াছে. প্রকাণ্ডকায় বট অশ্বত্থ বৃক্ষগুলি অট্টালিকা বেষ্টন করিয়া সগর্বে মস্তক উত্তোলন পূর্বক যেন শাখা প্রশাখা সঞ্চালন দ্বারা এই জমিদারবংশের অতীত সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সরকারি কাগজে প্রকাশ যে, দক্ষিণ সাহাবাজপুরের কতক অংশ পূর্বে নাজিরপুরের অন্তর্গত ছিল; এবং রতনদি কালিকাপুর,

নাজিরপুর হইতেই সম্পূর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রবাদ যে উজিরপুর গ্রাম আল্‌ফত্‌ গাজি কর্তৃক স্থাপিত ।।

হোসেনউদ্দিনের সময়ে জমিদারি নিলামে বিক্রয় হয়। স্বর্গীয় কানাইলাল ঠাকুর প্রথমত ইহার চৌদ্দ আনা অংশ ক্রয় করেন, তৎপরে ঢাকা নিবাসী পানিহাটি সাহেবে হইতে বাকি দুই আনা অংশ ১৮৩০ খ্রিঃ অব্দে খোস কবলা দ্বারা ক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ মালিক হইলেন। এই পরগনার বর্তমান রাজস্ব ২৮৭৮৩ ৪।।পাই মাত্র।

৯ রতন্‌দি কালিকাপুর

এই পরগনার প্রাচীন ইতিহাস চন্দ্রদ্বীপের সঙ্গে জড়িত। মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ ও তৎপুত্র বীরবর রামচন্দ্রে শরীররক্ষক সুপ্রসিদ্ধ মল্ল রামমোহনের বংশধর কর্তৃক এই পরগনা স্বতন্ত্রভাবে স্থাপিত। এই স্থান তৎসময়ে ও তাহার অনেক পরেও চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপরে তপ্পে নাজিরপুরের অন্তর্গত হয়, ১৭৪২ খ্রিঃ অব্দে নবাব আলিবর্দী খাঁ ইহা পৃথক্‌ করেন, এবং নবাব মীরকাশিম, স্বতন্ত্র ভাবে ইহার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই পরগনা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; জমিদারগণের প্রতাপে ও উদ্যোগে বিশেষ লাভজনক হইয়াছিল। ইহার রাজস্ব ৫২৩৭।। ৩ পাই।

রামমোহনের প্রপৌত্র রত্নেশ্বর রায় চৌধুরি নিজ নামে এই পরগনার নামকরণ করিয়া উজিরপুর গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। ইহাদের পূর্ব নিবাস জগদ্দল। ইহারা কায়স্থ কুলসম্ভূত।

উজিরপুর সুগন্ধানদীর চরোৎপন্ন, পূর্বে এই স্থান জলাকীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় ছিল। কথিত আছে যে ফকির মাহমুদ নামক জনৈক মুসলমান এই স্থানে বাস করিতেন, তিনি পূর্বে উজিরি করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম উজিরপুর হইয়াছে। বেভারিজ্‌ সাহেব অনুমান করেন যে মোগল শাসন সময়ে উজির আল্‌ফত্‌ গাজি এই স্থানে বাস করিতেন, তদনুসারে উজিরপুর নাম হইয়াছে।

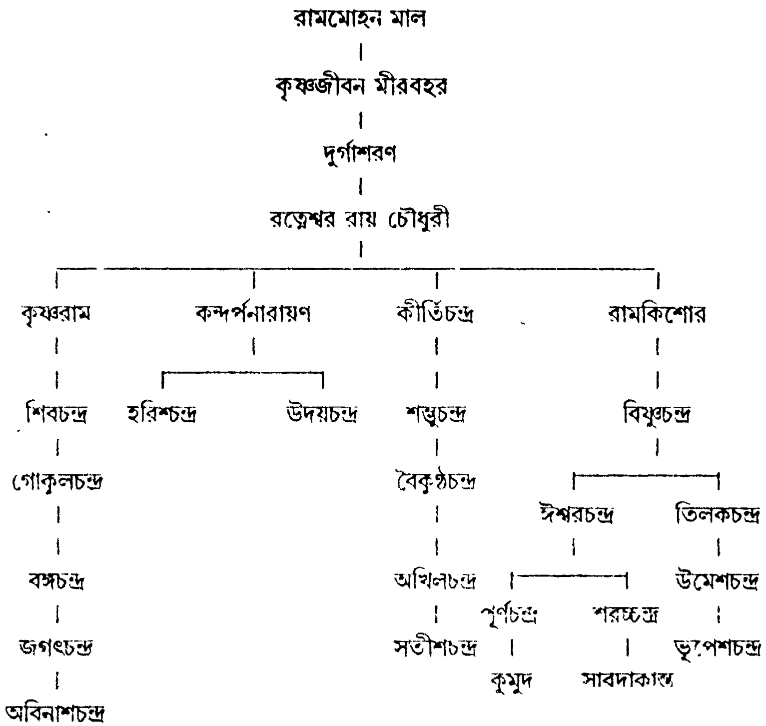
এই জমিদারি সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। প্রথিতনামা সাধক দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য মাধবপাশার রাজাদের কুলগুরু ছিলেন। একদিন রাজাকে দীক্ষা প্রদান করিতে আগমন করিয়া তিনি তাম্বুল চর্বণ করিতেছিলেন, রাজার মনে তাহাতে একটি অভক্তি জন্মিল; ভট্টাচার্য মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া রাজবাড়ি হইতে বহির্গত হইলেন। তখন রাজবাড়ির বহির্বাটিস্থ পুষ্করিণীতে রামমোহন মালের পৌত্র দুর্গাশরণ স্নান করিতেছিলেন; মহাপুরুষ তাহাকেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে বলিলেন। নিকটে রামমোহন দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রাজাকে মন্ত্র না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরুদেব বলিলেন "রাজা মূর্খ, তাই নিজের বুদ্ধির দোষে সর্বনাশ করিল। আমাকে তাম্বুল চর্বণ করিতে দেখিয়া অভক্তি প্রকাশ করিয়াছে। তোমার পৌত্রকে দীক্ষা দিব।"

রামমোহন বলিলেন "যদি কৃপা হইয়া থাকে তবে আমার পুত্রকেও দীক্ষিত করুন, সেও অদীক্ষিত আছে।" মহাপুরুষ তখন উভয়কেই দীক্ষা মন্ত্র প্রদান কহিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ অতি শীঘ্র অতুল ঐশ্বর্যশালী হইয়া নিজ নামে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করিবে।

এই দুর্গাশরণের পুত্রই স্বনামখ্যাত রত্নেশ্বর রায় চৌধুরি। একদা রাজনগর রাজবাড়িতে কোন শ্রাদ্ধোৎসব উপলক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য জমিদারবর্গের নিকট নিমন্ত্রণ-লিপি প্রেরিত হইলে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি স্বীয় কর্মচারী রত্নেশ্বর রায় সহ নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া রাজনগর উপস্থিত হইলেন। উৎসব-দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে শত শত লোক অভুক্ত অবস্থায় প্রতিগমন করিতেছে দেখিয়া রত্নেশ্বর রায়, উপঢৌকন জন্য নীত খাদ্যসামগ্রী অভুক্ত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। এই ঘটনায় রত্নেশ্বর রায়ের সুখ্যাতি প্রচারিত হইল। রাজা রাজবল্লভ তৎশ্রবণে রত্নেশ্বর রায়কে তৎসমীপে উপস্থিত হইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রত্নেশ্বর রাজসমীপে উপনীত হইয়া অতি বিনম্র বচনে বলিলেন "মহারাজ! ক্ষুধার্ত সাধারণ দর্শকবৃন্দ আপনার নিন্দাবাদ করিয়া অভুক্ত অবস্থায় গমন করিতেছিল, আপনার জন্য আনীত খাদ্য সামগ্রী দ্বারা আমি তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া আপনারই কাজ করিয়াছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা রাজবল্লভ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন

তিনি রত্নেশ্বর রায়কে ইহার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানের ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উপস্থিত হইতে বলিলেন। রত্নেশ্বর রায় নির্দিষ্ট তারিখে তথায় উপস্থিত হইলে রাজা রাজবল্লভের অনুরোধে আলিবর্দী খাঁ তাঁহাকে ১১৪৯ বঙ্গাব্দে তাম্রপাতে জমিদারি সনদ প্রদান করেন। রত্নেশ্বর রায় নবাব প্রদত্ত জমিদারি এবং পূর্বাধিকৃত স্থানগুলি এক পৃথক পরগনায় বিভক্ত করেন। এই পরগনার নামের 'আদি'তে নিজ নাম রাখিয়া 'কালিকা দেবীর নামে পরগনা সৃষ্টি করেন, তাহাতেই পরগনার নাম "রতনদি কালিকাপুর" হইয়াছে।

এই কিংবদন্তীর সত্যাসত্য পাঠক বিবেচনা করিবেন, রত্নেশ্বর রায়ের বংশধরগণ কিন্তু এখনও দিগ্বিজয় ভট্টাচার্যবংশের মন্ত্রশিষ্য।



রত্নেশ্বরের পুত্র কৃষ্ণরাম যখন এই পরগনা প্রাপ্ত হ'ন, তখন কতিপয় দেশের হিতকাজ করিবেন বলিয়া তিনি নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রজাদের সুখ শান্তির জন্য রাস্তা নির্মাণ ও জলাশয় প্রভৃতি খনন এবং চুরি-ডাকাতি নিবারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনৈক রাজপুরুষ কৃষ্ণরামের সঙ্গে আসিয়া উজিরপুর গ্রামে কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন, পরওয়ানায় যে সমস্ত বিষয় লিখিত ছিল সেই অনুসারে কাজকর্ম হচ্ছে কি না তাহা দেখাই উদ্দেশ্য ছিল। যদি কোন অংশে ত্রুটি হয় তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণরামের জমিদারি খাসে আনিবেন, নবাব এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণরামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরগনার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তৎকালে এই জমিদারগণের প্রবল প্রতাপে চতুর্দিক বিকম্পিত হইত; এমন কি সুদূর যশোহর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানেও ইহাদের যশ ও প্রতাপ ঘোষিত হইত।

গৃহ-বিসম্বাদ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এই জমিদারগণের পূর্বশ্রী ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এই বংশের মধ্যে যেমন কেহ কেহ সৎকীর্তি দ্বারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, আবার কেহ কেহ কুকার্য দ্বারা নরকের পথ তদ্রূপ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তারপর যে সমস্ত লোক এই জমিদারগণের আশ্রয়ে থাকিয়া ইহাদের অন্নে শরীর পুষ্ট করিয়াছেন, তাহারাও আবার সর্বনাশ সাধনের ত্রুটি করেন নাই।

রত্নেশ্বর রায়ের জমিদারি ছয়টি তালুকে বিভক্ত হয়, তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণরামের চারি আনি ও মধ্যম পুত্র কন্দর্পনারায়ণের চারি আনি অংশে আবার দুই দুইটি পৃথক হয়। এই পরগনা এখন বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে, নিম্নে ইহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

তৌজি নং		অংশ		মালিক
৩২৫৩	...	⁄৹ আনা		মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরি (চৌদ্দরশি)।
৩২৫৪	...	⁄৹ "		রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ।
		১৮।	...	
		৭।।	...	মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরি (চৌদ্দরশি)।
		৭।।	..	রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি (চৌদ্দরশি)।
৩২৫৫	...	৩।	...	বাসণ্ডার মহলানবীশগণ।
		৩।	...	রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ।
৩২৫৬	...	⁄০	...	স্বর্ণময়ী চৌধুরাণী প্রভৃতি।
		/১১⁄।।	...	বাসণ্ডার মহলানবীশগণ।
৩১৫৭	..	/৮।।	...	রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ।
		⁄০	...	বরহানদ্দিন চৌধুরি (দেউলা)।
		⁄০	...	ঐ ঐ
৩২৫৮	...	/১।	...	বাসণ্ডার মহলানবীশগণ।
		১৮।।	..	রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ।

জমিদারগণের অর্ধভগ্ন ইষ্টকালয়, অত্যুন্নত মন্দির এবং সুবৃহৎ দীর্ঘিকাসমূহ প্রাচীন গৌরবের সামান্য স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতেছে। এই জমিদারগণের সকল বংশধর উজিরপুর গ্রামে নাই, কেহ কেহ বা বারপাইকা, রাকুদিয়া, শিকারপুর, রারৈখালী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেছেন।

এই পরগনায় কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের লোকাতীত কীর্তিতে এই দেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকের স্মৃতি বিলোপ হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনচরিত যাহা পাওয়া যায় তাহাও কিংবদন্তী পূর্ণ।

১০ উত্তর সাহাবাজপুর

পরগনা উত্তর সাহাবাজপুর ইদিলপুরের দক্ষিণে মেহেন্দিগঞ্জ থানায় অবস্থিত। ইহার এক ক্ষুদ্র অংশ মেঘনা বক্ষস্থিত দক্ষিণ সাহাবাজপুর নামক বিশাল দ্বীপে বর্তমান। উভয় অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া মেঘনার শাখা মহানদী ইল্‌সা প্রবাহিত হইতেছে।

মোগল-শাসনসময়ে সাহাবাজপুর সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত একটি মহাল বলিয়া পরিগণিত হইত। কথিত আছে সাহাবাজ খাঁ নামক জনৈক সেনানী হইতে এই পরগনার নামকরণ হইয়াছে।[১৬১] যখন পর্তুগীজ এবং মগ দস্যুগণের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গ প্রায় উৎসাদিত, তখন এই দুর্বৃত্তদিগের দমনার্থ মোগল সম্রাট তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।[১৬২] এই সাহাবাজ খাঁ কখন বাংলায় আগমন করিয়াছিলেন এ বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন এই সাহাবাজ খাঁ এবং খাঁ আজিম মির্জার পরবর্তী বাংলার সুবেদার সাহাবাজ খাঁ কুম্ব একই ব্যক্তি। সাহাবাজ খাঁ কুম্ব ১৫৮৪ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১৫৮৭ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার শাসনকর্তা ছিলেন; কিন্তু পাঠান এবং মোগল জায়গিরদারগণের বিদ্রোহদমনে অসমর্থ হইয়া রাজরোষে পতিত হন। সম্রাট

আকবরশাহ্ তাহাকে আগ্রার কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া খাঁ হেরেবিকে বাংলার সুবেদার পদে নিযুক্ত করিলেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেন যে সাহাবাজপুর-স্থাপয়িতা সাহাবাজ খাঁ, সম্রাট্ আকবরের পূর্বের লোক। কিন্তু ঐতিহাসিকপ্রবর বেভারিজ্ যখন সাহাবাজপুর-স্থাপয়িতাকে স্পষ্টভাবে মোগলসম্রাট-প্রেরিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং মোগলসম্রাট-প্রেরিত সেনানিগণ মধ্যে যখন সাহাবাজ খাঁ কুম্ব ব্যতীত অপর কোন সাহাবাজ খাঁর নাম দৃষ্ট হয় না, তখন সাহাবাজপুর-স্থাপয়িতা এবং সাহাবাজ খাঁ কুম্ব এক ব্যক্তি নহেন ইহা বলা যায় না।[১০২]

বাংলার সুবেদার পদে নিযুক্ত হইবার বহু পূর্ব হইতেই সাহাবাজ খাঁ বঙ্গদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তখন ইনি ক্ষত্রিয় চূড়ামণি মহারাজ টোডরমল্লের অধীনে কার্য করিতেন। পরে খাঁ আজিম বঙ্গের সুবেদার পদে নিযুক্ত হইলে ইনি ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূভাগ মোগলের করায়ত্ব করিয়াছিলেন।[১০৩] সম্ভবত এই সময়েই সাহবাজপুর স্থাপিত হয়।

সম্রাট আকবর তুষ্ট হইয়া এই সমরকুশল সেনানায়ককে বাংলার শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার সুবেদার পদ তাদৃশ সুখকর ছিল না। পাঠানেরা তখনও সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয় নাই। দায়ূদ শাহের মৃত্যুর পর নবাব কতলু খাঁর অধীনে তাহারা বঙ্গদেশ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া মোগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মোগলগণ কিছুতেই এই অক্লিষ্টকর্মা দুর্ধর্ষ জাতির আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিল না। এই সময়েই আবার মোগল জায়গিরদারগণের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মজঃফর, টোডরমল্ল, খাঁ আজিম, কেহই বঙ্গদেশে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে এই গুরুতর কার্যের ভার সাহাবাজ খাঁর স্কন্ধে অর্পিত হইল। সাহাবাজ খাঁ প্রথমে শাসনকর্তা হইতে স্বীকৃত হন নাই কিন্তু পরিশেষে এই পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে বিদ্রোহদমনে অক্ষম হইয়া, বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলে বাদশাহ তাহাকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিলেন। এই রূপে সাহবাজ খাঁর কর্ম-জীবনের যবনিকাপাত হইল।

সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং তৎপুত্র শাহজাহানের রাজত্বে উত্তর সাহাবাজপুরে বিশেষ কোনও যুদ্ধবিগ্রহের কথা শুনা যায় না। বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া মোগলকুলপাংশুল ঔরঙ্গজেব, যখন দারা, সুজা প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত দিল্লির সিংহাসন লইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন সুযোগ পাইয়া মগ ও পর্তুগীজ দস্যুগণ পুনরায় সাহাবাজপুর প্রভৃতি মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে লোমহর্ষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। ঔরঙ্গজেব তাহাদিগের দমনার্থ বৈদ্যবংশোদ্ভব মহাবীর সংগ্রাম শাহকে পূর্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। সংগ্রাম সাহাবাজপুর প্রভৃতি স্থলে বহু সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়া দস্যুদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহাবাজপুর পরগনার অন্তর্গত গান্ধীয়া গ্রামের অনতিদূরে মেঘনার শাখা ইলসা নদীর তীরে সংগ্রামের কেল্লা বর্তমান ছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী হইল এই দুর্গ ইলসার বিশাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

সংগ্রাম শাহের কর্মবহুল জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি বৈদ্যকুলে শালঙ্কায়ন গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজ শৌর্যপ্রভাবে বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের নিকট রাজা উপাধি এবং মনসবদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট মধ্য বাংলায় ভূষণা, মামুদপুর এবং কালিয়ার অন্তর্গত নাওরা প্রভৃতি স্থান তাঁহাকে জায়গির অর্পণ করেন।

সংগ্রাম ভূষণা পরগনার অন্তর্গত মথুরাপুর নামক স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। মথুরাপুর গ্রামে একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ আছে, উহা "সংগ্রামের দেউল" বলিয়া প্রসিদ্ধ। সংগ্রাম ও তদ্বংশীয়গণের পরেই ভূষণা সীতারাম রায়ের হস্তগত হয়। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে ১৬৮৪ খ্রিঃ অব্দে যোধপুর রাজ্যে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল তাহাতেও বাঙ্গালি বীর সংগ্রাম সাহ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সংগ্রাম মোগল সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার

রণকৌশলে পরাজিত হইয়া রাঠোরগণ সন্ধির নিমিত্ত প্রধান চারণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, উদার হৃদয় সংগ্রাম সাহ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। মহামতি উড সাহেব রাজস্থানে লিখিয়াছেন — সংগ্রাম যে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা যায় না, তবে তাঁহার হৃদয় যেরূপ উচ্চ ছিল তাহাতে তিনি মহদ্‌বংশজাত ছিলেন, সন্দেহ নাই।

সংগ্রাম রাজা এবং মনসবদার হইয়াছিলেন বটে কিন্তু স্বজাতি-সমাজে তাদৃশ সম্মানলাভে কৃতকার্য হন নাই। ইহার কারণ এই যে তিনি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণির (শালঙ্কায়ন) বৈদ্য ছিলেন। উচ্চ শ্রেণির বৈদ্যগণ স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত আদান-প্রদান করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়াই স্বীকার করিতেন না; তাঁহারা তাহাকে "হাম বৈদ্য" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বীরহৃদয় সংগ্রাম, সমাজের অত্যাচার অগ্রাহ্য করিবার মানসে সিদ্ধবংশীয় বৈদ্যগণের সহিত কার্য করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি বাণীবহ গ্রামবাসী শক্‌ত্রি মাধববংশীয় সদাশিব সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র রাধাকান্ত ও মণিরাম যথাক্রমে ধন্বন্তরি আদিত্যবংশীয় কাশীনাথ সেনের কন্যা এবং ত্রিপুর গোবিন্দ গুপ্তের কন্যা বিবাহ করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ছয়টি কন্যা ধন্বন্তরি উচলি বিশ্বনাথ সেন ও রঘুনাথ সেন, আদিত্য রঘুনাথ সেন, বিকর্তন রামচন্দ্র সেন, শক্‌ত্রি গণবংশীয় দুর্গাদাস সেন ও আদ্যগোত্রীয় রঘুনাথ মজুমদারের সহিত পরিণীতা হন। সংগ্রাম কেবল অর্থব্যয়ে কার্য সুসিদ্ধ করিতে না পারিয়া অনেক স্থলে বল প্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কণ্ঠহার লিখিয়াছেন—

দুর্দ্দৈবাশনিসম্পাতাদ্রঘুনাথো যুবামৃতঃ।
সংগ্রামসাহতনয়া পাণিগ্রহণ পীড়িতঃ।।

সংগ্রামের কার্যাবলী দ্বারা বৈদ্যসমাজে যে ভীষণ বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহার ফল অদ্যাপি অনেকে ভোগ করিতেছেন। বাণীবহ, কালিয়া, মামুদপুর প্রভৃতি স্থানের বৈদ্য সমাজ অদ্যাপি সংগ্রামশাহ-দোষে হীনপ্রভ হইয়াছে। সংগ্রামশাহ বাকলায় যে সকল কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে "সংগ্রামনীল" নামক গ্রাম ও "সংগ্রামনীলের খাল" ব্যতীত আর সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে।[১৩৪]

বৈদ্যকুলোদ্ভব প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী চাঁদরায় সংগ্রামশাহের একজন বিশ্বস্ত সহকারী ছিলেন। তিনি মগ ও পর্তুগিজদিগের সহিত যুদ্ধকালে সংগ্রামের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। সম্রাট তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাহাবাজপুর পরগনা জমিদারি প্রদান করেন। তিনি সাহাবাজপুরের অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে অত্যুচ্চ মঠ ও বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দর্শকগণের নয়ন তৃপ্তি জন্মাইয়া থাকে। চাঁদ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে শ্রীরাম রায়ই নানাগুণে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লালরাম চৌধুরী এই পরগনার জমিদার ছিলেন। ঢাকার তৎকালীন এটর্নি পিট সাহেবের দুর্বৃত্ততায় লালরামকে বহুতর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।[১৩৫] পরবর্তীকালের ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে কালীনাথ রায় এবং রাসমণি চৌধুরানীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। উত্তর সাহাবাজপুরের অন্তর্গত দাদ্‌পুর গ্রামে বৈদ্যবংশীয় কয়েক ঘর প্রাচীন ভূস্বামী বাস করিতেছেন।

১১ দক্ষিণ সাহাবাজপুর

এই পরগনা বাদশাহি আমলে সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত ছিল। সরিদ্বরা ইলসা এবং তেতুলিয়া ইহাকে বাকরগঞ্জের অপর ভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই বিশাল দ্বীপের পূর্ব প্রান্ত বিধৌত করিয়া মেঘনার শাখা সাহাবাজপুর নদী প্রবাহিত। এই নদীর পূর্বে হাতিয়া দ্বীপ; পরগনে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের এক অংশ এই হাতিয়া দ্বীপে অবস্থিত।

কথিত আছে, পূর্বকালে দক্ষিণ সাহাবাজপুর, রতনদি কলিকাপুর, সায়েস্তানগর প্রভৃতি পরগনার মধ্য দিয়া বেতুয়া নাম্নী এক মহাবেগবতী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইত। ইহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ও পূর্বে দুইটি ক্ষুদ্র প্রবাহিনী বর্তমান ছিল। কালক্রমে মহানদী বেতুয়ার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে ক্ষুদ্র প্রবাহিনীদ্বয় উত্তাল তরঙ্গময়ী মহানদীরূপে পরিণত হইয়া দক্ষিণ সাহাবাজপুরকে বাকরগঞ্জ এবং হাতিয়া দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবলবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। এই মহানদীদ্বয়ই যথাক্রমে তেতুলিয়া এবং সাহাবাজপুর নদী বলিয়া পরিচিত।[১৩৬]

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের অধিবাসীগণ প্রায়ই মুসলমান। হিন্দুগণ অধিকাংশ "হালিয়াদাস" শ্রেণির অন্তর্গত। মুসলমান-শাসনসময়ে এই স্থান মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুগণের দুর্বিসহ অত্যাচারে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছিল। সম্ভবত এই কারণে হিন্দু "হালিযাদাস" গণ জাতিচ্যুত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া এই দ্বীপে মুসলমানের সংখ্যা এত অধিক লক্ষিত হয়।[১৩৭]

মগ ও ফিরিঙ্গিদিগকে দমন করিবার জন্য সাহাবাজপুরের প্রতিষ্ঠাতা সাহাবাজ খাঁ দিল্লিশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। সাহাবাজ খাঁর কিয়ৎকাল পরেই দুর্ধর্ষ পর্তুগিজগণ পুনরায় মেঘনার মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্দীপের মোগল শাসনকর্তা ফতে খাঁ বহু রণপোতসহ তাহাদিগকে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের নিকটে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই জলযুদ্ধে ফতে খাঁ পরাজিত এবং নিহত হন ; বিজয়ী পর্তুগিজগণ গঞ্জালেকে সেনানি পদে বরণ করিয়া সন্দীপ অধিকার করেন। পর্তুগিজ নায়ক গঞ্জালে ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন দক্ষিণ সাহাবাজপুর বাকলা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ পর্তুগিজ-সেনাপতি এইক্ষণে বাকলা-রাজকৃত উপকার বিস্মৃত হইয়া সাহাবাজপুর দ্বীপও স্বরাজ্যভুক্ত করিল।[১৩৮]

এই সময়ে সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁ সুবেদার পদ প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। মহামতি ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া পর্তুগিজদিগকে বিদূরিত করিয়া দিলেন। ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পর পর্তুগীজ এবং আরাকানবাসীদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে আরাকানরাজ ওলন্দাজগণের সাহায্যে পর্তুগিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া সাহাবাজপুর অধিকার করেন। অতঃপর মগ দস্যুগণ পঙ্গপালের ন্যায় দক্ষিণ সাহাবাজপুর এবং তন্নিকটবর্তী প্রদেশে পতিত হইয়া নগর গ্রাম প্রভৃতি উৎসাদিত করিতে লাগিল। এই সময়ে কত শত সহস্র বঙ্গবাসী নরনারীর তপ্ত অশ্রু মেঘনা এবং বঙ্গসাগরের বক্ষ প্লাবিত করিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? ১৬৩২ খ্রিঃ অব্দে হুগলির সমরে পর্তুগিজ-শক্তি বিধ্বস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মগের অত্যাচার কিছুতেই নিবারিত হইল না।[১৩৯] মোগল রাজধানী ঢাকা নগরীর অধিবাসীগণ পর্যন্ত এই দস্যুগণের পরাক্রমে সর্বদা সভয়ে কালযাপন করিত।

অবশেষে ১৬৬৪ খ্রিঃ অব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁ ঔরঙ্গজেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বঙ্গে আগমন করেন। এই সময়ে হতাবশিষ্ট পর্তুগিজগণ মগদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাংলার দক্ষিণ পূর্ব প্রদেশ বিধ্বস্ত করিতেছিল। পর্তুগিজদের অত্যাচার-কাহিনী ফরাসি পরিব্রাজক বর্ণিয়ে অতি তেজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। "They consisted of such as had abandoned their monasteries ; had been twice or thrice married murderers, and the like. Their usual trade was robbery and piracy. They not only scoured the sea-coasts, but entered the rivers, especially the Ganges, and often penetrating forty or fifty leagues up the country, surprised and carried away whole towns and villages of people, with great cruelty, and burning all which they could no carry away. They ransomed the old people ; but the young ones they made rowers of, and such Christians as they were themselves ; boasting that they made more converts in one year, than the missionaries, through the Indies, did in ten.[১৪০]

এই সমস্ত অত্যাচার-কাহিনী সায়েস্তা খাঁর কর্ণগোচর হইলে নবাব স্বীয় পুত্র বোজরগ উমেদ

খাঁ এবং সেনাপতি হোসেন বেগকে বহু সৈন্য এবং রণপোতসহ মেঘনার মোহানায় প্রেরণ করিলেন। মোগলগণ বহুযুদ্ধে আরাকানবাসীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ সাহাবাজপুর, সন্দীপ এবং চট্টগ্রাম পর্যন্ত অধিকার করিলেন। এইরূপে নিম্নবঙ্গে "মগের মুলুকের" অবসান হইলে পুনরায় শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

মগ এবং ফিরিঙ্গি অপেক্ষা সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর আর এক প্রবল শত্রুর আক্রমণে দক্ষিণ সাহাবাজপুর বহুবার শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই ভীষণ শত্রু স্বয়ং সমুদ্র। বাংলা ১২৮৩ সনে (১৮৭৬ খ্রিঃ অঃ ৩১ অক্টোবর) যে ঝটিকাবর্ত সংঘটিত হয়, তাহার ফলে মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের সলিলরাশি বাকরগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় তিন লক্ষ মনুষ্য, বহু সংখ্যক গবাদি জন্তু ও অনেক নৌকা এবং গৃহ বিনষ্ট করে। এই মহাঝড়ে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের অন্তর্গত দৌলত খাঁ এবং তৎ পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।[১৫২]

মগ এবং পর্তুগিজগণ সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইলে ভূলুয়ায় বিজয়-নারায়ণ মজুমদার এবং আসান উল্লা শিকদার এই পরগনায় জমিদারি প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে বিজয়পুর এবং আসানি নামক গ্রামদ্বয়ে বাসস্থান স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহারা নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে পর নবাব আবু সৈয়দ নানা জনৈক ফকিরকে এই পরগনা প্রদান করিলেন। আবু সৈয়দ স্বীয় পত্নী সরতাজ বিবির নামে এই জমিদারি গ্রহণ করিয়া শ্রীরামপুর নিবাসী কৃষ্ণরাম চক্রবর্তীকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। আবু সৈয়দ এবং কৃষ্ণরাম ভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হাওলাদারদিগকে প্রদান করিয়া তাহাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। ইহাদিগের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিশাল দ্বীপের অনেক অরণ্য পরিষ্কৃত হইয়া শস্যশালিনী হইল।

আবু সৈয়দ এবং সরতাজ বিবির তিরোধানের পর কতিপয় বৎসর অতীত হইলে ইহাদিগের পৌত্র মির্জা আহম্মদজান সমগ্র পরগনার অধীশ্বর হইলেন। মির্জা জানের খোদাবক্স নামে এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল। সম্পত্তি লইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে গৃহ বিবাদের বিষময় ফল শীঘ্রই ফলিল। ১৭৮০ খ্রিঃ অব্দে বাকি রাজস্বে এই পরগনার সাত আনা অংশ বিক্রিত হইল, ঢাকা নিবাসী খাজে মাইকেল নামক জনৈক আর্মানি ইহা ক্রয় করেন। ১৭৮৬ খ্রিঃ অব্দে মাইকেল এই পরগনার অবশিষ্ট নয় আনা অংশও খরিদ করিলেন, কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরে সদাশয় কালেক্টর ডগলাস সাহেব মির্জা জানকে তিন আনা দেড় গণ্ডা এক ক্রান্তি অংশ প্রত্যর্পণ করিয়া দুঃস্থ জমিদারবংশের জীবিকা নির্বাহের উপায় করিয়া দেন। অদ্যাপি এই অংশ মির্জা জানের বংশধর ঢাকার মির্জা সাহেবগণ ভোগ করিতেছেন।

আর্মানিবংশের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীও অধিককাল স্থায়ী হইল না। মাইকেলের পুত্র খাজে আরতুনের মৃত্যুর পর হইতে এই বংশের অধঃপতন আরম্ভ হয়। অধুনা মাইকেলের বিশাল সম্পত্তি তদীয় বংশধরগণ ব্যতীত সিফেন্স, হার্নি, লুকস্, কগ্রাম প্রভৃতি আরও অনেক অংশীদারের হস্তগত হইয়াছে।

মির্জাজান এবং খাজে মাইকেলের সময়ে দক্ষিণ সাহাবাজপুর লবণের কারখানার নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ১৭৭৪ খ্রিঃ অব্দে ঢাকার শাসনকর্তা (Chief) বিখ্যাত বারওয়েল সাহেব (Richard Barwell) খাজে মাইকেল এবং খাজে কাওর্কের নিকট হইতে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কারখানার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, পরে আর এক ব্যক্তির নিকট হইতে আর এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া তাহাকেই ঐ ভার প্রদান করেন।[১৫৩] এই সকল কারণে ডিরেক্টরগণ (Court of Directors) কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া বারওয়েল যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বড়ই কৌতুকাবহ। "If I am mistaken in my reasoning, and the wish to add to my fortune has warped my judgment in a transaction that may appear to the Board [of Directors] in a light different to what I view it in, it is past ; I

cannot recall it, and I rather choose to admit an error than deny a fact." উত্তরে ডিরেক্টরগণ বলিয়াছিলেন "The extraordinary caution, and the intricate contrivances with which his share in this transaction is wrapped up, form a sufficient proof that he was not altogether misled in his judgment, and though there might be some merit in acknowledging an error before it was discovered, there could be very little in a confession produced by previous detection."[১৪৩]

১৮৪৫ খ্রিঃ অব্দে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে মহকুমা স্থাপিত হয় এবং মেহেন্দিগঞ্জের মুন্সেফি দৌলতখাঁয় পরিবর্তিত হয়। সর্ব প্রথমে এই দ্বীপ ঢাকা জেলালপুরের অন্তর্গত ছিল। পরে ক্রমান্বয়ে বাকরগঞ্জের এবং নোয়াখালির এলাকাভুক্ত হইয়া ১৮৬৯ খ্রিঃ অব্দে পুনরায় বাকরগঞ্জের অন্তর্ভূত হইয়াছে। ১২৮৩ সনে মহাঝড়ে দৌলত খাঁ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে ভোলায় হেড কোয়াটার স্থাপিত হয়।

১২ তপ্পে কৃষ্ণদেবপুর

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কৃষ্ণদেবপুর বাকরগঞ্জের একটি প্রসিদ্ধ পরগনা। পূর্বে ইহা উত্তর সাহাবাজপুরের অন্তর্গত ছিল, সুপ্রসিদ্ধ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে এই জমিদারি সৃষ্ট হয়। ইহার সরকারি রাজস্ব ৮১৬ টাকা মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ এই পরগনার প্রথম জমিদার। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বঙ্গদেশের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বাটিতে অধ্যাপনা করিতেন, এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বুদ্ধিবলে তাঁহার মনোরঞ্জনে সমর্থ হন। এই সময়ে গঙ্গাগোবিন্দ বঙ্গদেশের দেওয়ানপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অসীম প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ; স্বয়ং হেস্টিংস তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেওয়ান বাহাদুরের পরামর্শ ব্যতীত রাজস্ব এবং জমিদারি সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ই মীমাংসিত হইত না, তাঁহার অখণ্ড প্রতাপে সমগ্র দেশ কম্পিত হইত। তাঁহারই অনুগ্রহে কৃষ্ণদেব স্বনামে জমিদারি লাভ করেন।

জমিদারি প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ কি কি কার্য করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ বহুকাল অতীব সম্মান ও সমৃদ্ধির সহিত এই জামিদারি ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না। বর্তমানে এই পরগনা কৃষ্ণদেবের বংশধরগণের দখলে নাই। ইহার কতক অংশ বালিয়াটির সাহগণ ক্রয় করিয়াছেন। অপর অংশ ময়মনসিংহের জনৈক ভূম্যধিকারীকে পত্তন প্রদান করা হইয়াছে।

১৩ তপ্পে আলিনগর

তপ্পে আলিনগর দক্ষিণ সাহাবাজপুরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র পরগনাও উত্তর সাহাবাজপুর হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। নাম দৃষ্টে মনে হয় এই স্থল মুসলমান কর্তৃক স্থাপিত, কিন্তু কখন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

খ্রিষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন কুরজন (Mr. John Courjon) নামক এক ব্যক্তি এই ক্ষুদ্র পরগনার একমাত্র ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইহার সরকারি রাজস্ব ১৫৭৮ টাকা মাত্র।

১৪ রামনগর

এই পরগনা মহারাজ রাজবল্লভের জমিদারি হইতে উৎপন্ন। বাকরগঞ্জের অধিকাংশ পরগনাই এককালে স্বনামপ্রসিদ্ধ মহারাজের অধীন ছিল। তিনি যে সময়ে ঢাকা নগরে নায়েব-নাজিম পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন রামনারায়ণ সেন নামক কায়স্থবংশজ জনৈক কর্মচারী তাঁহার অধীনে কার্য করিতেন। রামনারায়ণের পিতার নাম অনন্তরাম সেন, পিতামহের নাম রত্নগর্ভ সেন, জন্মস্থান কোথায় তাহা জানা যায় নাই, তবে তিনি রাঢ় দেশবাসী ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ রায়েরকাঠির দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ-রাজগণের ন্যায় রামনারায়ণের বংশধরগণ মহাত্মা গঙ্গাধর সেন

এবং নরপতি সেনের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। রায়েরকাঠির রাজগণের সহিত রামনগরের পূর্ব জমিদারবংশের জ্ঞাতিত্ব থাকাই সম্ভব।

যখন রামনারায়ণ মহারাজ রাজবল্লভের অধীনে কার্য করিতেন তখন রাজকন্যার বিবাহোপলক্ষে সপ্তবিংশতি লক্ষ মুদ্রাস্থলে দ্বাত্রিংশত লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া কর্মচারীগণ প্রকাশ করিল। রাজা রাজবল্লভ ইহার নিকাশ বুঝিয়া লইবার জন্য রামনারায়ণকে নিয়োজিত করিলে, কর্মচারীগণ তাঁহার নিকট নিকাশ দিতে অসম্মত হন ও তাঁহাকে অপমান করেন। মহারাজের নিকট একথা প্রকাশ হইলে, তিনি সেই কর্মচারীদিগকে কারারুদ্ধ করিলেন। অবশেষে কর্মচারিগণ রামনারায়ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত নগদ দশ সহস্র মুদ্রাসহ হিসাব নিকাশ পরিষ্কার করিয়া দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। রামনারায়ণ কাগজপত্র এবং মুদ্রাগুলি লইয়া রাজা রাজবল্লভের নিকট উপস্থিত হন। রাজা কর্মচারীর সততা দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই ঐ মুদ্রা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রামনারায়ণ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন "মহারাজ, আমার বসতবাড়ির স্থান নাই, টাকা লইয়া কি করব?" তখন রাজা, রামনারায়ণকে বাসোপযোগী ভূমি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ইদ্রাক্‌পুর পরগনার জমিদারের প্রতি তাঁব জন্য বাটি নির্মাণের আদেশ করিলেন। রামনারায়ণ ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন "মহারাজ, আমি রাঢ়দেশীয়, বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে কিরূপে প্রচলিত হইব?" তদুত্তরে ব্রজবল্লভ বলিলেন "তোমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না, চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের নেতা, তাঁহাদের দ্বারা তোমাকে এই সমাজে প্রচলিত করিব।" তখন রামনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজ-বাটির নিকটবর্তী কোন স্থানে বাটি নির্মাণ করা স্থির করিয়া ঘণ্টেশ্বরের পার্শ্বলগ্ন সাহাজিরা নামক মৌজারি চারি দ্রোণ পরিমিত ভদ্রাসন ঠিক করিলেন।

অনন্তর কতিপয় বৎসর অতীত হইলে নবাব আলিবর্দী খাঁ রাজবল্লভের কতক হিসাব-কাগজ তলব করায় রাজা বিশ্বাসী রামনারায়ণ কর্তৃক কাগজ প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। নবাব সেই কাগজ দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলে, রাজবল্লভ রামনারায়ণকে ষাষ্টি সহস্র মুদ্রা আয়ের জমিদারি পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিলেন। উত্তর সাহাবাজপুর, চন্দ্রদ্বীপ, আজিমপুর রতনদি কালিকাপুর, বাঙ্গরোড়া প্রভৃতি অনেক পরগনা হইতে সাতাশটি কিসমত বাহির করিয়া এই পরগনা গঠন করা হয়। রামনারায়ণ তাঁহার পুত্র রামদাস সেন নামে এই পরগনার সনন্দ প্রাপ্ত হন ; এবং রামদাসের নামানুসারে এই পরগনার নাম রামনগর হয়।

রামনারায়ণ পুত্রের উপর জমিদারির ভার অর্পণ পূর্বক স্বয়ং রাজবল্লভেব কৃপায় নবাবসরকারে কার্য প্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে বাস করিতে লাগিলেন। পূত-সলিলা ভাগীরথী-বিধৌত বঙ্গের পূর্ব রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগরেই তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার জামাতা ইদিলপুর জমিদার বংশীয় কেশব বায়কে কেশবপুর নামক ভূসম্পত্তি প্রদান করেন।

রামনারায়ণের পুত্র রামদাস সেন, ঘোষ, বসু প্রভৃতি কুলীন কায়স্থদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কায়স্থ-সমাজে মহাপাত্র বলিয়া আদৃত ও পরিচিত হন, এবং নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং নবশায়ক প্রভৃতি নানা শ্রেণির লোক আনয়ন করিয়া তাহাদিগের বাসস্থান সংস্থাপন করিয়া দেন। তিনি সাওয়ার মজুমদারবংশীয় রঘুদেব তর্ক-পঞ্চাননকে গুরুরূপে বরণ করেন এবং ভূসম্পত্তি দান করিয়া উক্ত গ্রামেই স্থাপন করেন। তথাকার ভট্টাচার্যগণ উক্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয়েরই সন্তান।

১২৮৭ সালে রামদাসের পৌত্র বিষ্ণুদাস রায়ের সময়ে এই জমিদারি নিলাম হওয়ায় শিবদয়াল ত্রিবেদি ইহা খরিদ করেন ; কিন্তু জমিদারি দখল করিতে অসমর্থ হওয়ায় উহা পুনরায় নিলাম করিয়া দেওয়া হইলে, ঢাকার কৌলীপাড়ার জমিদার বংশ বার আনি, এবং মাধবপাশার মুদি-জমিদারগণ অপর চারি আনি অংশ ক্রয় করেন। রামনগরের পূর্ব জমিদারবংশ অতি শোচনীয় অবস্থায় সাহাজিরা গ্রামে বাস করিতেছেন ; জীর্ণ অট্টালিকা, বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে।

১৫ তরফ রামহরিচর

রামহরিচর মহানদী মেঘনার মোহানায় কলমি দ্বীপের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত। ১৭৮৫ খ্রিঃ অব্দে সুন্দরবনের স্বনামধন্য শাসনকর্তা মহামতি টিলমান হেঙ্কেল নাজিমপুরের মুসলমান জমিদারবংশোদ্ভব সিরাজউদ্দিনের পত্নী দোর্দনাখানম্ এতেমন্নেসাকে এই নব গঠিত "তরফ" অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরগনা প্রদান করেন। উক্ত মহিলার নামানুসারেই এই পরগনার "দোর্দনাখানম্" নামক তালুকের নামকরণ হইয়াছে। পট্টি, মায়, নাংলা এই তিনটি ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া এই তালুক গঠিত। "দোর্দনাখানম্"ই রামহরিচরের একমাত্র তালুক, এতদ্ভিন্ন ইহার অন্তর্গত অন্য কোন তালুক নাই।

১৬ কল্‌মিচর ও তরফ

কল্‌মিচর মহানদী মেঘনার মোহনায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র। ইহার একদিকে অনন্ত নীল সিন্ধু, অপর তিনদিকে সমুদ্রতুল্য মহানদী। এই দ্বীপের অধিবাসীগণ অধিকাংশই মুসলমান; কৃষিকার্য এবং মহিষপালন ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ইহারা কুক্‌রি, মুক্‌রি প্রভৃতি নিকটবর্তী দ্বীপ সমূহে সচরাচর মহিষ চরাইতে গমন করে; এতদ্ব্যতীত বাকরগঞ্জের অন্যান্য স্থলে ইহারা কদাচিৎ যাতায়াত করিয়া থাকে।

কথিত আছে, বদনআলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথমে এই দ্বীপে কৃষিকার্য আরম্ভ করে। যৎকালে মহামতি টিলমান্ হেঙ্কেল দোর্দনাখানম্ তালুক প্রদান করিয়াছিলেন তখন এই কল্‌মি দ্বীপও বৈদ্যনাথ সেন নামক এক ভদ্রসন্তানকে পত্তন প্রদান করেন। বৈদ্যনাথ প্রকৃতপক্ষে একজন বেনামিদার মাত্র। নাজিরপুরের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার মহাত্মা আল্‌ফত গাজির বংশধর সিরাজউদ্দিনই প্রকৃত ভূস্বামী।

অস্মদ্দেশের ইংরাজ শাসনকর্তাদিগের মধ্যে মহাত্মা হেঙ্কেলই এই দ্বীপে প্রথম পদার্পণ করেন। হেঙ্কেল অতীব সদাশয় এবং কার্যদক্ষ লোক ছিলেন। কথিত আছে তাহার সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সুন্দরবনবাসী মলঙ্গিগণ তাহার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া অর্চনা করিত। "A strong proof that the natives of this country are sensible of kind treatment and easily governed without coercive measures"[১৪৫] মহামতি হেঙ্কেলের পর বাকরগঞ্জের প্রথম কালেক্টর স্বনামধন্য হান্টার সাহেব এই দ্বীপ পরিদর্শন করেন। তৎকালে সিরাজউদ্দিনের বিধবা পত্নী এতেমন্নেসার অধীনস্থ মতিউল্লা খাঁ নামক জনৈক তালুকদার এই দ্বীপের প্রধান ভূম্যধিকারী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কল্‌মিচর, ইমদাদ্ আলি মুন্সি এবং চব্বিশ পরগনার এক ঘোষ পরিবারের হস্তগত হয়। ইহাদিগের সময়ই (১৮৭৪ খ্রিঃ অঃ) মহাত্মা বেভারিজ্ এই দ্বীপে গমন করিয়া ইহার ইতিবৃত্ত এবং প্রাকৃতিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

১৭ সুলতানাবাদ

পরগনে সুলতানাবাদ বাউফল এবং বাকরগঞ্জ থানায় অবস্থিত। এই পরগনার কি নিমিত্ত সুলতানাবাদ নাম হইল তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায় না। বঙ্গদেশের কোন সুলতানের নামানুসারে এই পরগনার নামকরণ হইয়াছে ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। কিন্তু এই সুলতান কে তাহা সঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। বাংলার স্বাধীন পাঠান নৃপতিগণ সকলেই সুলতান উপাধি ধারণ করিতেন। হইতে পারে, ইহাদিগের কাহারও সময়ে সুলতানাবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমরা সুলতানাবাদকে এত প্রাচীন বলিয়া মনে করি না; এই পরগনা যে পাঠানযুগের বহু পরে, সম্রাট আকবরেরও পরবর্তীকালে গঠিত হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আকবরের রাজত্বকালে বাকরগঞ্জের তদানীন্তন মহালগুলি সরকার ফতিয়াবাদ এবং সরকার বাকলার অন্তর্গত ছিল। আবুল ফজলের গ্রন্থে ফতিয়াবাদ এবং বাকলার অন্তর্গত মহাল সমূহের যে তালিকা আছে তাহাতে সুলতানাবাদের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বিশেষত সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও মুসলমান সাম্রাজ্য বর্তমান বাউফল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। অতএব সুলতানাবাদ আকবরের পরেই গঠিত হইয়াছে ইহা মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

আকবরের পরবর্তী বঙ্গের সুবেদারগণের মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের মধ্যম পুত্র সুজা সুলতান উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। সুলতান সুজা আরাকানবাসী দস্যুগণের দমনার্থ নিম্নবঙ্গে আগমন করিয়া বাকরগঞ্জের বহুস্থলের অরণ্য পরিষ্কার করিয়া লোকালয় স্থাপন এবং দুর্গাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্য মোরাদখানা অর্থাৎ বর্তমান পটুয়াখালি বিভাগের উত্তরভাগে অবস্থিত মুরাদিয়া এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস মুরাদিয়ার অনতিদূরবর্তী সুলতানাবাদও এই সময়ে সৃষ্ট হয় এবং সুলতান সুজা হইতেই ইহার নামকরণ হইয়াছে।

সুলতানাবাদের জমিদারগণ সকলেই মুসলমান। ঢাকার নবাব বাহাদুর এই পরগনার সর্বপ্রধান অংশীদার। অপর অংশ সৈয়দ আবদুল্লা চৌধুরি, মেহেরুন্নেসা খানম্, আসানমির এবং তোজম্মল আলি প্রভৃতির বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন।

১৮ কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়া

কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়া পটুয়াখালি বিভাগের অন্তঃপাতী বাউফল থানায় অবস্থিত। বাউফল পুলিশ স্টেশনের অনতিদূরবর্তী "দাসপাড়া" নামক গ্রাম লইয়াই এই "জোয়ার" অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরগনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাত্মা বেভারিজের সময়ে হামিদোন্নেহা খাতুন এই স্থলের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

১৯ খাঞ্জা বাহাদুরনগর

এই ক্ষুদ্র পরগনাও বাউফল থানার অন্তর্গত। ইহা কোন সময়ে কাহার কর্তৃক স্থাপিত হয় তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন বিখ্যাত খাঞ্জে আলি ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার নামানুসারেই এই স্থলের নামকরণ হইয়াছে; কিন্তু এই কথা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। একমাত্র নামের সাহায্য ব্যতীত এ বিষয়ে অন্য কোনও প্রমাণ বর্তমান নাই। মৌলবী মহম্মদ ফজেল মহাত্মা বেভারিজের সময়ে এই পরগনার প্রধান অংশীদার ছিলেন।

২০ শ্রীরামপুর

বাকলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর অতি প্রাচীন পরগনা। মহানদী মেঘনার তরঙ্গাভিঘাতে ইহার বহুস্থল অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা বাকরগঞ্জের উত্তর প্রান্তস্থিত মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত।

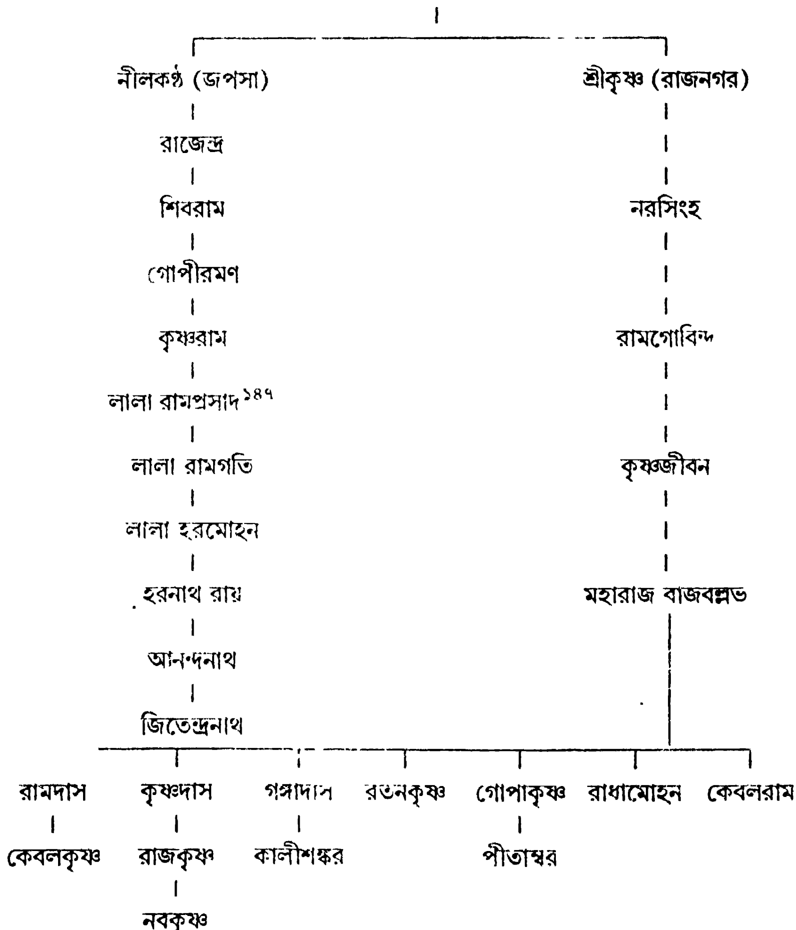
দিল্লিশ্বর আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে শ্রীরামপুর সরকার বাকলার একটি প্রসিদ্ধ মহাল বলিয়া পরিগণিত হইত। এই পরগনার নাম দৃষ্টে সহজেই অনুমান হয় যে ইহার আদিম জমিদারগণ হিন্দু ছিলেন, পরিশেষে ইহা মুসলমান ভূম্যধিকারিগণের করায়ত্ত হয়। এই ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে বোসানউল্লা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৫৯ খ্রিঃ অব্দে সুবিশাল দক্ষিণ সাহাবাজপুর দ্বীপ ইহার বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু মহানদী মেঘনার ভীষণ আক্রমণে শ্রীরামপুরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে।[১৪৬] সুতরাং এই প্রাচীন পরগনার অতীতগৌরবের চিহ্নমাত্র বর্তমান নাই।

বর্তমান সময়ে ঢাকার মির্জা সাহেবগণ এই পরগনার প্রধান ভূম্যধিকারী। মির্জা সাহেবগণ দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ভূতপূর্ব জমিদার মির্জা আহম্মদ জানের বংশধর।

২১ তপ্পে আবদুল্লাপুর

এই পরগনা পূর্বে সুবিশাল সেলিমাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; সেলিমাবাদের সার্ধ চারি আনি অংশ লইয়াই এই পরগনার সৃষ্টি হয়। ফরিদপুরের অন্তঃপাতী জপসা গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈদ্য জমিদারগণ ইহার অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিলেন। এই জমিদারগণ বাকরগঞ্জবাসী না হইলেও এতদ্দেশের সহিত ইহাদিগের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতএব এস্থলে ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বোধহয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ধন্বন্তরিকুলোদ্ভব মহাত্মা গোপীরমণ সেন এই জমিদার বংশের স্থাপয়িতা। ইহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ বেদগর্ভ সেন বিদ্যাধ্যয়ন জন্য যশোহর জেলান্তর্গত ইতনা হইতে বিক্রমপুরে আগমন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ রাজনগর গ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বেদগর্ভের দুই পুত্র, নীলকণ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণের বংশেই বৈদ্যকুল-প্রদীপ মহারাজ রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোপীরমণ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ নীলকণ্ঠের প্রপৌত্র। গোপীরমণের বংশধরগণের যশসৌরভে একসময়ে সমগ্র পূর্ববঙ্গ আমোদিত হইত। আমরা নিম্নে ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা প্রদান করিলাম।



গোপীরমণের পুত্র কৃষ্ণরাম এবং রামমোহন যথাক্রমে "দেওয়ান" এবং "ক্রোড়ি" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কৃষ্ণরাম দেওয়ানের পুত্র রামপ্রসাদ বহু কুলক্রিয়া এবং অন্যান্য সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বজাতি-সমাজে অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জপসার জমিদারবংশে তিনিই সর্বপ্রথম গৌরবাত্মক "লালা" উপাধি প্রাপ্ত হন। লালা রামপ্রসাদের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে মহাত্মা রামগতি রায় নানাগুণে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ, উদার, ধার্মিক এবং বিদ্যানুরাগী তৎকালে অধিক দৃষ্টিগোচর হইত না। "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" এবং "যোগকল্পলতিকা"

নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার অসামান্য বিদ্যানুরাগের আংশিক পরিচায়ক মাত্র। নব্বই বৎসর বয়ঃক্রমে উক্ত মহাপুরুষ কাশীধামে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রামগতির বিদুষী কন্যা আনন্দময়ী এবং মধ্যম সহোদর জয়নারায়ণের কবিত্ব শক্তিও অসামান্য ছিল। তাঁহারা "হরিলীলা" এবং "চণ্ডীকাব্য" নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। তাঁহাদিগের প্রতিভাবলে জপসা একটি সারস্বতকুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। তখন এই ক্ষুদ্র পল্লি, বিক্রমপুর অঞ্চলে সর্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত এবং সমাদৃত হইত।

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্বেতে প্রচার
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার।
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর।
বিশিষ্ট অম্বষ্ঠশ্রেণী বসতির স্থান
জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান।[১৪৮]

রামগতি রায়ের তিরোধানের পর হইতেই জপসার ভাগ্যাকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হইল।

২২ তপ্পে কাদিরাবাদ

এই ক্ষুদ্র পরগনা মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত। "তপ্পে" এই শব্দ দৃষ্টে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে এই স্থল নিকটবর্তী কোন বৃহৎ পরগনা হইতে গঠিত হইয়াছে।[১৪৯] ঐতিহাসিকগণ বলেন সেলিমাবাদ এবং তদুপকণ্ঠস্থিত পরগনাগুলি ব্যতীত বাকরগঞ্জস্থিত অন্যান্য যাবতীয় পরগনা চন্দ্রদ্বীপ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে।[১৫০] অতএব মনে হয় কাদিরাবাদও চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র পরগনায় পরিণত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র পরগনা প্রথমে মুসলমান জমিদারগণের অধীন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। বর্তমানকালে ঢাকা জেলার অন্তর্গত কৌলিপাড়ার ব্রাহ্মণবংশীয় ভূস্বামীগণ ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

২৩ তপ্পে আজিমপুর

এই পরগনা চন্দ্রদ্বীপ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কোন সময়ে কাহার কর্তৃক পৃথকীভূত হয় তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। ঢাকার মোগল রাজপ্রতিনিধিগণের মধ্যে আজিম নামধারী তিন জনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম আজিম ১৬৩৩ খ্রিঃ অঃ হইতে ১৬৩৭ খ্রিঃ অঃ পর্যন্ত সুবেদারপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার শাসন সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই দৃষ্ট হয় না, পরন্তু ইহার আলস্য এবং কর্তব্য কার্যে ঔদাসীন্য দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট শাহজাহান শীঘ্রই ইহাকে পদচ্যুত করেন। দ্বিতীয় আজিম স্বয়ং সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মধ্যমপুত্র, ইনি ১৬৭৮ খ্রিঃ অব্দে সুবেদার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কিয়ৎকাল পরেই রাজস্থানে পিতৃশিবিরে গমন করেন। তৃতীয় আজিম সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র প্রসিদ্ধ নবাব আজিম ওসান। আজিম ওসান ১৬৯৬ খ্রিঃ অব্দে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পাঠানবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপ দমন করিয়া দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইহার শাসন সময়ে দেওয়ান জাফর খাঁ (মুর্শিদকুলি) বাংলার রাজস্ব এবং জমা-জমির অভিনব বন্দোবস্ত আরম্ভ করেন এবং ইহারই নামানুসারে হুগলীর বাজার এবং পাটনা নগরের পূর্বনাম পরিবর্তিত হইয়া যথাক্রমে "আজিমগঞ্জ" এবং "আজিমাবাদ" বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। তপ্পে আজিমপুরও এই সময়ে সৃষ্ট হয় এবং জাফর খাঁর বন্দোবস্তের ফলেই চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। বর্তমানে এই পরগনার অবস্থিতি নির্ণয় করা বড় দুরূহ, কারণ ইহার ভূমি অতিশয় বিক্ষিপ্ত। বাকরগঞ্জ হইতে বরিশাল, গৌরনদী এমন কি সুদূর বিক্রমপুর পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। গৌরনদী থানার অন্তর্গত পিপড়াকাঠি গ্রামের সমাদ্দারগণ এই পরগনার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই সমাদ্দারগণ ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত, ইহারা বহুকাল অতীব সম্মানের সহিত এই ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন কিন্তু ভাগ্যচক্রের আবর্তনে ইহাদিগের সম্পত্তির অধিকাংশ এখন

পরহস্তগত। বর্তমানে চরামদ্দি নিবাসী আছমাতালি খাঁ চৌধুরি সাহেব এবং লাখুটিয়ার প্রসিদ্ধ রায় বংশই ইহার প্রধান অংশীদার; জাহাপুরের দত্তগণও কতক অংশের মালিক।

২৪ জাহাপুর

মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত জাহাপুর একটি সুপ্রাচীন পরগনা। এই স্থল মহানদী আড়িয়ালখাঁর শাখা ডাকাতিয়া নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। ইহার সরকারি রাজস্ব ৮৯৬।। ৯ মাত্র।

জাহাপুর গ্রামের দত্তগণ এই পরগনার ভূম্যধিকারী। ইহারা অতি প্রাচীন কাল অবধিই বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত এই জমিদারি শাসন-সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু বাকলার অন্যান্য বহু প্রাচীন জমিদার বংশের ন্যায় ইহাদিগেরও সৌভাগ্য-সূর্য বহুদিন অস্তমিত হইয়াছে। সর্বগ্রাসী আড়িয়াল খাঁ দত্তগণের কালস্বরূপ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সম্পত্তির অধিকাংশ স্বীয় বিশাল উদরে প্রেরণ পূর্বক 'ডাকাতিয়া' নামে সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। বর্তমানে দত্তগণের কীর্তি, দীঘিতি সকলই ডাকাতিয়া নদীর কুক্ষিতে অবস্থান করিতেছে।

২৫ ইদ্রাকপুর

পরগনে ইদ্রাকপুর বাকরগঞ্জ জেলার উত্তর প্রান্তে গৌরনদী এবং মেহেন্দিগঞ্জ থানায় অবস্থিত। মহানদী আড়িয়াল খাঁ ইহার মধ্যস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই পরগনার কতকগুলি জমি এজমালি, ইহাদিগের রাজস্বে অর্ধভাগ ইদ্রাকপুরে এবং অপরভাগ রসুলপুরে প্রদত্ত হয়।

১৭৮৪ খ্রিঃ অব্দে ইমামউদ্দিন চৌধুরি নামক এক ব্যক্তি এই পরগনা ক্রয় করিয়াছিলেন। এই ইমামউদ্দিনের কোনই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার কৃতকার্যাবলীও বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে।

ঢাকা নগরীর খাতুনবংশীয় আমিরন্নেসা, আবদেন্নেসা এবং করিমন্নেসাই ঐতিহাসিকপ্রবর বেভারিজের সময়ে এই পরগনার সর্বপ্রধান অংশীদার ছিলেন। নলচিড়ার নিকটবর্তী সরিকল এবং গচুয়া নামক গ্রামদ্বয়ে ইহাদিগের কাছারি সংস্থাপিত। লৌহজঙ্গের প্রসিদ্ধ কুণ্ডগণ এই পরগনার তিন অংশ ক্রয় করিয়াছেন। কার্তিকপুরের নাজিমউদ্দিন চৌধুরি সাহেবও ইহার কতক অংশের স্বত্বাধিকারী।

২৬ রসুলপুর

রসুলপুর বাকলার একটি অতি প্রাচীন পরগনা। এই পরগনা বঙ্গদেশে মোগলসাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার বহু পূর্বে গঠিত হইয়াছে। সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বকালে ইহা সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ মহাল বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎকালে ইহার রাজস্ব ১০৩৭৬৭ ডাম অর্থাৎ প্রায় ২৫৯৪ টাকা ছিল। বর্তমানে এই পরগনার অন্তর্গত কোন জমিদারিই বাকরগঞ্জে অবস্থিত নহে।

খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অংশীদারগণের বেবন্দোবস্তে এই জমিদারির অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। তখন গবর্ণমেণ্ট জৈনউদ্দিন নামক একজন অংশীদারকে সমগ্র সম্পত্তির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। জৈনউদ্দিন যেমন শান্তিপ্রিয় তদ্রূপ বিচক্ষণ ছিলেন। পূর্ব বন্দোবস্তের দোষে জমিদারি মধ্যে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা ছিল তিনি তৎসমুদয় নিরাকৃত করিয়া তদানীন্তন কালেক্টর ডগলাস সাহেবের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

২৭ বাঙারোড়া

গৌরনদী থানার অন্তঃপাতী বাঙারোড়া অতীব প্রাচীন এবং বিখ্যাত পরগনা। এই পরগনায় গৈলা-ফুল্লশ্রী, শোলোক, বাটাজোড়, মাহিলাড়া প্রভৃতি বহু সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বিদ্যমান। বাদশাহী শাসনে ইহা ফতিয়াবাদের অন্তর্গত ছিল ঃ—

রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত
মুল্লুক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক্‌সিম।

বাঙারোড়া শব্দ সেলিমাবাদ, ইদিলপুর প্রভৃতির ন্যায় যাবনিক নহে, পরন্তু বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় সংস্কৃতমূলক। কথিত আছে বখ্‌তিয়ার খিলজি কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের পর তরুণ, অরুণ, হরি, বিজয় অশোক প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজন্যগণ পুতিতুণ্ডকুলশেখর পণ্ডিত, গোবর্ধনাচার্য সমভিব্যাহারে এই স্থানে আগমন করিয়া কথঞ্চিত সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বঙ্গাধিপগণের আশ্রয়স্থান বলিয়াই ইহা বাঙ্গরোড়া (বাঙ্গ + আরূঢ়) নামে খ্যাত হয়।

তরুণ, অরুণ প্রভৃতি রাজপুত্রগণের শৌর্য বীর্য এবং কীর্তি সকলই সময়স্রোতের ভীষণ ঘূর্ণিপাকে অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে। কেবল তাহাদিগের স্বনামাভিহিত জনপদ এবং সরোবরগুলি হিন্দুস্বাধীনতার যুগের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপি বর্তমান রহিয়া দর্শকগণের নয়নতৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে। গৈলা-ফুল্লশ্রীর অনতিদূরে ফটকস্থল নামক একটি গ্রাম দৃষ্ট হয়। স্থানীয় প্রবাদ যে এই স্থানেই রাজপুত্রগণের সেনানিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

পুতিতুণ্ডকুলশেখর মহাত্মা গোবর্ধনাচার্য যে স্থানে বাসভূমি নির্মাণ করিয়াছিলেন সেই স্থান অদ্যাপি গোবর্ধন বলিয়া খ্যাত। ইহার বংশধরগণ এখন বামরাইল, শোলোক, নলচিড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। প্রতিভাসম্পন্ন কুলীন পুতিতুণ্ড বাকলা ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না। এই নিমিত্ত হুগলী নিবাসী লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় "সম্বন্ধ-নির্ণয়" গ্রন্থে পুতিতুণ্ডের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই।

সেনারাজন্যগণের শেষ আশ্রয়স্থল বাঙারোড়া চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় বহুকাল স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই এই স্থল পাঠানসাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হইল। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে বর্তমান লস্করপাড় এবং সিপাইপাশা নামক গ্রামদ্বয়ে মুসলমান লস্কর এবং সিপাহিগণের স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইয়াছিল। গৈলার মধ্যে মুসলমান রাজপুরুষগণের গোলাবারুদ-খানা ছিল বলিয়া তাঁহার নাম 'গোলারপাড়'।

রাজনীতিক্ষেত্রে চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় অতুল কীর্তি স্থাপনে অসমর্থ হইলেও বাঙারোড়া অতি প্রাচীন কালেই বিদ্যাচর্চার একটি প্রধান স্থল বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই স্থানেই কবীন্দ্র ত্রিলোচনদাশ গুপ্ত এবং সাধকপ্রবর বিজয় গুপ্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়েও এই পরগনায় বহু প্রতিভাবান মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া অস্মদ্দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

সাধকপ্রবর মহাত্মা বিজয় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত ভগবতী মনসাদেবীর মন্দির এই পরগনার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে অবস্থিত। মন্দিরের নিকটে পদ্মপুষ্পে সুশোভিত মনসাকুণ্ড নামক একটি সরোবর বর্তমান, পূর্বকালে মনসা পঞ্চমী তিথিতে এই সরোবরতীরে লোকারণ্য হইত। নানা দিগদেশ হইতে অসংখ্য নরনারী এই স্থানে আগমন করিয়া ভক্তিভরে বিষহরির অর্চনা করিত। এমন কি অনেক মুসলমান-সন্তানও রোগ-মুক্তি অথবা অন্য কোন প্রকার শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় দেবীকে দুগ্ধ, ফল, পুষ্প প্রভৃতি প্রদান করিত। তৎকালে ফুল্লশ্রীই শ্রীশ্রীমনসা পূজার লীলা-নিকেতন ছিল। মনসা-কল্পিত স্থান বলিয়া ফুল্লশ্রীর অপর নাম মানসী। কথিত আছে শিবের কাশী, কৃষ্ণের বৃন্দাবনের ন্যায় মানসীও মনসার প্রিয় স্থান —।

শিবস্য চ যথা কাশী, বিষ্ণোর্বৃন্দাবনং যথা।
মানসী মনসা দেব্যা স্ত্রীপুর্য্যা স্ত্রিপুরংতথা।।

মনসা দেবীর ঘট সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা প্রথমে এই ঘট নির্মাণ করেন। স্বয়ং মহাদেব ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্বক এই ঘট মর্তে আনয়ন করিয়াছিলেন। লাটিক নামক একজন চণ্ডাল সর্বপ্রথমে উহা প্রাপ্ত হয়। লাটিকের বংশধরগণ অদ্যাপি বিষহরির সন্তান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কালক্রমে ঐ ঘট মনসাকুণ্ডে অন্তর্হিত হয়। কিয়ৎকাল অতীত হইলে পুতিতুণ্ড-কুলশেখর মহাত্মা গোবর্ধনাচার্য এখানে অর্চনা করিয়াছিলেন। খ্রিষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাধক প্রবর বিজয় গুপ্ত আবির্ভূত হন। বিজয়ের তিরোধানের পর ঐ ঘট পুনরায়

অন্তর্হিত হয়। বিজয় গুপ্তের প্রায় দুই শত বৎসর পরে ভবদাশবংশোদ্ভব রায় কাশীনাথ দাশ মজুমদারের পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর দাশ মহাশয় দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইলে ডিংসাইবংশোদ্ভ কালীশঙ্কর চক্রবর্তী কুণ্ডে অবতরণপূর্বক সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। তদবধি ঐ ঘাট অর্চিত হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে—

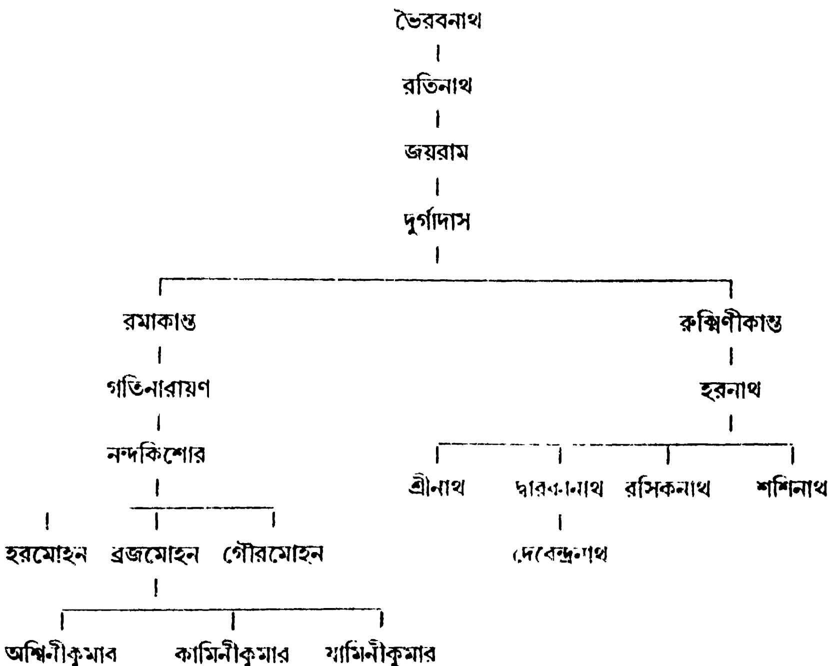
"ফুল্লশ্রী নগরে রম্যে কলৌ জাগর্ত্তি পন্নগী"।

ফুল্লশ্রীর প্রান্ত বিধৌত করিয়া ঘাঘর এবং ঘণ্টেশ্বর নামক মহানদদ্বয় প্রবাহিত ছিল। প্রবাদ যে চন্দ্রপতি সওদাগর প্রভৃতি বণিকগণ এই নদীপথে বাণিজ্যে গমন করিত। গমন কালে তাহারা যে স্থানে পূজা দিয়া যাইত তাহা অদ্যাপি জাহাজঘাটা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। নৈসর্গিক কারণে এই মহানদদ্বয়ের অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত প্রায়। নদগর্ভে বহুযোজনবিস্তীর্ণ বিলের উদ্ভব হইয়াছে।

লক্ষ্মণকাঠির প্রসিদ্ধ মহাবিষ্ণুমূর্তি এই পরগনার অন্তর্গত আটকগ্রামে পুষ্করিণী খনন কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১৪১] এই মহাবিষ্ণু চারিহস্ত পরিমিত, গরুড়বাহন, চতুর্ভুজ পাষাণময় মূর্তি। উহার এক হস্তে কমলে-কামিনী, দ্বিতীয় হস্তে চর্তুভুজ চক্রধর, তৃতীয় হস্তে চতুর্ভুজ গদাধর এবং চতুর্থ হস্তে চতুর্ভুজ শাঙ্গধর, কিরীটোপরি যোগাসনারূঢ় চতুর্ভুজ মূর্তি। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে দুরাত্মা কালাপাহাড়ের ভয়ে এই মূর্তি আটকের চৌধুরিগণ কর্তৃক দীর্ঘিকাগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিল।

বাঙ্গরোড়ার তালুকদারগণের সংখ্যা অনেক হইবে। হায়াতুন্নেসা খাতুন নামক এক ব্যক্তি ঐতিহাসিকপ্রবর বেভারিজের সময়ে এই পরগনার জমিদার ছিলেন। বর্তমান ভূমধ্যধিকারিগণের মধ্যে বাটাজোড়ের দত্তবংশ, শোলোকের মজুমদার, গৈলার দাশবংশ ও বার্থীর বকসিগণই প্রধান।

বাটাজোড়ের দত্ত বংশ



বাটাজোড়ের দত্তগণ এই পরগনার পুরাতন ও প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী। ইহারা পুরুষোত্তম দত্তের সন্তান। কথিত আছে যে মহারাজ আদিশূর দত্তবংশীয়দিগকে বাসস্থান স্থাপন জন্য বাটাজোড় গ্রাম অর্পণ করেন। পুরুষোত্তম দত্তের অব্যবহিত পরবর্তী বংশধরগণের বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে ইহা নিশ্চিত যে তাহার বংশসম্ভূত দত্তগণ মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া মজুমদার আখ্যা প্রাপ্ত হন।

সুপ্রসিদ্ধ ভৈরবনাথ দত্ত প্রথমে বাটাজোড় গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করিয়া সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করেন। স্বনামখ্যাত ব্রজমোহন দত্ত তাঁহার সপ্তম পুরুষ অধস্তন। ব্রজমোহন ১৮২৫ খ্রিঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাগুণে বরিশালে মুন্সেফি পদ প্রাপ্ত হন। তৎপূর্বে এই জেলার কোন হিন্দু সন্তান বিচারকের পদে নিযুক্ত হন নাই। তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নে পটুয়াখালিতে সাবডিভিসন স্থাপিত হয়। তিনি একসঙ্গে মুন্সেফ ও ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট-ডেপুটিকালেক্টরের কার্য করিতেন। তৎপরে কিছুদিন তিনি কৃষ্ণনগরে জজের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল গবর্নমেণ্টের কার্য করিয়া ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে ৬০ বৎসর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন; এবং জুন মাসে বরিশাল সহরে একটি এন্ট্রান্স স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল তাঁহার সুযোগ্য পুত্র স্বনামপ্রসিদ্ধ অশ্বিনীকুমার কর্তৃক 'ব্রজমোহন ইনিস্টিটিউসন' নামে উচ্চ কলেজে পরিবর্তিত হওয়ায় অনেক দরিদ্র ভদ্রসন্তানের শিক্ষার পথ সুগম হইয়াছে।

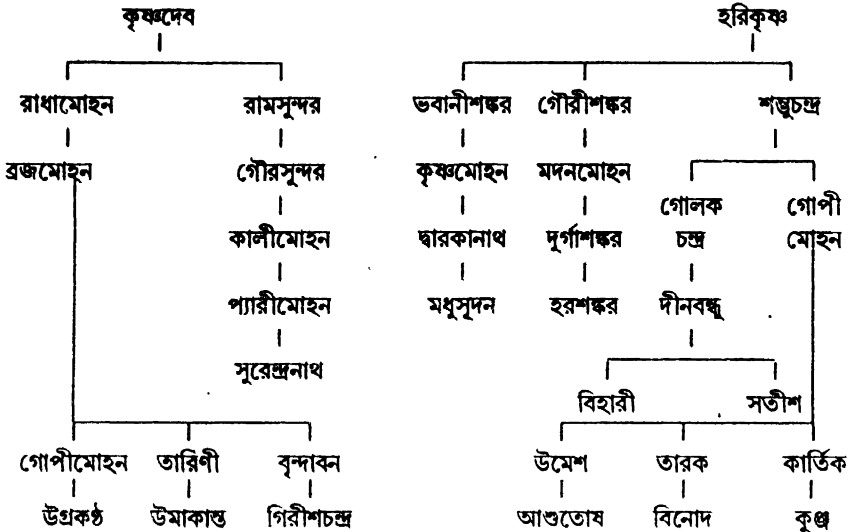
ব্রজমোহন স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্যে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার প্রযত্নে বাটাজোড় গ্রামেও একটি এন্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত হয়। যশোহরের লোন অফিস ও বার লাইব্রেরি তাঁহার কর্তৃকই স্থাপিত হয়। ব্রজমোহন একষট্টি বৎসর বয়সে স্ত্রী, তিন পুত্র এবং দুই কন্যা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

সুপ্রসিদ্ধ অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র; ইহার আত্মত্যাগ ধর্মনিষ্ঠা, স্বদেশহিতৈষিতা, তেজস্বিতা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণাবলী বঙ্গদেশের সর্বত্র পরিচিত। ইহার কর্মবহুল জীবনের বিস্তৃত বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। মধ্যম কামিনীকুমার ইংরাজি, বাংলা ও পার্সি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

দুর্গাদাসের পৌত্র হরনাথ দত্তও একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, তিনি গ্রামের বিবাদ মীমাংসা করিয়া শান্তি সংস্থাপন করিতেন। হরনাথের পুত্র দ্বারকানাথ একজন প্রতিপত্তিশালী উকিল ছিলেন। তিনি বরিশালের মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার প্রযত্নে জগদ্ধাত্রী পূজোপলক্ষে বাটাজোড় গ্রামে একটি মেলা সংস্থাপিত হইয়াছিল।

শোলোকের মজুমদার বংশ

শ্রীরামসেন
|
রামগোবিন্দ মজুমদার
|
রাজারাম
|
কৃষ্ণদেব — হরিকৃষ্ণ



শোলোক একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম; কিংবদন্তী এই যে পুরাকালে এখানে বহুতর পণ্ডিতের বাসহেতু সংস্কৃতকাব্যের অনুশীলন হইত বলিয়া গ্রামের নাম "শোলোক" (শ্লোক) হইয়াছে। এখানকার বৈদ্য-মজুমদারবংশ চিরপ্রসিদ্ধ ও সম্মানিত। এই জেলার অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পুরুষানুক্রমে ইহাদের প্রদত্ত বৃত্তি-ব্রহ্মোত্তর দ্বারা সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন।

কথিত আছে ইহাদের আদিপুরুষ শ্রীরামসেন রাঢ়দেশ হইতে এ জেলায় আগমন করেন, তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের অধীনে সৈনিক বিভাগে কার্য করিতেন। তখন মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ পুনঃপুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া নিরীহ গ্রামবাসীদিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রপীড়িত করিয়া যাবতীয় ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন পূর্বক লইয়া যাইত।

শ্রীরামসেন সুবিখ্যাত তীরন্দাজ ছিলেন, কোন এক যুদ্ধে বর্গিরা শ্রীরামসেন কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করে; সেই কারণে নবাব তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দিতে চাহেন, তখন শ্রীরাম অবসর বুঝিয়া ভূমি প্রার্থনা করেন। নবাব বাহাদুর প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া সনন্দ প্রদান পূর্বক তদানীন্তন ঢাকার শাসনকর্তার উপর সুন্দরবন হইতে উপযুক্ত ভূমি প্রদান করিবার জন্য পরোয়ানা দেন। নবাবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া ঢাকার শাসনকর্তা শ্রীরামকে বাকরগঞ্জের দক্ষিণে সুন্দরবন আবাদ করিয়া ভূমি গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে শ্রীরাম সেন আপন পরিবার ও কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীকৃষ্ণ সেনকে সঙ্গে লইয়া রাঢ়দেশ পরিত্যাগ পূর্বক বরিশালের নদীর পূর্ব বুহৈনগর নামক গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন। শ্রীরাম, সহোদর শ্রীকৃষ্ণকে রত্নদীর (আধুনিক গলাচিপা) চারি আনি অংশ ছাড়িয়া দিবার জন্য একমাত্র পুত্র রামগোবিন্দ সেনকে আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। বুহৈনগরের জলবায়ু স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় রামগোবিন্দ খুল্লতাত শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রহার গ্রামে স্থাপন করিয়া নিজে হোসেনপুর নামক গ্রামে সপরিবারে বাস করেন। উক্ত রামগোবিন্দই নবাব সরকার হইতে "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এখন চন্দ্রহারে বিদ্যমান আছেন।

এই সময়ে শোলোকে 'মলুয়ারাজা' বলিয়া এক ব্যক্তি ঢাকার শাসনকর্তার তহশিলদার ছিলেন। তিনি এখানে 'মলুয়ার দিঘি' নামক এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করেন, আজিও তাহা অব্যবহার্য অবস্থায় বর্তমান আছে। মলুয়ারাজ মাধবরামই হোসেনপুর হইতে রামগোবিন্দ মজুমদারকে শোলোকে আনয়ন করেন।

রামগোবিন্দের পুত্র রাজারাম সেন মজুমদার স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, তাঁহার কীর্তিগাথা আজও এই জেলার বহুস্থানে বর্তমান আছে। তিনি স্বীয় গুরুদেব ও কতিপয় অনুচর সঙ্গে লইয়া পিতৃসম্পত্তি সুন্দরবনে উপস্থিত হন। গুরুদেব সুন্দরবন আবাদের পূর্বে দেবীর অর্চনা করতঃ একটি যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারাই অরণ্যে অগ্নি প্রদান করেন। দেখিতে দেখিতে অনল হু হু শব্দে ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া হিংস্রজন্তুসমাকুল নিবিড় অরণ্য ভস্মসাৎ করিল, অনায়াসে আবাদের কার্য সুসম্পন্ন হইল। অবশেষে রাজারাম বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নানা দিগেদশ হইতে বিভিন্ন জাতীয় প্রজা আপন তালুকের মধ্যে সংস্থাপিত করেন। দয়াময়ীর নিত্যনৈমিত্তিক পূজার জন্য দৈনিক ১ টাকা হিসাবে ৩৬৫ টাকা আয়েব ভূসম্পত্তি দেবোত্তর ও ইষ্টদেব তর্কবাগীশ মহাশয়কেও বাৎসরিক ৩৬৫ টাকা আয়ের নিষ্কর হাওলা প্রদান করেন। বাজারাম প্রাচীর বেষ্টিত, ইষ্টক নির্মিত দয়াময়ীর মন্দিব ও শিবালয় নির্মাণ করিযা মহাসমারোহে শিব প্রতিষ্ঠা করেন; এবং সুচারুরূপে দৈনিক পূজাদির সুবন্দোবস্তের জন্য প্রচুর পরিমাণে ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া তথায় পূজক ব্রাহ্মণ পরিবার স্থাপন করেন। রাজারামেব এই সমস্ত কীর্তিস্তম্ভ পটুয়াখালি সাবডিভিসনের অন্তর্গত চিক্‌নীকান্দি গ্রামে আজও বর্তমান আছে। এখনও সেখানে প্রত্যহ দেবীর পূজা হয়। যথারীতি নীলচণ্ডী, দোলোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ আজও অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। প্রতি বৎসব মাঘীপূর্ণিমার দিন মন্দির সম্মুখে প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে।

রাজাবামের স্বর্গারোহণের পর তদীয় দুই পুত্রেব মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদেব সেন মজুমদার জ্যেষ্ঠত্বের হিসাবে সম্পত্তির নয় আনি ও কনিষ্ঠ হরিদেব সেন মজুমদার সাত আনি অংশ প্রাপ্ত হন। দুই সহোদরও অনেক ব্রহ্মোত্তব দান করেন, কৃষ্ণদেব "ছোট দিঘি" নামক জলাশয় খনন করেন। কৃষ্ণদেবের তিন পুত্র, রাধামোহন, রামসুন্দব ও শ্যামসুন্দর।

হরিদেবেব তিন পুত্র; ভবানীশঙ্কব, ধর্মপবায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ে শোলোকে ইষ্টক নির্মিত দ্বাদশ শিবমন্দিব প্রতিষ্ঠা করেন, এবং "নয়াদিঘি" নামে সুবৃহৎ জলাশয় খনন করেন। ভবানীশঙ্করের মৃত্যু হইলে তাঁহার সহধর্মিণী রাজেশ্বরী সহমৃতা হইলেন। ভবানীব কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণমোহন সুবিখ্যাত গোরাচাঁদ শিরোমণির অধ্যক্ষতায় বাঙারোড়ার উপাধিধারী পণ্ডিতদেব বিদায়ের শ্রেণি বিভাগ করিয়া দেন, সেই অনুসারে এই জেলাব সর্বত্রই পণ্ডিতদের বিদায়ের হার নির্দিষ্ট হয়। হরিদেবের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র বহুব্যয়সাধ্য পঞ্চাগ্নি, তুলাট প্রভৃতি মহাপুণ্যকার্য ও শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। শম্ভুর দুই পুত্র গোলকচন্দ্র ও গোপীমোহন। গোলোকচন্দ্রেব পুত্র দীনবন্ধু; ইনি সর্পাঘাতের একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক, ফণাধারী বিষধর কর্তৃক দংশিত কালকূটে জর্জরিত সংজ্ঞাহীন অনেক রোগীকে মন্ত্রবলে আরোগ্য করিয়াছেন। দীনবন্ধু সর্বদা ধর্মচর্চা করিয়া থাকেন, একাদিক্রমে অনাহারে, অনিদ্রায় সপ্তাহাধিক অতিবাহিত করিতে পারেন। ইনি সামান্য বাংলা লেখাপড়া জানেন, অথচ পাটিগণিত কি বীজগণিতে এমন অঙ্ক খুব কমই আছে যে আপন মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত নিয়মের বলে উত্তরে পৌঁছিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উপাধিধারী ব্যক্তি দীনবন্ধুকে পরীক্ষা করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন।

২৮-২৯ পরগনে বীরমোহন ও তপ্পে বীরমোহন

পরগনে বীরমোহন ও তপ্পে বীরমোহন গৌরনদী থানায় অবস্থিত। ১৭৮৭ খ্রিঃ অব্দে যে ভীষণ জলপ্লাবন হয় তাহাতে এই অঞ্চল একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে। ফলে এই বিশাল ভূখণ্ডের অনেকস্থল নিবিড় অরণ্যানী পরিব্যাপ্ত হইয়া হিংস্র শ্বাপদগণের আবাসভূমিতে পরিণত হয়। এই স্থলে ব্যাঘ্রের উৎপাত এক সময়ে এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, কোন ব্যক্তি দিনে দ্বিপ্রহরেও এই স্থলে আগমন করিতে সাহসী হইত না। স্বয়ং কালেক্টর বাহাদুব ইহার প্রতিকারকল্পে বঙ্গের নানাস্থান হইতে শিকারীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অনেক বৎসর অতীত হইলে এই পরগনা পুনরায় লোকালয়ে পরিণত হয়।

বীরমোহনের প্রাচীন জমিদারগণ ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। তাহারা বীরমোহনের চৌধুরি বলিয়া খ্যাত। বর্তমান সময়ে এই পরগনার কতক অংশ মাত্র চৌধুরিগণের ভোগদখলে আছে। অবশিষ্ট অংশ যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইলের জমিদারগণ ক্রয় করিয়াছেন।

৩০ হবিবপুর

এই পরগনা অতিশয় ক্ষুদ্র। ইহার যাবতীয় ভূমি গৌরনদী এবং স্বরূপকাঠি থানার অধীনে অবস্থিত। মীর হবিবের নামানুসারে এই পরগনার নাম সৃষ্টি হয়। মীর হবিব খাঁ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্রী-পতি (ঢাকার শাসনকর্তা) মুর্শিদখাঁর অমাত্য, ধনলুব্ধ, ক্রুর আগা বাখরের বন্ধু ছিলেন। যৎকালে বেভারিজ্ সাহেব বাকরগঞ্জের কালেক্টর পদে অধিষ্ঠিত, তখন বিক্রমপুর নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত ভূঁইয়া প্রধান অংশীদার ছিলেন। এই পরগনায় বহুসংখ্যক তালুক বর্তমান। তালুকদারগণের মধ্যে কেশবকাঠির সরকার বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩১ মৈজরদি

মৈজরদি বা মৈজদ্দি মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পরগনা। ইহার অনেক স্থল সর্বগ্রাসী মেঘনার অতলজলে নিমজ্জিত, এই নিমিত্ত বর্তমান সময়ে এই পরগনার আয়তন পূর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গোলাম গফুর নামক জনৈক মুসলমান ভদ্রসন্তানই সর্বপ্রথমে এই পরগনার স্বত্বাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই জমিদারি অধিককাল ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার স্বত্বাধিকার প্রাপ্তির অত্যল্পকাল পরেই এই পরগনার অধিকাংশ স্থল বিদেশি ভূস্বামীগণের হস্তগত হয়; তন্মধ্যে শ্রীনগরের জমিদার, ঢাকার মির্জাসাহেব এবং ভুঙ্গিবাড়ির চক্রবর্তীবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩২ জালালপুর

পরগনে জালালপুরের কিয়দংশ মাত্র বাকরগঞ্জে জেলায় অবস্থিত। ইহার প্রধানভাগ ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার অন্তর্গত। ১৭৮৭ খ্রিঃ অব্দের জলপ্লাবনে এই পরগনা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহার তিন বৎসর পরে ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ ডগলাস এই সম্বন্ধে রেভেনিউ বোর্ডে যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Mr.Day did not send down his proposed plan of settlement for upwards of six months after this district [Dacca Jalalpur, which included Faridpur and Bakarganj] had been visited by the most dreadful calamity ever remembered by the oldest inhabitant of the district, and which deprived it (by Mr Day's calculation) of upwards of 60,000 of its inhabitants, who either miserabley perished, or were reduced to the painful necessity of forsaking their habitations in search of a preacarious subsistence. Mr Day visited some of the parganas when the famine raged with the greatest violence. and had ocular proofs of the extreme misery to which the wretched inhabitants were reduced. He saw the parganas inundated, whole crops destroyed, and cultivation totally neglected. He had the mortification of beholding hundreds of the poor wretched inhabitants daily dying without the means of affording them the smallest relief.[১১২]

এই পরগনায় বহু তালুক বর্তমান। ১৭৯৪ খ্রিঃ অব্দে ইহার অন্তর্গত তালুকগুলির সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র ছিল। তালুকদারগণের মধ্যে অনেকের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। পূর্ব বর্ণিত ভীষণ দুর্যোগের পর রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে তালুকদারগণ অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। অনেকে গৃহ, বাটি, বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সদাশয় ডগলাস সাহেবের সুবন্দোবস্তের ফলে ইহাদিগের দুর্গতির কতকটা লাঘব হইয়াছিল।

৩৩ সায়েস্তাবাদ

পরগনে সায়েস্তাবাদ বরিশাল নগরীর অনতিদূরে অবস্থিত। বাদশাহী ও নবাবী আমলে এই স্থল চাকলা যশোহরের অধীন এবং সরকার খলিফাবাদের অন্তর্গত ছিল।

কথিত আছে যে বাংলার সুবিখ্যাত মোগল-রাজপ্রতিনিধি নবাব সায়েস্তা খাঁর নামানুসারেই এই পরগনার নামকরণ হইয়াছে। সায়েস্তা খাঁ সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং বাদশাহদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। যৎকালে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তখন এই নবদৃপ্ত মহারাষ্ট্র-শক্তি সমূলে নির্মূল করিবার নিমিত্ত বাদশাহ ঔরঙ্গজেব সায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন। মহারাষ্ট্র-বীরের অপূর্ব রণকৌশলে বিপর্যস্ত হইয়া সায়েস্তা খাঁ শীঘ্রই সম্রাট সমীপে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্রাট তখন তাহাকে চিরশান্তিপ্রিয় বাঙ্গালি জাতির শাসনভার অর্পণ করেন। সায়েস্তা খাঁ ঔরঙ্গজেব কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া দুইবার সুবাবাঙ্গলার নবাবপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মগ ও ফিরিঙ্গি আততায়ীগণের উপযুক্ত দণ্ড বিধানের নিমিত্ত বন্দুবায় নিম্নবঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। তাহারই অনুজ্ঞাক্রমে চন্দ্রদ্বীপের কিয়দংশ লইয়া সায়েস্তাবাদ পরগনা গঠিত হয়।

নবাবের অনুচরবর্গের মধ্যে ইবাব খাঁ নামক একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। ইবাব খাঁ কোন বিশেষ কার্যে নবাব বাহাদুরের মনোরঞ্জন করিয়া পুরস্কারস্বরূপ এই পরগনা প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কন্যা ওমদৎ উন্নিসা সমগ্র বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। ওমদৎ নবাব-পরিবারে বিবাহিতা হইয়া "বহু বেগম" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

বহুবেগমের জীবনবৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হওয়া যায় না। সুবিখ্যাত মহম্মদ হানিফ চৌধুরি সাহেব তাহার নিকট হইতেই সায়েস্তাবাদের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহম্মদ হানিফ চৌধুরি দীর্ঘকাল অতি কৃতিত্বের সহিত জমিদারি শাসন-সংরক্ষণপূর্বক আমিনা খাতুন নাম্নী বিধবা পত্নী ও একটি মাত্র কন্যা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মহম্মদ হানিফ চৌধুরির মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী আমিনা খাতুন, ঢাকা জেলার অন্তর্গত হাকিমপুর গ্রামনিবাসী মির সলিমউদ্দিনের সহিত কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। মির সলিমউদ্দিন চৌধুরি সাহেবই সায়েস্তাবাদের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সৈয়দগণ মুসলমান ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ মহম্মদের কন্যা ফতেমার বংশীয়। এই বংশ অতীব সম্ভ্রান্ত এবং মুসলমানদিগের মধ্যে আভিজাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ। এই সুপ্রসিদ্ধ বংশসম্ভূত হামসামউদ্দিন সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মাকিমপুরে আগমনপূর্বক গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহারই পৌত্র মির সলিমউদ্দিন. হানিফ চৌধুরির কন্যাকে বিবাহ করিয়া সায়েস্তাবাদে আগমন করেন; আমরা নিম্নে বংশতালিকা প্রদান করিলাম।

মহম্মদ (ধর্মপ্রবর্তক)
|
ফতেমা (কন্যা)
|

হোসেন	হাসান
|	|
সৈয়দ জেইনোল আবেদিন	১৫ সালার সমরকান্দি
|	|
সৈয়দ মহম্মদ বাকের	কোরার সমরকান্দি
|	|
সৈয়দ মহম্মদ ইমাম জাফর সাদেক	শাহ বক্সী

সৈয়দ মহম্মদ ইমাম জাফর সাদেক
|
সৈয়দ শাহ আমেদ বলাখি
|
সৈয়দ আবুল উমান
|
সৈয়দ আনওয়ারল হক বলাখি
|
সৈয়দ শাহ আবদুলহফ বলাখি
|
সৈয়দ শাহ আলম বলাখি
|
সৈয়দ আবদুল খালেফ বলাখি
|
সৈয়দ আব্দুর রজ্জাক
|
সৈয়দ আবদুল কাদের
|
সৈয়দ গোসল হক
|
সৈয়দ শাহ সুলতান

শাহ বক্‌সী
|
শাহ আমানত
|
শাহ জাকারিয়া
|
সামসউদ্দিন
|
শাহ মহম্মদওয়ালী
|
শাহ আদমওয়ালী
|
মোর্তজা
|
হাসামউদ্দিন
|
সামসউদ্দিন
|
মির সলিমউদ্দিন চৌধুরী
|
মির আসাদ আলি চৌধুরী
|
আব্বাস আলি — মির এমদাদ আলি — মির গোলাম ইমাম

মির তোজাম্মল আলি — মির আবদুল মজিদ — মির মোয়াজ্জাম হোসেন — মির আবদুল্লা

মির তোজাম্মল আলি
|
মির তোফাজ্জল

মির আবদুল মজিদ
|
আবদুল হামেদ — আবদুল ওয়াহেদ

মির আবদুল্লা
|
মহম্মদ ইসরাইল — ওবেদুল্লা

মির মোয়াজ্জাম হোসেন
|
মজঃফর হোসেন — আবদাররব — মহম্মদ হোসেন — মামুদ হোসেন — মোতাহার হোসেন

মজঃফর হোসেন
|
দোলেরা

মোতাহার হোসেন
|
একপুত্র

মির সলিমউদ্দিনের পুত্র আসাদ আলি ১১৭১ বঙ্গাব্দে মাতামহীর নিকট এই পরগনার জমিদারির দানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে মধ্যম এমদাদ আলির বংশধরগণই সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। সুলতানাবাদ এবং আয়েলা-ফুলঝুরিতে ইঁহাদের জমিদারি আছে।

মহাত্মা এমদাদ আলির তৃতীয় পুত্র স্বনামধন্য নবাব সৈয়দ মির মোয়াজ্জাম হোসেন তেজস্বী এবং বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন। তিনি স্মল-কজ কোর্টের জজের কার্য করিয়া নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মোতাহার হোসেন ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বাকলার মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে এই বংশই প্রধান।

৩৪ সায়েস্তানগর

বর্তমান বাকরগঞ্জের পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত এই পরগনা অবস্থিত; ইহা অন্যান্য পরগনা হইতে ছোট, কিন্তু বড় আধুনিক নহে। সমুদ্রোপকূলস্থিত যাবতীয় স্থান তৎকালে গভীর অরণ্যানীতে পরিণত ছিল; ইহার অনেক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করিবার সময়ে বৃহৎ বৃহৎ অংশে সুন্দরীবৃক্ষের মূল ও তৎসহ অন্যান্য বৃক্ষেরও অনেক বড় বড় কাণ্ড পাওয়া গিয়াছে।

নবাব সায়েস্তা খাঁর নামের সঙ্গে এই পরগনার কোন সংশ্রব আছে কিনা জানা যায় নাই; তবে সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে এদেশের অনেক জঙ্গল আবাদ হইয়া মনুষ্য-বাসোপযোগী উর্বরা ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারই আদেশ ক্রমে তদীয় অনুচর দ্বারা এই স্থানের জঙ্গল আবাদ হয়; এবং স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তদীয় নামকরণে এই স্থানের নাম হইয়াছিল। কিন্তু জনশ্রুতি ব্যতীত ইহার আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

রামগোপাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই জমিদারির স্থাপয়িতা। ইঁহার পিতা রামবল্লভ সমাদ্দার, জনৈক মুসলমান ফৌজদারের অধীনে সামান্য রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং বিশ্বস্তরূপে কর্তব্যকার্য পালন করিতেন। রামগোপাল তাহার একমাত্র সন্তান।

রামগোপাল প্রাপ্তবয়স্ক হইলে পিতার নিকটে থাকিয়া তাঁহার কার্যের সহায়তা করিতেন। তৎকালে ঢাকা অথবা জাহাঙ্গীরনগরে বঙ্গের রাজধানী ছিল। রামগোপাল প্রায়ই কার্যোপলক্ষে ঢাকায় গমন করিতেন, এই সূত্রে তত্রত্য প্রধান রাজকর্মচারীর সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় হইল। একদিন রামগোপাল রাজসংক্রান্ত কোন একটি বিশেষ জটিল কার্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করিলেন। নবাব তাহার এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কার্যতৎপরতা দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ ১০৭৬ সালে সায়েস্তানগরের জমিদারি সনন্দ প্রদান করিলেন।

জমিদারি সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া রামগোপাল সায়েস্তানগরের জঙ্গলগুলি পরিষ্কার করাইয়া তথায় লোকালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন। বালিগাঁ নামক স্থানে নিজের বাসস্থান স্থাপন করিয়া তথায় দীর্ঘিকা, প্রকাণ্ড বর্ত্ম প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন। অদ্যাপি বালিগাঁ গ্রামে তাঁহার কীর্তিসমূহের ভগ্নচিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে।

অতি প্রাচীন বয়সে রামগোপালের মৃত্যু হয়। তাঁহার এক কন্যা ও ছয়পুত্র, রামগোবিন্দ, রামভদ্র, রামচন্দ্র, রামনারায়ণ, গঙ্গাধর এবং জানকীবল্লভ। এই জানকীবল্লভ স্বকীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে যে বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়া বিশাল বংশ-তরু রোপণ করিয়াছেন তাহার সম্যক ইতিহাস পরবর্তী পরগনার ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইবে।

রামগোপালের মৃত্যুর পর রামগোবিন্দ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ বালিগাঁ পরিত্যাগ করিয়া গাড়ুড়িয়া নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। এই গ্রাম তখন অত্যন্ত অরণ্যসঙ্কুল ছিল; পরিষ্কার করিবার সময় শৈবালাদি পরিপূর্ণ একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা আবিষ্কৃত হইল। এই দিঘির জল বড় পরিষ্কার ও সুপেয়, বর্তমান সময় ইহার গভীরতা দশ বার হাতের কম নহে। এই দীর্ঘিকা কে খনন করিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রামগোবিন্দের তিন পুত্র, মধুসূদন, কৃষ্ণরাম ও হরিদেব। ইহাদের সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কালিকাপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ, কৃষ্ণবন্ধু, দীননাথ, মনোমোহন প্রভৃতি নানাপ্রকার সদানুষ্ঠান দ্বারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বর্তমানে গঙ্গানন্দ, দক্ষিণাকুমার, শশিকান্ত প্রভৃতি উত্তরাধিকারীসূত্রে এখনও গাড়ুড়িয়ায় বাস করিতেছেন। ইঁহাদের পূর্বাবস্থা এখন আর নাই; কাহারও কাহারও অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়াছে যে, তাঁহারা অতিকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিতেছেন।

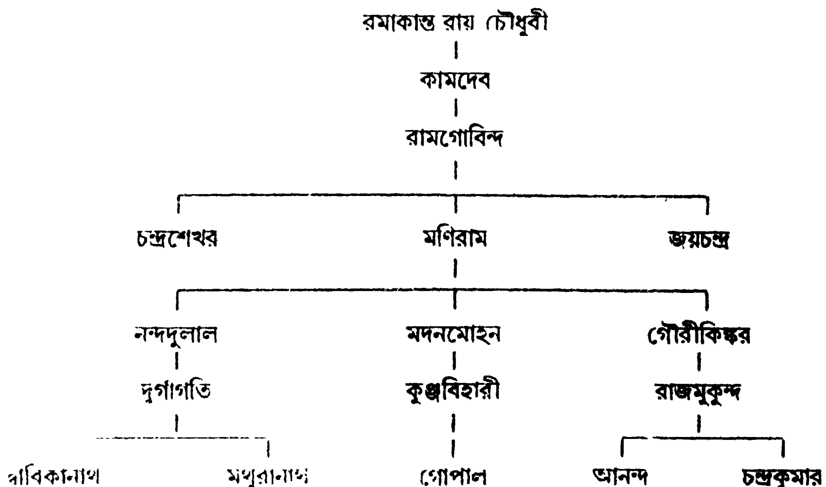
৩৫ সাহাজাদপুর

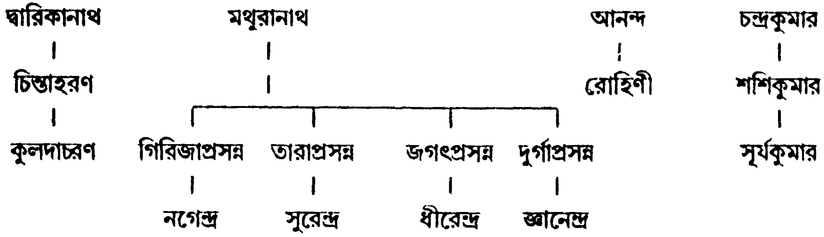
নলছিটি থানার অন্তর্গত সাহাজাদপুর অতিশয় প্রাচীন পরগনা। এই পরগনা পূর্বে সুবিশাল বাকলা রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বকালেও এই ভূখণ্ড সরকার বাকলার অংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইত।

এই মহাল কোন সময় কাহার কর্তৃক প্রথম গঠিত হয় তাহা নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ। সাহাজাদপুর যাবনিক নাম, অতএব এই পরগনা যে বাকলায় মুসলমানাগমনের পরে সৃষ্ট হইয়াছে ইহা নিশ্চিত। ১৪৯১ খ্রিঃ অব্দে প্রসিদ্ধ হাবসী বীর বার্বেক সুলতান শাহজাদা নাম গ্রহণ পূর্বক বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু কিয়দ্দিবসের মধ্যেই তাহাকে ঘাতকহস্তে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল, সুতরাং তাহার রাজত্বকালে এই স্থান স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। মুসলমান ভূপতিগণের জ্যেষ্ঠপুত্রগণ সাহজাদা আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। ইহাদিগের কাহারও নামানুসারে এই পরগনার নামকরণ হইয়া থাকিবে। বিখ্যাত নলছিটি বন্দর সাহাজাদপুর পরগনায় অবস্থিত। মহারাজ রাজবল্লভের পৌত্র পীতাম্বর সেন এই বন্দর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সিদ্ধকাঠির চৌধুরিগণ সাহাজাদপুরের স্বত্বাধিকারী। ইহারা বৈদ্যবংশসম্ভূত, এই জমিদারগণ বরিশাল জেলায় বিশেষ সম্মানিত; এবং কুলমর্যাদা, ধর্মরক্ষা, বিনয়, সমদর্শিতা এবং দানশীলতা প্রভৃতি গুণাবলী দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের পূর্বপুরুষ রমাকান্ত রায় সাহাজাদপুর পরগনার জমিদারি ক্রয় করেন। খুলনা জেলান্তর্গত মূলঘর গ্রামে রমাকান্তের পূর্বনিবাস ছিল। জমিদারি ক্রয় করিয়া পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করতঃ তিনি সিদ্ধকাঠি বাসস্থান স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে বাসভূমির অনতিদূরে একটি মন্দির নির্মাণ করতঃ কালী প্রতিষ্ঠা করেন এবং দৈনন্দিন পূজা-ব্যয় নির্বাহার্থ স্বীয় জমিদারির কতিপয় সম্পত্তি দেবোত্তর প্রদান করেন।

রমাকান্তের পুত্র কামদেব ও পৌত্র রামগোবিন্দের কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ জানা যায় না। রামগোবিন্দের পুত্র চন্দ্রশেখর অতিশয় তেজস্বী এবং শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, কথিত আছে যে তিনি দস্যুদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। রামগোবিন্দের মধ্যমপুত্র মুনিরামের তিন পুত্র; নন্দদুলাল, মদনমোহন ও গৌরীশঙ্কর। তিন ভ্রাতাই সুপণ্ডিত ছিলেন, জ্যেষ্ঠ নন্দদুলাল পার্সি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, অপর দুই ভ্রাতার সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়া তাঁহারা যথাক্রমে কবিরত্ন ও কবিকঙ্কণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।





নন্দদুলালের পুত্র দুর্গাগতি রায় চৌধুরি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মনিষ্ঠার ফলে জমিদার শ্রেণির মধ্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি যখন জমিদারি কার্য পরিচালন করিতেন, তখন ইহার সত্যানিষ্ঠায় মোহিত হইয়া অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ তাহাদের বিষয়ভার ইহার হস্তে ন্যস্ত করেন। দুর্গাগতি রায় চৌধুরি ষোল আনা সম্পত্তির সর্বময় কর্তা হইয়াও জ্ঞাতিদের প্রতি যে সব অভিন্ন ভাবে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শক্তিসম্পন্ন বিষয়ীমাত্রেরই শিক্ষার স্থল। ইনি অনেক সম্পত্তি দান করিয়া স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির নিয়মিত সেবার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। আত্মরক্ষার জন্য গ্রামস্থ নীচশ্রেণির লোকদিগকে লাঠিখেলা ও মল্লযুদ্ধে ইনি উৎসাহ দিতেন। দেশি ও বিদেশি ব্রাহ্মণদিগকে ইনি অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন এবং জমিদারির আয় অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন।

দুর্গাগতি রায় চৌধুরির কনিষ্ঠ পুত্র মথুরানাথ; পিতৃবিয়োগের পর তাঁহার হস্তেই দুর্গাগতি রায় চৌধুরির ত্যজ্য অর্ধসম্পত্তির বিষয় ভার ন্যস্ত হয়। এই সময় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দ্বারকানাথ রায় চৌধুরি পৃথকভাবে কর্তৃত্ব-পরিচালন করিতেছিলেন। প্রজাদের উপর তাঁহার এত প্রভুত্ব ছিল যে, তাঁহার সঙ্গে মথুরানাথ প্রতিযোগিতা করিয়া যে পিতার ন্যায় একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন, এরূপ আশা অনেকেই তখন হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন নাই। মথুরানাথ সহৃদয় বিনয়ী ও পরহিতব্রতী ছিলেন। একদিকে দ্বারকানাথের কঠোর শাসন, অপরদিকে মথুরানাথের সত্য, প্রেম ত্যাগ প্রভৃতি শান্তিপ্রদ গুণগ্রামের আকর্ষণ। ভদ্র ও প্রজামণ্ডলী মথুরানাথের সেই গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া দ্বারকানাথের শাসনদণ্ডের ভয় পরিত্যাগ করিল। শারীরিক বল যে ধর্মবলের নিকট অকিঞ্চিৎকর; প্রেম, ত্যাগ, সরলতা যে কঠোর শাসন অপেক্ষাও লোকচিত্তজয়ের অমোঘ পন্থা, মথুরানাথ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াই বিষয়-কার্যে তাহা সপ্রমাণ করিলেন।

সিদ্ধকাঠির দক্ষিণে একজন প্রাচীন ভূম্যধিকারী ছিলেন। দেনার দায়ে তাঁহার জমিদারি নিলাম হইয়া যায়। গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়স্বরূপ তাঁহার ভদ্রাসন ও কয়েকখানি খানাবাড়ি মাত্র সম্বল থাকে। উক্ত জমিদারের বাটির চতুর্দিকস্থ সম্পত্তির মালিক বাকরগঞ্জ জেলার অন্য এক জমিদার। তিনি উক্ত পুরাতন জমিদারকে নিঃসহায় দেখিয়া তদীয় ভদ্রাসন ও খানাবাড়ি করায়ত্ত করিতে অভিলাষ করেন। উক্ত নিঃসহায় জমিদার নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া মথুরানাথের আশ্রয়প্রার্থী হন। মথুরানাথ তাঁহার ন্যায্য সম্পত্তি রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই উপলক্ষে উক্ত জমিদার ও নিঃসহায় ভূম্যধিকারীর মধ্যে মনোমালিন্য এতদূর ঘনীভূত হয় যে, উভয়পক্ষ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। নিঃসহায় ভূম্যধিকারী উদরান্নের সংস্থানেই অসমর্থ, তাহার পক্ষে উক্ত মোকদ্দমার ব্যয় নির্বাহ অসম্ভব হওয়ায় মথুরানাথ তাহাকে অর্থসাহায্য করেন। মথুরানাথ বরিশাল আদালতে এই মোকদ্দমা উপলক্ষে যে সব সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, দয়াদাক্ষিণ্যাদির পরিচয় পাইয়া উকিল, মোক্তার ও বিচারকগণ তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রবল শক্তি সম্পন্ন জমিদারের হস্ত হইতে নির্ধন ভূম্যধিকারীকে রক্ষা করিবার জন্য বিবাদ করিতে গিয়া যখন যেটুকু আইনের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, সত্যের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য জবানবন্দির সময়ে তাহা অকপট চিত্তে বিচারালয়ে প্রকাশ করিয়া স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়াছেন।

মথুরানাথের হৃদয় দয়ার আধার ছিল। নিলছিটির কোন এক মহাজনের কারবার দেনার দায়ে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হয়। মহাজন পরোপকারী মথুরানাথের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হয়। মথুরানাথ সুদ গ্রহণ না করিয়া তাহাকে প্রায় ছয় হাজার টাকা বিনা খতে ধার দেন। দেশের অনেক ভদ্র ও ইতর লোক তাঁহার কাছে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও টাকা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই।

পূর্বে সিদ্ধকাঠির রাস্তাঘাট সুগম ছিল না। তিনি স্বব্যয়ে স্থানে স্থানে রাস্তা নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীদের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। মথুরানাথ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি অনেকের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়-ভার বহন করিতেন। যে সব বালক লেখা-পড়ায় মনোযোগ প্রদান করিয়া বিশেষত্ব দেখাইতে পারিত, মথুরানাথ তাহাদিগকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার জন্মভূমি সিদ্ধাকাঠি তাঁহার চেষ্টাতেই সৌন্দর্যপূর্ণ ও ভদ্রলোকের বাসোপযোগী হইয়াছে।

"গৃহলক্ষ্মী" "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা স্বনামপ্রসিদ্ধ গিরিজাপ্রসন্ন মথুরানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। গিরিজাপ্রসন্ন হাইকোর্টের একজন উদীয়মান উকিল ছিলেন ; ইহার বিস্তৃত জীবনী পরে বিবৃত হইবে।

৩৬ তপ্পে বাহাদুরপুর

তপ্পে বাহাদুরপুর বাকরগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পরগনা। এই পরগনার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন তত্ত্ব কিছু নাই বলিলেই হয়। খাজে নিকাস খ্রিষ্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

৩৭ অরঙ্গপুর

এই পরগনা বাদশাহী আমলে সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। বাকলা হইতে চন্দ্রদ্বীপের সৃষ্টি হইলে ইহাকে চন্দ্রদ্বীপ হইতে পৃথক করা হয়।[১৩৩] কাহার সময়ে এবং কোন সনে এই অরঙ্গপুর সৃষ্ট হয় তাহা জানা যায় না। প্রথিতনামা বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বের প্রায় এক চতুর্থাংশ সময় ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ এইরূপ কাটাইয়া, তিনি শেষে দাক্ষিণাত্যে মানবলীলা সম্বরণ করেন।[১৩৪]

নবাব সায়েস্তা খাঁ যখন শেষবার বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হইয়া আসেন, তাহার কয়েক বৎসর পরে আওরঙ্গজেব সসৈন্যে নিম্নবঙ্গে আগমন করিয়া কয়েকদিন স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী যে সম্রাট এই পরগনার কোন স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন ; সায়েস্তা খাঁ বাদশার এই শুভাগমন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নবসৃষ্ট পরগনা তন্নামেই অভিহিত করিলেন।

এই কিম্বদন্তীর মধ্যে সম্রাটের এই দেশে আগমনের সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা কর্তব্য। ইতিহাসে দেখা যায় যে সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে সকল দস্যুদমনার্থ তাঁহাকে বিশেষ যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক ছিলেন, পিতা, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। যে স্থানে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি উপস্থিত হইত তাহা অল্পে দমিত না হইলে সম্রাট্ স্বয়ং কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার কার্যের এবম্প্রকার উদাহরণ ইতিহাসের বহু স্থানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কারণে ঔরঙ্গজেবের অস্মদ্দেশে আগমন নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

সায়েস্তানগরের জমিদারি-স্থাপয়িতা রামগোপালের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মহাত্মা জানকীবল্লভ এই পরগনার জমিদার। এই মনস্বী পুরুষ শত্রুকর্তৃক যথেষ্ট উৎপীড়িত হইয়া স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে যে প্রকারে এই জমিদারিলাভ করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

রামগোপালের জ্যৈষ্ঠপুত্র রামগোবিন্দ জমিদারির সর্বেসর্বা ছিলেন। কনিষ্ঠগণ বৈষয়িক যাবতীয় কার্য তাঁহার প্রতি ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; কিন্তু স্বার্থপর ধূর্ত রামগোবিন্দ অজানিতভাবে ভ্রাতৃগণের নামলোপ করিয়া তাঁহার নিজের নামে জমিদারি পত্তন করিলেন। এই প্রকারে কতিপয় বৎসর অতীত হইল। একদা দুষ্ট রামগোবিন্দ তাঁহার ভ্রাতৃগণকে স্পষ্টই বলিলেন যে এই পৈত্রিক জমিদারিতে তাহাদের কোন স্বত্ব নাই, নবাব সমস্তই তাঁহাকে দিয়াছেন।

নিরুপায় ভ্রাতৃগণ তখন মহাবিপদে পড়িলেন; তাঁহাদের এমন অর্থবল ও জনবল ছিল না—যাহা দ্বারা স্বীয় স্বীয় স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারেন। তখন তাঁহারা জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে কতক কতক ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া পৈত্রিক বাসভবন পরিত্যাগ করিলেন এবং বেবাজ, নারাঙ্গল, ভাতারিকাঠি প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও এই সমস্ত গ্রামে বাস করিতেছেন।

সর্বকনিষ্ঠ তেজস্বী জানকীবল্লভ জ্যেষ্ঠের এই পৈশাচিক আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং বিনাদোষে অবৈধরূপে পিতৃস্বত্ব হইতে কেন বঞ্চিত হইবেন তজ্জন্য তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ইহাতে বালক জানকীবল্লভের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার চলিতে লাগিল। মর্মাহত জানকীবল্লভ জ্যেষ্ঠের এই পাশবিক ব্যবহারে অপর ভ্রাতৃগণের ন্যায় নিজস্বত্ব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন।

দুরাচারের কিন্তু ইহাতেও মনস্তুষ্টি হইল না। জানকীবল্লভের বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বালকের তেজস্বিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতা অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহাকে সর্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। পাপিষ্ঠ রামগোবিন্দ বালকের এবম্বিধ গুণ ও সর্বোপরি সর্বজনপ্রিয়তা দর্শন করিয়া পূর্ব হইতেই হৃদয় মধ্যে এক পৈশাচিক সঙ্কল্প পোষণ করিতেছিলেন। বর্তমানে যখন তিনি দেখিলেন যে অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াও বালক পৈত্রিক বাসভূমি পরিত্যাগ করিতেছে না, তখন সেই পূর্বকৃত পৈশাচিক সঙ্কল্প তাঁহাকে আবার উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সকলের অগোচরে কনিষ্ঠকে হত্যা করিয়া, পাপ লুক্কায়িত করিবেন এই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

রামগোবিন্দের সহধর্মিণী ভবানীদেবী শৈশবকাল হইতেই জানকীবল্লভকে স্বীয় গর্ভস্থ সন্তানের ন্যায় পালন করিয়াছিলেন। তিনি দেবরের সমূহ বিপদ জানিতে পারিয়া সুযোগমত একদা নিশীথ সময়ে তাহাকে সকল কথা বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সুদূরে পলায়ন করিতে উপদেশ দিলেন। জানকীবল্লভের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাঁহার সরল হৃদয়ে এবম্বিধ সন্দেহের ছায়া কখনও পড়ে নাই, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার সহোদর বিনা দোষে—এত ভক্তি শ্রদ্ধার বিনিময়ে, তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া জমিদারি নিষ্কণ্টক করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, ইহা সহজে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু মাতৃস্বরূপা ভ্রাতৃজায়ার অশ্রুপূর্ণ লোচন দেখিয়া তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। জানকীবল্লভ তখন ভ্রাতৃজায়ার পদধূলি গ্রহণ করিয়া পলায়নোদ্দেশে বহির্গত হইলেন। শৈশবের লীলাভূমি জন্মস্থান হইতে বিদায় লইবার সময়ে তাঁহার হৃদয়কোণে অজানিত ভাবে একটি উচ্ছ্বাস উঠিয়া আবার মিশিয়া গেল।

বিপন্ন জানকীবল্লভ ঘূর্ণ্যমান অদৃষ্টচক্রের আবর্তনে স্বীয় বাসভূমি হইতে সাত আট মাইল পশ্চিমে অভয়নীল নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার এক আশ্রয়স্থান মিলিল। রামগোপাল নামক জনৈক কায়স্থ তাঁহাকে বিপন্ন দেখিয়া স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিলেন। এই কায়স্থ সন্তানের কাছে অযাচিতরূপ আশ্রয় পাইয়া জানকীবল্লভ কয়েকদিন তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার সমভিব্যাহারে ঢাকায় গমন করিলেন।

ঢাকায় উপস্থিত হইয়া জানকীবল্লভ তাঁহার সদ্গুণাবলী দ্বারা অনেকের প্রিয়পাত্র হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার দুঃখের কাহিনী অনেক রাজপুরুষের কর্ণগোচর হইল। এতমাদ খাঁ নামক জনৈক প্রাচীন রাজপুরুষ নিঃসন্তান ছিলেন। জানকীবল্লভের সৌম্যমূর্তি এবং সৌজন্য দর্শন করিয়া খাঁ সাহেবের বড়ই স্নেহ জন্মিল। নবাব সায়েস্তা খাঁ তখন নিম্নবঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন ; এতমাদ খাঁ জানকীবল্লভকে লইয়া তাঁহার নিকট সমস্ত বিবৃত করিলেন। সায়েস্তা খাঁর মনে দয়া হইল ; তিনি

গোপনানুসন্ধান দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি মর্মাহত হইলেন। অত্যল্প কাল মধ্যে সায়েস্তা খাঁর অনুগ্রহে ও এতমাদ খাঁর একান্ত যত্নে, জানকীবল্লভ ১১০৬ সনে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার সুলতান আজিম ওসমানের নিকট হইতে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পাঞ্জাযুক্ত এক সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এই সনন্দে অরঙ্গপুর পরগনার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। এতমাদ খাঁ তখন তাঁহার স্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ নিজনামে তপ্পে এতমাদপুর পরগনা অরঙ্গপুরের সনন্দভুক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

রাজানুগ্রহে জানকীবল্লভ অনেক ধনসম্পত্তি ও লোকজন সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে আসিয়া প্রথম পৈত্রিক বাসভূমি বলিগাঁ গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করিলেন। নানাপ্রকার অসুবিধা বশত ১১০৯ বঙ্গাব্দে কলসকাঠি গ্রামে বাসস্থান স্থির করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই অরঙ্গপুর ও এতমাদপুর পরগনাদ্বয় অধিকার করিলেন। এই সময় সায়েস্তানগর পরগনারও অধিকাংশ অরঙ্গপুর ও এতমাদপুর পরগনাভুক্ত হয়।

জানকীবল্লভের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরগনারও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলসকাঠিতে উচ্চ অট্টালিকা, প্রশস্ত দীর্ঘিকা, ইস্টক নির্মিত বৃহৎ বাজবর্ত্ম প্রভৃতি অচিরে নির্মিত হইল। চতুর্দিক হইতে বণিকগণ নানাপ্রকার ব্যবসা করিবার জন্য তথায় আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করিতে লাগিলেন। অনেক দেবমন্দির ও বহুবিধ বিগ্রহ স্থাপিত হইল ; নীলমাধব নামক বিগ্রহ মূর্তি তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই মূর্তি এখনও কলসকাঠির জমিদার-বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত আছে। জানকীবল্লভের বংশধরগণ ইঁহাকে কুলদেবতাজ্ঞানে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকেন।

অরঙ্গপুর তৎকালে উত্তরে রূপাতীলি ও সদবপুর এবং দক্ষিণে বর্তমান কলসকাঠি হইতে তিন মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এতমাদপুর পরগনা বর্তমানে অরঙ্গপুর পরগনাভুক্ত। পূর্বে ইহা দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পরে ১১৭১ সাল হইতে ১১৮৭ সাল পর্যন্ত ইহার রাজস্বের হার বৃদ্ধি হওয়া উপলক্ষে কোম্পানি কাউন্সিলের সঙ্গে অনেক মোকদ্দমা হয়। তাহাতে দক্ষিণের অধিকাংশ ভূমি কোম্পানি-সরকারের বাজেয়াপ্ত হয়।

এতমাদপুব পরগনা লাউকাঠি গ্রাম হইতে আবাদ আরম্ভ হয়, কিন্তু যে দিবস প্রথম কাজ আরম্ভ হয় সেই দিবস এক অপূর্ব শালগ্রাম-শিলা উত্থিত হইয়াছিল। জানকীবল্লভ সেই শালগ্রাম চক্র লাউকাঠি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি স্বীয় জমিদারি রক্ষার্থ আমড়াজুরি হইতে রূপরাম সরকার নামক জনৈক কায়স্থকে প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং রাধাকান্ত রুদ্র নামক অপর ব্যক্তিকে মুহুরির পদে নিযুক্ত করিলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমনকালে ইনি রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে পৌরাহিত্য পদ প্রদান করেন ও তাহার আশ্রয়দাতা রামগোপাল নাগকে জমিদারির অধীনে এক তালুক ও নিয়মিত প্রভূত বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আত্মীয়-কুটুম্বদিগকে জমিদারির অধীনে ব্রহ্মোত্তর ও বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া স্বীয় গ্রামে স্থাপন করেন। সেই বৃত্তি-ব্রহ্মোত্তর আজ পর্যন্তও তাঁহাদের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন।

জমিদারি-প্রাপ্তির বিশ বৎসর পরে রাজস্বের হার লইয়া রাজকর্মচারীগণের সহিত জানকীবল্লভের বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদে নবাবের শতাধিক লোক হত হয়। পরে বহুসহস্র ফৌজ লইয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য রাজকর্মচারীগণ আগমন করেন, কিন্তু জানকীবল্লভ তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্র ভীত না হইয়া তাহাদিগকে উৎকোচ দানে বশীভূত করেন। এই সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলে নবাব তাহার জমিদারি ক্রোক করিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য এক পরওয়ানা প্রেরণ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন থাকিলে কিছুতেই বিপদ আসিতে পারে না। এই সময়ে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হওয়ায় আলিবর্দী খাঁর সিংহাসনারোহণের পূর্বে যে গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই সুযোগে সুচতুর জানকীবল্লভ, রাজকর্মচারী ও ফৌজদিগকে প্রভূত অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া নিরাপদে স্বদেশে উপস্থিত হন।

জানকীবল্লভ কয়েক বৎসর পরে জমিদারির সনন্দ তাঁহার তৃতীয় পুত্র বিদ্যাধরের নামে পরিবর্তন করেন, কিন্তু আবার ১১৫১ সালে নিজ নামে বন্দোবস্ত করেন। সেই বন্দোবস্ত-পত্রের শেষ ভাগে লেখা আছে—"সন ১১৫১ সাল বাদশাহ দিন মহম্মদ শাহ আলম বন্দোবস্ত হুজুর চৌধুরাই শ্রীজানকীবল্লভ রায়।"

জানকীবল্লভের প্রথম একটি কন্যা জন্মে, তিনি স্বীয় প্রাণদাত্রী ভ্রাতৃজায়ার নামানুসারে তাহার নাম 'ভবানী' রাখেন। তারপর তাঁহার আর চারিটি পুত্র ও চারিটি কন্যা জন্মে। তিনি শেষজীবনে পুত্রদের হস্তে জমিদারি অর্পণ করিয়া মানবলীলা শেষ করেন। তাঁহার সকল পুত্রই কার্যদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।

রামগোপাল রায়চৌধুরি
|
জানকীবল্লভ (সর্বকনিষ্ঠ)
|

গঙ্গাধর	মুকুন্দদেব	বিদ্যাধর	রঘুনাথ
সীতারাম	রামকান্ত	রামশঙ্কর	
সদাশিব	হরচন্দ্র	কাশীনাথ	
হৃদয়কৃষ্ণ	গুরুদাস	রতনকৃষ্ণ	
কালীপ্রসাদ	ব্রজকিশোর	বরদাকান্ত	
ব্রজকান্ত	দুর্গাপ্রসন্ন	বিশ্বেশ্বর	

ব্রজকান্ত → সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র, মণীন্দ্র
বিশ্বেশ্বর → রাজেশ্বর, রত্নেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, অমরেশ্বর

জানকীবল্লভের লোকান্তরের পর তাঁহার পুত্রগণ নির্বিবাদে পুরাতন কর্মচারীগণের সহায়তায় জমিদারি কার্য সুচারুরূপে চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ প্রায়ই ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে যাতায়াত করিতেন। পরে মহারাজ রাজবল্লভের অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় তাঁহার বোজরগ উমেদপুর পরগনার গোলাবাড়ি নামক কাছারিতে এক প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। এই গোলাবাড়ি কাছারি কলসকাঠি হইতে দুই মাইল দূরে নন্দপাড়া নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রঘুনাথ রায়ের ধর্মানুরাগ ও সৌজন্য তাঁহার চরিত্রের মহৎ গুণ ছিল। কর্মদক্ষতা ও মহানুভবতার বলেই তিনি মহারাজ রাজবল্লভের চিত্তাকর্ষণ করেন।

একদা রঘুনাথ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাজবল্লভের নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর, তুমি সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া কপালে তিলক পর না কেন?" রঘুনাথ তখন উত্তর করিলেন "মহারাজ, কি প্রকারে পরের মাটি দিয়া তিলক পরিব? এখানে আমার নিজস্ব কিছুই নাই।" মহারাজ এই কথায় একটু লজ্জিত হইলেন এবং কয়েকদিন পরে কচুয়া প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামে একখানা খারিজা তালুকভুক্ত করিয়া রঘুনাথকে প্রদান করিলেন। এই তালুকের আয় সেই সময় বার হাজার টাকা ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমানে ইহা রঘুনাথের উত্তরাধিকারীগণের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

পূর্ববর্ণিত ঘটনার কিঞ্চিৎকাল পরে রঘুনাথ হয়বৎপুর মালোয়ার প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম বলপূর্বক হস্তগত করিয়া নিজনামে একটি পরগনা করেন, এবং হয়বৎপুর গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন এবং কালী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং অন্যান্য জাতি স্থাপন করেন। দেবীর অর্চনার জন্য কতক জমিও বৃত্তিরূপে নির্ধারিত করিয়া দেন। কিন্তু দেবালয়ের কার্যাদি সুচারুরূপে নির্বাহিত না হওয়ায় কলসকাঠি নিবাসী তারিণীচন্দ্র রায় মহাশয়, পণ্ডিত অভয়াচরণ বিদ্যালঙ্কার এবং অন্যান্য লোকজন সমভিব্যাহারে হয়বৎপুর গ্রামে গমন করিয়া মন্দির সংস্কার এবং প্রতিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রঘুনাথপুর পরগনায় ইহাদের প্রদত্ত তিন শত ষাইট কেত্তা ব্রহ্মোত্তর এবং অনেক নিষ্কর ভূমি অদ্যাপি অনেকে ভোগ করিতেছেন।

১১৬৩ সালে রঘুনাথ রায় নিজবাড়িতে ইষ্টক নির্মিত এক দেবালয় প্রস্তুত করেন, উহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে—

বসুদ্রিষট্ চন্দ্রমিতে শকাব্দে
বৈশাখ মাসস্য গতেন রাশেঃ।
প্রাচীকবচ্ছ্রী রঘুনাথ শর্মা
বিষ্ণোর্গৃহং রামধনাভিধেন।

১৬৭৮ শকাব্দীয় বৈশাখ মাসের শেষভাগে শ্রীরঘুনাথ শর্মা রামধন নামক জনৈক রাজমিস্ত্রি দ্বারা এই বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

জানকীবল্লভের পুত্রগণের মধ্যে সৌভ্রাত্রের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা এবং ইহাদের পুত্রগণও একই কর্মচারী দ্বারা জমিদারি কার্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করেন। ১২৯৭ সালে জমিদারি ও অন্যান্য তালুক ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তি নির্বিবাদে বণ্টন করা হয়। ইহার পরে পুনরায় মালিকগণের প্রার্থনামত ১২৪৬ সালে কালেক্টর কর্তৃক আমিন নিযুক্ত হইয়া বাটোয়ারা কার্য আরম্ভ হয় এবং ১২৪৬ সালে শেষ হয়। রঘুনাথপুরের জমিদারি নয় আনি ও সাত আনি এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। নয় আনি জমিদারি আবার আটটি নম্বরে বিভক্ত হয়।

জানকীবল্লভের বংশধরের মধ্যে অনেকেই স্বধর্মনিরত ক্রিয়াবান তেজস্বী এবং বিচক্ষণ ছিলেন। ইহারা স্বীয় স্বীয় কন্যা কুলীন-পাত্রস্থ করিয়া জামাতাকে প্রভূত বৃত্তি দান করিতেন, ইহাদের প্রদত্ত বৃত্তি-ব্রহ্মোত্তর অনেকে এখনও ভোগ করিতেছেন। এই বংশের বরদাকান্ত একজন নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু ছিলেন; সৌজন্য, বদান্যতা ও সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্যগুণে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রযত্নে কলসকাঠিতে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় এবং গণেশ পুজোপলক্ষে একটি মেলা সংস্থাপিত হয়। বরদাকান্ত একজন সৌভাগ্যশালী পুরুষ ছিলেন, তিনি তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে নবদ্বীপ, কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা প্রভৃতি দূরদেশাগত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে প্রভূত ধনদান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

কলসকাঠির জমিদারগণের অবস্থা বিশেষ উন্নত, ইহাদের মধ্যে ব্রজকান্ত রায়চৌধুরি, বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরি, দুর্গাপ্রসন্ন রায়চৌধুরি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

৩৮ সৈদপুর

এই পরগনা বাকরগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত, ইহার অধিকাংশ ভূমি হিংস্র জন্তু সমাকুল সুন্দরবনে আচ্ছন্ন ছিল। ইহার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা জানা যায় নাই। ভূতত্ত্ববিৎগণ মৃত্তিকাভাণ্ডের পরীক্ষা দ্বারা এই স্থির করিয়াছেন যে, কোন সময়ে এই ভূভাগ সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল।

এই ভূভাগের কী কারণে সৈদপুর নাম হইল তাহা সম্যকরূপে জানা যায় নাই, তবে অনেকে অনুমান করেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হইতে সুন্দরবনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লইয়া যে ফকিরের সাহায্যে প্রথম আবাদ করা হয়, সম্ভবত তাহার নামানুসারেই পরগনার নাম সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাও

দেখা যায় যে এই পরগনাস্থিত কতক জমি টাকির জমিদার দেবনাথ রায় কর্তৃক আবাদ হওয়ায় উক্ত জমি দেবনাথপুর নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই পরগনা পূর্বে পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের জমিদারির অধীন ছিল। ঢাকানিবাসী লালা মিত্রজিৎ সিংহ ও ব্রজরতন দাসের উত্তরাধিকারীগণ বর্তমান সময়ে এই পরগনার জমিদার। ভগীরথ সিংহ নামক কোন পশ্চিমদেশীয় লোক এই সিংহ-পরিবারের স্থাপয়িতা। ভগীরথ গভর্নমেন্টের কানুনগোই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহারই ষড়যন্ত্রে এই পরগনা পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

গভর্নমেন্টের তুষখালি নামক খাসমহাল এই পরগনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। টাকির জমিদার বাবুগণের সহিত মোকদ্দমায়, গভর্নমেন্ট প্রায় উনিশ হাজার বিঘা জমি তুষখালির অন্তর্ভুক্ত করেন।

এই পরগনায় কোন স্থানীয় জমিদার নাই, যে সকল জমিদার এই পরগনা ভোগ করেন তন্মধ্যে টাকির বাবুগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টাকির বাবুগণ গুহ বংশোদ্ভব কুলীন কায়স্থ, ইঁহারা প্রবলপ্রতাপ মহারাজ প্রতাপ আদিত্যের খুল্লতাত-ভ্রাতা (রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র) কচু রায়ের বংশধর।

তথ্যসূত্র

১. * * * * But the only one which remains entire is called *Pargana* which answers to the lordship of 100 Towns —Elphinstone's History of India, page 67

২ Speaking generally, it may be said that the ... n of the district belongs to Bangrora, Birmohan, Idrakpur and Chandradwip, the eastern portion to North and South Shahbazpur, Idilpur, Sultanabad, Nazepur and Ratandi-Kolikapur, the central portion to Chandradwip, Selimabad, Buzrgomedpur and Arangpur, and the western portion to Selimabad and Syedpur. The south of the district belongs for the most part to the Sundarban and is not included in any pargana —H. Beveridge's History of Bakarganj Page 67

৩. চন্দ্রদ্বীপের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ ; বর্তমান বরিশাল নগর লইয়াই এই পরগনার সৃষ্টি।

৪ H. Beveridge's History of Bakarganj, page 69.
(শেষের পরগনা কয়টির অধিকাংশ ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা ভুক্ত হইলেও তদন্তর্গত কতকগুলি তালুকের রাজস্ব বরিশালের কালেক্টরিতে দাখিল হয়। এই নিমিত্ত উক্ত পরগনাগুলির নামও এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।)

৫ I suppose that Bakla was identical with Chandradwip.—H. Bevridge's History of Bakarganj page 50

৬ Chandradwip,—a pargana, which included the whole of the modern zila of Bakarganj with the exception of Mahal Selimabad —Dr. James Wise's *Bara-Bhuya* of Bangal, 1874

৭. ১। অগ্রদ্বীপ ২। নবদ্বীপ ৩। মধ্যদ্বীপ ৪। চক্রদ্বীপ ৫। এড়ুদ্বীপ ৬। প্রবালদ্বীপ ৭। বৃদ্ধদ্বীপ ৮। কুশদ্বীপ ৯। অন্ধদ্বীপ ১০। সূর্যদ্বীপ ১১। জয়দ্বীপ ১২। চন্দ্রদ্বীপ।

৮. ১৭৬৪ এবং ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে জরিপ দ্বারা এই মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল।

৯ কেহ কেহ বলেন সংসারত্যাগী যোগী পুরুষ।

১০ এই পাষাণ প্রতিমাদ্বয় এখনও মাধবপাশা রাজবাড়িতে বর্তমান আছে।

১১. "চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ" ১২শ পৃষ্ঠা।

১২. "বিশ্বকোষ" চন্দ্রদ্বীপ শব্দ দ্রষ্টব্য।

১৩. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I No. III, 1871

১৪. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I No. III, 1874

১৫. তৃতীয় অধ্যায় ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (সম্রাট বুলবনের পুত্রকর্তৃক সুবর্ণগ্রাম বিজয়ের পরেও মহারাজ দ্বিতীয় বল্লাল সেন বিক্রমপুরে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। গোপাল ভট্ট রচিত 'বল্লাল চরিত' পাঠে জানা যায় যে বৈদ্যরাজ বল্লাল খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বাবা আদমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইনিই সেনবংশের শেষরাজা।)

১৬. বল্লালতনযো রাজা লক্ষ্মণোহভূৎ মহাশযঃ।
তৎপুত্রঃ কেশবোরাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ।।
মতিং চাপ্য করোৎ দ্বন্দ্বে যবনস্য ভযাৎততঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং তদাপুনঃ।।
প্রাদুরভবৎ ধর্মাখ্যা সেনবংশাদনন্তরং।
দনৌজামাধবঃ সর্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ।।

১৭. রাজা ভট্টারকো দেব স্তৎসুতা ভর্তৃদারিকা।
দেবী কৃতাভিষেকাযামিতরাসু চ ভট্টিনী।। -- (অমরকোষ)

১৮. সুখসেন, অরুণসেন, তরুণসেন, হরিসেন এবং বিজয়সেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাঞ্চলে পলায়ন করেন। ঘটক কারিকা।

১৯. "চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ" ৮ পৃষ্ঠা।

২০. সেন (গোত্র) বাসুকি, আলম্যান, ধন্বন্তরি ও কাশ্যপ।
দে, দেব . (গোত্র) ঘৃত কৌশিক, আলম্যান, কাশ্যপ, পরাশর, মৌদগল্য, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, গৌতম, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ। কায়স্থ বংশাবলী ১৭ পৃঃ।

২১ বর্তমান পটুয়াখালি সাবডিভিসনের অন্তর্গত।

২২. The chief event of this rule was the organisation of the Bangaja Kayasthas He (Danujmardan) appointed certain Brahmins whose descendants still reside in Idilpur to be Ghutuks or Kulacharyyas of Kayasthas and he directed that all marriages should be arranged by them He also appointed a Swarnamatya or master of the ceremonies, who fixed the precedence of each member of the Sabha or assembly and who pointed out the proper seat, each individual was to occupy, at the feat given by the Raja These offices still exist and the holders of them are much respected by all Kayasthas.—Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I. No III, 1876

২৩. কেহ কেহ বলেন ইহার নাম বলভদ্র বসু , কিন্তু ইনি "কালারাজা" বলিযা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। কালারাজার বিল অদ্যাপি বর্তমান।

২৪ Joydeb Rai, the fourth in descent died childless His heir, a sister's son was Paramanand Rai of Basu family of Dehergati, Chandradwip, who traced their pedigree to Dasaratha Basu, one of the original Kayasthas He, and his successors were acknowledged as the Samajpati of the Kayasthas of southern and eastern Bengal,--Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I No 3
This is evedently a mistake, Kamala was Jaydeb's daughter, Instead of sister.

২৫ ইহার অপর নাম শিবানন্দ।

২৬ See Gladwin's Translation of Ain-i-Akbari, Page 304

২৭. The residence of the Rajas of Chandradwip was at Kachua, close to the modern station of Bakarganj, but during the life of Kandarpanarayan Rai or immediately afterwards, they were obliged to move farther inland to a place called Madhabpassa, where the rajas have resided ever since The removal was necessitated by frequent forages made by the Mughas and Portuguese of Chittagong, against whom the Raja was unable to contend. —Journal of the Asiatic Society of Bengal Part I No II , 1874

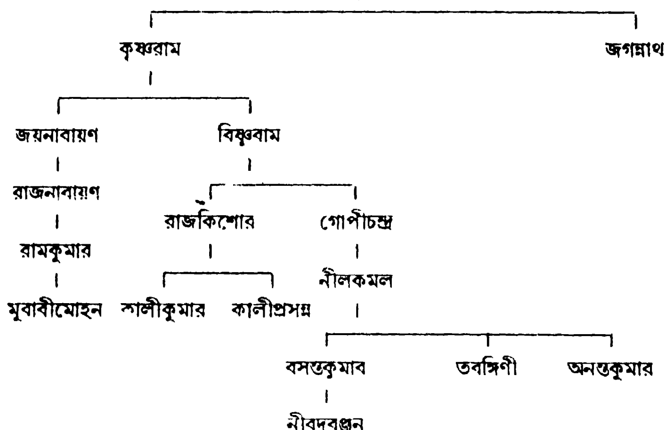
২৮. গাজির দিঘি নামে একটি প্রাচীন দিঘি মাধবপাশায বর্তমান আছে! ইহা সেই গাজি কর্তৃক নির্মিত বলিয়া প্রকাশ।

২৯. বিগত ১২৯৭ সনের বৈশাখ মাসে আমার মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরের বিবাহোৎসবে আমাদের বাড়িতে এই কামানটি আনীত হইয়াছিল। অত পরিমাণে বারুদ বোঝাই করায উহার একস্থান ফাটিয়া যায। সেই অবস্থায উহা এখনও বরিশালের পুলিসকোর্টের সম্মুখে পড়িয়া আছে।

৩০ From Chittagong in Bengal, I came to Bakla, the king here is a Gentoo (Hindu), a man very well-disposed and delighted much in shooting gun His country is very great and fruitful, and hath store of rice much cotton cloth and cloth of silk The houses are very fair and high built, the streets large, the people naked except a little cloth about their waist The women wear great store of silver hoops about their necks and arms, and their bags are ringed about with gold silver, copper and rings made of elephant's teeth —Extracts from James Wise's *Bara Bhuia* of Bengal

৩১. See Gladwin's Translation of Ain-i-Akbari, Page 464
৩২. আমরা পাঠককে এই বীরপুরুষের জীবনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।
৩৩. চন্দ্রদ্বীপ পুরাৎ তস্মিন্ কায়স্থান্ ব্রাহ্মণান্ তথা
বৈদ্যকানানয়ামাস সমাজেশ বভূব সঃ।—ঘটককারিকা (পরিশিষ্টভাগ)
৩৪. বাবু সত্য চরণ শাস্ত্রী, ইঁহার নাম বিন্দুমতী বলিয়াছেন, কিন্তু মাধবপাশার বর্তমান রাজা শ্রীযুক্ত বীরসিংহ নারায়ণ রায় বলেন যে রাজা রামচন্দ্রের স্ত্রীর নাম বিমলা। প্রতাপ আদিত্য প্রদত্ত যৌতুক ভূমি তৎকন্যা বিমলার নামেই প্রদত্ত হইয়াছে।
৩৫. ব্রাহ্মণ, রৈভদ্রদি এবং বাবৈখালি রাজ-পুরোহিতগণের আদি পুরুষ, বৈদ্য, গুঠিয়া মজুমদারবংশের আদিপুরুষ এবং কায়স্থ, গৌরীরায় এবং কাশীপুরের রায়বংশের আদিপুরুষ।
৩৬. কীর্তিনারায়ণো বীরো মহামানি তদঙ্গজঃ।
জগদেক শূরো সোহপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ।।
মেঘাদোপকূলে স ফেবঙ্গ সৈন্যকৈঃসহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্বান তাড়য়ৎ।
জাহাঙ্গীর পুরাধীশো নবাব যবনস্ততঃ
স্থাপয়ামাস মিত্রহং সার্দ্ধং তেন প্রযত্নতঃ।
কায়স্থ কুলকারিকা। (চন্দ্রদ্বীপ)
৩৭. বাগেরহাটের চারিক্রোশ পশ্চিমে খাঞ্জা আলির বাসস্থান এখনও বর্তমান আছে। তিনি একটি প্রকাণ্ড দিঘি খনন করিযাছিলেন, তাহা "খাঞ্জাআলির দরগা" নামে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক দিঘি ও বড় বড় প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকা এখনও বর্তমান রহিয়াছে। "খাঞ্জাআলির" দীঘিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্রসমূহ সর্বদা বিচরণ করিতেছে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দিঘিতে সর্বদা বহুলোক স্নান করিতেছে অথচ কুম্ভীরগণ কাহাকেও হিংসা করে না।
৩৮. মোগল সম্রাটদের নিকট চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ, পাঞ্জাঙ্কিত অনেকগুলি সনন্দ বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দলিল এবং তৎসহ সিংহাসন পর্যন্ত ভস্মীভূত হইয়াছিল।
৩৯. কলিকাতার সন্নিহিত পাইকপাড়ার রাজগণ, এই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর। ইহার ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করিলে, আমরা স্বনামখ্যাত চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।
৪০. তখন ঢাকায় কালেক্টরি ছিল। খাজনা প্রভৃতি তথায় দাখিল করিতে হইত।
৪১. ইঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা লন্ডনে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন।
৪২. সিভিলিয়ান—ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর।
৪৩. ব্যারিস্টার—হাইকোর্ট।
৪৪. ইনি চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী হইবার জন্য অন্যূন পঞ্চদশ বর্ষ ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন, এবং তথা হইতে এম বি সি এস, এফ আর সি পি, এফ আর সি এস উপাধিতে ভূষিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।
৪৫. ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লন্ডনে বাস করিতেছেন।
৪৬. * * the Brahman-family of Lakhutia can boast of at least one member, who would have done honour to any family. This was Raj Chandra Raj—H Beveridge' History of Bakarganj, Page 93.
৪৭. The village of Barisal is a very small one, and lies in the Pargana of its own called the Gird i-Bandar which appears to have been formed out of Pargana Chandradwip as a site for the Bazar.—H Beveridge's History of Bakarganj, Page 367
৪৮. এই স্থানে লবণের শুল্ক আদায় হইত।
৪৯. H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 305—306
৫০. সায়েস্তা খাঁ ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।
৫১. Stewart's History of Bengal, Page 187.
৫২. কিছুদিন হইল জঙ্গল পরিষ্কার করিবার সময়ে এইস্থানে বল্মীক মধ্যে দুইটা প্রস্তর স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে।
৫৩. Stewart's History of Bengal and Dr Taylor's Topography of Dacca.
৫৪. প্রাচীন তত্ত্ব-সংগ্রহাধ্যায়, ৮৩—৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫৫.



৫৬ মহারাজ রাজবল্লভের বিস্তৃত জীবনচরিত বহু অনুসন্ধান করিয়াও সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারাও এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই জ্ঞাত নহেন।

৫৭ বৈদ্যগণ সকলেই রাঢ়দেশবাসী ; কোন স্মরণীয় রাষ্ট্রবিপ্লবে বৈদিকক্রিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৫৮. Nowaziz (Niwais Mahamed) died in 1756, and Raj Ballav's influence continued during the time of the widow, with whom, Raj Ballav was said to be improperly intimated —Orme, Vol II, Page 49

৫৯. * * * * Of that number were Ram Narayan, heretofore Deputy Governor of Azemabad, as well as Raja Raj Ballav, who had himself enjoyed that office after having been a long time before Dewan and Prime Minister to Nowaziz Mahamed Khan, and in the sequel to Miran, son to Mir Jaffar Khan This unfortunate name had all his sons with him Some others of those persons were Roy Rayan Umed Roy, with his son, the Zamindars to Tickary Raja Fatte Singh and Raja Bunad Singh and also Saha Abdulla, the same who had been heretofore confined at Purniah There were numbers of other persons of distinction and characters, all which were dispatched the regions of non-existance I have heard it said that Ram Narayan had been drowned in the Ganga, with a bag of sand and astued to his neck, and probably the others also were dismissed out of this world in the like manner.—Siyar-ul-Mutaakhirin, Vol II Page 492—493

৬০. Previously to Raja Raj Ballav's death, he subdivided his estate by creating Bozragumedpur and Rajnagar, into a Zamindary in the name of God Laksmi-Narayan and Shujabad fisral division into a seperate estate in the name of the Goddess Durga —Sir W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol V, Page 222.

৬১. H Beveridge's History of Bakarganj, pages 95—96.

৬২. (১) রাজা রামদাস, (২) রাজা কৃষ্ণদাস, (৩) রাজা গঙ্গাদাস, (৪) রায় রতনকৃষ্ণ, (৫) রায় গোপালকৃষ্ণ, (৬) রায় রাধামোহন এবং (৭) কেবলরাম বাবু।

৬৩. Vide Siyar-ul-Mutaakhirin, Vol II, Page 192

৬৪. Kissen Dass escaped on this occasion only to die a violent death some years afterwards, for he and his father were seized by Mir Kassim and drowned in the Bhagireti at Monghyr, Raja Gopal Kissen, another son, thereon succeeded to the charge of the Property.—H Beveridge's History of Bakarganj, Page, 97

৬৫. Extract form the foot note of H Beveridge's History of Bakarganj, Page 97.

৬৬ Extract from Asiatic Society of Bengal

৬৭ সুগন্ধায়াং নাসিকামেদেব ত্র্যম্বক ভৈবব। সুন্দরীসা মহাদেবী সুনন্দা তত্রা দেবতা।।
কালিকাপুবাণ।

৬৮. 'গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা' ১৩১০-১১ বঙ্গাব্দ।

৬৯. সম্রাট আকববের রাজত্বের সপ্তচত্বারিংশৎ বর্ষে আইন-ই-আকববি সমাপ্ত হয়। ১৫৫৬+৪৭=১৬০৩ খ্রিস্টাব্দ।—Gladwin's translation of Ain-i-Akbari, Preface-i-ii

৭০. বঙ্গের শেষ পাঠান নৃপতি দাউদশাগের পিতা সুলইমনশাহ কিবানী ১৫৬৪ হইতে ১৫৭৩ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে বাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনিই কি ব্লক্‌ম্যানকথিত সুলইমন?

৭১. 'Besides Sandeep, there was also a great salt-mart at Sondercool, a vast tract of land west of Chandradwip ...' Extracts from the Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol III 1868

৭২. এই ব্রাহ্মণই ঝালকাঠি থানাব অন্তর্গত তাবপাশা নিবাসী রাজপুবোহিত বংশেব আদিপুরুষ। ইহার বংশধবগণ এখনও এইস্থানে বর্তমান আছেন।

৭৩ বাংলাব ইতিহাস (নবাবী আমল)—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, ৪৮ পৃঃ ফুটনোট (৩)।

৭৪. বর্তমান ঝালকাঠিব নিকটবর্তী সুতালড়ি নামক স্থানে শ্রীবাম বাযেব কাছাবি বাটি ও নুৎফাবাদ নামক গ্রামে খানা বাটি নির্মাণ, দেবতা প্রতিষ্ঠা, দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তব দান কবত ঃ জমিদারি শাসন ও সংবক্ষণেব জন্য ষষ্ঠ প্রকাব জাতিকে উপবোক্ত গ্রামে সংস্থাপিত কবিযা সময সময ঐ স্থানে বাস কবিতেন। কায়স্থ কুল-দর্পণ, ২য ভাগ, ১২৯ পৃঃ।

৭৫. এই দেবী মূর্তি অদ্যাপি বায়েরকাঠিতে স্থাপিত আছেন। প্রত্যহই ইঁহাব পূজা হয। ইনি সিদ্ধেশ্বরী নামে অভিহিতা। অতি উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ প্রস্তবে এই মূর্তি নির্মিত।

৭৬ মহামতি বেভারিজ তাঁহাব ইতিহাসে এই তারিখ ১০৫০ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং লিখিযাছেন যে প্রস্তর লিপিতে উহা লিখিত আছে। কিন্তু বাজবংশেব হস্ত লিখিত তুলট কাগজে যে বিবরণ আছে উহাতে ১০৬৫ বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং তাহাই লিখিত হইল।

৭৭ উহাব বংশধবগণ এখনও নুৎফাবাদে বাস করিতেছেন।

৭৮ ইহাব মধ্যম পুত্র নরেন্দ্রনাবাযণ খুলনা জেলাব অন্তর্গত বনগ্রামে, তৃতীয পুত্র কন্দর্পনাবাযণ খুলনাব অন্তর্গত চিংবাখালি গ্রামে এবং কনিষ্ঠ পুত্র গন্ধর্বনাবাযণ মধিযা গ্রামে বসতিস্থাপন কবেন।

৭৯. ইহাব চাবি পুত্র, প্রত্যেকেব পৃথক বাড়ি।

৮০ ইহাব চাবি পুত্র, প্রত্যেকেব পৃথক বাড়ি।

৮১. মহাত্মা কৃষ্ণবাম সেন আমাব অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহেব জনক।

৮২ ইঁহাব নাম বামগোবিন্দ ন্যাযপঞ্চানন। ইঁহাকে কৃষ্ণবাম যাট বিঘা ব্রহ্মোত্তর প্রদান কবিয়াছিলেন। এখনও ইঁহাব বংশধবগণ ইহা ভোগ করিতেছেন।

৮৩. এই তালুকেব আয় কিঞ্চিদূর্ধ্ব ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা।

৮৪ ইহার আর এক নাম "মহারাজগঞ্জ"।

৮৫. কথিত আছে পূর্বকালে বৈদ্যজাতিব শালঙ্কাযণ বংশোদ্ভব রাজা কুমাবদাশ এই পবগনায় জমিদাবি প্রাপ্ত হইযা এদেশে কনসী গ্রামে আসিয়া বাস কবেন। কুমাবদাশ নবাব-সবকারে সৈন্য বিভাগে কার্য কবিতেন। তাঁহার আগমনকালে এতদ্দেশে চণ্ডভণ্ড জাতির বসতি ছিল। কুমাবদাশই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণিব হিন্দুদিগকে আনযন কবেন। রাজা কুমার দাশেব লক্ষ্মীপতি ও দেবদাস নামে দুই পুত্র এবং আদ্যাশক্তি ও মহামায়া নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। বিক্রমপুব নিবাসী রামরাম দাশ ও শুভঙ্কব সেনেব সহিত কন্যাদ্বযেব বিবাহ হয। ইহারা যথাক্রমে স্থানীয পাহিদাশ ও মহাব্রত সেনগণেব আদিপুরুষ।

কুমাব দাশেব জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীপতিব বংশধবগণ কনসী গ্রামে বাস কবিতেছেন। এই বংশেব জযশঙ্কব দাশ স্বীয কন্যা মন্দাকিনীকে স্থানীয় বাযদেব আদিপুরুষ বামভদ্র মজুমদাব মহাশযেব নিকট বিবাহ দেন। জযশঙ্কবেব সহিত তাহাব পুত্রেব সদ্ভাব ছিল না। এই নিমিত্ত তিনি সমুদয সম্পত্তি জামাতাকে অর্পণ কবেন। এই সময় বাযেবকাঁঠিব বাজবংশ স্থাপযিতা বাজা শ্রীনাথ রায় বাদশাহেব নিকট সোন্দাবকুলেব জমিদাবি প্রাপ্ত হ'ন। এই সময হইতে সোন্দাবকুল পবগনাব নাম লুপ্ত হইযা সেলিমাবাদ নাম প্রচলিত হয়। বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণেব নিমন্ত্রণে মাত্র উক্ত নামেব ব্যবহাব দেখা যায। রামভদ্র মজুমদাব বাজা শ্রীনাথেব অধীন তালুকেব বন্দোবস্ত গ্রহণ কবেন। এই হইতে ইহাব বংশধবগণ রায় উপাধি ধাবণ করত দশ পুরুষ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছেন।

৮৬ A petition presented by Mr Somingo D Silva to the Judge on the 20th March, 1805, and sent by him to the government, whence it was forwarded to the Collector for report through the Board, throws considerable light to the early history of the fiscal division From this petition it would appear that Selimabad first composed of ten Purgaunas, viz : Tappa Havili Selimabad, Sundhurkul, Budrapur Tappa Jahanpur, Bongaon, Tappa Sultanabad, Tappa Sultanpur, Kashimpur, Nazirpur, Rajor, Tappa Havili Nimak Mahal and Shibpure These Purgaunas formed the whole of Purgauna Selimabad, which was originally divided into two estates ; the Larger estate was afterwards equally subdivided into two and one of these was again subdivided into two equal shares.—Sir W W Hunter's Statistical Account of Bengal (Bakarganj volume, page 224

৮৭. ৩৮৪০ ও ৩৮৪১ নং তৌজিভুক্ত জমিদারি 'বাবুয়ান', ৩৮৪২—৩৮৪৫ নং জমিদারি 'চৌধুরীয়ান' এবং ৩৮৪৬—৩৮৪৯ নং জমিদারি "দুই আনি" নামে অভিহিত . এই সমস্ত জমিদারিব অধীনে অনেকগুলি লাভজনক তালুক আছে।

৮৮ অদ্যাপি এই বহুমূল্য হাব আমাদেব বাড়ি বর্তমান আছে।

৮৯. তৎকালে এই নামটি সমগ্র বাকলায প্রচলিত ছিল।

৯০ গত ১৯০৩ খ্রিঃ অব্দে ২২শে জানুয়ারি এই বিদ্যালয় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

৯১ তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদ দ্রষ্টব্য।

৯২ কুলকাঠি ও বাবইকবণের চৌধুরিগণের আদিপুরুষ।

৯৩. দেউরিব চৌধুরিগণেব আদিপুরুষ।

৯৪. ইঁহারা তিন ভাই মথুরানাথ, যদুনাথ, উপেন্দ্রনাথ।

৯৫. See partition papers of 1180 B S

৯৬ The pergana of Syedpur is said to have been formerly included in Havili Selimabad, and to have been separated from it through the influence of Bhagirath Singh, who was a Kanunga —Beveridge's History of Bakargang, p 124

৯৭. এই শিবলিঙ্গ নির্মল কৃষ্ণপ্রস্তব নির্মিত, দেখিতে বড়ই সুন্দব , কাশীধামেও নাকি এইরূপ সুশ্রী শিব দেখা যায না। পোনাবালিযা শিববাড়ি ৫১ পীঠেব অন্তর্গত .—

সুগন্ধায়াং নাসিকামেদেবস্ত্র্যম্বকভৈববঃ।

সুন্দবী সা মহাদেবী সুনন্দা তত্র দেবতা।।

অনেকেব বিশ্বাস শিকাবপুরের উগ্রতারাই এই শিবেব শক্তি, স্থানীয জমিদারগণ বলেন ইহার শক্তি তারা নহে, ষোড়শীর অন্তর্গত "সুন্দবী"।

প্রায় বিশ বৎসর হইল গোপাল চক্রবর্তী নামক এক ব্রাহ্মণ এই স্থানে পাষাণময়ী কালিকামূর্তি স্থাপন করেন। মাঘী সপ্তমী ও শিবরাত্রি প্রভৃতি পর্বোপলক্ষে এখানে বহু যাত্রীব সমাগম হয।

আদি জমিদার নবেন্দ্র গুপ্ত চৌধুবিব সমযে ব্রহ্মানন্দ গিবি নামক এক সন্ন্যাসী এই স্থানে বাস কবিতেন। কেহ কেহ বলেন তিনিই ত্র্যম্বকেশ্বরেব প্রকাশকর্তা। তাহাব দ্বাদশটি গোপাল ছিল। পোনাবালিযা ও বাদুরপুরের কালাচাঁদ এবং কলসকাঠিব নীলমাধব এই দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ব্রহ্মানন্দের পরবর্তীকালে অনেক সাধুসন্ন্যাসী শিববাড়িতে অবস্থান কবিতেন, তন্মধ্যে পুরানগিরি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এইস্থানেই দেহত্যাগ করেন।

৯৮. Gupta Chaudhuri was the first Zemindar —Beveridge's Bakarganj, p. 124.

১৬৫৩ খ্রীঃ অব্দে রচিত রামকান্তদাশ কবিকণ্ঠহারকৃত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় গুপ্তচৌধুরির সম্পূর্ণ নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

একাচ তনযা জাতা পরিণীতা চ কন্যকা।

নরেন্দ্র রায় গুপ্তেন সিলিমাবাদবাসিনা।। ৫৭ পৃষ্ঠা।

কবিণা কণ্ঠহারেণ মাতুলোদিত বর্ত্মনা।

পঞ্চসপ্ততিথৌ শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা। ১ম পৃষ্ঠা।

৯৯. কণ্ঠহার ৫৪ পৃষ্ঠা (চতস্রঃ কন্যকাঃ ইত্যাদি)।

১০০. সেলিমাবাদ সরকাব ফতিয়াবাদেব অন্তর্গত ছিল (Beveridge's Bakarganj p. 51, 110) কিন্তু আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকববিতে ফতিয়াবাদের মহালগুলিব যে তালিকা আছে তাহাতে সেলিমাবাদেব উল্লেখ নাই। অতএব সেলিমাবাদ উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নেব পবে সৃষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই।

১০১ নবেন্দ্র রায গুপ্তেন সেলিমাবাদবাসিনা। ৫৭ পৃষ্ঠা, কণ্ঠহার।

১০২. "বাকবগঞ্জেব ইতিহাস" প্রণেতা খোসাল বাবু একটি কিংবদন্তী অবলম্বনে নরেন্দ্র গুপ্তেব পূর্ববর্তী আরও দুই জমিদাবেব উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে উহারা নরেন্দ্রেব পিতা ও পিতামহ. এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তিই হাবিলী সেলিমাবাদ জমিদাবিব প্রতিষ্ঠাতা। নরেন্দ্র গুপ্তেব আবির্ভাব কাল অনুমান ১৫৬৩—১৫৭৪ খ্রিঃ অব্দ. তাঁহাব পিতামহ তখন অবশ্য বৃদ্ধ ছিলেন অতএব তিনি ষোড়শ শতাব্দীব প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ কবেন। সেলিমাবাদ এই সময়েব এক শতাব্দী পবে সপ্তদশ শতাব্দীব প্রারম্ভে সৃষ্ট হয়। তন্মে হাবিলী সেলিমাবাদ আরও পবে গঠিত হয় ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে. তখন নবেন্দ্র গুপ্তেব পিতামহ জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ঐতিহাসিকপ্রবর বেভারিজ্ গুপ্তচৌধুরি নামক একজন জমিদাবেব অস্তিত্বেব কথা লিখিয়াছেন (Gupta Chaudhari was the first Zamindar)। বৈদ্যকুলপঞ্জিকাতেও একমাত্র নবেন্দ্র গুপ্ত ব্যতীত অপর কোন সেলিমাবাদবাসী গুপ্ত চৌধুবিব উল্লেখ নাই।

১০৩. খোসাল বাবু বোধ হয় একটি কিংবদন্তী অবলম্বনে লিখিয়াছেন (বাকবগঞ্জেব ইতিহাস, ১১৪—১১৫ পৃষ্ঠা) যে নবেন্দ্র চৌধুবিব এক কন্যা ও দুই নাবালক পুত্র ছিল। বামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবেব নিকট চৌধুরি কন্যাকে বিবাহ দেন। ঘটনাচক্রে (সুরুচিব অনুবোধে ঘটনাটি উল্লিখিত হইল না) একটি বালক হত হইল অন্যটি (নাম শ্রীবাম বায) সাহাজাদপুবে পলায়ন পূর্বক স্থানীয় জমিদাববংশে বিবাহ করিয়া তথায় বদ্ধমূল হ'ন।

ঐতিহাসিক প্রবব বেভারিজ্ উল্লিখিত কিংবদন্তীব বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন। ১৬৫৩ খ্রিঃ অব্দে বচিত কণ্ঠহাবকৃত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকাব উচলি প্রকবণে লিখিত আছে —

চতস্রঃ কন্যাকাঃ কালীচবণো বামচন্দ্রতঃ।
অশ্বগুপ্ত নবেন্দ্রস্য সেলিমাবাদবাসিনঃ।
দৌহিত্রাঃ কন্যয়োর্ণাথৌ শিবাভিন্ন মদনাবুভৌ ।। ৫৪ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ উচলিবংশীয় বামচন্দ্র হইতে চাবি কন্যা ও কালীচবণ (পুত্র) জন্মগ্রহণ করে। ইহাবা সেলিমাবাদবাসী গুপ্ত বংশোদ্ভব নবেন্দ্রব দৌহিত্র। এতদ্দ্বাবা স্পষ্টই জানা যায় যে বামকৃষ্ণেব পত্নী ব্যতীত নবেন্দ্রেব আবও কন্যা ছিল। তাঁহাব সহিত উচলিবংশীয় বামচন্দ্র সেনেব বিবাহ হয় এবং তাঁহাব গর্ভে এক পুত্র ও চাবি কন্যা জন্মগ্রহণ কবে। ইহাব মধ্যে দুইটি কন্যাব বিবাহেব কথা পর্যন্ত অবগত হওয়া যায়। কণ্ঠহার তাঁহাদেব স্বামীব নাম দিয়াছেন। কুলকাঠি ও পোনাবালিয়াব চৌধুবিগণ রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবেব সন্তান ও নবেন্দ্রেব দুহিতৃকুলজাত. ইহা খোসালবাবুও অবগত আছেন (বাঃ ইঃ ১১৪ পৃঃ)। কিন্তু তাঁহাবা নবেন্দ্রেব এক কন্যাব বংশধব নহেন। কুলকাঠিব চৌধুবিগণ বলেন তাঁহাবা নবেন্দ্র গুপ্তেব জ্যেষ্ঠা কন্যা শিবদাব বংশধব. পোনাবালিয়া ও কেওবায় চৌধুরিগণ গুপ্ত চৌধুবীব সাবদা নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যাব বংশধব। চৌধুরিগণেব গয়ায় পিণ্ডদানেব বহিতে শিবদা ও সাবদাব নামোল্লেখ আছে। বামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব এই উভয় কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। নবেন্দ্র চৌধুবিব এক কন্যা থাকাব কথা অমূলক। তাঁহার তিন কন্যা ছিল এবং কন্যাগণ প্রত্যেকেই পুত্রবতী ছিলেন। অত্রাবস্থায় নবেন্দ্র চৌধুবিব দুইটি নাবালক পুত্র থাকিলে কন্যাদেব মধ্যে কাহারও তাঁহাদিগকে অপসারিত কবিয়া পৈত্রিক সম্পত্তিব অধিস্বামী হইবাব সম্ভাবনা ছিল না। বাদশাহী আমলে জমিদাবগণ বাজস্ব আদায়কাবী কর্মচাবীস্বরূপ ছিলেন। বীতিমত বাজস্ব আদায়ে অক্ষম হইলে বড় বড় জমিদার গণেবও জমিদাবি যাইত। অত্রাবস্থায় নাবালকেব জমিদারি রক্ষা অসম্ভব। (তৎকালে চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কোর্ট অব ওয়ার্ড ছিল না।) অতএব নবেন্দ্র চৌধুরির নাবালক পুত্র থাকিলে তাঁহাদেব অপসারিত না কবিয়াও অভিভাবকগণ বাজস্ব প্রদান কবিয়া নিজ নিজ নামে নবাবেব নিকট হইতে সম্পত্তি লাভ কবিতে পাবিতেন।

নবেন্দ্র চৌধুরির শ্বশুবেব নাম কোথাও শ্রীনায়কাখ্য শ্রীবাম বায. কোথাও বা কেবল শ্রীবাম বায বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—

শ্রীনায়কাখ্যঃ শ্রীরাম বায় স্তিস্রশ্চকন্যকাঃ।
ত্রিপুরানন্দতো জাতা দত্তজাগর্ত্তসম্ভবাঃ।।
কায়ু ভবানন্দ সুতা জগন্নাথস্য কন্যকা।
শ্রীনায়কস্য ভার্য্যেদ্বে গোপীনাথঃ সুতোঽভবৎ।।
একাচ তনয়াজাতা পরিণীত চ কন্যকা।
নবেন্দ্র রায় গুপ্তের সিলিমাবাদবাসিনা।।
মহেশ সেনজাভর্ত্তু গোপীনাথাৎ সুতোঽভবৎ।
চাটীগ্রাম মসৌনীতো বলাস্থ্যচমূচবৈঃ।। কণ্ঠহাব ৫৬।৫৭ পৃঃ
জগন্নাথদ্বৌ গদাধরশ্চ মধুসূদনঃ।

কনৌকা বিষ্ণুসেনস্য দৌহিত্রান্তনযাস্তচ।
শ্রীনায়কাখ্যা শ্রীরামরায়স্তাং পরিণীতবান্।। ১৪০ পৃঃ
ভবানন্দ স্ততো জাতৌ গোবিন্দ হরিগুপ্তকৌ।
তিস্রশ্চকন্যকাজাতা দাশশ্রীধরজাসুতাঃ।।
নাবসিংহো বিষ্ণুদাশো গোপীনাথাখ্য সেনকঃ।
শ্রীনায়কাখ্যঃ শ্রীরামরায়ঃ জামাতরঃ স্মৃতাঃ।। ১৭৬ পৃঃ
বিদ্যানন্দাম্মহেশোহভূৎ হবিদাসসুতা সুতঃ।
তস্মাজ্জাতে উভে কন্যে তযোরেকং ব্যুবাহচ।
শ্রীরামরায় তনয়ো গোপীনাথোহপবাং সুতাং।
হরগৌরীদাস দাশো মহেশোহভূদ পুত্রকঃ।।২৭পৃঃ

অতএব নবেন্দ্রের শ্রীবাম বায় নামে কোন পুত্র থাকিলে মাতামহ দৌহিত্রের এক নাম হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ ঘটনা অস্মদ্দেশস্থ হিন্দু সমাজে অসম্ভব। পোনাবালিয়ার চৌধুবিগণের পূর্বপুরুষ শ্রীরামরায় নরেন্দ্র চৌধুরিব দৌহিত্র, ইহাব পুত্র বামভদ্র বায়, পৌত্র শ্রীকৃষ্ণ বায় অদ্যাপি এই নামে জমিদারি চলিতেছে। নরেন্দ্রেব শ্রীরাম নামে কোন পুত্র থাকিলে সাক্ষাৎ মাতুল ও ভাগিনেয়ের এক নাম হয়। ইহাও অসম্ভব। কণ্ঠহার ৫৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায় সেলিমাবাদবাসী জমিদার নবেন্দ্র গুপ্তেব "রায়" উপাধি ছিল তৎকৃত দিঘি, বাটি এবং জাঙ্গাল ও বেভাবিজেব গ্রন্থ "চৌধুরী " উপাধি ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু সাহাজাদপুরবাসী শ্রীরাম বংশধরগণের বায কি চৌধুবি উপাধি নাই। নবাবী আমলে বাদশাহদত্ত বংশোপাধি (রায়, চৌধুরি, মজুমদার, দস্তিদাব, সবকাব প্রভৃতি) কেহই পবিত্যাগ করিত না। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের বংশধরেব মধ্যে যাহাবা স্থানচ্যুত এবং জমিদারিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাবাও "চৌধুরি" পদবি ত্যাগ করেন নাই (যথা কেওবার চৌধুরিগণ)।

১০৪ কণ্ঠহার বিনায়ক বংশ।

১০৫. রত্নপ্রভা ৭ পৃষ্ঠা।

১০৬. বিনাযকস্য সেনস্য জজ্ঞিরে তনযাস্ত্রযঃ।
বোযসেনস্তদীয়গ্র্যো ধন্বন্তবিবথাপরঃ।।
পবঃ কাপডি সেনোহমী ত্রয এব মহাকুলাঃ।
তিস্রোধাবা ইবোস্তুত্য ভগীবথসমুদ্ভবাঃ।। রত্নপ্রভা ৭ পৃঃ

[প্রচলিত কণ্ঠহারে বিনাযক প্রকরণেব প্রারম্ভে লিখিত আছে যে বিনাযকেব দুই পুত্র ধন্বন্তবি ও শুক, বোয ধন্বন্তরিব পুত্র ও গাণ্ডেযিব অগ্রজ ভ্রাতা। কিন্তু কণ্ঠহাব অগ্রে গাণ্ডেযিবংশ লিখিয়া পরে বোযবংশ লিখিযাছেন। তিনি বোযকে ধন্বন্তরিব পুত্র এবং গাণ্ডেযিব অগ্রজ ভ্রাতা বলিয়া জানিলে কখনই এইরূপ কবিতেন না, কারণ তিনি সর্বত্র জ্যেষ্ঠানুক্রমে বংশাবলী লিখিযাছেন, বামসেন পিতৃশাপে কৌলীন্যহীন হইলেও জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন অগ্রে তাঁহাব বংশ লিখিয়া, পবে মহাকুল লক্ষ্মণ, কন্দর্প প্রভৃতি ভ্রাতৃগণেব বংশ লিখিয়াছেন, জয়দাশ অকুলীন হইলেও তাহাব বংশ লিখিযা তৎপরে তদনুজ মহাকুল বিষ্ণুদাশ বংশ লিখিযাছেন। চন্দ্রপ্রভা, রত্নপ্রভা প্রভৃতি অন্যান্য সংস্কৃতকুলপঞ্জিকাগুলিতে বোয ধন্বন্তরির ভ্রাতা এবং শুক ধন্বন্তবিব পুত্র ও গাণ্ডেযিব অগ্রজ বলিয়া বর্ণিত হইযাছেন (রত্নপ্রভা ২৬ পৃষ্ঠা)। তদনুযায়ী বিনাযকাৎ সুতৌ জাতৌ ধন্বন্তবি শুকাদুভৌ স্থলে বিনায়াকৎ সুতৌ জাতৌ ধন্বন্তবি বোযাবুভৌ কবিলে কণ্ঠহাবেব ক্রমভঙ্গদোষ নিরাকৃত হয়, কুলপঞ্জিকাগুলিব মধ্যেও কতক ঐক্যস্থাপিত হয়।]

১০৭. রত্নপ্রভা ৭ পৃষ্ঠা।

১০৮ আসীৎ সভায়াং শিখরেশ্বরস্য লব্ধপ্রতিষ্ঠঃ কিলসাহিসেনঃ।
বাণীবিলাসং কবিসার্বভৌমং বিজিত্য যঃ প্রাপ যশঃ সুমদ্রং।।

১০৯ সাহিসেনস্যা তনযঃ কাকুৎস্থ কুলভূষণ। কণ্ঠহাব ১০২ পৃঃ

১১০. কণ্ঠহাব বলেন বোযবংশীয শুভঙ্করের দুই পুত্র বলভদ্র ও মদন, (১০৪ পৃঃ) ১৬৭ পৃষ্ঠায বলিয়াছেন 'বোযকুলজ মদন ত্রিপুরবংশীয সূর্যগুপ্তেব কন্যা বিবাহ করেন কৈতবর্ণীব পাণ্ডা গযালীদের ও গযাপিণ্ড দানের বহিতে বামকৃষ্ণবিদ্যার্ণবেব পিতা ভবানন্দ ও পিতামহ মদানন্দ সেনেব নাম পাওয়া যায়। পোনাবালিয়াব চৌধুবিগণেব একখানি বংশতালিকায় লেখা আছে মদনানন্দ ত্রিপুর সূর্যগুপ্তের কন্যা বিবাহ করেন। অতএব কণ্ঠহাবকথিত মদন ও বিদ্যার্ণবের পিতামহ মদনানন্দ একই ব্যক্তি মনে হয়।

১১১ বিনাযকস্য পুত্রো যো জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠো ভিষক্কুলে।
বোযসেনোহত্র মালঞ্চে তদ্বংশ্যাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।। ১৬ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা

তস্যৈব রোষসেনস্য বংশে মহতি সাগরে।
সাণ্ডসেনোহভবৎ চন্দ্রো বিখ্যাত ভুবনত্রয়ে।। ১৬ পৃঃ
সাণ্ডসেনস্য চত্বারঃ কুমারাদয় আত্মজাঃ।
কুলোজ্জ্বলাঃ যে তদ্বংশ্যাঃ সর্বে মালঞ্চবাসিনঃ।। ১৪ পৃঃ

১১২ কাকুৎস্থ সেনস্তনয়স্ততোহভূৎ ততোপি লক্ষ্মীধরসেননামা।
তস্মাভূদ্দুদ্ধবণস্তনুজ তস্যাপানন্ত স্তনয়োথ জজ্ঞে।।
মালঞ্চিকাগ্রামনিবাসভূমেঃ গৌড়াবনি পালভিষগ্বরস্য।
অনন্তসেনস্য সুতোবিধত্তে টীকামিমাং শ্রীশিবদাসসেনঃ।। (চক্রদত্ত টীকা)

পোনাবালিয়া বোষগণ অনন্তের সন্তান বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রকৃতপক্ষে অনন্তের সন্তানগণ পূর্ববঙ্গে আগমন করেন নাই। --(চন্দ্রপ্রভা ৩৬ পৃষ্ঠা—'গতা স্বয়োহংমী বদীপুবাদুস্তব গঙ্গাবাঢাম্, বসন্তি তত্রৈব তদীয় বংশ্যাপঃ।"

১১৩ See page 66

১১৪. Ponahalia was formerly the headquarters of the zamindar of the pargana Beveridge's History of Bakarganj, p 124

১১৫. Rambhadra Rai is said to have fought with the Mahrattas or Bargis, and to have defeated them near Ponabalia.--Beveridge's Bakarganj, p 124

১১৬ ইন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ প্রাণনারায়ণের পুত্র দীননাথ তৎপুত্র নিবারণ ও শরচ্চন্দ্র। ইন্দ্রে দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রেমনারায়ণের পুত্র কীর্তিনারায়ণ। তৎপুত্র বৃন্দাবন ও হরচন্দ্র, বৃন্দাবনের পুত্র জানকীনাথ, হরচন্দ্রের পুত্র গোলক ও ঈশান। গোলকের পুত্র প্রসন্নকুমার, ঈশানের পুত্র পদ্মকুমার।

১১৭ গোপালকৃষ্ণের পৌত্রগণমধ্যে রামকানাইর পুত্র রজনীকান্ত, চন্দ্রকান্তের পুত্র নিবারণচন্দ্র এবং নীলকমলের পুত্র শশিকমল উল্লেখযোগ্য।

১১৮ শুকদেবাৎ (অরবিন্দ) সুতোজজ্ঞে রঘুনাথশ্চকন্যকা।
কন্যামেনামুপযেমে সিলিমাবাদবাসিনঃ।
শ্রীকৃষ্ণ বোষবংশপ্রসূতস্য সুতঃ কৃতী।।
মহলানবীশাখ্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তনুস্তবাং।
রমানাথ (হিস্নু পীতাম্বর) শ্চোপযেমে উভে কণ্যে চ্যুতঃ সুতাঃ।
তযোবাদ্যাম্দবহৎ শ্রীকৃষ্ণবোষপুত্রকঃ।।
*** রামকিশোর সেনকঃ (প্রভাকর)।
বাণেশ্বরদাশাকন্যাং পরিণিন্যে গুণান্বিতাং।
তস্যাং মৃতায়াং দুর্দৈববাধিতঃ পরিণীতবান্।।
বোষবংশসমুদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণস্যাত্মজাত্মজাং।
সেলিমাবাদবাসীয় কুলদেব প্রসাদতঃ।।
(শ্লোকগুলি হর ঠাকুর প্রণীত কণ্ঠহার পরিশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত)

১১৯. ইহার পূর্বনিবাস বাঁশবেড়ে। শ্রীকৃষ্ণ রায় ইহাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া ডৌয়াতলা, তৎপরে শিববাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। বর্তমানে ইহার বংশধরগণ নাগপাড়ায় বাস করিতেছেন। রামচন্দ্রে প্রপৌত্র গদাধর ও রামসন্তোষের সময় নাগপাড়ায় একটি টোল ছিল। রুক্মিণীকান্ত ন্যায়ভূষণ অধ্যাপনা করিতেন।

১২০ শিকদারগণ ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত। ইহারা চৌধুরিগণের কালাচাঁদের সিংহাসন বহন করিতেন।

১২১ বৈদ্য ঘটকগণের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—
রোষে চৌধুরীর বংশ পোনাবালিয়ায়।
পুবিলা আপন গ্রাম কুলীন সংখ্যায়।।
পোনাবালিয়ার রোষে বহু ক্রিয়াবান্।
কুলীন আশ্রম সদা বিশেষ সম্মান।। ডাকৈর ৫৪ পৃষ্ঠা।
অতি দীর্ঘকাল বংশ বহু ক্রিয়াবান্।
জপসা পোনাবালিয়া রাজনগর সমান।। ৭৮ পৃষ্ঠা।

১২২. রামধনরায়ের সময় চৌধুরিবাড়িতে "নব আশা" নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া কিছুদিন চলিয়াছিল।

১২৩. কৃষ্ণজীবনের তৃতীয় পুত্র বিখ্যাত জয়নারায়ণ; জয়নারায়ণের পুত্র প্রাণদুর্লভ, তৎপুত্র শম্ভুনাথ, শম্ভুর পুত্র অভয় চৌধুরি প্রভৃতি।

১২৪. জগন্নাথের পাঁচ পুত্র—রুদ্রনারায়ণ, রাজকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, কেবলকৃষ্ণ ও গঙ্গাগোবিন্দ।

১২৫. পোনাবালিয়া গ্রামস্থ ভট্টাচার্যগণের পূর্বপুরুষ।

১২৬. সংস্কৃত গ্রন্থে এই পরগনা ইন্দিলপুরী বলিয়া অভিহিত, যথা :—

মেঘনানদী পূর্বভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী।
ইন্দিলপুরী যক্ষ সীমা দক্ষিণে সুন্দরবনং।।—(দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃত্তি)।

১২৭. তৃতীয় অধ্যায় — প্রাচীনতত্ত্ব সংগ্রহ ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১২৮. The Chaudhuries of Idilpur . . . . . . did not bear a good character, as they were accused of Harbouring dacoits. Doubtless the jungly condition of the pargana encouraged bad characters to resort to it Beveridge's History of Bakarganj, page 125.

১২৯. Sir W W Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. V, page 224.

১৩০. ইনি সম্রাট সাহজাহানের সময়ে জনৈক উজির ছিলেন বলিয়া প্রবাদ।

১৩১. It is said to derive its name from one Shahbaz Khan, a Mogul general in old times.—H. Beveridge's History of Bakarganj, Pp 133-134.

১৩২. প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহ—তৃতীয় অধ্যায়—৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

১৩৩. আইন-ই-আকবরিতে সাহাবাজ খাঁর নাম দৃষ্ট হয়।

১৩৪. After Khan Azim had assumed the command of the Imperial army, Shahabazkhan subdued the country as far as the banks of the Burhampooter—Stewart's History of Bengal, (Bangabashi Edition) page 204

১৩৫. ৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৩৬. The zamindar of Uttar Shahbazpur was one of those who suffered from the aggressions of Mr Peat, an attorney, who had been Mr Justice Hyde's clerk Among other things,he shot a native for trying as he said, to resist his authority.—H, Beveridge's History of Bakarganj, Page 134

১৩৭. It seems that formerly Dakhin Shahbazpur pargana was bounded on the west by a large river called the Betua · that west of this river were the lands of Ratandi Kalikapur, Uttar Shahbazpur, Shaistanagar and Baikanthpur, &c , and that west of them was the Ilsa or Titulia, which was then a small river Now the Betua has been dried up, and much of the land in the centre of the island is situated in its old bed, and was resumed by Government, while the Titulia has become a very large river. The river between Hattia and Dakhin Shahbazpur was also small in old times, and there is still a small portion of Dakhin Shahbazpur pargana in Hattia.—H Beveridge's History of Bakarganj, Page 140.

১৩৮. When the Mugs began to give trouble, most of the Hindus who remained in Bakargnaj probably became voluntary converts to Mahomedanism, and there is little doubt that the process was hastened by the fact that the mere circumstance of their living side by side with Mugs, Portuguese and Mahomedans was sufficient to famish their caste in the eyes of Hindus of other districts, and so to deprive them of the social advantages of Hinduism—H. Beveridge's History of Bakarganj, Page 252.

১৩৯ Although he was under great obligations to the Raja of Batecala (Bacala) who had first given refuge to the Portuguese in their distress he ungratefully seized upon the islands of Shahbazpur and Potelbauga, which belonged to that chief. Stewart's History of Bengal, P. 235 (Bangabashi Edition).

১৪০. Such was the extent of depredations that the inhabitants of Dacca trembled when they heard the names of the Mugs whose general practice was to kill the men and to carry off the women and children as slaves.—Stewart's History of Bengal, Page 326 (Bangabashi Edition).

১৪১. Quotation from Modern Universal History Vol. VI.

১৪২ দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৪।৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৪৩. Khajah Kaworke complained that after Mr Barwell had let him the farms, and taken a lac and Rs 25 000 from him on this account, he dispossessed him and relet the farms to another perosn for another lac of rupees —H Beveridge's History of Bakarganj, P. 138.

১৪৪. H. Beveridge's History of Bakarganj Pp. 138-39.

১৪৫. H Beveridge's History of Bakurganj Page—145

১৪৬. Pargana Srirampur which was one of the four original Parganas of sarker Bakla, has been nearly all washed away by the Meghna. and the Zamindars of it have long since disappeared H Beveridge's History of Bakarganj P 61

১৪৭. লালা রামপ্রসাদের পাঁচ পুত্র; লালা রামগতি, লালা জয়নারায়ণ, লালা কীর্তিনারায়ণ, লালা রাজনারায়ণ ও লালা নরনারায়ণ।

১৪৮. লালা রামগতি রায়কৃত "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" হইতে উদ্ধৃত।

১৪৯. It is generally understood that the word *tappe* prefixed to the name of a tract of country implies that it has been formed out of part of a pargana—H Beveridge's History of Bakarganj P 65.

১৫০. Chandradwip included the whole of the modern Zilla of Bakarganj with the exception of Mahal Selimabad —Dr James Wise"s Wise's Wise's *Barabhuia* of Bengal.

১৫১. ১২৯৪ সালে ১৭ চৈত্র মঙ্গলবার এই মূর্তি আবিষ্কৃত হয়।

১৫২. H Beveridge's History of Bakarganj.—Page 313

১৫৩ H Beveridge's History of Bakarganj P. 154,

১৫৪. Elphinstone's History of India (chapter IV). p p 668 —672



ষষ্ঠ অধ্যায়

ইংরাজ-রাজত্ব

বৈদ্যকুল-প্রদীপ অতুল দিধীতিসম্পন্ন প্রবলপ্রতাপ মহারাজ রাজবল্লভের নায়েব-দেওয়ান পদ প্রাপ্তি হইতেই ইংরাজ রাজ্যের সূচনা আরম্ভ; নবাব আলিবর্দীর মৃত্যু, তৎপর তদীয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের এক বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিঃ অব্দে ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ-রাজত্বের পাষাণবৎ স্থায়ী ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। তারপর এক মীরকাশিম ব্যতীত যে কয়জন নবাব বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সকলেই ইংরাজগণের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী; ফলে ইংরাজই রাজ্যের সর্বময় কর্তা, নবাব উপলক্ষ্যমাত্র ছিলেন। কেবল ইংরাজের মন যোগাইয়া তাঁহারা নবাবী করিতেন, এবং ইংরাজের রোষকটাক্ষে আবার পূর্বভাব প্রাপ্ত হইতেন।

ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য নবাব অপেক্ষা, মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম একটু স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন যে, একমাত্র কর আদায় ব্যতীত রাজ্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্যই ইংরাজগণের করে ন্যস্ত, তিনি মাত্র প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্বক ইংরাজের প্রাপ্য টাকা শোধ করিবেন, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। গুরগণ খাঁ নামক জনৈক আর্মানি সেনাপতির সাহায্যে তিনি নূতন গোলন্দাজ সৈন্য, কামান, বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; ভাবিয়াছিলেন, এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ব্রিটিশ-সিংহকে তাড়াইয়া দিয়া আবার মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিবেন। এই সময়ে ইংরাজ কর্মচারীগণ এবং তাহাদিগের অনুগৃহীত দেশীয় বণিকগণও কোম্পানির নামে বাদশাহী সনন্দবলে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব মীরকাশিম অন্তর্বাণিজ্যের শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে দেশীয় বণিকগণের সুবিধা হইল বটে, কিন্তু ইংরাজ বণিকগণের বিশেষ ক্ষতি হইল; সুতরাং তাঁহারা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া নবাবকে এই আজ্ঞা রহিত করিবার জন্য বলিলেন। নবাব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজ্যস্থিত ইংরাজগণের গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইলেন। উভয় পক্ষই গোপনে যুদ্ধসজ্জা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলে নবাব প্রথমত গড়িয়া, তারপর কাটোয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রিঃ অব্দে বক্সারের যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, মীরকাশিম ফকিরি গ্রহণ পূর্বক ভারতবর্ষ হইতে মক্কা গমন করিয়াছিলেন। মীরকাশিমের অধঃপতনের পর আবার মীরজাফর খাঁ নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।[১]

১৭৬৫ খ্রিঃ অব্দে ১২ আগস্ট লর্ড ক্লাইভ, তদানীন্তন দিল্লিশ্বর সম্রাট শাহ্ আলমকে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ গ্রহণ করিলেন। ইহাই ইংরাজ রাজত্বের মূল দলিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ফলত সেই সময় হইতেই প্রকৃতরূপে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ এই দেশের রাজা হইলেন, এবং সেই সময় হইতেই ইংরাজরাজ এই দেশে রাজ্য পত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজের তেজস্বিতা, ন্যায়পরতা, সদ্বিচার প্রভৃতি অবলোকন করিয়া দেশবাসীগণ কায়মনোবাক্যে তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিল।

এক রাজার রাজ্য গত হইয়া অন্য রাজার রাজ্য পত্তন হইবার পূর্বে যে সময়টুকু থাকে, তাহাতে দস্যুভীতি, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি অরাজকতা চিরপ্রসিদ্ধ। অস্মদ্দেশ যে এই অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল তাহা নহে। তবে প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ-রাজের সুশাসনে কতিপয় বৎসর মধ্যেই এই অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছিল।

"যার লাঠি, তার মাটি" এই কথাটি দেশপ্রসিদ্ধ; ফলত সেই অরাজকতার সময়ে ইহার সার্থকতা অক্ষরে অক্ষরে সম্পাদিত হইয়াছিল। সবল ভূম্যধিকারিগণ, দুর্বল ভূস্বামীর জমিটুকু কাড়িয়া লইতেন। নীচ জাতীয় হিন্দুমুসলমান দলবদ্ধ হইয়া দেশের মধ্যে লুঠপাট করিত। এই সময় হইতে অনেক লোক স্বাধীনভাবে লবণের জ্বাল দিতে আরম্ভ করে; তাহারা এই কার্যের জন্য অনেক নিরীহ লোককে বলপূর্বক ধরিয়া আটক করিত। কেহ আপত্তি করিলে, অথবা প্রতিবন্ধক হইলে, তাহার দুর্দশার সীমা থাকিত না। লবণের জ্বাল অনেক বৎসর হইল উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি "মলঙ্গী" নামে জনসমাজে পরিচিত। ইংরাজ-রাজ্য পত্তন হইবার পূর্ব হইতেই নৌ-দস্যুতা এত প্রবল হইয়াছিল যে, তজ্জন্য দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইংরাজ-রাজকেও ত্রাসিত এবং সতর্ক হইতে হইয়াছিল; এমন কি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পণ্যদ্রব্য, যাত্রীর নৌকা প্রভৃতিও লুণ্ঠিত হইয়াছিল।[২]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ তাহাদের নামে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিয়া ১৭৭২ খ্রিঃ অব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হেস্টিংস যে প্রকার বুদ্ধিমান, তদ্রূপ কর্মঠ ছিলেন। তিনি নূতন রাজ্য পত্তন সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য, অনন্যমনে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কলিকাতায় রাজধানী স্থাপন করিয়া, মুর্শিদাবাদ হইতে রাজকোষ এবং অন্যান্য কার্যালয় তথায় উঠাইয়া আনিলেন। এই সময় হইতে "জেলা" গঠিত হয় এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যালয় স্থাপিত হয়। কালেক্টর দেওয়ানি কার্য করিতেন, একজন মুসলমান কাজি দ্বারা ফৌজদারি বিচার নির্বাহ হইত।

লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক বিজিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য, দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন দেখিয়া মহামান্য ব্রিটিশ পার্লিয়েমেন্ট ১৭৭৩—১৭৭৪ খ্রিঃ অব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act) নামক আইন প্রচার করিলেন। এই আইনানুবলে, ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম ভারতীয় ব্রিটিশ রাজ্যের গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন; এবং কলিকাতায় "সুপ্রিম কোর্ট" নামক সর্বপ্রধান স্বাধীন বিচারালয় সংস্থাপিত হইল।[৩] ইহার পর হইতেই বঙ্গদেশান্তর্গত যাবতীয় জেলায় রীতিমত কাছারি স্থাপিত হইয়া নিয়মিত কার্য আরম্ভ হইল। এই জেলার সর্বপ্রথম বর্তমান ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত বারইকরণ নামে সরকারি কার্যালয় স্থাপিত হয়। মিঃ বেভারিজ্ তৎপ্রণীত ইতিহাসে ইহার কোন সন তারিখ নির্ণয় করেন নাই।[৪] তথায় স্থানে স্থানে এখনও ভগ্ন ইষ্টকসমূহ প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে স্থানে পূর্বে কাছারি ছিল, স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসীগণ বলেন যে, তাহার অধিকাংশ এখন নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে; তবে পূর্ব থানার চিহ্ন এখনও বর্তমান দেখা যায়।

১৭৯২ খ্রিঃ অব্দে বারইকরণ হইতে বাকরগঞ্জে সরকারি অফিসাদি স্থানান্তরিত করা হয়। তখন মিডল্টন্ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট। সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম স্থানীয় শাসনকর্তা; জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট এই উভয়ের যাবতীয় কার্যই তাঁহার একা দ্বারা নির্বাহ হইত।

১৮০১ বাকরগঞ্জ হইতে রাজধানী উঠাইয়া বর্তমান বরিশালে স্থাপিত হয়। তখন মিঃ উইন্টেল সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট্। বর্তমান সময়েও জেলার যাবতীয় রাজকার্য এই স্থানে নির্বাহ হইয়া থাকে।

বেভারিজ্ সাহেব বলেন যে, বারইকরণের পর বোজরগ উমেদপুরে কালেক্টরি অফিস স্থাপিত ছিল, এবং জেলা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যও সেখানে নির্বাহ হইত। বাকরগঞ্জে জেলা পরিবর্তিত হইবার পূর্বে লজ্ বোজরগ উমেদপুরে কালেক্টর ছিলেন; চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ, জাফরাবাদ, সৈদপুর, অবঙ্গপুর, বোজরগ উমেদপুর জেলার অধীনে ছিল। ১৭৮২ খ্রিঃ অব্দে উহা ঢাকা-কালেক্টরির তৌজিভুক্ত হয়।[৭]

ঢাকা হইতে কালেক্টরি পৃথক হইলে হাণ্টার সাহেব প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট্ পৃথক রহিলেন, তাহাকে রাজস্ব সম্বন্ধে কোন কার্য করিতে হইত না। সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইবার প্রায় সাত বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রিঃ অব্দে মফস্বলে সিভিল কোর্ট স্থাপিত হইবার আইন লিপিবদ্ধ হইল। তখন ইংরাজশাসিত বঙ্গদেশ মধ্যে অষ্টাদশটি জেলার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বাকরগঞ্জ অন্যতম; কিন্তু কোন বৎসর প্রথমে সিভিল কোর্ট এই জেলায় সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। সম্ভবত বারইকরণ হইতে বাকরগঞ্জ জেলা স্থানান্তরিত হইবার দুই তিন বৎসর পরে সিভিল কোর্ট স্থাপিত হইয়া থাকিবে। তৎকালে বাকরগঞ্জের যে সীমা ছিল, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। তখন ঢাকা বিভাগস্থ গঙ্গা এবং কালীগঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে মেঘনা, চাঁদপুর এবং সমুদ্রের পশ্চিম পর্যন্ত ভূখণ্ড বাকরগঞ্জের অধীনে ছিল। ইহার পশ্চিম সীমায়, ভূষণা, যশোর এবং রাজমঙ্গল (রায়মঙ্গল?) নদীর মোহানা পর্যন্ত যতগুলি দ্বীপ ঢাকার অধীনে ছিল, একমাত্র সন্দ্বীপ এবং তদধীনস্থ দ্বীপ ব্যতীত সমস্তই বাকরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮]

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাকরগঞ্জ সাধারণ স্থান ছিল না। বর্তমান জেলায় যেটুকু সীমা দৃষ্ট হইয়া থাকে উল্লিখিত সীমা তদপেক্ষা দ্বিগুণ অথবা ততোধিক হইবে। এক জন ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা সুশাসন না হওয়ায় ইহার অনেক স্থান পার্শ্ববর্তী জেলাভুক্ত হইয়াছে। ফরিদপুর, খুলনা, নোয়াখালি প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ একরূপ বাকরগঞ্জের ভূমি দ্বারা গঠিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজ্য পত্তন হইলে অতি সত্বর এই জেলা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার দুইটি কারণ উপলব্ধি হয়; প্রথমত এই দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্য, পাট, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, এই সকল উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য অল্প অথচ দ্রব্য উৎকৃষ্ট; দ্বিতীয়ত বাণিজ্য করিবার অত্যন্ত সুবিধা, কেননা জলপথে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করা যেরূপ সুখসাধ্য তদ্রূপ অল্প ব্যয়সাধ্য। বিশেষত তৎকালে সাহাবাজপুর, বোজরগ উমেদপুর, সেলিমাবাদ প্রভৃতি পরগনায় এরূপ উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হইত যে তদ্রূপ নিম্নবঙ্গে হইত না। পর্তুগীজ বণিকগণ প্রথমত এই বাণিজ্যের আকাঙ্ক্ষায় এদেশে আগমন করেন এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ বিস্তর লাভবান হইয়াছিলেন।[৮]

বাকরগঞ্জ হইতে বরিশাল জেলা স্থানান্তরিত হইলে নৌ-দস্যুতা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইল। মিঃ মিডল্টন্ তখন ম্যাজিস্ট্রেট্; তিনি আলিয়ার খাঁ নামে জনৈক দক্ষ গোয়েন্দাকে দক্ষিণ সাহাবাজপুর অঞ্চলে চোর, ডাকাত প্রভৃতি ধৃত করিতে প্রেরণ করিলেন। বিচারে তাহাদের যথারীতি শাস্তি হইলে পর সেই হইতে দস্যুতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। বরিশালে পৃথক কালেক্টরি স্থাপিত হইলে ফৌজদারি এবং দেওয়ানি কার্য অনেক বাড়িয়া গেল; এই সময়ে মহকুমা করিবার প্রস্তাব হইল। তদনুসারে বাখরগঞ্জে পিরোজপুর, পটুয়াখালি দৌলতখাঁ তিনটি মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৮৫৯ খ্রিঃ অব্দে পিরোজপুর ১৮৭১ খ্রিঃ অব্দে পটুয়াখালি, এবং ১৮৪৫ খ্রিঃ অব্দে দৌলতখাঁয় মহকুমার কার্য আরম্ভ হয়। বিগত ১৮৭৬ খ্রিঃ অব্দে মহাঝড়ে দৌলতখাঁ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তথাকার মহকুমা পর বৎসর ভোলায় স্থানান্তরিত হইল। আজকাল যেমন স্থানে স্থানে থানা এবং পুলিশ-ফাঁড়ি স্থাপিত দেখা যায়, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এই জেলায় মাত্র নলছিটি, গৌরনদী, বাউফল, আঙ্গারিয়া,গলাচিপা এবং কেওয়াড়ি এই ছয়টি থানার নাম দেখিতে পাই। বর্তমান সময়ে এই স্থানে ষোলটি থানা এবং দশটি ফাঁড়ি হইয়াছে।

খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমাধীন যত স্থান, তাহা পূর্বে এই জেলাভুক্ত ছিল; বিগত ১৮৬৩ খ্রিঃ অব্দে খুলনার অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রিঃ অব্দে মাদারিপুর এবং কোটালিপাড়া ফরিদপুরভুক্ত হইল। মহকুমা স্থাপিত হইবার পূর্বে বাকরগঞ্জ থানার অধীন কোটেরহাট, বাউফল, কাউখালি ও মেহেন্দিগঞ্জে মুন্সেফি চৌকি ছিল। তথায় এক এক জন মুন্সেফ দেওয়ানি বিচারকার্য নির্বাহ করিতেন। পটুয়াখালিতে মহকুমা স্থাপিত হইলে কোটেরহাট ও বাউফলের মুন্সেফি চৌকি উঠিয়া মহকুমার অন্তর্গত হয়। সেই প্রকার কাউখালি, পিরোজপুরে, এবং মেহেন্দিগঞ্জ প্রথমে দৌলতখাঁয়, পরে ভোলায় মহকুমাভুক্ত হইল।

এই সময়ে আইন প্রভৃতির বড় কড়াকাড়ি ছিল না ; জমিদারগণ, অথবা স্থানীয় প্রধানগণই দেওয়ানি ও ফৌজদারির বিচার নির্বাহ করিতেন। ১৮৬০ সালে ফৌজদারি দণ্ডবিধি-আইন প্রচলিত হয়। ইহার পর শাসনকার্য বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আরম্ভ হইল। বর্তমান সময়ে হত্যাকারীগণের প্রাণদণ্ড জেলের মধ্যেই হইয়া থাকে, কিন্তু বহুপূর্বে সেরূপ নিয়ম ছিল না। যে স্থানে নরহত্যা হইত, অপরাধীকে সেই স্থানেই ফাঁসি দেওয়া হইত। ইহা দ্বারা অন্যান্য সকলের মনে একটা বিকট আতঙ্ক উপস্থিত হইত, তদ্রূপ একটা উদাহরণও থাকিত। ১৮৫৯ খ্রিঃ অব্দে নিলামি আইন জারি হয় ; নির্দিষ্ট দিনে কালেক্টরিতে দেয় রাজস্ব দাখিল না করিলে সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইত। এই আইন জারি দ্বারা ভূম্যধিকারী সাধারণের ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইল। এই অনুসারে বহু প্রাচীন জমিদারি এবং তালুকের অস্তিত্ব লোপ হইয়া পরস্বত্ব হইয়াছে। বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ, ইদিলপুর প্রভৃতি পরগনাই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকের সময়ে সতীদাহ এবং গঙ্গাসাগরে পুত্রকন্যা বিসর্জন-প্রথা রহিতকর আইন লিপিবদ্ধ হয় ; ইংরাজ রাজত্বের সময় হইতে এই আইন জারির পূর্ব পর্যন্ত এই জেলায় (যে পর্যন্ত হিসাব রাখা হইয়াছে) ১৬০টি সতীদাহ হইয়াছে। ১৮২৯ খ্রিঃ অব্দে এই আইন লিপিবদ্ধ হইয়া, তৎপর বৎসর ইহা প্রচলিত হয়। মিঃ গ্যারাট তখন এই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

লর্ড ডেলহাউসির শাসনসময়ে ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধিত হয় ; তন্মধ্যে সাধারণের সুবিধার জন্য পূর্ত বিভাগ, পোস্টাফিস সংক্রান্ত সুবিধাজনক কার্যপ্রণালি এবং সর্বাপেক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই শাসন সময়ে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলায় জেলায় গভর্নমেন্টের সম্পূর্ণ ব্যয়ানুকূল্যে উচ্চ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। আমাদের বরিশাল জেলা-স্কুলও এই সময়ে স্থাপিত হয়। বিগত ১৮৫৪ খ্রিঃ অব্দে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল ; ইহার পূর্বে এই জেলায় আর কোন স্থানেই ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল না।

লর্ড ক্যানিং মহোদয়ের শাসনসময়ে ১৮৫৭ খ্রিঃ অব্দে সিপাহি-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই মহাবিদ্রোহে যে কালাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, প্রতাপান্বিত ব্রিটিশরাজ তখন বদ্ধপরিকর হইয়া এই দেশ রক্ষা না করিলে, যে কি সর্বনাশ সংঘটিত হইত, তাহা ধারণা করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ঢাকা লালবাগস্থ হতাবশিষ্ট সিপাহিগণ বরিশাল আক্রমণ করিবে এরূপ জনরব হইলে, নাগরিকগণের অন্তঃকরণে বিষম ভয় উপস্থিত হইল। ভদ্র অধিবাসীগণ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া কেহ নৌ-যানে, কেহ বা তট-পন্থায় পলায়ন করিতে লাগিলেন। স্থানীয় ইংরাজগণ বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রাদি লইয়া স্ত্রীপুত্রাদিসহ, বর্তমান যে দালানে ইস্টার্ন মরগেজ্ কোম্পানির কর্মচারীগণ বাস করেন, সেই স্থানে সমবেত হইলেন। চতুর্দিকে সঙ্গিনধারী পুলিশ কনস্টেবল পাহারায় নিযুক্ত রহিল। ভাগ্যক্রমে বিদ্রোহীদল এদিকে আসিল না ; নচেৎ মুষ্টিমেয় কনস্টেবল এবং সিবিলিয়ানগণ তাহাদের পাশবিক অত্যাচারে নিশ্চয়ই হত হইত। বাকরগঞ্জের কোন কোন ভূম্যধিকারী এই বিদ্রোহীগণের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া শত্রুগণ মিথ্যা রচনা করিয়া দেয় ; তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খ্রিঃ অব্দে ১লা নভেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থলে, এই ভারতসাম্রাজ্য, মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইল। সেই সময় হইতে রাজকীয় যাবতীয় কার্য মহারাণীর স্বনামে আরম্ভ হয়।

ইহার অল্প দিন পরে খাজনা বিষয়ক ১০ আইন এবং কারেন্সি নোট প্রচারিত হইল। পূর্বে অস্মদ্দেশীয় জমিদারগণ খাজনা আদায় সম্বন্ধে আইনের কোন ধার ধারিতেন না ; প্রজার শস্য দ্বারা অথবা তাহাদের ধরিয়া আনিয়া প্রাপ্য খাজনা আদায় করিতেন। ১০ আইন এবং ৪৫ আইন (দণ্ডবিধি) জারি হইলে তাহাদের ক্ষমতা বড়ই খর্ব হইয়া গেল। প্রজাগণও খাজনা আদায় সম্বন্ধে জমিদারের বড় ধার ধারিত না ; কারণ ১০ আইন দ্বারা খাজনা আদায় করা কোন কোনও সময়ে ভূম্যধিকারীর পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইত। ১৮০৩ খ্রিঃ অব্দে স্ট্যাম্প আইন এবং ১৮৬৫ খ্রিঃ অব্দে রেজিস্ট্রি আইন জারি হয়। ১৮১৩ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১৮৬৪ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত কাজির রেজিস্ট্রি ছিল, ইহার পূর্বে দেশীয় কাগজেই যাবতীয় দলিলাদি লিখিত হইত। কোন কোন সম্পন্ন জমিদার দানপত্র প্রভৃতি তাম্রফলকে লিখিয়া দিতেন। ১৮৭৮ খ্রিঃ অব্দে প্রথমত অস্ত্র আইন জারি হইল। সাধারণ প্রজাবর্গ তখন বন্দুকাদি ইচ্ছামত প্রস্তুত এবং ব্যবহার করিতে পারিত ; কেবল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জানাইতে হইত। বিগত ১৮৯৬ খ্রিঃ অব্দে এই জেলার সমস্ত বন্দুক গভর্নমেন্ট কাড়িয়া লইয়াছেন। গভীর রাত্রিকালে বন্দুক দ্বারা গুপ্ত নরহত্যাই ইহার উল্লেখযোগ্য কারণ ; তবে নরহত্যাকারীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই নীচজাতীয়।

প্রজারক্ষা রাজার সনাতন ধর্ম ; তাই গভর্নমেন্ট সমগ্র অধিবাসীগণকে নিরস্ত্র করিয়াছেন ; কিন্তু ধর্মভীরু ভদ্রসন্তান এবং নিরীহ প্রজাগণের অন্তত হিংস্র জন্তু এবং দস্যু হইতে আত্মরক্ষার উপায় সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি করিলে বোধহয় ভাল হইত। ১৮১২ খ্রিঃ অব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি বরিশাল নগরীতে একটি ছোটখাটো বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে জেলখানা যে প্রকার সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর এবং বৃহৎ অট্টালিকাসমূহ দ্বারা বেষ্টিত, সে সময়ে তাহা ছিল না ; চতুর্দিকে সুদৃঢ় সুন্দরী কাঠের বেড়া এবং কয়েদিগণের বাসোপযোগী কয়েকখানি কারাগৃহ ছিল। কয়েদিগণ উত্তেজিত হইয়া গৃহগুলিতে অগ্নি দিয়া সামান্য বেড়া উল্লঙ্ঘন করত "মার" "মার" শব্দে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। কতকগুলি নীচজাতীয় মুসলমানও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। তখন মিঃ বেটিয়া এই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ; সুবেদার ও পুলিশ-কনস্টেবলগণের সাহায্যে তিনি জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীগণের আকস্মিক আক্রমণে তাঁহাকে অনেক স্থানে আঘাত পাইতে হইয়াছিল। সুবেদার সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল। বিদ্রোহীগণের মধ্যে দশ বার জন হত হইলে, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

মহামতি লর্ড রিপনের সময়ে স্বায়ত্বশাসন আইন প্রচলিত হয়। সেই সময়ে বঙ্গকুলগৌরব মহামনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত, বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ; তখন হইতেই অস্মদ্দেশে স্বায়ত্বশাসন আরম্ভ হইল। জেলা-বোর্ডের অধীনে প্রত্যেক মহকুমায় স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপিত হইল।

লর্ড ডাফরিনের সময়ে বিগত ১৮৮৫ খ্রিঃ অব্দে ১লা নভেম্বর প্রজা-ভূম্যধিকারী সংক্রান্ত নূতন আইন প্রচলিত হয়। এই আইন দ্বারা ভূম্যধিকারিগণ অপেক্ষা প্রজাগণের বিশেষ সুবিধা পরিলক্ষিত হইতেছে। স্থানীয় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী, প্রজাগণের কাছে খাজনা আদায় করিবার জন্য হৃতসর্বস্ব হইয়াছেন।

১৮৮৩—৮৪ খ্রিঃ অব্দে বরিশাল সদরে প্রথম টেলিগ্রাফ অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং অনতিবিলম্বে ঝালকাঠি, নলছিটি, পিরোজপুর, গৌরনদী, সাহেবগঞ্জ, বাটাজোড় এবং রহমতপুর পোস্টাফিসের সঙ্গে টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপিত হইল।

কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি হইতে এ জেলায় গমনাগমনের জন্য পূর্বে নৌকার বন্দোবস্ত করিতে হইত ; ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড স্থাপিত হইলে ১৮৮৫ খ্রিঃ অব্দে প্রথমত বরিশাল হইতে খুলনা পর্যন্ত প্লোটিলা কোম্পানি স্টিমার চালাইতে আরম্ভ করে। কলিকাতার ঠাকুর বাবুগণ এই কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া খুলনা পর্যন্ত আর একখানি স্টিমার চালাইতে আরম্ভ করেন। উভয় দলে কয়েকদিন বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা হওয়ায় এক সময় বরিশাল হইতে খুলনা পর্যন্ত মাত্র চারি আনা ভাড়া হইয়াছিল। অল্পদিন পরে, ঠাকুর বাবুগণ, প্লোটিলা কোম্পানি হইতে কয়েক সহস্র টাকা গ্রহণ

করিয়া লাইন ছাড়িয়া দিলেন ; তদবধি প্লোটিলা কোম্পানির একাধিপত্য স্থাপিত হইল। বর্তমান সময়ে ধনকুবের আর এস এন কোম্পানি (Rivers Steam Navigation Company) লাইন গ্রহণ করিয়া বরিশাল নগরীতে প্রবীণ স্টেশন, এবং কারখানা স্থাপন করিয়া আসাম, ডিব্রুগড় পর্যন্ত সুদূর দেশে বিনা ক্লেশে এবং অল্পব্যয়ে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা এবং বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। লাখুটিয়ার স্বনামধন্য জমিদার রাজচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাখালচন্দ্র রায়, এবং জলাবাড়ির খ্যাতনামা জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ বিশ্বাস এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, কয়েক মাস যাবৎ যাত্রী-স্টিমার চালাইয়াছিলেন।

একমাত্র গভর্নমেন্ট স্থাপিত ইংরাজি বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন একটি মধ্যবাংলা বিদ্যালয় ব্যতীত, এই জেলায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী আর কোন ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল না। বাটাজোড় নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী সুবিখ্যাত ব্রজমোহন দত্ত বিগত ১৮৮৪ খ্রিঃ অব্দে ২৭শে জুন বরিশালে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তদীয় পুত্র স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমারের অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে দিন দিন বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৮৯ খ্রিঃ অব্দে এই বিদ্যালয় দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজে পরিণত হইল। বর্তমান সময়েও এই কলেজ এবং তৎসংক্রান্ত স্কুল নিম্নবঙ্গে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। অশ্বিনীকুমারের এই মহৎ কার্যে বরিশালবাসী জনসাধারণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। অধিক বলিতে কি, সাধারণের হিতকর সমস্ত কার্যেই তিনি অগ্রণী। ব্রজমোহন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৮ খ্রিঃ অব্দে লাখুটিয়ার জমিদার বিহারীলাল রায়, তদীয় পিতৃদেব রাজচন্দ্রের নামে একটি উচ্চ শ্রেণির ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ১৮৮৯ খ্রিঃ অব্দে উহাও কলেজে পরিণত হয়। উক্ত কলেজে আইন-শিক্ষা-বিভাগ থাকায় উহা প্রথম শ্রেণির কলেজে পরিণত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের শিথিলতায় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় উহা উঠাইয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া বর্তমান সময়ে এই জেলাস্থ অনেক সমৃদ্ধিশালী গ্রামে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বিগত ১৮৯০ খ্রিঃ অব্দে গৈলা নিবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল রজনীকান্ত দাশগুপ্তের যত্নে বরিশালে টেকনিকাল স্কুল (পূর্ত কার্য-শিক্ষাবিষয়ক বিদ্যালয়) স্থাপিত হইয়া, ম্যাজিস্ট্রেট, মহাত্মা বেল সাহেবের চেষ্টায় শিবপুরস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শাখা শ্রেণিভুক্ত হইল। এই বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছে।

অতি অশুভক্ষণে ভয়ঙ্করী প্লেগ (মহামারি) রাক্ষসী বোম্বাই নগরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এই নরশোণিতলোলুপা পিশাচী ধীরে ধীরে ভারতের প্রায় স্থানেই ইহার সংহারিণী মূর্তি প্রকটিত করিয়া নরকুল ক্ষয় করিতেছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডও ইহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই প্লেগ বিগত ১৮৯৮ খ্রিঃ অব্দে নলছিটি থানার অন্তর্গত সিদ্ধকাঠি গ্রামে আবির্ভূত হইয়া, "গৃহলক্ষ্মী", "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা জমিদার গিরিজাপ্রসন্নকে প্রথম আক্রমণ করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় নবীনা সহধর্মিণী ও পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা জননীকে গ্রাস করিয়া, সিদ্ধকাঠি এবং তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। তখন মহামতি এন ডি বিটসন বেল এই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। এই মহাপুরুষ স্বীয় জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া মহামারির করাল কবল হইতে এই দেশকে যেভাবে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

প্লেগাক্রমণ শুনিয়া সাহেব বাহাদুর, তৎক্ষণাৎ সিভিল সার্জন ও অন্যান্য ডাক্তার সমভিব্যাহারে স্বয়ং সিদ্ধকাঠি গমন করিলেন। এদিকে মহামারি নিকটবর্তী গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িল ; অধিবাসীগণ মহাতঙ্কে স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা বেল তথায় পৌঁছিয়া যে সমস্ত ইতর পল্লীতে এই মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত স্থানের যাবতীয় স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা প্রভৃতিকে পৃথক পৃথক নৌকায় রক্ষা করিয়া, সকলকে উপযুক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ছোট ছোট বালকবালিকাগণের জন্য, খেলার সামগ্রী, কখন কখন বা উৎকৃষ্ট মিঠাই আনিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক শঙ্খবণিক উক্ত মহামারিতে গৃহমধ্যে

মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল ; ভয়ে কেহ তাহার সৎকার করিতে গেল না ; মৃত ব্যক্তির একমাত্র স্ত্রী, সেই শবদেহ কোলে করিয়া রহিল। এই ভীষণ ঘটনা বেল সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বয়ং তথায় গমন পূর্বক মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর সাহায্যে তাহার ঔর্ধ্বদেহিক কার্য সমাধা করিলেন। তিনি স্বীয় জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া যেভাবে বিপন্নদিগকে সাহায্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাম বাকরগঞ্জবাসীগণের হৃদয়স্থ অস্থিপঞ্জরে চিরখোদিত থাকিবে। এই মহাত্মা তখন উক্ত দুরন্ত রোগ দমনের জন্য এবম্বিধ চেষ্টা না করিলে, বোধ হয় প্লেগ-রাক্ষসী অর্ধাধিক অধিবাসীগণকে উদরসাৎ করিত।

অস্মদ্দেশে পূর্বে সাধারণের হিতকর কোন সভা-সমিতি ছিল কিনা তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিগত ১৮৬৯ খ্রিঃ অব্দে অথবা তৎপর বৎসর ইস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন (East Bengal Land Holders' Association) নামক সভার একটি শাখা সভা বরিশাল নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কীর্তিপাশার জমিদার প্রসন্নকুমার সেন, বাসণ্ডার জমিদার সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ সেন, সায়েস্তাবাদের নবাব সৈয়দ মীর মোয়াজ্জাম হোসেন খান বাহাদুর, লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় এবং বিহারীলাল রায় প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। দুই তিন বৎসর সভার কার্য কোন প্রকারে নির্বাহিত হইযাছিল ; কিন্তু দেশীয় অন্যান্য ভূম্যধিকারীগণ যোগ না দেওযায় শীঘ্রই ইহার অস্তিত্ব লোপ হইল। এইরূপ সাধারণ-হিতকল্পসভা রীতিমত চলিলে, তদ্বারা দেশের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সভা থাকিলে, বোধ হয, অস্মদ্দেশীয় কয়েকটি পুরাতন সমৃদ্ধিশালী জমিদার দরিদ্রভাবাপন্ন হইতেন না ; অথবা জমিদারগণ পরস্পরের সম্পত্তি গ্রহণেচ্ছায় আইনজীবীগণের বিশাল উদর পূর্ণ করিতে হৃতসর্বস্ব হইতেন না।

১৮৭০ খ্রিঃ অব্দে মুদ্রাযন্ত্র প্রথমত বরিশাল নগরীতে বাসণ্ডা নিবাসী সূর্যচন্দ্র গুপ্ত স্বনামে স্থাপিত করেন। "পবিমল বাহিনী" নামক একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র সেই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হইত। কয়েক বৎসর পরে উভয়েরই অস্তিত্ব লোপ হইযা যায়। পরে ১৮৭৩ খ্রিঃ অব্দে মাওরা নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র কর, "সত্যপ্রকাশযন্ত্র" নামে এক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই যন্ত্রে "বরিশাল-বার্তাবহ" "হিতসাধিনী" "বানরঞ্জিকা" "সত্যপ্রকাশ" "বঙ্গদর্পণ" নামক কয়েকটি পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। একমাত্র বরিশাল-বার্তাবহ ব্যতীত, অন্যান্য সংবাদপত্রগুলি অল্পদিন মধ্যেই লোপ পাইল। বরিশাল-বার্তাবহ পাঁচ ছয় বৎসরের অধিক স্থায়ী ছিল না। কাশীপুব নিবাসী অসাধারণ অধ্যবসায়ী প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিগত ১৮৮১ খ্রিঃ অব্দে "কাশীপুরনিবাসী" নামক একখানি পত্রিক পত্র প্রচার করেন। তিনি প্রথমত হাতে লিখিয়া উক্ত সংবাদপত্র প্রচার করেন ; পরে স্বযং মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া পত্রিকা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্তমান সময় পর্যন্তও উক্ত পত্রিকা অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে। মফস্বলে এত দীর্ঘকাল অন্য কোন বাংলা সংবাদপত্র স্থায়ী হইতে দেখা যায না। প্রতাপচন্দ্রের এই দেশহিতকর কার্য বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্তমান সময়ে বরিশাল নগরীতে "বিকাশ" এবং "বরিশাল হিতৈষী" নামক আরও দুইটি সংবাদপত্র এবং তৎসহ দুইটি মুদ্রাযন্ত্র আছে।

"বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী" নাম্নী আর একটি সভার অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান আছে ; বিগত ১৮৭৭ খ্রিঃ অব্দে এই সভা প্রথমত স্থাপিত হয়। অন্তঃপুরস্থ রমণীদের শিক্ষার উন্নতিই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। খলিশাকোটা নিবাসী উকিল চন্দ্রকান্ত সেন, উজিরপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্য মাতৃসেবক এই সভার চালক এবং পৃষ্ঠপোষক। বর্তমান সময পর্যন্তও এই সভার কার্য ধীরভাবে চলিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই জেলার এক চতুর্থাংশ অধিবাসীরও ইহার উন্নতিকল্পে আদৃশ সহানুভূতি দৃষ্ট হয না।

ধর্মবীর রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম ধীরে ধীরে এদেশেও প্রবেশাধিকার পাইল। প্রথমত হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত উকিল দুর্গামোহন দাস এবং জগচ্চন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি এই ধর্ম-প্রচারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তখন অনেকে গুপ্তভাবে এই ধর্মে যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই

সময় লাখুটিয়ার জমিদারগণ প্রকাশ্যরূপে পৈতৃক হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া যজ্ঞোপবীত ত্যাগপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে এই জেলাস্থ হিন্দুসমাজ বাত্যাবিতাড়িত সাগরোর্মির ন্যায় যেরূপভাবে সংক্ষোভিত হইয়াছিল, তাহাতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সেই উর্মিমালার ভীমগর্জন মধ্যে মধ্যে শ্রুত হওয়া যায়। এই সমস্ত নবদীক্ষিত ধনশালী ব্রাহ্মগণের অর্থব্যয়ে অচিরাৎ একটি ব্রাহ্ম-ধর্মমন্দির নির্মিত ও কিছুদিন পরে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন হইল।

ইংরাজ রাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে খ্রিস্ট-ধর্ম-যাজকগণ ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু তখন এই দেশীয় লোক কেহই বড় একটা অগ্রসর হইত না। মিঃ গেরেট যখন এই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন দুই একজন করিয়া এই দেশীয় লোক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর ইতর লোক ব্যতীত ভদ্রবংশজাত কেহ এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এরূপ জানা যায় না। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের জন্য তখন দুইটি ধর্মমন্দির নির্মাণ করা হয়। গেরেট সাহেবের আমলে এই কার্য আরম্ভ হইয়া চারি পাঁচ বৎসর মধ্যেই প্রোটেস্টান্ট চার্চ নির্মিত হইল। এই ধর্মমন্দির, অতি সুন্দর এবং উচ্চ। বিগত ১৮৪০ খ্রিঃ অব্দে ইহার নির্মাণ কার্য সমাধা হয়। অস্মদ্দেশীয় সাধারণ ইংরাজিশিক্ষিত যুবকগণ, তৎকালে হুজুগে মাতিয়া কেহ কেহ ব্রাহ্ম, কেহ কেহ বা খ্রিস্টান হইতে আরম্ভ করিল। এই হঠকারিতায় যে কি বিষময় ফল, তাহা তখন তাহাদের বিকৃত মস্তিষ্কে স্থান লাভ করে নাই। অনেক নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ হিন্দু মাতাপিতা অশ্রুজলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে করিতে ধর্মের জন্য একমাত্র পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; অনেক যুবতী, শ্বশুর শাশুড়ি মাতাপিতা পরিত্যাগ পূর্বক অশ্রুমোচন করিতে করিতে বিকৃতমস্তিষ্ক স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছিল। ইহার ভাবী ফল যাহা ঘটিয়াছে তাহা বাকরগঞ্জের হিন্দু পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। এই সমস্ত সামাজিক অভাব এবং ধর্মবিপ্লব হইতে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য কতিপয় ধর্মপ্রাণ হিন্দু অতি শুভক্ষণে বরিশাল নগরীতে "ধর্মরক্ষিণী সভা" নামক একটি সভা স্থাপন করেন। বিক্রমপুর নিবাসী স্বধর্মনিরত জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমত এই গুরুতর কার্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কর্মোপলক্ষে বরিশালবাসী হইয়া যে প্রকার শারীরিক ও আর্থিক ক্লেশ স্বীকার করত এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাতে এই দেশবাসী হিন্দুমাত্রেই তাঁহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিবে। গাভা নিবাসী উকিল নন্দকুমার ঘোষ, চাঁদশী নিবাসী উকিল অম্বিকাচরণ গুহ, গৈলা নিবাসী স্বনামখ্যাত উকিল রজনীকান্ত দাশগুপ্ত প্রভৃতি এই লোকহিতকর কার্যের উদ্যোক্তা। এই সকল মহাত্মার মধ্যে ভূতপূর্ব সাবজজ নফরচন্দ্র ভট্টের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের উদ্যোগে এবং দেশীয় হিন্দু-সনাতনদের সাহায্যে বিগত ১২৯৫ বঙ্গাব্দে এই সভার জন্য একখানি ধর্মভবন নির্মিত হইয়াছে।

পূর্বে দরিদ্রদিগের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত ছিল না ; দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের অর্থ সাহায্যে বিগত ১৮৪৮ খ্রিঃ অব্দে গভর্নমেন্ট কর্তৃক একটি বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সময়ে ইহার অবস্থা বেশ উন্নত ; বহুসংখ্যক গরিব দুঃখী বিনাব্যয়ে ঔষধ-পথ্য দ্বারা জীবন লাভ করিতেছে।

বিগত ১৮৪৭ খ্রিঃ অব্দে বরিশাল নগরীতে প্রথমে সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। তদানীন্তন ইংরাজ অধিবাসীগণই ইহার স্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই এই পুস্তকালয় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানীয় অধিবাসীগণ এখন আর ইহার উন্নতিকল্পে তাদৃশ যত্নবান নহেন।

বর্তমান সময়ে এই জেলায় যত ফৌজদারি ও দেওয়ানি সংক্রান্ত মোকদ্দমা হয়, তাহার অধিকাংশই ভূমির পরিমাণ, হকিয়ত, খাজনা এবং সীমা লইয়াই হইতেছে, গভর্নমেন্টের এরূপ বিশ্বাস। সেইজন্য চন্দ্রদ্বীপের অন্যতম জমিদার কলিকাতাস্থ পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রার্থনায় বিগত ১৯০২ খ্রিঃ অব্দে এই দেশে সার্ভে সেটেলমেন্ট আরম্ভ হইয়াছে। ইহা দ্বারা কালে শুভফল হইবে, কি অশুভফল হইবে, তাহা সেটেলমেন্ট বিভাগের প্রধান

কর্মচারীগণও বলিতে পারেন না। কত বৎসরে যে এই কার্য সম্পন্ন হইবে, তাহাও নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ; তবে বর্তমান সময়ে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে জমিজমা লইয়া অসংখ্য মোকদ্দমা উদ্ভূত হইয়াছে। মহামতি বেল এই বিভাগের সর্বপ্রধান কর্মচারী ; তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অদম্য উৎসাহে প্রকৃতিপুঞ্জের হিতার্থে ন্যায়পরতার সহিত কার্য নির্বাহ করিতেছেন, তাহাতে এ দেশবাসী সেটেলমেন্ট ও জরিপের শুভফল কামনা করিয়া থাকেন।

মুসলমান-রাজত্বের সঙ্গে বর্তমান ইংরাজ-রাজত্বের তুলনা করিতে গেলে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। মুসলমান নরপতিগণের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত সকলেই আত্মসুখপরায়ণ ছিলেন ; প্রজাদের হিত এবং সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। এই নরপতিগণের অত্যাচারে হিন্দুগণ সর্বদা মর্মপীড়ায় মূহ্যমান থাকিত। তখন কোন আইন অথবা উপযুক্ত বিচারালয় ছিল না, রাজার মুখের বাক্যই আইন এবং তাহার কার্যকলাপই সকলের অনুকরণীয়। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কেহ যদি কোন সত্য কথাও বলিত, ঘুণাক্ষরেও তাহা রাজার কর্ণগোচর হইলে, তাহার আর রক্ষা থাকিত না ; হয়ত প্রাণদণ্ড, সর্বস্ব রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত, অথবা চিরকারাবাস ব্যবস্থা হইত। দস্যু-তস্করের ভয়ে প্রজাপুঞ্জ সর্বদা ত্রাসিত থাকিত। কেহ সুন্দরী স্ত্রীকন্যা লইয়া নির্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিত না। দৈবাৎ বাদশাহ অথবা তৎপ্রতিনিধির কর্ণগোচর হইলে, আর রক্ষা ছিল না ; ছলে, বলে, কৌশলে, যে প্রকারেই হউক, স্বীয় পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া তাঁহারা "রক্ষকই ভক্ষক" এই দেশপ্রসিদ্ধ কথার সার্থকতা সম্পাদন করিতেন।

আমাদের সদাশয় ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট, জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছেন। স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য প্রভৃতি এখন নিরাপদ ; দস্যু-তস্কর প্রায় দেশ হইতে বিদূরিত। ক্রোড়পতি হইতে ভিক্ষাজীবী পর্যন্ত বিচারার্থ রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, ন্যায় এবং আইনানুসারে সুবিচার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতি পূর্বে কেহ তীর্থযাত্রার জন্য দূরদেশে গমন করিলে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তুমুল আতঙ্ক উপস্থিত হইত ; কেননা তখন পথ বড় বিপদসঙ্কুল ছিল, অনেকেই আর বাড়ি ফিরিতে পারিতেন না। কিন্তু আমাদের ইংরাজরাজের অনুগ্রহে বাষ্পীয় পোত এবং বাষ্পীয় শকটারোহণে আমরা স্বল্প ব্যয়ে অতি দূরদেশেও অনায়াসে গমনাগমন করিতেছি। বিদেশি লোকের কোন প্রকার কষ্ট না হয়, সদাশয় গভর্নমেন্ট তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিয়াছেন।

মুসলমান রাজাদের সময়ে প্রজাপুঞ্জের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথাই পাওয়া যায় না, কিন্তু ইংরাজরাজ প্রজাগণকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য, প্রতিবৎসর প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। রাজা যেমন বিদ্বান এবং প্রতিভাশালী, প্রজাগণকেও তদ্রূপ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। উপযুক্ত প্রজা রাজার নিকট উচ্চপদ লাভ করিয়া রাজসম্মানে সম্মানিত হইতেছেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রজারক্ষা রাজার অবশ্য কর্তব্য ; একথা সর্বথা স্বীকার্য, কিন্তু তা বলিয়া কি প্রজাদের রাজার প্রতি একটা কর্তব্য বোধ নাই? রাজা কি আমাদের নিকট হইতে ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা পাইতে অধিকারী নন? ইংরাজ শাসনের কোন কোন অংশ সামান্য দোষাবহ হইলেও তৎকৃত অসীম লোকহিতকর কার্য এবং ন্যায়ধর্মানুমোদিত শাসন দোষের অংশটুকু ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুদূর সমুদ্র পার হইয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁহারা এদেশে সংসারত্যাগী সংযত সন্ন্যাসী হইয়া আসেন নাই। ইংরাজরাজও আমাদের ন্যায় সংসারী, আমাদের ন্যায় তাঁহারও সংসারধর্ম প্রতিপালন করিতে হয়। ইংরাজরাজ বিজেতা, আমরা বিজিত ; তথাপি রাজা যে আমাদের অনেকগুলি স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, আমাদের ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহাতে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিধেয়। মুসলমান-রাজত্বের সময়ে কয়জন হিন্দু-সন্তান শালগ্রাম-শিলা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন? কয়জন নির্বিঘ্নে ধর্মোচিত ক্রিয়া-কর্ম সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন? আমরা ইতিহাসে যখন হিন্দুজাতির ধর্মলোপজনিত যবন-অত্যাচার পাঠ করি, তখন মনে বাস্তবিকই অতিশয় ক্লেশ এবং ক্ষোভ উপস্থিত হয়। আমাদের ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করা দূরে থাক, বরং যাহাতে ইহার ক্রমোন্নতি

সাধিত হয়, প্রাচীন তীর্থস্থানে গমনাগমন করিয়া লোকের মনে যাহাতে ধর্মপ্রবণতা বৃদ্ধি হয়, ইংরাজরাজ যত্নপূর্বক তাহাই করিতেছেন।

প্রজাপুঞ্জের এতাদৃশ হিতানুষ্ঠান করিয়াও ব্রিটিশ-রাজ প্রজাদিগকে আত্মরক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়াছেন। নিত্যাবশ্যকীয় দা, বঁটি, খন্তা, কুড়াল ব্যতীত আমাদের আত্মরক্ষার জন্য একখানি সুদৃঢ় বংশদণ্ডও নাই। একটা ক্ষেপা শিয়াল গ্রামে আসিলে, আমরা তাহাকে বধ করিযা আত্মরক্ষা করিতে পারি, এরূপ অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত আমাদের নাই। ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি বলবান জন্তু তো দূরের কথা, যদি কয়েকজন ভোজপুরি অথবা কাবুলি রিক্তহস্তেও আমাদের আক্রমণ করে, তবু তাহাদের হস্ত হইতে ধনধান্য মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। ব্যাঘ্র শূকর প্রভৃতির অত্যাচারে অনেক স্থান যারপরনাই উৎপীড়িত হইতেছে। গবাদি পশু অনেক স্থলে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যাঘ্রকবলিত হইতেছে, শস্যক্ষেত্রে শূকর ও মহিষকুল নির্বিঘ্নে চরিয়া বেড়াইতেছে। অস্ত্রহীন দুর্বল প্রজা দূর হইতে প্রাণোপম শস্যগুলির ধ্বংস অবলোকন করিযা সাশ্রুনয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। বঙ্গদেশস্থ অন্যান্য জেলায় অস্ত্র-আইনের এত কড়াকড়ি আইন নাই, কিন্তু এই হতভাগ্য বাকরগঞ্জবাসীগণের প্রতি গভর্নমেন্ট তীব্র কঠোরতা প্রকাশ করিতেছেন। কতকগুলি নীচজাতীয় মুসলমান এবং হিন্দু দুবাচারগণের কৃতাপরাধে অন্যান্য নিরীহ প্রজাগণও দণ্ডভোগ করিতেছে। অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়ায় হত্যার সংখ্যা কমিয়াছে বটে, কিন্তু নিরীহ প্রজাগণের উৎকণ্ঠা এবং ত্রাস বরং শতগুণে বর্ধিত হইযাছে।

কেবল যে বাখরগঞ্জে হত্যাকাণ্ড হয় এরূপ নহে। সভ্যতার লীলাভূমি মহানগরী কলিকাতায় বৎসরে যতগুলি হত্যা হয়, পুলিশ-কমিশনার তাহার কয়টা খোঁজ রাখেন? দুই এক টাকা ব্যয় করিলে যে স্থানে গুণ্ডা দ্বারা অনায়াসে নরহত্যা চলে, সে স্থানের কোন কথা হইল না, কেবল হতভাগ্য বাকরগঞ্জবাসীগণই অপরাধী হইল। ইংলন্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি সুসভ্য দেশের কুকাণ্ডের বিবরণ পড়িলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এই সমস্ত দেশের সুসভ্য অধিবাসীগণ যে উপায়ে নরহত্যা, লুণ্ঠন, চুরি প্রভৃতি করিয়া ডিটেকটিভগণের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন, তাহা অতীব বিস্ময়প্রদ এবং নরবুদ্ধির অগোচর। নিউগেট ক্যালেন্ডার (Newgate Calender), প্যারিস ম্যাগাজিন (Paris Magazine) প্রভৃতিই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রতি বৎসর লন্ডন নগরে, রাজসমক্ষে কতগুলি লোক অনন্তে অন্তর্হিত হয়, কে তাহার খোঁজ লয়? স্বীকার করি যে বাকরগঞ্জে ইতরশ্রেণিস্থ অনেক লোক কলহপ্রিয়, উদ্ধতস্বভাব এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ ; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধহয় অবিদিত রহিবে না যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অশিক্ষিত, এমন কি অনেকে স্বীয় স্বীয় নাম দস্তখত করিতেও জানে না। বিদ্যাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানার্জন করিতে না পারিলে মানুষ ও পশুতে বড় প্রভেদ থাকে না , সুতরাং অজ্ঞান মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞানহীন পশু সদৃশ। মানবের ক্রোধ উদয় হইলেই পশুর ন্যায় জিঘাংসা বৃত্তি স্বতই উদিত হইযা সাধারণ বিবেকটুকুকে ঢাকিযা ফেলে, তাই তাহারা ভবিষ্যতান্ধ হইযা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। কোন পাপাচরণ করিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, অথবা জগদীশ্বরের কোপে পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, জ্ঞানহীন মনুষ্য তাহা ধারণা করিতে পারে না। উপযুক্ত বিদ্যাভ্যাসসহ ধর্মোপদেশ শ্রবণ দ্বারা যে পর্যন্ত মানসিক বৃত্তিসমূহের বিকাশ প্রাপ্ত না হইবে, মানুষ ততকাল পশুর ন্যায় থাকিবে। শত সহস্র রাজদণ্ডও তাহাকে কর্তব্য পথে ফিরাইতে সমর্থ হইবে না। গভর্নমেন্ট যতই কেন কঠোর আইন করুন না, যতই কেন তীব্র শাসন করুন না, যে পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে ধর্মভাব সমুদিত না হইবে, ততকাল কিছুতেই কিছু হইবে না। বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার সঙ্গে বাকরগঞ্জের নীচজাতীযগণের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, অস্মদ্দেশস্থ নীচজাতীয় অধিবাসীগণের মধ্যে অনেকেই বিদ্যাহীন. তাই তাহারা ভালমন্দ বিচার করিতে অসমর্থ। নিরক্ষর নীচজাতীয় অধিবাসীগণের উন্নতি বিধান করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাহাদের মানসিক সৎবৃত্তিসমূহের যাহাতে বিকাশ হয় তাহাই করা কর্তব্য।

অবশ্য যাহারা দুষ্ক্রিয়াকারী এবং পশুস্বভাববিশিষ্ট, তাহাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র না দেওয়াই কর্তব্য, কারণ তাহা হইলে অনেক নিরীহ লোকের সর্বনাশ হইবে। কিন্তু যাহারা ধর্মভীরু, রাজভক্ত এবং বিবেচক, তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান না করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না ; তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র আত্মরক্ষার্থ ব্যবহার করিবেন—জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থের জন্য নহে। সাধুপ্রকৃতি ভদ্র-সন্তানগণকে শুদ্ধ আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে, একজন উদ্ধত প্রকৃতির পঞ্চায়েত গভর্নমেন্টের আজ্ঞায় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতেছে, হয়ত তাহার অধীনস্থ অথবা আত্মীয়স্বজন তাহা চাহিয়া লইয়া কার্যোদ্ধার করিতেছে ; অথচ সেই স্থানের একজন শান্ত, ধার্মিক, রাজভক্ত ভদ্রলোক দস্যুতস্কর হইতে স্ত্রীপুত্রাদি রক্ষা করিতে অসমর্থ। আমরা আমাদের দুঃখ রাজার নিকট জানাইয়া কাঁদিতে পারি, কেননা, রাজা প্রজার রক্ষক, রাজাই প্রজার পিতৃস্বরূপ। আমাদের মান, অপমান, জীবন, মরণ প্রভৃতির জন্য রাজাই ঈশ্বরপ্রেরিত, এবং তিনিই তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ি।

পুলিশবিভাগ প্রজাপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষা এবং দেশের শান্তি-সংস্থাপন জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছে। অত্যাচারী হইতে দুর্বলকে রক্ষা, দস্যু-তস্কর দমন প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর কাজ পুলিশের প্রতি ন্যস্ত ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক স্থলে এই কর্মচারীগণকে কর্তব্যপরাঙ্মুখ এবং অলস দেখা যাইতেছে। অধিকন্তু নীচস্থ পুলিশকর্মচারীগণের নামে আবও অনেক দুর্নাম শুনা যায়। অবশ্য সকলেই যে একরূপ তাহা নহে। বাকরগঞ্জে ভূতপূর্ব যে সমস্ত পুলিশ কর্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের যোগ্যতায় এবং কার্যতৎপরতায় অনেক দস্যুতস্কর ধৃত হইয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হওয়ায় দেশের অশান্তি দূর হইযাছে। এই কর্মচারীগণের মধ্যে গাভা নিবাসী দুর্গাচরণ ঘোষ, কৌড়িখাড়া নিবাসী মহিমচন্দ্র দাস ও বানরিপাড়া নিবাসী হরিশ্চন্দ্র গুহ ঠাকুরতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়েও বাকরগঞ্জ জেলায় যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী আছেন, তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ, অসীম বুদ্ধিমত্তা এবং ন্যায়াচরণে অনেক দুর্বৃত্ত শাসিত হইয়াছে। এই কর্মচারীগণের মধ্যে স্বনামপ্রসিদ্ধ কালীকিশোর চৌধুরি, বামাচরণ ভৌমিক, রাসবিহারী দত্ত ও প্রিয়নাথ মিত্র বিশেষ ধন্যবাদযোগ্য।

বর্তমান সময়ে মফঃস্বলস্থ পুলিশ বিভাগেব সংস্কাব কবা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। কারণ অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে প্রকৃত দোষীর পরিবর্তে নিরপরাধী ব্যক্তি পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হইতেছে। এই সমস্ত কারণে অনেক প্রধান রাজপুরুষেরও পুলিশের কার্য সম্বন্ধে ততটা আস্থা পাওয়া যায় না। যে সমস্ত কর্মচারীর উপর প্রজাপুঞ্জের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের ধার্মিক, সত্যবাদী, ন্যায়বান এবং সদ্বিবেচক হওয়া একান্ত কর্তব্য।

তথ্যসূত্র

১ Sivar ul-Mutaakhirin vol II

২. A sloop returning from Dacca to Calcutta had been attacked by dacoits near Serampur, who had plundered the crew of what they had and murdered five of them, after having cut the rigging, sails, cables etc Having information also of several sloops and boats being on the way from Calcutta to Dacca, and that as the ways between this and Bakergunge are greatly infested with dacoits, it was agreed that a party of ten men with a surgeant, corporal, and ten Baxeries, be sent down as far as Bakergunge and convey hither all vessels belonging to the English —India Office Records, 4th June 1745
In 1764, we find, that an English gentleman named Mr Rose was murdered by dacoits near Bakarganj.--H Beverige's History Bakarganj, Page 308

৩. The Regulating Act came into operation in 1774 though it had been passed in 1773 It laid down some wise laws about the appointment of the Directors of the East India Company in

London : its most important provisions immediately affecting India were the following —

(i) That the governor of Bengal should henceforth be the Governor General , and with his council should be supreme over all the British possession in India

(ii) That a Supreme Court of Judicature should be established in Calcutta, consisting of a Chief Justice, and two other Judges, all Barristers, appointed by the English Ministers of State, and independent of the Company

In consequence of this act Mr Hastings became Governor General of India, as well as Governor of Bengal, in October 1774 —Sir R Lethbridge's History of Bengal, pp 104-105

৪. Local tradition points to Baraikaran as the old headquarters of the district, and this is supported by a reference in the decree for the resumption of Baraikaran *Char* to a piece of land therein which had originally been Mr Christopher Keating's *Cutchery* * * * The ancient importance of Baraikaran is also shown by the fact that it was the site of the Police station, which was not removed from it to Nalchiti until 1824.— H Beveridge's History of Bakarganj P. 308

৫. Mr Lodge also held the office of Collector of Buzurgumedpur, which was a zilla or collectorate district long before Bakarganj It appears from a letter of Mr Lodge, dated the 12th August 1786, which is preserved in the office of the Board of Revenue that the Parganas of Chandradwip Selimabad, Jaffarabad Syedpur Arangpur and Azimpur were attached to the zilla of Buzrugumedpur Buzrugumedpur apparently remained a separate charge till 1787, when it was annexed to the Collectorate of Dacca – H Beveridge's History of Bakarganj, Page 311

৬ From the time of the acquisition of Bengal by the British, up to the end of 1817, Backergunja formed a part of Dacca Collectorate.—Sir, W W Hunter's Statistical Account of Bengal (Backergunj), Page 217

৭ "The Board taking into consideration the present state of the administration of civil and criminal justice throughout the provinces, pass the following resolution That to remedy the inconveniences, occasioned by the too extensive jurisdiction of the Mofussil Dewany Adalats established by the resolutions of 28th March 1783, and thereby promote the more rapid and effectual administration of justice, the following Courts of Civil Justice including those now existing, be established throughout the provinces " Then follow the names of eighteen courts, among which Jessore appears under the name of Moorly The boundaries given of Bakarganj are as follows "The jurisdiction of Backergunje consisting of that portion of Dacca Province lying on the south-west of Ganges or Padma and the Cali-Ganges, and to the west of the Meghna from Chandpur to the sea , having its western limits the eastern frontier of Boosna and Jessore, down to the mouth of the River of Raj Mangal, including also all the islands belonging to and situated on the coast of the Dacca Province, except the pargana of Sandwip and its dependences Sixth Report of the House of Commons, Page 889 (quoted form the appendix of Mr Beveridge's History of Bakarganj pp 442

৮ Portuguise Travellers in India

৯ India Office Records —(ইহার পরও কয়েকটি সতীদাহ হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।)



সপ্তম অধ্যায়

সাহিত্য ও শিল্প

খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভৃতি মনীষীগণের সাধনাবলে নবদ্বীপে যে অপূর্ব মহিমার বিকাশ হইয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু তাহার বহুশত বৎসর পূর্বে হিন্দু রাজত্বের সময় হইতেই বাকলা পাণ্ডিত্য-গৌরবে সমগ্র ভারতে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা বোধহয় অনেকে অবগত নহেন। অতি প্রাচীনকালে এই স্থান হইতে বহু ছাত্র কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থানে স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। আবার নানাদিগ্‌দেশীয় ছাত্রবৃন্দ বাকলায় আগমন করিয়া নানাশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া উপাধিলাভ করিতেন। তৎকালে বৈদ্যকুলভূষণ মাধব কর যে অপূর্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি আয়ুর্বেদ-শিক্ষার্থীদিগের অতীব আদরের সামগ্রী। পূততুণ্ড-কুলশেখর 'আর্যসপ্তসতী' প্রণেতা মহামতি গোবর্ধনাচার্য যবন-বিপ্লবের পর এই বাকলা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাধব কর নিজ গ্রন্থের পরিসমাপ্তিকালে আপনাকে ইন্দ্র করের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

সুভাষিতং যত্র যদস্তি কিঞ্চিৎ তৎসর্বমেকীকৃতমত্রযত্নাৎ।
বিনিশ্চয়ে সর্বরুজাং নরানাং শ্রীমাধবেনেন্দকবাত্মজেন।।

মাধব করের বাটির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি গৌরনদী থানার অন্তর্গত নলচিড়া গ্রামে দৃষ্ট হয়।

হিন্দুরাজত্বের অবসান হইতে নৃপতিকুল-তিলক সুলতান হোসেন শাহের রাজত্ব পর্যন্ত যে সকল পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়া সমগ্র বাকলা দেশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ অতীতের বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন রহিয়াছে। অতি প্রাচীন ভুলটের গ্রন্থে তাঁহাদিগের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা নানাবিধ কিম্বদন্তীতে পরিপূর্ণ ; তাই বাহুল্য-ভয়ে উল্লেখ করা গেল না। খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাকলা বিদ্যা, জ্ঞান ও ভক্তিপ্রভাবে আবার সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঘাঘর ও ঘণ্টেশ্বরের মধ্যবর্তী "পণ্ডিতনগর" ফুল্লশ্রী গ্রামই তখন বিদ্যা-গৌরবমণ্ডিত বাকলার বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। তৎকালে এই স্থানে যে সকল মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া বীণাপাণির অর্চনা দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র, তৎপুত্র জানকীনাথ এবং ভাগিনেয় সাধকপ্রবর বিজয়গুপ্ত সর্বপ্রধান। মহাত্মা ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র কলাপব্যাকরণের "পঞ্জি" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। অদ্যাপি এই টীকা কলাপাধ্যায়ী ছাত্রগণের ব্যাকরণ বুঝিবার পক্ষে সুগম পন্থারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইঁহারই পুত্র জানকীনাথ কবিকণ্ঠহার "চর্করিতরহস্য" নামক ব্যাকরণের অংশ বিশেষ বঙ্গ-মগধে প্রভাব সম্বন্ধে

শ্লোকপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করত নীরস বিষয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছিলেন। জানকীনাথের পুত্র ভবানীনাথ সার্বভৌম ও পৌত্র রঘুরাম কবিকণ্ঠাভরণও পাণ্ডিত্য-গৌরবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা বিজয়গুপ্ত ভক্তির তরঙ্গে অস্মদ্দেশে কিরূপ প্লাবিত করিয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে।

পরবর্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে মধুসূদন সরস্বতী, গৌরীনাথ, হরনাথ, আলোক, গোলোক, রুদ্র, মঙ্গল প্রভৃতির নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

মধুসূদন সরস্বতীর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে।—

পারং বেত্তি সরস্বত্যাঃ মধুসূদন সরস্বতী।
মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী।।

মধুসূদনের নিবাস কোটালীপাড়ান্তর্গত উনিশে গ্রামে। তিনি তেজস্বী, ন্যায়পরায়ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। মধুসূদন অতি অল্পবয়সেই সংসারের প্রতি বীতরাগ হন এবং একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী বাটি হইতে পদব্রজে কাশী যাত্রা করেন। কথিত আছে যে তিনি স্বীয় গ্রাম হইতে সাষ্টাঙ্গেপ্রণিপাত করিতে করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে মধুমতী নদীর তীরে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া মধুসূদন মহামায়ার স্তব করেন। কিম্বদন্তী এই যে তাঁহার স্তবে তুষ্টা হইয়া জগদম্বা সেই স্থানে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং দেবীর বরে মধুমতীর সেই স্থান প্রকাণ্ড গড়ে পরিণত হয়। মধুসূদনের সন্তানসন্ততিগণ অদ্যাপি সেই স্থান ভোগ করিতেছেন। মধুসূদন কাশীধামে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। কতিপয় বৎসর পরে বিশ্বেশ্বরানন্দ মধুসূদনের নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন যে শিষ্য আরও কতিপয় শিষ্যসহ উৎকৃষ্ট বিছানায় নানাবিধ বিলাসোপযোগী দ্রব্যসহ বসিয়া আছেন। মধুসূদনকে গুরু যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ; কিন্তু তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া গুরুর অপ্রীতি জন্মিল, এবং তৎক্ষণাৎ মধুসূদনকে অনুসরণ করিতে বলিয়া বিশ্বেশ্বরানন্দ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মধুসূদনও বিনাবাক্যব্যয়ে গুরুদেবের পশ্চাদানুসরণ করিলেন। গুরু শিষ্য উভয়ই চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিন দিন পরে গুরু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন মধুসূদন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সমস্ত শরীর স্বেদসিক্ত হইয়াছে। গুরু তখন আদেশ করিলেন, "মধুসূদন, তুমি এই বৃক্ষমূলে বসিয়া শ্রান্তি দূর কর এবং আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত এই স্থানে অবস্থান কর।" শিষ্য স্বীকৃত হইলে বিশ্বেশ্বরানন্দ প্রস্থান করিলেন।

দৈবাৎ জনৈক রাজা বহুদ্রব্য ও বহুলোক সমভিব্যাহারে সেই পথ দিয়া বিশ্বেশ্বরের পূজা দিতে যাইতেছিলেন। তিনি বৃক্ষমূলে মধুসূদনকে ঐভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা দ্বারা সবিশেষ অবগত হইলেন। তারপর সেই স্থানে মধুসূদনের বাসোপযোগী একটি সুন্দর গৃহ নির্মাণ করাইয়া দিলেন। মধুসূদন সেই স্থানে বসিয়া ভগবদুপাসনা ও নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সুনাম শুনিয়া সেই স্থানে বহুবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল এবং সেই স্থানে হাট, বাজার, শিষ্য ও নানাপ্রকার লোকের আবাসভূমি হইল।

সন্ন্যাসী ছয় বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, শিষ্য বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি তখন শিষ্যকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সুখভোগ তাঁহার প্রাক্তন কিন্তু ভোগবিলাস-স্পৃহা নাই। তারপর বিশ্বেশ্বরানন্দ মধুসূদনকে লইয়া পুনরায় কাশীতে ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে পুনরায় সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিয়া তৎসহ লোকালয় পরিত্যাগ করিলেন।

মধুসূদন কতিপয় ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে বেদান্ত ও গীতার প্রাঞ্জল টীকা এবং মহিম্নস্তব সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের মাতামহবংশের আদি পুরুষ। পণ্ডিত নীলকান্ত তর্কবাগীশ, বিশ্বেশ্বর তর্কভূষণ, কালীকান্ত বাচস্পতি, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি এই বংশসম্ভূত।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে যে সকল মহাপুরুষ বাকলার বিদ্যা-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তন্মধ্যে নলচিড়া, উজিরপুর, বারপাইকা, শিকারপুর, মানপাশা, খলিসাকোটা, কীর্তিপাশা, রায়েরকাঠি, গৈলা-ফুল্লশ্রী প্রভৃতির পণ্ডিতগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতি প্রাচীনকালে নলচিড়া গ্রাম বিদ্বন্মণ্ডলী পরিপূর্ণ বলিয়া "নিম্ন নবদ্বীপ" আখ্যা লাভ করিয়াছিল। সুবিখ্যাত ভীষগশ্রেষ্ঠ মাধব কবের অপূর্ব নিদানগ্রন্থ এই স্থানেই প্রকাশিত হয়। অদ্যাপি এই স্থানের ব্রাহ্মণ-বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। এই গ্রামের বড় ভট্টাচার্য বাড়িতে এককালে চতুর্দশটি চতুষ্পাঠী ছিল।

উজিবপুর পণ্ডিতবরেণ্য মহাত্মা গৌরীনাথ তর্কবাগীশ[১] নীলকণ্ঠ তর্করত্ন, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ, শিবচন্দ্র সার্বভৌম, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির জন্মস্থান বলিয়া বাকলার গৌরব বর্ধন কবিতেছে। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বনামধন্য ও কীর্তিমান। যতদিন সংস্কৃতচর্চা থাকিবে ততদিন গৌরীনাথের নাম শিক্ষার্থী ছাত্রদিগেব নিকট অমর অক্ষরে লেখা থাকিবে। "গৌরীনাথীকূট"ই তাঁহাকে পণ্ডিতসমাজে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার কূট তর্কেব সর্বাংশ সুন্দর মীমাংসা অদ্যাপি হয় নাই। তিনি একজন ভগবদ্ভক্ত পুরুষ ছিলেন, কিন্তু বাকলার দুরদৃষ্টবশত অপরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গৌরীনাথ অল্প বয়সেই নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে গমন করেন, এবং তথায় নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অথচ বাকচাতুর্যবিহীন এক নিরীহ পণ্ডিতের নিকট পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন। গৌরীনাথের প্রতিভাবলে তাঁহাব অধ্যাপকের নাম অল্পকাল মধ্যেই চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। একদিন কতিপয় পণ্ডিত ঈর্ষাপরবশ হইয়া কোন এক সভায় গৌরীনাথের অধ্যাপকেব সঙ্গে একটি কূট-তর্কের বিচাব আবম্ভ করিলেন। গৌরীনাথ তখন সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি প্রবেশ করিতে না পারেন এইজন্য দ্বাবদেশে প্রহবী রাখা হইল। গৌরীনাথ তাহা অবগত হইয়া দৈবাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত ছিল, তাই প্রহরীগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। গৌরীনাথ স্বগর্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিচার্য বিষয় লইয়া পণ্ডিতগণের সহিত তর্ক আরম্ভ কবিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই ঈর্ষাপরায়ণ পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করিয়া রাজসভায় তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। রাজসভায় এইরূপ অপদস্থ হইয়া পণ্ডিতগণ গৌরীনাথকে অভিশাপ প্রদান কবিলেন। সমবেত পণ্ডিতবর্গের অভিশাপ সাংঘাতিক পীড়ারূপে গৌরীনাথকে আসিয়া আক্রমণ করিল। তিনি গৃহে আসিযাই শয়ন করিলেন, আর শয্যা হইতে উঠিলেন না। গুরুর প্রতিপত্তি বক্ষা জন্য ভক্ত গৌরীনাথ অচিরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বিদ্যাসাগর মহাশযেব অধ্যাপক ছিলেন, তিনি কলিকাতায় তাঁহাকে অধ্যাপনা করাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়েব জীবনচরিত পাঠে তাঁহার কথা অনেক অবগত হওয়া যায়। শিবচন্দ্র সার্বভৌম, পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কাব এবং নীলকণ্ঠ তর্কবত্ন স্মার্ত ও বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাদের গভীর শাস্ত্রজ্ঞানসূচক অনেক ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

মহাত্মা গৌরীনাথ তর্কবাগীশের বংশ বাকলায় বেদপঞ্চাননের বংশ বলিয়া খ্যাত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণজীবন হইতে বর্তমান সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন এম. এ. পর্যন্ত সকলই অসাধরণ কৃতবিদ্যা ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়ে সংস্কৃত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা পণ্ডিতশ্রেণির অগ্রগণ্য হইয়া ইনি আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধানুকাগ্রামে ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এইরূপে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ইংরেজি স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়েব সমস্ত পরীক্ষা সসম্মান ও বৃত্তির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৬ খ্রিঃ অব্দে এম. এ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে ঢাকা কলেজে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ত্রিংশাধিক বর্ষ অধ্যাপনা কার্য করিয়া পরিশেষে

কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পদে উন্নীত হন। ইনি আজীবনকাল সাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের গবেষণার অনেক সময় অতিবাহিত করিয়া এখনও ইনি কর্মক্লান্ত জীবনের গৌরবমণ্ডিত সন্ধ্যায় সেই সাধনায় রত আছেন। এই বিদ্যোৎসাহী মহাত্মার চেষ্টায়ই বর্তমানে মহামান্য গবর্নমেন্টের দৃষ্টি দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং নানাপ্রকার সাহায্য দ্বারা সাহিত্য সেবীদিগের বিদ্যালোচনার পথ সুগম হইয়াছে।

উজিরপুরের সিদ্ধবংশের পণ্ডিতগণ চিরপ্রসিদ্ধ। নোয়াখালিতে ইহাদের আদিম বাসস্থান ছিল। এই বংশের পূর্বপুরুষ ঠাকুরদাস মাধবপাশার রাজাদের গুরু ছিলেন। সাধক প্রবর দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য এই ঠাকুরদাসের পাঁচপুরুষ অধস্তন। তিনি বাল্যকালে সাতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন না; তাই রাজগুরু হইবার অনুপযুক্ত বলিয়া একদিন তদীয় পিতামাতা তাঁহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন। ক্ষোভে ও অভিমানে দিগ্বিজয় একাকী কাশীধামে চলিয়া গেলেন এবং স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায়বলে গভীর সাধনায় জগদম্বা কালিকার সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধ হইয়া ইনি জগদম্বার যে স্তব করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি লিপিবদ্ধ আছে। তারপর সিদ্ধপুরুষ দিগ্বিজয় দেশে ফিরিয়া আসিয়া সর্বত্র স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তিজ্ঞাপক দুই একটি ঘটনা এখনও এদেশে প্রচলিত আছে। শীঘ্রই তাঁহার যশোরাশি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। রহমৎপুর ও উজিরপুরের জমিদারগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রে সেরূপ জ্ঞান না থাকিলেও গভীর জ্ঞান তাঁহার আয়ত্ত হইল, এবং অচিরে সর্বত্রই দিগ্বিজয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। দিগ্বিজয়ের দুই বিবাহ। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার সময়ে উজিরপুরের জমিদার শিষ্য রত্নেশ্বর রায় উজিরপুরে গুরুদেবের জন্য বাড়ি প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার ও তাঁহার সন্তানসন্ততির বাসোপযোগী সকলপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নোয়াখালি হইতে আসিয়া দিগ্বিজয় জীবনের অবশিষ্ট অংশ উজিরপুরে অতিবাহিত করেন। দিগ্বিজয় ভট্টাচার্যের পৌত্র সৃষ্টিবিজয় তর্কবাগীশ শাস্ত্রচর্চা ও সাধনায় সমভাবে কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেও দুই একটি অলৌকিক ঘটনা এদেশে প্রচলিত আছে। তাঁহার দুই পুত্র, কালীপ্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন। তাঁহারা সিদ্ধবংশের উপযুক্ত বংশধর। কালীপ্রসন্ন ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কনিষ্ঠ তারাপ্রসন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে বাকলার একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ইহার আর্যোচিত চেহারা, অদম্য তেজ, গভীর জ্ঞান এই বংশের উপযুক্তই বটে। ইহার কাব্য এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রেও বিশেষ দখল আছে এবং ইনি স্বীয় গুণ দ্বারা সর্বত্র পরিচিত ও সকলের যশোভাজন হইয়াছেন।

উজিরপুরের দক্ষিণপার্শ্বে বারপাইকা একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও নগণ্য পল্লী নহে। প্রাচীনকালে বারপাইকার পণ্ডিতমণ্ডলী শুধু বাকলা কেন—সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রামের পাঁচ হাবেলির ভট্টাচার্যগণ এবং শ্রোত্রীবংশীগণ পাণ্ডিত্যগৌরবে বিশেষ বিখ্যাত। খ্রিস্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঁচ হাবেলিবংশে খ্যাতনামা পণ্ডিত গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন আবির্ভূত হন। বর্তমান সময়েও নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বলিয়া সর্বজনবিদিত।

শ্রোত্রীবংশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী বারপাইকার অতি প্রাচীন অধিবাসী নহেন। এই বংশের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত মহাত্মা শুকদেব তর্কালঙ্কার বারপাইকায় আগমন করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন ধর্মপ্রাণ ভূম্যধিকারী চৌধুরিগণ তাঁহাকে বারপাইকায় বাসস্থানসহ ব্রহ্মোত্তর অর্পণ করেন। শুকদেবের সন্তানসন্ততিগণ বাকরগঞ্জের বহু সম্ভ্রান্ত বংশের কুলগুরু। গুঠিয়া, রূপসী, নাগপাড়া প্রভৃতি গ্রামে এই বংশের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন।

শুকদেব তর্কালঙ্কারের ভ্রাতা আনন্দিরাম সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনা প্রচলিত আছে। আনন্দিরাম প্রথম যৌবনে বুদ্ধিমান্দ্য প্রযুক্ত আত্মীয়গণ কর্তৃক সর্বদা অবজ্ঞাত হইতেন। একদা তাঁহার সহধর্মিনী অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত মুষ্টিপরিমিত ছাই ভোজন-পাত্রের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, পত্নী পতির প্রতি যথেষ্ঠ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি

করিতেন না। সেই দিন আনন্দিরাম নিতান্ত বিষণ্ন হৃদয়ে অনাহারে গৃহ ত্যাগ করিলেন। কতিপয় বৎসর পর্যন্ত তাঁহার আর কোন খোঁজখবব পাওয়া গেল না। পরিশেষে তাঁহাদের বাটির বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য 'যশা' আনন্দিরামের অন্বেষণার্থ নানা দেশ ভ্রমণ পূর্বক নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার অনুসন্ধান পাইল। সায়ংকালে যশা আনন্দিবামের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল একটি সুন্দরী রমণী আসিয়া তাঁহার সন্ধ্যার আলোক জ্বালিয়া দিল। যশা যুগপৎ আশ্চর্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়া দ্বারদেশে বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পবে সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া আনন্দিরাম গৃহে ফিরিলেন। যশা তাঁহাকে দেখিয়া কোনরূপ হর্ষ প্রকাশ করিল না, বরং যথেষ্ঠ কটূক্তি করিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল; শেষে সকল ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা কবিল। আনন্দিরাম তখন 'মা—মা' বলিয়া অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল—"বৎস, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমার জ্ঞানের স্ফূরণ হইয়াছে। তোমাদের ঠাকুর ঘরের মাটির নীচে একখানি তালপাতার গ্রন্থ আছে, তাহা দ্বারাই তোমার সৌভাগ্য উদয় হইবে এবং তোমার বংশের উপর আমার অনুগ্রহ থাকিবে।" এই কথা বলিয়াই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। আনন্দিরাম হৃষ্টান্তঃকরণে বাড়ি ফিরিলেন। কালক্রমে এই বংশে ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপ ও অন্যান্য পণ্ডিত-প্রধান স্থানে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বিচারনৈপুণ্যদর্শনে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। আজও পণ্ডিতসমাজে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ আছে। বর্তমান সময়ে তাঁহার পুত্র শশিভূষণ ভট্টাচার্য এম. এ সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং একজন কৃতী পুরুষ। ইনি বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

বাকলার পীঠস্থান শিকারপুর ভারতের সর্বত্র পরিচিত; কোন সময়ে এই স্থানে সংস্কৃতচর্চা বিশেষ প্রবল ছিল। পূর্বে এই স্থানে নানাদিগদেশীয় বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। তাঁহারা এ দেশের পণ্ডিতগণের গভীর শাস্ত্র-জ্ঞানে চমৎকৃত হইতেন, এবং সময় সময় তাঁহাদের দ্বারা দুই একটি শাস্ত্রীয় জটিল সমস্যা পূরণ করিয়া লইতেন।

বর্তমান কাল-স্রোত পূর্বগৌরব অনেকটা হ্রাস করিয়া দিলেও সেই মহর্ষিকল্প পণ্ডিতদিগের বংশধরগণ পূর্বপুরুষের পাণ্ডিত্য-গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য অদ্যাপি যত্নবান। "শুম্ভ-নিশুম্ভবধ" নামক সংস্কৃত মহাকাব্য প্রণেতা পণ্ডিত কালীকান্ত শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত রামধন ন্যায়লঙ্কার এদেশে সর্বত্র পরিচিত।

মানপাশার পণ্ডিতগণ এই দেশে বহু দিন হইতে বিখ্যাত। ভট্টাচার্য বংশের রামনাথ সার্বভৌম একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার পাণ্ডিত্য-গৌরব-মণ্ডিত শুভ্র যশোরাশি তাঁহাকে এদেশে সর্বত্র পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। ত্রিবেণির সুবিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নিকট তিনি ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করেন, এবং স্বীয় ক্ষমতাবলে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের অতীব প্রিয়পাত্র হইলেন। জগন্নাথ রামনাথকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং যাহাতে রামনাথ বিভিন্ন স্থানে পরিচিত হইতে পারেন সেই জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে মহারাজ নন্দকুমার রামনাথের বিদ্যাবুদ্ধি ও অসাধারণ শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই জেলার "পণ্ডিত-জজ" নির্বাচিত করেন। রামনাথ বারৈকবণের দেওয়ানি-আদালতে "পণ্ডিত-জজ" নিযুক্ত হইলেন। ফয়রা গ্রামের ভূম্যধিকারী বিজয়রাম রায় তাঁহাকে মানপাশায় আনয়ন করেন। উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ করিয়া রামনাথ সেই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ মানপাশায় অবস্থিতি করিতেছেন।

রামনাথেব বংশধরগণ সকলেই কৃতীপুরুষ। তাঁহার পৌত্র কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র কমল ন্যায়পঞ্চানন ও তাঁহার বংশধর নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বাকলার বিখ্যাত পণ্ডিত। কলিকাতার সিটি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক (প্রফেসার) পণ্ডিত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন রামনাথ সার্বভৌমের তিনপুরুষ অধস্তন। ইনি সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ও বাকরগঞ্জের সর্বত্র পবিচিত।

বর্তমানে গোবিন্দ বিদ্যাভূষণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ প্রতিপত্তি সমগ্র বাকলায় ইঁহাকে বিশেষ পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই গ্রামের ভট্টাচার্যগণ ব্যতীত আরও অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আছেন; তন্মধ্যে শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরকুমার চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষ বিখ্যাত।

খলিসাকোটা গ্রামেও একটি সংস্কৃত কলেজ বিদ্যমান আছে। স্থানীয় পণ্ডিত আশুতোষ কাব্যতীর্থ ইহার স্থাপয়িতা।

কাঁচনার মুখটি দ্বাকরের সন্তান শাস্ত্রজ্ঞ মহাত্মা রামকৃষ্ণ কীর্তিপাশার ভট্টাচার্যগণের আদিপুরুষ। ইনিই স্বস্থান হইতে প্রভৃতি বৃত্তি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া, কীর্তিপাশা গ্রামে আগমন পূর্বক ব্রাহ্মণোচিত পবিত্র কর্মদ্বারা গৌরবের সহিত বসবাস করেন। কীর্তিপাশার মজুমদারগণের আদিপুরুষ কীর্তিপাশায় আসিয়া প্রথম যে বাটিতে বাস করেন, তাহার সংলগ্ন সুন্দর ভূখণ্ডে ইঁহারও বাসস্থান বিদ্যমান আছে। কীর্তিপাশার মজুমদারবংশ ও ভট্টাচার্যবংশ উভয়ই সমসাময়িক। স্বধর্মনিষ্ঠা ও বিদ্যোপাসনার জন্য এই বংশ এতদ্দেশে চিরপ্রসিদ্ধ। মহাত্মা রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র প্রাতঃস্মরণীয় যাদবেন্দ্র তর্কালঙ্কার অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, বৈদ্যকুল-সম্ভূত পোনাবালিয়ার বিখ্যাত জমিদার, দেশীয় ভূম্যধিকারী পাহিদাস, এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত অনেক ব্রাহ্মণ-বৈদ্য ইঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মজুমদার-বংশীয়গণ শিষ্য না হইলেও গুরুদেবের ন্যায় ইঁহাকে ভক্তি করিতেন। বায়েরকাঠির রাজা ও তাৎকালিক ভূমধ্যধিকারিগণ ইঁহাকে ভক্তি করিতেন। রায়েরকাঠির রাজা ও তাৎকালিক ভূমধ্যধিকারীগণ ইঁহাকে বৃত্তিদানাদি দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। কালক্রমে নিস্তেজ ও নিঃস্ব হইলেও যাদবেন্দ্রের বংশধর অদ্যাপি কুলমর্যাদা ও কুলধর্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; বিদ্যোপসনায়ও সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ হন নাই। উল্লেখযোগ্য খ্যাতনামা অনেক সুবিজ্ঞ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। মহাত্মা যাদবেন্দ্রর পৌত্র নানাশাস্ত্র-পারদর্শী স্বনামধন্য রামগোবিন্দ ন্যায়পঞ্চানন পিতামহের ন্যায় সমগ্র সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া অনেক শিষ্য-সম্পত্তি লাভ করেন। কীর্তিপাশার মজুমদারবংশীয় মহামনা কৃষ্ণরাম ইঁহার বন্ধু ছিলেন। কৃষ্ণরাম যখন কারাবাসে রুদ্ধ থাকিয়া নানা যন্ত্রণায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, তখন ইনিই বিবিধ কৌশলে রাজপুরুষগণের কৃপাভিক্ষা করিয়া বন্ধুর প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণরাম কারামুক্ত হইয়া বন্ধুকৃত উপকারের প্রতিদানস্বরূপ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বন্ধুর পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত বৃত্তি-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কৃষ্ণরামের বংশধরগণ, রামগোবিন্দের সন্তান-সন্ততির নিকটে ভক্তিমান ও কৃতজ্ঞ। রামগোবিন্দের বংশধরগণও কৃষ্ণরামের বংশে প্রগাঢ় অনুরাগসম্পন্ন। এই বংশের পরবর্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন গঙ্গাগোবিন্দ বিদ্যারত্ন স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিপত্তিতে সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। পরবর্তী বংশধরগণের মধ্যে রামধন ভট্টাচার্য, গোবিন্দ বিদ্যারত্ন, বিহারীলাল বিদ্যারত্ন, বৈকুণ্ঠ কাব্যতীর্থ, নকুলেশ্বর কাব্যতীর্থ, মতিলাল স্মৃতিতীর্থের নাম উল্লেখযোগ্য।

কীর্তিপাশায় ন্যায়, স্মৃতি কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতির ন্যায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রেরও যথেষ্ট চর্চা ছিল। ধন্বন্তরীকল্প স্বনামখ্যাত পণ্ডিত প্যারীমোহন দাশগুপ্ত কবিরঞ্জন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত-চিকিৎসক তৎকালে বাকলায় কেন—সমগ্র বঙ্গদেশে বিরল ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র উমাচরণ কবিরত্ন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য এবং ব্যাকরণেও রীতিমত অধিকার ছিল। প্যারীমোহনের পুত্র অক্ষয়কুমার কবিরঞ্জন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সুচিকিৎসক।

বহু পূর্বে রায়েরকাঠিতেও বিলক্ষণ সংস্কৃতচর্চা ছিল। যে সকল পণ্ডিত রাজবাড়ির সভাপণ্ডিত ছিলেন তাঁহারা অনেকেই বাকলায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাজা শিবনারায়ণের

সভাপণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত তর্কভূষণ, রাজা মাধবনারায়ণের সভাপণ্ডিত বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন ও স্বনামখ্যাত বৃন্দাবন কবিরত্ন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক পণ্ডিত স্বীয় ক্ষমতাবলে বাকলায় রায়েরকাঠির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে সংস্কৃতচর্চার উপযুক্ত চতুষ্পাঠী ছিল এবং গ্রামের প্রধান প্রধান পণ্ডিত কর্তৃক তাহা পরিচালিত হইত। অধুনা নানা কারণে চতুষ্পাঠী উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু সংস্কৃতচর্চা লোপ পায় নাই। বর্তমানে এই গ্রামের পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বি. এ. সিটি কলেজের সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। তিনি সুকবি ও গ্রন্থকার।

রায়েরকাঠিতে নরনারায়ণ রায়ই সর্বপ্রথমে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি কাব্য, নাটক, প্রহসন প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অর্থকৃচ্ছতাবশত সকল গ্রন্থ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে "চারুপ্রবন্ধ", "কর্তব্যোপদেশ", "গোপাঙ্গনাকাব্য", "সুনীতি নাটক" "শ্রীবৎস চবিত" প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন আরও প্রায় দ্বাদশখানি গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহাব দর্শন শাস্ত্রেও রীতিমত ব্যুৎপত্তি ছিল; তদীয় অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে "শক্তিবাদ", "অদ্বৈতবাদ", "ভক্তিবাদ" প্রভৃতি তাহার পরিচায়ক।

শিক্ষিত গ্রন্থকার নরনারায়ণের পত্নী বসন্তকুমাবী অতীব বিদুষী রমণী ছিলেন। তাঁহারও কবিত্বশক্তি ছিল। "কবিতামঞ্জরী", "রোগাতুরা বসন্তকুমারী", "বাসন্তিকা" "বালিকা বিনোদ" ও "যোষিদ্বিজ্ঞান" প্রভৃতি তাঁহার কবিত্ব পূর্ণ গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষার উপাদেয় সামগ্রী। তাঁহার প্রতিভা উপযুক্ত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে অকালে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কন্যা কুসুমকুমারীও বিদ্বান ও বিদুষী পিতামাতার উপযুক্ত শিক্ষায় একজন বিদুষী রমণী হইয়াছিলেন। তিনিও জননীর মত "কুসুমিকা" নামে একখানি কাব্য রচনা করেন।

নরনারায়ণের সমসাময়িক যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় "সুখদায়িনী" নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গীতবাদ্যবিশারদ জিতেন্দ্রনারায়ণ রায়ের "কলঙ্কভঞ্জন" নামে একখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। সেইখানি কৃতিত্ব ও কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। অদ্বৈতনারায়ণ রায়ের "সেলিমাবাদের জমিদারির বিবরণ" নামক একখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থখানির জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

পাঠান যুগে ত্রিলোচন দাশ, জানকীনাথ কবিকণ্ঠহার প্রভৃতি মনীষীগণ গৈলা-ফুল্লশ্রীকে গৌরবপ্রভায় মণ্ডিত করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে শুকদেব সেন ও মদনকৃষ্ণ কবীন্দ্র উল্লেখযোগ্য। মদনকৃষ্ণ পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসানৈপুণ্যে বঙ্গদেশে বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। আজিও তাঁহার অনেক ছাত্র বঙ্গদেশের নানাস্থানে চিকিৎসা শাস্ত্রে বিপুল যশ অর্জন করিতেছেন। উক্ত মহাত্মার পৌত্র চন্দ্রকুমার কবিভূষণ স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের গৃহচিকিৎসক রূপে বিশেষ সম্মানিত। বর্তমান ত্রিপুরেশ্বরেব অভিষেক-ব্যবস্থাতে নাম স্বাক্ষর করিয়া কবিভূষণ বৈদ্যজাতির মুখোজ্জ্বল করিযাছেন। ইঁহার পুত্র ললিতমোহন কবিসাগর "কবীন্দ্র কলেজ" নামে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শে একটি উচ্চশ্রেণির সংস্কৃত বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন। এই স্থানে আয়ুর্বেদ, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কাব প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ উচ্চশ্রেণির সংস্কৃত বিদ্যালয় এই জেলায় আর দ্বিতীয়টি নাই।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে জগন্নাথ তর্কালঙ্কার, পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ, রামচরণ শিরোমণির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত গাবখান গ্রামে বহু পূর্বে অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে খ্যাতনামা কালিদাস বিদ্যাবাগীশ একসময়ে সমগ্র বাকলায় একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তৎপর কালীকিশোর বিদ্যারত্নও যশস্বী পণ্ডিত ছিলেন। বর্তমানে শশিকুমার তর্কতীর্থ এই জেলাব একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি কাব্য, ব্যাকবণ, নব্য ন্যায় এবং প্রাচীন ন্যায়-পরীক্ষায় গবর্নমেন্টের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কীর্তিপাশার সংলগ্ন ভাবপাশা গ্রামেও পূর্বে কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহামনস্বী রামমাণিক্য বিদ্যানিধি এককালে স্বীয় প্রতিভাবলে ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য ও

ব্যাকরণে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চম বৎসর হইতেই ইনি শুধু বীণাপাণির অর্চনা দ্বারা কালাতিপাত করিয়াছেন। এই গ্রামের কালীশ্বর ন্যায়পঞ্চাননও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বর্তমানে গোপালকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ, গোপালচন্দ্র ন্যায়রত্ন, চিন্তাহরণ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রসিদ্ধ।

জলাবাড়িনিবাসী রাজকুমার ন্যায়রত্ন কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য-প্রতিপত্তিতে তাৎকালিক বাকলার পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার কবিত্ব ও বিচারশক্তি অতীব প্রখর ছিল। সুপ্রসিদ্ধা বিদুষী রমাবাঈর সহিত ইঁহার বিচার হইয়াছিল, এবং তিনি ইঁহার গভীর জ্ঞান ও বিচার-নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বর্তমান সময়ে রাজকুমার ন্যায়রত্নের ভ্রাতা হরকুমার তর্করত্ন, বাইশারিনিবাসী প্রসন্নকুমার শিরোমণি, কলসকাঠিনিবাসী বর্ধমানের রাজপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন ও চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ প্রভৃতি মনীষীগণ বাকলার পূর্ব পাণ্ডিত্য-গৌরব রক্ষা করিয়া বঙ্গদেশের নানাস্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ন্যায়, স্মৃতি, আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্রে পারদর্শী সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিতগণই বাকলার একমাত্র গৌরব-স্থল নহেন। বাকলাবাসীগণ মাতৃভাষায় আলোচনায়ও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। আমরা এই স্থানে কবি বিজয়গুপ্তপ্রমুখ মাতৃভাষায় সাধকগণের ও কয়েকজন শিল্পীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গদেশে শক্তি উপাসনার প্রাধান্য ছিল বলিয়া অনুমান হয়। সত্য বটে, বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর বঙ্গে শিবোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল; কিন্তু নির্গুণ চিদানন্দরূপ শিব অপেক্ষা সগুণ জয়দুর্গা, মঙ্গলচণ্ডী, কালী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবীর মাতৃভাবে উপাসনাই ভাবপ্রবণ বঙ্গবাসীর অধিক প্রিয় ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মের বহুল প্রচারের পূর্বে অস্মদ্দেশীয় হিন্দুগণের মধ্যে শক্তি-উপাসনার একাধিপত্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাকলায় বিষহরি বা মনসা পূজার বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। এই সময় 'রয়ানী' বা মনসা-সংকীর্তন দ্বারা সমগ্র দেশ মুখরিত হইত।

প্রায় পাঁচহাজার বৎসর পূর্বে খ্রিস্টিয় পঞ্চাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে এক প্রতিভাশালী কবি বাকলায় জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিরসপূর্ণ মধুর কবিতা-স্রোতে পূর্ববঙ্গ প্লাবিত করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে ভক্তির উচ্ছ্বাস ছড়াইয়া দিযাছিলেন, সেই প্রাচীন ভক্ত বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিজযের পিতার নাম সনাতন গুপ্ত ও মাতার নাম রুক্মিণী দেবী; এবং ইনি প্রসিদ্ধ ত্রিলোচন দাশের ভাগিনেয়।—

সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয় গুপ্তের রাখ জগন্নাথ।

তাঁহার গ্রন্থে তদীয় সহধর্মিণী জানকীদেবীরও নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।—

জানকীনাথের বাণী শুন দেবী ব্রাহ্মণী
দাস কবি রাখিয়া চরণে।

ক্রমে বিজয় গুপ্ত মনসাদেবীর একনিষ্ঠ সাধক হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তৎকালের প্রচলিত মনসা-গীতে পরিতৃপ্ত হইলেন না। সুতরাং তিনি স্বয়ং বিজয়কে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে স্বপ্নাদেশ করিলেন—

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥

কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ-ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥

স্বপ্নাদেশের বিবরণ বিজয় এরূপ লিখিয়াছেন—

গা তোল আরে পুত্র কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও॥
মনে ভয় না করিও দেখে নাগ জাতি॥
মহাদেবের কন্যা আমি নাম পদ্মাবতী।
মোর পায়ে ভক্ত তুমি সেবক প্রধান।
স্বপ্ন উপদেশ বলি না করিও আন॥
আজ নিশি অবসানে এড়িয়া বসন।
গীত ছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন॥

বিজয় গীত লিখিতে আদিষ্ট হইয়া এক প্রকাণ্ড ছাতিম বৃক্ষতলে বসিয়া পাঁচালি রচনা করেন। রচনা শেষ হইলে কবি মাতুল ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রকে সংশোধন করিতে দিলেন। ত্রিলোচন পাঁচালী সংশোধন করিতে আরম্ভ করিলে তদীয় পুরোহিত রামহরি চক্রবর্তী মহাশয়ের কন্যা আসিয়া কবীন্দ্র কি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। কবীন্দ্র বলিলেন "বিজয়ের পাঁচালী সংশোধন করিতেছি।" "বিজয় গুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহাই উত্তম হইয়াছে, আপনার কোন সংশোধন করিবার প্রয়োজন নাই।" এই বলিযা চলিয়া গেলেন। বালিকার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিলোচন সেই কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে জানিতে পারিলেন যে প্রায় চারি-পাঁচ বৎসর পর্যন্ত চক্রবর্তীর মহাশয়ের কন্যা শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই কার্য স্বয়ং মনসাদেবীর, ইহা চিন্তা করিয়া ত্রিলোচন আর সংশোধন করিলেন না। বিজয়ের পাঁচলী তাঁহাকে আবার ফিরাইয়া দিলেন।

১৪০৬ শাকে বিজয় 'মনসা-মঙ্গল' বা 'পদ্মপুরাণ' রচনা করেন। তখন এই গ্রন্থ পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্রই ভক্তির সহিত রক্ষিত ও পঠিত হইত। শ্রাবণ মাসে ঘরে ঘরে বিষহরির উপাসনা হইত এবং তৎসঙ্গে বিজয়ের পাঁচালীও সর্বত্র গীত হইত। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেমানন্দ ও কেতকদাসের 'ভাসান' যেরূপ প্রচলিত, পূর্ববঙ্গে সেই রূপ বিজয়ের 'মনসা-মঙ্গল' প্রচলিত।

বিজয় প্রকৃতই উচ্চশ্রেণির ভক্ত-কবি ছিলেন। তাঁহার মনসা-ভক্তি সর্পভয়ক্লিষ্ট ভীরুস্বভাব মানবের ভক্তি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। গৌরাঙ্গের হরি-ভক্তি এবং রামপ্রসাদের শ্যামা-ভক্তির ন্যায় তাঁহার বিষহরি-ভক্তিও অতুলনীয়।—

নমঃ নমঃ জগৎমাতা সর্ব সিদ্ধিদায়িনী।
তুমি সূক্ষ্ম, তুমি মোক্ষ, তুমি বিশ্বজননী॥
তুমি জল, তুমি স্থল, চরাচরবন্দিনী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি, তুমি মূলধারিণী॥
কে তোমায় পূজিতে পারে কাহার শকতি।
সেই সে পূজিতে পারে যে জানে ভকতি॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি, তুমি চারি বেদ।
ব্রহ্মা, শঙ্কর, হরি তোমাতে নাহি ভেদ॥

— এই বন্দনা ভক্ত-হৃদয়ে অপূর্ব ভক্তি স্ফূরণ।

বিজয় যে উপাখ্যান লইয়া ছন্দ রচনা করিতে বসিয়াছিলেন তাহা মহাকাব্যের অনুপযোগী

নহে। চাঁদের পুরুষকার, বেহুলার অপূর্ব সতীত্ব-কাহিনী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অতীব গৌরবের বস্তু; এবং বিজয়ের প্রাঞ্জল উহা ব্যক্ত হইয়া বঙ্গবাসীর অতিশয় আদরের সামগ্রী হইয়াছিল।

মনসা-মঙ্গল হইতে তাৎকালিক দেশেব অবস্থা বহুল পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। কবিবর গ্রন্থের প্রারম্ভেই শাসন-প্রণালীর একটু আভাস দিয়াছেন।—

ঋতুশূন্য-বেদ-শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি-তিলক॥
রাজার শাসনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক্‌সিম॥

কিন্তু রাজ্য সুশাসিত হইলেও ছোট-খাট অত্যাচারের বিরাম ছিল না। কবিবর হাসেন-হোসেন সংবাদে লিখিয়াছেন।—

দক্ষিণে হোসেনহাটী গ্রামের নিকট।
তথায় যবন বসে দুই বেটা শঠ।।
হাসেন হোসেন তারা দুই ভাইর নাম।
দুই জনে করে তারা বিপরীত কাম।।
কাজিয়ালী করে তারা জানে বিপরীত।
তাদের সম্মুখে নাহি হিন্দুয়ালী রীত।।
এক বেটা হালদার তার নাম দুলা।
বড় অহঙ্কার করে শাসনের শালা।।
সর্বক্ষণ হোসেনের আগে আগে আসে।
তার ভয়ে হিন্দু সব পলায় তরাসে।।
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত!
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ।।
বৃক্ষ তলে থু'য়ে তারে মারে বজ্র কিল।
পাথর প্রমাণ যেনঝড়ে পড়ে শিল।।—

বিজয় তাৎকালিক বঙ্গীয় সওদাগরগণেব বাণিজ্যব্যাপদেশে "চৌদ্দ ডিঙ্গা" সাজাই। য় গমনের একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন।—

চৌদিকে বাজনা বাজে হুলাহুলি সর্ব রাজ্যে
সাধু যায় দক্ষিণ পাটন॥
আগে তোলে ধনখণ্ড স্বর্ণ তোলে ভাণ্ড ভাণ্ড
সাধু নহে ধনেতে কাতর।
হীরামণি-মাণিক্য ভরা ডিঙ্গায় তুলিল সারা
আর তোলে বিচিত্র পাথর॥
ছোলঙ্গ জামির ফল মিষ্ট তোলে নারিকেল
গুয়ার পাকড়ী ছড়া ছড়া।
সূতার কাপড় গড়া জৈন তোলে ঘড়া ঘড়া
আরো তোলে চটের ধাপড়া।

* * *

সত্বর হইয়া সাধু ডিঙ্গায় চলিল।
একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা বাওয়াইয়া দিল॥

প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
যেই নায় চলিল লক্ষের সদাগর॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজু সিজু।
গাঙ্গের দুই কূল ভাঙ্গি বেঁকা করে উজু॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী!
যার উপরে চড়ি রাবণের লঙ্কা দেখি॥ ইত্যাদি—

তৎকালে ফুল্লশ্রীর বিলক্ষণ বিদ্যাগৌরব ছিল; কবিবর জন্মভূমির পরিচয়ে যাহা লিখিয়াছেন তদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়।—

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্ডেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর॥
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের সুর।
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর॥—

মনসা-মঙ্গলে স্ত্রীলোকদিগের লেখা-পড়া শিক্ষার বিষয়ও বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নানা বিদ্যা জানে বেহুলা সাহের কুমারী।
নয়নের কাজলের লিখে বোল দুই চারি॥
আপনে পণ্ডিতা বেহুল' লিখে ভায় ভায়।
প্রথমে প্রণাম করে বাপ মায়ের পায়॥—

মহাত্মা বিজয় গুপ্তের পর অদ্যাবধি কেহ সেরূপ ভক্তির উচ্ছ্বাসে এদেশ প্লাবিত করেন নাই। পরবর্তী মোগল-রাজত্বকালে যে সকল কবি অস্মদ্দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের স্মৃতি বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে। কবিবর বিজয় গুপ্তের মত তাঁহাদের শ্রেণিবদ্ধ কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে তাঁহাদের ভক্তি ও গভীর ভাবপূর্ণ অনেক কবিতা পাওয়া গিয়াছে। তখন আধুনিক বঙ্গভাষার নূতন আলোক গ্রামবাসীগণের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তাই অসংস্কৃত গ্রাম্যভাষায় তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবগুলি উন্মেষিত হইয়াছিল। অনেকেই লোকচক্ষের অন্তরালে তাঁহাদের নিভৃত পল্লির গৃহকোণে বসিয়া সরল গ্রাম্যভাষায় গান, কবিতা, হেঁয়ালী, ছড়া প্রভৃতি রচনা করিয়া গুপ্ত স্থানেই রাখিয়া দিতেন। সেইরূপ কয়েকটি কবিতা ও ছড়া বহু চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু নানাকারণে এই সংস্করণে প্রকাশিত হইল না।

বাকলার ভূস্বামীগণের মধ্যে যাঁহারা কাব্য রচনা দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে তপ্নে আবদুল্লাপুরের বৈদ্য জমিদার বংশ ও রায়েরকাঠির রাজবংশ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা রামগতি রায় রচিত "মায়া-তিমির-চন্দ্রিকা", "যোগ-কল্প-লতিকা" ও জয়নারায়ণ এবং আনন্দময়ী রচিত "হরিলীলা", "চণ্ডীকাব্য" প্রভৃতির নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রায়েরকাঠির রাজবংশের রাজা নরনারায়ণ এবং তাঁহার বিদুষী পত্নী বসন্তকুমারীর রচিত পুস্তকগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগে অস্মদ্দেশে যে সকল সাহিত্যসেবী বীণাপাণির অর্চনা দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

বাকলার বর্তমান যুগের সাহিত্যরথীগণের মধ্যে চণ্ডীচরণ সেনের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভরাজি প্রণেতা চণ্ডীচরণ সেন বাসণ্ডাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডীচরণ তাঁহার পিতা নিমচাঁদের চতুর্থ সন্তান। তাঁহার জ্যেষ্ঠা তিনজন ভগ্নি ছিলেন। বাল্যকালে ইনি জ্যেষ্ঠ-ভগিনীপতি বাউকাঠি নিবাসী আনন্দচরণ সেনের তত্ত্বাবধানে বরিশাল জেলাস্কুলে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮৬৩—৬৪ খ্রিঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হ'ন। অতঃপর ইঞ্জিনিয়ারিং (Engineering) পড়িতে কলিকাতা উপস্থিত হ'ন; কিন্তু তিনি তদপযুক্ত চিত্রবিদ্যায় (Drawing) বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না বলিয়া সেই ইচ্ছা ত্যাগ করেন। তারপর ওকালতি পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন শিক্ষানবিশী ভাবে মুনসেফী কার্য করেন ও ১৮৭৪ খ্রিঃ অব্দে ১২ই মে তারিখে উক্ত পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হ'ন। তৎপর সাবজজ পদে উন্নীত হ'ন।

চণ্ডীচরণের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্ম-ধর্মের বীজ নিহিত ছিল। নিরাকার অতীন্দ্রিয় অসীম ভগবানকে তিনি সসীম ভাবে উপাসনা করিতে ভালবাসিতেন না, তাই ১৮৬৮ খ্রিঃ চণ্ডীচরণ প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত হ'ন, এবং বাসণ্ডা গ্রাম পরিত্যাগ করেন।

চণ্ডীচরণের পাঁচ পুত্র ও পাঁচটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য, বিশেষত জ্যেষ্ঠা কন্যা কামিনী রায় বি. এ. বঙ্গের একটি অসাধারণ প্রতিভা। দ্বিতীয়া কন্যা যামিনী সেন এল. এম এস ও তৃতীয়া কন্যা প্রেমকুসুম চৌধুরানী বরিশালে স্ত্রী সমাজের গৌরবস্থল। চতুর্থা কন্যা অল্পবয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। পুত্রগণ মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সেন বি. এ, নিশীথচন্দ্র সেন ব্যারিস্টার, প্রভাতচন্দ্র সেন বি. এ, ললিতমোহন সেন ইন্‌জিনিয়ার, সুধীর কুমার সেন বি. এ প্রভৃতি সকলেই কৃতবিদ্য হইয়াছেন।

ক্রমান্বয়ে কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে চণ্ডীচরণের শরীর ও মন উভয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং এই নিদারুণ শোকশেলই তাঁহার মৃত্যুরূপী হইয়া উঠিল। ১৯০৬ খ্রিঃ অব্দে ১০ই জুন তাঁহার মৃত্যু হয়।

চণ্ডীচরণ দাতা সহৃদয় ও পরোপকারী ছিলেন। অনেক আত্মীয়স্বজন তাঁহার সাহায্যে বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছেন। তিনি জননী বঙ্গভাষার কণ্ঠে যে সমস্ত অমূল্য রত্নহার পরাইয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই মহার্ঘ।

যখন তিনি যশোহরে মুন্‌সেফি করিতেন তখন তত্রত্য ছাত্রসম্মিলনীতে ১৮৮০ খ্রিঃ অব্দে "A Discourse Education" নামক তাঁহার একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হয়। ছাত্র-জীবন গঠনের জন্য এই বইখানি একটি অমূল্য উপদেশ। এই সময়ে তিনি কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে Vice President ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রিঃ অব্দে স্বনামখ্যাত উমেশচন্দ্র দত্তের অনুরোধে এই বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। ১৮৮৩ খ্রিঃ অব্দে তাঁহার "লঙ্কাকাণ্ড" প্রকাশিত হয়।

তৎপরে ১৮৮৪ খ্রিঃ অব্দে "Uncle Tom's Cabin" নামক ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ 'টমকাকার কুটীর" প্রকাশিত হয়। ইহা তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১৮৮৬ খ্রিঃ অব্দে তিনি "জীবনের গতি নির্ণয়" নামক একখানি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকখানি চণ্ডীচরণের দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানের পরিচায়ক। তৎপর যথাক্রমে তাঁহার "মহারাজা নন্দকুমার" বা "শতবৎসর পূর্বে বঙ্গের অবস্থা" "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ" "মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা" বা "মেট্‌কাফ্ চরিত", "ঝানসীর রানী", "অযোধ্যার বেগম", "এই কি রামের অযোধ্যা", "পাহাড়ি বাবা" প্রভৃতি বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়। অবশেষে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইহাতে পাপ ও পুণ্যের একটি অপূর্ব চিত্র বঙ্গসাহিত্য সমাজের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই পুস্তকখানি তাঁহার শেষ রচনা। ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধেও তিনি দুই খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সেই দুইখানি তাঁহার ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব স্ফুরণ।

শেষ জীবনে চণ্ডীচরণ রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জ্ঞানপিপাসার জন্য কঠিন তেলুগু ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি ওয়ালটেয়ার (Waltair) বাস করিতেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই তিনি এই ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

কর্মবীর চণ্ডীচরণই এই জেলার সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা। তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষীতা, তেজস্বিতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী তাঁহাকে এই দেশের আদর্শস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছে।

অস্মদ্দেশে স্ত্রী শিক্ষার স্বল্পতা হেতু শিক্ষিতা বঙ্গনারীর সংখ্যা অতিঅল্প। কিন্তু আধুনিক যুগের উচ্চ শিক্ষিতা রমণীগণের মধ্যে কুমারী তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু, মানকুমারী, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী প্রভৃতি বঙ্গনারীগণ বাস্তবিকই ললনাকুলের শীর্ষস্থানীয়া ও জ্ঞানগৌরবে বাঙ্গালি জাতির গরিমাস্থল।

১৮৫৪ খ্রিঃ অব্দে ১২ই অক্টোবর শ্রীমতী কামিনী বাসণ্ডাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চণ্ডীচরণের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

বাল্যকালের ক্রীড়াকলয়িত সুমধুর শিশু বাল্যের উচ্ছৃঙ্খল শত দুরন্তপনার মধ্যেও যখন তাঁহার ঠাকুরদাদার স্নেহমধুর কণ্ঠের ছড়া শুনিত, তখনি নীরবে উৎকর্ণ হইয়া নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিত—যেন এমনি করিয়া বালিকা ভবিষ্য জীবনের কোন অজানা মধুর রাগিনী তাহার প্রাণের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে শুনিত।

পাঁচ বৎসর বয়সে ইহার হাতেখড়ি হয় এবং অক্ষরপরিচয়ের পর হইতে ইনি 'শিশুশিক্ষা' মাতার নিকট অধ্যয়ন করেন। তারপর কিছুদিনের জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বালিকার বিকাশোন্মুখ প্রতিভা শিক্ষকের জ্ঞান অতিক্রম করিয়া উঠিল।

চণ্ডীচরণ কিছুদিন বরিশালে মুন্সেফি করিয়া পিরোজপুরে বদলি হইলেন। এইখানে বসিয়া আট বৎসর বয়সে কবি প্রথম কবিতা রচনা করেন। চণ্ডীচরণ গোপনে তাহা দেখিলেন, এবং কন্যার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পড়াইতে লাগিলেন।

কামিনী দশ বৎসর বয়সে 'হিন্দুমহিলা' বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবিষ্ট হ'ন এবং এই সময় হইতেই ইংরেজি ভাষা রীতিমত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন পড়িয়াই ইতিহাসে সেই স্কুলে প্রথমস্থান অধিকার করেন। তারপর পুনরায় গৃহশিক্ষকের নিকট ও এক বৎসর পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ইনি "বঙ্গমহিলা" বিদ্যালয়ে প্রেরিত হ'ন এবং সেই স্থানে উচ্চ প্রাথমিক (upper primary) পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সী বিভাগে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় চতুর্থস্থান অধিকার করেন। মাইনর পরীক্ষায় তৎকালে মেয়েদের সেলাইশিক্ষা বিষয় ইচ্ছাকৃত (optional) ছিল। কিন্তু কামিনী এ বিষয় না লইয়া, physics, mensuration, arithmatic প্রভৃতি পাঠ গ্রহণ করেন। এই সময় 'বঙ্গমহিলা' বিদ্যালয় 'বেথুন' বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হয়। তারপর কবি ষোড়শ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বিংশতি মুদ্রা বৃত্তি পান।

এই সময় বেথুন বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে কবির পিতৃবন্ধু কমিটির অন্যতম সদস্য দুর্গামোহন দাশ, কামিনীকে উক্ত কর্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে পিতার অনিচ্ছা ছিল, তিনি বলিতেন "শিক্ষার জন্য কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়াছি, অর্থের জন্য নহে।" অবশেষে তিনি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে সম্মতি দিতে বাধ্য হন। এতদ্ভিন্ন আরও একটি ঘটনা ইহার চাকরি গ্রহণে সুবিধা করিয়া দেয়। "মহারাজ নন্দকুমার" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া কামিনীর পিতা কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন, এই কারণে তিনি রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এ দিকে বেথুন-স্কুল-কমিটি হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া কামিনী পুনরায় পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নিজে কর্মচ্যুত হইলে চিরদিন যত্নে লালিত কন্যাকে দারিদ্র্য-কষ্ট ভোগ করিতে হয় এ জন্য তিনি তাঁহাকে কার্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি কন্যাকে লিখিলেন "তোমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলাম জ্ঞানলাভ করিবে বলিয়া—চাকরির জন্য নহে ; তুমি খাটিয়া খাইবে ইহা মনে করিতেও আমার কষ্ট হয়। কিন্তু আমি চাকরি ছাড়িতেছি, এতকাল তোমাকে যে ভাবে রাখিয়াছি এখন সে ভাবে রাখিবার সাধ্য হইবে না, সুতরাং তোমার চাকরি করা সম্বন্ধে আর আমার আপত্তি নাই, তুমি নিজ আয় দ্বারা নিজ অভাব দূর কর।" অতঃপর কামিনী বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কর্ম গ্রহণ করিলেন। সেই দিনে ইহার "লক্ষতারা" নামক কবিতা রচিত হয়। সেই হইতে আট বৎসর যাবৎ উক্ত স্কুলে থাকিয়াই নানা প্রকার ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থ পাঠ করেন। George Eliot,

Browning, Emerson, Merlin প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এই সময়ে ইনি কলেজে Botany, (উদ্ভিদ বিদ্যা) Logic (তর্কশাস্ত্র) ও মাঝে মাঝে সংস্কৃত শিক্ষা দান করিতেন।

১৮৮৮ খ্রিঃ অব্দে ইনি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করেন। দীক্ষার অব্যবহিত পরেই ক্রমান্বয় "নূতন আকাঙ্ক্ষা", "আশা পথে", "নীরবে", "যৌবন তপস্যা", প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। ইহার বিখ্যাত গ্রন্থ "আলো ও ছায়া"র মধ্যে প্রায় দশ বৎসরের বিভিন্ন সময়ের কবিতা স্থান পাইয়াছে।

১৮৮৯ খ্রিঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকাসহ "আলো ও ছায়া" প্রথম প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্রকে দুর্গামোহন দাশ যখন আলো ও ছায়ার পাণ্ডুলিপি দেখান তখন কবিবর জানিতেন না যে ইহা স্ত্রী-রচিত। তিনি কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন ও বহুবিধ সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "বস্তুত কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্মলতা এবং সর্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি। আর বলিতে কি, স্থলবিশেষে হিংসার উদ্রেক হইয়াছে।" (কামিনী স্বীয় কবিতা প্রকাশে শৈশব হইতেই অতিরিক্ত ভয় এবং লজ্জা অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন এবং আত্মগোপন পূর্বক যে কবিবরের পশ্চাতে থাকিয়া আপনার সঙ্গীত শুনাইতে পারিয়াছিলেন, দশ বৎসর পরে ১৯০৯ খ্রিঃ অব্দে "আলো ও ছায়া" তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিয়া স্বীয় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।)

ক্রমে তাঁহার "নির্মাল্য" ও "একলব্য" রচিত হয়। ১৮৯৪ খ্রিঃ অব্দে ঢাকা নিবাসী স্বনাম খ্যাত সিভিলিয়ন্ মিঃ কে. এন রায়ের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ১৮৯৭ খ্রিঃ অব্দে ইহার "পৌরাণিকী" প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯০৪ খ্রিঃ অব্দে "গুঞ্জন" নামে কতগুলি শিশু-পাঠ্য কবিতা ও "জনৈকা জননী" প্রকাশিত হয়।

কামিনীর কবিত্বশক্তি অতুলনীয়। সুমধুর কবিতাগুলিতে ইহার পূত চরিত্র সম্যকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার কবি-জীবন সার্থক। প্রার্থনা করি ইনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধান করুন।

স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরি বরিশাল জেলার আর একটি অমূল্য রত্ন। ইনি ১২৬৮ সালের চৈত্র মাসে সিদ্ধকাঠি গ্রামে বৈদ্যজমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। যে সূক্ষ্মদর্শিতা ও চিন্তাশক্তির অপূর্ব বিকাশ ইহার ভবিষ্যজীবনে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, বাল্যকাল হইতেই গিরিজাপ্রসন্নের বাল্যচরিত্রে তাহার উন্মেষ-লক্ষণ দৃষ্ট হইত।

বরিশাল জেলা-স্কুলে বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গিরিজাপ্রসন্ন কলিকাতার সিটি কলেজিয়েট-স্কুল হইতে প্রবেশিকা এবং উক্ত কলেজে হইতে এফ. এ. এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, অতঃপর বি. এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন।

পাঠ্যাবস্থায়ই তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল। ক্লাসের সর্বোৎকৃষ্ট বালকদিগের মধ্যে তিনি রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে গিরিজাপ্রসন্ন পাঠদ্দশাতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং পাঠদ্দশায়ই বিমল যশোলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বি. এ পরীক্ষার সময়ই তাঁহার বিখ্যাত "গৃহলক্ষ্মী" নামক সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থখানির সূত্রপাত হয়, এই পুস্তক প্রথমত তাঁহার একজন বন্ধু লিখিতে আরম্ভ করেন কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি স্বয়ংই 'গৃহলক্ষ্মী' সমাপ্ত করিলেন।

যে বিখ্যাত পুস্তকে তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল, গিরিজাপ্রসন্ন সেই বিস্তৃত ও সর্বাঙ্গসুন্দর সমালোচনা গ্রন্থ—"বঙ্কিমচন্দ্র" রচনা বি. এল. পরীক্ষার সময়ে আরম্ভ করেন, এই বিখ্যাত পুস্তকে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রালিখিত উপন্যাসাবলীর সমালোচনা করা হয়। এই পুস্তকে তিনি যে মানব চরিত্র বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—গভীর জ্ঞান ও যেরূপ চিন্তা শক্তির বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহাতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। এমন কি তিনি

নাকি বলিয়াছিলেন— "যে কল্পনা ও ভাব লইয়া এই চরিত্রগুলি চিত্রিত করিয়াছিলাম, গিরিজাবাবুর সমালোচনায় তাহারা আরও উজ্জ্বল ও মহান্ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়াছে।"

কবি অনেক সময়ে নিজে যাহা কল্পনাবলে লিখিয়া থাকেন, ভাবুক সমালোচকের হস্তে তাহাই আবার উচ্চাদর্শের জ্যোতির্ময় পূতপরিচ্ছদে, দেশের দুয়ারে—সাহিত্য-মন্দিরে—গম্ভীরতর উদ্দেশে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাই আজ "বঙ্কিমচন্দ্র" এত সমাদৃত, তাই গিরিজাপ্রসন্নের সমালোচনা পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী পাঠের সার্থকতা উপলব্ধি হয়; আর সমালোচক, কবির হৃদয়াপ্লুত প্রীতরসে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। কবি আপন মনে লিখিয়া যান আর সমালোচক তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। সমালোচকের কষ্টিপাথরের মুখে কবির কাব্য খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয়।

গিরিজাপ্রসন্নও আমাদের এই শ্রেণির সমালোচক। এই পুস্তক ব্যতীত তিনি "হিতকথা" নামে একখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থরচনা করেন এবং পূর্বলিখিত "কয়েক খানি পত্র" নামক গ্রন্থ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া "দম্পতির পত্রালাপ" নামে প্রকাশিত করেন। তাঁহারা "গৃহলক্ষ্মী" পুস্তকে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনোপলক্ষে—দম্পতির কর্তব্য, সংসারের উন্নতি অবনতির মূলতত্ত্ব, স্ত্রী জাতির কর্তব্য প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

লেখকের বা কবির মনোভাবই তাঁহাদের কাব্যে প্রকাশ পায়—এটা স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং গিরিজাপ্রসন্ন যে কোমলতা, মাধুর্য, ধর্মনিষ্ঠা, ভগভক্তি প্রভৃতি গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন, তাহা তাঁহার পুস্তকপাঠেই সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

গিরিজাপ্রসন্ন জ্যোতিষশাস্ত্রেরও আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিও লাভ করিয়াছিলেন। "গৃহলক্ষ্মী"তে তাঁহার জ্যোতিষাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গিরিজাপ্রসন্ন একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চিত্ত ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। মন পরিষ্কার না হইলে ভগবানের চিন্তা করিতে পাবা যায় না, তাই তিনি চিত্তশুদ্ধিব জন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিমত ব্রত-নিয়মাদি পালন করিতেন। ব্রহ্মচর্য তাঁহার এক রকম নিত্য সহচর ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন, তৎপরে পূজা ইত্যাদি সমাধা করিয়া স্বীয় বিষয় কার্যে মনোনিবেশ করিতেন। এমনি করিয়া গিরিজাপ্রসন্ন হৃদয়কে ভগবানের পবিত্র আসন করিতে প্রয়াস পাইতেন।

তাঁহার ব্রহ্মচর্য নিত্য গঙ্গাস্নান ও ধর্মগ্রন্থাদি পাঠে ব্যাঘাত হয় এই অন্য গিরিজাপ্রসন্ন প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতেন। ১৩০৫ সনে কলিকাতায় প্লেগ মহামারি উপস্থিত হইল। তাঁহার বাসাবাড়িতে সীতানাথ নামক একটি আয়ুর্বেদ-শিক্ষার্থীর উক্ত বোগ হইল। গিরিজাপ্রসন্ন স্বয়ং তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের প্রকোপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। তখন গিরিজাপ্রসন্ন কতিপয় বন্ধুর পরামর্শে বাড়িতে যাত্রা করেন ; কিন্তু সেই সর্বসংহারক ব্যাধি হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন না। ২০শে ভাদ্র গিরিজাপ্রসন্নের জ্বর হইল এবং অনতিবিলম্বে প্লেগের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইল, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। অবশেষে ২২শে ভাদ্র প্রাতঃকালে ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার আত্মা ভগবানের পাদপদ্মে বিলীন হইয়া গেল।

বাকরগঞ্জে গিরিজাপ্রসন্নের "গৃহলক্ষ্মী" গৃহলক্ষ্মীদের মহদুপকার সাধন করিয়াছে। বর্তমানে আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা একরকম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গিরিজাপ্রসন্ন এই অভাব প্রকৃতই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন রমণী অনন্ত শক্তি-স্বরূপিণী, স্বার্থত্যাগ ও সংযমের জ্বলন্ত মূর্তি। তাই তিনি হৃদয়ের আবেগে তাঁহার পুস্তকে বলিয়াছেন "তবে এক ভরসা আছে, ভারতে রমণী জাতি! তাহাদিগেরও অধঃপতন হইয়াছে, দিন দিন হইতেছে; তবুও রমণীতে ভারতের যে গৌরব আছে, পুরুষে তাহা নাই; অধঃপতনের অনুপাতে তাহারা এখনও অনেক উচ্চে অবস্থিত বলিতে হইবে। তাই মনে হইতেছে এই রমণী ভারতকে রাখিলে রাখিতে পারে।"

এই অভাবটা আরও অনেকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্তোষজনক ফল হইল না। গৈলানিবাসী আনন্দচন্দ্র সেনও গিরিজাপ্রসন্নের মত "গৃহিণীর-কর্তব্য" নামক একখানা পুস্তক রচনা করিয়া স্ত্রীসমাজের উপকার সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বাকরগঞ্জে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। "বাকরগঞ্জ-হিতৈষিণী-সভা" এই জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খ্রিঃ অব্দে এই সভা স্থাপিত হয়। বাটাজোড়ের ভূম্যধিকারী ব্রজমোহন দত্ত, উজিরপুরের মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, গৈলার বিশ্বেশ্বর সেন, লাখুটিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিঃ পি. এল. রায় প্রমুখ বাকরগঞ্জের কতিপয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ইহার অগ্রণী ছিলেন। ময়মনসিংহ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু ও ফরিদপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ উকিল অম্বিকাচরণ মজুমদার এই সভার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

তবে বাকলার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা যে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। রায়েরকাঠির রাজবংশীয়া বসন্তকুমারী ও কুসুমকুমারী, বাসণ্ডার কামিনী রায়, বি এ ও যামিনী সেন এল. এম; এম. আর. সি. পি.—(লণ্ডন—এই উপাধিটি ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনি সর্বপ্রথম পাইয়াছেন।) প্রভৃতি মনস্বিনীগণের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি মহিলা প্রতিভার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে চাঁদসিগ্রাম বঙ্গদেশে অপরিচিত নহে। ধন্বন্তরীকল্প ক্ষতচিকিৎসক স্বনামখ্যাত ডাক্তার পদ্মলোচন দাস চাঁদশী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মলোচন শুধু বঙ্গদেশে কেন, ভারতের অনেকস্থানে সুপরিচিত। তাঁহার পুত্রগণও বর্তমান সময়ে ক্ষতচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। কুসুমকুমারী "স্নেহলতা" ও "প্রেমলতা" নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাদের ভাব ও ভাষা হৃদয়স্পর্শী। সরোজবাসিনী "প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি" নামক গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা পুস্তকের রচয়িত্রী। এই পুস্তকখানি মানকুমারীর "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

চণ্ডীচরণ ও গিরিজাপ্রসন্নের লেখনী প্রধানত ঐতিহাসিক ও সামাজিক গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত ছিল। অস্মদ্দেশবাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ ধর্মগ্রন্থ প্রণয়নেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই শ্রেণির পুস্তকের মধ্যে প্রসিদ্ধ "ভক্তিযোগ" গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাটাজোড় গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী দত্তবংশে "ভক্তিযোগ" প্রণেতা অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। ইহার পিতা ব্রজমোহন দত্ত একজন স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ ছিলেন। তাঁহারই যত্নে পটুয়াখালিতে প্রথমে সাবডিভিসন স্থাপিত হয় এবং এখানে তিনি মুনসেফ ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করেন। ১৮৫৬ খ্রিঃ অব্দে অশ্বিনীকুমার পটুয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে যখন ইনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন একদিন বিখ্যাত লেপ্টেনান্ট গবর্ণর আস্‌লি ইডেন্ (Ashley Eden) উক্ত কলেজ পরিদর্শনার্থ তথায় আগমন করিলে, বালক অশ্বিনীকুমার ইংরাজি ভাষায় একটি চিত্তাকর্ষক সনেট (Sonnet) লিখিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন। সাহেব বাহাদুর অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি উক্ত রচনার পারিপাট্য ও মাধুর্য দর্শনে তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করেন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া মুগ্ধ হ'ন। কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ রো (Mr. Rowe) অশ্বিনীকুমারের সনেট লিখিবার এবম্বিধ ক্ষমতা দর্শনে আশ্চর্যান্বিত হইলেন, তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন।

অশ্বিনীকুমার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ উপাধি গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসর শ্রীরামপুর উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন শুধু বিদ্যালয়ের পুস্তক পাঠে উপযুক্ত শিক্ষা হয় না, মানুষকে মানুষ নামের উপযুক্ত করিতে হইলে চরিত্র গঠন আবশ্যক। তাই তিনি ছাত্রদিগের বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠন শিক্ষা দিতেন এবং যাহাতে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেন। অশ্বিনীকুমার ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং তাহারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করত ও হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসিত।

অতঃপর তিনি ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে আসিলেন। শীঘ্রই তাঁহার অসাধারণ

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কথা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি শুভ্রযশোরাশির অধিকারী হইলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় সকল সময়ে সততা রক্ষা হয় না মনে করিয়া অশ্বিনীকুমার আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিকট সৎপথের ধূলিরাশি অসৎপথের স্বর্ণমুষ্টি অপেক্ষা মূল্যবান ছিল।

অশ্বিনীকুমার তারপর পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন এবং বহুচেষ্টা যত্ন ও সর্বোপরি অসাধারণ প্রতিভাবলে উহাকে উচ্চশ্রেণির কলেজে পরিণত করিলেন। ক্রমে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবিত করিয়া উহাকে আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করিলেন। সত্য, প্রেম, পবিত্রতায় অশ্বিনীকুমারের জীবন গঠিত এবং ইহাই তাঁহার লক্ষ্য।

অশ্বিনীকুমারের কর্মবহুল জীবনের বিস্তৃত কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তিনি সাহিত্যজগতে যে কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন আমরা তাহারই বর্ণনা করিব। তাঁহাব পবিত্র লেখনী হইতে যে অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়াছে, যাহার মধুময় আস্বাদে বঙ্গের ধ্বংসপ্রায় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-জীবনে নবীন উৎসাহ, নবীন তেজ, নবীন জীবনী-শক্তি বিকশিত হইয়াছে, সেই "ভক্তিযোগ", সেই অপার্থিব "প্রেম", সেই জগদম্বার মহোদ্বোধনের নবীন জ্যোতিঃ "দুর্গোৎসব তত্ত্ব" তাঁহারই অমৃতময়ী লেখনি-প্রসূত। এই ভক্তিযোগ দর্শনে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থকারকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। অশ্বিনীকুমার নানাপ্রকার পুবাণ ও বহু সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন।

অশ্বিনীকুমার যে শ্রেণির পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা প্রধানত নীতি ও ধর্মবিষয়ক। আমরা এইখানে আর একজন সাহিত্যরথীর কথা বলিব, তাঁহার রচনাগুলি ঠিক এক শ্রেণির না হইলেও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও মৌলিক গবেষণাপূর্ণ। ইনি বর্তমানে এই জেলার একজন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার।

১২৬৪ সালের শ্রাবণ মাসে বরিশাল জেলার অন্তর্গত লতাগ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা জন্মগ্রহণ কবেন। ইঁহার পৈত্রিক বাসস্থান বানারিপাড়া গ্রামে; পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুহ-ঠাকুরতা। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশ হয় এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় ইনি মাসিক পত্রে কবিতা পাঠাইতে আরম্ভ করেন। মনোমোহন বসুর "মধ্যস্থ" পত্রে ইহার আদি-উদ্যম-প্রসূত কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক মনোরঞ্জনের "অশনি" নামক একটি কবিতা তৎকালিক বাংলার বিখ্যাত মাসিকপত্র "বঙ্গদর্শনে" মুদ্রিত হয়। যদি তিনি একাগ্রমনে সাহিত্যচর্চায় নিযুক্ত থাকিতেন তাহা হইলে মনোরঞ্জন আজ বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার হইতেন সন্দেহ নাই। তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তন্মধ্যে "জীবন সহায়" "কবিতারঞ্জন" "কবিতা-কলিকা" "আশা-প্রদীপ" "কুম্ভমেলা" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পুস্তকদ্বয় তাঁহার গভীর গবেষণা, দার্শনিক তত্ত্ব ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নানাবিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ, সমালোচনা, কবিতা প্রভৃতি অদ্যাপি অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

বরিশালের নিকটবর্তী কাশীপুরের প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ দেশের আর একজন সাহিত্যরথী। তাঁহার রচিত "কাশীপুর কুসুম" ও "কাশীপুরনিবাসীর সংগ্রহ" পুস্তকদ্বয় উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তক দুইখানি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যথেষ্ট পরিশ্রমের পরিচায়ক। তিনি পোস্টাফিসের কার্যাবলী সম্বন্ধে আর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিযা গবর্নমেন্টের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার "কাশীপুর-নিবাসী" নামক পত্রিকা বরিশালবাসীর প্রভৃতি উপকার সাধন করিতেছে। বরিশালে যত প্রকার সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে এইটি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী। প্রতাপচন্দ্র যেরূপ সুলেখক তদ্রূপ দেশের অনেক সৎকার্যের অগ্রণী।

বর্তমান সময়ে লাখুটিয়ার দেবকুমার চৌধুরি বরিশালের একজন প্রতিভাশালী শ্রেষ্ঠ কবি। ইহার কবিত্ব ও পুস্তক সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই নবীন উদীয়মান কবি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা বলে বরিশালের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

উদীয়মান লেখকশ্রেণির মধ্যে গৈলানিবাসী কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি "সাবিত্রী" "লিপিদাশ" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় বাহির হইতেছে।

বাকলার সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে হইলে এইস্থানে আর এক শ্রেণির সাহিত্যের বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। বহু পূর্ব হইতেই আমাদের অনেক প্রতিভাশালী লেখক সংবাদপত্রের আবশ্যকতা বুঝিয়া ইহার প্রচারে মনোনিবেশ করেন। সর্বপ্রথমে বাসণ্ডা নিবাসী পূর্ণচন্দ্র সেন এই জেলায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই যন্ত্রেই প্রথমে "পরিমল-বাহিনী" নামক সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। তারপাশা নিবাসী হরকুমার রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। তারপর ১২৮ বঙ্গাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র কর "সত্যপ্রকাশ" নামে আর একটি মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করেন। এই যন্ত্রে "বরিশাল-বার্তাবহ" নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদপত্রের আবশ্যকতা দেশবাসী সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন তাই ক্রমশ "হিতসাধিনী" "বালরঞ্জিকা" "সত্যপ্রকাশ" "বঙ্গদর্শন" প্রভৃতি পত্রিকা বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগবশতঃ এই পত্রিকাগুলি অনেক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। তারপর প্রতাপচন্দ্র "কাশীপুরনিবাসী" পত্রিকা বাহির করেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। তৎপরে "বিকাশ" নামে আর একটি পত্রিকা বাহির হইত। বর্তমানে "বরিশাল হিতৈষী" পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে; ইহার সম্পাদক দুর্গামোহন সেন বি. এ।

কবি যে সৌন্দর্য ভাষায় সৃষ্টি করেন, শিল্পী তাহা অসীম কৌশলে মানব চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত করেন। কাব্য ও কবিতা যেরূপ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের একটি প্রধান উপাদান, শিল্পও তদ্রূপ ঐতিহাসিকদিগের প্রধান সাক্ষী। হোমারের ইলিযাড, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে যেরূপ তাৎকালিক সমাজ-চিত্র সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে, কলাকৌশলের পরাকাষ্ঠা গ্রিসের ভাস্কর্যসমূহ, ভারতের চারু কারুকার্যখোদিত সুবৃহৎ অট্টালিকা সমূহ, মিশরের পিরামিড প্রভৃতিও তাৎকালিক মানবের সৌন্দর্য-উপলব্ধির গভীরতা, জ্ঞানের প্রসারতা ও অপরিসীম কৌশলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রাসকিন বলিয়াছেন "In true Art the hand, the head and the heart of a man go together" যে দেশের লেখক কবি, বৈয়াকরণ কবি, চিকিৎসক কবি, দার্শনিক কবি, ধর্ম প্রবর্তক কবি, আইনজ্ঞ কবি, যে দেশ স্মরণাতীত যুগ হইতে কাব্যামৃত রসাস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া আসিতেছে, সে দেশের শিল্পির কারুকার্যে কত মাধুর্য, কত সৌন্দর্য থাকিতে পারে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের অন্তর্নিহিত গুণসমূহেরও অধঃপতন হয় ; গ্রিসের সে শিল্পচাতুর্য, মহাভারত ও ইলিয়াডের মত কাব্য এখন কোথায়? পুরীর জগন্নাথের মন্দির, অজন্তা গুহা এবং তাজমহলের কারুকার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের বাকলারও এমন একদিন ছিল যে দিন তিনি তাঁহার সন্তানগণের কলাকৌশলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। যে সকল প্রাচীন মঠ-মন্দির প্রভৃতি এদেশে দৃষ্ট হয়, তাহার অনেকগুলির কারুকার্য বড়ই মনোহর। ইহাদের মধ্যে রায়েরকাঠির সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির এবং পোনাবালিয়ার রামভদ্র রায়-প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের চতুস্পার্শে বিভিন্ন সময় নির্মিত নবরত্ন, পঞ্চরত্ন প্রভৃতি চতুর্দশটি মন্দির বিদ্যমান। বহুতর অশ্বত্থ এবং পাকুড় বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন হইয়া এই মন্দির অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। মন্দিরে হিন্দু-মুসলমান শিল্পের আশ্চর্য সম্মিলন দৃষ্ট হয়। মন্দিরগাত্র নানাবিধ মূর্তি ও কারুকার্য খোদিত ইষ্টক দ্বারা সজ্জিত। এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য রাজা শত্রাজিৎ রায়ের সময় আরম্ভ হইয়া রাজা জয়নারায়ণ কর্তৃক সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখভাগে পঞ্চভুজাকৃতি শ্বেত-প্রস্তরে সংস্কৃত ভাষায় তাৎকালিক বঙ্গাক্ষরে মন্দিরনির্মাতা স্থপতি কিঙ্করের নাম, উৎসর্গকর্তা রাজা জয়নারায়ণের নাম উৎসর্গের সন-তারিখ, পূজকের নাম এবং যে ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তর খোদিত হইয়াছিল তাহার নাম প্রভৃতি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পোনাবালিয়ার রামভদ্র রায়-প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দির, অস্মদ্দেশবাসীগণের

গৌরবের সামগ্রী। স্থাপত্যশিল্পের এইরূপ উৎকৃষ্ট নিদর্শন এদেশে অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না। মঠ মন্দিরের অনতিদূরে মনোহর রায় প্রতিষ্ঠিত দুর্গামন্দির ও কমলাকান্ত রায় স্থাপিত মনসা-মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরদ্বয়ের গাত্রখোদিত লিপিপাঠে উহারা যথাক্রমে ১৭০০[৪] ও ১৭৩১[৫] শকে নির্মিত বলিয়া জানা যায়। এখন ইহাদের ভগ্নদশা উপস্থিত। আশ্চর্যের বিষয়, রামভদ্রের মঠ-মন্দির উহাদের বহুপূর্বে নির্মিত হইয়াও অদ্যাবধি অটল রহিয়াছে। এই মঠ-মন্দিরের দৃঢ়তা এবং শিল্পচাতুর্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মন্দিরগাত্রে ধ্রুবের তপস্যা, রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি নানাবিধ পৌরাণিক চিত্র খোদিত আছে, কিন্তু উৎসর্গলিপিগুলি পল্লিবাসী Vandalগণের অত্যাচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব এই মন্দির সর্বপ্রথম কি উদ্দেশে নির্মিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। খোদিত চিত্রগুলি সকলই কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় ; তদ্দৃষ্ট অনুমান হয় রামভদ্র "কালাচাঁদ" নামক সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই বাসের জন্য মধিপুরস্থিত কাছারি-বাড়ি যাইবার পথে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বীয় ভবন হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া নিজগৃহের সম্মুখেই কালাচাঁদের বর্তমান ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।

যে সকল স্থপতি আমাদের দেশকে একদিন উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রায়েরকাঠিস্থিত সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির নির্মাতা কিঙ্কর ও রাজা শিবনারায়ণের শিবমন্দির-নির্মাতা রামকান্ত ব্যতীত অন্যান্য সকলের নাম বর্তমান যুগে বিলুপ্ত প্রায়।

অস্মদ্দেশে চিত্র-শিল্পেরও যথেষ্ট চর্চা ছিল। রায়েরকাঠি নিবাসী গিরীশচন্দ্র রায় ও নলচিড়া নিবাসী ঈশানচন্দ্র কর চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বর্তমানে রায়েরকাঠির কৈলাসচন্দ্র দাস ও খলিসাকোটা নিবাসী দুর্গানাথ ভট্টাচার্য তৈল-চিত্র অঙ্কনে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কীর্তিপাশার সংলগ্ন রণমতি গ্রামে চন্দ্রকুমার পাল চিত্রবিদ্যা ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রতিমাদি প্রস্তুতে বিশেষ পারদর্শী। ইহার নাম বাকরগঞ্জের সর্বত্র পরিচিত, অল্পকাল মধ্যেই ইনি স্বীয় গুণপনা দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামক আর একটি তরুণবয়স্ক যুবক চিত্রবিদ্যায় বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শুক্তাগড় গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার অন্য একনাম ঠাকুরচাঁদ। ইনি স্বনামখ্যাত পণ্ডিত বনমালী বেদান্ততীর্থের ভ্রাতুষ্পুত্র। সুরেন্দ্রনাথের সরলতা, উদারতা, ধর্মনিষ্ঠা অতি শৈশবেই পরিলক্ষিত হইত। বর্ণপরিচয়ের পর হইতেই সুরেন্দ্রনাথের শিল্পকার্যের দিকে বেশি মনোযোগ দৃষ্ট হইত। ইনি বাল্যকালে মাটির দুর্গাপ্রতিমা এবং বহুবিধ কল-কব্জা প্রস্তুত করিতেন। বাল্যকালের দুই একটি কার্যেই তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বারদেশ পর্যন্ত গিয়া ঠাকুরচাঁদ ফিরিয়া আসিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে তাহার চিত্ত কোন দিনই আকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু চিত্রবিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। বনমালী বেদান্ততীর্থ যখন কাশী সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তখন ঠাকুরচাঁদ কয়েক বৎসর কাশীধামে পাঠাভ্যাস করেন। কাশীধামের প্রাচীন কীর্তিসমূহের ভগ্নাবশেষ চিহ্নগুলি দেখিয়া তাঁহার মন সেই প্রাচীন চিত্রগুলির দিকে আকৃষ্ট হইল এবং ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলার উদ্ধারসাধনে তদনুরূপ চিত্রাঙ্কন করিতে লাগিলেন। সেই হইতে বিদেশীয় শিল্পচাতুর্য তাঁহার চক্ষে ভাল লাগিত না। ভারতের সন্তান ভারতের লুপ্ত শিল্প পুনরুদ্ধার করিতে বিশেষ যত্নবান হইলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক বহুপ্রকার বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সেই সাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। তারপর সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ হাবেল আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ভারতীয় চিত্রকলার কতগুলি শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাঁহার ছাত্রদের চক্ষের সম্মুখে ধরিলেন। ঠাকুরচাঁদ সেই আদর্শে চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই হাবেল সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, তারপর তাঁহারই অনুগ্রহে সুরেন্দ্রনাথ মাসিক আট টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইলেন।

সকল সৎকার্যেই সুরেন্দ্রনাথ অগ্রণী ছিলেন। কিছুকাল পরে দেশের উন্নতিকল্পে শিল্পী

সুরেন্দ্রনাথ হাটারসলি তাঁতের (Hatersly Loom) ব্যবহার শিখিতে লাগিলেন। আশা ছিল যে, গ্রামে ইহা শিক্ষা দিয়া গ্রামবাসীদিগের নিকট শিল্পের একটি সহজ পন্থা তুলিয়া ধরিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে আশা সফল করিতে পারিলেন না।

কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় যে প্রাচ্য-শিল্প-প্রদর্শনী বসিয়াছিল তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের ছবিগুলিই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল এবং অচিরেই তাঁহার যশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ ঐ সময়ে পুরস্কার বাবদ প্রায় আটশত টাকা প্রাপ্ত হ'ন।

সুরেন্দ্রনাথের চিত্রগুলি সাধারণের কাছে তত ভাল লাগিত না এবং বাজারে সেরূপ বিক্রয় হইত না, এই জন্য তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে রবিবর্মার পদানুসরণ করিতে বলিলেন ; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন "বরং না খাইয়া মরিব, কিন্তু যাহাতে চিত্র-বিদ্যার আদর্শ বুঝিয়াছি, অর্থলোভে তাহা হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না।" এই একাগ্রতা, এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, এই কর্তব্যনিষ্ঠাবলেই সুরেন্দ্রনাথ এত অল্প বয়সে শুভ্র বিমল যশের অধিকারী হইয়াছিলেন ; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ না হইতেই মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

উল্লিখিত চিত্র-শিল্পীগণ ব্যতীত শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আর এক নবীন যুবক চিত্র ও ভাস্কর্য বিদ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইঁহার বাসস্থান কীর্তিপাশার সংলগ্ন গোবিন্দধবলগ্রামে। ইনি কোথাও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। ইঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভা স্বতঃই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। শিল্পীর মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্য সৃষ্টির অপূর্ব ক্ষমতা লইয়া যেন শীতলচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। শৈশবে মৃত্তিকা দ্বারা নানাবিধ সুন্দর পুতুল প্রস্তুত করা ও রঙ্গিন পেনসিলের সাহায্যে অঙ্কিত করা ইহার খেলার একটি অঙ্গ ছিল। স্বহস্তে বহুবিধ ছবি আঁকিয়া শিশু শীতলচন্দ্র বাল্য ক্রীড়াভূমিটিকে সজ্জিত করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার কলাবিদ্যাও পরিমার্জিত হইতে লাগিল। গ্রাম্য মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে মাইনর পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারি শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। মহানগরীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিল্প ও নানাপ্রকার কারুকার্য শীতলচন্দ্রের হৃদয়ে অদম্য উৎসাহের সৃষ্টি করিল। তিনি নবীন উৎসাহে নির্জনে বসিয়া আপনার প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলেন। কলিকাতার প্রস্তর নির্মিত মূর্তিগুলি দেখিয়া শীতলচন্দ্র মোম ও ছুরির সাহায্যে যে সকল মূর্তি প্রস্তুত করিতেন, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহার বালসুলভ চপলতা-প্রসূত নিপুণতাপূর্ণ ফটোফ্রেম, নানাবিধ গহনার কেস, আয়না-বসান কড়ির বাক্স, মোমের নির্মিত শ্বেতমর্মর প্রস্তরবৎ কতিপয় মূর্তি ও সুন্দর সুন্দর কয়েকটি চিত্র বালকের নিপুণ হস্তের ও বিকাশোন্মুখ প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে।

শীতলচন্দ্রের প্রথম-উদ্যম-প্রসূত কয়েকটি চিত্র সর্বপ্রথমে স্বনামখ্যাত সাহিত্যরথী দীনেশচন্দ্র সেনের "রামায়ণী কথা" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র ইঁহাকে অন্যতম সাহিত্যসেবী কুমার শরৎকুমার রায়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। উপযুক্ত ক্ষেত্র অভাবে নবীন প্রতিভা শুকাইয়া যাইবে ভাবিয়া শরৎকুমার ভাস্কর্য বিদ্যার অনুশীলনের জন্য নবীন শিল্পীকে একখণ্ড নাতিবৃহৎ শ্বেতমর্মর প্রস্তর প্রদান করেন। শীতলচন্দ্র সেই প্রস্তর দ্বারা একটি সর্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মীমূর্তি প্রস্তুত করিলেন। এই মূর্তি দর্শন করিয়া বঙ্গের কতিপয় শ্রেষ্ঠব্যক্তি ইঁহার সুনিপুণ ভাস্কর্য বিদ্যার যথেষ্ট প্রশংসা করেন, তারপর দীনেশচন্দ্র ইঁহার অসাধারণ গুণপনার আংশিক পরিচয় "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত করেন।

এই শ্রেণির ভাস্কর অস্মদ্দেশে বিরল। ইনি বর্তমানে ডাক্তারি পাশ করিয়া চিত্রবিদ্যায় রত আছেন। ভরসা করি, এই নবীন শিল্পী কলাবিদ্যার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিয়া আমাদিগকে আরও গৌরবান্বিত করিবেন।

আমাদের দেশে যখন শিল্প ও অন্যান্য বহুপ্রকার কলাবিদ্যার অনুশীলন হইত, তখন ম্যাঞ্চেস্টার, আমেরিকা, শেফিল্ড প্রভৃতির কোন জিনিস এদেশে আসিত না। তৎকালে তাহাদের

অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এদেশবাসীগণ অজ্ঞ ছিলেন। তখন আমাদের দেশের তৈয়ারি জিনিসপত্রেই আমাদের সকল কার্য সমাধান হইত। মাধবপাশা, গাবখান ও লক্ষ্মণকাঠি প্রভৃতি স্থান বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। গ্রাম্য তাঁতিগণ এমন চমৎকার সুচিক্কণ বস্ত্র প্রস্তুত করিত যে, সেগুলি বিভিন্নদেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। বিশ বৎসর পূর্বেও অস্মদ্দেশের বাজারে এই সকল বস্ত্র বিক্রয় হইত। কিন্তু নতুন স্রোত আসিয়া তাহার চিহ্ন পর্যন্তও লোপ করিয়া দিয়াছে। বর্তমান সময়ে শুধু এই সকল স্থানের স্মৃতিটুকু মাত্র জাগরুক আছে। নলচিড়ার দক্ষিণপূর্বে কোন এক নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লিতে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে কাগজ তৈয়ারি হইত। এই কাগজের জন্যই উক্ত গ্রামের নাম কাগজিনগর হইয়াছে। এই গ্রামের অধিবাসীগণ ঢেঁকির সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত করিয়া স্বীয় স্বীয় জীবিকা নির্বাহ করিত। তৎকালে কাগজিনগরের পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিদ্যার্থী ছাত্রবৃন্দ এই কাগজই ব্যবহার করিতেন। উজিরপুর গ্রামে যে সকল ইস্পাত নির্মিত শাণিত অস্ত্র, ছুরি, কাঁচি নিব প্রভৃতি প্রস্তুত হইত তাহা অতীব চমৎকার। আমাদের দেশের সকল অভাবই ইহাদ্বারা দূরীভূত হইত এবং সুদূর আরাকান, মণিপুর, ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত স্থানে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইয়া তাহাদেরও যথেষ্ট উপকার সাধন করিত। উজিরপুরে এই সমস্ত কারবার এখনও কিছু কিছু বর্তমান আছে। বর্তমানে স্বদেশী নিবগুলির মধ্যে "উজিরপুব-নিব" এখনও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া পূর্ব গৌরবের সামান্য স্মৃতিটুকু জাগাইয়া রাখিয়াছে।

রহমতপুর নিবাসী ভূম্যধিকারী স্বনাম প্রসিদ্ধ বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বর্তমান যুগে এই জেলাব সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তিনি অসাধারণ শক্তি ও জ্ঞান-গরিমার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। ইনি বহুকাল হইতেই জ্যোতিষশাস্ত্রের গভীর গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। কতিপয় বৎসর হইল ইনি (Solar system) সৌর জগতের গতি প্রদর্শক একটি অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার ও নির্মাণ কবিয়াছেন। গত ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার ভারত শিল্প প্রদর্শনীতে এই যন্ত্র প্রদান করিয়া সুধীসমাজে যথেষ্ট যশোভাজন হইয়াছেন। এই যন্ত্রটি ঘড়ির চাকার ন্যায় চাকাদ্বারা নির্মিত। কর্তৃপক্ষ এই অদ্ভুত ক্ষমতা ও অভিনব শিল্পচাতুর্য দর্শন করিয়া ইঁহাকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ "Calculating apparatus" নামে আর একটি যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন। উহা দ্বারা মিশ্রযোগ-বিয়োগ প্রভৃতি অতি সত্বর প্রদর্শিত হয়। সম্প্রতি হিন্দু-জ্যোতিষের মর্ম ও গণনা অতি সহজে সাধারণের বোধগম্যের জন্য "সিদ্ধান্ত চক্র" নামক একটি যন্ত্র ও "সিদ্ধান্ত-দীপিকা" নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই যন্ত্র ও পুস্তকের সাহায্যে যে কোন সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তি অতি সহজে পাঞ্জকার তিথি, নক্ষত্র, বার ও যোগ নির্ণয় করিতে পারিবেন। এই শিল্পীর কৃতিত্বে গৌরবান্বিত ও সমগ্র বাকলা ইঁহার গৌরব প্রভায় উজ্জ্বল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি ইনি উত্তরোত্তর শিল্পের উন্নতি কবিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে উজ্জ্বলতর প্রভায় মণ্ডিত করুন।

ক্ষীরোদবিহারী সেন বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ হাফটোনব্লক প্রস্তুতকারক বলিয়া বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। গৌরনদী থানার মাহিলাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে ইঁহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার চিত্র অঙ্কন ও খোদাই কার্যে দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। জীবনের যে লক্ষ্য ইনি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহার অনুশীলনে ক্ষীরোদবিহারী বাল্যকাল হইতেই বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

কৈশোরের প্রারম্ভেই ইনি আলোকচিত্র (photograph) শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকায় গমন করেন। অতি অল্পসময় মধ্যে ইনি এই বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত হইলেন। অর্থের সংস্থান আবশ্যক মনে করিয়া ক্ষীরোদবিহারী অতি সামান্য বেতনে ঝালকাঠি, পরে পিংনা ও কিশোরগঞ্জ স্কুলের চিত্রবিদ্যার শিক্ষক হইলেন। কিছুদিন পরে উক্ত কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া হাফটোনব্লক প্রস্তুত প্রণালি শিখিবার জন্য কলিকাতা আগমন করেন ও সুপ্রসিদ্ধ Messrs U Ray & Co.

অফিসে চাকরি গ্রহণ করিয়া উক্ত কার্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। ইহার পর ইনি এলাহাবাদ ইন্ডিয়ান প্রেসে কয়েক দিন এই কার্য করিয়া বম্বে "টাইমস অব ইন্ডিয়া" অফিসে কার্য করেন এবং এই খানে ইনি বিশেষ সম্মানিত হন। পরের চাকরি করা ইঁহার ইচ্ছা ছিল না, তবে জ্ঞান-পিপাসার জন্য এই চাকরিতে ইনি কখনও অবজ্ঞা করেন নাই। স্বাবলম্বন-চিন্তা বাল্যকাল হইতেই ক্ষীরোদবিহারীর অত্যন্ত বলবতী ছিল ; তাই অতি সত্বর চাকরি ছাড়িয়া কলিকাতায় স্বীয় নামে হাফটোন ব্লকের কারবার খুলিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বহস্তখোদিত ব্লক কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ব্লকশ্রেণির মধ্যে পরিগণিত হইল। ইহার পর ইনি স্বীয় ব্যবসায়ের আয় হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া ১৯৯১ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত যাত্রা করেন।

তিনি লন্ডনে আসিয়া মাত্র তিন মাস শিক্ষা লাভ করিলেন এবং কঠোর পরিশ্রমের সহিত জ্ঞাতব্য সকল বিষয় অবগত হইলেন। তারপর তাঁহার শিক্ষকের অনুরোধে সাপ্তাহিক দুই পাউন্ড দুই শিলিং বেতনে সেইস্থানে কার্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমাগত নয় মাস কার্য করিলেন ; কিন্তু বিলাতে কাজ শিক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাই ডিসেম্বর মাসে পুনরায় তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন।

বর্তমান "K V Seyne & Bros" কারখানাই ক্ষীরোদবিহারীর অসাধারণ যত্ন ও চেষ্টার ফল। তাঁহার নির্মিত ছবির বিশেষ পরিচয় বাহুল্য মনে করি, বর্তমানে সর্বত্রই এই কারখানার ছবি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এই অধ্যায়ে সংস্কৃত চর্চা ও বঙ্গসাহিত্যসেবা সম্বন্ধে পূর্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই অস্মদ্দেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমাদের দেশে পূর্বকথিত পণ্ডিতবর্গ ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে এমন আরও অনেক লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানচর্চায় আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া স্বদেশের হিতসাধন করিতেছেন ; ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নাটক, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া, কেহবা আয়ুর্বেদশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা ইতিমধ্যে সাহিত্যের ও এদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। নাগপাড়ানিবাসী রজনীনাথ ভট্টাচার্য, "অভিমন্যুবধ" নাটক-রচয়িতা মহেশচন্দ্র দাশ, কীর্তিপাশানিবাসী কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরনিবাসী হরনাথ বসু, উজিরপুরনিবাসী পণ্ডিত রজনীনাথ পদরত্ন, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন ও কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শুক্তাগড়নিবাসী অধ্যাপক বনমালী বেদান্ততীর্থ এম এ চাঁদসীনিবাসী সীতানাথ সাঙ্খ্যতীর্থ, ও হরনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে বাকলাবাসীগণের কৃতিত্ব যাহাই হউক না কেন, আয়ুর্বেদচর্চায় যে তাঁহারা একদিন বঙ্গের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভারত বিশ্রুত নিদান-গ্রন্থ-প্রণেতা মহামতি মাধবকর[৬] ও কলাপ-ব্যাকরণের পঞ্জি-রচয়িতা মহাত্মা ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রের নাম গৌড়জন সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বাকলাবাসীগণের মধ্যে যাঁহারা স্বদেশের এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় মনীষীর নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে বর্তমান সময়েও খলিসাকোটানিবাসী ঋষিকল্প সুপণ্ডিত পার্বতীচরণ রায় সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন প্রতিভাশালী সুচিকিৎসক অধুনা অস্মদ্দেশে আর নাই। এতদ্ভিন্ন ভাটিয়ানিবাসী সুপণ্ডিত শ্রীনাথ সেন গভীর জ্ঞান ও চিকিৎসা-নৈপুণ্য দ্বারা দেশবিখ্যাত হইয়াছেন। পরবর্তী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সহিত স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় নিযুক্ত আছেন।

আমাদের দেশে এরূপ আরও অনেক উদীয়মান কবি ও শিল্পী আছেন, যাঁহারা উপযুক্ত ক্ষেত্র অভাবে নির্জন গৃহ-পল্লিতে বসিয়া স্বীয় স্বীয় অন্তর্নিহিত গুণসমূহের অনুশীলনে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের কবিত্ব ও শিল্পচাতুর্য ক্ষুদ্র অর্ধশিক্ষিত জনসমাজে সীমাবদ্ধ। হায়! উপযুক্ত অর্থ অথবা পৃষ্ঠপোষক অভাবে তাঁহাদের অমূল্য গুণসমূহ ক্ষুদ্র পল্লির ভিতরেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে।

তথ্যসূত্র

১ গৌরীনাথের বাসস্থান নলচিড়া গ্রামে বলিয়া পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত বাসস্থান উজিরপুরে , মধ্যে মধ্যে তিনি নলচিড়ায় আসিয়া অবস্থান করিতেন।

২ বগুড়া জেলার সেরপুর নিবাসী জমিদার বেনওয়ারি লাল চৌধুরির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

৩ ইনি বর্তমানে কলিকাতার Sen & Sen নামক প্রসিদ্ধ দোকানের ও Sen & Pandit নামক Importing Agencyর একমাত্র পরিচালক।

৪. ব্যোম ব্যোম সমুদ্র চন্দ্র গণিতে শাকে গতে হায়ণে।
সানন্দো হরকৃষ্ণরায় তনয়ো হর্ম্যাংমৃদানির্মমে।।
দুর্গায়া ভবদুঃখসাগরতরেস্তুতঃ প্রীতয়ে যত্নতঃ।
সেন শ্রীলমনোহরো হরমনোরামাপদার্চাশয়ঃ।

৫ নক্ষত্রেশ গুণাচলক্ষিতি মিতে শাকে গতে হায়ণে।
স্বর্গার্থংজনকানুজস্য শিবচন্দ্রস্যানুতস্যা** ।।
শ্রীকৃষ্ণাত্মজকৃষ্ণকিঙ্কর সুতঃ পদ্মাবতী দৈবতঃ।
প্রাসাদং ** ণ সেনকমলাকান্ত ** নির্মমে।।

৬ গ্রন্থকার জাতিতত্ত্ব-বারিধি-প্রণেতার অনুবর্তী হইয়া পূর্বে ইহাকে চক্রপাণিদত্তের সময়কালীন লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ ইনি তাঁহার বহুপূর্বে সম্ভবত ৮ম শতাব্দীরও পূর্বে বর্তমান ছিলেন।

"Madhavakara in his Nidana quotes bodi from the Uttaratantra, and as the Nidana was one of the medical works which were translated for the Caliphs of Bagdad, it can safely be placed in the 8th century at the latest" Page, XXIX P. C Ray's Hindu Chemistry Vol I.

সম্পূর্ণ।

BIBLIOGRAPHY

English Books

1. Ain-i-Akbari—translated by Blochmann.
2. Ain-i-Akbari—translated by Gladwin.
3. Ain-i-Akbari—translated by Jarret.
4. Ancient India—R. C. Dutta.
5. Asiatic Researches.
6. Bakarganj—H. Beveridge.
7. Bengal, History of —Lethbridge.
8. Bengal, History of —Stewart.
9. Bengal, Journal of the Asiatic Society of.
10. Bengal, Statistical Account of —Sir W. Hunter.
11. Calcutta Review.
12. Dacca, Topography of —Taylor.
13. Eastern Bengal, Notes on the Races, Cutom, Trades of —Dr. Wise.
14. Education Gazette.
15. Encyclopedia Britanica.
16. Essay on Lord Clive—Macaulay.
17. Essay on Female Emancipation—Early.
18. Hindu Chemistry—P.C Roy.
19. Hindusthan, Reflections on the Governnment of —Scrafton.
20. India, Early Travellers in.
21. India History of —Abdul Karim.
22. India History of —Elphinstone
23. India Travels in—Bernier.
24. Indo-Aryans—Dr. Rajendra Lal Mitra.
25. Industan—Orme.
26. Report—Cardew.
27. Riyazu-s-Salatin.
28. Siyar-ul-Mutaakhirin.
29. Tabakat-i-Nasiri—Translated by Raverty.

Bengali Books

১। কৃষ্ণচরিত্র (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

২। গোষ্ঠীকথা (নুলো পঞ্চানন)।

৩। গৌড়ে ব্রাহ্মণ (মহিমচন্দ্র মজুমদার)।

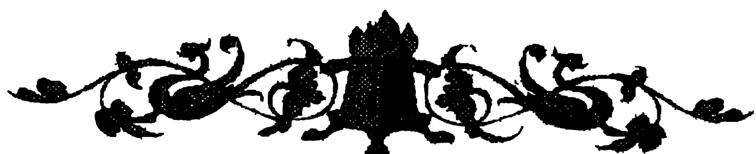
৫। জাতিতত্ত্ব বারিধি (উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন)।

৬। ঢাকের (বৈদ্যকুল পঞ্জিকা)।

৭। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (চণ্ডীচরণ সেন)।
৮। নবাবী আমল (কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়)।
৯। পরিব্রাজক প্রণীত ভারত ভ্রমণ।
১০। প্রকৃতিবাদ অভিধান।
১১। প্রতাপ আদিত্য (পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী)।
১২। প্রদীপ (মাসিকপত্র)।
১৩। প্রাকৃতিক ভূগোল (রাজেন্দ্রলাল মিত্র)।
১৪। বঙ্গদর্শন (মাসিকপত্র)।
১৫। বাকরগঞ্জের ইতিহাস (খোসালচন্দ্র রায়)।
১৬। বাংলার ইতিহাস (রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)।
১৭। বিকাশ (পত্রিকা)।
১৮। মনসামঙ্গল (বিজয়গুপ্ত)।
১৯। মনসার ভাসান (কানাহরি দত্ত)।
২০। মায়া তিমির চন্দ্রিকা (লালা রামগতি রায়)।
২১। বিশ্বকোষ (প্রাচ্যাবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু)।
২২। সম্বন্ধনির্ণয় (পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি)।
২৩। সাহিত্য (মাসিকপত্র)।

Sanskrit Books

১। অমরকোষ।
২। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষ সূক্ত।
৩। কণ্ঠহার।
৪। কায়স্থ কুলদীপিকা প্রভৃতি।
৫। কালিকাপুরাণ।
৬। গরুড়পুরাণ।
৭। চক্রদত্ত।
৮। চন্দ্রপ্রভা (ভরতমল্লিক)।
৯। দানসাগর (বল্লালসেন)।
১০। দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃত্তি।
১১। দেবীপুরাণ।
১২। নিদান (মাধবকর)।
১৩। পরাশর সংহিতা।
১৪। পীঠমালা।
১৫। ভবিষ্যপুরাণ।
১৬। মনুসংহিতা।
১৭। মহাভারত (ব্যাসদেব)।
১৮। মিশ্রীগ্রন্থ।
১৯। রঘুবংশ (কালিদাস)।
২০। রত্নপ্রভা (ভরতমল্লিক)।
২১। রামায়ণ (বাল্মীকি)।
২২। লঘুভারত।
২৩। বল্লালচরিত (আনন্দভট্ট)।
২৪। বাচস্পত্যাভিধান।
২৫। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলপঞ্জী।
২৬। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রম্।
২৭। শব্দকল্পদ্রুম।
২৮। শিশুপালবধম্ (মাঘ)।
২৯। সংগ্রহতত্ত্ব চন্দ্রিকা (শিবদাস সেন)।
৩০। হরিমিশ্রের কারিকা।



বরিশালের বিবরণ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত





বরিশালের বিবরণ

নওয়া ভাঙ্গা নদী

৬ ফাল্গুন (১২৬১) শনিবার প্রাতে আমরা এই ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম করত পদ্মায় প্রবেশপূর্বক কিছুকাল পরেই বরিশাল জেলা স্পর্শ করিলাম। এই বরিশাল অতি বিশাল। এমন দস্যুভয় আর কুত্রাপি নাই। লাঠালাঠি কাটাকাটি নিয়তই হইতেছে। নৌকারোহী জনসমূহের রজনীতে নিদ্রা হইবার বিষয় কি। সমস্ত রাত্রি ত্রাহি ত্রাহি করিয়া জাগরণ করিতে হয়। নিদ্রা যাইলে অথবা কিঞ্চিন্মাত্র অসাবধান হইলে তৎক্ষণাৎ অমনি দুরাত্মারা নৌকার ভিতর প্রবেশপূর্বক সর্বস্ব হরণ করিয়া প্রস্থান করে। ঝাঁপ কাটিয়া নৌকায় আসিয়া খোলে ঢুকিয়া নিচের দ্রব্যাদি ও উপর হইতে উপরের জিনিসপত্র গ্রহণ করে। নৌকা চালাইয়া স্ব স্ব কার্য সাধন করিতে থাকে। ইহারদিগের হস্তে কিছুতেই নিস্তার নাই। দড়ি, কাছি, দাঁড়, বাঁশ যাহা পায় তাহাই চুরি করে। এ পথে বোম্বেটিয়া ও ছিঁচকে চোর দুই আছে। এখানকার স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই অধিক আশঙ্কা। আমরা ভাবতেই নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। দিবারাত্রি বসিয়া সতর্ক থাকিয়া ভয়ে ভয়ে কাল হরণ করিতেছি।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ পূর্বে নওয়াভাঙ্গা নদী বাহিয়া মান্যাগ্রগণ্য শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারি নাজিরপুর পরগনার অধিকার মধ্যে উপস্থিত হইলাম। এখানকার নদীতীরস্থ ভূমি অতি উর্বরা। সুপারি, নারিকেল, কাঁঠাল, আম্র, তাল, খেজুর, বাঁশ, রম্ভা, শিমুল, কুল, তেঁতুলাদি বহুবিধ ফলকর বৃক্ষ দৃষ্ট হইল।

মটর, মশুরি, খেঁসারি, মুগ, কলাই, সর্ষা, অড়হর প্রভৃতি অনেক প্রকার শস্য জন্মে। ধান্য অন্যান্য ফসল হইতে অধিক উৎপন্ন হয়, গৃহস্থের গৃহে ও ক্ষেতে তরিতরকারি পরিমিত রূপ জন্মিয়া থাকে। মৎস্য বিস্তর, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি সুলভ বটে। নদীতটে ইতর লোকের বসতিই অধিক, ভদ্র লোকেরা কিঞ্চিৎ দূরে বাস করেন। বনশূকর ও বনমহিষে সর্বদাই দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। এই স্থল হইতে নাজিরপুরের সদর কাছারি এক ভাঁটার পথ, কিন্তু ইদিলপুরের কাছারি অতি নিকট, একে ভয়ঙ্করী, তাহাতে অন্ধকারময়ী। উভয় কাছারি বামভাগে রাখিয়া বরিশালাভিমুখে রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে যাত্রা করিলাম।

বরিশাল। ৭ ফাল্গুন ১২৬৯

অদ্য পূর্বাহ্ন বেলা ৯ ঘণ্টার সময়ে আমরা বরিশালে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানের শোভা অতি সুন্দর, জল উত্তম নহে, নদী অতি প্রবল, জলের উপর হইতে শহরটি দেখিলে নয়ন প্রফুল্ল

হইতে থাকে। এখানে খাদ্য সুখের কথা বর্ণনা করা যায় না। ফল মূল দধি দুগ্ধ ঘৃত ক্ষীর মৎস্য মাংস তরিতরকারি চাউল ডাউল মিষ্টান্ন চিনি, গুড় তেল লবণ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি সকল সস্তা। নারিকেল অনেক। এখানকার মত উত্তম চাউল বোধ করি বঙ্গদেশের আর কুত্রাপি নাই। বাণিজ্যের পক্ষে এই স্থান অতি প্রধান স্থান, বাণিজ্যে দ্রব্য পরিপূরিত নৌকার আমদানি রপ্তানি কত হয় তাহারি সংখ্যা হয় না, বাষ্পীয় জাহাজ এখানে অনায়াসেই আসিয়া থাকে। এ পর্যন্ত আমরা স্থলে উঠি নাই, জলেই রহিয়াছি, এ কারণ অদ্য এই পত্রে বিস্তারিত লিখিতে পারিলাম না।

বরিশাল। ১৫ ফাল্গুন ১২৬১

ইংরাজি ১৮০৩ সালে বাকরগঞ্জ জেলা স্থাপিত হয়, তৎকালে বরিশাল অঞ্চলে স্থলে ও জলে দস্যুভয়ের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তন্নিবারণ নিমিত্ত ১৮১১ সালে এই জেলা বাকরগঞ্জ হইতে উঠিয়া বরিশাল নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তদবধি এ পর্যন্ত এই স্থানেই এই জেলার সমুদয় কার্য নিষ্পাদিত হইতেছে, এই ক্ষণে বাকরগঞ্জ নগরের চিহ্নমাত্র নাই, ঐ স্থল পরগনা বুজর গোমেদপুরের অন্তর্গত কলিকাতা হইতে ৬০ ক্রোশ দূর হইবে, এখানে যৎকালে জেলা ছিল তৎকালে বহু সংখ্যক খ্রিস্টান আসিয়া বাস করে, তাহারা বহু পরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া অদ্যাবধি তথায় অবস্থান করিতেছে।

জেলার সীমা

দক্ষিণ সীমা—মহা সমুদ্র।

উত্তর সীমা—আঁড়িয়ল খাঁ নদ ও ঢাকা প্রদেশ।

পশ্চিম সীমা—চিথলমারি, যশোহরের অন্তঃপাতি মধুমতী নদী।

পূর্ব সীমা—মেঘনা নদী, ত্রিপুরা ও ভুলুয়া প্রদেশ।

এই জেলা উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্যে ৫৬ ক্রোশ এবং পূর্বে পশ্চিমে প্রস্থে ৩৬ ক্রোশ হইবেক।

প্রজা সংখ্যা

এই জেলায় অন্যূন দশ লক্ষ মনুষ্য আছে। তন্মধ্যে দশ আনা হিন্দু এবং ছয় আনা মুসলমান। খ্রিস্টান যাহা আছে তাহা গণনার মধ্যেই নহে, এক পাই হইবে না।

পরগনা এবং তাহার অধিকারীদিগের নাম ও যে যে পরগনায় যত প্রধান প্রধান গ্রাম আছে তদ্বিশেষ।—

১। পরগনা—চন্দ্রদ্বীপ।

জমিদার—রাজবল্লভ রায়।

এই পরগনায় বরিশাল, মাধবপাশা, কাশীপুর, নাখুটিয়া, গাবা, রহমতপুর ; বানরিপাড়া এবং বগরমহল এই কয়েকটি ভদ্র গ্রাম আছে।

২। তপ্পে বীরমোহন।

জমিদার—রামরত্ন রায় প্রভৃতি।

এই পরগনায় মাদারিপুর, মাজিপাড়া, গোপালপুর এই কয়েকটি ভদ্র গ্রাম আছে।

৩। পরগনা—বাঙ্গরোড়া।

জমিদার—মেং ব্রৌণ সাহেব প্রভৃতি।

ভদ্র গ্রাম—গৈলা, ফুলশ্রী, চন্দ্রহার, শ্লোক, বাটাযোড়, বারতি, হবিবপুর।

৪। পরগনা—ফতেজঙ্গপুর।

জমিদার—হরিনাথ রায় চৌধুরি প্রভৃতি।

ভদ্র গ্রাম—খেলে, ফতেপুর, গোয়ালা, আম গাঁ ও বাজিতপুর।

৫। পরগনা—জাহাপুর।
জমিদার—ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরি প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—মুলদি
৬। পরগনা—বীরমোহন।
জমিদার—রামরত্ন রায় প্রভৃতি।
৭। পরগনা—আজামপুর।
জমিদার—মনোহর চৌধুরি প্রভৃতি।
৮। পরগনা—বাহাদুবপুর।
জমিদার—ওয়াকিন, গ্রিনর, নিকস্‌ল, পোগস।
ভদ্র গ্রাম—কোকিলে।
৯। পরগনা—বিক্রমপুব (কিয়দংশ)।
জমিদার—রাজনগরের অনেকেই অংশি।
১০। পরগনা— বোজবগ উমেদপুর।
জমিদার—সরকার বাহাদুব।
ভদ্র গ্রাম—আঙ্গারিয়া, রঙ্গশ্রী, রুক্সী ও শিবপুব।
১১। পরগনা—দুর্গাপুর।
জমিদার—বাবু গোপাললাল ঠাকুর।
১২। পরগনা—গ্রেদবন্দর।
জমিদার—ব্রজমোহন সেন প্রভৃতি।
১৩। পরগনা—হবিবপুর।
জমিদার—লক্ষ্মীকান্ত ভুঁএঃ প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—মাইটভাঙ্গা, শাঁকাবি কাটি।

সংবাদ প্রভাকর ।। ১২ চৈত্র ১২৬১

১৪। পরগনা—হাবেলি মিনিগঞ্জ।
জমিদার—খাজে আবদুল গণি।
ভদ্র গ্রাম—পোনাবেলে, সৈদপুর ও বারুইকবণ।
১৫। পরগনা—হাবেলি।
জমিদার—দুর্গাগতি রায় প্রভৃতি।
১৬। পরগনা—ইদ্রাকপুর।
জমিদার—কুমিরুদ্দিন চৌধুরি প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—সরিকেল, ঘটেশ্বর ও আগরপুর।
১৭। পরগনা—জালালপুর।
জমিদার—গোলাম মর্তজা প্রভৃতি।
১৮। পরগনা—খাঞ্জা বাহাদুর নগর।
ভদ্র গ্রাম—বাহাদুরপুর।
১৯। পবগনা—তরফ। কলমিরচর।
জমিদার—গোলোকনাথ ঘোষ প্রভৃতি।
২০। পরগনা—কোটালিপাড়া।
জমিদার—রাজমোহন বায় প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—মদনপাড়, উনিশা, কাস্যবপাড়া, গচাপাড়া ও ঘাঘব।
এই ঘাঘরে এক মেলা হইয়া থাকে, তথায় বহু লোকেব সমাগম হয়।

২১। পরগনা—লক্ষ্মীদিয়া।
জমিদার—নওরাজা জমাদার।
২২। পরগনা—মান্দারিপুর।
জমিদার—গোবিন্দ পাল প্রভৃতি।
২৩। পরগনা—ময়েজঙ্গি।
২৪। পরগনা—মুরসুদ, কোতালি জায়গির।
জমিদার—গোপাললাল ঠাকুর।
২৫। পরগনা—নাজিরপুর।
জমিদার—গোপাললাল ঠাকুর।
ভদ্র গ্রাম—সাফিপুর।
২৬। পরগনা—উত্তর সাহাবাজপুর।
ভদ্র গ্রাম—সোমসাবাদ ও গঙ্গাপুর।
২৭। পরগনা—আরঙ্গপুর।
জমিদার—কালীপ্রসাদ রায়।
ভদ্র গ্রাম—কসলকাঠি ও বালিগ্রাম।
২৮। পরগনা—কাদারাবাদ।
জমিদার—কালীপ্রসাদ রায়।
ভদ্র গ্রাম—কসলকাঠি ও বালিগ্রাম।
২৯। পরগনা—কাশিমনগর।
জমিদার—রাধামাধব রায় প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—নৌলাবাগী।
৩০। পরগনা—কাসিমপুর, সেলাপটি।
জমিদার—মহিমাচন্দ্র রায় প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—পাঙ্গাশিয়া।
৩১। পরগনা—কাসিমপুর—তেলিহাটি।
৩২। পরগনা—রাজনগর কিয়দংশ।
৩৩। পরগনা—রামনগর।
জমিদার—ব্রজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।
৩৪। পরগনা—দোদংনোখানম তালুক।
৩৫ পরগনা—রসুলপুর।
জমিদার—করিমুদ্দিন চৌধুরি প্রভৃতি।
৩৬। পরগনা—রতনদি, কালিকাপুর।
জমিদার—বিধুচন্দ্র রায়।
ভদ্র গ্রাম—মহিষে, গাভরিয়া ও উজিরপুর।
৩৭। পরগনা—শাহাবাদপুর।
জমিদার—দুর্গাগতি রায় প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—সিদ্ধকাটি, ফয়রা ও মানপাশা।
৩৮। পরগনা—শাহাপুর।
জমিদার—রামনারায়ণ রায় প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—ওলপুর, দুর্গাপুর ও রাজগঞ্জ।

৩৯। পরগনা—সাইস্তাবাদ।
জমিদার—মীর তোজমল আলি প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—সাইস্তাবাদ ও ফুলতলা।
৪০। পরগনা—সাইস্তানগর।
জমিদার—আরমান আলি।
ভদ্র গ্রাম—গারুলিয়া।
৪১। পরগনা—তকিপুর কালা।
জমিদার—আরমান আলি.
৪২। পরগনা—সুলতানাবাদ।
জমিদার—আবদুল্লা চৌধুরি প্রভৃতি।
৪৩। পরগনা—শ্রীরামপুর।
জমিদার—এজামেহেদি।
ভদ্র গ্রাম—শ্রীরামপুর।
৪৪। পরগনা—সৈয়দপুর।
জমিদার—লালা মিত্রজিৎ সিংহ।
ভদ্র গ্রাম—আমুয়া, চেঁছাড়ি ও কানুদামকাটি।
৪৫। পরগনা—আত্রপুর।
জমিদার—উমেশচন্দ্র রায় চৌধুরি।
৪৬। পরগনা—সলিমাবাদ।
জমিদার—রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর।
ভদ্র গ্রাম—রায়েরকাঠি, বনগ্রাম, কীর্তিপাশা, ঝালকাটি, মহারাজগঞ্জ ও সূতালুটি।

সংবাদ প্রভাকর।। ১৪ চৈত্র ১২৬১

৪৭। পরগনা—তেলিহাট মহব্বতপুর।
জমিদার—রামরত্ন রায়।
৪৮। পরগনা—আমিরাবাদ।
জমিদার—মৌলবি সয়বজ্জমা।
৪৯। পরগনা—ইদিলপুর।
ভদ্র গ্রাম—ইদিলপুর, হাটুরে, নলমুড়ি বুড়ির হাট ও ভয়েরা।
৫০। পরগনা—গুণানন্দী।
জমিদার—একজন ফিরিঙ্গি।
৫১। পরগনা—দক্ষিণ সাহাবাদপুর।
ভদ্র গ্রাম—নাগদি।
৫২। পরগনা—মুজরদি।

এই জেলায় শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয়ের "ইদিলপুর" পরগনা সর্বাপেক্ষা প্রধান, কারণ ইহার সদর মালগুজারি ও উৎপন্ন সকল হইতেই অধিক। এই জমিদারির অবস্থা আমরা শ্রবণ ও দর্শন করিলাম, ইহাতে ঠাকুরবাবু যৎকিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে অনায়াসেই বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইতে পারে সে পক্ষে কোন সন্দেহই নাই। পতিত জঙ্গল ভূমি হয় বিলি করিয়া দিন, নয় খাসে আবাদ করুন। এতদ্রূপ চিরলভ্যকর ব্যাপারে কি জন্য তাচ্ছিল্য করেন বলিতে পারি না।

এই ইদিলপুর পরগনার নীচেই শ্রীযুক্ত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের সলিমাবাদ পরগনা।

বরিশালে ঘোষাল বাহাদুরের কাছারি বাটি প্রভৃতি কয়েকটা উত্তম বাটি আছে, তদ্ভিন্ন গুরুধামের শোভা অতি মনোহর। ঝালকাটি নামক স্থানে মহারাজগঞ্জ নামক এক নূতন গঞ্জ করিয়াছেন, এই গঞ্জ এই ক্ষণে জেলার মধ্যেই প্রধান গঞ্জ রূপে গণ্য হইতেছে।

মুন্সেফ

এই জেলায় সদর মুন্সেফ সদর আমিন ব্যতীত অপর পাঁচ জন মুন্সেফ আছে। যথা—

১। চৌকি—মেহেন্দিগঞ্জ।

মুন্সেফ—মৌলবি মফিজুদ্দিন মহম্মদ। প্রথম শ্রেণী।

২। চৌকি—কাউখালি।

মুন্সেফ—বাবু মধুসূদন ঘোষ। ঐ

৩। চৌকি—বহুফল।

মুন্সেফ—বাবু ব্রজমোহন দত্ত।

৪। চৌকি—মাদারিপুর।

মুন্সেফ—বাবু বিশ্বেশ্বর সেন।

৫। চৌকি—কোটেহাট।

মুন্সেফ—বাবু গৌরহরি বসু।

থানা

বাকরগঞ্জ জেলায় ১৩ থানা ও ৯ ফাঁড়ি। যথা—

১। থানা—নিজ বরিশাল। সদর কোতোয়ালি।

এই থানায় ১৭৫ চৌকিদার। ১৮ জন বরকন্দাজ।

২। থানা—ব্রজাগঞ্জ।

এই থানার অধীনে ২৯৮ চৌকিদার। ১৪ জন বরকন্দাজ।

৩। থানা—মেহেন্দিগঞ্জ।

এই থানার অধীনে ১৬৭ চৌকিদার। ১৪ জন বরকন্দাজ।

৪। থানা—খলিসাখালি।

এই থানার অধীনে ১৫৯ চৌকিদার। ১০ জন বরকন্দাজ।

৫। থানা—বহুফল।

এই থানার অধীনে ২৩২ চৌকিদার। ১০ জন বরকন্দাজ।

৬। থানা—আঞ্জারিয়া।

এই থানার অধীনে ৩০৮ চৌকিদার। ১৫ জন বরকন্দাজ।

৭। থানা—নলছিটি।

এই থানার অধীনে ২৮৫ চৌকিদার। ১৫ জন বরকন্দাজ।

৮। থানা—কচুয়া।

এই থানার অধীনে ৯৮ চৌকিদার। ৮ জন বরকন্দাজ।

৯। থানা—কেঁওয়াড়ি।

এই থানার অধীনে ১৩৯ চৌকিদার। ১৩ জন বরকন্দাজ।

১০। থানা—কোটালিপাড়া।

এই থানার অধীনে ২১২ চৌকিদার। ১০ জন বরকন্দাজ।

১১। থানা—গৌরনদী।

এই থানার অধীনে ২৬৭ চৌকিদার। ১৪ জন বরকন্দাজ।

১২। থানা—বুড়ির হাট।
এই থানার অধীনে ২৩৮ চৌকিদার। ৭ জন বরকন্দাজ।
১৩। থানা—টগরাপুর।
এই থানার অধীনে ১৩৯ চৌকিদার। ১২ জন বরকন্দাজ।

ফাঁড়ি

১। ফাঁড়ি—গঙ্গাপুর।
এই ফাঁড়িতে ৫৪ চৌকিদার। ১ জন বরকন্দাজ।
২। ফাঁড়ি—কোকাইনগর।
এই ফাঁড়িতে ৩৩ জন চৌকিদার। ২ জন বরকন্দাজ।
৩। ফাঁড়ি—শ্রীরামপুর।
এই ফাঁড়িতে ৪৪ জন চৌকিদার। ২ জন বরকন্দাজ।
৪। ফাঁড়ি—রাজাপুর।
এই ফাঁড়িতে ৯৩ জন চৌকিদার। ৪ জন বরকন্দাজ।
৫। ফাঁড়ি—ঝালকাঠি।
এই ফাঁড়িতে ২৭ জন চৌকিদার। ৩ জন বরকন্দাজ।
৬। ফাঁড়ি—বাজের।
এই ফাঁড়িতে ৯২ জন চৌকিদার। ২ জন বরকন্দাজ।
৭। ফাঁড়ি—আগরপুর।
এই ফাঁড়িতে ৪৭ জন চৌকিদার। ৩ জন বরকন্দাজ।
৮। ফাঁড়ি—কাউখালি।
এই ফাঁড়িতে ৪৭ জন চৌকিদার। ৪ জন বরকন্দাজ।
৯। ফাঁড়ি—ভগীরথপুর।
এই ফাঁড়িতে ৭৯ জন চৌকিদার। ৪ জন বরকন্দাজ।

নিমক

বাকরগঞ্জে নিমক চৌকির এক সুপ্রেন্টেণ্ডেটি অফিস আছে। সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধীন দুই জন প্রথম শ্রেণিযুক্ত সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট দারোগা ও দুই জন দ্বিতীয় শ্রেণির সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট দারোগা নিয়োজিত আছেন। তন্মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণির ও একজন দ্বিতীয় শ্রেণির দারোগা চট্টগ্রাম জেলায় থাকিয়া কার্য নির্বাহ করেন, তাঁহারা এই স্থান হইতে বেতন পাইয়া থাকেন।

সংবাদ প্রভাকর। ১৫ চৈত্র ১২৬১

এতদ্ভিন্ন ৮টা চৌকি, ৩টা ফাঁড়ি এবং ১টা কুৎচৌকির ঘাট আছে। যথা—

চৌকি—নলছিটি	...	১
চৌকি—বাকরগঞ্জ	...	১
চৌকি—গৌরনদী	...	১
চৌকি—ধূলে	...	১
চৌকি—চরখালি	...	১
চৌকি—কাউখালি	...	১
চৌকি—পাটুয়া	...	১
চৌকি— বোকাইনগর	...	১
		৮

ফাঁড়ি—নেয়ামত	...	১
ফাঁড়ি—বঙ্গাবাড়ি	...	১
ফাঁড়ি—বলুফল	...	১
		৩
কুৎচৌকি—ঝালকাঠি	...	১২

এ জেলায় আবকারি ডিবিজনফাঁড়ি ৪টা। যথা—

বরিশাল ডিবিজান	...	১
সুন্দরদী ডিবিজান	...	১
কাউখালি ডিবিজান	...	১
দামপাড়া ডিবিজান	...	১
		৪

নানা বিষয়ে গবর্নমেণ্টের আয়। যথা—

গর বন্দবস্তী খাস মহালের বার্ষিক উৎপন্ন কোং	৪৩৩৭৫ ৮
দাইনি মকর বার্ষিক উৎপন্ন কোং	১০৩৭১৬ ২১
নিমক মহলের বার্ষিক উৎপন্ন কোং	২৩৩৯৵১২
আবকারির বার্ষিক উৎপন্ন কোং	৫০৮৮৯৷৵৩
ষ্টাম্প কাগজের বার্ষিক উৎপন্ন কোং	৮১০২০৷৷৵১১
ফেরি ফণ্ডের বার্ষিক উৎপন্ন কোং	৩৭৫
ট্যাক্সের বার্ষিক উৎপন্ন কোং	১৭২
ডাক ঘরের বার্ষিক উৎপন্ন কোং	৩৯৭৮৷৷৬
পুলিসের ডাকের ব্যয় নির্বাহ জমিদারদিগের নিকট হইতে বার্ষিক উৎপন্ন কোং	৪৩৩৭ টাকা

কর্মালয় বিশেষের বার্ষিক ব্যয়—

নিমক মহলের ব্যয় কোং	১৮৯৫১৷৵৫
আবকারির বিশেষের বার্ষিক কোং	৯৪৯১৷৵৭
ষ্টাম্প কাগজের বিশেষের বার্ষিক কোং	৮৩৭০৷৷৵৯
ফেরি ফণ্ডের বিশেষের বার্ষিক কোং	১২০
ট্যাক্সের বিশেষের বার্ষিক কোং	৯৩৬
ডাকঘরের বিশেষের বার্ষিক কোং	১৬৬০৷৵০
পুলিস সংক্রান্ত ডাকের বিশেষের বার্ষিক কোং	৩৮৭৭ টাকা

কারাগার

এখানকার কারাগারে অনেক বন্দি আছে। তাহার মধ্যে ভদ্র লোকের সংখ্যা নিতান্ত ন্যূন নহে। হত্যা, ডাকাতি, চুরি ও দাঙ্গা করিয়া অনেকেই কারাবদ্ধ হয়।

জেলখানায় কয়েদিরা ছালা, চিক, চৌকি, মোড়া, ইট ও পেঁটরা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। কয়েদির সংখ্যা ৬৮০ জন।

জেল আমলা

জেল দারোগা	...	১
জমাদার	...	২
দফাদার	...	৮
কামজারি বরকন্দাজ এবং আর আর পেয়াদা	...	১৪৫

সংবাদ প্রভাকর ॥ ১৬ চৈত্র ১২৬১

নারিকেল যথেষ্ট, কিন্তু তৈল ভালরূপে প্রস্তুত করিতে জানে না, ঐ বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলে কত লাভের বিষয় হয় যাহা কল্পনাতীত।

শিল্পকার্য

এখানে কোনরূপ শিল্পকর্ম বিখ্যাত নহে, যে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা যৎসামান্য, কোনমতেই প্রশংসা করিতে পারা যায় না। পাটি যাহা প্রস্তুত করে তাহা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি সাঁতরের তুল্য নহে। ঘটেশ্বরে এক প্রকার পান্সি নৌকা প্রস্তুত হয় তাহা দ্রুতগামিনী বটে, টুরকি ও কোটালিপাড়াতে নৌকা অনেক প্রকার নির্মাণ করে, কিন্তু তাহা ঘটেশ্বরের সমান উৎকৃষ্ট নহে। নানা প্রকার মোড়া ও সাজি প্রস্তুত হয়। এখানে কাঁসারিরা বড় বড পাতলা ঘটি প্রস্তুত করে, তাহা ব্যবহার যোগ্য বটে। প্রতিমার গঠন ভাল হয় না, চিত্রকরেরাও উপযুক্ত নহে। স্ত্রীলোকেরা নারিকেলের চিঁড়া, জিরা, ও পুষ্পাদি যাহা নির্মিত করে, তাহা অতি সুদৃশ্য।

প্রধান প্রধান বন্দর

নলছিটি, মহারাজগঞ্জ, রাজগঞ্জ কালেয়া, মাদারিপুর, টরকি, কানুদাসকাটি, সরিকেল, বাকরগঞ্জ, বরিশাল, মূলদি, ভয়রা এবং সূতালুড়ি।

এই সকল বন্দরের মধ্যে নলছিটি বন্দর অতি প্রধান ও প্রাচীন, কিন্তু সম্প্রতি গুরুধামের নীচে রাজা বাহাদুরেরা মহারাজগঞ্জ নামে নূতন যে এক বন্দর করিয়াছেন তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তথায় পাকাঘর অনেক।

গুরুধাম

গুরুধাম অট্টালিকাময়। নদীতীরে বাঁধাঘাট কয়েকটা ও রম্য উদ্যান সকল দর্শকদিগের নয়ন ফুল্লকর হইয়াছে। ঘোষাল বাহাদুরের গুরুধামের শোভা যদ্রূপ বরিশালের শোভা তদ্রূপ নহে। বিশেষত মহারাজগঞ্জ নামক মনোহর নূতন বন্দর স্থাপিত হওয়াতে এই স্থানের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি হইয়াছে।

চর

সরিকেল, কলকিনী, রামজানপুর, হেমামদ্দি, গাজিপুর, জালালপুর, লক্ষ্মীনারায়ণপুর, কদমতলি, রঘুনাথদি, বিশকাঁটালি, মুরদিয়া, কুমুরে, কলমি, রামহরি, দুর্গাপুর, কেওচর ও হোগলবুনে, এই কয়েকটা বিখ্যাত চর এই জেলায় আছে।

নদ-নদী

মেঘনা, বুড়িগঙ্গা, পদ্মা অথবা কীর্তিনাশা, বলেশ্বরী, দামোদর, ভৈরব, তেঁতুলে, রামনাবামনা, কচার্দন, কালীগঙ্গা, কেলেজিরার দল, বেনুয়ার দল এবং বরিশাল নদী, এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নদী ও খাল আছে, ও এই জেলাযুক্ত সুন্দরবনের মধ্যে ছোট বড় অনেক নদী নদ ও খাল দেখিতে পাওয়া যায়।

বিল

কোটালিপাড়ার বিল, এই বিল বিখ্যাত বিল। এতদ্ভিন্ন অবিখ্যাত অনেক বিল আছে।

দেবালয়

এই জেলায় প্রত্যেক গ্রামে মনসা দেবীর ও কালীর এক এক মন্দির আছে, দেশীয় লোকেরা এই দুই দেবীকে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করেন।

দেবতার নাম	ধাম
শ্যামরায়।	পানাবেলে।
বিরূপাক্ষ।	কাশীপুর।
মহামায়া	ঐ
মদনমোহন।	বরিশাল
জগন্নাথ।	ঐ
মনসা।	বগুড়া।
পাষাণময়ী কালী	বরিশাল
তালতলার কালী	ঐ
খালধারের কালী	ঐ
গাংধারের কালী	ঐ
জীবন সিংহ বাবুর কালী	ঐ

উৎসব

দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, কার্তিকপূজা, রাসযাত্রা, নবান্ন, সরস্বতীপূজা, বাসন্তী পূজা, দোলযাত্রা, চড়ক, রথযাত্রা, মনসাযাত্রা, ঝুলান যাত্রা, এবং জয়দুর্গা পূজা।

দুর্গাপ্রতিমার আশ্চর্য এই যে, দুর্গার বামভাগে গণেশ, দক্ষিণ ভাগে কার্তিক। ১৫ টাকা হইতে ৪০ টাকায় অনায়াসেই দুর্গোৎসব হইয়া থাকে! কোটালিপাড়া পরগনার মধ্যে এক প্রহরের পথের ভিতর ১০০০ দুর্গাপূজা হয়।

রাসযাত্রায় নাখটিয়ার রাজচন্দ্র রায়ের ভবনে অতি সমারোহ ও মেলা হয়, কয়েক দিবস অনেক দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, অন্যূন ২০০০০ লোকের জনতা নিয়তই হয়।

এদেশে হিন্দু, মোসলমান উভয়েই নবান্ন করেন। নবান্নে অত্যন্ত আমোদ হয়। নারিকেলের জলে চালের গুঁড়ি ও নারিকেল কোরা, মসলা ও গুড় মিশ্রিত করিয়া তাহারি ভুষ্টি নাশ করেন।

এখানে কেবল পূর্ণিমার দিবসেই দোল হয়, অষ্টাহ পূর্বে আবীর ও পিচকারির আমোদ চলিতে থাকে।

চড়কে অতিশয় ঘটা হয়, কিন্তু সংক্রান্তির দিবসে বিশেষ সমারোহ না হইয়া তৎপর দিবসেই হইয়া থাকে। এখানে তাহাকে "গোলুইয়া" কহে।

শ্রাবণী সংক্রান্তিতে মনসা যাত্রা হয়, ইহাতে আর যত জাঁক জমক না হউক, সমস্ত জেলা লইয়া ৪০০০ পাঁঠা বলিদান হইয়া থাকে। প্রতিমা গড়িয়া মনসাপূজা করে, রোগাদির প্রতিকারার্থ মনসাকেই মানসা করে।

রহমতপুরের চক্রবর্তীদিগের বাটিতেই হিন্দোলযাত্রার বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে।

জয়দুর্গাপূজার দিন নির্দিষ্ট নাই, যখন ইচ্ছা তখনি ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করে, প্রতিমা গড়ে না।

সংবাদ প্রভাকর ॥ ১৮ চৈত্র ১২৬১

পণ্ডিত ও পঞ্জিকা

এ জেলার মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ পরগনাতে অনগণ্য অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ও অধিক চতুষ্পাঠী। এই স্থল সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে এখানকার প্রধান স্থল। এখানে অদ্যাপি পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই পঞ্জিকা অতি প্রসিদ্ধ।

চিকিৎসা

এখানে পীড়া হইলে ঔষধ প্রয়োগ অধিক না করিয়া কেবল ঝাড়ান করে, ও স্বস্ত্যয়ন করে। রহমতপুর, চাঁদশি ও বারতি এই কয়েকস্থানে কয়েকজন বিখ্যাত বৈদ্য আছেন, তাঁহারা চিকিৎসায় অত্যন্ত নিপুণ।

নিজ বরিশাল। জেলা অথবা নগর

বরিশাল দৈর্ঘে দেড়ক্রোশ এবং প্রস্থে অর্ধ ক্রোশ মাত্র। ইহার উত্তর সীমা আমানতগঞ্জ। দক্ষিণ সীমা সাগরদি। পূর্ব সীমা মেঘনা নদীর শাখা বরিশাল নদী এবং পশ্চিম সীমা কাশীপুর। এখানে চির-নিবাসির সংখ্যা অত্যাল্প, বিদেশীয শুদ্ধ মনুষ্য গণনা করিলে দ্বাদশ সহস্র লোক হইবে।

পূর্বাপেক্ষা অধুনা নগরের শোভা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে, বন প্রায় শেষ হইয়াছে, ইষ্টক গৃহ অধিক নির্মিত হইতেছে, জল হইতে নগর দৃষ্টি কবিলে মনে আনন্দ জন্মে; পথ ঘাট নিতান্ত মন্দ নহে, নদীতে নৌকা অসংখ্য।

পুষ্করিণী অনেক আছে, কাছারিবাটি সমুদয় এক স্থানে হওয়াতে সকলের পক্ষে অত্যন্ত সুযোগ হইয়াছে, নগর মধ্যে কয়েকটা খাল ও সেতু আছে তাহা দৃশ্য সুখকর বটে।

এখানে প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক এই দুইটা গির্জা আছে।

নাগরীয় বাজার

চক বাজারের দক্ষিণের পুলের উপব সন্ধ্যাকালে বাজার বসিয়া থাকে, তথায় কেবল মণিহারি দ্রব্য ও পুস্তকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এ নগরে যে কয়েকটি বাজার আছে তাহার মধ্যে ঢাকাওয়াল পটি, চকবাজার, গিল সাহেবেব বাজার এবং নীলকণ্ঠ রায়ের হাট সর্বপ্রধান, প্রথমোক্ত দুই বাজারে বহুবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য এবং শেষোক্ত বাজারদ্বয়ে শুদ্ধ খাদ্যসামগ্রীই অধিক পাওযা যায়। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে সমারোহপূর্বক হাট হয়।

দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন

এখানে নির্জলা দুগ্ধ প্রায় পাওয়া যায় না, সকলি জল মিশ্রিত। জেলার ভদ্রলোকেরা মুসলমানের দধি ভক্ষণ করেন। মিষ্টান্ন সকল যবনে স্পর্শ করে, স্বচ্ছন্দেই তাহার আহার চলিয়া থাকে।

বাজারে মৎস্য অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ঢাকার ন্যায় সুলভ নহে।

সংবাদ প্রভাকর ।। ২১ চৈত্র ১২৬১

প্রকাশ্য ইষ্টকালয়

আদালত ও ফৌজদারি ১— একতালা।
কালেক্টরি ১— দুইতালা।

প্রধান সদর আমিনি	
এবং সদর আমিনি ও সরকিউট ঘর ১—	একতালা।
নিমক চৌকি—	একতালা।
জেল হসপিটাল—	একতালা।
স্কুল ঘর—	একতালা।
সাহেবদিগের গির্জা ঘর—	তিনতালা।
দাতব্য চিকিৎসালয় ১ —	একতালা।

জেলখানায় অনেক ঘর, তন্মধ্যে কয়েকটি একতালা, কয়েকটি দুইতালা।

বিশেষ সমাচার

এ জেলার সদর জমা প্রায় ১৬০০০০০ টাকা। মফস্বলের মুন্সেফ অবধি প্রধান সদর আমিন পর্যন্ত আনুমানিক ৩০০০ হাজার মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ফৌজদারি মোকদ্দমা কত তাহার সংখ্যাই হয় না, তাহার সাক্ষী ৬৮৭ ব্যক্তি কারাবদ্ধ আছে। ইংরাজি ১৮৫২ সালের ভাদ্র হইতে ৫৩ সালের ভাদ্রমাস পর্যন্ত ১৬ জন দোষির ফাঁসি হইয়াছে। সর্বদাই ফাঁসি হইতেছে, এত খুনাখুনি আর কুত্রাপি নাই। মানুষ সকল স্বভাবত অতি নিষ্ঠুর, সর্বস্ব নষ্ট হইলেও মোকদ্দমা করিতে ছাড়ে না, একারণ এখানকার আমলারা অতি সুখী। উকিলেরা সুবক্তা, মোক্তারেরা অতি চতুর।

জমিদারি

জমিদারি ১। তালুক ২। ওসত তালুক ৩। নমওসত তালুক ৪। নিমওসত তালুক ৫। হাওলা ৬। নিমহাওলা ৭। ওসত হাওলা ৮। নিমওসত হাওলা ৯। নিমহাওলা ১০। মিরাশ ১১। করশা ১২। জামিনী ১৩। আড়জামিনী ১৪। জেমা ১৫। খারিজ জমা ১৬। বারজমা ইত্যাদি।

এতদ্রূপ আধিক্য হওয়াতে প্রজারা বড় সুখী নহে। বন্দোবস্তের কালে অনেক পরগনার অনেকাংশ স্বতন্ত্র হওয়াতে খারিজ হইযাছে। জমিদারেরা ঐ সকল খণ্ড বিভাগের রাজস্ব আপনারা আদায় করিয়া সরকারি কর কালেক্টরিতে প্রদান করিয়া থাকেন।

জলবায়ু

এই জেলার জলবায়ু সর্বত্র সমান নহে। অধিকাংশ জলময় ও অরণ্যময় হওয়াতে বায়ু হিতকর হয় না। নদী-নদের জল লবণাবৃত, একাবণ সর্বদাই প্রজারা উৎকট রোগ ভোগ করে, জলদোষের পীড়া অনেকেরি আছে। বিশেযতঃ বর্ষাকালে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, শীতকালে তাদৃশ ভয় থাকে না।

সংবাদ প্রভাকর।। ২৩ চৈত্র ১২৬১

বর্ষা

এখানে বর্ষার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন এই কয়েক মাস ক্রমশই বৃষ্টি হয়। পরগনা বিশেযে নৌকা ভিন্ন এক স্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমনের উপায় থাকে না। ঐ সময় হিংস্র জন্তুর অত্যন্ত আশঙ্কা হয়। ভূমি ও বন সকল জলে প্লাবিত হওয়াতে ভুজঙ্গ গৃহস্থের গৃহ মধ্যে এবং ব্যাঘ্রাদি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করে।

জলপ্লাবন

বাংলা ১২২৯ অব্দে এদেশে গুরুতর বন্যা হয়, তাহাতে অধিকাংশ প্রজার মহানিষ্ট ঘটিয়াছিল ঘরদ্বারের চিহ্ন মাত্র ছিল না। অনুমান ৩৭০০০ মনুষ্য ও ৮৯০০০ সহস্র পশ্বাদির প্রাণ জলে নষ্ট হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন স্থলে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্রূপ দুর্দশাবশত এতদেশে এ পর্যন্ত আপনার পূর্বাবস্থা পরিপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

ক্ষত

জলদোষ ও আর আর পীড়া নিবারণ নিমিত্ত এখানকার লোকেরা জঙ্ঘার অর্ধ হস্ত নিম্নে ক্ষত করত তন্মধ্যে নিম্বকাষ্ঠ দিয়া পাট দ্বারা আবল করিয়া রাখে। ইহাকে শুদ্ধ ও গুল লওয়া কহে।

বসন্ত এবং ওলাউঠা। এখানে উক্ত দুই রোগের বড় প্রাদুর্ভাব নাই।

শীত-গ্রীষ্ম

এখানে শীত বড় অধিক হয় না, গ্রীষ্মের আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে দুই দিবস বৃষ্টি না হইলে অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়া থাকে, তাহা অসহ্য হইয়া উঠে।

ধাতু

এই জেলায় কস্মিন্ কালে কোন প্রকার ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

পশ্বাদি

নানা জাতীয় হরিণ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, নানা প্রকাল ব্যাঘ্র, বন্য মহিষ, বন্য শূকর ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীরা সুন্দরবনে ও অপর বনে বাস করে, কিন্তু ব্যাঘ্র, বরাহ ও মহিষ নিয়ত লোকালয়ের নিকটেই অবস্থান করিয়া থাকে। মহিষ এবং শূকরেরা ধান্যাদির প্রতি অতিশয় অত্যাচার করে, প্রাণভয়ে সর্বদা সাবধান থাকিতে হয়। বাঘ, মহিষ ও শূকরের ভয়ে রাত্রিতে বাহির হইবার বিষয় কি। গো, মেষ, অজা প্রভৃতি পাল্য পশু বিস্তর, কিন্তু চমৎকার এই যে, এ অঞ্চলে শুভ্র বর্ণের গাভি কিম্বা ষণ্ড কখনই দৃষ্ট হয় নাই, এবং অধিকাংশ ছাগ এক মুষ্ক বিশিষ্ট।

নানাপ্রকার ইতর প্রাণী

পশুর মধ্যে শৃগাল, পক্ষীর মধ্যে কাক, কীটের মধ্যে মাছি, মশা, পিপীলিকা, ছারপোকা, উই, আঁটলি, জোঁক, নানা জাতীয় সর্পই অনেক ও অত্যাচারী, বিশেযত পিপীড়ার যদ্রূপ প্রাদুর্ভাব তন্যায় আর কাহারো নহে।

জলচর

মৎস্য যথেষ্ট। কুম্ভীর ও কূর্মাদি অগণ্য এবং তাহারা সততই দৌরাত্ম্য করে। নদীবিশেষে কুম্ভীরের ভয়ে জলে পদার্পণ করা যায় না। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর সেই দেশ এই দেশ।

জাতি ও উপজীবিকা

এই জেলায় হিন্দু ও যবনে দশ লক্ষ মনুষ্য হইবে, তন্মধ্যে হিন্দু জাতির কার্যবিবরণ লিখিত হইল। ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই জমিদার, যাঁহারা অর্থহীন তাঁহারা যাজন ক্রিয়া করেন। এক ব্রাহ্মণেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও অপরাপর জাতির যজন যাজনাদি ক্রিয়া কাণ্ড সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অন্য দেশে মহাবিপ্র অর্থাৎ মড়ুই-পোড়া ব্রাহ্মণেরা পতিত, অস্পৃশ্য, এখানে তাঁহারা

ত্যাজ্য নহে। পুরোহিতেরাই স্ব স্ব যজমানের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মন্ত্র পাঠ করাইয়া থাকেন, তাহাতে পতিত হন না।

বৈদ্যের সংখ্যার অধিক, ইহারা জমিদারি রাখেন, বিষয়কর্ম ও চিকিৎসা করেন।

কায়স্থ জাতিতে অনেক প্রকার ব্যবসায় করেন। যথা চাষ করা, নৌকাবহা, দুগ্ধ বিক্রয়, চাউল, মহিষ ও পাঁঠা বিক্রি এবং পরিচারকতা প্রভৃতি করা।

কাসাঁরি জাতিরা স্বীয় ব্যবসায় করে।

গোপ জাতি কায়স্থের ন্যায় সকল কর্মই করে।

তিলি জাতি মুদির কার্য করে।

মালি জাতি স্বীয় ব্যবসায় করে।

কর্মকার স্বীয় ও স্বর্ণকাবের কর্ম করে।

বারুই	নিজ	কর্ম
কুমার	ঐ	ঐ
রজক	ঐ	ঐ
মুচি	ঐ	ঐ
নাপিত	ঐ	ঐ
পাটুনি	ঐ	ঐ

শুঁড়ি, দোকানদার, জমিদার, তালুকদার, মহাজন, প্রায় তাবতেই রায় পদাধিধারি।

ভুঁই মালি মেথরের কর্ম করে।

ব্যাবাজিয়া, অর্থাৎ বেদে। ইহারা নৌকাবাসী ও সাপ খেলায়।

জেলে। মৎস্য ধরে, নৌকা চালায়।

চণ্ডাল। ঘরামির কর্ম করে, ঝুড়ি বোনে, কৃষিকর্ম ও দুগ্ধ বিক্রয় করে, নৌকা বায়, চব আবাদ করে ও সূত্রধরের কর্ম করে।

মুসলমান

মুসলমান জাতি "শিয়া" ও "সুন্নি" দুই ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে সুন্নি ।৴১০ এবং সিয়া অর্ধ আনা মাত্র। সুন্নির মধ্যে অধিকাংশ আবার ফিরজি মতাক্রান্ত হইয়াছে। ঐ ফিরজি দলের ক্রমশই প্রাবল্য হইতেছে। ইহারা পৌত্তলিক নহে, অথচ মহরম করে না। ফিরজি দল অতিশয় অত্যাচারী। এখানকার মুসলমানেরা দুগ্ধ বিক্রয় করে, নৌকা চালায় গরু এবং ছাগলাদি বিক্রয় করে ও কৃষিকর্ম করে। জেলখানার ভিতরে কয়েদির মধ্যে যবনের সংখ্যাই অধিক দেখিলাম।

সংবাদ প্রভাকর ॥ ২৪ চৈত্র ১২৬১

নৌকা

এই বাকরগঞ্জ জেলার মধ্যে অনেকস্থানেই দৃষ্ট হইল স্ত্রীলোকেরা নৌকা চালনা করে, তাহারা উত্তমরূপে হাল ধরে, দাঁড় বহে, এবং গুণ টানিয়া থাকে। তরী সঞ্চালন ব্যাপারে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের তুল্য ক্ষমতা দর্শন করিলাম।

কাটাবৃক্ষের পূজা

উজিরপুরের কাটাবৃক্ষের তলে গিয়া অনেকেই ভক্তিপূর্বক পূজা প্রদান করে। এমত জনরব যে, কোন ব্যক্তি ঐ বৃক্ষকে অস্ত্রাঘাতে দুই খণ্ড করিয়াছিল, ঐ খণ্ডাংশ মৃত্তিকায় পতিত হইয়া পুনরায় আপনিই উঠিয়া পূর্বাংশের সহিত সংযুক্ত হইল, একারণে সকলে দেবতা বলিয়া তাহার পূজা করেন। বৈশাখের তৃতীয় দিবসে তথায় গুরুতর সমারোহে এক মেলা হইয়া থাকে।

আচার ব্যবহার

এ দেশের প্রায় বহু লোকের স্বভাব অতি উগ্র, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত; লোভে, দ্বেষ হিংসায় পরিপূর্ণ। তাহারদিগ্যে বিনয় করিলে আরও বিপরীত ঘটিয়া উঠে, কিন্তু বল প্রকাশ করিলে সহজেই আজ্ঞাধীন হয়। বিষয় বোধাংশে উত্তম গুণ আছে, কিন্তু আন্তরিক গুণ প্রায় নাই, কিঞ্চিন্মাত্র তালুক করিতে পারিলেই সকলে চৌধুরি হইয়া বসেন। চৌধুরি উপাধিই সম্ভ্রমের উপাধি। কোনখানে যাইতে হইলে বৃষ্টি হউক, রৌদ্র হউক না হউক, সকলেই ছাতাধারি সঙ্গে লইয়া যাইবেন। যাঁহারা সঙ্গতি-হীন তাঁহারা স্বহস্তে ছত্র ধরেন না। খরতর সূর্য কিরণে ও মুসলধারে বৃষ্টি পতনেও মাথায় বস্ত্রাচ্ছাদন করেন না, যেহেতু তাঁহাদের মানের হানি হয়। মান তাঁহাদের ভালুক জ্বরের ন্যায়, এককথায় হয়, এককথায় যায়।

তাবতেই ত্রিসন্ধ্যা করেন কিন্তু মলত্যাগান্তে বাম হস্তেই কাছা দিয়া থাকেন। এমত শুনিতে পাই যে মুসলমানের সহিত "শুকনা ডাবায়" অর্থাৎ শুকনা হুঁকায় তামাক চলিয়া থাকে। মুসলমানের পাতা দধি ভক্ষণ করেন। মুচিকে অপবিত্র না বলিয়া ঋষিজ্ঞানে গৃহে উঠিতে দেন।

ব্রাহ্মণেরা যে পর্যন্ত মন্ত্র গ্রহণ না করেন সে পর্যন্ত সকল দেবতার পূজা করিতে পারেন না। স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিলে সম্ভ্রমের লঘুতা হয়। অপিচ ভদ্র জাতি মাত্রেই পট্টবস্ত্র পরিয়া পূজা করেন। তাহা অতি মলিন, এক বস্ত্রে তিন চারি পুরুষের পূজা চলিয়া যায়। কিন্তু আকাচা ছাড়া কাপড়ে আহারাদি চলিয়া থাকে।

দেশীয় জমিদারগণের ব্যবহার

রায়চৌধুরী উপাধিবিশিষ্ট জমিদাররাই বড় জমিদার, যাঁহারা প্রজাপীড়নে পরম পটু তাঁহারাই প্রধান। স্বকার্য সাধনার্থ সকলি করিয়া থাকেন। প্রজারা প্রাণ ও মান ভয়ে উল্লিখিত জমিদার প্রভুপুঞ্জের শ্রীপাদ পদ্মে সর্বস্বই অর্পণ করে। গুণের মধ্যে এই যে, পরের অত্যাচার হইতে আপন প্রজাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহারা মদগর্বে গর্বিত, মোকদ্দমা পাইলে আর কিছুই চাহেন না। সৎকর্মে ব্যয় মাত্র নাই, মোকদ্দমায় সর্বনাশ হইলেও সর্বনাশ বোধ হয় না, আপনাপন গুরু পুরোহিতকে বিচার স্থলে আনাইয়া সাক্ষ্য প্রদান করান। যবন জমিদারেরা হিন্দু জমিদার অপেক্ষা অনেক প্রকৃষ্ট, তাঁহারা যদিও প্রজাপীড়ক বটেন, কিন্তু বিবেচনাপূর্বক মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হয়েন।

রন্ধন ভোজনের ধারা

রন্ধন ভোজনের প্রণালী অতি জঘন্য, সকল ব্যঞ্জনে মৎস্য দিয়া ঘণ্টবৎ পাক করেন। শোলমাছে মূলা সংযোগ করিয়া যে ঘণ্ট পাক হয় তাহাই অতি উপাদেয়, তাহাকে "হট্রল মূলা" কহেন। বিনা তৈলে মাছের ঝোল রান্ধিয়া সকলেই আহার করেন, তাহার নাম "মাছ সিদ্ধ"। তৈলে ভাজিয়া মৎস্য রান্ধিলে তাহাকে "মৎস্যের রসা" বলেন। মুসারি ও খোঁসারির ডাউল সকলেই আহার করেন, ইহার নাম "কলুই"। অন্য ডাল ব্যবহার করেন না, ডাল রন্ধনের প্রধান উপকরণ "মিডাকমাড় ও দুনিয়ার পাতা"। শেফালিকা পত্র দিয়া খেঁসারির ডাল রন্ধন হয়, তাহার নাম "ডাউলের হুকৎ"।

ছাগ ও কচ্ছপের মাংসে অর্ধ ভাগ নারিকেল কোরা প্রদান করেন, তাহাই সুস্বাদু বলিয়া আনন্দে আহার করেন। আসন ব্যতীত কোন ক্রমেই ভোজনে বসেন না, পায়েসের পর দধি খাইয়া থাকেন। অন্নব্যঞ্জনে যত তুষ্ট, লুচি মণ্ডায় তত নহে, দধি চিনি অধিক হইলেই সুখ্যাতি হয়। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "কেমন আবার হইল", তবে তখনি উত্তর করেন "না অইবে কিয়া, খুব দদি চিনি দেছে"। এক আনা দক্ষিণা পাইলে ব্রাহ্মণেরা স্বচ্ছন্দেই শূদ্রের বাটিতে আহার করেন। চিঁড়া, দধি,

গুড়, চিনি ও নারিকেল কোবা হইলেই সুন্দররূপে জলপান হয়, ৫০০ টাকায় ৫০০০ ব্রাহ্মণের তৃপ্তিপূর্বক আহার হইয়া থাকে।

সংবাদ প্রভাকর।। ২৫ চৈত্র ১২৬১

স্ত্রী-পুরুষের বেশভূষা

বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরি চুলের গুচ্ছা গুছাইয়া রাখেন ও মস্তকের মধ্য দিয়া সিঁথি কাটিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহারদিগের সৌন্দর্যের এক প্রধান অঙ্গ। অনেকেরই গলায় মাদুলি, হাতে কবজ, ওরূপ না করিলে জাতি রক্ষা হয় না। বাজুকে "কবজ" এবং মাদুলিকে "তাবিজ" কহে, ১২।১২।১৬ছড়ার কৃষ্ণবর্ণের ঘুন্সি চন্দ্রহারের ন্যায় পরিধান করেন। রৌপ্য নির্মিত গোট গলদেশে প্রদান করেন, প্রায় বিংশতি বৎসর বয়স পর্যন্ত যুবকেরা পায়ে মল ও হাতে বালা ধারণ করেন, সকলেরই অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি আছে, তাহার নাম "আঙ্গট"।

স্ত্রীলোকেরা মোটা বস্ত্র দোবেড় করিয়া পরিধান করেন, মোমের দ্বারা কেশ সুশোভিত করত সিঁথার উপর এক অঙ্গুলি পরিমিত তৈল সিন্দুর লেপন করেন, কপাল নানা প্রকার চিত্র বিচিত্রিত তিলক অলকায় আবৃত, কেহ কেহ তৎপরিবর্তে মধ্যভাগে প্রশস্তরূপে সিন্দুরের এক ফোঁটা কাটিয়া শরীরের অতি চমৎকার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। নাসিকায় মোটা এক নথ, তাহার নাম "বুলক", হস্তে মোটা তাবিজ ও শঙ্খ। এই শঙ্খই মাঙ্গলিক অলঙ্কার, তাহা দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত লম্বা, এরূপ এক যোড়া শঙ্খ একবার ক্রয় করিলে জমিদারির ন্যায় পুরুষ পুরুষানুক্রমে অনায়াসেই তাহার ভোগ দখল হইয়া থাকে। গলদেশ কেবল মাদুলি মালায় মণ্ডিত। পায়ে বেড়ির ন্যায় বাঁকমল, হাতে চুড়ি পরিলে, পদে অলক্ত দিলে ও দন্তে মিশি না দিলে অতিশয় নিন্দা হয়।

বিধবা

ভদ্রলোকের বিধবারা একাদশীয় দিবসে ফল মূল ও ঘরে কোটা চিঁড়ে এবং খই খাইয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহারা অতি মান্যা ও পুণ্যশীলা "খোরোঁড়ী" বলিয়া সুখ্যাতি ঘোষণা হয়। কিন্তু এতদ্রূপ ব্যবহার ঢাকা, বিক্রমপুর, ত্রিপুরা, কমিল্যা, ভুলুয়া, সুধারাম ও চট্টগ্রাম মধ্যেও চলিত আছে। এরূপ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, সত্য মিথ্যা পরমেশ্বর জানেন কিন্তু প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ শ্রবণ করাতে সত্যের পক্ষে অনেক বিশ্বাস হইতেই পারে।

বিবাহাদি ক্রিয়া ও আমোদ-প্রমোদ

যে কোন আনন্দের ক্রিয়া হউক, এ দেশের স্ত্রীলোকেরা সেই সূত্রে অতিশয় আনন্দ পূর্বক উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া হুলধ্বনি প্রদান কবিয়া থাকে, সেই হুলুর নাম "জোকার"। বিবাহাদি ক্রিয়ার প্রায় দুই মাস পূর্বাবধি নিয়তই নাগরায় বাদ্য হইতে থাকে, তাহার নাম, "খাড়া নাগরা"। ঐ নাগরার বাদ্য দিবসাপেক্ষা রজনীতে অধিক হয়। এক ক্রোশ পর্যন্ত তাহার শব্দ ধাবিত হয়।

সংবাদ প্রভাকর।। ২৬ চৈত্র ১২৬১

এ দেশের বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণ রূপেই বিপবীত। অর্থাৎ বরকে প্রায় কন্যার বাটিতে যাইতে হয় না, কন্যাই স্বয়ং সাজ-সজ্জা করিয়া সমারোহপূর্বক বরের আবাসে গমন করেন। এইরূপ নিয়ম ইহারদিগের পক্ষে অতিশয় সম্ভ্রমজনক, এতদ্রূপ শুভকর্মের কিঞ্চিৎ পূর্বে গৃহের অঙ্গনারা অঙ্গনের মধ্যে চক্রাকার হইয়া গানারম্ভ করেন, এই গানের নাম "গাহিন লওন", তাহার বাদ্যের নাম

"খাড়ানাগরা"। পুরুষেরা বাহিরে আসিয়া অত্যুত্তম গায়িকাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন, এতদ্রূপ গায়িকাগণ অন্য পল্লিতে কুটুম্বের ভবনে সংগীত করণার্থ নিমন্ত্রিতা হইয়া থাকেন। কিন্তু এ দেশের এই উৎকৃষ্ট গুণ যে নীচ জাতির স্ত্রীলোকেরাও পথে ঘাটে হাটবাজারে বাহির হয় না।

কামিনীদিগের নামের সহিত "মালা" অথবা "দুর্গা" শব্দ সংযুক্ত যথা—

"শ্যামমালা" "রামমালা" "কৃষ্ণমালা" "জগৎমালা" তথা "রামদুর্গা" ও "শ্যামদুর্গা" ইত্যাদি।

পুরুষজাতির আমোদ প্রমোদের মধ্যে কবি শুনাই সর্বপ্রধান। এদেশে যাত্রার দল এক্কালেই নাই। কোন স্থান হইতে ক্বচিৎ কোন যাত্রার দল আইলে শুনিতে অত্যন্ত ব্যাগ্র হয়েন। কিন্তু তচ্ছ্রবনের নিয়ম কিরূপ তাহা কেহই জ্ঞাত নহেন। গায়কেরা কোন পালা আরম্ভ করিয়াছে, এমত সময়ে কর্তারা ফরমাস করিয়া বসেন যে, "য়্যাকটা মালসী মালসী গাওহে", সুতরাং তাহারা কর্তৃপক্ষের আজ্ঞানুসারে মালসী গাহিতে আরম্ভ করে, ইহাতে গাহনার সম্পূর্ণরূপ ব্যাঘাত জন্মে। এখানে ভদ্রলোকেরা আমোদ করিয়া কবির দল কবিয়া থাকেন, তাহার গাওনা ও সুর গীত অতি চমৎকার; কখনই যাত্রা বা পাঁচালীর দল করেন না।

ভাষা

এই বঙ্গদেশের ঢাকা, বিক্রমপুর, সুধারাম, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের অপেক্ষা বরিশালের ভাষা অতি কদর্য, কিন্তু শ্রীহট্টের অপেক্ষা অনেকাংশেই উত্তম, এবং কোন কোন কথা চট্টগ্রাম হইতে ভাল, ঢাকা ও বিক্রমপুরের ভাষার সহিত এখানকার ভাষার কোন কোন অংশের বিলক্ষণ ঐক্য আছে, এবং উচ্চারণের শেষ একটা রেশ প্রায় তুল্যরূপ, "ক" স্থানে "অ" এবং "অ" স্থানে "হ" উচ্চারণ প্রায় করিয়া থাকে, "ধ" স্থানে "দ" "ভ" স্থানে "ব" ইত্যাদি।

ইহারদিগের উচ্চার্য ব্যঞ্জন যথা। ক, খ, গ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ ড, ঢ, ত, থ, দ, ন, প, ফ, ব, ম, র, ল, শ, হ।

কি কর, শব্দে, "কি অর"। অথবা "কি হর" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

ঘ, ধ, ভ এই তিনবর্ণের উচ্চারণ এককালেই করিতে পারে না।

বেটা স্থানে বেডা, ফাটা স্থানে ফাডা, পাঁটা স্থানে পাডা, ঘড়ি স্থানে গরি, যাব স্থানে যামু, হরি স্থানে অরি, হস্তি স্থানে অস্তি, করেছ স্থানে করচ্, বসিব স্থানে বস্মু, বসিবেন স্থানে ববেন, হাট স্থানে আট, আসুন স্থানে আস্কুন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি তাবতেই "আজ্ঞা, আপনি মশয়" এই সম্বোধনীর সাধু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সংবাদ প্রভাকর।। ২৮ চৈত্র ১২৬১

HISTORY OF BACKERGANJ

KHOSAL CHANDRA ROY

ADARSHA PRESS
1895

Printed and Published by Naneda Kumar Das
at the Adarsha Press, Barisal

এই পুস্তক বরিশালস্থ ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে বাবু খোসালচন্দ্র রায় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ও বরিশালের ডাক্তার বাবু রাজেন্দ্রলাল ঘোষাল এল্. এম্. এস্. মহাশয়ের ডিস্পেনশারীতে পাওয়া যাইবে।

উৎসর্গপত্র

পরমদয়াল্ ও দরিদ্রবন্ধু মাজিস্ট্রেট মাননীয় মহাত্মা এন. ডি. বিট্সান্ বেল বি, এ, সি, এস, যিনি বাকরগঞ্জের দুর্দমনীয় বহুকালব্যাপী বদমাইসি ও চিরপ্রসিদ্ধ নরহত্যা কাণ্ড অতীব সুকৌশলে দমন করিয়া এ জিলাস্থ জনসাধারণের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। যাঁহার যত্নে দেশে স্বাস্থ্য রক্ষার উন্নতি প্রকৃষ্ট রূপে সাধিত হইয়াছে, তাঁহার করকমলে আমাদিগের এই বাকরগঞ্জের ইতিহাস সাদরে উৎসর্গীকৃত হইল।

বিনয়াবনত
শ্রীখোসালচন্দ্র রায়
গ্রন্থকার।

ভূমিকা

মাননীয় বিভারিজ সাহেব মহোদয়ের লিখিত বাকরগঞ্জের ইতিহাসের সাহায্য না পাইলে, আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সঙ্কলন করা দুরূহ ব্যাপার হইত। উক্ত মহাত্মার পদানুসরণে এই পুস্তকের অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে। গ্রামের ইতিহাস, স্থানীয় লোকের সাহায্যে প্রকাশিত হইল। উপক্রমণিকা ও প্রাকৃতিক বিবরণ লিখিতে, পূর্ব্ববঙ্গচক্রের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টরবাবু দীননাথ সেন মহাশয়ের বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নামক পুস্তকখানির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এজন্য আমরা উক্ত মহাত্মার নিকট চিরঋণী রহিলাম। তদ্ভিন্ন আইন-ই-আকবরী, এসিয়াটিক সোসাইটিস জর্নেল, সেনসাস্ রিপোর্ট, এড্‌মিনিষ্ট্রেসন রিপোর্ট, বিশ্বকোষ, কাশীপুর নিবাসীর সংগ্রহ, নব্য ভারত, ভিলেজ ডিরেক্টরী প্রভৃতি হইতে আমরা অনেকানেক বিষয়ের সংগ্রহ করিয়াছি। এই পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে বরিশালের ভূতপূর্ব মাজিস্ট্রেট মিঃ লিমেজারার ও মিঃ ফিলিমোর সাহেব মহোদয়গণ, সিভিল সার্জেন মিঃ কে. পি. গুহ সাহেব মহোদয় ও ভূতপূর্ব পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ ডান্ডেস ও মিঃ রাইলান্ড সাহেব মহোদয় কতকগুলি বিষয়ের বিবরণ প্রদান করিয়া, আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম, এ, বি, এল ও ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান বাবু দ্বারকানাথ দত্ত নিজ নিজ আফিসাদি হইতে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ প্রদান করিয়া, আমাদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আজীবন তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। ভোলার ভূতপূর্ব ডেপুটী মাজিস্ট্রেট বাবু প্রসন্নকুমার দত্ত ও বর্তমান ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বাবু জগদীশচন্দ্র সেন এম, এ, ও দক্ষিণ সাহাবাজ পুরের ম্যানেজার বাবু শশিকুমার দত্ত মহোদয়গণ আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে উপদেশ দান ও উৎসাহ বর্ধন করিয়া, আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিবেদন করিতেছি যে, পটুয়াখালীর ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বাবু যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ মহোদয় অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমার ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া, ভুল প্রমাদগুলি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন ও তাঁহার সব্ ডিবিসনের ও সুন্দরবন বিভাগের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাঁহার (টুর ডায়েরী) হইত উদ্ধৃত করিয়া, আমাকে পাঠাইয়া দিয়া আমার মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। আমাদিগের পরম বান্ধব কীর্তিপাশার জমিদার বাবু শশিকুমার রায় চৌধুরী এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লোক সমক্ষে প্রকাশ করিয়া, আমাকে চিরদিনের জন্য ঋণী করিয়া রাখিয়াছেন। আদর্শ প্রেসের অধ্যক্ষ পণ্ডিত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকখানির ভাষা সংশোধন করিয়া দিয়া, আমাকে চিরকৃজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন।

উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন, আমাদিগের মাজিস্ট্রেট দয়ার্দ্রহৃদয় মহাত্মা এন, ডি বিট্‌সন বেল বি, এ, সি, এস্ মহোদয় আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণে আশাতীত সাহায্য করিয়াছেন ও সংসারপথে আমাকে উন্নত করিবার মানসে আশাতীত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া, আমাকে চিরঅধীনতা ও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আমার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল দেখিয়া যাঁহারা আনন্দিত হইবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মহাত্মা বেল সাহেবকে একজন প্রধানতম বলিয়া মনে বিশ্বাস করি। তিনি বিদেশী লোক হইয়া, আমার নিজের জন্য ও এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির জন্য যতদূর যত্ন করিয়াছেন এবং এই বাকরগঞ্জের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্যে তিনি যত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তাঁহার করকমলে অর্পণ করিলাম।

দৌলাত খাঁ
১৭ই মে, ১৮৯৮।

শ্রীখোসালচন্দ্র রায়।

কীর্তিপাশাব জমিদার বাবু শশিকুমার রায়চৌধুরী প্রথমবার লিখিয়াছেন—

নিবেদন

বাকরগঞ্জের ভূতপূর্ব মাজিস্ট্রেট মাননীয় বিভারিজ সাহেব মহোদয় বিগত ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় বাকরগঞ্জের একখানি ইতিহাস লিখিয়া, এ দেশবাসীদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তিনি একজন বিদেশী লোক, তাঁহার লেখনী হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা অতীব প্রশংসনীয় ; কিন্তু উহা ইংরেজি ভাষায় লিখিত বলিয়া সর্বসাধাবণেব বোধগম্য নহে। তৎপর এই বিশ বৎসর কাল মধ্যে এইরূপ হিতকর কার্যে বাকরগঞ্জের আর কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। আজ আমাদিগের একটি সুখের দিন ; বিশেষত আমার নিজের কি এক অভূতপূর্বভাবের উদয় হইতেছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা একপ্রকার অসাধ্য : এ স্থলে একটি বিষাদময় ঘটনা আমার স্মৃতি পথে জাগরিত হইতেছে—আমার পিতৃদেবের সময়ের প্রধান চিকিৎসক তারপাশা নিবাসী প্রসিদ্ধ কবিরাজ গুরুপ্রসাদ রায় মহাশয়ের প্রাক্‌কালে, তিনি তাঁহার পুত্রগণকে আমার হস্তে অপণ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—বিশ্বেশ্বর, খোসাল, বসন্ত, হেমন্ত ও অনন্ত। রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিশ্বেশ্বব রায় পিতৃগুণগ্রামের অধিকারী হইয়া, আমার পরিবারে প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান খোসালচন্দ্র রায় সাধাবণের বোধগম্য "বাকরগঞ্জের ইতিহাস" সঙ্কলন করিয়া, আমাদিগের একটি প্রকৃত অভাব দুবীভূত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা হইতে আমার সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? পুস্তক প্রণেতা বাকরগঞ্জের প্রধান প্রধান গ্রাম ও সুন্দরবনাদি পর্যবেক্ষণ ও ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমার পাঞ্জাব পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি বরিশালের প্রসিদ্ধ ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে এগার বৎসর কাল পর্যন্ত ম্যানেজার ও শিক্ষক নিযুক্ত থাকিয়া, বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

উপসংহারে আমার বিনীত প্রার্থনা যে, এই পুস্তকেব ভুল প্রমাদগুলি পাঠকবর্গ আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্বক জ্ঞাত করাইলে, আমরা পুনঃ সংস্করণে তাহার সংশোধন করিয়া দিব। বলা বাহুল্য যে, এই প্রকার পুস্তক সংকলনে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, সুতরাং প্রথমবার সর্বাঙ্গ সুন্দব করা সহজ নহে। স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মাগণের সহানুভূতির প্রত্যাশায়ই এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। আশা করি, ইহা এ দেশবাসীর একটি আদরের সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত হইবে। বাকরগঞ্জ হিতৈষিনী সভার পক্ষ হইতে অন্তঃপুর মহিলাগণের পরীক্ষায় এই পুস্তকখানি পাঠ্য কবিবার প্রস্তাব হওয়ায় আমবা সভার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

কীর্তিপাশা.
২০শে অগ্রহায়ণ,
সন ১৩০২

শশিকুমাব রায়চৌধুরী
জমিদাব, কীর্তিপাশা

OPINIONS

The Hon'ble Mr. C. W. Polton, chief secretary to the Government of Bengal wrote to the author on the 19th of January 1897 :—

"I received your History of Backergunge and thank you for it.*** The work appears to be a useful one."

The Hon'ble Mr. G. Joynbee, Secretary to the Board of Revenue remarked, on the 1st of May 1897 when he was Commissioner of the Dacca Division :—

"I beg to send you my best thanks for your interesting book. I wish more native gentlemen would do such work instead of writing against Government in the papers."

Mr. C A. Oldham, under secretary to the Government of Bengal remarked, on the 13th December 1896 :—

"I thank you for a copy of your History of Backergunge which you have kindly sent me. *** you seem to have supplied a want for your district that might with advantage be supplied for many other districts of this province. I mean a succinct, descriptive and historical account in the vernacular."

Remarks made by Mr. H. Le Mesuries, late Magistrate of Backergunge on the 26th March 1896.

"I have looked into your book Backergunger Itihash or History of Backergunge so far as I have been able to spare time. It appears to be a very useful and interesting Gazettier Containing all items necessary to give a good idea of the district. Such books are unfortunately not common and you deserve credit for the enterprise as well as for devoting so much time and labour to it"

The Reverend Mr. William Carey remarked, on the 16th July, 1896 :—

"He has taken the trouble to investigate the history of Backergunge and has published a book in Bengali as the first of this research."

Mr. N.D. Beatson Bell, Magistrate of Backergunge remarked, on the 21st December 1896 :—

"Babu Khosal Chandra Rai has written a very interesting little book about the district of Backergunge. The book should be very useful to every one connected with the district. The author is bringing out a second edition and is taking considerable trouble to make the work as complete as possible."

Extract from See IV

"Social and political institutions, state of public feelings and the public press" of the General Administration Report for 1896—97.

"This is probable the best place to notice the little book of Babu Khoshal chandra Ray. He has published in Bengali a useful hand book . Containing the history of District. He is now bringing out a second edition. I am very glad to see literary energy directed into this Channel."

Babu Aswini Kumar Dutt M A B. L. of Barisal remarked on the 14th March, 1896 :—

"He has composed an interesting history of Backergunge in Bengali.

I have much pleasure in recording my appreciation of the pains Babu Khosal Chandra Rai has taken in compiling the history of Backergunge in Bengali."

Amrita Bazar Patrika of March 8th, 1896 :—

"Backergunger Itihash by babu Khosal Chandra Rai, is written on the line of Mr. Beveridge's well known volume on the same subject and gives all the minute details of division its products, places, manufactures, peoples, interesting historical points and a host of other useful informations. The work is perhaps, the first attempt in the direction in Bengali and removes a long felt want, and we hope the labour, the Compiler has bestowed on the work, will be adequatly appreciated."

Bengali, March 14th 1896

'We have received a Bengali treatise, entitled the "History of Backergunge" edited by Babu Khosal chandra Rai, teacher B. M. Institution. It contains some useful informations. It is worth perusing "

Remarks made by Babu Jogendra Kumar Ghosh M A. subdivisional officer of Patuakhali on the 9th July, 1896.

"I read the book and think it to be a work of considerable merit"

Babu Shashee kumar Dutt, Manager Court of Words, Backergunge, remarked on the 31st July 1896.

"I have your History of Backergunge and am glad to say that it contains many informations which we ought to know."

Babu Brajendra Nath Chatterjee M. A. B. L. Principal of B. M. Institution remarked on the the 15th March, 1896 :—

"The History of Backergunge in Bengali compiled by Babu Khosal chandra Rai, superintendent of the Brojomohun Institution, contains many useful in formatios regarding this district. The compiler has taken much pains in bringing out the work "

Remarks made by Babu Jogendra Nath Ghosh L.C.E. District Engineer on the 16th July, 1896 :—

"He has written the History of Backergunge in Bengali, which is an interesting tittle book requiring some trouble in compilation.

ভোলা সবডিভিসনের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু প্রসন্নকুমার দত্ত ১৮৯৭ সনের ১০ই ফ্রেবুয়ারী নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"বাবু খোসালচন্দ্র রায়ের প্রণীত বাকরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। বঙ্গদেশের বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের একটি মহা অভাব এই যে, সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস নাই। পুরাবৃত্তের অনুশীলন দ্বারা সেই অভাব দূর করিতে কাহাকেও যত্নবান দেখিলে বাস্তবিকই মনে বড় আনন্দ হয়। গ্রন্থকার বাকরগঞ্জের এই অভাব অনেকাংশে দূর করিয়াছেন। গ্রন্থকার অসীম অধ্যবসায় ও গবেষণার জন্য সমস্ত বাকরগঞ্জবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। বাকরগঞ্জ সম্বন্ধে যত কিছু জ্ঞাতব্য এ পুস্তকে তৎসমস্তই সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমি আশা করি, এই পুস্তকখানা বাকরগঞ্জবাসীর আদরণীয় হইবে।"



উপক্রমণিকা

অতি প্রাচীনকাল অবধি ১২০৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সুখে বঙ্গদেশ হিন্দুরাজগণ কর্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ১২০৩ অব্দে মুসলমানেরা আক্রমণ করিয়া, ক্রমে সমুদয় বঙ্গদেশ অধিকৃত করে এবং ১২০৩ খৃস্টাব্দে বঙ্গদেশে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপনপূর্বক, সেই অবধি প্রায় সার্ধ পঞ্চশত বৎসর, অর্থাৎ খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগ পর্যন্ত রাজত্ব করে।

ইংলন্ডীয় কয়েকজন বণিক ১৬৩৬ খৃস্টাব্দে বঙ্গদেশে কারবারের কুঠী স্থাপন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। পরে তাহারা নানা উপায় অবলম্বন করিয়া, ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকার করে। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের পর অনেকগুলি হিতকর পরিবর্তন সাধিত হয় ও ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী হয়েন। বঙ্গদেশের বিস্তার এক লক্ষ দশ হাজার বর্গ মাইলের ন্যূন নহে ও লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। বঙ্গদেশ পাঁচ বিভাগে বিভক্ত ; যথা—বর্ধমান, রাজসাহী, প্রেসিডেন্সি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম।

ঢাকা বিভাগ—বঙ্গদেশের মধ্য ও উত্তর পূর্বাংশে স্থিত। এই বিভাগ চারটি জেলায় বিভক্ত। পশ্চিম দক্ষিণ দিকে বাকরগঞ্জ, বাকরগঞ্জের উত্তরে ফরিদপুর, ফরিদপুরের উত্তরে ঢাকা এবং ঢাকার উত্তরাংশে ময়মনসিংহ।

বাকরগঞ্জ ২১° হইতে ২৩° উত্তর লেটিচিউড ও ৮৯° হইতে ৯১° পূর্ব লঙ্গিচিউডের অন্তর্গত। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে বিস্তারিত ও পূর্ণাকারে বাকরগঞ্জের সীমা লিখিত হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে বলিতে হইলে, বাকরগঞ্জের উত্তর সীমা ফরিদপুর ও ঢাকা ; পশ্চিম সীমা ফরিদপুর, খুলনা ও বলেশ্বর নদী ; দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর এবং পূর্ব সীমা মেঘনানদী, সাহাবাজপুর নদী ও বঙ্গোপসাগর। বাকরগঞ্জের উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত ৮৭ মাইল ও পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত প্রায় ৬০ মাইল। ইহার বিস্তৃতি ৩৬৪৯ বর্গমাইল। একরে পরিণত করিলে স্থলভাগ ২৪৫৩৪৯৭ একর ও জলভাগ ৫১২০৮২ একর। লোকসংখ্যা ২১৫৩৯৬৫। তন্মধ্যে ১৪৬২৭১২ জন মুসলমান, ৬৮০৩৮১ জন হিন্দু, ৬০৮০ জন বৌদ্ধ, ৪৬৫৯ জন খৃস্টান ও ১৩৩ জন ব্রাহ্ম। সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে মুসলমান তিনভাগের দুইভাগ ও অপর একভাগের মধ্যে অত্যল্প সংখ্যক বৌদ্ধ, খৃস্টান ও ব্রাহ্ম বাদে অবশিষ্টাংশ হিন্দু। সমস্ত বাকরগঞ্জে ৪৭০৮ খান গ্রাম। বর্তমান সময়ে গবর্নমেন্ট সর্বসমেত পরগনা ও খাস মহাল হইতে ১৭২৫৫৫০ টাকা, রোড সেসে ও পাবলিক ওয়ার্ক সেসে দ্বারা ৪৭৭৭৭৮ টাকা, ইনকাম

ট্যাক্সে ৬৯৬৪৯ ও আবগারি বিভাগে ১১৭৭৬২ টাকা, সর্ব মোট ২৩৯০৭৩৯ টাকা প্রাপ্ত হইতেছেন। বাকরগঞ্জ—চারি উপবিভাগে বিভক্ত, যথা—বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও ভোলা।

প্রধান প্রধান গ্রাম সমূহের নাম

বরিশাল সদর

বরিশাল, মাধবপাশা, লাকুটিয়া, কাশীপুর, জাগুয়া, কালিজিরা, কলসগ্রাম, রায়পাশা,কড়াপুর, রহমতপুর,বাবপাইকা, উজিরপুব, শিকারপুর, বেড়মহল, রামচন্দ্রপুর, কাচাবালিয়া, গাভা, নারায়ণপুর, আওসার, তেবদরুন, গুঠিয়া, দেহেরগতি, পঞ্চকবন, মোহনগঞ্জ, রামরাইল, বাটাজোড়, চন্দ্রহার, আধুনা, শোলোক, আটক, জয়শ্রীকাঠি, মাহিলাড়া, নলচিড়া, বাসুদেবপাড়া, বিশ্বগ্রাম, হরিষণা, হানুয়া, হস্তীশুণ্ড, গৌরনদী, আগরপুর, গৈলা, ফুল্লশ্রী, বাকাল, চাঁদশী, বাকাই, বাগধা, বার্থী, মেহেন্দীগঞ্জ, সায়েস্তাবাদ, চড়ামদ্দি, লতা, সাহমপুর, উলনিয়া, কাউয়ারচর, গোবিন্দপুর, শিয়ালগুণী, বাকরগঞ্জ, শিবপুর, কলসকাঠি, কাজলাকাঠি, ভাতশালা, গারুরিয়া, গৌরীপাশা, নলছিটি, সরমহল, হয়বতপুর, ভাটিয়া, অভয়নীল, কুলকাঠি, বারইকরণ, কুশঙ্গল, পোনাবালিয়া, নাগপাড়া, কৈলকাশী, শ্যামরাইল, দেউরী, রাজাপুর, ঝালকাঠি, আগোলপাশা, বিকনা, কৃষ্ণকাঠি, প্রতাপ, মগর, পেমার, আঙ্গারিয়া, সূতালড়ি, হবিরকাঠি, নবগ্রাম, কাকুরকাঠি, বেতরা, বাউকাঠি, নথুল্লাবাদ, বাসন্ডা, পিপাইলথা, গোবিন্দধবল, গাবখান, কীর্তিপাশা, তারপাশা, কেওরা, বেলদাখান, বণমতি, বেউখীর, রুনসী ইত্যাদি।

পিরোজপুর

পিরোজপুর, রায়েরকাঠি, উমেদপুর, বাইসারি, বানরিপাড়া, নরোত্তমপুব, মাছরং, বুড়িহারি, ইলুহার, জুলুহার, বরদাকাঠি, স্বরূপকাঠি, খলিশাকোটা, চাখার, শাখারিকাঠি, কামারকাঠি, সমুদয়কাঠি, মটবাড়িয়া, বামনা, জঙ্গালপাড়া, কাউখালি, নাজিরপুর, ভাণ্ডারিয়া, আমরাজুরী, সাতুরিয়া, জলাবাড়ি, তুষখালি, সোহাগদল, অযোধ্যা, শুক্তাগড় ইত্যাদি।

পটুয়াখালি

পটুয়াখালি, মৃজাগঞ্জ, কালাইয়া, তাকালবাড়িয়া, গজালিয়া. গুলিসাখালি, আয়েলা, ফুলঝুরি, চাঁদখালি, ধুলিয়া, আমতলী, বাউফল, কালীসুরী, কচুয়া, গলাচিপা, নেহালগঞ্জ, বড়গুনা, বাদুরিয়া, কনকদিয়া, কুল্যা, মুরদিয়া, আখিবাড়িয়া, আলগী, আমরাগাছিয়া, আন্ধারমানিক, বদরপুর, বগা, চন্দনবাড়ি, চণ্ডীপুর, কচুপাত্রা, কালাইয়া, খাব্রাডঙ্গা ইত্যাদি।

ভোলা

ভোলা, দৌলত খাঁ, বরানদ্দী, গাজিপুর, গঙ্গাপুর, ভবানীপুর, তজুমদ্দি, বাঞ্চাপুর, রাজাপুর, জয়পুর, গোকুলগুহা, লক্ষ্মীরচর, কাশীগঞ্জ, লালমোহন, মৃজাকালি, তালতলী, জয়নগর, ছান্দিয়া, ঘোযনদী, চাঁদপুব, হাজিপুর, ন্যায়তপুর, মাণিকপুর, মেদুয়া, হাজারি, বিজয়পুর, আমানী, নলডুগি, আবুগঞ্জ, আঙ্গারিয়া, বদরপুর, বগা, বামনপুর, চাচরা, চণ্ডীপুর, দশুপুর, শিপুর, কাঞ্চনপুর, মহাদেবপুর ইত্যাদি।



প্রথম অধ্যায়
প্রাকৃতিক বিবরণ

প্রাকৃতিক শাস্ত্র বর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী অপরাপর দেশাপেক্ষা বঙ্গদেশে অধিকতর বিস্ময় রসোদ্দীপক। এই পুস্তকবর্ণিত বাকরগঞ্জে এই সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী সমধিক লক্ষিত হয়। এ জিলায় কোন পর্বত কি পাহাড় নাই। উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক ক্রমশ ঢালু হইয়া চলিয়াছে। সমুদ্র হইতে উত্তর দিকে গড়ে প্রত্যেক মাইল ১০৮ ইঞ্চি উচ্চ। মধ্যভাগে অনেকানেক বিল পরিলক্ষিত হয়। বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত কতকগুলি দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ সাহাবাজপুর সর্বপ্রধান। এ জিলার দক্ষিণে ভীষণ সমুদ্র ও তৎসংলগ্ন সুন্দরবন। সমুদ্র গর্ভ হইতে সুন্দরবনের দক্ষিণে মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন দেশ উদ্ভাবিত হইতেছে—কোথাও বা তটদেশ ভাঙ্গিয়া সমদ্রের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। অসাধারণ বেগ সহকারে বাত্যা ও ঝটিকা প্রবাহ এবং বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়া থাকে—বিচিত্র প্রকৃতি পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা ও শস্যাদি এ অঞ্চলে উৎপন্ন হয় ; তৎসমুদায়ের বিদ্যমানতা বশতঃ এস্থান অতীব রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বাকরগঞ্জ বহুসংখ্যক নদী ও খালে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে বৃষ্টির জল বদ্ধ হইয়া, ক্ষুদ্র বা বৃহদায়তন বিল উৎপন্ন করিতেছে। নদী বা খালের তটদেশ দিয়া মৃত্তিকা প্রায়শ উচ্চ। তদ্ভিন্ন প্রায় সমুদয় স্থানই বর্ষার সময়ে জলমগ্ন হইয়া থাকে। গ্রামসমূহের মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত প্রশস্ত কর্ষিত ক্ষেত্র আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যভাগ প্রায় নিম্ন বলিয়া সেখানে বিল উৎপন্ন হইয়া, বারমাস জলপূর্ণ থাকে। এই সমস্ত নিম্ন স্থান দেখিলে অনুমিত হয় যে, এই স্থানগুলি পূর্বে নদীর অংশ ছিল। পরে নদীর গতি পরিবর্তনে মাটি পড়িয়া ভরিয়া যাইতেছে। বাস্তবিকই মনে হয়, এ দেশে এমন স্থান নাই যাহা কোন না কোন সময়ে নদীর গর্ভস্থ ছিল না।

সমভূমি, জলাভূমি ও সুন্দরবন এই তিন ভাগে বাকরগঞ্জকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সমভূমি প্রদেশে বহুসংখ্যক লোকের বসতি স্থান ও বহুল পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলাভূমি প্রদেশের মধ্য দিয়া অসংখ্য খাল ও নদী চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। জোয়ারের সময়ে সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হয় বলিয়া এই প্রদেশের জল অধিক বা অল্প পরিমাণে লবণাক্ত। জোয়ারের সময়ে এই সমুদয় জলাভূমিতে নূতন জল বেগ সহকারে আসিয়া মৃত্তিকা নিক্ষেপ করতঃ জলাভূমিগুলিকে ক্রমে ভরিয়া উঠাইতেছে। এই প্রদেশে লোকের বসতি প্রায়ই নাই। স্থানে স্থানে শুভ্রবর্ণ কার্পাস সদৃশ, চাকচিকাময় ও পুষ্পবিশিষ্ট নল ও খাগড়া, কোথাও বা বহুদূরব্যাপী পরিষ্কার জল ও স্থানে স্থানে অনাচ্ছাদিত বালুকা ও কর্দম দৃষ্টিগোচর হয়। সুন্দরবন বিভাগ গভীর অরণ্যে আবৃত ; তথায় মনুষ্য সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। আবাদী স্থলসমূহে অল্পসংখ্যক মনুষ্য বসতি

করিতেছে। এই প্রদেশের দক্ষিণাংশে অতল সলিল ও বহুদূর বিস্তৃত অপার সমুদ্র বেগে ধাবমান হইতেছে।

দ্বীপ

দক্ষিণ সাহাবাজপুর বাকরগঞ্জের দ্বীপসমূহ মধ্যে বৃহৎ। ইহার পরিসর প্রায় ৮০০ শত বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা সওয়া দুই লক্ষের অধিক। ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও উপদ্বীপ লক্ষিত হয় ; তন্মধ্যে কালী, কাজল, বড় বাইশদিয়া, ছোট বাইশদিয়া, কোডালিয়া, রাঙ্গাবালী, কালমী, ছোপা, কুকড়ী, মুকড়ী, মনপুরা ইত্যাদিই প্রধান। মনপুরার লোকসংখ্যা ৫০০০ হাজারের অধিক।

নদী

বাকরগঞ্জের নদীগুলির মধ্যে মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ ও বলেশ্বর নদী প্রধান।

(১) **মেঘনা** নদী প্রথমত ঢাকা ও ত্রিপুরা, তৎপর বাকরগঞ্জ জিলার পূর্বদিক দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। সাতবেড়িয়া, ইলসা ও তেঁতুলিয়া, মেঘনার নামান্তর মাত্র।

(২) **আড়িয়াল খাঁ** পদ্মা নদীর এক শাখা। এই নদী পাশের দিক ধার দিয়া বাকরগঞ্জে প্রবেশ করিয়া অবশেষে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। আড়িয়াল খাঁর দক্ষিণ মোহানাকে ডাকাতিয়া নদী কহে। আড়িয়াল খাঁ হইতে এক উপনদী বাহির হইয়া বাকরগঞ্জ জিলার উত্তর পূর্বাংশ দিয়া তেঁতুলিয়ার মোহানাতে পতিত হইয়াছে। আড়িয়াল খাঁ হইতে আর একটি নদী প্রথম বরিশালের নদী, তৎপর বিষখালি নামে, বরিশাল নগর পশ্চিম পাড়ে রাখিয়া হরিণঘাটা মোহানায় পতিত হইয়াছে। আড়িয়াল খাঁর দক্ষিণ অংশ হইতে নূতন বা নয়াভাঙ্গানী, লাটার গাঙ প্রভৃতি শাখা উত্তর পূর্ব দিকে গিয়া মেঘনায় পতিত হইয়াছে।

(৩) **বলেশ্বর নদী**। এই নদী কুষ্টিয়ার সম্মুখে ডাকদহের মোহানা হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর দক্ষিণ পূর্বাভিমুখে যশোহর জেলার পূর্ব সীমা এবং ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জের পশ্চিম সীমা দিয়া হানু, মধুমতী, এলেনখালি ইত্যাদি বিভিন্ন বিভিন্ন নামে হরিণঘাটা নামক প্রশস্ত মোহানা দিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। বলেশ্বর গঙ্গানদীর উপশাখা। (ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও মেঘনা পরস্পরে সংযোগ দেখা যায়। আড়িয়াল খাঁ শীতকালে ৩৪০০ শত হস্ত এবং বর্ষাকালে ৬০০০ হাজার হস্ত প্রশস্ত দেখা গিয়াছে।)

(৪) **বরিশাল বা কীর্তনখোলা নদী**—নলছিঠি, মধিপুর ও ঝালকাঠির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ধানসিদ্ধের বাগ, কাউখালি ও কচা নাম ধারণ করিয়া বলেশ্বরে মিলিত হইয়াছে। বিষখালি ও খয়েরাবাদ নদী বরিশাল নদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বাকরগঞ্জ থানায় **পাণ্ডব** নদী ; বাউফলে কারখানা, ধুলিয়া ও খয়েরাবাদ নদী, পটুয়াখালি থানায় নেহালিয়া, গলাচিপা থানায় গলাচিপা ও বিষখালি নদী, ন্যামতী ও কালমেঘার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে ; বিঘাই নদী মৃজাগঞ্জ ও গুলিসাখালি থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে ; গুলিসাখালি থানায় আন্ধারমানিক নদী, মঠবাড়িয়া থানায় সাপলেজ ও আগুনমুখা নদী দক্ষিণবাহিনী হইয়া চলিতেছে।

দোন সমূহের নাম

বিষখালি, আমুয়া, মুরদিয়া, কচা, দামুদা, পটুয়াখালি, আয়েলী, বর্গী, গজালিয়া, ধানসিদ্ধের বাগ, কালীজিরা, জোবখালি ইত্যাদি।

বিল

বাকরগঞ্জের উত্তর পশ্চিমাংশে একস্থান দিয়া কতকগুলি বিল আছে। তন্মধ্যে রামশীল দীঘি, বাঘিয়া, বড়াইয়া, কাজলা, চন্দনা, ধলবাড়িয়া, দোবড়া, বলদিয়া, হরতা, ঝনঝনিয়া, সতলা, দেওপুরা ও আস্কর বিল প্রভৃতি বৃহৎ। বরিশালের দক্ষিণে রামপুর চাঁচুরী বিল দেখিতে প্রশস্ত। বাউফলে ধরনদি, আদমপুর ও কালারাজা বিলগুলি বৃহদাকার। ঝালকাঠি থানার উত্তরে খাজুরা, আতা, ডুমরিয়া প্রভৃতি বৃহৎ। স্বরূপকাঠি থানার বিল সমুদ্র হইতে বড় বড় মৎস্য কলকাতা মহানগরীতে প্রেরিত হয়। খাজুরার বিলে হোগোল ও নল বহুল পরিমাণে জন্মে।

ঝটিকাবর্ত

আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায়, ১৫৮৩ খৃস্টাব্দে এদেশে একটি বজ্রবিদ্যুৎসহকৃত ভীষণ ঝটিকাবর্ত উপস্থিত হইয়াছিল। উহার প্রতাপে সমুদ্র বারি উত্থিত হইয়া, দেব মন্দির চূড়া অত্যুচ্চ স্থান ব্যতিরিক্ত বাকরগঞ্জের অনেকাংশে নিমজ্জিত করিয়া ছিল। ইহাতে প্রায় ২ লক্ষ জীবের মৃত্যু হয়। ১৭৬৯ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এদেশে যে বন্যা হয়, তাহাতে বাকবগঞ্জে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া, এতদ্দেশীয় অধিবাসীর প্রায় চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাকে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলে। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে এদেশে একটি ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত উপস্থিত হইয়া অনেক অপকার করে। বহুসংখ্যক গৃহ ও বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়। অনেক নৌকা ডুবিয়া যায় এবং ঝড়ের প্রতাপে বঙ্গোপসাগরের সলিল রাশি এদেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত শত মনুষ্য জীবজন্তু ও লোকালয় বিনষ্ট করিয়াছিল। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের ৩১ শে অক্টোবর অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ১৬ই কার্তিক তারিখে যে বন্যা হয়, তাহা সর্বাপেক্ষা মার‌াত্মক। উহার ফলে মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের জল বাকরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় ৩ লক্ষ লোক, বহুসংখ্যক গবাদি জন্তু এবং অগণ্য নৌকা ও গৃহ বিনষ্ট করিয়াছে। এই সময়ে দৌলত খাঁ জলমগ্ন হইয়া, মহাপ্রলয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০২ সালে ১৫ই ও ১৬ই আশ্বিন তারিখে যে বন্যা হয়, উহার প্রতাপে বরিশাল নগরের অধিকাংশ গৃহাদি ও বহুসংখ্যক বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছে। উল্লিখিত কয়েকটি বন্যা ব্যতীত, ১৮২২, ১৮৬৭ও ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের বন্যায় এ অঞ্চলে ভয়াবহ কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। বাকরগঞ্জ সমুদ্রের সংলগ্ন বলিয়াই এ স্থলে ঝটিকার প্রকোপ প্রবল হইয়া থাকে।

বরিশাল গান

বাকরগঞ্জের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীর সংলগ্ন কুকড়ী মুকড়ী উপদ্বীপে মগজাতি বহু কালাবধি উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসতি করিতেছে। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে মাননীয় মিঃ বিভাবিজ সাহেব মহোদর বরিশাল গান সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কোন উপসংহারে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ফ্লিলানামক জনৈক বৃদ্ধ ও বহুদর্শী মগকে বরিশাল গান সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় সে উত্তর করিল যে, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসে এইরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যায়। ইহার সঙ্গে সামুদ্রিক স্রোতের কোন সংস্রব নাই। উত্তর ও দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক হইতে এই শব্দ আসিতে থাকে। বঙ্গদেশবাসী সকলেরই ধারণা যে, দক্ষিণ দিক হইতে শব্দ শোনা যায়। কিন্তু কুকড়ী মুকড়ী ৮০— একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত। তথাকার অধিবাসীর কথিত এই বিবরণ বিশ্বাস না করিবার কারণও কিছু পাওয়া যায় না। উত্তর দিক হইতে কখন কখন শব্দ শোনা যায়, ইহা বড়ই কৌতূহলজনক। আর কোন অঞ্চলের লোকই এই বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে না। বাণ ডাকার শব্দ কি প্রকার শোনা যায় তাহা ফ্লিলা মগ বিশেষ রকমে অবগত ছিল, কারণ সে এক প্রকার সমুদ্রবাসী। বরিশাল গানকে বাণ ডাকার শব্দ বলিয়া যাঁহারা ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিকের মতে ঐক্য হইতে পারি না। লঙ্কাদ্বীপের রাবণের বাড়ির কপাট বন্ধ হওয়ার শব্দ বলিয়া যাহারা ব্যাখ্যা

করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের মতে ঐক্য হওয়া অসম্ভব। মাননীয় মিঃ বিভারিজ সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে, বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে তাড়িত সংযোগে শব্দ হয় বলিয়া তিনি মনে করেন না। আমরা ইহাই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত।

উৎপন্ন সামগ্রী

বাকরগঞ্জের উৎপাদিকা শক্তি সম্ভবত বঙ্গদেশের অন্যান্য সমুদয় স্থান অপেক্ষা অধিক। বর্ষার জলে সমুদয় নিম্ন স্থান প্লাবিত হইলে তদুপরি মৃত্তিকা ও গলিত উদ্ভিজ্জ পতিত হইয়া উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করে।

বাকরগঞ্জে কৃষি কার্যের বিস্তার সর্বাপেক্ষা অধিক। বৃক্ষ লতা ও ফলাদি, পশু পক্ষী ও মৎস্যাদিও বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এ জেলায় অন্য স্থানাপেক্ষা অধিক ধান উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়।

শস্যাদি

নিম্নস্থানে উৎকৃষ্ট আমন ধান জন্মে। আমন ধান মাঘ মাসে সুপক্ক হয়। প্রায় ১৫০ রকমের আমন ধান জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে ক্ষিরইজালী, বউয়ারী, চাউলামগী, সাক্করখোবা, বালাম, চিঙ্গরভুষী, ভাটী আস্কর, কালজারা, গান্ধিনারী, চেঙ্গাই, লক্ষ্মীবিলাস, কুটীয়া, আগুনী, সুচরই বাসমতী, দুধকলস, শ্যামমুনার, জোয়ালগাথা, রূপেশ্বর, ঘুচিমাঘী, পারিজাত, স্বর্ণলতা, সীতাভোগ, মহিষদল, দুধমনর, আইলমাবাজ, দুধকলই, পানকাইচ, কুমারগাইর, বামপাইর, চৌয়াই, লতা মনোহর, বৃন্দি, ক্ষিকজ, রঙ্গেরগুড়া, কালিয়াজিড়া, প্রভৃতি ধান অতি উৎকৃষ্ট। আষাঢ় মাসে আর এক রকমের ধান্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহাকে আশু ধান্য বলে। এই ধান প্রায় ২২ রকম জন্মিয়া থাকে। ফাল্গুন মাসে এক রকম ধান্য জন্মিয়া থাকে, উহার নাম বোড়ো। প্রায় ১০ রকমের বোড়ো দেখা যায়। গরিব ও ছোট লোকে আশু বোড়ো ধান্যই প্রায়শঃ ব্যবহার করে। চড়ামদ্দি ও কাউয়ার চরে যে একরকম ধান জন্মে, তত উৎকৃষ্ট ধান্য বাকরগঞ্জের আর কোন স্থানেই উৎপন্ন হয় না। পটুয়াখালি সবডিভিসনের অন্তর্গত কালমেঘা ও বাইন চটকিতে উৎকৃষ্ট বালাম পাওয়া যায়। বাকরগঞ্জে প্রত্যেক বিঘা জমি হইতে গড়ে প্রায় ১২ মন ধান উৎপন্ন হয়।

গম, যব, খেসারী, মুসুরি, মটর, তিল, তিসি, সর্ষপ, প্রায় সর্বত্রই উৎপন্ন হয়। পাট ও আখের চাষ সর্বত্র দৃষ্ট হয়। এদেশে হরিদ্রা, মরিচ, আদা, নারিকেল, চাইলতা, লেবু, সুপারী, আম্র, কাঠাল, আনারস, জাম, তেঁতুল, কলা, খেঁজুর, তাল, দাড়িম, বেগুন, পটল, মূলা, লাউ, আলু, পিঁয়াজ, শসা, ফুট, ক্ষীরই, তরমুজ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মৎস্য

কই, সিং, মাগুর, খলিসা, পুটি, বাটা, বাইন, পোনা, ফেসা, চিতা, রামছোড়, তপস্বী, পায়েরা, ভেটকী, বাইলা, শৈল, গজাল, ফলই, ইলসা, চাইঙ্গ, রুই, কাতল, কালীবায়স, পাঙ্গাস, বোয়াল, সিলন্দ, বাসপাতি, চিঙ্গরী ইত্যাদি মৎস্য বহুল পরিমাণে নদী, খাল পুষ্করিণী ও বিল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাকরগঞ্জ হইতে বার্ষিক প্রায় ১৭০০০ হাজার টাকার মৎস্য কলকাতায় চালান হইয়া থাকে।

পশ্বাদি

ব্যাঘ্র, শূকর, নেকড়িয়া বাঘ, শৃগাল, কুকুর, খাটাস, চিতাব্যাঘ্র, বানর, বিড়াল, বনবিড়াল, খরগোস, হরিণ, মহিষ, অশ্ব, গো, ছাগ, মেষ ইত্যাদি বন্য ও গৃহপালিত পশু এদেশে জন্মে।



দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরাতন ইতিহাস

অতীতের পুরাতন স্মৃতি ধীরে ধীরে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইতে ছিল। যাহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, তাহা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল ও বিস্মৃতি গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে প্রাচীন বিষয় অনুশীলন জন্য তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। সুতরাং প্রাচীন তত্ত্ব, প্রাচীন বিবরণ ও প্রাচীন রহস্য পাঠের উপকারিতা, এখন আর যত্ন করিয়া বা ক্লেশ স্বীকার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা পাইতে হয় না। এই পুস্তক বর্ণিত বাকরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে এ দেশের অনেকাংশ সুগন্ধ বা সোন্ধা নদীর বক্ষে নিহিত ছিল। নলছিটি নদীর উত্তর পাড় হইতে সোন্ধারকুল নামে বাকরগঞ্জে যে একটি সুবৃহৎ অঞ্চল আছে, ঐ অঞ্চল সোন্ধা নদীর চর। সোন্ধা নদীর পূর্ব পাড়কে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, আর পশ্চিমপাড়কে সেলিমাবাদ বলে। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে মিঃ রালফ্ ফিস চট্টগ্রাম হইতে বাকরগঞ্জে ভ্রমণ কালে বাকলারা হিন্দু রাজাকে অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাকলার প্রধান প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইহাকে নিম্ন-নবদ্বীপ বলিয়া সকলেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুর্শিদকুলি খাঁর শাসন সময়ে আগা বকর, বোজরগোমেদপুরের ষোল আনার ও সেলিমাবাদের সাড়ে এগার আনার ভূস্বামী ছিলেন। সম্ভবত ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার নামানুসারেই বাকরগঞ্জ নাম হইয়াছে। বাকরগঞ্জ থানা বোজরগোমেদপুর পরগনার অন্তর্গত। পূর্বকালে বারজন 'ভূঁইয়া' শাসনকর্তা দ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশ শাসিত হইত এবং তাঁহাদিগের মধ্যেই একজন চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন। পটুয়াখালি সব ডিবিশনের অন্তর্গত বাউফল থানার অধীন কচুয়া নামক স্থানে চন্দ্রদ্বীপের পুরাতন রাজধানী ছিল। তথায় দুই একটি পুরাতন দালান ভগ্নদশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে; অপর কোন চিহ্ন নাই। আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায়। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলে একবার জল-প্লাবন হয়, সেই সময়ে চন্দ্রদ্বীপের রাজা পূর্ণানন্দ রায় কতিপয় অমাত্য ও প্রজাবর্গ সহিত নৌকারোহণে অতিকষ্টে জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। এ ঘটনায় বাকরগঞ্জের প্রায় দুই লক্ষ প্রাণীর জীবন নষ্ট হয়। পূর্ণানন্দ রায়ের অতি পূর্বে চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারীর শিষ্য দনুজমর্দন দে, বাঙ্গালা ৬০৬ সালে চন্দ্রদ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারীর নামেই চন্দ্রদ্বীপ পরগনার সৃষ্টি হইয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে, সরকার বাকলা সমুদ্র পাড়ে স্থিত ও দুর্গ বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত।

১৪৬৫ খৃস্টাব্দে (৮৬০ হিজিরা) পটুয়াখালি সব ডিভিসনের অন্তর্গত গুলিসাখালির নিকটবর্ত্তী বিঘাই নদীর তীরে সুন্দরবন মধ্যে, সুলতান মামুদের পুত্র আবুয়াল মোজাফর বারবেকে

রাজত্বকালে মোজাম ও জোয়াল খাঁ একটি অতি মনোরম মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা এখনও বর্তমান রহিয়াছে। একজন ফকির তথায় বাস করেন। শত শত মুসলমান সেখানে গিয়া নামাজ পড়ে। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় উক্ত ফকিরের আহারাদির সংগ্রহ করিয়া দেয়। বাকরগঞ্জ থানার অন্তর্গত সিয়ালগুনী গ্রামে একটিও গৌরনদী থানার এলাকাধীন রামসিদ্ধি নামক গ্রামে আর একটি মসজিদ সৃষ্ট হয়। এতদুভয়ই অতি প্রাচীনকালের স্মৃতি-চিহ্ন। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৬৯ সালে সফি নামক কোন এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান মেহেন্দিগঞ্জে অতীব রমণীয় একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। বাকরগঞ্জ থানার এলাকাধীন নন্দপাড়া গ্রামে আওলিয়ার দরগা প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বারজন ফকির আসিয়া ধর্মচর্চা করিয়া ছিলেন। ওই গ্রামে রুস্তম খাঁয়ের দীঘি বিখ্যাত।

ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত পোনাবালিয়ার নিকটবর্তী শ্যামরাইল নামক স্থানে বিশ্বেশ্বরের একটি মন্দির আছে। তথায় শিবরাত্রির সময়ে শত শত হিন্দু-নরনারী গমন করিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে যে, দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ কবিলে, মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণকালে, সতীর বামহস্তের একটি অঙ্গুলি শ্যামরাইলে পতিত হয় এবং তদবধি শ্যামরাইল পীঠস্থান বলিয়া কীর্তিত হইতেছে। কথিত আছে, বর্তমান উজিরপুরের নিকটবর্তী কোন গ্রামের একটি লোক কাশীর ত্রৈলঙ্গ গোস্বামীর সহিত দেখা করেন। স্বামীজী তাহার নিবাস জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাহার নিজ বাসগ্রামের নাম করেন। স্বামীজি নাকি তাহাতে বুঝিতে না পারিয়া, নিকটবর্তী কোন প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম করিতে বলিলেন। ভদ্রলোকটি উজিরপুরের নাম করেন। স্বামীজি তাহাতেও ঠিক না পাইয়া স্বতই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শিকারপুরের কোন দিকে?' ভদ্রলোকটি যেই বলিলেন, 'শিকারপুরের দক্ষিণে', অমনি স্বামীজি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কি ও সব কি চর পড়িয়াছে?' ভদ্রলোকটি শিকারপুরের দক্ষিণস্থ রৈভদ্রদী নামক গ্রামে বসতি করিতেন। তাহার গ্রামের নামও (দী= দ্বীপ) উহা চর বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। এখন বক্তব্য যে, স্বামীজি ভারতের সমস্ত তীর্থ জানিতেন কি, এখানে উগ্রতারা বাড়িতে আসিয়াছিলেন কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয় ; মাত্র গ্রামটি যে অতি প্রাচীন ; প্রচলিত প্রবাদটি হইতে আমরা তাহা জানিতে পাই।

নথুল্লাবাদের দেবমন্দির 'দক্ষিণ চক্র' নামে অভিহিত। বৎসর বৎসর বহু সংখ্যক যাত্রী তথায় গমন করে। কীর্তিপাশার নিকটবর্তী মঠবাড়ি নামক স্থানে একটি শিবমন্দির আছে। দেখিলে মনে হয়, শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে যে, এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক বৎসর চৈত্র মাসের শেষ দিবসে হিন্দুগণ তথায় উপস্থিত হইয়া বিগ্রহ দর্শন করেন। সে দিবস তথায় চড়ক পূজা হইয়া থাকে। রায়েরকাঠিব সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ির পুরাতন দালানগুলি ও দেবমূর্তি সকল এখনও বর্তমান রহিয়াছে। গৈলা গ্রামের বিজয় গুপ্তের মনসাবাড়ি এখনও পরিষ্কারভাবে রহিয়াছে। বাটাজোড় দত্তের বাড়িতে একটি বালাখানা ও একখানি ঝিকটি দালান অতি প্রাচীনকালের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। দুইশত বৎসরের অধিক কাল গত হইল ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত বারপাইকা গ্রামের কুণ্ডখোলা নামক স্থানে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপ শোনা যায় যে, রূপবান নামক এক ব্যক্তির সহধর্মিনী স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া, প্রজ্জ্বলিত চিতানলে দেহত্যাগ করে। স্বামী বিদেশ হইতে এই সংবাদ শুনিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, স্ত্রীর চিতা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। নির্বাপিত চিতা হইতে তৎক্ষণাৎ অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া, স্বামীকেও ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তদবধি সেই স্থান 'কুণ্ডখোলা' নামে অভিহিত হইতেছে। ঘটনা যাহাই হইয়া থাকুক, কুণ্ডখোলা নাম হওয়া, অবশ্যই বিশেষ কোন ঘটনানুবর্তী তাহার কোন সংশয় নাই।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা সুলতান সুজার আমলে, ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মদেশীয় মগজাতি যখন এ দেশ আক্রমণ করে, তখন সুজা, বরিশালের দক্ষিণ পশ্চিমে সুজাবাদ নামক স্থানে মৃত্তিকার দেয়াল দ্বারা একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সা সুজার নামানুসারেই ওই স্থানের নাম 'সুজাবাদ'

হয়। বাকরগঞ্জের কালেক্টরীয় কাগজে ও সেরেস্তায় ইহার উল্লেখ আছে। ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত রূপসীয়ায় ও ইন্দ্রপাশায় দুইটি দুর্গের চিহ্ন লক্ষিত হয়।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত বারইকরণ নামক স্থানে সরকারি অফিসগুলি সংস্থাপিত ছিল। তথা হইতে বাকরগঞ্জে সদর কাছারি সংস্থাপিত হইয়াছে। এদেশ ইংরাজদিগের অধিকৃত হইলেও প্রায় ৩৫ বৎসরকাল পর্যন্ত বাকরগঞ্জ ঢাকা জেলার অন্তর্গত ছিল। তৎপরে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাকরগঞ্জকে পৃথক একটি জেলা করা হয়। তদবধি এখানে পৃথক একজন মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ঢাকার কালেক্টর সাহেবের হস্তে বাকরগঞ্জের কালেক্টরী সংক্রান্ত সমস্ত কার্যের ভার ছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে কালেক্টরের পদ প্রথম প্রবর্তিত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কালেক্টরের কার্যও করিতেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

বাকরগঞ্জ জেলার নানা স্থানে বিশেষত গৌর নদী থানায় ছবি খাঁর জাঙ্গাল দেখা যায়। আদালতের অনেক কাগজপত্রে জমিদারদিগের হিসাব সেরেস্তায়, ছবি খাঁয়ের জাঙ্গালের উল্লেখ আছে। প্রবাদ আছে যে, তিনি নবাব সরকারে কোতোয়াল কার্য করিতেন বলিয়াই, তাহার নামানুসারে কোটালিপাড়া নাম হইয়াছে। যাহা হউক, অতি প্রাচীনকালে ছবি খাঁ যে একজন খ্যাতনামা ও সম্পন্ন লোক ছিলেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

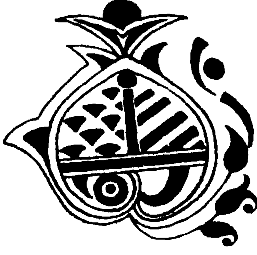
বাকরগঞ্জ হইতে কোটেরহাট পর্যন্ত তথা হইতে সুতালড়ি পর্যন্ত একটি রাস্তা অতি প্রাচীনকালে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সুতালড়ি হইতে মাধবপাশার মধ্য দিয়া মকসদপুর পর্যন্ত ওই রাস্তার বিস্তার দেখা যায়।

ঝালকাঠি স্টেশনের অধীন সুতালড়ি, তারাপাশা চহটা গ্রামে ও গৌরনদী থানার অন্তর্গত মাহিলাড়া গ্রামে বড় বড় মঠ দেখা যায়।

দক্ষিণ সাহাবাজপুরে ১৭৬৫ হইতে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লবণ ও পাথর চুনার কারখানা ছিল। ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত রায়মঙ্গল নামক স্থানে লবণের দুইটি কারখানা ছিল। বাকরগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবপুর ও ন্যামতী স্থানদ্বয় লবণের কারখানা ছিল, প্রায় ৯০ বৎসর হইল ওই কারবার বন্ধ হইয়াছে।

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে জুন তারিখের বিলাতের পার্লামেন্টের রিপোর্টে দেখা যায়, সেলিমাবাদে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে খাজে ওস্মার নামক সাহেবের লবণের কারখানা ছিল। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে বারওয়েল সাহেব লবণের এক কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন।

এদেশে প্রথমে মুসলমান জাতিই প্রধান ছিল। সম্ভবত প্রথমে তাহারাই এদেশে আসিয়া সংস্থাপিত হয়। তাহারাই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে বলপ্রয়োগে বা প্রলোভন দিয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছে। নচেৎ এদেশে মুসলমান সংখ্যা এত অধিক হইত না। বাকরগঞ্জ জেলার পরগনা সমূহের নামে প্রায়ই মুসলমানী নামের চিহ্ন দেখা যায়। তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এদেশে প্রথমে মুসলমান জাতির প্রাধান্য ছিল। কয়েকটি পরগনার নাম এস্থলে উল্লেখ করা গেল। যথা বোজরগোমেদপুর, সেলিমাবাদ, নাজিরপুর, সাহাবাজপুর, আলিনগর, সুলতানাবাদ, কাশিমনগর, খাঞ্জাবাহাদুর নগর, আবদুল্লাপুর, কাদিরাবাদ, আজিমপুর, জাহাপুর, ইদ্রাকপুর, রসলপুর, মইজদ্দি, জালালপুর, সায়েস্তাবাদ, সায়েস্তানগর, সাজাদপুর, সৈদপুর ইত্যাদি।



তৃতীয় অধ্যায়

পরগনার বিবরণ ও রাজস্ব

পরগনার উল্লেখ করিতে হইলেই প্রথমত চন্দ্রদ্বীপ পরগনার বিবরণ একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া মনে হয়। বাকরগঞ্জের ইতিহাসে চন্দ্রদ্বীপের নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্তব্য। এমন এক সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজাসনে স্বাধীন রাজা সমাসীন ছিলেন। এমন একদিন চলিয়া গিয়াছে, যখন লোকের ভিড় ভেদ করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। এখন সে স্থান জন-মানবশূন্য মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কেবল রাজবংশের কয়েকটি যুবক অশ্রুপাত করিতেছেন। অতুল ধন সম্পত্তিপূর্ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়েরা আজ ভিক্ষা প্রার্থী। প্রাচীন মহত্ব, প্রাচীন গৌরব, সমস্তই প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। যে সময় চিরদিনের জন্য অতীতের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে মাত্র কয়েকটি ভগ্ন অট্টালিকা ও দেবমন্দির এবং ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট একটি কামান অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে, চন্দ্রদ্বীপের ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনের জন্য অন্তর্হৃত হইয়াছেন।

জগদ্বিখ্যাত সম্রাট আকবর সাহের রাজস্ব দেওয়ান টোডরমল্ল ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব বিষয়ক বন্দোবস্ত করিবার সময়ে বাকরগঞ্জের বাকলা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীরামপুর; সাহাজাদপুর ও ইদিলপুর নামক আরও তিনখানি মহলের নামোল্লেখ করেন এবং এই পরগনা, চতুষ্টয়ের মোট রাজস্ব ১৭৮২ ৬৬ টাকা ধার্য করিয়াছিলেন।

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সুজার শাসন সময়ে দ্বিতীয়বার রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজস্ব বিষযক বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যাক মনে না করিয়া, মাত্র সুন্দরবন বা মুরাদখানার রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে নবাব জাফর খাঁ তৃতীয়বার রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া যান। বিশেষ কোন পরিবর্তন করেন না। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে মিরকাশিম চতুর্থবার রাজস্বের একটি হিসাব করেন।

সুবিখ্যাত রাজা 'টোডরমল্ল' অতিশয় চিন্তাশীল ও নিরপেক্ষ লোক ছিলেন। সুতরাং তিনি যে রাজস্ব নির্দিষ্ট করেন, তাহা প্রায় দুইশত বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকে। তৎপরে ওয়ারেন হেস্টিংসের ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের প্রবর্তিত রাজস্ব বন্দোবস্তের নিয়ম পত্রানুসারে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে মহামতি লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারদিগের সহিত রাজস্বের দশসালা বন্দোবস্ত করেন ; ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২০০ সনে উক্ত দশসালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বা কায়েম হইয়া যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে বাকরগঞ্জ, ঢাকার কালেক্টরীর অধীন ছিল। মিঃ উইলিয়াম ডগলাস সাহেব তদানীন্তন ঢাকার কালেক্টর ছিলেন। বর্তমান সময়ে পরগনা ও খাঁস মহাল ইত্যাদি হইতে গর্বনমেন্ট ১৭ লক্ষ টাকার অধিক প্রাপ্ত হইতেছেন।

বাকরগঞ্জের কালেক্টরীর পরগনা সমূহের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে বার্ষিক রাজস্ব

ক্রমিক নম্বর	পরগনার নাম	জমিদারির সদর খাজনা	খারিজা তালুকের সংখ্যা	খারিজা তালুকের রাজস্ব	সর্বমোট সদর জমা	মন্তব্য
১	চন্দ্রদ্বীপ	৮২৬২৸৯৪৷৷	৭৩	৫৮১০৪৸৶৮৸	১৪০৬৬৭৷৷/১	
২	গিরিদিবন্দর	০	১	৫৩৷/৪	৫৩৷/৪	
৩	বোজরগোমেদপুর	৩৪৪৬৷৷১১৸	৪০৭	২৬৫৮৯৪৸৯৫	৩০০৪৪১৷৯৪৸	
৪	সেলিমাবাদ	৯৮২৭৲	২০	৪৭৯৮৷১৷৷	১০৩০২৫৷২৷৷	
৫	তপ্পে হাবেলী সেলিমাবাদ	১১৫৫৸৶৫	৯	৩৩২৩৬	১৪৩৭৮৷৲১	
৬	তপ্পে হাবেলী	৬৪৸১০	৫	৪৮৫১৷৷	১১২৪৷৷১৷৷	
৭	ইদিলপুর	৬৫০৪৷৷১১	১১৯	৮৬৩৭৷/৯	৭৪৫৮১৷৶৮	
৮	তপ্পে নজিরপুর	২৮৮৩৪/৸	৪	১৪৬৮৭৷৷/১১	৪৩৪৭০৸৩৷৷	
৯	রত্নদিকালিকাপুর	২৫৩৭৷৷৵৪	৬	৩৩১৪/৬	২৮৫৫১৷৷১০	
১০	উত্তর সাহাবাজপুর	৭৬৪৸৶	২৯৪	১০৮৯৯৷৷/১০৷৷	১৮৫৪৫৷৯৮	
১১	দক্ষিণ সাহাবাজপুর	৪৪৪৩৷৶৫	৪	১৫৩১৷৶৬৷৷	৫৯৯৪৫	
১২	কৃষ্ণদেবপুর	৮১৬	০	০	৮১৬	
১৩	আলিনগর	১৫৭৷৷/৫	০	০	১৫৭৮৷/৫	
১৪	রামনগর	৫১৮৷৶৬	১৫	৩৬৭৬৸৫৷৷	৮৮৬৪৶১১৷৷	
১৫	রামহরিচর	০	১	১১৯৷৬	১১৯৷৬	
১৬	কালমিচর	০	১	১৮৪৬৷৷৯৮	১৮৪৬৷৶৮	
১৭	সুলতানাবাদ	২২১৮৸/৫	১০	৬৪৬৸১	২৬৭৭৫৷৶৬	
১৮	কাসিমনগর জোয়ার দাসপাড়া	১৬৩৸/১১	০	০	১৬৩৩৷৷/১১	
১৯	খাঞ্জাবাহাদুর নগর	৬৪৷৷৷	৫৯	৬৯৮৷৷৶৬	৬৬৬৩৸৷	
২০	শ্রীরামপুর	৪৪১১৸	৮৪	৪৭৯৭৷৷/৪৷৷	৫২৩৮৷৷৬	
২১	তপ্পে আবদুল্লাপুর	৩৫৫৷৶৬	১	৭৭৮	৪৩৪৯৸১৬	
২২	তপ্পে কাদিরাবাদ	৯৬২৶১০৷		৫৯৮৷৷/৩৷	১৫৬১৷৷/২	

২৩	তপ্পে আজিমপুর	২৭৪৸৶৮৷৷	৪১	৭৭৩২৷৷(৯৷৷	১০৪৮২৯	
২৪	পরগনে জাহাপুর	৮৫৩৷৷৶১০	২	৪২৸১১৷৷	৮৯৬৸৯৷৷	এই সকল পরঃ
২৫	ইদ্রাকপুর	৩২৭৮৷৷৶১০	৫২	২০৬০৷৶১০৷৷	৫৩৩৯৯৷৷	ভিন্ন ও অমরাপুর
২৬	রসুলপুর	০	৪৭	৯৮৪(৯৷৷	৯৮৪(৯৷৷	নামে ক্ষুদ্র ১টি
২৭	বাঙ্গোবোরা	৩৬৫৷৶৯৷৷	৯৩৯	২০৭২৪৯	২১০৮৯৷৷/৬৷৷	পরগনা খাস
২৮	বীরমোহন	০	৬৯	২৭২৸/৯৷৷	২৭২৸/৯৷৷	মহালভুক্ত আছে
২৯	তপ্পে বীরমোহন	১৩৷/৪	২৭	২৯৫৷৶১০	৩০৮৸/২	সদর জমা ৭৶
৩০	হবিবপুর	৮৭৮৸৶১১৷৷	০	০	৮৭৮৸৶১১৷৷	আনা
৩১	মেজর্দি	৩৪৫৬	২৩	৪২৭৷৶১০৷৷	৭৭২৷৷৪৷৷	
৩২	জালালপুর	৩৬৫৷৯৪৸	১	১১১৩১৷৷	১৪৭৮৷৬৷	
৩৩	সায়েস্তাবাদ	১০৪০৸৯৷৷	৫	৯৯১৸০	২০৩২৸৷৷	
৩৪	সায়েস্তানগর	১৫৩৭/৬	১৬১	১৪৯২৭৸১০৷৷	১৬৪৯৫৪৷৷	
৩৫	সাজাদপুর	৬৮৯৭৩৷৷	২৬	৮৫০৷৬৷৷	৭৭৪৭৷৯১০	
৩৬	তপ্পে বাহাদুরপুর	৪৯১৩/১	২	৩০৪	৫২১৭/১	
৩৭	পরগনে অরঙ্গপুর	১৪৩৬৪৷৬	২২	৯৬০৪৸৯৷৷	২৩৯৬৯৷৩৷৷	
৩৮	সৈদপুর	১৫৭০৸৶৹	৪	২১৩৪১/৩	২৭৯১২	
৩৯	বৈকুণ্ঠপুর	০	৩২	৭২১৬৷৷১১	৭২১৬৷৶১১	বৈকুণ্ঠপুরের
৪০	তপ্পে লক্ষ্মীরদিয়া	০	২৭	১২৫১৶৬	১২৫১৶৬	জমি নানা
৪১	রাজনগর	০	৯	৪৭১/১০	৪৭১/১০	স্থানে বিভক্ত।
৪২	তপ্পে সফিপুর কোলা	০	৬২	৮৭৭/১১৷৷		দক্ষিণ সাহাবাজপুরেও
৪৩	আমিরাবাদ	০	১	৩৩৬	৩৩৬	কতক জমি আছে।
৪৪	বিক্রমপুর	০	১	৩৪৶৮	৩৪৶৮	বিক্রমপুরের এই
৪৫	গোপালনগর	০	৫	৪৬৭৫	৪৬৭৫	তালুকখানিও
৪৬	দুর্গাপুর	০	১	৪৸/১১৷৷	৪৸/১১৷৷	বাকরগঞ্জ হইতে
৪৭	কাসিমপুর সেলাপট্টি	০	২৭	৭৩১৸৮৷৷	৭৩১৸৮৷৷	খারিজ হইয়া ঢাকায়
						কালেক্টরীভুক্ত হইয়াছে

পরগনা সমূহের গড়পড়তা খাজনার নিরেখ

ক্রমিক নম্বর	পরগনার নাম	কি প্রকারের জমি	গড়পড়তা দর
১	চন্দ্রদ্বীপ	চাষী ও বসতবাড়ি	১২টাকা কানি
২	গিরিডি বন্দর	ঐ	৮০ টাকা ঐ
৩	বোজরগোমেদপুর	ঐ	১৪ টাকা ঐ
৪	সেলিমাবাদ	ঐ	৬ টাকা বিঘা
৫	তপ্পে হাবেলি সেলিমাবাদ	ঐ	৪ টাকা বিঘা
৬	তপ্পে হাবেলি	ঐ	১২ টাকা কানি
৭	ইদিলপুর	ঐ	২৫ টাকা ঐ
৮	তপ্পে নাজিরপুর	ঐ	৩ টাকা বিঘা
৯	পরগনা রত্নদি কালিকাপুর	ঐ	১৮ টাকা কানি
১০	উত্তর সাহাবাজপুর	ঐ	২৭ টাকা ঐ
১১	দক্ষিণ সাহাবাজপুর	ঐ	২৫ টাকা ঐ
১২	কৃষ্ণদেবপুর	ঐ	১৮ টাকা ঐ
১৩	আলিনগর	ঐ	২০ টাকা ঐ
১৪	রামনগর	ঐ	৪ টাকা ঐ
১৫	রামহরি চর	ঐ	১২ টাকা ঐ
১৬	কালমি চর	ঐ	১২ টাকা ঐ
১৭	সুলতানাবাদ	ঐ	২২ টাকা ঐ
১৮	কাসিমনগর জোয়ার দাসপাড়া	ঐ	১৪ টাকা ঐ
১৯	খাঞ্জাবাহাদুর নগর	ঐ	১২ টাকা বিঘা
২০	শ্রীরামপুর	ঐ	২ টাকা ঐ
২১	তপ্পে আবদুল্লাপুর	ঐ	৩ টাকা ঐ
২২	তপ্পে কাদিরাবাদ	ঐ	৮ টাকা ঐ
২৩	তপ্পে আজিমপুর	ঐ	১৬ টাকা কানি
২৪	জাহাপুর	ঐ	২টাকা ঐ
২৫	ইদ্রাকপুর	ঐ	১ টাকা বিঘা
২৬	রসুলপুর	ঐ	১০ টাকা কানি
২৭	বাঙারোড়া	ঐ	১৮ টাকা ঐ
২৮	বীরমোহন	ঐ	৭ টাকা ঐ
২৯	তপ্পে বীরমোহন	ঐ	৭ টাকা ঐ
৩০	হবিবপুর	ঐ	৬ টাকা ঐ
৩১	মইজদ্দি	ঐ	২০ টাকা ঐ
৩২	জালালপুর	ঐ	৫ টাকা ঐ
৩৩	সায়েস্তাবাদ	ঐ	১২ টাকা ঐ
৩৪	সায়েস্তানগর	ঐ	২ টাকা বিঘা
৩৫	সাজাদপুর	ঐ	২ টাকা ঐ
৩৬	তপ্পে বাহাদুরপুর	ঐ	২ টাকা ঐ
৩৭	অরৎপুর	ঐ	২ টাকা ঐ

৩৮	সৈদপুর	ঐ	৩ টাকা ঐ
৩৯	বৈকুণ্ঠপুর	ঐ	২ টাকা ঐ
৪০	তপ্পে লক্ষ্মীর দিয়া	ঐ	৫ টাকা বিঘা
৪২	তপ্পে সফিরপুর কোলা	ঐ	১ টাকা বিঘা
৪৩	আমিরাবাদ	ঐ	১০ টাকা কানি
৪৪	গোপালপুর	ঐ	১২ টাকা ঐ
৪৫	দুর্গাপুর	ঐ	৮ টাকা ঐ
৪৬	কাশিমপুর সেলাপট্টি	ঐ	১ টাকা বিঘা

পরগনাসমূহের নাম

(১) চন্দ্রদ্বীপ, (২) গিরিধি বন্দর, (৩) বোজরগোমেদপুর, (৪) সেলিমাবাদ, (৫) তপ্পে হাবেলি সেলিমাবাদ, (৬) তপ্পে হাবেলি, (৭) ইদিলপুর, (৮) তপ্পে নাজিরপুর, (৯) পরগনা রত্নদি কালিকাপুর, (১০) উত্তর সাহাবাজপুর, (১১) দক্ষিণ সাহাবাজপুর, (১২) কৃষ্ণদেবপুর, (১৩) আলিনগর, (১৪) রামনগর, (১৫) রামহরিচর, (১৬) কালমিচর, (১৭) সুলতানাবাদ, (১৮) কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়া, (১৯) খাঞ্জাবাহাদুর নগর, (২০) শ্রীরামপুর, (২১) তপ্পে আবদুলাপুর (২২) তপ্পে কাদিরাবাদ, (২৩) তপ্পে আজিমপুর, (২৪) বাঙারোড়া, (২৮) বীরমোহন, (২৯) তপ্পে বীরমোহন, (৩০) হবিবপুর, (৩১) মহজদি, (৩২) জালালপুর, (৩৩) সায়েস্তাবাদ, (৩৪) সায়েস্তানগর, (৩৫) সাজাদপুর (৩৬) তপ্পে বাহাদুরপুর, (৩৭) পরগনা অরঙ্গপুর, (৩৮) সৈদপুর, (৩৯) বৈকণ্ঠপুর, (৪০) তপ্পে লক্ষ্মীরদিয়া, (৪১) রাজনগর, (৪২) তপ্পে সকিপুর কোলা, (৪৩) আমিরাবাদ, (৪৪) গোপালপুর, (৪৫) দুর্গাপুর এবং (৪৬) কাশিমপুর শেলাপট্টি।

যে সকল পরগনার উল্লেখ হইয়াছে, তারমধ্যে সৈদপুর পর্যন্ত ৩৮টি পরগনা অল্পাধিক বা সম্পূর্ণরূপে বাকরগঞ্জের এলাকাধীন রহিয়াছে। বক্রী ৮ টি পরগনা, ফরিদপুর ও ঢাকা জিলার অন্তর্গত হওয়ায় জমিদারির রাজস্ব ফরিদপুর ও ঢাকার কালেক্টরীতে দাখিল হইয়া থাকে। কেবল কতকগুলি তালুকের খাজানা বাকরগঞ্জের কালেক্টরীতে দাখিল হয় বলিয়াই এস্থলে ঐ পরগনা গুলির নামোল্লখ হইয়াছে।

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগনাগুলিকে বাদ দিয়া সমস্ত বাকরগঞ্জকে নিম্নলিখিত প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা, বাকরগঞ্জের উত্তরভাগে, বাঙোরোড়া, বীরমোহন, ইদ্রাকপুর এবং চন্দ্রদ্বীপ। পূর্বভাগে উত্তর সাহাবাজপুর, দক্ষিণ সাহাবাজপুর, ইদিলপুর, সুলতানাবাদ, নাজিরপুর এবং রত্নদি কালিকাপুর। মধ্য ও পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্ব দক্ষিণ ভাগে চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ, বোজরগোমেদপুর এবং অরঙ্গপুর, পশ্চিমভাগে সেলিমাবাদ এবং সৈদপুর। দক্ষিণ ভাগ সুন্দরবন নামক মহা অরণ্যে আবৃত। সুন্দরবন কোন পরগনা ভুক্ত হয় নাই; ইহার পুরাতন নাম মুরাদখানা বা জিরাদখানা, উল্লিখিত প্রধান প্রধান পরগনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইল।

১ চন্দ্রদ্বীপ

(বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত)

চন্দ্রদ্বীপ, বাঙ্গালার অন্তর্গত সমুদ্রের নিকটবর্তী একটি বিস্তীর্ণ জনপদ। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ইহারই অধিকাংশ বগলা (বাকলা) সরকার নামে বর্ণিত।

চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রথমটি—বিক্রমপুর পরগনার চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামে ভগবতী মন্ত্রে দীক্ষিত এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঘটনা ক্রমে তিনি

ভগবতী নামী এক কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথমে তিনি জানিতে পারেন নাই, জানিতে পারিলে তাঁহার এক আশঙ্কার সীমা রহিল না—ভাবিলেন, লোকে কি আমাকে পত্নী উপাসক বলিবে? বরং প্রাণত্যাগ করিব, তবু এমন দুষ্কর্ম করিব না। তিনি নৌকায় করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিলেন, তখন বিক্রমপুরের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। একদিন সমস্ত রাত্রি নৌকা করিয়া সাগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ভাবিয়াছিলেন যে, এখানে আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না ; কিন্তু পরদিন প্রত্যূষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় এক ধীবর কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। চন্দ্রশেখর অবাক। তিনি ভাবিলেন, বোধহয় স্বয়ং ভগবতী ছলনা করিবার জন্য এই দুস্তর জলধি মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তিনি অবিলম্বে সেই কন্যার তরণীতে উঠিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। প্রথমে ভগবতী ধীবর কন্যা বলিয়াই আপনার পরিচয় দিয়াছিলেন। শেষে যখন দেখিলেন চন্দ্রশেখর ভুলিবার ছেলে নয়, তখন পরিচয় দিলেন, "আমি তোমার ইষ্ট দেবী ভগবতী।" আমার বরে এইখানে চরা পড়িয়া দ্বীপ উৎপন্ন হইবে। তুমি অধিকার করিবে এবং তোমার নাম অনুসারে ইহা চন্দ্রদ্বীপ নামে খ্যাত হইবে।" বর দিয়া ভগবতী অন্তর্হৃতা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জল সরিয়া চর দেখা দিল।

২য় প্রবাদ এই—চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। দনুজমর্দন দে নামে তাঁহার এক শিষ্য ছিল। সন্ন্যাসী শিষ্যকে লইয়া সর্বদাই বেড়াইতেন। একদিন রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যেন কালী দেবী দেখা দিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন —"এই জলের মধ্যে কতকগুলি দেবীমূর্তি আছে। ঐ সকল উদ্ধার কর।" পরদিন সন্ন্যাসী শিষ্যকে তিনবার ডুব দিতে বলেন। শিষ্য তিন ডুবে তিনটি দেবীমূর্তি তুলিলেন (১) দুর্ভাগ্যক্রমে আর ডুব দিতে হইল না, তাহা হইলে লক্ষ্মীমূর্তি পাইতেন ও রাজ্যও চিরস্থায়ী হইত। চন্দ্রশেখর এই ভবিষ্যৎবাণী বলিলেন যে, ঐ স্থান শুষ্ক হইয়া চর হইবে ও দনুজ তাহার রাজা হইবেন। চন্দ্রশেখরের আদেশে ও নামানুসারে ইহার নাম চন্দ্রদ্বীপ হইল।

আবার ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—(২) এখানকার সমস্ত ভূমি পূর্বে জলময় ছিল, মহাদেবের প্রসাদে ও তাহার ললাটস্থ অগ্ন্যুত্তাপে সেই জল শুষ্ক হয়। চন্দ্রচূড়ের মস্তকস্থ চন্দ্র কলার কিরণে এই দ্বীপ সিক্ত হইয়াছিল। (বোধ হয় ব্রহ্মখণ্ডকার ইহা চন্দ্রদ্বীপ নামে অভিহিত করিয়াছেন।)

বাস্তবিক চন্দ্রদ্বীপের নাম কেন হইল? তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই।

প্রাচীন সীমা—দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃতি নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে একস্থানে লিখিত আছে—

পূর্বে মধুমতী সীমা পশ্চিমে চ ইছামতী।
বাদা ভূমি দক্ষিণে চ কুশদ্বীপোহি চোত্তরে,
সমন্তাৎ মাস মার্গস্য শাসকোহম্ মহীপতিঃ।

পূর্ব সীমা মধুমতী পশ্চিমে ইছামতী নদী, দক্ষিণে বাদা ভূমি এবং উত্তরে কুশদ্বীপ।

পূর্ব সীমা মেঘনা নদী, পশ্চিমে বলেশ্বরী, উত্তরে ইদিলপুর ও দক্ষিণভাগে সুন্দরবন। ইহার মধ্যে গিরি বর্জিত সোমকান্ত, ইহার পরিমাণ ৩০ যোজন। সোমকান্তের মধ্যে আবার দুইটি জনপদ আছে— পশ্চিমে জম্বুদ্বীপ ও উত্তর ভাগে স্ত্রীকার—মধ্যভাগে বাক্‌লা নামক রাজধানী।

যদি দিগ্বিজয় প্রকাশের বিবরণ প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে কোন সময়ে বাক্‌লা, চন্দ্রদ্বীপ হইতে ভিন্ন বলিয়া গণ্য ছিল। খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দি হইতে আমরা চন্দ্রদ্বীপের স্থলে বাক্‌লার উল্লেখ দেখিতে পাই। বাদশাহ আকবরের সময়ে বাক্‌লা একটি স্বতন্ত্র সরকার, ইস্‌মাইলপুর, শ্রীরামপুর, সাহাজাদপুর ও আদিলপুর (ইদিলপুর) এই চারিটি মহালে বিভক্ত ছিল, এখানে ১৫০০ পদাতিক ও ৩২০ গজ থাকিত। এই সরকার হইতে মোট ৭১৫০৬০৫ দাম অর্থাৎ ১৭৮৭৬।।১৫ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। (আইন-ই-আকবরী)

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপস্থ এই কয়টি নগর ও গ্রামের উল্লেখ আছে ; যথা—ব্রহ্মপুর (নগর), বারাণসীপুর, সহ্যশাল, নালিকা সরিৎ পার্শ্বে কুমুদগ্রাম, কোটালি, কাকিনাগ্রাম, কণ্ঠস্থালী, বেণুবাটি, রনানদীর নিকট ডম্বুর, বেদীনগর, যাদবপুর, বেত্রগ্রাম, তোলগ্রাম, ধুরগ্রাম, কাকুলগ্রাম, সুরাগ্রাম, মাধব পার্শ্ব ও পিসল পত্তন।

উপরোক্ত মহাল ও নগরাদির অবস্থান অনুসারে বোধহয় একসময়ে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ বর্তমান খুলনা, বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে, বাকরগঞ্জ জেলাই প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মগদিগের উৎপাতে এই বিস্তৃত জনপদের দক্ষিণাংশ উৎপন্ন হয়, অধিকাংশ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ জঙ্গলময়। সুন্দরবনরূপে পরিণত হয়।

ইতিহাস—চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ লেখকের মতে বিক্রমপুর হইতে সমাগত দনুজমর্দন সেই চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমাজপতি। ইনিও মুসলমান ইতিহাসে দনুজরায় বা নৌজা ও প্রাচীনতম কুলাচার্যকারিকায় দনৌজমাধব নামে বিখ্যাত।

ইনি গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন দেবের প্রপৌত্র। ফিরোজসাহী নামক পারস্য ইতিহাসে লিখিত আছে—দনুজ রায় সুবর্ণ গ্রামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। যৎকালে সম্রাট বলবন তুগ্রিল খাঁকে দমন করিতে আসেন, সেই সময়ে (১২৮০ খৃস্টাব্দে) ইনি জলপথে বলবনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি অবশেষে সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন।

দনৌজমাধবের বা দনুজ রায়ের পুত্র রামাবল্লভ রায়। ইনিও পিতার প্রদর্শিত কুলবিধি রক্ষার জন্য আবও কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন (৩) ইনি নিজ নামে একটি নগর ও স্থাপন করেন, (৪) তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ রায়, তৎপুত্র হরিবল্লভ রায়, (৫) তৎপুত্র জয়দেব রায়। দনুজ রায় লইয়া এই পাঁচজন (৬) চন্দ্রদ্বীপে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছেন।

জয়দেব রায়ের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার ভাগিনের বলভদ্র বসুর পুত্র পরমানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। রাজা পরমানন্দ কায়স্থগণের কৌলীন্য সম্বন্ধে অনেক নিয়ম করেন। পূর্বে বঙ্গজ কায়স্থদিগের ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা হইত। তাঁহার সময়ে বসু, ঘোষ, গুহ মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা হইতে আরম্ভ হয়। আইন-ই-আকবরীর মতে পরমানন্দের পিতা বাক্‌লায় রাজত্ব করিতেন। আকবরের ২৯শ বর্ষে ঐ স্থানে বেলা ৩টার সময় এক ভয়ানক জলপ্লাবন হয়, তাহাতে প্রায় সমস্ত ঘর দ্বার ভাসিয়া যায়। রাজা সেই সময়ে আমোদে মত্ত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি একখানি নৌকায় উঠিয়া পড়েন, তাঁহার পুত্র পরমানন্দ রায় ও কতকগুলি লোক একটা মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। চারি ঘণ্টা পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সহিত সমুদ্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল, উক্ত মন্দির ব্যতীত আর সমস্তই সাগরের গর্ভশায়ী এবং প্রায় দুই লক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হয়।

(৭) কিন্তু চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশাবলী ও প্রাচীন কুলাচার্যকারিকায় পরমানন্দই চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তৎপুত্র রাজা জগদানন্দের সময়েই নদীর স্রোত প্রবলবেগে রাজবাটি পর্যন্ত ধাবিত হয়। বাজা জগদানন্দই নদীগর্ভে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি নিজে বাকরগঞ্জের নিকট কচুয়া নামক স্থানে রাজত্ব [দিগ্বিজয় প্রকাশে চন্দ্রদ্বীপের রাজা অম্বু রায় নামে অভিহিত হইয়াছেন।] করিতেন। রাজা জগদানন্দের কন্যা কমলা এখানে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করেন, এখনও ঐ পুষ্করিণীর চিহ্ন রহিয়াছে।

রাজা জগদানন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, তৎপুত্র মহাবল কন্দর্পনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৫৮৬ খৃস্টাব্দে ইনি রাজত্ব করিতেন। রালফ ফিচ্ প্রভৃতি বৈদেশিক ভ্রমণকারী ইহার গুণের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। (কন্দর্পনারায়ণ শব্দ দেখ)

চন্দ্রদ্বীপের রাজবাটিতে একটি বৃহৎ পিত্তলের কামান আছে, ঐ কামানের উপর বঙ্গাক্ষবে কন্দর্পনারায়ণের নাম ও ৩১৮ অংক খোদিত (৮)।

মঘের দৌরাত্ম্যে কন্দর্পনারায়ণ কচুয়া পরিত্যাগ করিয়া, বরিশালের পূর্বোত্তর কোণে বাসুবিকাটি গ্রামে এক রাজধানী করেন। পরে ঐ স্থান ছাড়িয়া যথাক্রমে পঞ্চকরণের নিকটবর্তী হোসনপুর ও ক্ষুদ্রকাঠিতে কিছুকাল বাস করেন। শেষে মাধবপাশা নামক স্থানে উঠিয়া যান। পূর্বোক্ত স্থান সমূহে এখনও প্রাচীন মন্দির ও ভগ্ন ইষ্টকালয়াদির চিহ্ন পড়িয়া আছে।

মাধবপাশায় একজন মুসলমান গাজী বাস করিতেন। তাঁহাকে বধ করিয়া, কন্দর্পনারায়ণ এই স্থানে রাজধানী নির্মাণ করেন। এখনও তাহা বিদ্যমান আছে। (৯)

কন্দর্পনারায়ণের পর তৎপুত্র রামচন্দ্র রায় রাজা হন। যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহ রাত্রে প্রতাপাদিত্য তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিয়া কায়স্থের সমাজ পতিত্ব ও চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য অধিকার করিবেন, পত্নীর মুখে এই সংবাদ পাইয়া, তিনি বসন্ত রায় ও সর্দার রামমোহন মালের সাহায্যে ৬৪ দাঁড় কোষ নৌকায় করিয়া চন্দ্রদ্বীপে চলিয়া আসেন। কয়েক বৎসর পরে যশোর রাজকন্যা কাশী যাত্রাচ্ছলে নৌকাযানে চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হন। কিন্তু এখানে বহুদিন অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার ভাগ্যে স্বামী দর্শন লাভ ঘটে নাই। প্রথমে তিনি যে ঘাটে থাকিতেন, সেখানে সপ্তাহে দুইবার হাট বসিত। এখন সেইখানে হাট নাই। কিন্তু সেই স্থান "বউ ঠাকুরানির হাট" নামে প্রসিদ্ধ। রামচন্দ্র মহিষী সারসী গ্রামের নিকটও কিছুদিন ছিলেন। ঐ গ্রামে এক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন।

রাজা রামচন্দ্র ভুলুয়ার প্রসিদ্ধ বীর লক্ষ্মণ মাণিক্যকে বন্দি করিয়া চন্দ্রদ্বীপে আনিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার সাহস ও বীবত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের পুত্র রাজা কীর্তিনারাযণ রায়। ইনি নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন, মেঘনার উপকূল হইতে ফিরিঙ্গিদিগকে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দেন ; তাহা শুনিয়া, ঢাকার নবাব কীর্তিনারায়ণের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করেন। দৈবক্রমে একদিন যুদ্ধ যাত্রাকালে ইনি নবাবের ভোজ্য দ্রব্যের ঘ্রাণ পাইয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি জাতিভ্রষ্ট হন ও কনিষ্ঠ বাসুদেবনারায়ণের হস্তে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য সমর্পণ করেন। বাসুদেবের পর তৎপুত্র প্রেমনারাযণ রাজা হন।

প্রেমনারায়ণের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। বসু বংশীয় এই ৮টি রাজা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন।

প্রেমনারায়ণের পর তাঁহার পিতৃ-দৌহিত্র মিত্রবংশীয় উলাইল নিবাসী গৌরীচরণ মিত্র মজুমদারেব পুত্র উদয়নারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন অধিকার করেন। উদয়নারায়ণের এক সহোদর ছিলেন, তাহার নাম রাজা বাজনারায়ণ রায়। তিনিও মাতামহীর উত্তরাধিকার সূত্রে "রাজমাতা তালুক" নামে এক বৃহৎ তালুক ও চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত মহাল হিস্যাজাত ও মহাল উজুহাত এই কয় সম্পত্তি পাইয়া মাধবপাশার নিকট প্রতাপপুরে বাস করেন। তথায় এখনও তাঁহার বংশীয়গণ বাস করিতেছেন। কিন্তু এখন আর তাঁহাদের সে মহামূল্য সম্পত্তি নাই।

উদয়নারায়ণ হইতে মিত্রবংশীয় এই কয়পুরুষ চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন— (১) রাজা উদয়নারায়ণ রায়, (২) রাজা শিবনারায়ণ রায় (৩) রাজা জয়নারায়ণ রায়, (৪) রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায় (৫) রাজা বীরনারায়ণ রায় (দত্তক), (৬) রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ (দত্তক)।

রাজা উদয়নারায়ণের রাজ্য লাভের পরই নবাবের শ্যালক খাদি মজুমদার তাঁহাকে অধিকার চ্যুত করেন। পরে নবাবের আদেশে উদয়নারায়ণ এক ব্যাঘ্রকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পুনরায রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা শিবনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপ ব্যতীত মুলতান প্রতাপ পরগনার ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন দালালকে উহার সমস্ত অংশ লিখিয়া দিয়া উলাইল নিবাসী দেবপ্রসাদ মিত্র

মজুমদারকে ফাঁকি দিতে যান, তাহাতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা ১১৭৯ সালে ২২ শে অগ্রহায়ণ ঐ মোকদ্দমার রায় প্রকাশ হয়। ইহাতে রাজা শিবনারায়ণের যথেষ্ট কলঙ্ক হইয়াছিল।

রাজা জয়নারায়ণ বাল্যকালেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। এই সময়ে তাঁহার কর্মচারী শঙ্কর বক্সী অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্যে জয়নারায়ণের মাতা দুর্গারানী কতকাংশ ফিরাইয়া দেন। ঐ রানী বিস্তৃত অর্থ ব্যয় করিয়া, এক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, তাহা এখন দুর্গাসাগর নামে খ্যাত। রাজা জয়নারায়ণের সময় দশশালা বন্দোবস্ত হয়। তাহাতে পরগনা কোটালিপাড়া, ইদিলপুর সুলতানাবাদ, বোজরগোমেদপুর প্রভৃতি কয়েকটি স্থান পৃথক হয়, তবুও যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা এক বৃহৎ জমিদারি, তাহারই বন্দোবস্ত হইল।

তখনকার লোকের নির্দিষ্ট দিনে খাজনা লইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইতে অভ্যাস ছিল না। অবধারিত দিনে এই আইন জারী হইলে, রাজার অর্থলোভী দুষ্টাশয় কর্মচারীদিগের দোষে ক্রমে ক্রমে সমুদয় সম্পতি নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। রাজার নিষ্কর খামারবাড়ি ও কয়েকখানি নিকমী তালুক মাত্র তাঁহার বর্তমান সম্পত্তি।

মিত্রবংশীয়দের রাজত্বের পূর্বে যে বসুবংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ এখনও দেহেরগাতি গ্রামে বাস করিতেছেন ও চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় তাঁহারা যুবরাজ উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান রাজগণের অবস্থা মন্দ হইলেও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে এখনও তাঁহারা যথেষ্ট সম্মানিত। চন্দ্রদ্বীপের বার্ষিক রাজস্বে ৮২৫৬২৮৯৪।।.পাই। ৭৩ খানা পৃথক তালুকের রাজস্ব ৫৮১০৪।।.৯৮।। পাই।

২ বোজরগউমেদপুর

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সায়েস্তা খাঁয়ের শাসন সময়ে, তাঁহার ভ্রাতা বুর্জাগোমেদ খাঁয়ের নামানুসারে "বোজরগোমেদপুর" পরগনাব নামাকরণ হইয়াছে। আগা বকরের মৃত্যুর পর এই পরগনা রাজা রাজবল্লভের শাসনাধীন ছিল। প্রাচীন কালে এই পরগনার পরিসর অতি ক্ষুদ্র ও রাজস্ব অত্যল্প ছিল। পরে ঘটনার পরিবর্তনে রাজস্ব ও পরিসর বৃদ্ধি পাইয়া ৬০০ হাজার টাকা স্থলে ৩ লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব ধার্য হইয়াছে। বাকরগঞ্জের নিকটবর্তী গোলাবাড়ি নামক স্থানে বোজরগোমেদপুর রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। এখনও তথায় রাজধানীর ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। রাজা রাজবল্লভ বৈদ্য বংশজাত। তাঁহার সাত পুত্র, তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস ও গোপালকৃষ্ণ নামক পুত্রদ্বয় আমাদিগের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। কৃষ্ণদাসের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনিই সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে কলিকাতায় পালাইয়া গিয়া ধন সম্পত্তি রক্ষা করেন ও তাঁহাকে নিয়াই পলাশীর যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং বঙ্গদেশ মুসলমান হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। গোপালকৃষ্ণ ঝালকাঠির নিকটবর্তী সুতালড়িতে, পরগনার রাজধানী স্থাপন করেন। বোজরগোমেদপুরের অন্তর্গত শিবপুর একটি প্রধান গ্রাম, এই স্থান বাকরগঞ্জ থানা হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ডোমিঙ্গো ডি সেলভা সাহেব শিবপুরস্টেট স্থাপয়িতা। তাঁহার বংশাবলী এখন শিবপুরে "ফিরিঙ্গি" নামে অভিহিত হইতেছেন। বামনার চৌধুরিগণ বোজরগোমেদপুরের প্রধান খারিজা তালুকদার। এখন তাঁহাদিগের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায়, গাথসাহেবের নিকট স্টেট ইজারা পত্তন করিয়াছেন। বামনা বিষখালির পাড়ে অবস্থিত। বার্ষিক রাজস্ব ১৯৪৮৭।।.৯৮পাই। মহম্মদ সফি ইহাদিগের আদিপুরুষ বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করেন। তিনি ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে বোর্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বামনা স্টেটের বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন।

রহমতপুরের চক্রবর্তী, নারায়ণপুরের চক্রবর্তী, খাজে আসানুল্লা, রসিকচন্দ্র নিয়োগী, চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়, ব্রাউন সাহেব, প্রসন্নকুমার সেন, চন্দ্রকুমার সেন. রাজাবাহাদুর, গোমেজ সাহেব, ডিসেলভা, ভগবতী দেবী ও সায়েস্তাবাদেব মির সাহেব, এই পরগনার প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী। বোজরগোমেদপুরের অন্তর্গত আবদা ফুলঝুরির পত্তনীদার, রামধন চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরগণ

ঢাকার হাফিজউল্লার নিকট ১২১৯ সালের ২৭ শে চৈত্র তারিখে ২১০০ টাকা মূল্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি আয়লা ও ফুলঝুরি বিক্রয় করেন। আফিজউল্লা আয়লা ফুলঝুরির তিন আনা অংশ সায়েস্তাবাদের গোলাম ইমামকে দান করেন। অদ্যাপিও আয়লা ফুলঝুরি ঢাকার খাজে সাহেব ও সায়েস্তাবাদের মির সাহেবের হস্তে রহিয়াছে। স্থানীয় গর্ভনমেন্ট আয়লা ফুলঝুরি অত্যল্প টাকার পত্তন দিয়া যে অত্যল্প ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন, তাহার সংশয় নাই। বার্ষিক রাজস্ব মাত্র ৩৭২।০ আনা। এক লক্ষ টাকার উপরে জমিদারের আয় হইতেছে। বোজরগোমেদপুরের সদর জমা ৩৪৫৪৬।।১১পাই। এতদ্ব্যতীত ৪০৭ খানা তালুকের পৃথক রজস্ব ২৬৫৮৯৪৷৯৫ পাই মোট ৩০৪৪১।৯৪।.পাই বার্ষিক রাজস্ব।

৩ সেলিমাবাদ

সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিমের নামানুসারে সিলেমাবাদ বা সেলিমাবাদ নাম হইয়াছে। পূর্বোল্লিখিত সুগন্ধা বা সোন্ধা নদীর পশ্চিম পাড়কে সেলিমাবাদ বলে। (দক্ষালয়ে সতী প্রাণত্যাগ করিলে, মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণকালে বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ৫১ খণ্ডে বিভক্ত হয়। দেবীর নাসিকা এই নদীগর্ভে পতিত হইয়াছিল বলিযা, ইহার নাম "সুগন্ধানদী" হইয়াছে।)

পিরোজপুর, স্বরূপকাঠি ও ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত সেলিমাবাদ পরগনার বিস্তৃতি। রাজা বাহাদুর ও রায়েরকাঠির চৌধুরিগণ সেলিমাবাদের প্রধান জমিদার। রোহিনীকুমার রায়, শশিকুমার রায়, বাসন্ডার মহলানবিশ ও জলাবাড়ির বিশ্বাস বংশীয়েরা সেলিমাবাদের প্রধান তালুকদার। জমিদারির বার্ষিক রাজস্ব ৯৮২২৭১ পাই। ২০ খানা তালুকের পৃথক খাজনা ৪৭৯৮।.১।।.পাই। কলিকাতার নিকটবর্তী ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবার সেলিমাবাদের ।।১২।। ক্রান্তির ভূস্বামী। ঘোষাল পরিবার চিরদিনই সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও গভর্নমেন্টের নিকট সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। গভর্নমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঘোষাল পরিবারকে "রাজা বাহাদুর" খেতাবী দিয়াছেন। রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর ঝালকাঠির সংলগ্ন, সুতালড়ীতে একটি কাছারি বাড়ি নির্মাণ করেন। বাকরগঞ্জের প্রসিদ্ধ বন্দর ঝালকাঠি রাজা বাহাদুরের জমিদারির অন্তর্গত। ১৭৮৯ খৃস্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে ২৯৫০০ টাকায় সেলিমাবাদের জমিদারি রাজা বাহাদুরের পক্ষ হইতে ক্রয় করা হয়।

৪ ইদিলপুর

ইদিলপুরের জমিদারগণ দীর্ঘকাল আপনাপন জমিদারির স্বত্ব ভোগের সুবিধা পাইয়া, এরূপ জটিল ভাবে জোতগুলিকে বিভক্ত ও রাজস্ব আদায়ের কুটিল পন্থা অবলম্বন করিতেন যে, তাহারা ভিন্ন আর কাহারও সহজে তাহা বুঝিয়া উঠিবার উপায় ছিল না। বাঙ্গালা ১১৭০ সালে রামবল্লভ এই পরগনার জমিদার ছিলেন। ইদিলপুরের চৌধুরী বংশ পূর্বকালে ডাকাইতের সহায়তা করিতেন। গভর্নমেন্টের খাজনা আদায় পক্ষে অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে হইত। সদর জমা এক সময়ে ৮৩৫০৬ টাকা স্থির হইলে, চৌধুরিগণ দলবদ্ধ হইয়া পরগনা ছাড়িয়া দিলেন। গভর্নমেন্ট বাধ্য হইযা সম্পত্তি খাসে নিলেন। ইতিপূর্বেও গভর্নমেন্ট মানিক বসু নামক এক ব্যক্তিকে সাত বৎসরের জন্য বার্ষিক ৮১১১৫ টাকা জমায় জমিদারি পত্তন দিয়াছিলেন। তদ্দারাও গভর্নমেন্টের কোন সুবিধা না হওয়ায় পুনরায় ১১৯৬ সালে চৌধুরিদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, ৮০,০০০ টাকা জমায় পরগনা ছাড়িয়া দিলেন। আবার এক বৎসর পরে চৌধুরিগণ জমিদারি ছাড়িয়া দিলেন। পুনরায় গভর্নমেন্ট সম্পত্তি খাসে লইলেন। সে বৎসর অর্থাৎ ১১৯৭ সালে মাত্র ৫৪৭৬৯ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। জমিদারগণ আর কিছুতেই জমিদারি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমাগত গোলযোগই চলিতে লাগিল। অবশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারেরা মহাগোলযোগ আরম্ভ করিয়া দিলেন। বাঙ্গলা ১১৯৮ সালে রামবল্লভ রায়, কৃষ্ণবল্লভ রায় ও নরসিংহ রায় জমিদারির বন্দোবস্ত

নিয়া, গভর্নমেন্টের রাজস্ব বন্ধ করেন। তখনকার প্রথানুসারে গভর্নমেন্ট রিভিনিউ বোর্ডে চৌধুরিদিগের নামে নালিশ করিয়া ডিক্রি পাইলেন। পুনরায় ১২১৪ সালে গভর্নমেন্ট চৌধুরিদিগের সহিত এক কিস্তিবন্দি করেন। চৌধুরিগণ চিরদিনই দাঙ্গাবাজ, তাঁহাদিগের সহিত গভর্নমেন্ট আর কিছুতেই সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কিস্তিবন্দির টাকা বন্ধ করিলেন। ১৮১২ খৃস্টাব্দে জমিদারি নিলাম হইল ও মোহিনীমোহন ঠাকুর ক্রয় করিলেন এবং তদবধি ঠাকুর বংশীয়েরাই ইদিলপুরের মালিকী স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইদিলপুরের অন্তর্গত মেহেন্দিগঞ্জ থানায় কোষ, পান্সি নৌকা প্রস্তুত হয়। ইদিলপুর অনেক ব্রাহ্মণের বসতি স্থান। জমিদারির রাজস্ব ৬৫৯০৪।.১১ পাই ও জমিদারির অন্তর্গত ১১৯ খানা তালুকের সদর জমা ৮৬৩৭।/৯ পাই, মোট ৭৪৫৪১।।/৮ পাই বার্ষিক রাজস্ব।

৫ নাজিরপুর

বরিশাল সদরের অন্তর্গত, এই পরগনার চৌদ্দ আনি অংশ বাকি করের নিলামে ১৮১৯ খৃস্টাব্দে কলিকাতার ঠাকুর ফেমিলি ক্রয় করেন। ১৮৩০ খৃস্টাব্দে তাঁহারাই পানিয়টী সাহেবের নিকট হইতে পরগনার বক্রী দুই আনি খাষ খরিদ করেন। এই প্রকারে সমস্ত নাজিরপুর ও পূর্বোল্লিখিত সম্যক ইদিলপুর পরগনা ঠাকুরবংশীয়দিগের হস্তগত হইল, ইহারাই বর্তমান সময়ে বাকরগঞ্জের প্রধান জমিদার। নাজিরপুরের জমিদারির সদর জমা ২৮৭৮৩/৪।।. পাই। ৪ খানা তালুকের রাজস্ব ১৪৬৮৭।।/১২৷৷।

৬ রত্নদি কালিকাপুর

আলিবর্দি খাঁর নবাবী আমলে বাঙ্গালা ১১৪৯ সালে এই পরগনার উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণরাম এই পরগনার মালিক ছিলেন। কৃষ্ণরামের বংশধরগণ উজিরপুরে বসতি করেন। তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায়, স্বরূপচন্দ্র গুহ, বৃন্দাবনচন্দ্র চক্রবর্তী, চন্দ্রনাথ সেন ও অভয়চরণ রায় জমিদারি ক্রয় করেন। জমিদারির সদর জমা ২৫২৩৭।।.৯৪ পাই।

৭ উত্তর সাহাবাজপুর

এই পরগনা মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত। মোগল সম্রাটের সেনাধ্যক্ষ সাবাজ খাঁ হইতে সাহাবাজপুর নামের সৃষ্টি হইয়াছে। রাসমণি চৌধুরানী ও কালীনাথ রায় প্রধান ভূম্যধিকারী। জমিদারির সদর জমা ৭৬৪৫৷৷৯।।পাই। ২৯৪ খানা পৃথক তালুকের রাজস্ব ১০৮৯৯।।/১০পাই।

৮ দক্ষিণ সাহাবাজপুর

এই পরগনা বাকরগঞ্জের পূর্ব প্রান্তে স্থিত। দক্ষিণ সাহাবাজপুর একটি অতি পুরাতন পরগনা ও এ জেলার সুবৃহৎ দ্বীপ। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালির এলাকা হইতে খারিজ হইয়া, বাকরগঞ্জ জেলাভুক্ত হইয়াছে। পরিসর ১৪৬ বর্গমাইল। ইহার অন্তর্গত ৩৭টি গ্রাম ও ১০টি চর। লোকসংখ্যা ৭৭৩৪১, তন্মধ্যে মুসলমান ৬৪০৮৮ ও হিন্দু ১৩২৫৩। অতি পূর্বে এই পরগনায় প্রধান প্রধান চোর ডাকাতের বাসস্থান ছিল।

জগদ্বিখ্যাত সম্রাট আকবর সাহের সৈন্যাধ্যক্ষ সাবাজ খাঁ কুঞ্জুর নামানুসারে পরগনার নামকরণ হইয়াছে। মহাত্মা টোডরমল্লের ১৫৮২ খৃস্টাব্দের রাজস্ব বন্দোবস্তে এই পরগনা বাকলার অন্তর্গত ও বাকলার রাজার শাসনাধীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৭২২ খৃস্টাব্দে নবাব জাফর খাঁয়ের সময়ে এই পরগনা ঢাকার অন্তর্গত করা হইয়াছিল। কথিত আছে, আমানুল্লা সিকদার, বিজয়নারায়ণ মজুমদার প্রভৃতি এই পরগনার আদি ও প্রথম জমিদার। তাঁহাদিগের নামানুসারে 'আমানি ও বিজয়পুর' গ্রামের নামকরণ হয়। এই জমিদারগণ রাজস্ব আদায় না করায়, সরকার বাহাদুর মহাল খাস সূত্রে দখল করিয়া ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে আবু সৈয়দের সহিত জমিদারির বন্দোবস্ত করেন। আবু

সৈয়দের মৃত্যুর পর তাঁহার ওয়ারিশগণ ও তৎপর হস্তান্তর ক্রমে বর্তমান জমিদারগণ পরগনার মালিক হইয়াছেন। গেম্পার স্টিফেন, হারনি, লুকস, এরাতুন, বসাকবাবু ও আনন্দবাবু প্রধান জমিদার। এই পরগনায় ধান্য, রবিশস্য, নারিকেল ও সুপারি উৎপন্ন হয়।

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের প্রধান স্থান দৌলত খাঁ। সাহাবাজপুর নদী দৌলত খাঁয়ের পূর্ব সংলগ্ন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে জলপ্লাবনে দৌলত খাঁয় প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইয়া, লক্ষাধিক প্রাণীর জীবন নষ্ট হয়। তৎকালীন বরিশালের দয়াশীল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মহাত্মা বাটন সাহেব অর্ধমৃত লোকদিগকে অন্ন ও লবণ বিতরণে তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। বিপদ বিপদের অনুসরণ করে, এই শাস্ত্রোক্ত বাক্য মিথ্যা নয় ; এই জলপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গেই মহামারী, কলেরা রোগে অবশিষ্ট জীবিত লোকগণ মধ্যে বহুসংখ্যক নর-নারী অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মহাত্মা পি এম গেম্পার সাহেব জমিদার ও রুদ্রবাবু মুন্সেফের মৃত্যুই উল্লেখ করা হইল। জলপ্লাবনে জমিদারগণের ভাগজাত প্রায় সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। প্রজাগণ খাজনা আদায় করে না। জমিদারগণ মহাবিপদগ্রস্থ হইয়া, গভর্নমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করায, ন্যায়বান গভর্নমেন্ট, দক্ষিণ সাহাবাজপুর পরগনা ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের শাসনাধীনে গ্রহণ করিয়া, বাবু পিতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অস্থায়ী ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া দৌলত খাঁয় প্রেরণ করেন। কিন্তু পরগনার বিদ্রোহী প্রজাগণকে তিনি বশীভূত করিতে ও দলিল অভাবে তাহাদিগের বিরুদ্ধে আইনত কোন উপায় অবলম্বন করিতে না পারিয়া, পশ্চাদপদ হইলেন। তদানীন্তন সুযোগ্য কালেক্টর মহাত্মা ফেচন সাহেব প্রজাগণকে বশীভূত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়া যান।

মহামান্য রেভেনিউ বোর্ড ময়মনসিংহের ডেপুটি কালেক্টর বাবু শশিকুমার দত্তকে কোর্ট অব ওয়ার্ডসেব ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইনি ১৮৮- খ্রিস্টাব্দর ১লা সেপ্টেম্বর এই পদ গ্রহণ করেন। ইঁহার কার্যদক্ষতা অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও পক্ষপাতশূন্য কার্যদ্বারা ও বরিশালের সুযোগ্য কালেক্টর মহাত্মা সেভেইজ সাহেব বাহাদুরের পরিণাম-দর্শিতা গুণে সহজেই প্রজাপুঞ্জ বাধ্যতা স্বীকারে খাজনা আদায় করিতে লাগিল।... ক্রমে ক্রমে পূর্ণাবয়বে হিসাবাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল।

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের জমিদারগণ শশীবাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ আছেন। বাবু শশিকুমার ১৮৬৭ অব্দে মাসিক ২০ টাকা বেতনে একজন সামান্য কেরানিগিরিতে নিযুক্ত হইয়া, নিজ অধ্যবসায় ও বুদ্ধির প্রখরতাগুণে গভর্নমেন্টের নিকট যশস্বী হইয়া, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ডেপুটি কালেক্টর হয়েন; পরে গভর্নমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে ৫০০ টাকা বেতনে এই গুরুতর কার্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত সফল মনোরথ হইয়াছেন। সম্মানার্থে এই পরগনার একটি চর শশিকুমার নামে ও একটি হাট শশিগঞ্জের হাট নামে নির্দিষ্ট আছে। মহাত্মা সেভেই সাহেব বাহাদুর নামে চর সেভেই বলিয়া একটি চর নির্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রজা ভূম্যধিকারিগণ মধ্যে ভবিষ্যতে জমাজমির কোন তর্ক না হইতে পারে, তজ্জন্য বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর ও ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর ঘোষণাপত্রানুসারে দক্ষিণ সাহাবাজপুর। পরগনার জরিপ জমাবন্দি আরম্ভ হয়। বরিশালের সুযোগ্য সেটেলমেন্ট অফিসার বাবু প্যারীমোহন বসু এই জটিলতাময় হকিয়ত সমূহের জটিলত্ব দূর করিয়া ও প্রজাসাধারণের বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া, অতি সুচারুরূপে ও দক্ষতার সহিত ১৮৮৯ খৃস্টাব্দ হইতে কার্য আরম্ভ করিয়া ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ফাইনেল জারি করিয়া যান। (তাঁহার লিখিত ১৮৯৬ অব্দের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য) বাবু প্যারীমোহন একজন স্বনামখ্যাত, কৃতবিদ্য ও গভর্নমেন্টের নিকট বিশেষ প্রশংসিত লোক। দক্ষিণ সাহাবাজপুরেব জমিদার, তালুকদার ও প্রজাগণ চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবেন।

বিবিধ—দক্ষিণ সাহাবাজপুর পরগনা সাধারণত ২টি জমিদারিতে বিভক্ত। জমিদারির অন্তর্গত ১০৮টি তালুক, ২৪টি ওসত তালুক, ৪টি নিমওসত তালুক, ৩টি ইটমাম, ১৬১টি হাওলা, ২টি ওসত হাওলা, ১৬টি নিমহাওলা ও ২টি ওসত হাওলা ছিল। এখন জমিদারের পক্ষে বাকি করের

ডিক্রিতে অনেকানেক মহাল বৃদ্ধি পাইয়াছে। দক্ষিণ সাহাবাজপুরের প্রজার হকিয়তের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের অতিরিক্ত হইবে। প্রজাগণ প্রায়ই বিলাসী, চাষীগণ নিজ হস্তে ধান্য কাটা ও মলা করে না। ঠিকা লোকদ্বারা কার্য করায়। জমিদারির বার্ষিক রাজস্ব ৪৪১৩।৯৫ পাই।

বাবু শশিকুমার দত্তের উদ্যোগে দৌলাত খাঁয় একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে। নিরাশ্রয় রোগীদিগের থাকিবার আশ্রয় স্থান স্বরূপ 'বেলা-আশ্রম' নির্মাণ করা হইয়াছে। দৌলতখাঁ বন্দরের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। রাস্তাঘাট সর্বত্রই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আবশ্যক মতে বান্ধ দেওয়া ও পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করা হইতেছে।

৯ সুলতানাবাদ

বাউফল থানার অন্তর্গত সুলতানাবাদ পরগনার বিস্তৃতি। জমিদারির সদর জমা ২১১২৮।৫ পাই। পৃথক তালুকের রাজস্ব ৫৬৪৬ ।./১ পাই। খাজে-আসানুল্লা, আবদুল্লা চৌধুরি, মেহেরুন্নেসা খাতুন ও তোজাম্মল আলি পরগনার প্রধান ভূম্যধিকারী।

১০ ইদ্রাকপুর

গৌরনদী ও মেহেন্দিগঞ্জ থানার মধ্যে এই পরগনা অবস্থিত। লৌহজঙ্গের কুণ্ড, আমিরেন্নেসা খাতুন, করিমন্নেসা খাতুন ও নাজিমউদ্দিন চৌধুরি এই পরগনার প্রধান ভূম্যধিকারী। জমিদারির রাজস্ব ৩২৭৮।৷/০১০ পাই।

১১ বাঙারোড়া

বাঙারোড়া গৌরনদী থানার অন্তর্গত। এই পরগনার জমিদারি হয়তন্নেছা খাতুন নামে রেজিস্টারিকৃত। বাটাজোড়ের দত্ত, গৈলার দাস এবং বার্থীর বক্সী বংশীয়েরা প্রধান মালিক। সদর জমা ৩৬৫।৯৯।। পাই। জমিদারির অন্তর্গত পৃথক ৯৩৯ খানা তালুক। তালুকের রাজস্ব ২০৭২৪৯৯ পাই। মোট ২১০৮৯।।/৬ পাই পরগনার বার্ষিক রাজস্ব।

১২ বীরমোহন

গৌরনদীর অন্তর্গত বীরমোহন পরগনা ১৭৯০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভীষণ অরণ্যে আবৃত ছিল। বীরমোহনের চৌধুরিগণ ও নড়ালের জমিদারগণ এই পরগনার প্রধান মালিক। সদর জমা ২৭২।।৯ পাই।

১৩ অরঙ্গপুর

অরঙ্গপুর, চন্দ্রদ্বীপ পরগনার এক অংশ মাত্র। সম্রাট আরঙ্গজেবের নামানুসারে এই পরগনার নাম হইয়াছে। কলসকাঠির জমিদারগণ ইহার প্রধান মালিক। গারুরিয়ার চৌধুরি ও কলসকাঠির জমিদার, একই বংশ সম্ভূত ও এক আদিপুরুষ গোপাল রায়ের সন্তান। গোপাল রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র জানকীবল্লভ রায় ঢাকার নবাব সরকার হইতে অরঙ্গপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অরঙ্গপুরের প্রধান জমিদার বিশ্বেশ্বর রায়, ব্রজকান্ত রায়, দুর্গাপ্রসন্ন রায়, সীতাকান্ত রায়, রাধিকাকান্ত রায় প্রভৃতি। জমিদারির সদর জমা, ১৪৩৬৪।৯৬পাই। ২২ খানা পৃথক তালুকের রাজস্ব ৯৬০৪।৷৹ ৯।। পাই।

১৪ সৈদপুর

বাকরগঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এই পরগনার অবস্থিতি। লালামিত্রজিৎ সিংহ এবং ব্রজরত্ন দাস পরগনার প্রধান মালিক। এই পরগনার অন্তর্গত প্রায় ৩০০০০ বিঘা জমি টাকির জমিদারগণ ভোগ করিতেছেন। জমিদারির রাজস্ব ৬৫৭০।৷৹ ৯ পাই। তালুকের সদর জমা ২১৩৪১৯৩ পাই।

পরগনার হকিয়ত

পরগনার বিবরণ পাঠে জানা যায়, বাকরগঞ্জের পরগনা সমূহ মধ্যে প্রায় ৯০ খানা প্রধান প্রধান জমিদারি ও প্রায় ৩৩০০ খারিজা তালুক আছে। এই সকল জমিদরি ও তালুকের অন্তর্গত কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হকিয়তের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পরিষ্কার হিসাব পাওয়া সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মোত্তর, লাখেরাজ মহাত্রাণ, সিকিমি তালুক, হুজুরী তালুক, নিম ওসত তালুক, হাওলা, নিম হাওলা, ওসত নিম হাওলা, ইজারা, মিরাশ ইজারা, মিরাশ মালগুজার, কায়েম কর্ষা, মিয়াদী কর্ষা, কর্ষা, রায়তি, জোত ইত্যাদি অনেকানেক হকিয়তের উল্লেখ দেখা যায়।

পরগনার জমিদার

বাকরগঞ্জের জমিদারদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ জমিদারের সংখ্যাই অধিক। ব্রাহ্মণ জমিদারগণের মধ্যে কলসকাঠির জমিদারগণই প্রধান। কলিকাতার ঠাকুর বংশ ও ঘোষাল পরিবার জমিদারির পরিসর অধিকৃত, কিন্তু তাঁহারা এদেশে বাস করিতেছেন না। মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে ঢাকার খাজে আসানুল্লা, সায়েস্তাবাদের মির সাহেব, চড়ামদ্দির চৌধুরী, বামনার জমিদার বলিয়া উল্লেখ, করা যাইতে পারে না। কেবলমাত্র নাজিরপুর পরগনার মুসলমান জমিদারগণ অতি প্রাচীন কালাবধি নাজিরপুরের জমিদার বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাঁহাদিগের ভ্রাতৃগণের আত্মকলহে জমিদারি এখন পরহস্তগত হইয়াছে। কায়স্থ ও বৈদ্য জমিদারের সংখ্যা বাকরগঞ্জে অতি অল্পই। কীর্তিপাশার জমিদারগণই অনেক কালাবধি এদেশের বৈদ্য জমিদারগণ মধ্যে প্রধান। রায়েরকাঠির জমিদারগণের শীর্ষস্থানীয়। চন্দ্রদ্বীপের ভাগ্যলক্ষ্মী অনেক পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন।

গভর্নমেন্টের খাস সম্পত্তি

বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানাপেক্ষা বাকরগঞ্জে গর্ভনমেন্টের খাস সম্পত্তি ও খাসমহালের সংখ্যা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বোজরগোমেদপুরের অন্তর্গত গভর্নমেন্টের খাস সম্পত্তির সংখ্যা অধিক। তদ্ভিন্ন ১৩৩ টি দ্বীপ ও চর, গভর্নমেন্টের রাজ সম্পত্তি। খাস মহালের সংখ্যাও প্রায় ৯৭ খানা। খাস মহালগুলির অধিকাংশই পটুয়াখালি, ভোলা ও পিজোরপুরের অন্তর্গত। খাস সম্পত্তি হইতে গভর্নমেন্ট বর্তমান সময়ে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেছেন। বাবু অখিলচন্দ্র রায় ডিপুটি কালেক্টর খাস মহালের কার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছেন। ইনি এই জিলার উজিরপুরের প্রসিদ্ধ রায় পরিবার সম্ভূত। বাবু অখিলচন্দ্র নিজ অধ্যবসায় ও সাধুতার বলে ক্ষুদ্র বেতনের কর্মচারীর পদ হইতে এই উন্নত পদে আসীন হইয়াছে ; ইহা হইতে গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?

সুন্দরবন

সুন্দরবন প্রকৃতির অতি রমণীয় স্থানে অবস্থিত। এ প্রদেশের প্রায় সম্পূর্ণ ভাগই গভীর অরণ্যে আবৃত। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র সর্বদা বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া অরণ্যের পাদদেশ বিধৌত করিতেছে, যতদূর দৃষ্টিপাত করা যায়, ততদূরই কেবল অপার ও অনন্ত বারিরাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উপরে অনন্ত আকাশ, সম্মুখে নীল সমুদ্র, মধ্যভাগে মনোহর বৃক্ষ ও গভীর অরণ্য, স্থানে স্থানে পরিষ্কার সমভূমি ও লোকালয় দৃষ্ট হয়। উপকূল হইতে বহুদূর ব্যাপী সমুদ্রের গভীরতা অতি অল্প। বালুকা ও কর্দম পতিত হইয়া জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। হরিণঘাটা মোহানার দেড় শত মাইল দক্ষিণেই সমুদ্র অত্যন্ত গভীর। বনে ব্যাঘ্র, মহিষ, হরিণ, শূকর ও অন্যান্য অসংখ্য হিংস্র জন্তুর বসতি স্থান আছে। মধ্য দিয়া বড় বড় নদী ও খাল চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। জোয়ারের সময়ে জল স্ফীত হইয়া তীরস্থ অরণ্য স্পর্শ করে। এ প্রদেশে অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা

সুন্দর বৃক্ষ অধিক বলিয়াই "সুন্দরবন" নাম হইয়াছে। সুন্দরবনের পুরাতন নাম মুরাদখানা বা জিরাদখান। বাকরগঞ্জের সুন্দরবন বিভাগ, আমতলী ও পিরোজপুরের অন্তর্গত। মধ্যে মধ্যে আবাদ হইতেছে। স্থানে স্থানে পূর্বের আবাদি স্থানের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাকরগঞ্জ জিলার সুন্দরবন প্রায় এগার আনি আবাদ হইয়াছে। যে সকল বৃক্ষ ও জঙ্গল কাটা হয় সেগুলি আমতলী, গুলিমাখালি ঝালকাঠি, ফুলঝুরি, বাকরগঞ্জ, নলছিটি, বরছাকাঠি বরিশাল প্রভৃতি স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে।

১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে যুগারী নামে জনৈক মগ, ২৩০ ঘর প্রজাসহ সুন্দরবনে উপস্থিত হইয়া, তথাকাব জঙ্গল আবাদ করত বসতি করিতে আরম্ভ করে এবং তথায় বহুল পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করাইতে থাকে। যুগারী একজন ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। মঘাইটাটি সুপারির কারবারে তাহার যথেষ্ট ধন সঞ্চয় হইয়াছিল। তাহার এলাকাধীনে একটি লবণের কারখানা ছিল।

গুলিসাখালির অধীন খাপরাভাঙ্গা, মৌড়ুবী, বড়বগী, ছোটবগী, লতাচাপলী, কচুপাতরা, টিয়াখালি, তাম্ভপাড়া, কুয়াকাটা প্রভৃতি স্থানে মগ জাতি বাস করে। তদ্ভিন্ন কুকরী মুকড়ী দ্বীপেও তাহাদিগের উপনিবেশ লক্ষিত হয়। ইহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এ জাতি অত্যন্ত সরল ও সত্যনিষ্ঠ। ইহাদিগের সংখ্যা ৬০৮০।

এই প্রদেশ পূর্বে কোন পরগনা ভুক্ত না থাকায়, কোন জমিদারের অধিকারে ছিল না। গভর্নমেন্ট রাজসম্পত্তিরূপে ঐ স্থান আবাদের নিমিত্ত লোকের নিকট পত্তন করিতেছেন। সুন্দরবনের শাসন কার্য নির্বাহ জন্য একজন কমিশনার নিযুক্ত আছেন।

বাসনা, হলটা, সোনাখালি আয়লা ও ফুলঝুরি এখন আর গভর্নমেন্টের খাস সম্পত্তির অন্তর্গত নহে। উক্ত মহালগুলির রাজস্ব বিষয়ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া ১৩৪০৯৮ টাকা বার্ষিক ধার্য হইয়াছে।

তথ্যসূত্র

১. মাধব পাশাব বাজবটিতে যে সকল দেবমূর্তি আছে, তাহাব কতকগুলি জলোদ্ধৃত মূর্তি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

২. চন্দ্রদ্বীপে পূরা বিপ্রোস্তোয় পূর্নাচ ভূমিকা।
মহাদেব প্রমাদেন শুষ্কা ভূতাহি মৃত্তিকা।।
ললাটানল দাহেন বিলানং হি জলং বহু।
স্থলী ভূতাচ পৃথিবী শৈবানাং মুখ কাবিকা।।
মহাদেবং মৃড়ানীচ পপৃচ্ছ সারদান্বিতা।
পূর্নচন্দ্রং বিহায়ৈব ধার্যাতে শশিনঃ কলা।।
কি নিমিত্তং ধরা ধার্য্যং কিং সুখং জাযতে ততঃ।
মহাদেব উবাচ--
তমাদি পৌর্ণমাস্যন্তাঃ যা এব শশিনঃ কলাঃ।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতা যোড়শৈব ববাননে।।
অমা ষোড়শ ভাগেন দেবী প্রোক্তা মহাকলাঃ।
সংহিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিনী।।
অমা নাম্নী কলা মধ্যে, খা বাসাং ধং প্রতিষ্ঠিতা।
অতো হিত্বং মমা ধার্যা কলা কাল প্রমাহিনী।
তস্যা কলায়াঃ কিরনৈঃ সিক্তা দ্বীপা চ ভূমুরাঃ।
অতো প্রজাঃ কলা চন্দ্রদ্বীপে ধর্ম পরায়নাঃ।।

আবার বাকলা বর্ণনা স্থলে বর্ণিত আছে—

মেঘনানদী পূর্বাভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী।
ইদিলপুরী যক সীমা দক্ষিণে সুন্দরং বনং।
ত্রিংশৎ যোজন বিমিতো সোমকান্তাদ্রি বৰ্দ্ধিতঃ।
সোমকান্তে চ দ্বৌ দেশৌ বিখ্যাতো নৃপশেখর।
জম্বুদ্বীপঃ পশ্চিমে চ স্ত্রীকাবো হি তথোত্তবে।
বাকলাখ্যো মধ্যভাগে রাজধানী সমীপতঃ।
ব্রহ্মখণ্ডেও লিখিত আছে—
মগজাতি শস্ত্রপাতৈর্মর্ত্তব্যাঃ সকলা প্রজাঃ।
মগাধিকারে ভাবী চ বেদভেষ্টো ভবিষ্যতি।।

৩. ব্রজরত্ন মিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ

৪. দিগ্বিজয় প্রকাশে এই নগরের উল্লেখ আছে।—"রামবল্লভ নগরে রাজা তুল ধনান্বিতর। (চন্দ্রদ্বীপ বিবরণ ২৪৫ শ্লোক)

৫. কুলীন শব্দে এই নামটি ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে।

৬. দিগ্বিজয় প্রকাশে যাদব রায় নামে একজন রাজার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে। ইহার সহিত ময়না কোটের রাজকন্যার বিবাহ হয়। ব্রহ্মখণ্ডে চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত যে যাদবপুরের উল্লেখ আছে। বোধহয় যাদব রায় সেই নগর স্থাপক।

৭ চন্দ্রদ্বীপের রাজবাটির নিকট এক পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম কামানতলা ও বহু লোকের বিশ্বাস এখানে অনেক কামান থাকিতে পারে।

৮. ব্রহ্মখণ্ডের মতে মাধব পার্শ্বকের মাধবদেবের মন্দির প্রসিদ্ধ।



চতুর্থ অধ্যায়

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও দেশের অবস্থা

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের আট বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হইয়া, ক্লাইব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। ইহাই এতদ্দেশে ইংরেজ রাজত্বের প্রধান দলিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। পরে তাঁহারা নানা উপায় অবলম্বন করিয়া এ দেশীয় লোকের যোগে এতদ্দেশের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিয়াছেন। বর্তমান সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রিটেনীয় শক্তি প্রবল প্রতাপান্বিত। সমস্ত ভারতবর্ষেব রমণীয় শক্তিব মহিমায় উদ্যান ভূমি ব্রিটেনের শক্তির মহিমায় গৌরবান্বিত। চতুর্দিকে বদ্ধমূল ব্রিটিশ শক্তি বিবাজিত। এই প্রকার একটি প্রবল প্রতাপান্বিত ও ক্ষমতা সম্পন্ন গর্ভনমেন্টের আবির্ভাব ভারতের ভাগ্যে বিগত নয় শত বৎসরের মধ্যে আর সংঘটিত হয় নাই।

ব্রিটিশ ভারতের সকল অধিবাসীব রাজনৈতিক উন্নতির আশা একরূপ, রাজনৈতিক অভাব একরূপ। সমস্তই এক রাজনৈতিক শাসনেব অধীন। বিধি, ব্যবস্থা ও শাসন প্রথা সর্বত্রই প্রায় একরূপ। বৈদেশিক শাসনের অবশ্যম্ভাবী ফল সকল প্রদেশেই এক প্রকার। এই সকল কারণ বশতঃই সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহানুভূতি ক্রমশ ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসিতেছে। জগদ্বিখ্যাত আকবর শাহর রাজত্ব কাল ভিন্ন অপব কোন মুসলমান সম্রাটের সময়ে এই প্রকাব সহানুভূতিব ভাব পবিলক্ষিত হয় নাই। সেই জন্যই মনে হয়, এ দেশে ব্রিটেনীয় শক্তির প্রভাবে এমন এক দিন উপস্থিত হইবে, যখন একতাব বিশ্বমোহিনী তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে, সাম্যেব বিজয় ভেরী নিনাদিত হইবে, জাতি নির্বিশেষে ভারতের একই ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া, গরীয়সী জন্মভূমির উন্নতি ঘোষণায় বদ্ধপরিকর হইবে।

মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া, এ দেশে থাকিয়াই অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ দেশে আর প্রত্যাগমন করেন নাই। এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া ট্যাক্স প্রভৃতি আদায় করিয়া, ভারতের নানা স্থানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতঃ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বড় বড় মসজিদ ও দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। এ দেশের হিতার্থে কিছুই করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ব্রিটিশ গর্ভনমেন্ট ভারতের বহু অর্থ শোষণ করিয়াও এদেশের [illegible] ও উন্নতিকল্পে কতক অংশ ব্যয় করিতেছেন। বর্তমান সময়ে যেরূপভাবে কর ও

ট্যাক্স সংগৃহীত হইতেছে, মুসলমানদিগের সময়ে প্রায় তদরূপ ভাবেই সংগৃহীত হইত। মুসলমানেরা এই ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট বাকরগঞ্জ হইতে (১) রাজস্ব বা ভূমির খাজনা যে নিয়মে ও যে হারে আদায় করিতেন, ব্রিটিশ গর্ভনমেন্টেও প্রায় তদ্রূপ আদায় করিতেছেন। মুসলমানদিগের সময়ে বাকরগঞ্জে খাস মহল ছিল না। এ দেশের কতকগুলি জমি মহা অরণ্যে আবৃত ছিল, ব্রিট্রিশ গর্ভনমেন্ট উক্ত জমিগুলি আবাদ ও জরিপ করিয়া, তথায় শস্যাদি উৎপন্ন করাইতেছেন ও বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক তদ্বারা গর্ভনমেন্টের অতিরিক্ত আয় হইতেছে। ইহাতে বাকরগঞ্জবাসীর যে বিশেষ কোন অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। (২) মুসলমানেরা "গাজর" নামে একটি ট্যাক্স ধোপা জাতির নিকট হইতে আদায় করিতেন। (৩) তাঁহারা "ধুমধারী" নামে ট্যাক্স ব্যাধ ও মাপুরিয়া জাতির ব্যবসার উপর ধার্য করিয়াছিলেন। (৪) গায়ক ও নট্ট জাতির নিকট হইতে "বাজান্দ্রি" নামে ট্যাক্স আদায় করিতেন। (৫) শুঠী মৎস্য বিক্রেতাগণকে "মহাই" ট্যাক্স দিতে হইত। (৬) যাহারা বাজারে শাক সবজী বিক্রয় করিয়া কোন মতে জীবন ধারণোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিত ; তাহাদিগের "চরমুকুন্দিয়া" ট্যাক্স দিতে হইত। (৮) "ঘাটচলন্তর" অথবা "গেট মাগল" রাজা রাজবল্লভের সময়ে তাঁহার এলাকা মধ্যে বিদেশ হইতে নৌকারোহণে যাহারা কোন প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আসিত তাহাদিগের উপর এই ট্যাক্স ধার্য হইত। (প্রফেসর উইলসন সাহেবের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।) (৯) মুসলমান মোল্লাগণ যে নামাজ পড়াইত তজ্জন্য তাহাদিগকে "মোল্লাসেলামি" নামক ট্যাক্স দিতে হইত। (শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের ১৮৬৫ সালের ১৬ই নভেম্বরের ২৪৫ নং চিঠি দ্রষ্টব্য।) (১০) "নগদ হাসিল" নামে ট্যাক্স সুপারি বিক্রেতাগণের উপর ধার্য ছিল। ১১৯৭ সনে এই প্রথা উঠিয়া যায়। (শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের ১৭৯২ অব্দের ১১ই এপ্রিলের চিঠি দ্রষ্টব্য।) সম্ভবতঃ মুসলমানী আমলে মাদকদ্রব্য ও লবণের উপর ট্যাক্সে ছিল না ; ইংরাজ রাজত্বে লবণের উপর ট্যাক্স প্রজারা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। সেকালে পথকর ও পাবলিক ওয়ার্ক কর কাহাকেও দিতে হইত না; ইহার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে, সে সময়ে সাধারণের সুবিধার জন্য দুই একটি রাস্তা ভিন্ন অপর কোন রাস্তা, রেলওয়ে, স্টিমার, জাহাজ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। সুতরাং এরূপ কর লওয়ার আবশ্যকতা ও মনে হয় নাই। ব্রিটিশ গর্ভনমেন্ট রাজ্যের সুশাসন জন্য বিবিধ প্রকারে কর ও ট্যাক্স আদায় করিতেছেন এবং তাহা হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অনেকানেক সিভিলিয়ান ইংরেজ কর্মচারিগণকে এ দেশের শাসন কার্য নির্বাহের জন্য নিযুক্ত করিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রাপ্য বেতনগুলি এ দেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু মুসলমানদিগের সময়ে ঐ টাকাগুলি এদেশেই থাকিয়া যাইত। সুতরাং আমাদিগের মনে হয়, একাল অপেক্ষা সেকালে লোকের আর্থিক অবস্থা কিছু ভাল ছিল। এ স্থলে ইহাও দেখিতে হইবে যে, এ দেশীয় বর্তমান শ্রেণীর লোকদ্বারা এই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সমস্ত কার্যাদি সম্পাদিত হইতে পারে কি না। স্বাধীন প্রবৃত্তি ও একতার অভাবেই এ দেশের এত দুর্দশা ঘটিতেছে। স্বায়ত্তশাসন প্রথাই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের শোচনীয় অবস্থার কথা প্রকাশিত হইতেছে। তবে যাঁহারা যোগ্য তাঁহারা উচ্চ রাজকর্ম পাইতেছেন।

ব্রিটিশ গর্ভনমেন্টের আমলে যে দেশের শিক্ষা, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও রাজনীতির উন্নতি হইতেছে ও পূর্ণ মাত্রায় শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা সর্ববাদী সম্মত। মুসলমানদিগের সময়ে শান্তি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির বিশৃঙ্খলার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরেজ রাজত্বে বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানদিগের সময়ে বাণিজ্যের নামও ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ব্রিটিশ শক্তি প্রভাবে অত্যাচারীর দৌরাত্ম্য কমিয়াছে। লোকের স্বত্ব রক্ষা করা সহজ হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান রাজত্বকালে "যাহার লাঠি তাহার মাটি" এই নিয়মই প্রায় প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ রাজত্ব মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থাকায় লোকে রাজপুরুষদিগকে মনের কথা বলিবার পথ পাইয়াছে।

বিদ্যাচর্চার উন্নতি হইয়া লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, নূতন নূতন রাস্তা, রেলওয়ে ও বাষ্পীয়পোত আরোহণে স্থানান্তরে গমনাগমন করিবার সুবিধা হইয়াছে। ডাকের ও টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত দ্বারা অল্প সময় মধ্যে দূরদেশে সংবাদ প্রেরণের সহজ উপায় হইয়াছে। এই প্রকার একটি ক্ষমতা সম্পন্ন গর্ভনমেন্টের প্রতি সহজেই অনুরাগের ভাব আসিয়া পড়ে। ব্রিটেনীয় শক্তি প্রভাবে লোমহর্ষক ও ভয়াবহ সহমরণ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি কুপ্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাল্য বিবাহ ক্রমে লোপ পাইতেছে ও বহু বিবাহ কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে।

ইংরেজ রাজত্বে দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে, ইহা লইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই এইটি আমাদিগের গুরুতব চিন্তার বিষয়। ইহার প্রকৃত সত্যে উপনীত হওযাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইংরেজ আমাদিগেব রাজা, আমরা প্রজা। রাজ্যের সুশাসন জন্য রাজা আমাদিগের নিকট দায়ী। রাজ্যের সুশাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য প্রজার নিকট কর, ট্যাক্স প্রভৃতি আদায় করাও যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। প্রজা যদি দরিদ্র হইয়া পড়ে, রাজা সাধ্যানুসারে তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রজার নিকট দায়ী । কিন্তু অপব্যয়িতা, অলসতা ও বিলাসিতা দ্বারা যদি প্রজার দারিদ্র্য বাড়িতে থাকে, সে জন্যে কে দায়ী হইবে?

প্রজা সাধারণের দারিদ্র্য বাড়িবার চারিটি প্রবল কারণ আমাদিগের নিকট পরিলক্ষিত হইতেছে।

(১) আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পুস্তক বর্ণিত বাকরগঞ্জের পল্লীগ্রামে, জমিদার হইতে কৃষক পর্যন্ত প্রায় সমুদয় লোক ঋণজালে জড়ীভূত। মহাজনের খত, ডিক্রি ও কিস্তিবন্দীতে পূর্ণ, কিন্তু নগদ টাকা আদায় হইতেছে না। দেনায় ডুবু ডুবু হইয়াও বাজারে মদ, মিঠাই ও অপরাপর নানা প্রকারের বিলাস সামগ্রী ক্রয় করিতেছে। এ অপব্যয়িতা ও বিলাসিতার জন্য কে দায়ী হইবে?

(২) বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চাকরি করিতে হইবে, ইহাই লোকের সাধারণ সংস্কার। বিশ্ববিদ্যালয় দাস প্রস্তুত করিবার কারখানা নহে। আমাদিগের শিল্প সম্বন্ধীয় অধীনতা, রাজনৈতিক অধীনতার মুলীভূত কারণ। বিদেশে হইতে যে সকল দ্রব্য আমাদিগের বাকরগঞ্জে আমদানি হইতেছে, তন্মধ্যে কাপড়, লবণ, লোহা, কাচ, টিন, কেরোসিন তৈল, সাবান, দেশলাই, কালী, খেলনা, বিস্কুট, ছাতা, ঔষধ, কাগজ প্রভৃতি বহুপরিমাণে আসিতেছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি দ্রব্য এ দেশে প্রস্তুত করাইতে পারিলে, বিদেশীর হস্ত হইতে কতক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায় ও দেশের লোকের অবস্থারও কথঞ্চিৎ উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ নাই। বক্তৃতা দ্বারা অশ্রু বিসর্জন করিলে, দেশের মঙ্গল হয় না, তা গর্ভনমেন্টের রাজনীতির দোষকীর্তন করিতে পারিলেই কেবল দেশহিতকর কার্য করা হয় না, কিন্তু যিনি আমাদিগকে একটি আলপিন সম্বন্ধীয় অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, তিনি আমাদিগের নিকট অধিকতর দেশহিতৈষী। যিনি কৃষি কার্যের বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে জঙ্গল আবাদ করিয়া শস্যাদি উৎপন্ন করাইবেন, তিনি আমাদিগের প্রকৃত বান্ধব।

(৩) বিগত ১৮৭১, ১৮৮১ও ১৯৮৯১ খ্রিস্টাব্দে যে মানুষ গণনা হইয়াছে, তদানুসারে দেখা যায় যে, এই বাকরগঞ্জে বিশ বৎসর কাল মধ্যে ২৭৫৮২১ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে । গ্রড়ে প্রত্যেক বৎসর ১৩৭৯১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহা হউক, লোক বৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না পাইলেও আমাদিগের দেশে লোকসংখ্যা যে দিন দিন বিস্তর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং আরও দেখা যাইতেছে যে, অনুপাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই অনুপাতে আহার্য দ্রব্যের বৃদ্ধি হইতেছে না। সুতরাং খাদ্য সামগ্রী মহার্ঘ হইয়া লোকের অবস্থার পরিবর্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

(৪) ইংরেজ কর্মচারিগণের বেতনের হার অধিক ও সেই অর্থগুলি এ দেশে হইতে বিলাতে প্রেরিত হইতেছে। ইহা দ্বারা দেশের আর্থিক, অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে।

(৫) এ দেশজাত শস্যাদি ও অন্যানা মূল্যবান দ্রব্যাদি বিদেশে চালান হইয়া, তৎপরিবর্তে যে সকল সামগ্রী এ দেশে আমদানী হইতেছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই অকিঞ্চিৎকর। এই সকল কারণে প্রজার দুর্দশা ঘটিতেছে।

আর একটি বিষয় এস্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। আমাদিগের স্বাস্থ্যের দুর্গতি কেন হইল? ইংরেজ রাজত্বের দোষ, কি এদেশীয় লোকের দোষ? এ দেশীয় লোকের স্বাস্থ্যের দুর্গতির কারণগুলি মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় কয়েকটি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে।

(১) বর্তমান সময়ে সমাজ প্রচলিত বাল্য বিবাহের ফল বিষময়। পূর্বে কোন ব্যক্তিই ২৫ বৎসর অতিক্রম না করিয়া বিবাহ করিত না। সকলেই শাস্ত্র ও দেশাচার মানিত। সুতরাং বিবাহের পর ৪।৫ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীর দর্শন লাভ পর্যন্তও তাহাদিগের পক্ষে দুর্ঘট ছিল। সন্তানসন্ততিগুলি পিতামাতার উপযুক্ত বয়সে জন্ম গ্রহণ করিত, সুতরাং, তাহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইত। তখন আহার্য দ্রব্যাদি সুলভ ছিল ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। সুতরাং অল্প টাকা উপার্জন করিয়াও স্ত্রী পুত্রাদির লালন পালন করিতে পারিত। বর্তমান সময়ে স্কুল ও কলেজে অধ্যয়ন কালেই বহু সংখ্যক যুবকবৃন্দের স্ত্রী পুত্র কন্যাদ্বারা গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পড়া ছাড়িয়া এক দিকে চাকরির চিন্তা, অপর দিকে অতিরিক্ত পোষ্যগুলির ভরণপোষণ প্রভৃতির চিন্তা। ভাবিতে ভাবিতে অস্থি চর্মসার হইয়া যায়। স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এই প্রকারে কেহ কেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। পরিত্যক্ত সন্তান সন্ততিগুলির স্বাস্থ্যনাশ হওয়ার যথেষ্ট কারণই বর্তমান রহিয়াছে। বাল্য বিবাহে যে দুর্বল ও অল্পায়ু করিয়া ফেলিতেছে, ইহার জন্যে কে জবাব দিবে? সমাজ কি গর্ভনমেন্ট?

(২) শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য আমাদিগের এ দুর্দশার আর একটি কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা প্রণালী অনুসারে ৫ বৎসর বয়সেই বালকগণ স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করে। সুতরাং তদবধি মানসিক পরিশ্রম ক্রমে বাড়িতে থাকে ; যে পরিমাণে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হয় ঠিক সেই পরিমাণে শরীর চালনা হয় না ও উপযুক্ত আহার্যও সকলের ভাগ্যে হইতেছে না। সুতরাং স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মে, পবিপাক শক্তির হ্রাস হয়, হৃদপিণ্ডের শক্তি খর্ব হয়, নাড়ী ক্ষীণ হইয়া পড়ে, শিরঃপীড়া, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইয়া, মানুষকে দুর্বল ও অল্পায়ু করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা প্রাণালী কতক পবিমাণে এই দুর্গতির নিমিত্ত দায়ী বলিয়া মনে হয়। শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ পরিবর্তন আবশ্যক। অপরিণত বয়সে সহজ বিষয়গুলি অল্প অল্প করিয়া পড়ান কর্তব্য। অল্প বয়স্ক বালকদিগের জন্য দিবসে দুইবার স্কুল করা বিধেয়। যাহাতে বালক কালে মানসিক পরিশ্রমের মাত্রা কম হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাহাদিগকে খেলিবার ও শরীর চালনা করিবার জন্য বিশেষভাবে অবসর দেওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য। ইংরেজি শিক্ষা যদি এ দেশীয় লোকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এ দেশেও স্কুলের সহিত ছাত্রনিবাস সংস্থাপিত হওয়া প্রার্থনীয় ইংরাজদিগের ব্যায়াম বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়, আমরা অন্ধভাবে তাহাদিগের বিলাসিতা ও এ দেশের অনুপযোগী নানা বিষয়ের অনুকরণ করিতেছি, কিন্তু উপকারী বিষয়ের অনুকরণে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ হইয়া রহিয়াছি।

(৩) আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে ও দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইতেছে। সুতরাং সকলের পক্ষে পর্যাপ্ত আহারাদির সংগ্রহ হইতেছে না বলিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন মদ্য পানাদি কয়েকটি ব্যক্তিগত কারণ আছে, যাহাতে ব্যক্তি বিশেষের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে।

হিন্দু রাজত্বের অবসানে, মুসলমান রাজত্বের অভ্যুদয়ে, এ দেশীয় লোকের মধ্যে বিলাসিতার ভাব আবির্ভূত হইয়া, বর্তমান সময়ে ইংরেজ রাজত্বে, সেই বিলাসিতা এ দেশে পূর্ণ মাত্রায়

পরিচালিত হইতেছে। হিন্দু রাজত্বের সহিত আমরা অপর কোন রাজত্বের তুলনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস বহু শতাব্দী পূর্বে অন্ধকারে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সহিত ইংরেজ রাজত্বের তুলনা করিতে গেলে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ইংরেজ রাজত্বে সর্ব দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সমাজনীতি, কর্মনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা কার্যের উন্নতির সাধন হইতেছে। যদি হিন্দুস্থানকে চিরদিনই বিদেশীয়ের শাসনাধীনে থাকিতে হয়, তবে ব্রিটিশ গর্ভনমেন্ট স্থায়ী ও অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিয়া এ দেশে শাসন করুন ইহাই বাঞ্ছনীয়। মুসলমানদিগের সময়ে এ দেশীয় লোক বড় বড় রাজকার্যে নিযুক্ত হইতেন, সেই ক্ষমতা এ দেশীয় উপযুক্ত লোককে প্রদান করিলে ব্রিটিশ রাজ উদার গর্ভনমেন্টের কার্য করিয়া, ভারত ইতিহাসে রাজেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়া রহিবেন।

যাহাতে রাজকীয় শক্তিতে প্রজা সাধারণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হয়, তৎপ্রতি রাজার বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। উপযুক্ত পাত্রে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে আর্যসন্তানগণ কোন দিনও কুণ্ঠিত হয় নাই।



পঞ্চম অধ্যায়

সাধারণ বিবরণ

লোকসংখ্যা

বিগত ১৮৭১, ১৮৮১ও ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে যে মানুষ গণনা করা হইয়াছে, তদনুসারে দেখা যায় বাকরগঞ্জে বিশ বৎসর কাল মধ্যে ২৭৫৮২১ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড়ে প্রত্যেক বৎসর ১৩৭৯১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯১ খৃস্টাব্দে বাকরগঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যা ২১৫৩৯৬৫ জন ছিল। যে সময়ে যে অনুপাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ১৫৬ বৎসর পরে বাকরগঞ্জের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইবে। যে সময়ে ও যে অনুপাতে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে পারে, বাস্তবিক সেই সময়েও সেই অনুপাতে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয় না। লোকসংখ্যা যদি পূর্ণ মাত্রাই বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে বহুকাল পূর্বে পৃথিবী লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত এবং দাঁড়াইবার তিল মাত্রও স্থান থাকিত না। পৃথিবীও বহুকাল পূর্বে তাহাদিগকে পালন করিতে অসমর্থ হইতেন। সময় সময় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়া, লোকবৃদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। দেশে সামগ্রিক দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আর্বিভাব না হইলে পৃথিবী বহুকাল পূর্বে অধিবাসীকে স্থান দিতে অসমর্থ হইতেন। যাহা হউক, দিন দিন যে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার কোন সংশয় নাই। ১৮৯১ সালের গণনানুসারে বাকরগঞ্জের ২১৫৩৯৬৫ জন লোক মধ্যে ১৪৬২৭১২ জন মুসলমান ; ৬৮০৩৮১ জন হিন্দু ; ৬০৮০ জন বৌদ্ধ ; ৪৬৫৯ জন খৃস্টান ও ১৩৩ জন ব্রাহ্ম। বাকরগঞ্জের প্রত্যেক পরগনায়ই মুসলমানের সংখ্যা অধিক। গৌর নদী, ঝালকাঠি ও স্বরূপকাঠিতে হিন্দু সংখ্যা অধিক লক্ষিত হয়। সুন্দরবনে বৌদ্ধ জাতি বাস করে। গৌর নদী থানায়ই অধিকাংশ খৃস্টান দিগের বসতি স্থান ও বরিশাল শহরে ব্রাহ্মগণ বাস করেন।

মুসলমান

বাকরগঞ্জের মুসলমান সম্প্রদায় প্রায় সকলই সুন্নি। সুন্নিদিগের শাস্ত্রে গাঁজা, আফিঙ্গ ও সুরাপান প্রভৃতি মহাপাপ বলিয়া আখ্যায়িত হইয়া থাকে। এ দেশীয় কতক মুসলমান "ফেরাজি" শ্রেণী ও দুধু মিঞার দলভুক্ত। দুধু মিঞা ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মতলবগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শরিয়তুল্লা। এ দেশস্থ মুসলমান অধিবাসীর মধ্যেই অধিকাংশই ক্রামতালীর দলভুক্ত। ক্রামতালী অতিশয় সাধু ও সৎচরিত্র লোক ছিলেন। তাহার পুত্র মৌলানা আহাম্মদ অতিশয় সাধু। মুসলমানগণ এক আল্লার উপাসক। অপর কোন দেবদেবীর পূজা করে না। জাতিভেদ প্রথা তাহাদিগের মধ্যে ছিল না। কিন্তু অধুনা তাহাদিগের মধ্যে এই ভাব একটু একটু

পরিলক্ষিত হইতেছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। দত্তক গ্রহণের বিধি নাই। এ দেশীয় মুসলমানের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্প। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ অত্যন্ত অশিক্ষিত; ইহারা ক্রোধ সম্বরণ করিতে অক্ষম। দাঙ্গা, হাঙ্গামা ও নরহত্যা, যে জন্য বাকরগঞ্জ চিরকলঙ্কিত, তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণীর মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। চোর ও ডাকাইতের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। জেলখানার কয়েদিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এ দেশে মুসলমানের সংখ্যার আধিক্যও ইহার অন্যতম কারণ। সায়েস্তাবাদ, উলনিয়া, নলচিড়া, চড়ামদ্দি, কড়াপুর, বামনা, সাতুরিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রধান ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ বাস করেন।

হিন্দু

হিন্দু-জাতি চিরদিনই তাহাদিগের ধর্মরক্ষা করিবার জন্য প্রসিদ্ধ। তাহারা ধর্মোদ্দেশে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। হিন্দুগণ সাকারবাদী, কোন না কোন দেবতার উপাসক। সময় সময় সাকার দেব দেবীর পূজা করিতে গিয়া তাঁহারাও মহাকুসংস্কারেও পতিত হইয়া থাকেন। হিন্দুগণ জাতিভেদকে পরমধর্ম বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বালিকাগণের বাল্য বিবাহ পরম ধর্ম ও বিধবা বিবাহ অধর্ম বলিয়া মনে করেন।

হিন্দুগণের সামাজিক রীতিনীতির অধিকাংশই সন্তোষজনক। মানুষের চিরভূষণ নম্রতা, হিন্দু জাতির মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। নারীগণ অত্যন্ত লজ্জাশীলা, গৃহ কার্যে অত্যন্ত পটু। ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সম্মান দেখান হইয়া থাকে। কিন্তু বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বংশ কুকার্যে জড়িত হইয়া পদ গৌরব নষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কুলীন ব্রাহ্মণ এক ভয়ঙ্কর সম্প্রদায়, বহু বিবাহ ইহাদিগের মজ্জাগত অভ্যাস। কলসকাঠি নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ ১০৬ টি বিবাহ করেন। ইহাতেও তাহার সাধ পূর্ণ হইয়াছিল না। বিক্রমপুর নিবাসী মহাত্মা, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বহু বিবাহ কুপ্রথার সংস্কার কার্যে বহুদিবসাবধি যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন ও কতক পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছেন।

কলসকাঠি, গারুরিয়া, মানপাশা, নাগপাড়া, কাশীপুর, নলচিড়া, খলিসাকোটা, উজিরপুর, বারপাইকা, সকারপুর, গৈলা, বাইসারি, বুড়িহারি, আগপাশা, তারপাশা, রহমতপুর প্রভৃতি গ্রাম ব্রাহ্মণের প্রধান বসতি স্থান।

এ দেশে বৈদ্য জাতির সংখ্যা অতি অল্পই বলিতে হইবে। এ জাতি এখন পর্যন্ত আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া, সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেছে। বৈদ্য জাতির মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষিত। তাহাদিগের প্রধান ব্যবসায় আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা। মাননীয় মিঃ বিভারিজ সাহেব মহোদয় তাঁহার লিখিত বাকরগঞ্জের ইতিহাসে এ দেশীয় বৈদ্য জাতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কীর্তিপাশা, পোনাবালিয়া, সিদ্ধকাঠি, কুলকাঠি, বাসণ্ডা, গৈলা, ফুল্লশ্রী, মাহিলাড়া, শোলক, জয়শ্রীকাঠি, খলিসাকোঠা, নারায়ণপুর, গুঠিয়া, কলসগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বৈদ্য জাতির প্রাধান্য আছে।

বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থদিগের মধ্যে তুলনা করা সুকঠিন। কারণ রায়েরকাঠি হবিবকাঠি প্রভৃতি দুই তিনটি গ্রাম ভিন্ন, দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ আর কোন গ্রামেই দেখা যায় না। গবাভার ঘোষ, নরোত্তমপুরের রায়, বানরিপাড়ার গুহ ঠাকুরতা, নথুল্লাবাদের মিরবহর, ভাতশালার ঘোষ, কাচাবালিয়ার গুহ বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহারা শূদ্র জাতির সহিত বৈবাহিক ক্রিয়া কলাপে লিপ্ত হইয়াছে, সমাজ বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়া, পদগৌরব হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছেন ও সমাজ মধ্যে নিন্দা-ভাজন হইতেছেন। আজ যাহারা তাঁহাদিগের পদসেবক, কাল হয়ত তাহারা ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব হইয়া দাঁড়াইবে। এ দেশীয় বঙ্গজ কায়স্থদিগের এ কলঙ্ক অনেক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বাকরগঞ্জের হিন্দুদিগের মধ্যে নমশূদ্র বা চণ্ডালের সংখ্যাই অধিক। ইহারা অত্যন্ত অশিক্ষিত,

অত্যন্ত ক্রোধী। দাঙ্গা হাঙ্গামা ও নরহত্যাকাণ্ডে, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগের মতন ইহারাও লিপ্ত থাকে। ইহাদিগের মধ্যে চোর, ডাকাইতের সংখ্যাও কম নহে; জেলখানার চণ্ডাল কয়েদির সংখ্যাও অধিক।

বৌদ্ধ

সুন্দরবনের মগ জাতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বাকরগঞ্জের আর কোন স্থানে বৌদ্ধ জাতি নাই। এ জাতি অতিশয় সরল ও সত্যনিষ্ঠ। ইহারা অরণ্য আবাদ করিতে অত্যন্ত দক্ষ। সুন্দরবনের চিলা চৌধুরীর সময়াবধি মগদিগকে সাধারণত চৌধুরী বলিয়া সকলে সম্বোধন করিয়া থাকেন। এই জাতি মধ্যে চিলা চৌধুরী খ্যাতনামা লোক ছিলেন। ইহারা প্রায় সকলেই অহিফেন সেবন করিয়া থাকে। অহিংসাকেই পরমধর্ম বলিয়া মনে করে। এ দেশে বৌদ্ধের সংখ্যা ৬০৮০ জন।

খ্রিস্টান

বাকরগঞ্জের মাজিস্ট্রেট মিঃ গেরেট সাহেবের সময়ে, ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে এদেশ মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচার আরম্ভ হয়। উক্ত সাহেব বাহাদুর স্বয়ং অবগাহমণ্ডলী ভুক্ত হইয়াছিলেন। গৌরনদী থানার অন্তর্গত আস্কর ও ধোনসার এ দেশীয় খ্রিস্টানদিগের প্রধান বসতি স্থান। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে গৌর নদীর অন্তর্গত বারপাইকার খৃস্টানদিগের একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। উহা দ্বারা এ দেশীয় খ্রিস্ট সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকগণ যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে প্রচার কার্য নির্বাহ করিতেছেন তাঁহারা অতুল্য ফল পাইতেছেন না। নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি চণ্ডাল ব্যতীত অপর কেহই তাঁহাদিগের দলভুক্ত হয় নাই। উক্ত চণ্ডালদিগের মধ্যেও কেহ কেহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দু হইতেছে। ইহাদিগকে "ফিরতি খোচ" বলে। মিঃ জুশন ও মিঃ উইলিয়ম কেরী সাহেবের যত্নে বরিশালে যে একটি বাইবেল ক্লাস খোলা হইয়াছে, তদ্বারা বহুসংখ্যক বালকের নৈতিক উপকার সাধিত হইতেছে। ইহাও খৃস্টধর্ম প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই স্কুলটির জন্য বরিশালবাসী উক্ত মহাত্মাগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। খৃস্টানগণ যীশুখৃস্টকে ঈশ্বরের অবতার মনে করেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই মানুষের পাপ মোচন করিতে সক্ষম নহে। যীশুকে ভজনা না করিলে অনন্ত নরকে ডুবিতে হইবে, ইহাই তাঁহাদিগের ধর্মমত। এ দেশে ৪৬৫৯ জন খ্রিস্টান বাস করেন।

ব্রাহ্ম

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক। ব্রাহ্মগণ কোন দেবদেবীর উপাসক নহেন। এক ঈশ্বর তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা। ইহাদিগের যত্নে সমাজের কুসংস্কার ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি ইহারা অত্যন্ত গুরুত্ব স্থাপন করেন। বাল্য বিবাহকে মহাপাপ বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ। প্রত্যেক সাধু কার্যে ইহাদিগের আন্তরিক সহানুভূতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। মনুষ্য সমাজে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করা ইহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। এ দেশে ব্রাহ্মের সংখ্যা ১৩৩ জন।

লোকের স্বাভাবিক লক্ষণ

কোন দেশের বিষয় কোন জাতির বিষয় পর্যালোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই সেই দেশ ও দেশস্থ লোকের চরিত্রের বিষয় অনুসন্ধান করা সর্বতভাবে কর্তব্য। বাকরগঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, এ দেশের অধিকাংশ লোকই বৃথা তর্কে কালাতিপাত করিয়া থাকে। ইহারা বাকপটু ও অতিরিক্ত ভাষী। এ দেশীয় লোকের অধিকাংশ মোকদ্দমায়ই জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ দেশে ও ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয়বিধ মোকদ্দমার সংখ্যা এত অধিক যে, বিচারকগণ সময় সময় দিশাহারা হইয়া পড়েন ও অনেক সময়ে কোন কোন মোকদ্দমার

জটিল ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। চোর ও ডাকাইতের সংখ্যা বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা বাকরগঞ্জে অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। পুলিশ কর্মচারিগণের চেষ্টায় ও ব্রিটিশ গর্ভনমেন্টের প্রতাপে, ক্রমশই তাহাদিগের দৌরাত্ম্য কমিয়া আসিতেছে। এ দেশের ভদ্রবংশীয়দিগকে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে উৎসাহী দে া যায়। এ দেশবাসী হিন্দুগণ অতিশয় নম্র ও শান্ত। কিন্তু চণ্ডালগণ উদ্ধত স্বভাবের লোক। শিক্ষিত ও ভদ্রবংশের মুসলমানগণ ভদ্রোচিত ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীস্থ মুসলমানগণের কোন প্রকারে রাগের কারণ জমিলে, প্রতিশোধ না লইয়া আর তাহারা সুস্থ হইতে পারে না।

বাকরগঞ্জের জাতিসমূহের নাম

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, নাপিত, ধোপা, নট্ট, ভূমালী, সাহা, চণ্ডাল, তাঁতি, জুগী, তেলী, মালকর, জিয়ামী, জালিয়া, কৈবর্ত, স্বর্ণ বণিক, বণিক, শাঁখারি, কুম্ভকার, কর্মকার, কাঁসারী হালিয়া, দাস, বারৈ, কোচ, সাঁওতাল, বৈরাগী, ব্রাহ্ম, খৃস্টান, মুসলমান, মগ ইত্যাদি জাতি এদেশে বসতি করে।

বর্তমান সময়ে এই সকল জাতি বাঙ্গালা ভাষাই শিক্ষা করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা প্রায় সকল জাতির পক্ষেই মাতৃভাষার ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছে।

এ দেশস্থ অশিক্ষিত ছোট লোকে, যেরূপ ভাষায় কথা বলে, তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। দুই চারিটি উদাহরণ এস্থলে সন্নিবেশিত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যথা— কারু কোনে (চারিদিকে), অনুরাগ হরবেন না (রাগ করিবেন না), ধচ্‌মোনা (চিমটা), হুলাক হরছে (আলোকিত করিয়াছে), এমোন্‌ তেমোন্‌ হরোতো লাল গোরা দৌড়ামু (মত বিরুদ্ধ কিছু করিলে ঘরে আগুন ধরাইব), মোর নাও হান্‌ যায়-তিনে আলগোছে (নিমেষ মধ্যে আমার নৌকা চলিবে), তুই মোর হরবি কি (তুমি আমার কি করবি?) পাহীর বিচ্ছেদ (বহু সংখ্যক পক্ষী), অসন্দে হর্‌বেন না (সন্দেহ করিবেন না), বোহে (বক্তৃতা দেয়), আমেজ হরি (চিন্তা করি), হাস্তা (সস্তা), জোনোম ভরি (জন্ম ভরিয়া), উজাল হরি (উজ্জ্বল করিয়া), হ্যাসে (শেযে), কোন মুহী যাই (কোন দিকে যাইব?) মুই এ হোন কোমনে যাই (আমি এখন কোথায় যাইব?) ইত্যাদি।

মাদক দ্রব্য

বাকরগঞ্জের প্রায় প্রত্যেক জাতিব লোক মধ্যেই সুরাপানের প্রচলন আছে। বৈদ্য জাতিই অগ্রগণ্য। সুরাপানে লোকের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির অধোগতি হইতেছে। অনেকেই অহিফেন ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ বা রোগ মুক্তির জন্য কেহ বা নেশার পরবশ হইয়া আফিঙ সেবন করেন। সম্পন্ন লোকেরা ৪০ বৎসর বয়সের পরে শরীর পোষণার্থ অহিফেন ব্যবহার করিয়া থাকেন। রায়েরকাঠি গ্রামে বহু সংখ্যক ভদ্রলোক শরীর পোষণার্থ আফিঙ্‌ সেবন করেন। সুন্দরবনে মগ জাতির মধ্যে অহিফেন ব্যবহার অধিক পরিমাণে দেখা যায়। নিম্ন শ্রেণীর লোকে গাঁজা ব্যবহার করিয়া থাকে, গাঁজায় শরীরে নতুন বলের সঞ্চার হয়, ইহা সেবনাতে তাহাদিগের ক্লান্তি দূর হয়। এ দেশে গাঁজার চায নাই। কোচবিহার ও রংপুর হইতে এদেশে গাঁজা আমদানি হইয়া থাকে। মরফিয়া, চরস, চণ্ডু ও তাড়ি অত্যল্প লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকে। এদেশে তামাকের ব্যবহার বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এদেশস্থ অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ কোন না কোন প্রকারে তাম্রকূট সেবন করিয়া থাকে। আড়াই বৎসরের বালকেও তামাক ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে।

আমোদ

নির্মল ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ অভাবে দেশ অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। নূতন নূতন আমোদের উদ্ভাবন হওয়া একান্ত কর্তব্য। হিন্দুদিগের বিবিধ পূজা উপলক্ষে বাজী, বাজনা, বাইচ

খেলা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতিতে বিশুদ্ধ আমোদ হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের রোজা, মহরমের আমোদ, খৃস্টানদিগের বড়দিনের আমোদ, ব্রাহ্মগণের মাঘোৎসবের আমোদ, অতিশয় নির্দোষ ও বিকার শূন্য। যাত্রাগান, থিয়েটার, নাচ, কবিগান প্রভৃতি সুরুচি সম্পন্ন নহে।

মেলাতে অত্যন্ত আমোদ হয় বটে, কিন্তু যে মেলার বেশ্যাগত প্রাণ, যে মেলার সুরাগত প্রাণ, তাহার অস্তিত্ব না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বরিশাল জনসাধারণ সভার সম্পাদক বাটাজোড় নিবাসী বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুরোধে লাখুটিয়া মেলার স্বত্বাধিকারী বাবু বিহারীলাল রায়চৌধুরী তাঁহার মেলায় মদের দোকান বন্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিলাতের পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় পর্যন্ত তাঁহাদিগের উভয়ের নাম ঘোষিত হইয়াছিল। তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট বিধি রহিত হওয়ায়, বাকরগঞ্জের প্রকৃত হিতকর কার্য সংসাধিত হইয়াছে। কিন্তু বাকরগঞ্জে বেশ্যাশূন্য মেলা প্রায়ই দেখা যায় না। এদেশে মোট ৭১টি মেলা আছে। তন্মধ্যে ঝালকাঠি, কীর্ত্তিপাশা, পিরোজপুর, লাখুটিয়া, বানরিপাড়া, কলসকাঠি, ভাণ্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানের মেলাগুলি বিখ্যাত। কিন্তু বাউফল থানার অন্তর্গত কালীসুরী নামক স্থানে, দুই শত বৎসরের পূর্বে সৈয়দ এল অবহরণ্ নামক জনৈক মুসলমান সাধু কর্তৃক একটি মেলা স্থাপিত হইয়াছে। কথিত আছে তাঁহার একজন শিষ্যের নামানুসারে এই মেলার নামাকরণ হয়। উক্ত সাধুর সমাধি মন্দির এখনও কালীসুরীতে বর্তমান আছে। প্রত্যেক বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে এই মেলা আরম্ভ হইয়া থাকে। এখানে কোন রকমের মাদক দ্রব্য বা বেশ্যা প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। মেলায় বহুতর দ্রব্যাদির আমদানি হইয়া থাকে। ইহা অতি নির্দোষ ও নির্মল ভাবের পরিপোষক। বাকরগঞ্জের আর কোন মেলাতেই এরূপ নির্দোষ আমোদের উপলব্ধি করা যায় না।

কারখানা ও বাণিজ্য

বাকরগঞ্জে বর্তমান সময়ে কোন কারখানা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য করিয়া থাকে। অতি পূর্বাকালে এদেশে লবণের কারখানা ছিল। দক্ষিণ সাহাবাজপুরে ১৭৬৫ হইতে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লবণ ও পাথর চুনার কারখানা ছিল। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে খাজে ওকর ও বারওয়েল সাহেব ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত রায়মণ্ডল নামক স্থানে লবণের দুইটি কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শিবপুর ও ন্যামতী স্থানদ্বয়ে লবণের কারখানা ছিল। গৌরনদী থানার অন্তর্গত পাতিহারের কাপালিকগণ ছালা বুনাট করিয়া থাকে। পাটি, হোগলা, চাটাই প্রভৃতি বাকরগঞ্জের প্রায় সকল দেশই প্রস্তুত হইয়া থাকে। চিঁড়াপাড়া ও রঙ্গশ্রীর পাটি বিখ্যাত। পিরোজপুরের নিকটবর্তী ডজবেরমল নামক স্থানে ইক্ষু গুড় প্রস্তুত হয়। দৌতল খাঁ ও নলছিটিতে নারিকেল তৈল প্রস্তুত হয়। চাউলাকাঠি প্রভৃতি বিলে দেশী চুণ প্রস্তুত হয়। উজিরপুর ও স্বরূপকাঠিতে উৎকৃষ্ট তীক্ষ্ণধার অস্ত্র প্রস্তুত হয়। সাহেবগঞ্জে বড় বড় ঘটি প্রস্তুত হয়। ঝালকাঠি নিকটবর্তী মধিপুরে বড় বড় মাইট ও কোলার আমদানি হয়। ঝালকাঠি স্বরূপকাঠি মেহেন্দীগঞ্জ, খণ্ডেশ্বর, বরদাকাঠি, কালীগঞ্জ, বাকরগঞ্জ, ফলাগড় প্রভৃতি স্থানে সুন্দর কাঠের নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। নলছিটির উত্তর পাড়ে, কলুপাড়া, নামক স্থানে তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঝালকাঠিতে একটি তৈলের কল স্থাপিত হইয়াছে। বাকরগঞ্জে অপর কোন কলকারখানা নাই।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বাকরগঞ্জে চাউলের কারবার বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সাহেবগঞ্জ, ন্যামতী, ঝালকাঠি, নলছিটি, বগা, বাবুগঞ্জ, সুজাগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে চাউলের আমদানি অধিক হইয়া থাকে। বর্ষাকালে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা হইতে এ অঞ্চলে চাউলের আমদানি হয়। বর্তমান সময়ে বাকরগঞ্জ হইতে তেত্রিশ লক্ষ মন চাউল, পঞ্চাশ হাজার মন পাট চালান হয়। পাঁচ লক্ষ মন লবণ ও চল্লিশ হাজার মন কেরোসিন তৈল বাকরগঞ্জে আমদানি হইতেছে। বাকরগঞ্জের নানাস্থানে বিশেষত দক্ষিণ সাহাবাজপুর ও নলছিটিতে সুপারির কারবার

অধিক। সুপারির কারবারে ভূম্যধিকারিগণের প্রায় তৃতীয়াংশ খাজনা আদায় হইতেছে। ব্রহ্মদেশে ও কলিকাতায় সুপারি চালান হইয়া থাকে। বাকরগঞ্জ হইতে কলিকাতা রাজসাহী, ঢাকা, যশোহর, ফরিদপুর ও পাবনাতে প্রায় সাত লক্ষ নারিকেল প্রেরিত হইয়া থাকে। কাপড়, লোহা, কাঁচ, টিন, সাবান, দেশলাই , কালি, খেলনা, বিস্কুট, ছাতা, ঔষধ, কাগজ প্রভৃতি বহুল পরিমাণে, বিদেশ হইতে বাকরগঞ্জে আমদানি হইতেছে। এ দেশীয় শঠীর পাল ও আবির নানাস্থানে প্রেরিত হয়।

দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশই বাড়িতেছে। ইহার কতকগুলি কারণ আমরা পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। নবাব সায়েস্তা খাঁ ও নবাব সুজাউদ্দিনের সময় এক টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যাইত। মুরশিদকুলি খাঁর আমলে টাকায় চারি মন ছিল। সাধারণত বলিতে গেলে এ কাল অপেক্ষা সেকালে খাদ্যসামগ্রী মাত্রই সস্তা ছিল। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে টাকায় আড়াই মন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে টাকায় দেড় মন, বর্তমান সময়ে টাকায় ১২ সের (পাকি) চাউল বিক্রয় হয়।

দেশের সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির সহিত আমদানি ও রপ্তানির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বিদেশীয়েরা এ দেশে আসিয়া বাণিজ্য দ্বারা বহু অর্থ শোষণ করিতেছে। সেইরূপ এ দেশীয় লোক বিদেশে যাইয়া কলকারখানা স্থাপন করত স্বচ্ছন্দে ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিতে পারেন ও তথা হইতে অর্থ ও বিবিধ দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে পারেন, সে দিকে আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষিত হইতেছে না। বাণিজ্যের অযত্নেই এ দেশ ক্রমশ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে।

ঝালকাঠি, নলছিঠি, সাহেবগঞ্জ, ফুলঝুরি, ভাণ্ডারিয়া, পাড়ের হাট, স্বরূপকাঠি, বাবুগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, বরদাকাঠি, বর্গা, দৌলত খাঁ, প্রভৃতি বড় বড় বন্দরে এ দেশীয় লোক ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া থাকে।

জলপথ ও স্থলপথ

জলপথে গমনাগমনের সুবিধার জন্য পাঁচটি স্টিমার লাইন আছে। (১) বরিশাল হইতে নলছিটি, ঝালকাঠি, কাউখালি, পিরোজপুর, কচুয়া, বাগেরহাট, ফকিরহাট, প্রভৃতি স্থান হইয়া খুলনা পর্যন্ত।

(২) বরিশাল হইতে ইদিলপুর ও মুলাদির মধ্য দিয়া চাঁদপুর পর্যন্ত।

(৩) বরিশাল হইতে পালেরদির ধার দিয়া মাদারীপুর পর্যন্ত

(৪) বরিশাল হইতে পাতারহাট, ভোলা, দৌলত খাঁ, হাতিয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া নোয়াখালি পর্যন্ত ও

(৫) বরিশাল হইতে বগা, কলসকাঠি, বাকরগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ,পটুয়াখালি প্রভৃতি স্থান হইয়া আমতলি পর্যন্ত, পাঁচটি স্টিমার লাইন বর্তমান আছে।

বরিশাল, রহমতপুর, দ্বারিকা, শিকারপুর, জাগুয়া, কালীজিরা, দপদপিয়া, গুরুধাম, ঝালকাঠি, দৌলতখাঁ, তোজমদ্দি, মানপুরা পটুয়াখালি, পিরোজপুর প্রভৃতি স্থানের ফেরি প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেরি আছে। এই সকল ফেরি বা খেয়ার নৌকার সাহায্যে নদী ও খালের এক পাড় হইতে অপর পাড়ে যাওয়ার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বরিশাল হইতে লাখুটিয়া পর্যন্ত রাজচন্দ্র রায়ের কাটা খাল দিয়া লোকের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তথা হইতে মোহনগঞ্জ ও বাবুগঞ্জের মধ্য দিয়া জয়শ্রীর খালে পড়িয়া বাটাজোড়, মাহিলাড়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্যে দিয়া পালেরদির নদীতে পৌঁছতে পারা যায় ; অপর দিকে লাখুটিয়ার ধার দিয়া একখাল রহমতপুর, মাধবপাশা, রাজারবেড় ও গুঠিয়ার মধ্য দিয়া পঞ্চকরণের দোনে মিলিত হইয়া একদিকে গাভা, বানরিপাড়া পর্যন্ত ; অপর দিকে উজিরপুর, খুলিসাকোটা; দক্ষিণে নবগ্রাম, বাউকাঠি ও বাসণ্ডার মধ্য দিয়া ঝালকাঠিতে মিলিত হইয়াছে। পঞ্চকরণ হইতে আর একটি খাল নারায়ণপুর ও খলিসাকোটার মধ্য দিয়া উজিরপুরের খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। গাভা, বানরিপাড়ার খাল বরাবর স্বরূপকাঠি ও নাজিরপুরের দোনে মিলিত

হইয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়া পিরোজপুরের দামোদরে মিলিত হইয়াছে। পিরোজপুরের মধ্য দিয়া একটি খাল জবরমল হইয়া পাড়েরহাটের নদীতে পতিত হইয়াছে। ঝালকাঠির উত্তর দিক দিয়া একটি খাল বাসণ্ডা, বাউকাঠি, নবগ্রাম হইয়া পঞ্চকরণের দোনে মিলিত হইয়াছে। ঝালকাঠির পশ্চিমের খাল, গাবখান পর্য্যন্ত যাইয়া উত্তর দিকে রামনগর, তলোয়ারী, কেওরা তারপাশা ও কীর্তিপাশার মধ্য দিয়া একদিকে রুনসি, খাজুরা, পাজি পুখরিপাড়ার দিয়া বাউকাঠির খালে পতিত হইয়াছে ; অপর দিকে হানিপ খাঁ বা সেখেরহাটের মধ্য দিয়া কাউখালিতে মিলিত হইয়াছে। গাবখানের পশ্চিম দিক দিয়া একটি খাল সেখেরহাট বা হানিপ খাঁর হাটের সহিত মিলিত হইয়াছে। রূপসিয়ার পশ্চিম দিয়া একটি খাল বাজাপুরের মধ্য দিয়া বাউখালিতে মিলিত হইয়াছে। পোনাবালিয়ার মধ্য দিয়া একটি ভবানীপুরের, নলছিটির মধ্যদিয়া সিদ্ধকাঠি পর্যন্ত, কুমারখালির মধ্য দিয়া বাকরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জের নদীতে মিলিত হইয়াছে। বরিশালের পশ্চিমে একটি খাল নথুল্লাবাদ, কাশীপুর, কড়াপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া কালীজিরা নদীতে পড়িয়া বরাবর পশ্চিম দিকে নবগ্রামে পতিত হইয়াছে। একটি খাল ভোলা হইতে দৌলত খাঁর নদীতে পতিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও বহুতর ভরানি খাল আছে। এই সকল খালের সাহায্যে নৌকা পথে লোকের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইতেছে।

বাকরগঞ্জের নদী পথে গমনাগমন করিতে যে সকল নদী ও দোন বাহিয়া যাইতে হয় তাহা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি ; এস্থলে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

বরিশাল হইতে রাজচন্দ্র রায়ের রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া গৌরনদী পর্যন্ত যে রাস্তা আছে, উহাই এদেশের প্রধান ও বড় রাস্তা। তাদ্দারা লাখুটিয়া, রহমতপুর, উজিরপুর, শিকারপুর, বাটাজোড় প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা। ত.ুবৌলার রাস্তা গৈলা হইতে ঘাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বরিশাল হইতে ঝালকাঠি তথা হইতে বাসন্ডা কীর্তিপাশা, তারপাশা, কেওরা, বরিশাল হইতে নলছিটি ; বরিশাল হইতে দপদপিয়া ; ভোলা হইতে দৌলত খাঁ ; ভোলা হইতে তালতলী; গাজিরচর হইতে ধনিয়া মানিয়া পর্যন্ত রাস্তাগুলিও প্রধান। বরিশাল হইতে মাধবপাশা পার্বতী চৌধুরানীর রাস্তা। তথা হইতে নারায়ণপুর পর্যন্ত ঐ রাস্তার বিস্তার দেখা যায়। বরিশাল হইতে নবগ্রাম পর্যন্ত একটি বড় রাস্তা আছে।

স্বাস্থ্য ও রোগ

মোটামুটি ধরিতে গেলে বাকরগঞ্জের জল বায়ুর অবস্থা ভাল। প্রায় সকল ঋতুতেই বায়ু ঠাণ্ডা থাকে। জলাশয়ের সংখ্যা অধিক থাকায় ও দক্ষিণ পশ্চিম "মনসুন" নামক বায়ুর প্রতাপে এ অঞ্চলের বায়ু প্রায় সর্বদাই পরিষ্কার থাকে। বরিশাল শহরে লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায়, এস্থানের বায়ু ক্রমশ মন্দ হইতেছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি অনেকানেক "রিজার্ভ পুষ্করিণী" খনন করাইয়া স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পল্লীগ্রামে ঐ প্রকার জলাশয় খনন করিয়া, লোকের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতেছেন।

দেশীয় লোকের পক্ষে ভাত, মসুরী ডাল, জীয়ন্ত মৎস্য প্রভৃতি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্য। কিন্তু মসুরি ডাল বাকরগঞ্জ ভিন্ন অন্য দেশে ব্যবহৃত হইলে, লোকের দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়। লঙ্কা ব্যবহারে এ দেশীয় লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চর্মরোগ প্রভৃতি জন্মায় ও ক্রোধ বৃদ্ধি করে। বাকরগঞ্জ ভিন্ন অন্য দেশে এত অধিক লঙ্কা ব্যবহৃত হইলে, লোকের অর্শ ও উদরাময় রোগ জন্মে।

বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়িয়া মৃত্তিকা নরম হইয়া পড়ে। তিন চারি মাস পর্যন্ত বাকরগঞ্জের অধিকাংশ স্থানে কর্দম দৃষ্টিগোচর হয়। যখন মাটি শুকাইতে থাকে অর্থাৎ আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ম্যালেরিয়া জ্বরের আধিক্য দেখা যায়, এ দেশে জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, বিষম জ্বর, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগ দেখা যায়। অল্পাধিক কলেরা বা বিসূচিকা রোগ প্রায় সমুদয় বৎসর ভরিয়াই থাকে ; গরমের

সময়ে বিশেষ ভাবে ইহার প্রকোপ লক্ষিত হয়। এ দেশে বসন্ত রোগের প্রার্দুভাব বড় অধিক নহে। জ্বরাদি রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন অনেকানেক কবিরাজ ও ডাক্তার আছেন, বসন্ত রোগের সুচিকিৎসক বাটাজোরের প্রসিদ্ধ কবিরাজবংশ বিভিন্ন দেশে গিয়াও এই ভয়ঙ্কর রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। অস্ত্র চিকিৎসায়, রহমতপুরের জামালদি, কামালদি ও মুল্লুকচাঁদ সময় সময় সিভিল মার্জেনকেও পরাস্ত করিতে গিয়াছেন। "ঘা" চিকিৎসায়, চাঁদসির বিষ্ণুহরি ডাক্তারের বংশধর পদ্মলোচন দাস, ডাক্তারগণের শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

বহুমূত্র, প্রমেহ, উপদংশ, শূলবেদনা, কাশি, বাত, হৃদকম্প, কুষ্ঠ রোগ প্রভৃতিও এ দেশে দেখা যায়।

দাতব্য ঔষধালয়

নিঃস্ব রোগীদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্তের জন্য, বিট্রিশ গভর্নমেন্টের অনুগ্রহে বাকরগঞ্জের স্থানে স্থানে দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে বরিশাল সদরে পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের জন্য পৃথক পৃথক দুইটি চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে।.মফস্বলে আঠারটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির তহবিল হইতে এই সকল চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্বাহিত হইতেছে। বিগত ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের সদর ডিস্পেন্সারি হইতে ১১০৮৭ জন ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১৮৪৪৫ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। উক্ত ডিস্পেন্সারির সংখ্যা কমাইয়া রোগীর চিকিৎসা কল্পে, আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসার জন্য আয়ুর্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইলে, বোধ হয় ফল আরও ভাল হইতে পারে। দেশীয় লোক যেরূপ ধাতুতে গঠিত, এদেশজাত ঔষধ প্রয়োগে, অল্পায়াসে তাহাদিগের রোগের উপশম হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

শিক্ষা

পূর্বকালে এ দেশীয় লোক, সংস্কৃত ও পারসী ভাযাদ্বয়ের অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সাহেবের রাজ বিজ্ঞাপনানুসারে, এ দেশের সাধারণ শিক্ষা কর্ম ইংরেজি ভাষায় সম্পাদিত হইতে থাকে।

বাকরগঞ্জের ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গেরেট সাহেব ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এদেশে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীরামপুরের খ্রিস্টধর্ম প্রচারকগণ ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে একটি ইংরেজি স্কুল, স্থাপন করিয়াছিলেন। মিঃ স্টার্ট সাহেব ১৮৪২ খৃস্টাব্দে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করিবার জন্য জমি ক্রয় করিয়া তথায় স্কুল স্থাপন করেন, কয়েক বৎসরে অর্থাৎ ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট উক্ত স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ১৮৯১ খৃস্টাব্দে এই স্কুলটি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডর হস্তে অর্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক মহকুমায় এক একটি মধ্য ইংরেজি স্কুল ও বরিশাল সদরে একটি বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তৎকালে অপর কোন থানায় বা গ্রামে এরূপ কোন বিদ্যালয় ছিল না।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাকরগঞ্জে বিভিন্ন প্রকারের ৩৬০ টি স্কুল ছিল এবং ১২১১০ জন বালক স্কুলে অধ্যয়ন করিত। তন্মধ্যে যদিও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা এ দেশে অধিক হউক, কিন্তু শিক্ষা বিভাগে হিন্দুর সংখ্যা চিরদিনই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে।

বর্তমান সময়ে এদেশে মোট ২ টি কলেজ, ১০ টি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি স্কুল, ৮৬ টি মধ্য বাঙ্গলা ও ইংরেজি স্কুল, ৩৩০৭ টি উচ্চ ও নিম্ন প্রাইমারি স্কুল ও ১টি টেকনিকেল স্কুল সংস্থাপিত আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রায় নব্বই হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে। বাকরগঞ্জের পুরুষের সংখ্যা ১১০৪৪৪৩ জন। স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের বালকগণ মধ্যে শতকরা ৫০ জন বালক পড়িতেছে।

বরিশালের বালিকা বিদ্যালয় ব্যতীত পূর্বে স্ত্রী শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না। অধুনা গভর্নমেন্টের অনুকম্পায় এ জিলায় ১১৬ টি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় সাত হাজার বালিকা অধ্যায়ন করিতেছে। এ জিলার স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০৪৯৫২২ জন, স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বালিকাগণ মধ্যে শতকরা ৪ জন বালিকা পড়িতেছে।

বাকরগঞ্জ, শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ ভাবে উন্নতি লাভ করিতেছে, বঙ্গদেশের অপর কোন স্থানেই এইরূপ দ্রুতোন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। এ দেশস্থ বালকদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিয়া, যাহাতে তাহাদিগকে চরিত্রবান করিতে পারা যায় এবং যদ্দ্বারা দেশে প্রকৃত শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হয়, তজ্জন্য বাটাজোড়া নিবাসী বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম, এ, বি, এল প্রায় দ্বাদশ বৎসরকাল পর্যন্ত বাকরগঞ্জে ও সময়ে সময়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়া নিঃস্বার্থভাবে, অদম্য উৎসাহের সহিত খাটিতেছেন। ১৮৮৪ অব্দের ২৭ জুন তারিখে ইহারই উদযোগে, ইহার পিতৃদেব বরিশালস্থ ব্রজমোহন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ স্কুল ইঁহারই দ্বারা নতুন প্রণালীতে চালিত হইয়া, শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের নিকট, উচ্চস্থান অধিকার করতঃ প্রশংসিত হইতেছে। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ঐ স্কুলটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা হইয়াছে।

বাবু অশ্বিনীকুমার ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে ওকালতী আরম্ভ করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং স্থানীয় উকিল শ্রেণী মধ্যে একজন উন্নত ও সুবক্তা উকিল বলিয়া পরিচিত হয়েন। পরে সাধারণের হিতানুষ্ঠানের অধিকতর সুযোগ ও সময় পাইবার জন্য এবং ওকালতির কার্য কিয়ৎ পরিমাণে তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ায়, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে উহা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার চেষ্টায় সর্বপ্রথমে বরিশালস্থ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ধর্ম জীবনের উন্মেষ হইয়াছে। তাহার যত্নে বরিশাল হইতে কুৎসিত আমোদপ্রমোদ অনেক পরিমাণে লোপ পাইয়াছে। এ জিলায় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত করাইবার জন্যে অশ্বিনীবাবুই প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা। ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত করাইবার জন্য ইনি এ দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন ও এই জিলা হইতে বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষর যুক্ত এক আবেদনপত্র পার্লামেন্ট মহাসভায় প্রেরণ করেন। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ইহাকে ছাড়িয়া বাকরগঞ্জের কোন হিতকর কার্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না ; ইনিই আমাদিগের একটি প্রকৃত বন্ধু। অশ্বিনীবাবু দীন দুঃখী ও নিরাশ্রয় রোগিগণের একজন আশ্রয়দাতা। রাত্রে জাগরিত থাকিয়া, ইনি কলেরার রোগীগণের সেবা শুশ্রূষা পর্যন্ত করেন।

লাখুটিয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়, ১৮৮৮ অব্দের ২৮ জুন তারিখে তাহার পিতৃদেবের নামে রাজচন্দ্র স্কুল স্থাপন করিয়া ১৮৮৯ অব্দে ঐ স্কুলটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে, পরে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিয়াছেন। এইখানে আইনের ক্লাস খোলা হইয়াছে। বিহারী বাবু বহু অর্থ ব্যয় করতঃ এই কলেজ চালাইয়া একটি কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভূতপূর্ব ভাইস চেয়ারম্যান গৈলা নিবাসী বাবু রজনীকান্ত দাসের উদ্যোগে বরিশালে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে টেকনিকেল স্কুল স্থাপিত হইয়া, এ দেশবাসীর একটি প্রকৃত অভাব দূরীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাত্মা বিটসন বেল ও বাবু দ্বারকানাথ দত্তের উদ্যোগে ঐ স্কুলটি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শাখা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

এ দেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী বিশেষ কোন বিদ্যালয় নাই। নবদ্বীপ হইতে যাহারা সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসেন, তাঁহারা নিজ নিজ বাড়িতে 'টোল' করিয়া ছাত্রগণকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইয়া থাকেন। অধুনা গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে বরিশালে বৎসর বৎসর ঐ সকল ছাত্রগণের পরীক্ষা গৃহীত হয় ও পরীক্ষার ফলানুসারে ছাত্রগণ ও তাহাদিগের শিক্ষকগণ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন হাইস্কুল ও কলেজে অল্প অল্প সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত শাস্ত্রে দুইটি পুরস্কার দেওয়ার জন্য কাশীপুরের বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্টের হস্তে দুইশত টাকা অর্পণ করিয়া, একটি সুদৃষ্টান্ত স্থাপিত করিয়াছেন।

মুসলমানদিগকে আরবি ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে কয়েকটি পাঠশালা বর্তমান আছে, তাহা যথেষ্ট নহে। এ দেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। সুতরাং তাহাদিগের শিক্ষার আরও উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হওয়া কর্তব্য। বাকরগঞ্জের প্রত্যেক বিভাগে এক একটি মাদ্রাসা সংস্থাপিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। মধ্য বাঙ্গলা, মধ্য ইংরেজি, হাই ইংরেজি স্কুলে ও কলেজে যে প্রণালীতে মুসলমানদিগের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা কম বলিয়া মনে হয়।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে এ দেশে এখন পর্যন্ত তত সন্তোষজনক ফল হইতেছে না। বাল্য বিবাহ প্রথাই হিন্দু-বালিকাগণের শিক্ষা বিষয়ের অন্তরায়। এ অধ্যায়ে ব্রাহ্মগণই দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহারা অদম্য উৎসাহের সহিত এ ব্রত পালন করিতেছেন। যদিও ব্রাহ্মের সংখ্যা অতিশয় অল্প হউক, তবুও তাহাদিগের শক্তি প্রশংসনীয়। বাকরগঞ্জের যে কয়েকটি রমণী উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্ম পরিবারের অন্তর্গত।

(১) চাঁদসির শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু বি, এ, এল, আর, সি, পি। এই তেজস্বিনী রমণী একই কালে তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এডিনবরা ও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকটি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(২) বাসণ্ডার শ্রীমতী কামিনী সেন বি, এ, ও

(৩) শ্রীমতী যামিনী সেন এল, এফ, এস।

অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষায় জন্য বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা অতিশয় উৎসাহের সহিত কার্য করিতেছেন। বিগত ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে এই সভা স্থাপিত হয়। সভার প্রথম প্রধান উদ্যোক্তাগণ মধ্যে ফরিদপুরের বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার উজিরপুরের বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, গাভার বাবু অমৃতচন্দ্র ঘোষ, অভয়নীলের বাবু হরনাথ ঘোষ, নরোত্তমপুরের বাবু উপকণ্ঠ রায় ও ইলুহারের বাবু বিহারীলাল সরকার এই সকল দেশ-হিতৈষী ভদ্র সন্তানগণের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাননীয় ব্যারিস্টার মিঃ আনন্দমোহন বসু বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার উন্নতি কল্পে যত্ন সহকারে সাহায্য করিয়াছেন।

বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার ১ম বর্ষে ২২ জন মাত্র সভ্য ছিল। কিন্তু সুখের বিষয়, বর্তমান সময়ে সেই স্থলে সভ্য সংখ্যা চারি শতাধিক হইয়াছে। এ যাবৎ সভা ক্রমে দুই সহস্রেরও অধিক মহিলা এবং বালিকার পরীক্ষা গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন। এ ভিন্ন এই সভার কোন কোন সভ্য স্ত্রী শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি করিয়াও স্ত্রীশিক্ষার সাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে সিদ্ধকাঠির বাবু গিরিজাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের প্রণীত "গৃহলক্ষ্মী" এবং গৈলার বাবু আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রণীত "গৃহিণীর কর্তব্য" এই দুইখানি পুস্তকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে গভর্নমেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝাইয়া বলিবার জন্য ১৮৮২ অব্দে সভা হইতে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল এডুকেশন কমিটির সাক্ষ্য প্রদানার্থ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয় এবং এক সুদীর্ঘ আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়া, স্ত্রী শিক্ষার অভাব ও আবশ্যকতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় এবং এককালীন দান সংগ্রহ প্রভৃতিই সভার প্রধান আয়। এই উপায়ে সভা এ যাবৎ প্রায় পাঁচ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া, স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি কল্পে ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দাতাদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহোদয়ের নামই বিশেষ উল্লেযোগ্য। ১৮৮৩ অব্দে সভার সাহায্যার্থে তিনি এককালীন নয়শত টাকা দান করিয়া, বদান্যতা এবং স্ত্রী হিতৈষিতার উচ্চাদর্শ দেখাইয়াছেন। গত ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে বরিশালের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, সভার সাহায্যার্থে বার্ষিক দেড় শত টাকা দিতেছেন।

১৮৭৮ হইতে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সভাপতির কার্য নির্বাহ করেন। তৎপরে ১৮৮৪ অব্দ হইতে এ যাবৎকাল লাখুটিয়া নিবাসী ব্যারিস্টার মিঃ প্যারীলাল রায়চৌধুরি মহোদয়ই বিশেষ উৎসাহেব সহিত সভাপতির কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিতেছেন।

বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে বাকরগঞ্জে 'Female Improving Society' অর্থাৎ রমণীকুলের উন্নতি বিধান করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। বাটাজোড়ের ব্রজমোহন দত্ত স্ত্রী শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীলোকের রচিত প্রবন্ধের জন্য প্রত্যেক বৎসর তাঁহার প্রদত্ত ৪০ টাকার একটি পুরস্কার দেওয়া হয়।

বাকরগঞ্জের শিক্ষা বিষয়ক বিবরণ পাঠে প্রতীয়মান হইতেছে যে, এ দেশ শিক্ষা বিষয়ে উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া দেশকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। বিশ বৎসর পূর্বে এদেশে দশ বারটি বি এ, উপাধিধারী লোক ছিলেন কিনা সন্দেহ, তৎস্থলে দুই শতেরও অধিক লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ, উপাধি লাভ করিয়াছেন। স্ত্রী-শিক্ষা দেশে পূর্ণমাত্রায় পরিচালিত না হইলে, আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে। সে কাল আর এ কাল, এত তফাৎ ও এত বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, বর্তমান সমাজ বাধ্য হইয়া স্ত্রী-শিক্ষার প্রার্থী হইবেন। কিন্তু রমণীগণের অল্প শিক্ষার ফল অতি বিষময় ; অল্প শিক্ষা অপেক্ষা নারীগণ অশিক্ষিতা অবস্থায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণ পুস্তকালয়

এ দেশস্থ অনেকানেক পল্লী গ্রামে বহুসংখ্যক সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত আছে। মিঃ কেম্প সাহেব ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল টাউনের সাধারণ পুস্তকালয়ের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়া লোকের মহদুপকার করিয়াছেন। উক্ত লাইব্রেরিতে ১৮৩০ খান পুস্তক আছে। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ হইতেই এই পুস্তকালয়ের কার্য ধীরে ধীরে আরম্ভ করা হইয়াছিল।

সংবাদপত্র

সর্বপ্রথমে ১২৭৮ সনে তারপাশা গ্রাম নিবাসী বৈদ্য কুলোদ্ভব পণ্ডিত হরকুমার রায় 'পরিমলবাহিনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে বাঙ্গালা ১২৮০ সনে মাগুরার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র কর 'বরিশাল বার্তাবহ' নামক সংবাদপত্র প্রচার করেন। তদনন্তর তারপাশা গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী 'হিতসাধিনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে 'বালরঞ্জিকা, 'সত্যপ্রকাশ' ও 'বঙ্গ দর্শন' নামক তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা ১২৮৮ সনে কাশীপুরের বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'কাশীপুর নিবাসী' পত্রিকা বাহির করিয়া, বর্তমান সময় পর্যন্ত চালাইতেছেন। এত দীর্ঘকাল স্থায়ী পত্রিকা এদেশে আর কখনও দেখা যায় নাই। স্বদেশী ও সহযোগী নামক দুইটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াই লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে বরিশাল বঙ্গ বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব হেড পণ্ডিত বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় 'হিতৈষী' পত্রিকা প্রচার করিতেছেন।

মুদ্রাযন্ত্র

সর্বপ্রথমে বাসণ্ডার বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করেন। পরিমলবাহিনী পত্রিকা তথায় মুদ্রিত হইত। উক্ত যন্ত্র কয়েক বৎসর পরে উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা ১২৮৩ সনে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র করের সত্যপ্রকাশ যন্ত্র, ১২৯২ সনে বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাশীপুর যন্ত্র, ১২৯৪ সনে বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের হিতৈষী যন্ত্র ও ১৩০২ সনে বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শ যন্ত্রালয় স্থাপিত হওয়ায় অধিবাসীগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

গৈলার বিজয় গুপ্তের প্রসিদ্ধ মনসার পাঁচালী ও পদ্মাপুরাণ এ দেশীয় পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। গৈলা নিবাসী বাবু প্যারীমোহন দাস এই মূল্যবান পুস্তক মুদ্রিত করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র হইযাছেন।

অতিপূর্বে রায়েরকাঠির জমিদার রাজা নরনারায়ণ রায়চৌধুরি ও তাঁহার সহধর্মিনী শ্রীমতী

বসন্ত কুমারী রায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাটাজোড়ের ভূম্যধিকারী বাবু ব্রজমোহন দত্ত 'মানব' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন ; তন্মধ্যে মানবের দেহতত্ত্বের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, পাপ ও পুণ্যের ছবি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

বাসণ্ডার বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহারাজা নন্দকুমার, টমকাকার কুটীর, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ, অযোধ্যার বেগম, এই কি রামের অযোধ্যা, জীবন গতি নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, এ দেশীয় অধিবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। দেশের ইতিহাসগুলি এই প্রকারে প্রকাশিত হইলে, বাস্তবিক দেশের মঙ্গল হয়। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী কামিনী সেন প্রণীত 'আলো ও ছায়া' অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ; পড়িতে ভাবুকের মন-ভাবরসে প্লাবিত হইয়া যায়। লাখুটিয়ার কুসুমকুমারী রায়ের 'স্নেহলতা' ও 'প্রেমলতা' গ্রন্থদ্বয় বিশেষ প্রশংসা যোগ্য। কীর্তিপাশার জমিদার বাবু রোহিণীকুমার রায় চৌধুরি কনকলতা, চিতোর উদ্ধার, চণ্ডবিক্রম, প্রমোদবালা, মায়াবিনী, কিরণসিংহ, সুধামুখী ও আমার পূর্বপুরুষ নামক আটখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, বঙ্গীয় সমাজে প্রশংসিত হইয়াছেন। দেশের পুরাতন ইতিহাস এই প্রকার উপন্যাসের আকারে প্রকাশিত করিয়া, বাবু রোহিণীকুমার রায় ও বাবু চণ্ডীচরণ সেন বাকরগঞ্জের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। আর্য জাতির কীর্তিকলাপ লোকসমক্ষে যিনি ধরিতে পারেন, তিনিই আমাদিগের প্রকৃত দেশ-হিতৈষী। রোহিণী বাবুর কনকলতা, প্রমোদবালা, মায়াবিনী, সুধামুখী প্রভৃতি গ্রন্থ কয়েকখানি পবিত্র ভালবাসার পবিত্র ছবি। বানরিপাড়ার বাবু মনোরঞ্জন গুহের 'আশাপ্রদীপ' পুস্তকে মুক্ত আত্মা নরদেহে আবির্ভূত হওয়ার বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। গৈলার বাবু চন্দ্রনাথ দাসের 'কয়েকটি চিত্র' নামক পদ্য গ্রন্থখানির নাম উল্লেখযোগ্য। বাটাজোড়ের ভূম্যধিকারী বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দেশস্থ বহু সংখ্যক বর্ষীয়ান ও যুবকবৃন্দের ভক্তিপথ প্রদর্শক হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা বাবু কামিনীকুমার দত্তের 'ভালবাসা' নামক গ্রন্থ, ভালবাসার বিকারে প্রপীড়িত লোকের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। সিদ্ধকাঠি নিবাসী বাবু গিরিজাপ্রসন্ন রায়ের 'গৃহলক্ষ্মী' ও গৈলার বাবু আনন্দচন্দ্র সেনের 'গৃহিণীর কর্তব্য' গ্রন্থদ্বয় রমণীগণের বিশেষ ব্যবহারোযোগী। কাশীপুরের বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৯২ খৃস্টাব্দে পোস্ট অফিসের কার্যবিধি লিখিয়া, গভর্নমেন্টের নিকট বিশেষ প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন। তৎপরে 'কাশীপুর' 'কুসুম ও কাশীপুর নিবাসীর সংগ্রহ' পুস্তকদ্বয় প্রকাশ করিয়া, তাঁহার নিজ গ্রামেব ও বিভিন্ন দেশ বিদেশের পুরাতন কীর্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কাঁচাবালিয়ার উকিলবাবু রসিকচন্দ্র বসু 'ইন্ডিয়ান ল রিপোর্ট ও নজির সংগ্রহ' পুস্তক প্রচার করিয়া, এ দেশে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছেন।

যে সকল গ্রন্থাকার ও গ্রন্থের নামোল্লেখ হইল, তদ্ভিন্ন বাকরগঞ্জে আরও অনেকানেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ; বিশেষ অসুবিধা বশত সে সকল নাম এ স্থলে উল্লিখিত হইল না।



ষষ্ঠ অধ্যায়

বাকরগঞ্জে ইংরেজ রাজত্ব

ইংরেজ কর্তৃক এ দেশ অধিকৃত হওয়ার পর শত বৎসর পরে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে বঙ্গদেশের শাসনকার্য নির্বাহের জন্য স্যার ফ্রেডেরিক হেলিডে সাহেব এ দেশের প্রথম লেপ্টেনেন্ট গভর্নর নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার শাসন সময়ে সব ডিভিশন স্থাপন প্রণালী প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে, জমিদারগণের ক্ষমতা খর্ব করিয়া, নিলামি আইন জারি করা হয়। যদি নির্দিষ্ট দিবসে জমিদারির রাজস্ব দাখিল না হয়, তবে জমিদারি নিলাম হইয়া যাইবে, এই নিয়ম প্রচারিত হয়। ১৮৬০ অব্দে জন পিটার গ্রান্ট সাহেবের সময়ে স্থানে স্থানে ছোট আদালত স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৬২ অব্দে ছোট লাটের কৌন্সেল বা আইনসভা স্থাপিত হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে মিউনিসিপাল গভর্নমেন্ট প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে পথকর আইন মঞ্জুর হয়। মহামতি লর্ড রিপনের শাসনকালে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে স্যার রিভারস টমসন ছোটলাট সাহেবের সময়াবধি বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটিতে নির্বাচন প্রথা ও স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইয়া, স্থানে স্থানে বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক বর্ণিত বাকরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইতিপূর্বে ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত বারইকরণ নামক স্থানে সরকারি সদর কাছারি সংস্থাপিত ছিল। মিঃ মিডেলটন সাহেব ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বারইকরণ হইতে বাকরগঞ্জে সরকারি আফিসাদি তুলিয়া নিয়া যান এবং ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তথায় শাসন কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। অদ্য পর্যন্ত ও এই জিলা 'বাকরগঞ্জ জেলা' বলিয়া উল্লিখিত ও পরিচিত হইতেছে। ডাকাইত, ঠগ ও বদমায়েস গ্রেপ্তার করাইবার জন্য মিডেলটন সাহেব আলিয়ার খাঁ নামক জনৈক গোয়েন্দাকে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে প্রেরণ করেন। তথা হইতে আলিয়ার খাঁ ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি তারিখে ৩১৪ জন ডাকাইত, ঠগ ও বদমায়েস ধৃত করিয়া, উক্ত সাহেব মহোদয়ের নিকট উহাদিগকে অর্পণ করে। এই সময়ই মিঃ স্পেডলিঙ্গ সাহেব বাকরগঞ্জে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েন। তিনি দুই তিন মাস পরে স্থানান্তরিত হইলে, মিঃ উইন্টল সাহেব তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হইয়াই উক্ত সনে অর্থাৎ ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে সদর কাছারী বরিশালে আনয়ন করেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এই স্থলেই সরকারি আফিসাদি সংস্থাপিত আছে।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে হাতিয়া এবং দক্ষিণ সাহাবাজপুর নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত হয়। কিন্তু পুনরায় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ সাহাবাজপুর বাকরগঞ্জ জেলাভুক্ত হয়। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ সাহাবাজপুরকে সবডিভিশন করা হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বালেশ্বর নদীর পশ্চিম পাড়স্থ কচুয়া স্টেশন পিরোজপুরের দক্ষিণে মোড়লগঞ্জ, যশোহরের অন্তর্গত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাদারিপুর

মহকুমা ফরিদপুরের অন্তর্গত হয়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে পিরোজপুর ও ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে পটুয়াখালিকে সব ডিভিশন করা হয়। কোটেরহাটে একটি মুনসেফি চৌকি ছিল। তাহা পটুয়াখালি সব ডিভিশন হওয়ায় এবালিস হইয়া যায়। কাউখালির মুন্সেফি পিরোজপুরে, বাউফলের মুন্সেফি পটুয়াখালিতে, মেহেন্দিগঞ্জের মুন্সেফি দৌলত খাঁয় ও দৌলত খাঁয়ের আফিসাদি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ভোলায় উঠিয়া গিয়াছে।

পূর্বে ফৌজদারি মোকদ্দমায় প্রায়ই কঠিন শাস্তি হইত না, ফাঁসির সংখ্যাও অল্প ছিল। কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, ঘটনাস্থলে তাহার গলায় ফাঁসি দেওয়া হইত। সুসভ্য ব্রিটিশ রাজ্যে অপরাধীর প্রাণদণ্ড প্রথা যদি একেবারে রহিত হইয়া না যায়, তবে ঘটনাস্থলে, সর্বজন সমক্ষে ফাঁসি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কারণ সেই ভীষণ কাণ্ডদ্বারা জনসাধারণ গভীরভাবের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে।

অতি প্রাচীন কালাবধি বাকরগঞ্জে ডাকাইতদিগের দৌরাত্ম্য চলিয়া আসিতেছিল। ইহাদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সর্বপ্রথমে এদেশে চৌদ্দটি পুলিশ স্টেশন স্থাপিত হয় এবং তৎসহ চৌদ্দখানি জল পুলিশের নৌকা দেওয়া হয়। জল পুলিশকে রাত্রিতে নদী মধ্যে পাহারা দিতে হইত। ১৮০৫ খৃস্টাব্দে মহম্মদ হায়াৎ ও আইনুদ্দিন সিকদার, সে কালের ডাকাইতগণের নেতা ছিল। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া দ্বীপান্তরিত করা হইয়াছিল।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে মিঃ গেরেট সাহেবের আমলে বাকরগঞ্জের সতীদাহ প্রথা রহিত হইয়া যায়। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ রহিত করাইবার জন্য গভর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেও এ জেলায় ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ২৩টি, ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ৬৩টি, ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ৪৫টি, ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ২৯টি নারী মৃত স্বামীর চিতারোহণ করেন, কিন্তু ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ হইতে এই প্রথা বাকরগঞ্জ হইতে চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে যখন মিঃ আলেকজাণ্ডার সাহেব বাকরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন পিরোজপুরের অন্তর্গত সিংঘালি গ্রামের গগন মিঞা ও মোহন মিঞা ৮ টা লুঠ ও বহুতর হাঙ্গামা করে গভর্নমেন্টের বিচারে তাহাদিগের চৌদ্দ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহারা দ্বীপান্তরিত হয় ও তাহাদিগের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়; এতদ্ভিন্ন বাকরগঞ্জে কত শত ডাকাইতি ও তজ্জনিত হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিষ্কার হিসাব পাওয়া যায় না। বাউকাঠি নিবাসী সাগর কর্মকার স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ ডাকাইতি ও এক দল চোরের নেতা ছিল। বর্তমান সময়ে পুলিশের বন্দোবস্তে ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতাপে চোর ও ডাকাইতগণের অত্যাচার কমিয়াছে ; কিন্তু বাকরগঞ্জের জালিয়াতিদিগের দৌরাত্ম্য কমিতেছে না, ইহারা অবলীলাক্রমে লোকের সর্বনাশ সাধন করিতেছে। কলসগ্রাম এই কলঙ্কের প্রধান স্থান।

লুণ্ঠন ও ডাকাইতি প্রভৃতির সংখ্যা কমিতেছে বটে, কিন্তু হাঙ্গামা ও নরহত্যাকাণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। যে পর্যন্ত এ দেশের নিম্ন শ্রেণীর ছোট লোকগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার না হইবে, যে পর্যন্ত তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম ভাবের সঞ্চার না হইবে, যে পর্যন্ত তাহাদিগের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইবে, ততদিন তাহারা নিজ স্বার্থ ও তাহাদিগের নিজ নিজ জমিদারের স্বার্থ ও ইঙ্গিতানুসারে, কথঞ্চিৎ পয়সা প্রাপ্ত হইয়া অথবা ঘটনা বিশেষে টাকা পয়সা গ্রহণ না করিয়াও এই সকল অমানুষিক কাণ্ডে লিপ্ত থাকিবেই থাকিবে। এস্থলে ইহাও বলিতে হইবে যে, এ দেশীয় জমিদার ও তালুকদারগণের অত্যাচারে সময় সময় প্রজাগণ ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া অস্বাভাবিক নরহত্যা ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে।

সর্বপ্রথমে এ জিলায় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি বন্দুক দ্বারা রাত্রিকালে হত্যাকাণ্ড হয়। আসামিকে প্রমাণ অভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে আসামির প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে বাকরগঞ্জবাসীর পক্ষে বিশেষ উপকারের কারণ হইত। আসামি মুক্ত হওয়ায় সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মনে ধারণা হইল যে, 'রাত্রের খুনে ফাঁসি হয় না' এবং এই ভাবটিই এ দেশবাসীর

সর্বনাশের কারণ হইয়াছে। রাত্রিকালের বন্দুকের খুন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, কোন চেষ্টায়ই কোন ফল হইতে পারিল না, ক্রমশ পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিশ সাহেব, অপরাপর পুলিশ কর্মচারী কোন প্রকার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। অবশেষে মহাত্মা বিটসন বেল সাহেব এ জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন, মিঃ রাইলেন্ড সাহেব কিছুদিন পূর্ব হইতেই এ জিলাস্থ পুলিশ বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। ইঁহারা উভয়ই আমাদিগের হিত কামনায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গলার ছোটলাট স্যার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জ সাহেব বাহাদুর বরিশালে শুভাগমন করেন। সেই সময়ে দয়ার্দ্র হৃদয় মহাত্মা বেল সাহেব বাকরগঞ্জে বন্দুকের পাশ উঠাইয়া দেওয়ার প্রার্থনা করেন ও ছোট লাট বাহাদুর প্রজার হিতার্থে বন্দুকের লাইসেন্স বন্ধ করার আজ্ঞা প্রচার করেন। তদানুসারে ঐ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রজা সাধারণের বন্দুক ফেরত লওযা হয়। ছোট লাট বাহাদুরের নিযুক্তিয় ডিটেকটিভ পুলিশ ইন্সপেক্টরগণ বাকরগঞ্জের গ্রামে গ্রামে গিয়া বেপাশের বন্দুকগুলি ধরিয়া দিয়া আমাদিগের প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছেন। বাবু কালীকিশোর চৌধুরি, বাবু বামাচরণ ভৌমিক, বাবু হরিশচন্দ্র গুহ ও বাবু রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাকরগঞ্জে চিরপরিচিত হইয়া রহিবেন। মিঃ রাইলেন্ড সাহেব অদম্য উৎসাহের সহিত বাকরগঞ্জের নরহত্যা বিদূরিত করিবার জন্য অহোরাত্র চিন্তা করিয়াছেন। মাননীয় মহাত্মা বেল সাহেব অন্যান্য সহস্র সহস্র কার্যের মধ্যে বিরত থাকিয়াও এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড দূর করিবার মানসে নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁদের অদম্য উৎসাহ, অকপট সাধুভাব ও ন্যায় বিচারে বর্তমানে, বাকরগঞ্জের বহুসংখ্যক বদমায়েস ও চোর ধরা পড়িয়াছে ও খুনের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমিতেছে। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

মোট খুন বা হত্যার সংখ্যা

সন	বন্দুক দ্বারা	বিনা বন্দুকে	মোট	মন্তব্য
১৭৯৭	০	৩	৩	
১৭৯৮	০	২৬	২৬	
১৭৯৯	০	২৯	২৯	
১৮০০	০	৩০	৩০	
১৮০১	০	২৬	২৬	প্রথমে দাওয়ার বিচার
১৮৮৩	০	১৪	১৪	আরম্ভ হয়।
১৮৮৪	০	১২	১২	
১৮৮৫	০	২২	২২	
১৮৮৬	০	১৫	১৫	
১৮৮৭	০	১৩	১৩	
১৮৮৮	১	১০	১১	রাত্রে প্রথম
১৮৮৯	১	২৬	২৭	বন্দুকের খুন
১৮৯০	১	২৫	২৬	
১৮৯১	২	৪৯	৫১	
১৮৯২	১০	২৯	৩৯	
১৮৯৩	৯	৪৫	৫৪	
১৮৯৪	১৬	৪৪	৬০	
১৮৯৫	২২	৫৪	৭৬	
১৮৯৬	১৫	৪২	৫৭	সেপ্টেম্বরে বন্দুকের
১৮৯৭	০	৩০	৩০	পাশ উঠিয়া যায়

বাকরগঞ্জ ডাকাইতি, বদমায়েসি, চৌর্য, হত্যা, জাল প্রভৃতি কুৎসিত কার্যের জন্য চির-কলঙ্কিত। এই কলঙ্ক হইতে যাঁহারা আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, তাঁহারাই আমাদিগের প্রকৃত বন্ধু ও দেশহিতৈষী। সুতরাং মহাত্মা বেল সাহেব আমাদিগের পরম বান্ধব।

মাননীয় এন ডি বিটসন বেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ উপাধি লাভ করেন ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর ভারতে আগমন করেন। প্রথমত পাটনা, হাজিপুর, বর্ধমান ও সিরাজগঞ্জে এঃ ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ও পাটনার সিটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে খুলনায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়েন। তৎপর ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে কার্য করিয়া, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বাকরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যভার গ্রহণ করিয়া সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণবশত সুচারুরূপে কার্য নির্বাহ করিতেছেন। মহাত্মা বিটসন বেল আমাদিগের ইতিহাসে একটি উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন। ইঁহার দয়ার পরিচয় সর্বত্রই পাওয়া গিয়াছে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইনি যখন ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখনকার ভীষণ দুর্ভিক্ষে সেই দেশ হাহাকার করিতেছিল। এই উদারচেতা বিবিধ উপায়াবলম্বনে নিরাশ্রয় ক্ষুধার্তদিগকে অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন ও নিজে শেষ কপর্দক পর্যন্ত এই মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া ভগবানের কৃপার ভাজন হইয়াছেন।

মাননীয় বেল সাহেব বাকরগঞ্জের হত্যাকাণ্ড কমাইয়াছেন, লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বহুসংখ্যক পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করাইয়াছেন, আম্বৌলা, ঝালকাঠি এবং আরও অনেকানেক রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছেন, মুসলমান ছাত্র নিবাসের জন্য প্রায় দশ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, বরিশাল সর্বসাধারণের একটি ক্রীড়াক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য প্রায় ৪০,০০০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। শাসনকর্তার পদোচিত কার্য করিয়া তিনি ধন্যই হইয়াছেন। এই সকল কার্যে বাবু দ্বারকানাথ দত্ত যথেষ্ট সাহায্য করিয়া, সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

বর্তমান সময়ে বাকরগঞ্জে মোট ১৬টি পুলিশ স্টেশন এবং ১০টি আউটপোস্ট স্থাপিত আছে ; যথা—বরিশাল বা সদর বিভাগের অন্তর্গত ঃ (১) বরিশাল, (২) নলছিটি, (৩) ঝালকাঠি, (৪) বাকরগঞ্জ, (৫) মেহেন্দিগঞ্জ ও (৬) গৌরনদী স্টেশন। (ক) আগোরপুর, (খ) রাজাপুর, (গ) ন্যামতী ও খবদরটুনী আউটপোস্ট।

পিরোজপুর বিভাগে ঃ (১) পিরোজপুর, (২) ভাণ্ডারিয়া, (৩) মঠবাড়িয়া ও (৪) স্বরূপকাঠি স্টেশন। (ক) বামনা ও (খ) নাজিরপুর আউটপোস্ট।

পটুয়াখালি বিভাগে ঃ (১) পটুয়াখালি, (২) আমতলী, (৩) বাউফল ও (৪) গলাচিপা স্টেশন। (ক) মৃজাগঞ্জ ও (খ) ফুলঝুরি আউটপোস্ট।

ভোলা বিভাগে ঃ (১) ভোলা ও (২) বরানদ্দি স্টেশন। (ক) দৌলত খাঁ ও (খ) তজুমুদ্দি আউটপোস্ট।

এ দেশে মোট ৫২৩ জন পুলিশ, ৪৬ জন টাউন পুলিশ ও ৪৮০১ জন চৌকিদার শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত আছে। পুলিশ বিভাগে গভর্নমেন্টের প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ও চৌকিদারদিগের জন্য বাকরগঞ্জের অধিবাসীগণের প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। বিভিন্ন গ্রামে ৬৩০ জন পঞ্চায়েত চৌকিদারদিগের কার্যের সহায়তা করিতেছেন। বাকরগঞ্জে মোট ৪২৯৩৫৩ খানা ঘর, সমস্ত পুলিশ ও চৌকিদারের সংখ্যা ৫৩৭০ জন ; এই হিসাবে দেখা যায় প্রায় ৮৯ খানা ঘর, এক একজন পুলিশের এলাকাধীন ; এদেশে মোট ৪৭০৮ খানা গ্রাম ও পুলিশের সংখ্যা ৫৩৭০ জন ; এই হিসাবে ও প্রায় একটি গ্রাম একজন পুলিশের এলাকায় পড়ে। পুলিশ, চৌকিদার ও তৎসহ পুলিশ স্টেশনের সংখ্যার আরও বৃদ্ধি হওয়া কর্তব্য। পঞ্চায়েতের কার্যেরও সংস্কার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকদ্দমার সংখ্যা

দাঙ্গা, হাঙ্গামা, অনধিকার প্রবেশ, নরহত্যা প্রভৃতি মোকদ্দমার সংখ্যা বাকরগঞ্জে এখনও অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শান্তিরক্ষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার সংখ্যা ব্যতীতও ৫৮৮২টি ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ৬৪০৯টি ফৌজদারি মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে।

দেওয়ানি বিভাগে ছোট আদালতের মোকদ্দমা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১০৮৪৫টি ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১০৬৯২টি, খাজনার মোকদ্দমা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১৯১৬ টি ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১৭৯৭৯টি, স্বত্বের মোকদ্দমা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১৬৯৯টি ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১৭৪৬টি, মোট ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৩১৭১১টি ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ৩০৪১৭টি মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে।

যতদিন মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস না হইবে, ততদিন আমাদিগের দেশের মঙ্গল হইবে না। মোকদ্দমার সংখ্যা কমাইবার একটি মাত্র উৎকৃষ্ট উপায় আমাদিগের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্বে আমাদিগের পল্লী গ্রামস্থ অধিবাসীগণের মধ্যে কোন রকমের বিবাদ বিস্বাদ উপস্থিত হইলে, গ্রামের প্রাচীন ও বিজ্ঞ লোকদ্বারা ঐ সকল বিবাদের নিষ্পত্তি সাধিত হইত। বর্তমান সময়েও প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রামস্থ প্রবীণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় যত্ন করিলে, অনায়াসে কৃতকার্য হইতে পারেন। মোকদ্দমার সংখ্যা কম হইলে, গভর্নমেন্টকে বাধ্য হইয়া কর্মচারীর সংখ্যা কমাইতে হয় ও দেশীয় হাকিম, উকিল, মোক্তার, কেরানির সংখ্যার ক্রমশ হ্রাস হয়। সুতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বাধ্য হইয়া, দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য, কল-কারখানা, কৃষি প্রভৃতি কার্যে মনোনিবেশ করিবেন এবং তদ্বারাই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

জেল

বাকরগঞ্জ যখন জিলা স্থাপিত ছিল, তখন তথায়ই জেলখানা ছিল। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে জেলখানা প্রবর্তিত হয়। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে মিঃ গার্ডানার সাহেব কয়েদিগণের বাসোপযোগী কয়েকখানি গৃহ নির্মাণ করেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তথায় ইস্টকালয় প্রস্তুত হয়। এখনও সেই কয়েকটি দালান বর্তমান রহিয়াছে।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে বহুসংখ্যক কয়েদি গারদ ভাঙ্গিয়া বাহির হয়। তাহারা জেলখানার গৃহ দাহন করে ও তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বেটিয়া সাহেবকে আক্রমণ করে। সুবেদার ও হাওলাদারের চেষ্টায় তিনি কোন মতে জীবন রক্ষা করেন। সুবেদার প্রায় মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ১২ জন কয়েদিকে বন্দুক দ্বারা গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

বরিশাল ভিন্ন পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও ভোলাতে তিনটি জেল আছে।

বরিশাল জেলে ১৮০১ সনে কয়েদিগণের দৈনিক গড় ৭৫ জন ছিল। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ৮০০ জন, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ৯৮২ জন, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ৫২০ জন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের জেলখানায় কয়েদিগণের দৈনিক গড়ের সংখ্যা ৪৩২ জন। তন্মধ্যে ৮৭ জন হিন্দু ও ৩৪৫ জন মুসলমান অর্থাৎ চারিভাগ মুসলমান ও এক ভাগ হিন্দু ; হিন্দুদিগের মধ্যে চণ্ডালের সংখ্যাই অধিক।

রেজিস্টারি আফিস ও পোস্টাফিস

লোকের স্বত্ব রক্ষার সহজ উপায় করিবার জন্য বাকরগঞ্জে ২১টি রেজিস্টারি আফিস ও ৯টি ম্যারেজ রেজিস্টারি আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে। যথা : (১) বরিশাল, (২) গৌরনদী, (৩) ঝালকাঠি, (৪) মেহেন্দিগঞ্জ, (৫) নলছিটি, (৬) বাকরগঞ্জ, (৭) রহমৎপুর, (৮) রাজাপুর, (৯) পিরোজপুর, (১০) কাউখালি, (১১) মঠবাড়িয়া, (১২) ভাণ্ডারিয়া, (১৩) স্বরূপকাঠি, (১৪) ভোলা, (১৫) বরানদ্দি, (১৬) তজুমদ্দি, (১৭) দৌলত খাঁ, (১৮) পটুয়াখালি,

(১৯) বাউফল, (২০) গুলিসাখালি ও (২১) গলাচিপা ; এই সকল স্থানে রেজিস্টারি আফিস স্থাপিত আছে। (১) বরিশাল, (২) আগরপুর, (৩) মেহেন্দিগঞ্জ, (৪) ভোলা, (৫) বরানদ্দি, (৬) পটুয়াখালি, (৭) বাউফল, (৮) পিরোজপুর ও স্বরূপকাঠিতে ম্যারেজ সব রেজিস্টারি আফিস স্থাপিত আছে। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে বরিশাল সদরে রেজিস্টারি আফিস স্থাপিত হয়।

দূরদেশে অল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ প্রেরণের সুবিধার জন্য বাকরগঞ্জে ৫টি টেলিগ্রাফ আফিস, ১টি হেড পোস্টাফিস, ২৬টি সব পোস্টাফিস, ৭০টি শাখা পোস্টাফিস স্থাপিত আছে। যথা ঃ হেড আফিস (১) বরিশাল ; সব আফিস বাটাজোড়, (২) গৌরনদী, (৩) গৈলা, (৪) ঝালকাঠি, (৫) কলসকাঠি, (৬) বরিশাল কালীবাড়ি, (৭) মেহেন্দিগঞ্জ, (৮) নলছিটি, (৯) নলগোড়া, (১০) রহমতপুর, (১১) সাহেবগঞ্জ, (১২) উজিরপুর, (১৩) পিরোজপুর, (১৪) বানরিপাড়া, (১৫) কাউখালি, (১৬) ভাণ্ডারিয়া, (১৭) মঠবেড়িয়া, (১৮) স্বরূপকাঠি, (১৯) পটুয়াখালি, (২০) গলাচিপা, (২১) গুলিসাখালি, (২২) ভোলা, (২৩) বরানদ্দি, (২৪) দৌলতখাঁ ও (২৬) তজুমদ্দি।

শাখা পোস্টাফিস বরিশাল আফিসের অন্তর্গত ঃ (১) কাশীপুর, (২) লাখুটিয়া, (৩) রানীরহাট, (৪) সায়েস্তাবাদ। বাটাজোড়ের অধীন ঃ (১) আগোরপুর, (২) বাসুদেবপাড়া, (৩) মাহিলাড়া, (৪) শোলক। গৌরনদীর অধীন ঃ (১) বাকাই, (২) বাহী, (৩) চাঁদসী। ঝালকাঠির অধীন ঃ (১) বাসণ্ডা, (২) বাউকাঠি, (৩) কেওরা, (৪) কীর্তিপাশা, (৫) নবগ্রাম, (৬) পোনাবালিয়া, (৭) রাজাপুর, (৮) রুনসী। কলসকাঠির অধীন ঃ (১) আণ্ডারিয়া, (২) ভাতশালা, (৩) গারুরিয়া। মেহেন্দিগঞ্জের অধীন ঃ (১) হিজলা, (২) কাজিরচর, (৩) লতা, (৪) সাহাগঞ্জ, (৫) সাহসপুর, (৬) শোলনা শ্রীরামপুর, (৭) উলানিয়া। নলছিটির অধীন ঃ (১) অভয়নীল, (২) সিদ্ধকাঠি, রহমতপুরের অধীন ঃ (১) দেহেরগতি, (২) মাধবপাশা, (৩) রামচন্দ্রপুর। সাহেবগঞ্জের অধীন ঃ (১) ন্যামতী, (২) পাদ্রি শিবপুর। উজিরপুরের অধীন ঃ (১) খলিসাপেটা, (২) হবিবপুর। পিরোজপুরের অধীন ঃ (১) নাজিরপুর, (২) সাতুরিয়া। ভাণ্ডারিয়ার অধীন ঃ (১) বামনা, (২) দাউদখালি। স্বরূপকাঠির অধীন ঃ (১) ইলুহার, (২) সোহাগদল, (৩) কামারকাঠি। পটুয়াখালির অধীন ঃ (১) বাদুরিয়া, (২) ভুরিয়া, (৩) ভোগা, (৪) কনকদিয়া, (৫) কুলুয়া, (৬) মৃজাগঞ্জ, (৭) মুরদিয়া। বাউফলের অধীন ঃ (১) নেহালগঞ্জ। গলাচিপার অধীন ঃ (১) আমতলী, (২) আয়লা-চান্দখালি, (৩) বরগুনা, (৪) ফুলঝুরি ভোলার অধীন ঃ (১) গাজীপুর, (২) জয়নগর। বরানদ্দির অধীন ঃ (১) কালীগঞ্জ, (২) লালমোহন, (৩) মিরজাকালু, (৪) তালতলা।

স্বায়ত্তশাসন

আপনাকে আপনি শাসন করিবার নামই প্রকৃত 'স্বায়ত্তশাসন'। যাহারা স্বায়ত্তশাসনের নেতা, তাহাদিগের মধ্য হইতে স্বার্থপরতার ভাব অন্তর্হিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতির ভাব থাকা একান্ত কর্তব্য। তাহাদিগের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইয়া, ভীষণ কাণ্ডের উৎপত্তি হওয়া বিধেয় নহে, পরার্থে তাহাদিগের আত্মস্বার্থ, আত্মসুখ বিসর্জন করিতে শিক্ষা করা কর্তব্য। তাহা হইলেই স্বায়ত্তশাসন দ্বারা দেশে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল সংঘটিত হইতে পারে না। পরকৃত শাসনাপেক্ষা স্বায়ত্তশাসনের প্রভাবে মনোবৃত্তি ও হৃদবৃত্তি সকল অধিকতর পরিস্ফুটিত হইয়া মানবজাতির স্বাধীন চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি করে।

বাকরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সাহেব মহোদয়ের সময়ে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রবর্তিত হইলে, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মাধবপুর গ্রাম নিবাসী বরিশালের সুবিখ্যাত উকিলবাবু প্যারীলাল রায় চেয়ারম্যান ও ঢাকা জেলার অন্তর্গত হাসারা গ্রাম নিবাসী বরিশালের প্রসিদ্ধ উকিলবাবু দীনবন্ধু সেন ভাইস চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত

হইয়া তিন বৎসর কাল নির্ব্বিবাদে বোর্ডের কার্য সম্পাদনে, দেশীয় লোকের নিকট যশোভাজন হইয়াছেন। তৎপর বাটাজোড়ের বাবু দ্বারকানাথ দত্ত চেয়ারম্যান ও বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েন। পুনরায় বাবু দ্বারকানাথ দত্ত চেয়াবম্যান,ও সরমহলের বাবু তারিণীকুমার গুপ্ত এল এম এস, ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েন। তৎপর বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত চেয়ারম্যান ও বাবু তারিণীকুমার গুপ্ত ভাইস চেয়ারম্যান হয়েন। বর্তমানে বাবু রজনীকান্ত দাস চেয়ারম্যান ও বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত আছেন।

সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রচলিত হওয়ার বিরুদ্ধে মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সাহেব মহোদয় বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট সমীপে একটি সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রেরণ করেন। এই ঘটনায় বাকরগঞ্জের অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত, চাখার নিবাসী মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ, লাখুটিয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল রায় ও মিঃ প্যারীলাল রায় ব্যারিস্টার ছোট লাট বাহাদুরের নিকট ডেলিগেট প্রেরিত হয়েন ও গভর্নমেন্টের আদেশানুসারে মিঃ ফেচন সাহেবের সময়ে, ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাকরগঞ্জের সদরে ও পিরোজপুর বিভাগে স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রবর্তিত হয়।

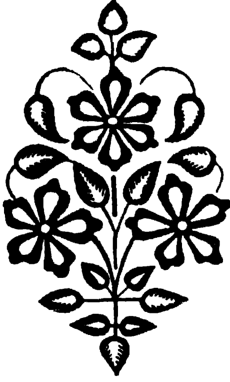
ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রথমবারে বাবু রজনীকান্ত দাস উকিল, দ্বিতীয়বারে মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ উকিল ও তৃতীয় ও চতুর্থ বারে বাবু দ্বারকানাথ দত্ত উকিল, ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন।

বোর্ডের তহবিলের টাকা প্রধানত রাস্তা, খাল, পানীয় জলের পুষ্করিণী, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাইমারি শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতেছে। স্টিমার কোম্পানি দ্বারা জলপথ চলিবার বিশেষ সুবিধা হওয়ায় বোর্ডে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

পথকর

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কোন তহবিলের টাকা ব্যয় করিতেছেন, ইহার আলোচনা একটি অবশ্য কর্তব্য বিষয় বলিয়া মনে হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের রাজ-বিজ্ঞাপনানুসারে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় 'পথকর ও পাবলিক ওয়ার্ক কর' নামক ট্যাক্স সংগৃহীত হওয়ার প্রস্তাব নির্ধারিত হয়। বাকরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্টন সাহেবের আমলে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে উক্ত ট্যাক্স নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক টাকার উপর পথকর দুই পয়সা ও পাবলিক ওয়ার্ককর দুই পয়সা, মোট চারি পয়সা করিয়া ট্যাক্স সংগৃহীত হইতে থাকে। কিন্তু ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে যে বন্যা হয়, তাহাতে প্রায় তিন লক্ষ লোক ও বহুসংখ্যক গবাদি জন্তু ও স্থানীয় লোকের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় তদানীন্তন, সদাশয় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্টন সাহেব ও রোড সেস আফিসের সুযোগ্য মেম্বর বাবু প্যারীলাল রায় প্রভৃতি, প্রজার কষ্ট কথঞ্চিৎ দূরীকৃত করার মানসে পথকরের অর্থহার নির্ধারণ করেন। তদবধি এই হারে পথকর আদায় হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় বোর্ডের অধিকাংশ মেম্বরগণ পথকর দেড়া করিলেন। তৎপর ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে পথকরের হার দ্বিগুণ নির্ধারিত হইয়াছে। বাকরগঞ্জের রাজনৈতিক ইতিহাসে বাবু প্যারীলাল রায় উকিল মহোদয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি তিনি বাকরগঞ্জের নানাপ্রকার হিতকর কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। তিনি বিদেশী হইলেও এদেশের পরম বান্ধব। এখন পর্যন্তও জনসাধারণের কোন কার্যই বাবু প্যারীলাল রায়ের সাহায্য ভিন্ন সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইতেছে না।

পথকরে যত টাকা আদায় হয়, তাহারই অধিকাংশ টাকা সাধারণের হিতার্থে বোর্ড পথকর তহবিল হইতে সওয়া লক্ষ টাকার অধিক প্রাপ্ত হইতেছেন। পথকর বিভাগের সুযোগ্য ডেপুটি কালেক্টর বাবু জগদীশচন্দ্র সেন এই বিভাগের অনেক জটিলতা দূর করিয়া, জমিদারগণের নিকট চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও কৃতবিদ্য লোক। পরোপকার তাঁহার একটি প্রধান ব্রত।



সপ্তম অধ্যায়

সদর ও সব ডিভিসনের বিবরণ

বরিশাল

বাকরগঞ্জের পরগনা সমূহ মধ্যে গিরিধি বন্দর নামে একটি ক্ষুদ্র পরগনার উল্লেখ আছে। তাহাই বরিশাল নামে পরিচিত। বরিশাল, বাকরগঞ্জ জেলার প্রধান নগর। এই শহরটি কলিকাতা হইতে প্রায় ১৮৩ মাইল পূর্ব ও ঢাকা হইতে প্রায় ৭৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বগুড়া, আমানতগঞ্জ, আলেকান্দা ও কাউনিয়া, বরিশাল টাউনের অন্তর্গত। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বাকরগঞ্জ হইতে বরিশালে গভর্নমেন্টের সদর কাছারি সংস্থাপিত হইয়াছে। মীর কাশিমের নবাবী আমলে বরিশালে লবণের প্রধান কারখানা ছিল।

বরিশালে ১টি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, ১টি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ, ৩টি এন্ট্রান্স স্কুল, ১টি বঙ্গ বিদ্যালয় (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত), ১টি বালিকা বিদ্যালয় (বাঙ্গলা ১২৮০ সনে স্থাপিত), ১টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কয়েকটি উচ্চ ও নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। এই নগরে জনসাধারণ সভা, ধর্মরক্ষিণী সভা (১২৮০ সনে স্থাপিত), লোন আফিস, (১২৮০ সনে স্থাপিত), টেলিগ্রাফ আফিস, ২টি পোস্টাফিস, স্টিমার আফিস, সাধারণ পুস্তকালয়, বার লাইব্রেরি, ৪টি গিরিজা, ব্রাহ্ম মন্দির (১২৬৮ সনে স্থাপিত), কয়েকটি কালীবাড়ি, কয়েকটি মদনমোহনের বাড়ি ১টি জেনানা হাসপাতাল, পুরুষদিগের জন্য ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় (১৮৪৮ অব্দে স্থাপিত), ৪টি ছাপাখানা, ২টি লিমনেডের কল, কয়েকটি সেলাইয়ের কল, গভর্নমেন্টের কাছারি বাড়ি, জেলখানা ও বোর্ড সমূহের আফিস স্থাপিত আছে।

শহরের স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা অতিশয় কম। উকিল মোক্তার, হাকিম, আমলা, স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি ও অপরাপর ব্যবসায়ী লোকগণ প্রায় কেহই স্থায়ী ভাবে শহরে থাকেন না। দুর্গা পূজার বন্ধের সময় শহরে লোকের সংখ্যা অত্যল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু বৎসরের এগার মাস ভরিয়া লোকের সংখ্যা অধিক। মিউনিসিপ্যালিটির অধিকৃত টাউনের লোকসংখ্যা ১৫৪৮২ জন। সমস্ত সদর বিভাগে লোক সংখ্যা ৮৭৯১৭৭ জন। মিউনিসিপ্যাল টাউনের দৃশ্য অতিশয় সুন্দর ; শৃঙ্খলার অভাব কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। রাস্তাঘাট ও পুষ্করিণীগুলি অতিশয় পরিষ্কার। বাবু দ্বারকানাথ দত্তের উৎসাহ ও যত্নের ফলেই বরিশাল শহরটির এত সৌন্দর্য বাড়িয়াছে। বাকরগঞ্জের প্রধান প্রাধান লোক সকল অধিকাংশ সময়েই বরিশালে বাস করেন। শহরে থাকিলে, কোন রকমের অভাব কাহারও ভোগ করিতে হয় না। জমিদারগণ মধ্যে মিঃ ব্রাউন, মিঃ লুকাস্

সাহেব ও লাখুটিয়ার জমিদারগণ বরিশাল টাউনে সদর কাছারি স্থাপন করত স্থায়িভাবে শহরে বাস করিতেছেন। স্কুলের ছাত্রদিগের থাকিবার ৫টি ছাত্রনিবাস আছে। তন্মধ্যে মুসলমান ছাত্রনিবাস মহাত্মা বেল সাহেবের অনুগ্রহে স্থাপিত হইয়াছে। তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রায় ১০,০০০ টাকার চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। মুসলমানদিগের একটি প্রকৃত অভাব দূরীকৃত হইল।

পিরোজপুর

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে এই মহকুমা স্থাপিত হয় এবং কাউখালির মুন্সেফী তথায় পরিবর্তিত হয়। বরিশাল জিলার প্রধান মহকুমা পিরোজপুর ; এস্থান বরিশাল শহর হইতে প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমে বালেশ্বর নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পিরোজপুরের লাগ উত্তরে দামোদর নদী প্রবাহিত হইতেছে। এন্ট্রান্স স্কুল, পোস্টাফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, কালীবাড়ি, হাট, বাজার, পাকা রাস্তা, পুল, জেল, কালেক্টরি দালান, দাতব্য ডাক্তারখানা, মিউনিসিপাল আফিস, লোকাল বোর্ডের আফিস প্রভৃতি সকলই শৃঙ্খলভাবে বর্তমান আছে। এই বিভাগে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইয়াছে। মিউনিসিপাল টাউনের লোকসংখ্যা ১২২৪৬ জন, পিরোজপুর বিভাগে লোকসংখ্যা ৫১৯৬০৩ জন। এই মহকুমায় ফৌজদারি মোকদ্দমা ও খুনের সংখ্যা অধিক, মঠবাড়িয়া নামক থানায় ডিটেকটিভ ও পুলিশ থাকা নিতান্ত কর্তব্য। এই মহকুমার ভূতপূর্ব ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু শশিশেখর দত্ত পিরোজপুর টাউনের ও বিভাগের অত্যন্ত উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে পিরোজপুরে একটি "প্রদর্শনী মেলা" হইত; এইরূপ দেশ হিতকর কার্য এ জিলায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শশীবাবু এ জিলায় স্বনামখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। বায়ের কাঠির প্রসিদ্ধ রাজা রাজকুমার রায় দোলযাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে একটি মেলার অবতারণা করিয়া যান। এই মহকুমার সংলগ্ন দক্ষিণে পাড়ের বাড়িতে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় জমিদার বংশ, সম্পন্ন অবস্থায় আছেন; বরিশালের নদীর ধারের পাড়ের ঘাটলা এই বংশের একটি কীর্তি। দামোদরের উত্তর পাড়স্থ কুমার খালির হাট ও হুলার বা বাজার হাট, বায়েরকাঠির জমিদারগণ কর্তৃক স্থাপিত। পিরোজপুরের বর্তমান সব ডিভিসনাল অফিসার বাবু প্রসন্নকুমার কারফরমা অত্যন্ত দক্ষতার সহিত শাসন কার্য করিতেছেন।

পটুয়াখালি

পটুয়াখালি প্রকৃতির অতি রমণীয় স্থানে বিরাজিত। স্থল ভাগের মধ্য দিয়া বৃহৎ বা ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট নদী উঠিয়াছে। দক্ষিণ দিক মহারণ্য সুন্দরবনে আবৃত। কত কত বিচিত্র চিত্রের পশুপক্ষী তথায় বাস করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুন্দরবনের দক্ষিণে অপার সমুদ্রবারি বেগে ধাবিত হইতেছে ও গভীর গর্জনে লোকের ভীতি সম্পাদন করিতেছে।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এই মহকুমা স্থাপিত হয় এবং বাউফলের মুন্সেফী পটুয়াখালিতে পরিবর্তিত হয় ও কোটেরহাটের মুন্সেফী এবালিস হইয়া যায়। পটুয়াখালি বরিশাল সদর হইতে প্রায় ৩৮ মাইল দক্ষিণে সুন্দরবন বিভাগে অবস্থিত। এই মহকুমার উত্তর ও পূর্ব দিকে দুইটি দোন থাকায় জল পথের সুবিধা হইয়াছে। বরিশাল হইতে পটুয়াখালি হইয়া আমতলী পর্যন্ত স্টিমার লাইন আছে। এ স্থানের জল লবণাক্ত ; সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে ; স্থানটির দৃশ্য ভাল। মহকুমায় এন্ট্রান্স স্কুল, পোস্টাফিস, হাট, বাজার, পাকা রাস্তা, পুল, জেল, কালেক্টরির ক্ষুদ্র দালান, দাতব্য ডাক্তারখানা, মিউনিসিপাল অফিস প্রভৃতি আছে। মিউনিসিপাল টাউনের লোক সংখ্যা ৪৮৮৫ জন ও পটুয়াখালী বিভাগের লোকসংখ্যা ৪৯৬৭৩৫ জন। পটুয়াখালিতে ফৌজদারি মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক ও নরহত্যা ব্যাপারও অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইত।

পটুয়াখালি বিভাগে অনেকানেক চোর, ডাকাইত, বদমায়েস প্রভৃতি ছিল, ক্রমশ ইহাদিগের দৌরাত্ম্য কমিতেছে। বাবু যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ পটুয়াখালিতে সব ডিভিসন অফিসার নিযুক্ত হইয়া আগমন করার পর হইতেই তাঁহার সুশাসনে ও অদম্য উৎসাহে চতুর্দিকে শান্তির চিহ্ন দেখা দিয়াছে। যোগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত ন্যায়বান পুরুষ, তাহাদ্বারা পটুয়াখালি বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ফৌজদারী বিভাগে বাবু হরিশচন্দ্র গুহ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার সাহায্যার্থে ঘটিয়াছেন। বাবু যোগেন্দ্রকুমার পটুয়াখালিতে আগমন না করিলে এত অল্প দিবস মধ্যে স্থানীয় এতদূর উন্নতি হইত কিনা সন্দেহের বিষয়। স্থানীয় অবস্থার উন্নতি কল্পে তিনি অত্যন্ত যত্ন করিয়াছেন। সংক্ষেপত বলিতে গেলে পটুয়াখালির বর্তমান অবস্থা বাবু যোগেন্দ্রকুমারের উৎসাহ ও কৃতবিদ্যত্বের ফল। এ অঞ্চলের লোক চিরদিন তাহার নিকট ঋণী থাকিবে।

পটুয়াখালি অঞ্চলের সুন্দরবন বিভাগ এখন পরিষ্কার হইতেছে। তথায় মুসলমান ও মগজাতি আসিয়া বাস করিতেছে। পটুয়াখালির অন্তর্গত বগা, ভুরিয়া প্রভৃতি স্থানে বালাম চাউলের কারবার যথেষ্ট পরিমাণ লক্ষিত হয়—ইহা দ্বারা সব্ ডিভিসনের গৌরব বর্ধিত হইতেছে।

• এই সব ডিভিসনের অন্তর্গত বাউফল, গলাচিপা, আমতলী, ন্যামতী, মৃজাগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে ও তদ্দ্বারা লোক সাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। ফুলঝুরির নবাব কাছারিতে দাতব্য ঔষধালয় আছে।

পটুয়াখালির অধীন কচুয়া নামক স্থানে চন্দ্রদ্বীপের পুরাতন রাজধানী ছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। কমলা নাম্নী রাজকন্যা, কালাইয়া নদীর পাড়ে তিন দরুণ তের কানি স্থান ব্যাপিয়া ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক দীঘি খনন করেন। উহার অংশ এখনও বর্তমান আছে। পটুয়াখালির অধীন কালীসুরির মেলায় অতিশয় নির্দোষ আমোদ প্রমোদ উপভোগ করা যায়।

ভোলা

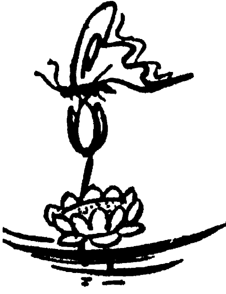
বাকরগঞ্জের পুরাতন সব্ ডিভিসন বলিলেই দক্ষিণ সাহাবাজপুরের নাম মনে হয়। প্রকৃতির অতি রমণীয় স্থানে অবস্থিত ; চতুর্দিকে অতল ও অপার বারিরাশি। পূর্বে, উত্তরে ও পশ্চিমে সাহাবাজপুর, ইলসা ও তেঁতুলিয়া নদী প্রবাহিত হইয়াছে। দক্ষিণে অপার সমুদ্র বেগে ধাবিত হইয়াছে। কোথাও বা নতুন স্থান ভাঙ্গিয়া নদীর আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। আবার কোথাও বা নতুন চর জাগিয়া উঠিয়া স্থলভাগের পরিসর বাড়াইতেছে। প্রকৃতির বিচিত্র লীলাক্ষেত্র এই দ্বীপে পরিলক্ষিত হয়।

দক্ষিণ সাহাবাজপুরকে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে সব্ ডিভিসন করা হয় ও মেহেন্দিগঞ্জের মুন্সেফী দৌলত খাঁয় পরিবর্তিত হয়। ১৮৭৬ অব্দের বন্যায় দৌলত খাঁয় প্রলয়কান্ড উপস্থিত হইয়া, সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায় ; ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ভোলায় সরকারি আফিসাদি সংস্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানটি বরিশাল সদর হইতে প্রায় ৪০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। দক্ষিণ সাহাবাজপুরে একটি দ্বীপ বরিশাল হইতে ভোলার ধার দিয়া নোয়াখালি পর্যন্ত স্টিমার লাইন আছে। এই ডিভিসনের লোকসংখ্যা ২৫৮৪৫০ জন। অতি প্রাচীনকালে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে লবণের কারখানা ছিল ও বহুসংখ্যক চোর, ডাকাইত ও ঠগ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই সম্বন্ধে ভোলা বাকরগঞ্জের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা উন্নত।

ভোলাতে ১৮৭৭ অব্দে খ্যাতনামা মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সব্ ডিভিসন স্থাপন করিয়া যান। লোহার পুলটি দেখিতে অতিশয় সুন্দর। রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া পথিকগণের শ্রান্তি দূর করিতেছে। মিঃ রমেশচন্দ্র এই স্থানটি পত্তন করিয়া যান, বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত সব্ ডিভিসনাল অফিসার তাহা যত্নের সহিত রক্ষা করেন। পরে বাবু প্রসন্নকুমার দত্ত বর্তমান সব্

ডিভিসনাল অফিসার সেই ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া স্থানীয় অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ইহার উদ্যোগে এন্ট্রান্স স্কুলটির অবস্থা পরিবর্তিত ও স্কুলের তহবিলে যথেষ্ট টাকা হইয়াছে। শাসন কার্যে ইনি অত্যন্ত নিপুণ। ভোলায় ফৌজদারি মোকদ্দমার সংখ্যা অতি কম। আপাতত বরিশালের খ্যাতনামা ভূতপূর্ব রোডসেরি ডিপুটি কালেক্টর ও ঝিনাদহের সব্ ডিভিসনাল অফিসার বাবু জগদীশচন্দ্র সেন এই স্থানের সব্ ডিভিসনাল অফিসার নিযুক্ত হইয়া আগমন করিতেছেন। আশা করি, ইনিও লোকের প্রিয়ভাজন হইয়া, শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন।

ভোলায় হাট, বাজার, রাস্তা, পুর, এন্ট্রান্স স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, জেল, আফিসাদির ঘর, পোস্টাফিস প্রভৃতি আছে। এই বিভাগে সর্বপ্রথমে সব ডিভিসন স্থাপিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, হাকিমগণের বাসোপযোগী পাকা গৃহাদি নাই। গভর্নমেন্টের অনুগ্রহ না হইলে, এ অভাব দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ভোলার অন্তর্গত লালমোহন নামক স্থানে বড় বড় মহিষ, ব্যাঘ্র, হরিণ প্রভৃতি বাস করে।



পরিশিষ্ট

গ্রামসমূহের বিবরণ

গ্রামের বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে একটি বিষয়ের এ স্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য। যে সকল গ্রামের বিবরণ বিশেষভাবে পূর্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, সে সকল গ্রামের নাম পুনরুল্লিখিত হইল না। যে সকল দেশহিতৈষী ভদ্রসন্তানগণ নিজ নিজ গ্রামের ইতিহাস প্রেরণ করিয়াছেন, যতদূর সম্ভব, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইল।

সদরবিভাগ—গারুরিয়া ও কলসকাঠি। গারুরিয়া বা সায়েস্তানগর পরগনা বাকরগঞ্জ থানার অন্তর্গত। গারুরিয়া ও কলসকাঠির জমিদারগণ একই বংশ সম্ভূত ও এক আদিপুরুষ রামগোপাল রায়ের সন্তান। রামগোপালের ৬ পুত্র, তন্মধ্যে রামগোবিন্দ রায় গারুরিয়া গ্রামেই অবস্থিতি করেন ও সর্বকনিষ্ঠ জানকীবল্লভ রায় কলসকাঠি গ্রামে গিয়া বাস করেন। অপরাপর ভ্রাতাগণ বিশেষ খ্যাতনামা হয়েন। রামগোবিন্দের তিনপুত্র— মধুসূদন, হরিদেব ও কৃষ্ণরাম। হরিদেব রায়ের তিন পুত্র — কালিকাপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ ও গঙ্গাপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদ নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। ইহাদিগের সময়ে স্থাপিত কালী, মনসা, শিব ও লক্ষ্মীনারায়ণ দেবমন্দিরগুলি এখনও বর্তমান আছে। কালিকাপ্রসাদের তিন পুত্র—রাজচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ ও কেবলকৃষ্ণ। ইহারা মাতৃ শ্রাদ্ধে নবদ্বীপ পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া, ১৪ টাকা সহচর করেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের পুত্র দীননাথ রায়। দীননাথ রায়ের স্ত্রী জয়দুর্গা চৌধুরানি তাহার দত্তক পুত্র দ্বারকানাথ রায়ের যজ্ঞোপবীতোপলক্ষে নবদ্বীপ পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া, ১০ টাকা সহচর করেন। উপরোক্ত গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র কমলাকান্ত, তৎপুত্র অখিলচন্দ্র রায়। ইনি পিতৃ শ্রাদ্ধে নবদ্বীপ পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া, ১২ টাকা সহচর করেন। গারুরিয়ার জমিদারগণ হিন্দুধর্মানুমোদিত অনেকানেক প্রকার দানাদি করিয়া, শত শত লোকের উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ইঁহাদিগের বংশধরগণের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। গারুরিয়ার পথঘাটগুলি সুবিধাজনক নহে। মধ্যে মধ্যে জঙ্গল দৃষ্ট হয়। বালকগণের পাঠোপযোগী কয়েকটি বিদ্যালয় আছে ; এই গ্রামে সংস্কৃতের চর্চা এখনও আছে। একটি পোস্টাফিস তথায় স্থাপিত আছে।

উপরোক্ত জানকীবল্লভ রায় তাঁহার ভ্রাতাগণ কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া, আট বৎসর বয়সে ঢাকার নবাব সাহেবের নিকট ভ্রাতাগণের অসদাচরণের বিষয় জ্ঞাপন করিলে, নবাব এই বালকের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, অরঙ্গপুর ও রঘুনাথপুর পরগনা এবং নবাবের একজন প্রধান কর্মচারীর ইতসদপুর পরগনা জানকীবল্লভকে প্রদান করেন। তৎপর তিনি কলসকাঠি গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। ইনিই কলসকাঠির জমিদারগণের প্রধান পূর্বপুরুষ। তাঁহার বংশধরগণ এখন এই গ্রামে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত হইয়া, নিজ নিজ জমিদারির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। এই বংশের কালীবাবু ও বরদাকান্ত

রায় স্বনামখ্যাত লোক। বরিশালে "কালীবাবুর ঘাট" নামে আমানতগঞ্জের নদীর ধারের ঘাট, কালী বাবুর সময়ে নির্মাণ করা হয়। বরদাকান্ত রায় অত্যন্ত হিন্দুধর্মানুরাগী সদাশয় পুরুষ ছিলেন। ইনি গণেশ পূজা উপলক্ষে কলসকাঠিতে প্রকাণ্ড এক মেলা স্থাপন করিয়াছেন। বৎসর বৎসর কার্তিক মাসে তথায় মেলা হয়। তাঁহার যত্নে গ্রাম মধ্যে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হইয়া সাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। তাঁহার মাতৃ শ্রাদ্ধে তিনি নবদ্বীপ, মিথিলা প্রভৃতি পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া, ২৫ টাকা সহচর করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাঁহার পুত্র বিশ্বেশ্বর রায় পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ২৬ টাকা সহচর করেন। ইহারা বংশ পরম্পরায় হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত সর্ব প্রকার দানাদি কার্য করিয়া আসিতেছেন। কলসকাঠির জমিদারগণের অবস্থার উন্নতিই হইতেছে। দেশের মধ্যে কয়েকটি রাস্তা, একটি পোস্টাফিস, একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজি স্কুল ও কয়েকটি টোল স্থাপিত হইয়া, লোকের পরমোপকার সাধিত হইযাছে। বর্তমান সময়ে বাবু বিশ্বেশ্বর রায়, বাবু ব্রজকান্ত রায়, বাবু দুর্গাপ্রসন্ন রায় প্রভৃতিই প্রধান জমিদার।

কীর্তিপাশা

ঝালকাঠি থানার অধীনে এই গ্রামটির অবস্থিতি। বাকরগঞ্জের প্রসিদ্ধ বৈদ্য জমিদারগণেব বাসস্থান বলিয়াই এ গ্রামটি সর্বদেশে বিশেষভাবে পরিচিত। কীর্তিপাশা গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতি বাস করেন। পূর্বে পাহিদাস বংশ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। এখন মজুমদারগণেরই একাধিপত্য। শূদ্র, কর্মকার, শঙ্খবণিক, চণ্ডাল, জিয়ানী, মুসলমান প্রভৃতিরও সংখ্যা কম নহে।

কীর্তিপাশার জমিদারগণের অনুগ্রহে একটি বাজার, একটি পোস্টাফিস, একটি মধ্য ইংরেজি স্কুল, একটি পুস্তকালয় (লাইব্রেরি), একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়া, নানা শ্রেণীর লোকের পরোপকার সাধিত হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়া দিযা, জমিদারগণ জনসাধারণ ও স্থানীয় লোকের নিকট যশোভাজন হইয়াছেন। ঝালকাঠি হইতে একটি প্রশস্ত রাস্তা এই গ্রাম পর্যন্ত আসিয়াছে।

কীর্তিপাশার জমিদারগণের আদি বাসস্থান, বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত পোড়াগাছা গ্রাম। দুর্গাদাস সেন ইহাদিগের আদিপুরুষ। পাহিদাস বংশীয় হরেকৃষ্ণ রায় তাঁহার ভাগিনীর বিবাহ দিয়া, ইহাকে কীর্তিপাশায় স্থাপন করেন। দুর্গাদাসের পুত্র রামজীবন ; তাঁহার দুই পুত্র— রামগোপাল ও রামেশ্বর।

রামগোপালের পুত্র রামকেশব ও রামেশ্বরের চারিপুত্র—কাশীরাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও বলরাম। রামকেশবের সন্তানগণ মধ্যে চন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের বর্তমান আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে। রামেশ্বরের চারিপুত্রের মধ্যে কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও বলরাম এই তিন ভ্রাতাই রায়েরকাঠির মহারাজা জয়নারায়ণ রায়ের চাকরি করিতেন। কৃষ্ণরাম সেন অসাধারণ বুদ্ধি বলে রায়েরকাঠির জমিদার বাড়ির দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং নবাব সরকার হইতে "মজুমদার" উপাধি লাভ করেন। অদ্য পর্যন্ত কীর্তিপাশার জমিদার বাড়ি "মজুমদার বাড়ি" নামে অভিহিত হইতেছে। মহারাজা জয়নারায়ণের সময়ে রায়েরকাঠি জমিদারি যখন প্রায় লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তখন কৃষ্ণরাম সেন অসাধারণ কৌশলে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, জমিদারি রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণরাম হইতেই কীর্তিপাশার ভাগ্য লক্ষ্মী উদিতা হয়েন।

কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীরামের সন্তান সন্ততিগণ কীর্তিপাশার "পূর্বের বাড়িতে" বাস করিতেছেন। এই বংশে কৃষ্ণমোহন সেন অতিশয় বুদ্ধিমান ও সাহসী লোক ছিলেন। বর্তমান সময়ে বাবু কালীপ্রসন্ন সেন অতিশয় শিষ্ট শান্ত হিন্দু ও ধার্মিক। তাঁহার পূর্বাবস্থার পরিবর্তন হওয়ায়, আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

কৃষ্ণরামের তৃতীয় ভ্রাতা বিষ্ণুরামের বংশধরগণ "পশ্চিমের বাড়িতে" বাস করিতেছেন। ইহাদিগের মধ্যে উমানাথ সেন ও দুর্গানাথ সেন বয়োজ্যেষ্ঠ। ইহাদিগের আর্থিক অবস্থায় পরিবর্তন হইয়াছে।

কৃষ্ণরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম সেনের বংশধরগণ মধ্যে শম্ভুচন্দ্র সেনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের আর্থিক অবস্থা এখন ভাল নহে।

কৃষ্ণরাম অত্যন্ত ন্যায়বান ও সচ্চরিত্র লোক ছিলেন। তিনি সে কালের একজন প্রসিদ্ধ দাতা ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দিয়া রামরাম দাস ঘটক বিশারদকে তিনি কীর্তিপাশায় স্থাপন করেন। রামরামের বংশধরগণ মধ্যে নীলমাধব কবিভূষণ, গৌরচন্দ্র কবিভূষণ, প্যারীমোহন কবিরঞ্জন, রামদয়াল দাস, উমাচরণ কবিরত্ন ও অক্ষয় কুমার কবিরঞ্জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের বাড়ি "কবিরাজ বাড়ি" নামে খ্যাত।

কৃষ্ণরাম ১০৯৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন ও ১১৬৬ সনে পরলোক গমন করেন। ইনি অত্যন্ত পুণ্যাত্মা পুরুষ ছিলেন। বাজারাম পিতার মৃত্যুর পরে কিছুদিন রায়েরকাঠির রাজসরকারে দেওয়ানের কার্য করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজবংশের আত্মকলহে তিনি কার্যে ইস্তাফা করিয়া, নিজ বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে কালাতিপাত করেন। বাসণ্ডা নিবাসী জয়দেব সেনের কন্যার সহিত রাজারাম সেনের বিবাহ হয় ; এই সূত্রে জয়দেবের বংশের কিশোর মহলানবিশ, শিবশঙ্কর মহলানবিশ প্রভৃতি কীর্তিপাশায় চাকরি করিতেন। ১১৭৫ সনে রাজারামের মৃত্যু হয়। রাজারামের দুই পুত্র নবকৃষ্ণ সেন ও কালচাঁদ সেন। নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ উভয়ই ধার্মিক ও তেজস্বী লোক ছিলেন। ১১৬৪ সনে নবকৃষ্ণ ও তৎপর তিন চারি বৎসর পরে কালচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। নবকৃষ্ণ গাবখান হইতে কীর্তিপাশা পর্যন্ত একটি খাল ও রাস্তা প্রস্তুত করেন। নবকৃষ্ণের পুত্র কালীকুমার সেন তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ এখন "বড় হিস্যার" অধিকারী ও কালাচাঁদের পোষ্যপুত্র চন্দ্রকুমার সেন, তাঁহার সন্তানগণ "ছোট হিস্যার" অধিকারী। কালাচাঁদ দত্তক পুত্রকে তাঁহার নিজের আট আনি অংশের ছয় আনি ও ভ্রাতুষ্পুত্র কালীকুমারকে দুই আনি অংশ দিয়া যান। এই কারণেই ষোল আনি বিত্তের বড় হিস্যা দশ আনি ও ছোট হিস্যা ছয় আনির মালিক হইয়াছে। কালাচাঁদ যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তাহার প্রমাণ পরিষ্কার ভাবেই পাওয়া যাইতেছে ; তিনি ১২২৮ সনে পরলোক গমন করেন। কালাচাঁদ সেনের সহধর্মিণী তারিণী চৌধুরানি "তুলা" করিয়া ছিলেন। অর্থাৎ তুলাদণ্ডের একদিকে তিনি, অপর দিকে স্বর্ণ ও রৌপ্য ওজন করিয়া, তৎসমুদয় ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন।

কালীকুমারের পুত্র, রাজকুমার সেন , তৎপুত্র প্রসন্নকুমার সেন ; তাঁহার চারিপুত্র— রোহিণীকুমার, কামিনীকুমার, রমণীকুমার ও বিনোদকুমার। চন্দ্রকুমার সেনের পুত্র, শশিকুমার সেন; তাঁহার দুই পুত্র— অন্নদাকুমার ও ভূপেন্দ্রকুমার।

১২৩৩ সনে নবকৃষ্ণ পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়া, সুদূর হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম হইতে মণিপুর পর্যন্ত পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ শ্রাদ্ধের তিন দিবস পূর্বে অকস্মাৎ নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয় ও তাঁহার সহধর্মিণী স্বামীর চিতারোহণ করেন। নবকৃষ্ণের পুত্র কালীকুমার ব্রাহ্মণগণকে আরও একমাস কাল কীর্তিপাশায় রাখিয়া, অশৌচান্তে ২৬ টাকা সহচর করেন। এই কার্যে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কালীকুমার ১২১৩ সনে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১২৪৫ সনে ২২ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয়া সহধর্মিণী মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করেন। এই বয়সে রাজকুমার সেনকে দত্তক গ্রহণ করা হয়। রাজকুমার বাবু অল্প বয়সে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার সহধর্মিণী স্টেটে অছি নিযুক্ত হয়েন। তিনিও এক বৎসর মধ্যে স্বামীর অনুগামিনী হয়েন। ১২৫১ সনে রাজকুমার বাবু "চৌদ্দমাদল মহোৎসব" করিয়া নবদ্বীপ পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া ২৬ টাকা সহচর করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়। রাজকুমারের পুত্র স্বনামখ্যাত বাবু

প্রসন্নকুমার সেন, ইনি সাধারণত "নাবালক বাবু" বলিয়া পরিচিত। নাবালক বাবু ১২৪৬ সনে জন্ম গ্রহণ করেন, ছয় বৎসর বয়সের সময়ে নাবালক বাবুর পিতৃদেবের মৃত্যু হওয়ায়, গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে মিঃ রেলী সাহেব এই বালকের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হয়েন। এ স্থলে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য— রাজকুমার বাবুর বিশ্বস্ত ভৃত্য রাজচন্দ্র ভদ্র এই বালককে সর্বদা বক্ষে ধারণ করিয়া লালনপালন করিয়াছেন। ভদ্র মহাশয় এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাকে জমিদারগণ অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকেন। বাবু প্রসন্নকুমার বয়োপ্রাপ্ত হইয়া, নিজ জমিদারির উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি কীর্তিপাশার নানা প্রকার হিতকর কার্য করিয়া, বিশেষ, যশোভাজন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থাপিত মাইনর স্কুলটি বাকরগঞ্জে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে; দুঃখের বিষয় যে, তিনি ৩৭ বৎসর বয়সে ১২৮৩ সনে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কীর্তিপাশা অঞ্চলের বহুসংখ্যক ভদ্র সন্তান ইহারই অনুগ্রহে জ্ঞানার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। নাবালক বাবুর চারিপুত্র, তন্মধ্যে বাবু রোহিণীকুমার রায়ই সর্ব জ্যেষ্ঠ ও স্টেটের ম্যানেজার। ইনি ১২৭৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর রোহিণী বাবুর মাতা যষ্ঠীপ্রিয়া চৌধুরানি জমিদারির কার্য করিয়াছিলেন। বাবু রোহিণীকুমার অত্যন্ত অমায়িক লোক, ইনি একজন সমদর্শী জমিদার, বাঙ্গলা ও ইংরেজি ভাষায় ইহার বিশেষ অধিকার আছে। ইহার প্রণীত আটখানি বাঙ্গলা গ্রন্থের নাম আমরা পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। রোহিণীবাবু লোকের নিকট অত্যন্ত প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন।

ছোট হিস্যার জমিদার বাবু শশিকুমার রায় ১২৬৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার মাতা ত্রিপুরা চৌধুরানি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন, তিনি স্টেটের কর্তৃত্ব করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাবু শশিকুমার জমিদারির কার্যভার গ্রহণ করিয়া, সুচারুরূপে কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ইনি অত্যন্ত ধীর ও গম্ভীর, ইংরেজি ও বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ অধিকার আছে। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইনি অতিশয় ব্যুৎপন্ন। ইহার দুই পুত্র, তন্মধ্যে বাবু অন্নদাকুমার রায় পিতার উপদেশানুসারে বিষয় কর্ম দেখিতেছেন। ইনি ১২৮০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবু শশিকুমার বিগত ১২৯৯ সনের দুর্ভিক্ষ সময়ে নিজ বাড়িতে একটি অন্নছত্র খুলিয়া কত শত লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু।

তারপাশা

ঝালকাঠি স্টেশনের অন্তর্গত কীর্তিপাশার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে তারপাশা গ্রামটি অবস্থিত। কীর্তিপাশা হইতে তারপাশার পরিসর বৃহৎ; বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বসতি স্থান। রায়েরকাঠির জমিদারগণের পুরোহিতগণ এই গ্রামে বাস করেন, তাঁহারা "রাজপুরোহিত" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক কুলীন ব্রাহ্মণ এখায় আছেন। এ গ্রামের ভট্টাচার্য বংশই প্রাচীন কালাবধি এখানে অবস্থিত আছে। নগুল্লাবাদ হইতে এক ঘর মিরবহর এ গ্রামে আসিয়া অতিশয় সম্মানের সহিত বাস করিতেছেন। তারপাশায় বহুসংখ্যক বৈষ্ণবের বাসস্থান। একটি গ্রাম্য রাস্তা ও কয়েকটি সংস্কৃত শাস্ত্রের টোল ও দুই তিনটি প্রাথমিক পাঠশালা আছে। কীর্তিপাশার সংলগ্ন বলিয়াই এ গ্রামে পৃথক স্কুল, বাজার প্রভৃতির আবশ্যক হয় না। কীর্তিপাশা ও তারপাশা একই গ্রামে বলিলে দোষ হয় না। এ গ্রামে একটি প্রশস্ত খাল আছে। তারপাশার কবিরাজ বাড়ি হইতে বাজার পর্যন্ত একটি রাস্তা আছে।

বর্তমান তারপাশা গ্রামের বৈদ্যকুলোদ্ভব রায় পরিবার পূর্বে এই গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে কোন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিত। ঐ গ্রামে রামগোবিন্দ রায় অনেক পূর্বে নবাব সরকারে কবিরাজী করিয়া এই বংশ "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামগোবিন্দের দুইটি পুত্র জন্মে তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম পরীক্ষিত রায়। কনিষ্ঠের নাম রামনরসিংহ রায়। পরীক্ষিত অত্যল্প কাল মধ্যে কলাপ, পানিনি, মাহেশ প্রভৃতি ব্যাকরণ, সুশ্রুত, চরকাদি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ সকল কণ্ঠস্থ করেন। ফলতঃ তিনি মুখে মুখেই ছাত্রগণকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতেন। কাব্যালঙ্কার, ন্যায়, সাংখ্যাদি যড়দর্শন, গীতা পঞ্চদশী, বেদান্ত প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। নাড়ীমালা, নাড়ীপ্রকাশ

প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার পূর্ণাধিকার ছিল। নাড়ী বিভাগ করিয়া, এক বৎসর পূর্বে লোকের মৃত্যু নির্ণয় করিতে পারিতেন। তৎকালের এতদ্দেশীয় সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার রায়ের কাঠির স্বর্গীয় মহাত্মা জয়নারায়ণ রায় উৎকট রোগগ্রস্থ হইয়া, অনেকানেক চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল না পাওয়াতে, উহাকে আপন বাড়ি লইয়া যান। ইনি অত্যল্পকাল মধ্যেই সেই উৎকট অচিকিৎস্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করান। সেই অবধি তিনি জয়নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া, তাঁহার পুরোহিতদিগের গ্রামে অর্থাৎ তারপাশার বর্তমান রায়ের বাড়ি ও বড় খালের অপর পাড়ের পুষ্করিণী ও ভিটা, রূপসী, গ্রামস্থ দশ বার ঘর কামার প্রজাসহ সমস্ত জমি মহাত্রাণ (নিষ্কর) লিখিয়া দেন ও তদবধি উক্ত পরীক্ষিত রায় মহাশয় তারপাশা গ্রামে অবস্থিতি করেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত পরীক্ষিত রায়ের মহাত্রাণ তাঁহার বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। জয়নারায়ণ রায় উক্ত রায়ের বাড়িতে ইষ্টকালয়, দেবমন্দির ও পাকাঘাট করিয়া দেন, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে।

উক্ত রায় মহাশয়ের পুত্রগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠ জয়কৃষ্ণ রায় ও কনিষ্ঠ রামলোচন রায় বিখ্যাত। রামলোচন রায়ই পিতৃগুণগ্রামের অধিকাংশ অধিকার করেন। ইনিও চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গুরুধামস্থ রাজা বাহাদুর পরিবারের ইনিই একমাত্র চিকিৎসক ছিলেন। উক্ত জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের চারিপুত্র। ১ম মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২য় কালাচাঁদ রায় ৩য় জগন্নাথ রায় ও ৪র্থ রামকুমার রায়। কাঁলাচাদ রায় চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি ৮০ বৎসর বয়সে কার্তিক মাসে রাসপূর্ণিমার দিনে পরলোক গমন করেন। ইহার এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্র গুরুপ্রসাদ রায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিজ গ্রাম ও নিকটস্থ গ্রামসমূহের বিবাদ বিসম্বাদের প্রধান শালিস ছিলেন। ইনি পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া, ১২৮৮ সনের ৪ঠা শ্রাবণ তারিখে ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইঁহার মৃত্যুকালে নিজের গতি নিজেই বলিয়া দিয়াছিলেন। ইনি কীর্তিপাশার জমিদার বাড়ির ছোট হিস্যার ও রায়েরকাঠির ছোট রাজবাড়ির প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ইহার সহধর্মিণী এখনও বর্তমান আছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বর পিতার ন্যায় সর্ব বিষয়ে সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন। ইনি কীর্তিপাশা জমিদার বাড়ির ছোট হিস্যার ফেমিলি কবিরাজ নিযুক্ত আছেন।

উক্ত জগন্নাথ রায় মহাশয় ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া, পৈতৃক চিকিৎসাশাস্ত্রে বিলক্ষণ অধিকারী হয়েন, জলাবাড়ি, আমরাজুরী প্রভৃতির জমিদারগণ উহার চিকিৎসাধীন ছিল। ইহার পুত্র হরকুমার রায়, ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন। এ অঞ্চলে ইনি একজন পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। আয়ুর্বেদ ও ডাক্তারী মতে ইনি চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইনিই বাকরগঞ্জে প্রথম "পরিমলবাহিনী" পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার চারিপুত্র। হরকুমার রায় ১৩০৩ সনের চৈত্র মাসে পরলোক গমন করেন।

কেওরা, বেলদাখান ও রসমতি

উক্ত গ্রাম তিনটিই পরস্পর অত্যন্ত সংলগ্ন, কীর্তিপাশার দক্ষিণ পশ্চিমে স্থিত। কেওরার সেন বংশই সমৃদ্ধিশালী ; ইহারা পোনাবালিয়া ও কুলকাঠির জমিদারগণের একই বংশের লোক। কেওরার চৌধুরিগণ গারুবিয়ার জমিদারগণের বরিশালস্থ প্রধান কর্মচারী ছিলেন, এই সূত্রেই চৌধুরী বাড়ির ভাগ্য-লক্ষ্মী উদিতা হয়েন। চৌধুরী বাড়ির মধ্যে গুরুচরণ রায়, গৌরমোহন সেন, গোলকচন্দ্র সেন মহাশয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়ে নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী ও গিরিশচন্দ্র সেন চৌধুরী বিশেষ পরিচিত। কেওরার চন্দ্রমোহন সেন ও গুরুদাস গুপ্ত নিজ নিজ অধ্যবসায় গুণে মূল্যবান সম্পত্তি রাখিয়া, পরলোক গমন করেন। তাহাদিগের উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে বাবু কামিনীকুমার গুপ্ত, বাবু মথুরানাথ সেন বি, এল, ও বাবু যদুনাথ সেন এম, এ, বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন। কেওরার রামকুমার সেন উকিলের পুত্র মথুরানাথ সেন এল, এম, এস ও ডাক্তার দুর্গাচরণ সেন বিশেষ সুপরিচিত। এই গ্রামে একটি মাইনর স্কুল, একটি পোস্টাফিস ও দুইটি গ্রাম্য

রাস্তা আছে। বাবু মথুরানাথ সেনের চেষ্টায় ঝালকাঠি হইতে এই গ্রাম পর্যন্ত একটি প্রশস্ত রাস্তা হইয়াছে। ইনি বরিশালে একজন উকিল ও লোকাল বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান।

রণমতি গ্রামের বক্সি বাড়ি, মধোর বাড়ি ও চন্দ্রকিশোর সেনের বাড়ি প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের পূর্ব সামাজিক কার্যাদি বিশেষ প্রশংসাযোগ্য।

বেলদাখানের নীলচন্দ্র দাস, কার্তিক দাস, বৃন্দাবন দাস ও গোকুল দাসের নাম স্থানীয় লোকের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। বেলদাখানের বাবু মথুরানাথ দাস বি, এল, একজন কৃতবিদ্য লোক ছিলেন।

বাসন্ডা

বাসন্ডা গ্রাম ঝালকাঠি হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের দৃশ্য অতিশয় সুন্দর। গ্রামের পূর্বদিক দিয়া একটি খাল প্রবাহিত হইয়াছে, খালের অপর পাড়ে বিকমা গ্রামের অবস্থিতি। বাসন্ডায় মাইনর স্কুল, পোস্টাফিস, গ্রাম্য রাস্তা, খেয়ার নৌকা প্রভৃতি থাকায় লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। মহলানবিশ বংশ বিশেষ সমৃদ্ধশালী। উত্তরের বাড়ির স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ সেন স্বনামখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি অনেক সময়ই বরিশালে বাস করিতেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে বাসন্ডার উত্তরের বাড়ি ও পুরাতন বাড়ির অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বর্তমান সময়ে বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন বিশেষ প্রশংসার সহিত নিজ জমিদারির কার্য করিতেছেন। ইনি পরোপকারী ও সদাশয় পুরুষ। ইনি চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নামে, বরিশালে একটি "কলেরা ওয়ার্ড" নির্মাণ করিয়া, অনাথ রোগীগণের আশীর্বাদের পাত্র হইয়াছেন। পুরাতন বাড়ির কালীকুমার সেন ঢাকার খাজে সাহেবের দেওয়ানি কার্যদ্বারা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া স্বনামখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র বাবু বসন্তকুমার সেন ও বাবু হেমন্তকুমার সেন। বসন্ত বাবু এখন জীবিত নাই। ঐ বাড়ির চন্দ্রমাধব সেন নিজ অধ্যবসায় গুণে প্রশংসনীয় হইয়াছেন। নূতন বাড়ির কিশোরচন্দ্র মহলানবিশ ও তাঁহার তিন পুত্র—মোহনচন্দ্র, শিবশঙ্কর ও জগবন্ধু মহলানবিশেরও নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিশোরচন্দ্র মহলানবিশ কীর্তিপাশা জমিদার বাড়ির প্রধান কর্মচারী ছিলেন, তৎকালাবধিই নূতন বাড়ির ভূসম্পত্তি বাড়িতে থাকে। তৎপর শিবশঙ্কর মহলানবিশ (গোসাল মহলানবিশ) কিছুদিন কীর্তিপাশায় চাকুরি করেন। ইনি স্বনামখ্যাত লোক। জগবন্ধু মহলানবিশ অত্যন্ত সহৃদয় ও পরোপকারী লোক ছিলেন। বর্তমান সময়ে বাবু কালীচরণ, বাবু প্রতাপচন্দ্র, বাবু যোগেশচন্দ্র ও বাবু আশুতোষ নূতন বাড়িতে কর্তৃত্ব করিতেছেন। বাসণ্ডার দক্ষিণের বাড়ির পূর্ণচন্দ্র সেন বাকরগঞ্জে প্রথম "পূর্ণচন্দ্রোদয় নামক মুদ্রাযন্ত্র" আনয়ন করেন। ঐ বাড়ির কালীশ মজুমদার পুরাতন বাড়ির সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। বাবু আনন্দচন্দ্র সেন পটুয়াখালিতে একজন খ্যাতিনামা উকিল। কালীকিঙ্কর সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। সেনের বাড়ির বাবু চণ্ডীচরণ সেন মুন্সেফ ও তাঁহার দুই কন্যা —কামিনী সেন বি, এ, ও যামিনী সেন এল্, এম, এস, এম। এতদ্ভিন্ন বাসণ্ডার বাবু রসিকচন্দ্র সরকার বি. এল, বাবু ললিতকুমার সেন বি, এ, বাবু চিত্তাহরণ সেন বি, এ, বাবু মধুসূদন সেন বি, এ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছেন।

হাবেলি সেলিমাবাদ

এই ক্ষুদ্র পরগনাটি সেলিমাবাদ পরগনার এক অংশ মাত্র। রামহরি গুপ্ত নামক স্বনামখ্যাত একজন কবিরাজ নবাব পত্নীর চিকিৎসা করত, হাবেলী সেলিমাবাদ পরগনার জমিদারি প্রাপ্ত হইয়া, তিনি দেউরী গ্রামে বাসস্থান নির্ধারণ করেন। রামহরির পুত্র যশচন্দ্র, তৎপুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত ঐ গ্রামে বাস করেন। উক্ত নরেন্দ্র চৌধুরীর এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মে। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব নামক এক ব্যক্তির নিকট চৌধুরী তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দেন। এই রামকৃষ্ণই পোনাবালিয়া, কুলকাঠী, বাকিরাবণ, কেওরা প্রভৃতি গ্রামের চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ। উক্ত নরেন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর পরে

তাঁহার নাবালক পুত্রদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার কন্যার প্রতি অর্পিত হয়। কন্যা সুযোগ মত তাহার ভ্রাতাদ্বয়ের একজনকে বিষ পান করাইয়া নষ্ট করে ; অপর নিরাশ্রয় বালকটি কোন এক আত্মীয়ের সাহায্যে সাহাজাদপুরের বাণেশ্বর রায় জমিদারের আশ্রয় নেয়। এই বালকের নাম শ্রীরাম রায়। ইনি এই সাহাজাদপুরের রায় বংশে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র গুপ্ত। ইহার পিতার আমলেই জমিদারি পরহস্তগত হইয়াছিল বলিয়া, ইহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। রামচন্দ্রের দুইপুত্র —রামদাস ওরফে জানকী ও রামজীবন ওরফে রূপবান। রামদাসের পাঁচ পুত্র— তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্র সোনারামের এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম রামকৃষ্ণ গুপ্ত। রামকৃষ্ণের চারিপুত্র তন্মধ্যে বাবু তারিণী কুমার গুপ্ত এম, এম, এস, একজন স্বনামখ্যাত লোক। এ গ্রামে একটি স্কুল ও গ্রাম্য রাস্তা আছে।

উপরোক্ত রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের সন্তানগণ পোনাবালিয়া, কুলকাঠি, বাইকরণ গ্রামে থাকিয়া, জমিদারির কার্য করিতেছিলেন। নিঃসহায় দুইটি বালককে বঞ্চনা করিয়া, হাবেলি সেলিমাবাদের জমিদারি প্রাপ্ত হইয়া, বিদ্যার্ণবের সন্তান সন্ততি ক্রমশই প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এই বংশের রামভদ্র রায় পোনাবালিয়ার নিকটবর্তী কোন স্থানে ১৭৪৮ খৃস্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। ইনিই পোনাবালিয়া চৌধুরী বংশের স্বনামখ্যাত প্রধান পুরুষ বলিয়া নির্দেশিত হইতে পারেন। পোনাবালিয়ার বহু সংখ্যক পুরাতন দালান ও দেবমন্দির এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এই গ্রামের সংলগ্ন শ্যামরাইলের শিবমন্দির অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দেয় ; এ স্থান হিন্দুদিগের একটি "পীঠস্থান" বলিয়া প্রসিদ্ধ। জমিদার বংশ কালক্রমে বহু পরিবারে বিভক্ত হয় ও আত্মকলহে তাঁহাদিগের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন আর পোনাবালিয়ার পূর্ব গৌরব কিছুই নাই। মনোহর রায় এই বাড়ির 'কালাচাঁদের' মন্দির নির্মাণ করেন। গোপালকৃষ্ণ রায়ের সময়াবধিই পোনাবালিয়ার ভাগ্য-লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতে থাকেন।

গৌর নদী থানার অন্তর্গত হরিষণা গ্রাম নিবাসী যাদবেন্দ্র সেন মজুমদারকে চৌধুরিগণ পোনাবালিয়ার স্থাপিত করিয়া, কতক তালুকাদি প্রদান করেন। মজুমদারগণ বিশেষ সম্মানিত বংশ।

উত্তর সাহাবাজপুর

গোবিন্দপুর, গোয়ালভাওর, দাদপুর ও নলগোড়া

মেহেন্দিগঞ্জ স্টেশনের অধীন উত্তর সাহাবাজপুর একটি পরগনা। এই পরগনার উত্তর ও পশ্চিম সীমা ইদিলপুর, দক্ষিণ সীমা লালগঞ্জের দোন এবং পূর্বসীমা মেঘনা ও ইলসা নদী। এই পরগনার অন্তর্গত গোবিন্দপুর, গোয়ালভাওর, দাদপুর, নলগোড়া প্রভৃতি অনেক বড় বড় গ্রাম আছে। এই সকল গ্রামে প্রচুর পরিমাণে সুপারি উৎপন্ন হয়। গোবিন্দপুর গ্রামে বৈদ্য বংশোদ্ভব প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী চাঁদ রায়ের স্থাপিত প্রস্তর নির্মিত অতি সুন্দর একটি বাসুদেব মূর্তি প্রাচীন কালাবধি বর্তমান আছে। বাসুদেব ঠাকুরের বাটিতে প্রায় ৮০ হস্ত উচ্চ, কারুকার্য খচিত একটি মনোহর মঠ আছে। দাদপুর গ্রামে বৈদ্য বংশের কয়েক ঘর প্রসিদ্ধ প্রাচীন ভূম্যধিকারী বাস করিতেছেন। গোয়ালভাওর গ্রামে একটি মধ্য শ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয় এবং নলগোড়া গ্রামে একটি পোস্টাফিস স্থাপিত আছে। এতদ্ভিন্ন বর্তমান সময়ে সাধারণের হিতকর বিশেষ কোন কার্য সম্পাদিত হয় নাই। এই পরগনার জমিদারি ও রাজস্বের বিবরণ এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

লতা

মেহেন্দিগঞ্জ থানার অধীন লতা একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। দক্ষিণে অল্প পরিসর নদী, উত্তর পাড়ে, লোকাল বোর্ডের রাস্তা, গ্রাম হইতে বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার পাশে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেরিটেবল ডিস্পেন্সারী, ইদিলপুর পরগনার বর্তমান জমিদার বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রসিদ্ধ সদর কাছারি ও

বন্দর অবস্থিত আছে। ঐ বন্দরে বৈশাখ মাস হইতে এক মাস কাল একটি বার্ষিক মেলা হইয়া থাকে।

এই গ্রামটি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অপরাপর জাতির বাসস্থান। এখানকার প্রসিদ্ধ দত্ত বাটিতে একটি পোস্টাফিস, বালকগণের সাধারণ শিক্ষার জন্য মধ্য ইংরেজি সার্কেল স্কুল এবং স্কুলের ছাত্রগণের নীতি শিক্ষার বালকতোষিণী সভা নামে একটি সভা আছে। বহুদিন হইতে একটি বালিকা বিদ্যালয় চলিতেছে। এখানে স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ আদর আছে ; এখান হইতে বালিকাগণ প্রায়ই উচ্চ প্রাইমারি ও মধ্য বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পাশ করিতেছে। মহিলাগণ বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার উচ্চ পরীক্ষা দিয়া দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইতেছেন।

সাধারণের জন্য 'সারস্বত লাইব্রেরী' নামে একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে বরিশাল জনসাধারণ সভার শাখা স্বরূপ "লতা হিতৈষিণী সভা" নামে একটি সভা স্থাপিত আছে এবং আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় ও শিক্ষিত কবিরাজ আছে।

উক্ত গ্রাম অতিপ্রাচীন কাল হইতেই কায়স্থ প্রধান। দত্ত ও নাগ বংশই এই দেশের আদিম অধিবাসী। ইহাদের মধ্যে দত্ত বংশই পূর্বকাল হইতে প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী। তাহাদের অনুগ্রহে কুলীন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন ও পুরুষানুক্রমে ঐ সকল বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। পুরাকাল হইতে উক্ত দত্ত বাটিতে ৺তারা, ৺মনসা ও ৺লক্ষ্মী গোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপিত আছে। ইহাদের নিত্য পূজার জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে। এই ৺তারা বিগ্রহ স্থাপন ও তাঁহার মহিমা সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য কথা শুনিতে পাওয়া যায়।পূর্বোক্ত দত্তবংশে চন্দ্রশেখর দত্ত নামক এক ব্যক্তি কালী ভক্ত ও সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তারা মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

তৎপর ৺মনসা ও ৺লক্ষ্মী গোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করেন। কোন সময় উহা প্রথম স্থাপিত হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না ; কিন্তু জানিতে পারা যায় যে ১১৩৮ সালে ইহার বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং ঐ বৃত্তি অদ্য পর্যন্তও চলিয়া আসিতেছে। চন্দ্রশেখর দত্তের পুত্র গঙ্গারাম দত্ত ঐ মূর্তি পরিবর্তন করিয়া নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গারাম দত্তের মৃত্যু সময় তাহার পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীর সহমরণ দত্তবংশের অন্যতম একটি গৌরবের বিষয়। গঙ্গারাম দত্তের একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর দত্ত অল্প বয়সেই যক্ষ্মা রোগগ্রস্থ হয়। তাহার মাতা ৺তারাদেবীর নিকট সন্তানের রোগাপনয়ন ও দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া পতির সহগামিনী হইলেন। যখন তাঁহার মনে সেই সাধুভাবের উদয় হইয়াছিল, তখন চতুর্দিকে হইতে শত শত লোক তাঁহাকে প্রবোধ, বাধা ও ভয় দেখাইয়াছিল , কিন্তু তিনি কিছুতেই ভীত হইলেন না। তিনি পরীক্ষা সাধ্য প্রমাণ দিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে তিনি সহমরণে সমর্থ। যখন পতির চিতা প্রজ্বলিত হইল, তখন সিন্দুরের কৌটা হস্তে করিয়া, জ্বলন্ত চিতার ঝাঁপ দিলেন। চতুর্দিক হইতে স্ত্রী লোকগণ হুলুধ্বনি দিতে লাগিল। তিনি জ্বলন্ত চিতায় থাকিয়াও তাহার সঙ্গে সঙ্গে হুলুধ্বনি দিয়াছিলেন। তদনন্তর ৺তারাদেবীর মহিমায় ও মাতার আশীর্বাদে কালীশঙ্কর দত্ত মহাশয় ক্রমে ক্রমে নীরোগ হইলেন। তিনিও ১২২৯ সালে একবার নূতন দেবদেবীর মূর্তি সকল প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই ৺তারা ও ৺মনসার মৃন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নিয়ত পরিবর্তনশীল মনে করিয়া কালীশঙ্কর দত্ত মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বীপচন্দ্র দত্ত ৺কাশীধাম হইতে পাচানের তারা ও পিত্তলের মনসা ও লক্ষ্মী গোবিন্দের অতি সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করাইয়া এবং নাম হ্রদ, পর্বত ও স্বাধীন রাজার রাজ্য হইতে প্রতিষ্ঠোপযোগী জিনিসাদি আনয়ন করত ঃ গত ১৩০৩ সালের ১৬ বৈশাখ তারিখে মহাসমারোহের সহিত ৺তারা, মনসা ও লক্ষ্মী গোবিন্দের প্রতিষ্ঠা ও লক্ষ্মী গোবিন্দের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বীপচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দুইটি পুত্র—প্রথম পুত্র মহিমাচন্দ্র দত্ত, দ্বিতীয় পুত্র বাবু অখিলচন্দ্র দত্ত। ইহারা বহুকালের খারিজা তালুকদার এবং কাদিরাবাদের জমিদারির অংশীদার। উক্ত অখিলবাবু বরিশালের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের মেম্বর এবং উলালিয়া জমিদারদিগের স্টেটে সিভিল কোর্টের নিযুক্তীয় ম্যানেজার। তিনিই

লতার বর্তমান উন্নতির একমাত্র ভিত্তিভূমি। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও যত্নের ফলে লতা গ্রামের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

সায়েস্তাবাদ

সায়েস্তাবাদ একটি ক্ষুদ্র পরগনা। মহম্মদ হানিফ চৌধুরি এই পরগনার আদি জমিদার। ঢাকা জিলার অন্তর্গত মকিমপুর নিবাসী মির সলিমুদ্দিন হানিফ চৌধুরির কন্যাকে বিবাহ করিয়া, বাঙ্গালা ১১৭১ সালের ২১ শে আষাঢ় তারিখে এই পরগনার জমিদারি প্রাপ্ত হয়েন। সলিমুদ্দিনের পুত্র আসাদালি। তাঁহার তিনপুত্র—আব্বাস আলী, এমদাদ আলি এবং গোলাম ইমাম। আব্বাস আলী এবং গোলাম ইমাম নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, এমদাদ আলীর চারি পুত্র—মির আবদুল মজিদ মির তোজাম্মল আলি, মির মোয়াজ্জেম হোসেন এবং মির আবদুল্লা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের বংশসম্ভুত বলিয়াই ইহারা সৈয়দ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা মুসলমানদিগের মধ্যে প্রধান কুলীন বংশ। এই বংশের অনেকেই অতি সম্মান ও সুখ্যাতির সহিত ইংরেজ গভর্নমেন্টের অধীনে উচ্চ কার্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই বংশের মীর এমদাদ আলীর চারি পুত্র। ১ম মৃত মৌলবী মীর তোজাম্মল আলী, জমিদার শ্রেণী মধ্যে অতি সম্মানিত, বুদ্ধিমান ও জাঁকজমকের লোক ছিলেন। আরবী, পারসী, বাঙ্গালা ভাষায় একজন মহাবিজ্ঞ লোক ছিলেন, তিনি বিদ্যার গৌরব ও বুদ্ধির কৌশলে সর্বশ্রেণীর লোকের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মৌলবী আবদুল মজিদ খান বাহাদুর, একজন সুবিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন, ঐকার্যে অন্যান্য জেলায় এবং ঢাকায় অতিশয় সম্মান ও সুখ্যাতি উপার্জন করিয়া, পরে ঢাকাতেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৃতীয় মৌলবী মীর মোয়াজ্জেম হোসেন খাঁন বাহাদুর ইনি নদীয়া এবং যশোহর জেলার প্রিন্সিপাল স্মল কজ কোর্টের জজ ছিলেন। ইনি কয়েক বৎসর এডিশনাল জজের কার্য করিয়াছেন এবং বাঙ্গালীর মধ্যে এডিশনাল জজ ইনিই প্রথম হন। হাইকোর্টের জজীয়তি পাওয়ার কথাও হইয়াছিল, কিন্তু পেন্সনের সময় পূর্ণ হওয়ায় এবং শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উক্ত কার্যে ইচ্ছুক না হইয়া পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন এবং বার্ষিক ৫০০০ টাকা করিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন। তিনি গভর্নমেন্টের সন্তোষজনক কার্য করিয়াছেন বলিয়া গভর্নমেন্ট তাঁহাকে খাঁন বাহাদুর উপাধি ও খেলাত দিয়াছেন ; ইনি এখন নিজ বাটীতে আছেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট ও বাকরগঞ্জে ডিস্ট্রিক বোর্ডের মেম্বর নিযুক্ত আছেন। এতদিন ইনি মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের একজন অতি বিজ্ঞ লোক এবং মুসলমান ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি বই উর্দু এবং আরবী ভাষার লিখিয়া ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন ও অনেকগুলি গ্রন্থ এখনও লিখিতেছেন। চতুর্থ মৃত মৌলবী সৈয়দ আবদুল্লা খান বাহাদুর ইনি ঢাকা জেলায় অতি সুবিখ্যাত প্রথম শ্রেণীর Small cause Court Judge ছিলেন। ইনি অতি অল্প বয়সে এবং অল্পদিনে এই উচ্চপদ পাইয়াছিলেন। ইঁহারও হাইকোর্টের জজ হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল, হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে উক্ত ঢাকাতেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

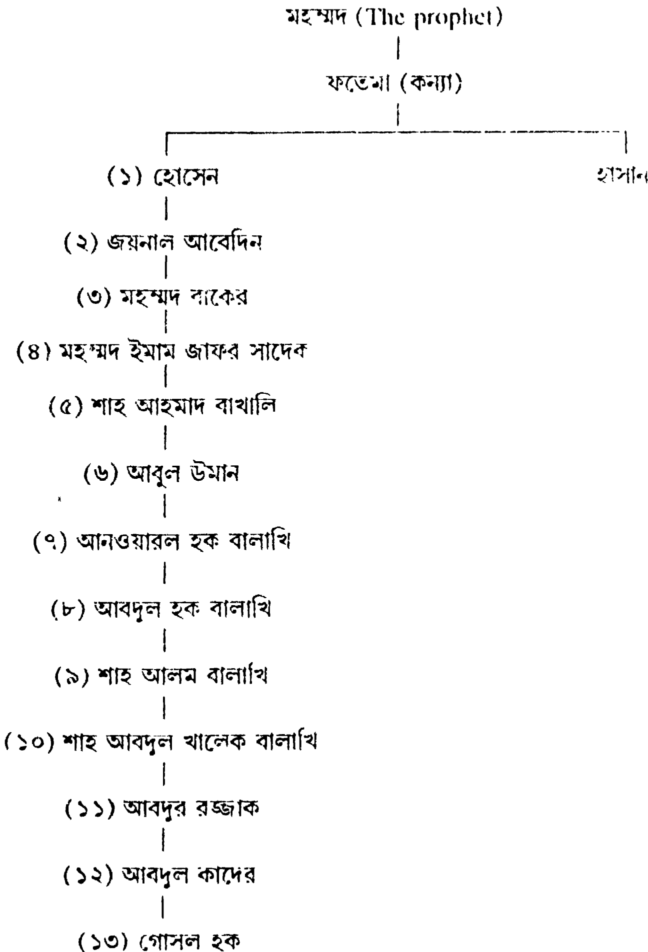
মৌলবি তোজাম্মল আলীর এক পুত্র মৌলবি সৈয়দ তোফাজ্জল আহাম্মদ। ইনি পূর্বে সব রেজিস্টার ছিলেন, এখন কার্য ত্যাগ করিয়া নিজ জমিদারীর কার্য করিতেছেন। মীর আবদুলমাজিদ খাঁ বাহাদুরের দুই পুত্র, মৌলবী মির আবদুল হামিদ ওমির আবদুল অহিদ, উভয়েই জমিদারির কার্য করেন। মৌলবীর বরিশালে আনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট আছেন সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন খাঁ বাহাদুরের ৫ পুত্র। ১ম মৌলবি সৈয়দ মজাফর হোসেন ইহার প্রতি সায়েস্তাবাদ স্টেটের কাজকর্মের ভার এবং ইনি আনারেরী ম্যাজিস্টেট। ২য় মৃত মৌলবী সৈয়দ আবদুল রব, ইনি ময়মনসিংহের স্পেশাল সব রেজিস্টার ছিলেন। ৩য় মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ হোসেন ইনি এখন বরিশালের স্পেশাল সবরেজিস্টার। ৪র্থ মৌলবী সৈয়দ সাহামুদ হোসেন ইনি পাতারহাটের সাবরেজিস্টার ছিলেন ; কার্য ত্যাগ করিয়া আপন জমিদারির কার্য করিতেছেন। ৫ম মিস্টার মোতাহার হোসেন ব্যারিস্টার এট ল। ইনি কলিকাতায় প্রাকটিস্ করিতেছেন।

মৃত সৈয়দ আবদুল্লা খান বাহাদুরের দুই পুত্র। ১ম মৃত মিস্টার মহম্মদ এজরাইল খান বাহাদুর ব্যারিস্টার এট্ ল। ইনি হুগলী জেলায় একজন সুবিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ২য় মৌলবী সৈয়দ ওবেদুল্লা পিরোজপুরের সবরেজিস্টার, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার লোকাল বোর্ডের মেম্বর এবং বরিশালের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার আছেন।

সায়েস্তাবাদ বরিশাল হইতে আট মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামে জমিদার বাড়িতে একটি পোস্টাফিস, একটি স্কুল ও একটি হাট, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে। অনেকানেক পুরাতন বালাখানা এবং মসজিদ বর্তমান রহিয়াছে। বরিশাল হইতে সায়েস্তাবাদ পর্যন্ত সরকারী রাস্তা থাকায় লোকের গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

পাঠক বর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ মহম্মদ হইতে সায়েস্তাবাদ পরিবারের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সায়েস্তাবাদ ফেমিলি-- মিঃ বিভারিজ সাহেব মহোদয়ের বাকরগঞ্জের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত।



(১৩) গোসল হক
|
(১৪) শাহ সুলতান
|
(১৫) সালার সামারকান্দী
|
(১৬) কোরার সামারকান্দী
|
(১৭) শাহ বক্সী
|
(১৮) শাহ আমানত
|
(১৯) শাহ জাকারিয়া
|
(২০) সামসুদ্দিন
|
(২১) শাহ মহম্মদ ওয়ালী
|
(২২) শাহ আদাম ওয়ালী
|
(২৩) মোর্ত্তজা
|
(২৪) হাসামুদ্দিন
|
(২৫) সামসুদ্দিন
|
(২৬) সলীমুদ্দিন
|
(২৭) আসাদ আলী চৌধুরী

(২৭) আসাদ আলী চৌধুরীর পুত্র: আব্বাস আলী, এমদাদ আলী, গোলাম ইমাম

গোলাম ইমামের পুত্র: তোজাম্মল আলী, আবদুল মজিদ, মোয়াজ্জাম হোসেন, আবদুল্লা

তোজাম্মল আলী → তোফাজ্জল আহমদ

আবদুল মজিদ → আবদুল হামিদ ও ওয়াহিদ

আবদুল্লা → মহম্মদ এসরাইল ও ওবেদুরা

মোয়াজ্জাম হোসেনের পুত্র: মজঃফর হোসেন, আবদুল রব, মহম্মদ হোসেন, মামুদ হোসেন, মোতাহার হোসেন

কাশীপুর

কাশীপুর গ্রামটি বরিশাল হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এইটি অতি পুরাতন স্থান। অনেকানেক পুরাতন কীর্তি তথায় অদ্য পর্যন্তও বর্তমান আছে। কাশীপুর একটি বড গ্রাম, বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতিব বাসস্থান। কাশীপুরের মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, চক্রবর্তী, দত্ত, বসু, ঘোষ, নাগ, দাস, ও সিংহ পরিবাব প্রসিদ্ধ। কাশীপুরে কয়েকটি গ্রাম্য রাস্তা, হাট, পোস্টাফিস, স্কুল, পুস্তকালয় ও কাশীপুর হইতে বরিশাল পর্যন্ত একটি বড় রাস্তা থাকায় লোকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এ গ্রামে সীতারাম বসু একজন স্বনামখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি গরিবের অন্ন যোগাইতেন বলিয়া, তাহাকে "চাউলা সীতারাম" বলিত। তাঁহাব সময়ের পুরাতন কতকগুলি দালান ও শিবমন্দির (বিরূপাক্ষ) ও মদনমোহন বাড়ি, কাশীপুবেব পুরাতন কীর্তি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে।

কাশীপুরে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ মধ্যে বাবু সারদাচরণ ঘোষ এম এ বি এল, বাবু রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, বাবু প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, বাবু অমিতরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম এ, বাবু শীতলাকান্ত মুখোপাধ্যায় বি এ, বাবু শশিভূষণ সিংহ বি এ ও বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যাযের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজ অধ্যবসায়গুণে নিজের অবস্থার উন্নতি ও গ্রামের প্রকৃত উন্নতি ও তৎসহ বাকরগঞ্জের অনেকানেক উন্নতি সাধন করিয়া, মনুষ্যত্বের পবিচয় দিয়াছেন। প্রতাপ বাবু বাস্তবিকই একজন দেশ হিতৈষী ও আমাদিগের পরম বান্ধব।

কাশীপুর বরিশালের অতি নিকটবর্তী স্থান, এ গ্রামটি ভীষণ জঙ্গলাবৃত, বাঘ, শূকর প্রভৃতি সর্বদা বসতি করে। অধিবাসীগণের তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া কর্তব্য। কাশীপুরের সাঁওতালগণ অনেক সময় এই সকল হিংস্র জন্তু ও বিষধর সাপ বধ করিয়া, স্থানীয় লোকের উপকার সাধন করিতেছে।

লাখুটিয়া

লাখুটিয়া বরিশাল হইতে ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অল্পসংখ্যক লোক তথায় বাস করে। গ্রামটি অতিশয় ক্ষুদ্র, পুরাতন কীর্তি কিছু নাই বলিলেও দোষ হয় না। লাখুটিয়ার জমিদারগণ প্রকাশ করেন যে, মোগল সম্রাটের একজন প্রধান কর্মচারী রূপচন্দ্র, লাখুটিয়া ফেমিলির স্থাপয়িতা এবং তিনিই রায়চৌধুরি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। দিল্লির সম্রাট রূপচন্দ্রের পৌত্রকে কয়েক খণ্ড 'লাখেরাজ' ভূমি প্রদান করেন, তাহা অদ্য পর্যন্তও বর্তমান জমিদারগণ ভোগ করিতেছেন। তৎপর এই বংশের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায়, পূর্ব নাম লোপ পাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাজচন্দ্র রায় ১২০৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি জজ আদালতের ওকালতি করিতেন এবং স্বনামখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়াবধিই এখানে এই বংশ বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি তাঁহাব ভদ্রাসনে ইষ্টকালয় নির্মাণ করেন; লাখুটিয়া হইতে বরিশাল পর্যন্ত একটি রাস্তা ও একটি খাল কাটাইয়া লোকের যৎপরোনাস্তি উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। রাস উপলক্ষে একটি মেলা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিয়া, যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রথম পুত্র বাবু রাখালচন্দ্র রায় সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় বাস করিতেছেন। বোধহয় তিনি এখন হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবেশাধিকার প্রার্থী। রাখালবাবু একসময়ে রোডসেস অফিসের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন, তাঁহার উদযোগে ববিশালে জনসাধাবণ সভা স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পুত্র বাবু বিহারীলাল রায়, তাঁহার পিতৃদেবের নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করিয়া, বাকরগঞ্জের একটি প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র বিলাতে ডাক্তারি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। রাজচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র মিঃ প্যারীলাল রায়, ইনি বিলাত হইতে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসা করত বিশেষ প্রতিপত্তি

লাভ করিয়াছেন। তিনি 'লিগেল রিমেম্ব্রান্সরের' পদে নিযুক্ত হইয়া, দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এ দেশে কোন ভারতবাসী ইহার পূর্বে এ পদে আর কোন দিনও নিযুক্ত হয়েন নাই ; এই প্রথম দৃষ্টান্ত। লাখুটিয়া একটি পোস্টাপিস দুই তিনটি পাঠশালা ও একটি বাজার সংস্থাপিত আছে।

রহমতপুর

এই গ্রামটি বরিশাল হইতে প্রায় ৮ মাইল উত্তর অবস্থিত। রহমতপুর ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান , জমিদারের সংখ্যা কম নহে। স্থানীয় লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল। এ গ্রামের প্রায় বাড়িতেই ইষ্টকালয় দৃষ্ট হয়। রহমতপুরে একটি মাইনর স্কুল, পোস্টাফিস, বাজার, অনাথাশ্রম, গ্রাম্য রাস্তা, প্রভৃতি আছে। এই গ্রামের খালটি প্রশস্ত, রহমতপুরের 'বাজার বেড়' চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের কোন রাজা কাটাইয়া ছিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষে অনেক কাল হইতে একটি মেলা স্থাপিত হইয়াছে; রাজারাম চক্রবর্তী মাধবপাশার রাজবাড়িতে দেওয়ানের কার্য করিতেন এবং তিনিই রহমতপুরের জমিদারগণের আদিপুরুষ। তৎপরবর্তী জমিদারগণ মধ্যে চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী, বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্তী, বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সারদাচরণ চক্রবর্তীর নাম বিশেষ পরিচিত। এ গ্রামে অতি পুরাতন কীর্তি কিছুই নাই ; মাত্র একটি ভগ্নদশাপন্ন শিবমন্দির দৃষ্ট হয়, এটিও অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রামের কমল সার্বভৌম একজন প্রবীণ ও স্বনামখ্যাত পণ্ডিত। বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও বাবু অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, কৃতবিদ্য লোক। রহমতপুরের প্রসিদ্ধ ঘা চিকিৎসক জামালদি, কামালদি ও মুল্লুকচাঁদ বিশেষ খ্যাতনামা।

শিকারপুর

শিকারপুর বরিশাল শহর হইতে ১৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামটি ভদ্রলোকের বসতি স্থান , এদেশে গভীর অরণ্য এখনও বর্তমান আছে, তন্মধ্যে বড় বড় বাঘ বসতি করে; বসতি স্থানে প্রাচীনকাল হইতে একটি শৃঙ্খলা বর্তমান রহিয়াছে। এই গ্রামে কুণ্ডগ্রামী, ভট্টাচার্য ও অন্যান্য বংশের ও শ্রোত্রীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ, বৈদিক ও বৈদ্য আদিম অধিবাসী।

এখানে কয়েকটি নাতি বৃহৎ সরোবর আছে ; তদ্ভিন্ন ২ /১টি ভগ্ন সমাধি মন্দির, একটি ভগ্ন প্রাসাদ এবং একটি অদ্যাপি বাসোপযোগী দালান ও কয়েকখানা প্রশংসনীয় নির্মল কৌশল বিশিষ্ট ঘাটলা ভিন্ন বিগত একশত বর্ষের কীর্তির বিশেষ কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না ; তৎপূর্বের ত কিছুই নাই।

কথিত আছে, অতি পূর্বকালে বনমধ্যে স্বপ্নাদেশে বিখ্যাত 'উগ্রতারা মূর্তি' খানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ইহার নির্মাণ কৌশল অতীব রমণীয়। তিনি বহুকাল একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে শোভা পাইতেছিলেন ; বহুকাল তাঁহার পবিত্রধামে নানা দেশীয় যাত্রীর সমাগম হইত , বৎসরের প্রায় সময়েই, বিশেষ শিব চতুর্দশীর সময়ে বিস্তর লোকের সমাগম হইত। সময়ে সময়ে অনেকানেক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হইত। স্থানটি অতি গভীর ভাবোদ্দীপক ও নানাবিধ স্বাভাবিক সৌন্দর্যের আধার ছিল। বিগত ১২৯১ সনে ঐ মূর্তিখানি অপহৃতা হইয়াছেন। সম্প্রতি ঐ মূর্তির সঙ্গেই প্রাপ্ত লিঙ্গটি বর্তমান আছেন এবং ঘটে দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

এখানে পূর্বে সংস্কৃত চর্চা বিলক্ষণ জাঁকাল ছিল। বর্তমানেও উহা একেবারে লোপ পায় নাই। 'শম্ভু নিশুম্ভ বধ' নামক নব্য সংস্কৃত মহাকাব্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীকান্ত শিরোমণি, জিলার সুবিখ্যাত স্মার্ত শ্রীযুক্ত রামধন ন্যায়ালঙ্কার এবং প্রসিদ্ধ নিদানবিদ রামচন্দ্র গুপ্ত এই গ্রামের অধিবাসী।

শিকারপুরের হাট নামক একটি হাট ব্যতীত কোন বিপণি নাই। শিকারপুরের রাস্তা নামক সরকারি রাস্তা এবং তদ্ভিন্ন কয়েকটি গ্রাম্য রাস্তা আছে।

একটি সংস্কৃত টোল এবং ৬/৭টি প্রাথমিক বিদ্যাচর্চায় পাঠশালা ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যালয় নাই। এইখানে বিখ্যাত সোন্ধা নদীর কোন ভাগ ছিল এবং ঐ নদীরই এক পাড়ে শিকারপুরের উগ্রতারা এবং অপর পাড়ে শ্যামরাইলের শিব।

উজিরপুর ও বারপাইকা

এই গ্রামটি বরিশাল সদর বিভাগের অন্তর্গত অতি পুরাতন স্থান। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের শরীর রক্ষক রামমোহন মালের বংশধরগণই উজিরপুরের প্রধান জমিদার ও সমৃদ্ধশালী ছিলেন ; কিন্তু বর্তমান সময়ে তাঁহাদিগের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এই গ্রামে বহুসংখ্যক ভদ্র ও ইতর লোক বাস করে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণেরই বিশেষ প্রাধান্য। উজিরপুরের অধিবাসীগণ মধ্যে অনেকেই উক্ত চৌধুরি জমিদারগণের আশ্রিত ছিলেন ; দুঃখের বিষয় যে, আশ্রিত ব্যক্তিগণ কুটীল চক্র দ্বারা চৌধুরি বংশের শেষ রক্তবিন্দুপর্যন্ত শোষণ করিয়া তাঁহাদিগকে পথের ভিখারি করিয়াছেন। এই গ্রামের বাবু অখিলচন্দ্র রায়, ডেপুটি কালেক্টর স্বনামখ্যাত লোক।

ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বৈদিক শ্রেণীর বিশেষ প্রতিপত্তি। পণ্ডিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য, বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বি এল, বাবু শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য বি এ, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বর্তমান সময়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। উজিরপুর ও বারপাইকার ভট্টাচার্য বংশ সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য বিখ্যাত। বারপাইকার তারিণীচরণ শিরোমণি, পণ্ডিত রাধানাথ ভট্টাচার্য খ্যাতনামা লোক। বর্তমানে শশিভূষণ ভট্টাচার্য বি এ, একজন সুশিক্ষিত লোক। উজিরপুরেব কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের পূর্বপুরুষ গৌরীনাথ তর্কবাগীশ একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন ; ইনি ছাত্রাবস্থায়ই কতকগুলি গ্রন্থেব এইরূপ অসংলগ্নতা দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, তদানীন্তন বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন এবং তদবধি সেই অনুপত্তিগুলি 'গৌরীনাথী কৌট' নামে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে ; তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, তিনি নবদ্বীপ হইতে দেশে আসিবার পূর্বেই তথায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই বংশের মাধব তর্কসিদ্ধান্ত একজন প্রবীণ ও বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। এই গ্রামের বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠতাত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন ; কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে তিনি বেদান্তদর্শনের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইঁহার ছাত্র। উক্ত বাণী বাবুর পিতা হরিশ্চন্দ্র তর্কভূষণ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পণ্ডিত ; কাব্য, অলঙ্কার ও পুরাণ শাস্ত্রেও ইঁহার অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। উজিরপুরের শিবচন্দ্র সার্বভৌম পূর্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ; তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহার সহিত বিচারে প্রায়ই পরাজিত হইতেন ; রহমতপুরের স্বনামখ্যাত কমল সার্বভৌম ইঁহার ছাত্র ছিলেন।

এই গ্রামের চন্দ্রমোহন সাপলা সঙ্গীত বিদ্যায় বাকরগঞ্জে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইতর লোকদিগের মধ্যে উজিরপুরের তাঁতিগণ কর্তৃক ভাল কাপড় ও কর্মকারগণ কর্তৃক লৌহাস্ত্র, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামে অতি প্রাচীনকালের তিনটি দীঘি আছে, উহার বড়টির জল সাধারণত রিজার্ভ পুস্করিণীর জল অপেক্ষা ভাল।

বারপাইকা ও উজিরপুরের খালে একটি সুন্দর পুল আছে। উজিরপুরে গ্রাম্য রাস্তা আছে। এই গ্রামে ১টি পুস্তকালয়, ১টি মাইনর স্কুল, ৬টি প্রাইমারি স্কুল ১টি বালিকা বিদ্যালয়, ৬টি টোল, ১টি পোস্টাফিস, ১টি বাজার ও ৩টি হাট থাকায় লোকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বারপাইকার রায়ের বাড়িতে ১টি মাইনর স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

নথুল্লাবাদ

এই গ্রামটি নলছিটি থানার অন্তর্গত বরিশাল হইতে ৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। নথুল্লাবাদ অতিশয় পুরাতন স্থান। এই গ্রামের মিরবহর রায়বংশ, এক আদিপুরুষ গোপাল বসুর সন্তান; ইহারা অত্যন্ত সম্মানের সহিত নথুল্লাবাদের বিভিন্ন বাড়িতে বাস করিতেছেন। এই বংশের রাজবল্লভ রায়

সমস্ত সেলিমাবাদ জমিদারির পাট্টা গ্রহণ করেন ও কতকগুলি লোকের প্ররোচনায় ও উৎপীড়নে উহা ত্যাগ করেন। এই সময়ই রায়েরকাঠির জমিদারগণ উক্ত পরগনার জমিদারি লাভ করেন। রাজবল্লভের সন্তানগণ নথুল্লাবাদের পুরাতন বাড়ি, গোলাবাড়ি, নূতন বাড়ি এবং রাজবাড়িতে বাস করিতেছেন। এই বংশ বাকরগঞ্জের এক ঘর পরিচিত তালুকদার এবং বংশ মর্যাদায়ও ইহারা বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ। নূতন বাড়ির জনার্দন রায় কর্তৃক ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, ইদিলপুরে গিয়া বাস করেন; তাঁহার দুই পুত্র রামপ্রসাদ ও নরহরি। রামপ্রসাদের তিন পুত্র—গোবিন্দপ্রসাদ, লক্ষ্মীপ্রসাদ ও কালাচাঁদ। ইহাদিগের ভগিনীকে মাধবপাশার মহারাজা শিবনারায়ণ বিবাহ করেন ; সাধারণত এই রানী লোকের নিকট 'কালারানী' বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে রাজবাড়ির দেওয়ানি পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার দুই পুত্র—অমরকৃষ্ণ ও জগচ্চন্দ্র। অমরকৃষ্ণের পুত্র প্রসন্নকুমার ও জগচ্চন্দ্রের পুত্র কালীহর। এই গ্রামের দক্ষিণচন্দ্র ঠাকুর, বিরূপাক্ষ এবং মহাকালী বিশেষ প্রসিদ্ধ। দক্ষিণচন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে প্রত্যেক বৎসর মাঘ মাসে একটি মেলা হয়। এই গ্রামে একটি মাইনর স্কুল, একটি লাইব্রেরি, একটি হাট আছে।

গাভা

বরিশাল সদরের অন্তর্গত,বরিশাল হইতে ১৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে এই গ্রামটি অবস্থিত। কোন এক সময়ে এ স্থানটি জলাভূমিতে পূর্ণ ছিল। বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে কুলীন ঘোষ বংশীয় রামকৃষ্ণ ঘোষ এই গ্রামের প্রথম এবং প্রধান অধিবাসী। ইনিই গাভার ঘোষ বংশের আদিপুরুষ। ইহার ছয় পুত্র—শ্রীগোবিন্দ, রামেশ্বর, শ্রীহরি, রাজেন্দ্র, রমানাথ ও রাঘবচন্দ্র। এই ছয় পুত্র দ্বারা বারখানি বাড়ি নির্মিত হয় এবং বর্তমান গাভার ঘোষ বংশ উক্ত বিভিন্ন বাড়িতে বাস করিতেছেন। এই গ্রামে একটি মাইনর স্কুল, দুইটি লাইব্রেরি, বড় খাল, রাস্তা প্রভৃতি থাকায় স্থানীয় লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। এ গ্রামের অধিবাসীগণ মধ্যে বাবু নন্দকুমার ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, দুর্গাচরণ ঘোষ, কৈলাশচন্দ্র ঘোষ, ভবানীচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ভদ্র সন্তানগণের নাম এ দেশে বিশেষ পরিচিত। ইহারা সকলই ঘোষ দস্তিদার এবং এই বংশ কৌলিন্য প্রথায় সুবিখ্যাত।

গাভার অনেকানেক বর্ষীয়ান ও যুবকবৃন্দ অধুনাতন রাজকীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া দেশ মধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বাবু অমৃতচন্দ্র ঘোষ, বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, এম এ, বাবু কৃপানাথ ঘোষ বি এল, বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ বি এল, বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ, বাবু আশুতোষ ঘোষ বি এ, বাবু তারাপ্রসন্ন ঘোষ বি এ, আমাদিগের নিকট পরিচিত।

নারায়ণপুর

ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামটি বরিশালের উত্তর পশ্চিমে প্রায় ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দেশে পুরাতন কীর্তি কিছুই নাই। এই গ্রামের তিলকচন্দ্র চক্রবর্তী নিজ অধ্যবসায়গুণে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রগণ অপরিমিত ব্যয় করিয়া ঋণজালে জড়ীভূত হয়েন ; তৎপরে আত্মকলহে তাঁহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি ঋণদায়ে পরহস্তগত হইয়াছে। দুই পুরুষের মধ্যেই তাঁহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। তিলক চক্রবর্তীর এই চারিপুত্র—বৃন্দাবন, গোবিন্দ, কামিনী ও আশুতোষ, দেশবাসীর নিকট বিশেষ পরিচিত। ইহাদিগের বাড়িতে কতকগুলি ইষ্টকালয় ও কয়েকটি দেব মন্দির ও মঠ আছে।

এই গ্রামের ভৈরবচন্দ্র সেন একজন স্বনামখ্যাত লোক। ইনি রামনার মুসলমান জমিদারগণের সরকারে কার্য করিয়া কতক সম্পত্তি রাখিয়া যান। ইনি নিজ ব্যয়ে নারায়ণপুর হইতে গাভার খাল পর্যন্ত একটি খাল কাটাইয়া লোকের আশীর্বাদের পাত্র হইয়া গিয়াছেন। এই খালটি 'ভৈরব সেনের কাটা খাল' নামে অভিহিত হইতেছে। ইনি তাঁহার ভদ্রাসনে ইষ্টকালয় ও দেবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই বাড়ির বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন উকিল বিশেষ পরিচিত। পূর্ণ বাবু বরিশালে ওকালতি করিয়া, অত্যন্ত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ; তৎকালবর্তী উকিলদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধান

মুসাবিদাক্ষম লোক ছিলেন ; ইনি গরিবের একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন ; ইনি একজন স্বনামখ্যাত লোক। নারায়ণপুরের বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ, একজন উকিল। এ গ্রামে একটি মাইনর স্কুল, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও গ্রাম্য রাস্তা থাকায় লোকের উপকার সাধিত হইতেছে।

বাটাজোড়

বাটাজোড় একখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রাম বরিশাল শহর হইতে ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত; বরিশাল হইতে গৌর নদী পর্যন্ত যে একটি বড় রাস্তা আছে, সেই রাস্তা এই গ্রামের মধ্যে দিয়া গিয়েছে এবং সেই রাস্তার পার্শ্বে একটি খাল আছে, এই খাল দিয়া ঢাকা-বিক্রমপুর-অঞ্চলের লোকেরা নৌকায় বাকরগঞ্জ জিলাব নানাস্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে। একটি সমৃদ্ধশালী বাজার, পোস্টাফিস এবং মাইনর মডেল স্কুল এই গ্রামে আছে। এই গ্রামটি গৌর নদী থানার অন্তর্গত বাঙ্গরোড়া পবগনা এবং বরিশাল সদর ডিভিসনের অধীনে। এই গ্রামের দত্ত বংশীয়েরা অধীন। এই গ্রামের দত্ত বংশীয়েরা বাঙ্গরোড়া পরগনার পুরাতন ও প্রসিদ্ধ-তালুকদার। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে মুসলফুন রাজত্বের সময়ে নবাব সরকারে চাকরি করিয়াছেন এবং অর্থও সঞ্চয় করিয়াছেন। এই গ্রামে অতি প্রাচীনকালের নির্মিত দোতালা একটি বালাখানা, একতালা, একটি দুর্গামণ্ডপ, বৈঠকখানা, ফটক, একটি মেঘরা অর্থাৎ তিন দ্বার বিশিষ্ট একটি কোঠা, একটি গোঁমাইর দালান ও একটি অতি প্রাচীনকালের দীঘি আছে। এই পুষ্করিণী মুসলমানদিগের সময়ে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে মগেরা এক বাত্রে কাটাইয়াছিল। ইহা এখন মগের আদ্ধি নামে খ্যাত।

গৌরনদী রাস্তার পার্শ্বে দেউলভিটা নামে একটি স্থান নির্দেশিত হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে যে, এই স্থানে অতি প্রাচীনকালে এই গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ একটি দেউল নির্মাণ করিয়া, তাহা মাতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হইবার সংকল্পে উৎসর্গ করিবার সময়ে সেই দেউলটি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন তখন হত হয়েন। এই স্থানে মাটির নিচে অনেক পুরাতন ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে।

ভৈরবনাথ দত্ত এবং তাঁহার পুত্র রতিনাথ দত্ত সপরিবারে এই গ্রামে প্রথম আসিয়া বাস করেন। রতিনাথের পুত্র জয়রাম, তৎপুত্র দুর্গাদাস ; তাঁহার পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে রমাকান্তের পুত্র গতিনারায়ণ ; তৎপুত্র নন্দকিশোর। তাঁহার তিনপুত্র—হরমোহন, ব্রজমোহন ও গৌরমোহন। ব্রজমোহন দত্ত ১৭৪৭ শকাব্দে ৩রা আশ্বিন ববিবার বাটাজোড়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে আইনের পরীক্ষায় পাশ হইয়া, কলিকাতায় সদর দেওয়ানি আদালতে উকিল হয়েন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বরিশাল শহরে মুন্সেফি কার্যে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে এই জিলার কোন হিন্দু ভদ্র লোক গভর্নমেন্ট হইতে বিচারকের পদে নিযুক্ত হন নাই। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইনি বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিচারকের পদে কার্য করিয়া আসিয়াছেন। পটুয়াখালিতে ইঁহারই যত্নে প্রথমে সবডিভিসন স্থাপিত হয়। এখানে মুন্সেফ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এই তিন পদের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কার্য করেন। কৃষ্ণনগরে অনেকদিন হইতে এক হাজার টাকা মাসিক বেতনে ছোট আদালতের জজের পদে কার্য করিয়া আসিতেছিলেন।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গভর্নমেন্টের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি (১৮০৭ শকের ১৯শে মাঘ) রবিবার একষট্টি বৎসর বয়সে ব্রজমোহন বাবু তাঁহার সহধর্মিণী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের ২৭শে তারিখে বরিশাল শহরে একটি এন্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত করেন ; এই স্কুল এখন কলেজে পরিণত হইয়াছে। ইহা ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন নামে খ্যাত। স্ত্রীলোকের শিক্ষার জন্য ইনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং প্রতি বৎসর স্ত্রীলোকের রচিত প্রবন্ধের জন্য ইঁহার প্রদত্ত ৪০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। ইনি যখন যশোহরের ছোট আদালতের জজ ছিলেন, তখন ইঁহার যত্নে ও উদ্যোগে যশোহরের লোন আফিস এবং বার লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। কাশীতে বেদ

অধ্যয়নের জন্য ইনি এক সময়ে একটি বৃত্তি দিয়াছিলেন। ইহার নির্মিত একটি দোতালা বাড়িতে গ্রামের স্কুলটি স্থাপন করিয়াছেন।

ব্রজমোহনের তিন পুত্র—অশ্বিনীকুমার, কামিনীকুমার ও যামিনীকুমার। যামিনীকুমার ১৮৯০ খৃস্টাব্দে বি এ ক্লাসে পড়িবার সময়ে পরলোক গমন করিয়াছেন। অশ্বিনীবাবু নানা প্রকার দেশ হিতকর কার্য করিয়া, পূর্ববঙ্গে যশোভাজন হইয়াছেন; ইনি একজন এম এ বি এল। কামিনীবাবু বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত নিজ জমিদারির তত্ত্বাবধান করিতেছেন ; ইংরেজি, বাঙ্গলা ও ফরাসি ভাষায় ইনি অভিজ্ঞ।

উপরোক্ত দুর্গাদাস দত্তের পাঁচ পুত্র মধ্যে রুক্মিনীকান্তের সন্তানসন্ততির মধ্যে হরনাথ দত্ত প্রসিদ্ধ। তাঁহার চারি পুত্র—শ্রীনাথ, দ্বারকানাথ, রসিকনাথ ও শশিনাথ। শ্রীনাথ এখন জীবিত নাই। বাবু দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয় বরিশালের জজ কোর্টের একজন ক্ষমতাশালী উকিল। ইনি বরিশালের মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, স্থানীয় বোর্ড সমূহে মেম্বার এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত আছেন। বাবু দ্বারকানাথ গভর্নমেন্টের নিকট অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ও Certificate of honour প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার যত্নে বাটাজোড় বাজারে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন হইতে এক সপ্তাহ কাল একটি মেলা হইয়া থাকে এবং তাহাতে বহুলোকের সমাগম হয়। ইঁহার পিতা হরনাথ দত্ত মহাশয় এবং অশ্বিনীবাবুর জ্যেষ্ঠতাত হরমোহন দত্ত মহাশয় বাটাজোড় গ্রামের প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। ইঁহারা পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের ভদ্রলোকদিগের বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দিতেন। জিলাস্থ রাজকর্মচারীদিগের নিকট, ইঁহাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

এই গ্রামের বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট চিকিৎসক কবিঠাকুরেরা বঙ্গদেশের অনেক স্থানে পরিচিত আছেন। বাঙ্গলা টীকা উঠিয়া যাওয়াতে ইহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। দীননাথ কবিচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র কবিচন্দ্র বর্তমান সময়ে ইহাদিগের মধ্যে প্রধান।

শোলোক

এই গ্রামটি বরিশাল সদর বিভাগের অন্তর্গত গৌরনদী থানার এলাকাধীন একটি পুরাতন স্থান। বৈদ্য কুলোদ্ভব মজুমদার বংশের রাজারাম সেন, মজুমদার বংশের প্রধান আদি পুরুষ। এই বংশ অতি প্রাচীনকালাবধি এই গ্রামে বাস করত ঃ অনেকানেক কীর্তিকলাপাদি করিয়া, বাকরগঞ্জে পরিচিত হইয়াছেন। শোলোক গ্রামে বহুসংখ্যক বংশজ শ্রোত্রীয় ও কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করেন। গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষ, এ গ্রামের একজন আদিম অধিবাসী। এখানে একটি স্কুল, একটি পোস্টাফিস, একটি টোল ও গ্রাম্য রাস্তা থাকায় সাধারণের উপকার সাধিত হইতেছে। উক্ত গিরিশচন্দ্রের পুত্র বাবু দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বি এল বরিশালে ওকালতি করিতেছেন।

পুরাতন কীর্তিকলাপ মধ্যে মজুমদার বংশ কর্তৃক নির্মিত অনেকানেক দালান, মঠ, দেবমন্দির আছে। তৎপূর্বের 'মুলুয়ার দীঘি'টি বর্তমান আছে। মগজাতি যখন এই গ্রাম আক্রমণ করে, তখন গৃহ কর্তা আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য সপরিবারে ঐ দীঘিতে ডুবিয়া মরেন। মজুমদার বংশের গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন মজুমদার খ্যাতনামা। চক্রবর্তী বংশের কীর্তিনারায়ণ ও সূর্যনারায়ণ ; পতিতুণ্ড বংশের গৌরচন্দ্র পতিতুণ্ড, রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ, শ্যামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ঘটক বংশের নরোত্তম বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদেব সার্বভৌম, গোরাচাঁদ শিরোমণি প্রভৃতি লোক সেকালে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

নলচিড়া

বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ পরগনার নাম স্মরণ হইলেই নলচিড়া গ্রামের নাম মনে হয়। বাকরগঞ্জ জিলায় এই গ্রামটি অতি প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত। নলচিড়া সাধারণত নিম্ন নবদ্বীপ বলিয়া অতি প্রাচীন কালাবধি অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। নলচিড়া বলিতে নলচিড়া,

কাণ্ডপাশা, বাসুদেবপাড়া, বাহাদুরপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহের সমষ্টি বোঝায়। নলচিড়া গৌরনদী থানার অন্তর্গত। এ গ্রামে একটি মাইনর স্কুল, গ্রাম্য রাস্তা ও একটি খাল থাকায় স্থানীয় লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের উজির অলফৎ গাজী, গাজিপুর হইতে কার্যবশত এ অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া, নলচিড়া গ্রামে স্থিত হন এবং জাহাঙ্গীরের প্রদত্ত কয়েকখানি জমিদারি প্রাপ্ত হন। বর্তমান মির সাহেবগণ উক্ত উজির সাহেবের বংশধর এবং প্রায় ২৫০ বৎসর পর্যন্ত ইঁহারা নলচিড়ায় বংশ পরম্পরায় বাস করিতেছেন। এই বংশে কুতুব সাহেব নামে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। ইহার সময়ে জমিদারির অত্যন্ত উন্নতি হয়, ইনি একজন পরম ধার্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, ইনি মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া নিজেকে গোর দিতে অনুমতি করেন। গোর দেওয়া হইলে, যোগ-বলে কবর মধ্যে কয়েকদিন জীবিত ছিলেন। নলচিড়া গ্রামে মির সাহেবদিগের সময়ের দীর্ঘায়তন বিশিষ্ট পুরাতন মসজিদ, ইষ্টকালয়, নহবত দীঘি প্রভৃতি অদ্যাপি বর্তমান আছে। এই গ্রামে পূর্বে অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল, এবং বসতি স্থানে একটি শৃঙ্খলার ভাব ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে গ্রামের অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া, মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে।

নলচিড়ার ভট্টাচার্য বংশ সমস্ত বঙ্গদেশে পূজিত ও সম্মানিত। নলচিড়া একসময় সংস্কৃত চর্চার রঙ্গভূমি ছিল। বড় ভট্টাচার্য বাড়িতে ১৪টি টোল ছিল। এই বংশের জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপ, কাশী দ্রাবিড়ের পণ্ডিতগণ পর্যন্ত তাঁহাকে অসাধারণ লোক বলিয়া অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহার সময়ে বিভিন্ন স্থানের ছাত্রমণ্ডলী নবদ্বীপ না গিয়া, ইঁহার নিকটেই শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। কোন দানাদিকার্যে নলচিড়ার পণ্ডিতগণের নামে 'আগ-বিদায়' পৃথক করিয়া রাখা হইত। হুগলি জিলার অন্তর্গত বাঁশবাড়িয়া গ্রাম সংস্কৃত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ; নলচিড়ার ভট্টাচার্য বংশের মহেন্দ্রনাথ তর্কপঞ্চানন, বাঁশবাড়িয়ার রাজা কর্তৃক তথায় স্থাপিত হন। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ভট্টাচার্য বংশ সম্ভূত। নলচিড়ার বৈদ্য বংশও সংস্কৃতে অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন।

রাজা, পণ্ডিত ও নদী যে স্থানে নাই, সে স্থান সর্বথা পরিহার্য। বিগত একশত বৎসরের পূর্বকাল পর্যন্ত জাহাঙ্গীরের উজির সাহেবের বংশধরগণ এই গ্রামের প্রধান জমিদার ছিলেন এবং ইহারা নাজিরপুরেরও জমিদার; দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণের রঙ্গভূমি এই নলচিড়া গ্রাম ; আগরপুর ও সরিকলের প্রশস্ত নদী এক সময়ে নলচিড়ার পাদদেশ বিধৌত করিয়াছে ; কিন্তু বর্তমান সময়ে নলচিড়ার পূর্বশ্রী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

গৈলা ও ফুল্লশ্রী

বরিশাল সদর বিভাগের অন্তর্গত গৌরনদী থানার এলাকাধীন গৈলা-ফুল্লশ্রীর অবস্থিতি। গৈলা বরিশাল হইতে উত্তর পশ্চিমে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। গৈলা বলিতে সাধারণত গৈলা, মিহিপাশা, কালুপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি কিসমতের সমষ্টি বুঝায়। গৈলায় একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজি স্কুল, একটি বালিকা বিদ্যালয়, কয়েকটি পাঠশালা, একটি বাজার, একটি পোস্টাফিস, গ্রাম্য রাস্তা প্রভৃতি থাকায় স্থানীয় লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। গৈলা হইতে ঘাঘর পর্যন্ত আম্বৌলা রোড ও তৎসহ একটি খাল থাকায়, অঞ্চলের লোকের মহদুপকার হইয়াছে। গৈলায় কোন নদী বা দোন নাই। বর্ষাকালে এদেশ জলে প্লাবিত হইয়া থাকে, তাহাতে লোকের গমনাগমনের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া থাকে। এ দেশে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতিরই প্রাধান্য। গৈলা ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে কতকগুলি অতি প্রাচীন অন্ধ-পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি ছবি খাঁর দীঘি নামে প্রসিদ্ধ ও এ অঞ্চলে কতকগুলি প্রাচীন রাস্তার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া

যায়, এই সকলও ছবি খাঁর জাঙ্গাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বিজয় সেন, ইন্দ্র সেন, যব সেন, অশোক সেন, তরুণ সেন, নরসিংহ সেন ও গোপাল সেন নামক সাত ভ্রাতা দ্বারা সাতটি দীঘি খনিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে ; ঐ সকল দীঘি বর্তমান সময় পর্যন্তও তাঁহাদিগের নিজ নিজ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এ স্থানের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে রামাকান্ত তর্কবাগীশের সন্তানগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত। ভব দাস বংশীয় প্রসিদ্ধ রামনাথ দাস উক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়কে এ গ্রামে আনয়ন করেন। তিনি ও কাশীনাথ দাসের পিতা কৃষ্ণদেব দাস কাশীপুরস্থ পৈতৃক গুরু পরিত্যাগ করিয়া, এই মনস্বী ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ ভিন্ন গৌর নদী থানার প্রধান জমিদার রামলোচন দাস মুন্সী ও শোলোকের বিখ্যাত মজুমদারগণও ইঁহার শিষ্য হয়েন। উক্ত মুন্সী জমিদারগণের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। গৈলা ফুল্লশ্রী নতুন গ্রাম নহে। প্রাচীনকাল হইতেই এ স্থান পণ্ডিত নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কবি বিজয়গুপ্ত স্বরচিত পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন।

"পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুবে খণ্ডেশ্বর,
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।"

এই ফুল্লশ্রী গ্রামে বিদ্যাধ্যয়ন জন্য সাড়ে চারি শত বর্ষ পূর্বে ফরিদপুরের অন্তর্গত পুরুলিয়া গ্রাম হইতে ত্রিলোচন দাস নামে জনৈক ছাত্র আগমন করেন। তিনি অসামান্য প্রতিভা বলে অতি সত্বরই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া, কবীন্দ্র উপাধি লাভ করেন এবং কয়েক বৎসর পরে গুরুকন্যাকে বিবাহ করিয়া পিতা হেরম্ব দাস ও পুরোহিত রামটুরী চক্রবর্তীর সহিত ত্রিলোচন গৈলা গ্রামে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। এই রামটুরী চক্রবর্তী মিহিপাশাস্থ ডিংসাই বংশের আদিপুরুষ। উক্ত ত্রিলোচন দাস ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঘবেন্দ্র দাস গৈলার যাবতীয় ভবদাসগণের আদিপুরুষ। ত্রিলোচনদাস কলাপ ব্যাকরণের বিখ্যাত পঞ্জিকার। কথিত আছে, কবি বিজয়গুপ্ত, ত্রিলোচন দাসের ভাগিনেয়, বিজয় গুপ্ত পদ্মাপুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক,
সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি তিলক।

ইহাতে বুঝা যায়, ১৪০৬ শকে (১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে) হোসেন সাহের রাজত্বকালে পদ্মাপুরাণ লিখিত হয়। একজন প্রবল পরাক্রান্ত হোসেন সাহ ১৪৯৮ হইতে ১৫০২ সন পর্যন্ত বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্বকাল পদ্মাপুরাণ রচনার ১৪ বৎসর পরে আরম্ভ হওয়ায় বিজয়গুপ্ত অন্য কোন হোসেন সাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক, পদ্মাপুরাণ ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে লিখিত হইলে, ত্রিলোচন দাস, ইহার পূর্বেই এ গ্রামে আসিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। গৈলার বিনায়ক সেনগণ অতি প্রাচীনকালাবধি এ গ্রামস্থ অধিবাসী। ইহাদিগের পূর্বপুরুষগণ বিক্রমপুর পরগনার গোড়াগাছা গ্রাম হইতে এ দেশে আগমন করেন। বর্তমান 'মধুর আন্ধিপাড়' বিনায়ক সেনদিগের আদি বাড়ি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভবদাস বংশীয় রঘুরাম দাস কবিকণ্ঠাভরণ চারি কন্যার বিবাহ দিয়া, জামাতাদিগকে এ দেশে আনয়ন করেন; ইহারাই ফুল্লশ্রীর মজুমদারগণের, দুহি সেন বংশের বর্তমান জগদীশ গুপ্ত দিগের ও ফুল্লশ্রীর সেবক সেনের সন্তানদিগের আদিপুরুষ। উক্ত গুপ্তদিগের আদিপুরুষ রামগোবিন্দগুপ্ত, রাধাবল্লভ দাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এ গ্রামে আগমন করেন। পদ্মাপুরাণ রচনার সময়ে বিজয়গুপ্ত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া, একটি ঘটের উদ্দেশ্য পান ও ঐ ঘট সংস্থাপনপূর্বক পূজা দেন। বিজয় গুপ্তের মৃত্যুর পর ঐ ঘট পুনরায় নিরুদ্দেশ হয়, বহু বৎসর পরে মিহিপাশা নিবাসী কিঙ্কর চক্রবর্তী পুনরায় ঐ ঘট সংস্থাপনের জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হন। বর্তমান মনসাবাড়ির পশ্চিম দিকস্থ পুষ্করিণীর মধ্যে এই ঘট, ধূপতি, রামদাও, শঙ্খ পাওয়া যায়। স্বর্গীয় বিজয় গুপ্তের বাড়ির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি মনসাবাড়ির দক্ষিণ ধারে বিদ্যমান আছে। বরিশালের

অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গৈলায় অধিকতর কৃতবিদ্য ইংরেজি শিক্ষিত যুবক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল হইতেই অনেকানেক পণ্ডিত গৈলার মুখোজ্জ্বল করিয়া আসিতেছেন। ত্রিলোচন দাস ও বিজয় গুপ্তের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ভব দাস বংশে জানকীনাথ দাস কবি কণ্ঠাভরণ, বিনায়ক সেন বংশে প্রসিদ্ধ সুখদেব সেন কবিরাজ ও কাশীনাথ সেন ও রামভদ্র সেন নামে তিনজন এবং মদনমোহন দাস কবীন্দ্র ও রাধামোহন তর্কভূষণ ও শ্যামকিশোর তর্কভূষণ এবং গুপ্ত বংশে রামচন্দ্র গুপ্ত কবি কণ্ঠহার প্রভৃতি অনেক বিখ্যাতনামা পণ্ডিতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৈলার অধিকাংশই বৈদ্য বলিয়া বহুকাল হইতে এ স্থানে আয়ুর্বেদের বিশেষ আলোচনা হইয়া আসিতেছে। গৈলার দুহি সেন বংশ পুরুষানুক্রমে সুখ্যাতির সহিত কবিরাজি ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন। ভবদাস বংশে ও ত্রিলোচন দাসের বংশধরগণ মধ্যে অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসা ব্যবসায়ী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ মদনমোহন কবীন্দ্র মহাশয়ের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য দেশ বিদেশ হইতে অনেক ছাত্র আগমন করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে কলিকাতার কবিরাজ কুলতিলক গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও বিজ্ঞবর কৈলাসচন্দ্র সেন কবিরাজ, ঢাকার খ্যাতনামা কালী কবিরাজ মহাশয়গণ বর্তমান চিকিৎসক সমাজে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। উক্ত কবীন্দ্র মহাশয়ের পৌত্র চন্দ্রকুমার দাস কবিভূষণ সম্প্রতি আগরতলা রাজবাড়িতে থাকিযা অতি উচ্চ বেতনে এবং বিশেষ সম্মানের সহিত নিজ কবিরাজি ব্যবসা করিতেছেন।

বাকরগঞ্জ জিলা হইতে সর্বপ্রথমে শোলনার বাবু ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ফুল্লশ্রীর বাবু চন্দ্রকুমার দাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ, উপাধি লাভ করেন। উক্ত চন্দ্রকুমার বাবু বহুকাল মুন্সেফের কার্য করিয়া, সব জজের পদে উন্নীত হয়েন। ইনি এখন জীবিত নাই। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় বাবু ললিতকুমার দাস বি এ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও বাবু নবীনচন্দ্র দাস জজ আদালতের উকিল। ফুল্লশ্রীর বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস এম এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। গৈলা ফুল্লশ্রীতে পাঁচজন এম এ ও ১৯ জন বি এ একজন এল এম এস উপাধিধারী লোক আছেন। বাকরগঞ্জের অপর কোন গ্রামেই ইংরেজি শিক্ষিত লোকের সংখ্যা, এত অধিক দৃষ্ট হয় না। এতদ্ভিন্ন বাবু মধুসূদন সেন শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করত ঃ বি সি উপাধি লাভ করিয়া, সম্প্রতি কটক জিলার অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ারের কার্য করিতেছেন। বাকরগঞ্জে ইনিই প্রথম ইঞ্জিনিয়ার। গৈলার বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত একজন বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বাবু রজনীকান্ত দাস বরিশালে খ্যাতনামা উকিল। প্রোফেসর বিশ্বেশ্বর সেন এম এ, বাবু বিপিনবিহারী দাস এম এ বি এল মুন্সেফের ও বাবু চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী এল এম এস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিশেষ দক্ষতার সহিত নিজ নিজ কার্য করিতেছেন।

চাঁদসি

বরিশালের অন্তর্গত গৌরনদী থানার এলাকাধীন চাঁদসি গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমশূদ্র ও মুসলমানের বাস। কায়স্থই গ্রামের বর্ধিষ্ণু লোক। এইটি কুলীন কায়স্থের গ্রাম বলিয়াই বিখ্যাত। ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈদিক, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণী, কায়স্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ কুলীন বসু মজুমদার পরিবার ও মৌলিক গুহ বংশ, নমশূদ্রের মধ্যে ডাক্তার পরিবার বিখ্যাত মুসলমানের মধ্যে ফকির মিএগার বংশধরগণ বিখ্যাত। চাঁদসির আদিম অধিবাসী দাস বংশ, নবাব সরকারে বাঙ্গরোড়ার তালুকদার ছিলেন। এই বংশে বিষ্ণুদাস, মহীভদ্র দাস, হাম্বীর দাস, ধুস্তর দাস, বাণেশ্বর দাস ও গোবর্ধন দাস নামধেয় সাত ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন, ইহাদের প্রত্যেকের নামে দীঘি ও খাল এবং রাস্তা এখনও চাঁদসি ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে বর্তমান আছে। এখন এই বংশের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

কাশ্যপ গোত্রীয় পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কার কোটালিপাড়া হইতে এই গ্রামে বসু মজুমদার ও গুহ পরিবারের ইষ্ট দেবতা নিবন্ধন বাস করেন। ইহার চারি পুত্র ; যথা—কমলাকান্ত, তর্কবাগীশ, গঙ্গ ানন্দ সার্বভৌম, গদাধর সিদ্ধান্ত ও ভুবনেশ্বর তর্কভূষণ। তৃতীয় পুরুষে উপাধিধারী পণ্ডিত, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কভূষণ ও কৃষ্ণনারায়ণ ন্যায়ভূষণ। চতুর্থ পুরুষে উদয় তর্কালঙ্কার। পঞ্চম পুরুষ কমলাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত ও বিশ্বেশ্বর ন্যায়ভূষণ। ষষ্ঠ পুরুষে হিন্দুধর্ম প্রচারক প্রসিদ্ধ বাগ্মীপ্রবর পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ ও পণ্ডিত হরনাথ শাস্ত্রী। বসুবংশ কচুয়া হইতে চাঁদসীর দাস কর্তৃক এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। এই বংশের রমাকান্ত বসু নবাব সরকারে প্রধানতম কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া, মজুমদার উপাধিতে ভূষিত হন। বর্তমান সময়েও চাঁদসীর মজুমদার বলিয়া এই বংশ বিখ্যাত। এই বংশে হরগোবিন্দ বসু মজুমদার সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ বুৎপন্ন ছিলেন যে, পণ্ডিতগণও তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। ইনি ৭০০ টাকা বেতনে রাজশাহী— তাহেরপুরের রাজসংসারের ও অপরাপর ঘরের ম্যানেজারি করিয়া কর্তৃত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। ইনি একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। এই বংশে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ব্রজকিশোর বসু মজুমদার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার কন্যাই কাদম্বিনী বসু বি এ, এল আর সি পি। বর্তমান সময়ে এই বংশে হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক বাবু শশিভূষণ বসু বি এল ও পেন্সন প্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর বাবু হরকিশোর বসু বিশেষ সম্মানিত।

চাঁদসীর গুহ বংশের আদিপুরুষ বিলাস গুহ, ইনি হানুয়া হইতে চাঁদসীতে অবস্থান করেন। এই বংশে বরিশাল জজ আদালতের ভূতপূর্ব উকিল অম্বিকাচরণ গুহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়া প্রতিভাবলে স্বীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করায় বহুতর অর্থোপার্জন করিয়া, বিত্ত পশার করিয়া গিয়াছেন ; ইনি নিঃস্ব কুটুম্বগণকে অর্থ সাহায্য করিতেন।

চাঁদসীর বিষ্ণুহরি ডাক্তার মনসার কৃপায় গোল ও কাইট নামধেয় ঔষধ প্রাপ্ত হন। এই ঔষধই এই বংশের কৃতিত্বের মূল ভিত্তি। তৎপর রামকৃষ্ণ ডাক্তার স্বীয় ব্যবসায়ে কৃতিত্ব দেখাইয়া, অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া দালান কোটা দেন। ইহার পর রামকান্ত ডাক্তার স্বীয় ব্যবসায়ে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখান। ইনি ময়মনসিংহ জমিদার বাড়ি হইতে পুরস্কারস্বরূপ একটি হাতি প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্রই বর্তমানে সুনামবিখ্যাত পদ্মলোচন দাস ডাক্তার। ইহাদের অস্ত্র চিকিৎসায় গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল বিদ্যালয় হইতে যাহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহারাও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন।

এই গ্রামে একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় পোস্টাফিস ও হাট আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে একটি মেলা হয়। দশমহাবিদ্যা, কালী, রাধা-গোবিন্দ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত দেবালয় সমূহ আছে।

রামচন্দ্রপুর

রামচন্দ্রপুর গ্রামটি ঝালকাঠি থানার এলাকাধীন বরিশাল সদরের অন্তর্গত। এ গ্রামে বৈদিক ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্র প্রভৃতির বাসস্থান। বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রসিদ্ধ কালী খোলাতে অতি প্রাচীনকালের একটি বট বৃক্ষ আছে ; এরূপ প্রবাদ আছে যে, ইহাদিগের পূর্ব পুরুষ কামরূপে গিয়া আবদ্ধ হইলে, কাত্যায়নীর আদেশে ঐ বটবৃক্ষে চড়িয়া তথা হইতে পুনরায় বাড়িতে উপস্থিত হয়েন। পরে ঐ বৃক্ষের নিচে তিনি কালী দেবীর মূর্তি স্থাপন করেন। এই বৈদিক বংশে পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ও তাঁহার ভ্রাতা পণ্ডিত কালীশচন্দ্র ভট্টাচার্য উক্ত স্কুলের অন্যতম সংস্কৃত শিক্ষক। পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বরিশাল দরিদ্র ভাণ্ডারের একজন পরমবন্ধু, ইহার চেষ্টায় অনেকানেক নিরাশ্রয় রোগীর সেবা শুশ্রূষা হইয়া থাকে। পণ্ডিত কামিনীকান্ত ও কালীশচন্দ্র বরিশাল ধর্মরক্ষিণী সভার আচার্য।

এই গ্রাম বসু, দাস, গুহ ও রায় বংশীয় কায়স্থ প্রধান। বসু বংশই আদিম অধিবাসী। আর সকলই বসু বংশ দ্বারা আনীত ও স্থাপিত। রাধাকান্ত দাস সরকার, গৌরসুন্দর বসু প্রভৃতি বিশেষ ক্ষমতাশালী ও সম্পন্ন লোক ছিলেন। বর্তমান সময়ে গুহ বংশই অত্যন্ত উন্নত। পঞ্চানন গুহের পুত্রগণ মধ্যে স্বরূপচন্দ্র গুহ বরিশালে ওকালতি করিয়া স্বনামখ্যাত হইয়াছেন, ইঁহার উপার্জিত অর্থ দ্বারা এই বংশের ভূসম্পত্তির সৃজন হইয়াছে, ইনি বরিশালে ও নিজ গ্রামস্থ বাটীতে ইষ্টকালয় ও দেবমন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছেন। ইঁহার পুত্র বাবু অবিনাশচন্দ্র গুহ এম এ একজন কৃতবিদ্য যুবক। উক্ত পঞ্চানন গুহের অপর তিন পুত্র—মোহনচন্দ্র গুহ, গোবিন্দ্রচন্দ্র গুহ ও আনন্দচন্দ্র গুহ, বুদ্ধিমান ও কার্যদক্ষ লোক ছিলেন. ইঁহারা নিজ নিজ ক্ষমতায় অর্থোপার্জন করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। উক্ত মোহনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ বি এল বরিশালের একজন উকিল, মধ্যম বাবু তারাপ্রসন্ন গুহ বি এল হাইকোর্টের একজন উকিল এবং কনিষ্ঠ বাবু উমাপ্রসন্ন গুহ এম এ একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এই পরিবারের সকলেই সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ। ইহাদিগের জমিদারির অবস্থাও ভাল। লক্ষ্মী এবং সরস্বতী একত্রে এই পরিবারের বাস করিতেছেন।

এই গ্রামে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুল, একটি পুস্তকালয়, একটি পোস্টাফিস ও গ্রাম্য রাস্তা আছে।

মানপাশা

নলছিটি হইতে দক্ষিণ পূর্বদিকে এই গ্রামটি অবস্থিত। গ্রাম্য রাস্তা, খাল ও মানপাশা হইতে নলছিটি পর্যন্ত হরনাথ দত্তের কাটা খাল থাকায়, লোকের গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে।

মানপাশা একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম ; এই গ্রামের ভট্টাচার্য বংশ ন্যায়শাস্ত্রের জন্য চিরদিনই বিখ্যাত। রামনাথ সার্বভৌম এই বংশের প্রধান পুরুষ। ইনি বাল্যকালে কোন এক সময়ে বালি গ্রামের চড়ার ওপর খেলা করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে ত্রিবেণীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তথায় নৌকারোহণে উপস্থিত হন এবং রামনাথকে তিনি ত্রিবেণীতে নিয়া যান। রামনাথ একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক হইয়া দেশ মধ্যে প্রশংসাভাজন হইলেন। ইনি কোন এক সময়ে গঙ্গাস্নানে যাইয়া জল মধ্যে একটি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন, অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ উক্ত চক্রের পূজা করিতেছেন। এই বিগ্রহটী 'রঘুনাথ' নামে অভিহিত হইতেছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের কোপানলে পড়িয়া যে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই নন্দকুমার উক্ত রামনাথের বিদ্যাবুদ্ধি ও অসাধারণ শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে এই জিলার জন্য 'পণ্ডিত জজ' নিযুক্ত করেন। রামনাথ বারইকরণে দেওয়ানি আদালতের পণ্ডিত জজ নিযুক্ত হন। সাহাজাদপুরের অন্তর্গত ফয়রার জমিদার বিজয়রাম রায় ইঁহাকে মানপাশায় স্থাপিত করেন এবং তদবধি ইঁহার বংশধরগণ এই গ্রামে অতিশয় সম্মানের সহিত বাস করিতেছেন। রামনাথ বিত্ত সম্পত্তি করতঃ বাটিতে দালান কোঠা দিয়া গিয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্র ও এগার কন্যা। রামনাথের দুই পুত্র—রঘুনাথ তর্কালঙ্কার ও কাশীনাথ তর্কভূষণ। রঘুনাথের তিন পুত্র মধ্যে কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত একজন প্রবীণ পণ্ডিত। তাঁহার পুত্র কমল ন্যায়পঞ্চানন ও গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ পরম পণ্ডিত। কমল ন্যায়পঞ্চাননের বংশধর নারায়ণ তর্কপঞ্চানন একজন পণ্ডিত।

উক্ত রঘুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র লোকনাথ ভট্টাচার্যের মধ্যম পুত্র বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন এখন কলিকাতা সিটি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন ও কনিষ্ঠ চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য বি এল, বরিশালে ওকালতি করিতেছেন।

মানপাশার ভট্টাচার্য বংশের পূর্বে কৃষ্ণজীবন চক্রবর্তী একজন বিখ্যাত তালুকদার ছিলেন। এই বংশের অনেকানেক কীর্তিকলাপের এখন চিহ্ন আছে। এক সময়ে স্বস্ত্যয়ন করাইবার জন্য চক্রবর্তীগণ বামদেব বাচস্পতি নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষকে মানপাশায় আনিয়া স্থাপিত করেন।

বাচস্পতির পৌত্র নন্দরাম তর্কবাগীশ একজন প্রধান তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি একটি উপাসনালয় নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে পঞ্চ জারজ চণ্ডালের মস্তক প্রোথিত করিয়া, 'ত্রিপঞ্চপীঠ' প্রস্তুত করেন; উহার চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। ইঁহার বাড়িতে ভগ্ন দালান ও দেবমন্দির আছে।

পিরোজপুর বিভাগ-রায়েরকাঠি

পিরোজপুর বিভাগের প্রধান স্থান রায়েরকাঠি। এ স্থানের জমিদারগণ সাধারণত 'রায়েরকাঠির রাজা' বলিয়া বিখ্যাত। এই বংশ সেলিমাবাদের রাজা, ইঁহাদিগের কীর্তিকলাপ দানাদি কার্য বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। রায় জমিদারগণ এই স্থানের গভীর অরণ্য আবাদ করেন বলিয়াই এই গ্রামের নাম 'রায়েরকাঠি' হইয়াছে, রায়েরকাঠি পিরোজপুরের মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত দামোদরের উত্তর পারে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামে মাইনর স্কুল, পোস্টাফিস, গ্রাম্য পাকা রাস্তা, চিকিৎসালয় প্রভৃতি থাকায় স্থানীয় লোকের সুবিধা হইয়াছে। গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি সকলেই রাজবংশের জায়গীর ভোগ করিতেছেন। রায়েরকাঠির চতুপার্শ্বস্থ প্রায় দশ হাজার টাকার লভ্যের তালুক রাজবংশের সম্পর্কীয় ও আশ্রিত লোকগণ নিষ্কর ভোগ করিতেছেন। জমিদারগণ আশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেককে তাহাদের বাড়িতে দালান নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রায়েরকাঠিতে ইষ্টকালয়ের সংখ্যা অধিক। বাকরগঞ্জের অপর কোন স্থানে এতগুলি দালান নাই।

রায়েরকাঠির রাজবংশ দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সেন বংশ। এই গ্রামের দক্ষিণ রাঢ়ী ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি কুলীনগণ রাজবংশ কর্তৃক আনীত ও স্থাপিত। হবিবকাঠির ঘোষ বংশ ও রায়েরকাঠির জমিদারগণের কুটুম্ব। রায়েরকাঠিতে এই সকল বংশে অনেকানেক কৃতবিদ্য ও ইংরেজি শিক্ষিত লোক আছেন। এ গ্রামে বি এ ও এম এ উপাধিধারী ৬জন লোক আছেন।

কলিকাতার নিকটবর্তী দ্বিগঙ্গা নামক স্থানের রামনাথ সেন নবাব সরকারে চাকরি করিতেন। তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ সেনরায় নবাব সরকারে চাকরি করিয়া, নিজ প্রতিভাবলে গচ্ছিত স্বরূপ জমিদারি লাভ করিয়া রায়েরকাঠির রাজবংশের আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন, শত্রুজিৎ রায় এই বংশের আদিপুরুষ। রায়েরকাঠির জমিদার বংশের অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা অদ্বৈতনারায়ণ রায়, শ্রীনাথ রায়কেই আদিপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করেন।

উক্ত শ্রীনাথ রায়ের পুত্র—শ্রীরাম রায়, তৎপুত্র রুদ্র রায়। ইঁহার চারি পুত্র—নরোত্তম, নরেন্দ্র, কন্দর্প ও গান্ধর্ব। নরোত্তম রায়েরকাঠিতেই থাকেন, অপর তিন ভ্রাতা বনগ্রাম, মঘিয়া ও চিঙ্গরাখালিতে গিয়া স্থিত হয়েন এবং তাঁহাদিগের বংশধরগণ এখনও উক্ত গ্রাম সমূহে বাস করিতেছেন। নরোত্তমের তিন পুত্র—জয়নারায়ণ, দর্পনারায়ণ (নিঃসন্তান) ও সুরনারায়ণ (ছোট রাজবাড়ী ; এই বাড়ির নবকৃষ্ণরায় প্রধান লোক), জয়নারায়ণ এই বংশের স্বনামখ্যাত মহা পুণ্যাত্মা পুরুষ। ইনিই এই বংশের প্রধান ও প্রবীণ রাজা। ইঁহার চারি পুত্র—শিবনারায়ণ, উদয়নারায়ণ, দুর্লভনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ। শিবনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণনারায়ণ, তৎপুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ। তাঁহার চারি পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ প্রহ্লাদনারায়ণ, মাধবনারায়ণ ও নরনারায়ণ। রাজা নরনারায়ণ সঙ্গীত শাস্ত্রে বঙ্গদেশ মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত, ইঁহার সহধর্মিণী বসন্তকুমারী রায় কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। শিবনারায়ণের তৃতীয় পুত্রের বংশে রাজা চন্দ্রনাথ রায় বিখ্যাত। উদয়নারায়ণের বংশে রাজা রাজকুমার রায় স্বনামখ্যাত পুরুষ। দুর্লভনারায়ণের বংশে রাজা অদ্বৈতনারায়ণ রায় বিখ্যাত। লক্ষ্মীনারায়ণের বংশে রাজা দুর্গানারায়ণ রায় খ্যাতনামা লোক ছিলেন।

বাকরগঞ্জের সকল অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণই এই বংশের ব্রহ্মোত্তর ভোগ করেন। জমিদারদিগের

পুরোহিতগণ তারপাশায় ও ইষ্টদেবতাগণ বায়েরকাঠিতে বাস করেন। রুদ্র রায় রায়েরকাঠিতে প্রসিদ্ধ কালী স্থাপন করেন। সংস্কৃত ভাষায় কালী মন্দিরের উপর লিখিত হ'ছে যে, বাঙ্গলা ১০৫০ সনে রুদ্র রায় (সাধু রায়) রায়েরকাঠির কালী স্থাপন ও মন্দির নির্মাণ করেন। কালী ও সিদ্ধেশ্বরীর বাড়িতে অনেকানেক দেব-দেবীমূর্তি ও মন্দির বর্তমান আছে। স্থানটি গভীর ভাবোদ্দীপক। প্রায় ২৫০ ফিট উচ্চ একটি নবরত্ন আছে। যে স্থলে অতিথিগণ আসিয়া বাস ও আহারাদি করিত, যে স্থানটি অদ্যাপি অতিথিখানা নামে অভিহিত হইতেছে।

কীর্তিপাশার জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ, সাহরিয়ার মিঞা ভূম্যধিকারীর আদিপুরুষ, আমড়াজুরির দত্ত ও জলাবাড়ির বিশ্বাসগণের পূর্বপুরুষগণ, রায়েরকাঠির রাজ সরকারে চাকরি করিয়া, সকলেই সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে রাজবংশের অনেকেরই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে ; রায়েরকাঠির পূর্বশ্রী এখন অন্তর্হিত।

জমিদার বংশের স্থাপিত কুলীনদিগের মধ্যে বাবু প্রিয়নাথ মিত্র, বাবু দীননাথ বসু, বাবু সখানাথ মিত্র, বাবু শশিভূষণ মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সম্পন্ন অবস্থায় আছেন।

সাতুরিয়া

এই গ্রাম পিরোজপুর হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে। সাতুরিয়া মুসলমান প্রধান গ্রাম। এই গ্রামে এক বংশজাত বহুতর ভদ্র বিশিষ্ট লোকের বাস। ইহারাই সাতুরিয়ার মিঞা নামে সর্বত্র অভিহিত। এতদ্ভিন্ন ফরিদপুর, যশোহর ও বাকরগঞ্জ জিলাস্থ অনেক গণ্যমান্য মুসলমান কুলীন সন্তান বিবাহাদি করিয়া, এই গ্রামে স্থাপিত হইয়াছেন। সাতুরিয়ার জমিদারগণের প্রসিদ্ধ আদিপুরুষ সাজেন্দা নামক জনৈক আওলিয়া (ফকির)। তিনি দিল্লি হইতে সাজাহান আলী অর্থাৎ যাঁহাকে এতদ্দেশীয় লোকে খাঞ্জে আলী বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহার সঙ্গে বাগহাট মহকুমার অন্তর্গত হাবেলি পরগনায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের বাসস্থান অদ্যাপি খাঞ্জে আলীর দরগা নামে সর্বত্র ঘোষিত হইতেছে এবং ঐ স্থানে দর্শকের তৃপ্তিকর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, মসজিদ ও বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় সকল বর্তমান থাকিয়া, চতুর্দিকে যশোরাশি প্রচার করিতেছে। সাজেন্দার পুত্র সানুর প্রভৃতি ক্রমান্বয় কয়েকপুরুষ ঐ স্থানেই অবস্থিতি করেন ; পরে ঐ বংশীয় সেখ সাহাবুদ্দিন নামক একজন আওলিয়া (ফকির) সেলিমাবাদ পরগনার জমিদার রায়েরকাঠির চৌধুরিগণ কর্তৃক কতক চেরাগি ও তালুকাদি প্রাপ্ত হইয়া, এই সাতুরিয়া গ্রামের ৫ মাইল পূর্বে সুতালোগর নামক পল্লীতে বাস করেন। অবশেষে ঐ স্থানেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। এখনও এদেশীয় মুসলমান ও অনেক হিন্দু সন্তান তাঁহার সমাধি স্থানে অনেক মানসিক ও সির্নিআদি দিয়া থাকেন। উক্ত আওলিয়ার নয় পুত্র। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার জীবদ্দশাতেই নানারূপ উন্নতি সাধন করিয়া, এই সাতুরিয়া আসিয়া বাস করেন এবং ক্রমান্বয় অনেক ভূসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া, সেলিমাবাদ পরগনায় এক ঘর প্রসিদ্ধ তালুকদার হইয়া পড়েন। উক্ত শেখ সাহাবুদ্দিন হইতে এই বংশীয়দের ৭ম পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে। পূর্বে এই বংশীয়গণ দেশচল প্রথানুসারে আরবি, পারসী ও বঙ্গভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। এই বংশীয় ভূম্যধিকারিগণ মধ্যে ইতিপূর্বে সেখ ব্রাহতুল্লা ওরফে ধোন মিঞা ও আবদুল আজিজ ওরফে মুনসুর মিঞা জাঁকাল লোক ছিলেন।

বানরিপাড়া, নরোত্তমপুর ও কুন্দিহার

উক্ত তিনটি গ্রাম একই লগ্ন, পিরোজপুর বিভাগে স্বরূপকাঠি থানার অন্তর্গত। বানরিপাড়ায় একটি এন্ট্রান্স স্কুল থাকায়, অধিবাসীগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। গ্রামের পোস্টাফিসটি নরোত্তমপুরে স্থিত। গ্রামে লাইব্রেরী, ডিস্পেন্সারি, হাট, বাজার, খাল প্রভৃতি আছে। বানরিপাড়ায় পাকা রাস্তা ও বাজারের খালে কৌশল নির্মিত একটি লোহার পুল থাকায় লোকের

গমনাগমনের অত্যন্ত সুবিধা হইতেছে। বানরিপাড়ায় বসতিস্থান ঘন ও লোকসংখ্যা স্থানের পরিসরানুসারে অধিক বলিয়া মনে হয়। কুন্দিহার গ্রামে বৈদ্য জাতির প্রাধান্য ; কবিরাজ দ্বারিকানাথ সেন, পণ্ডিত পার্বতীচরণ দাস কাব্যতীর্থ প্রভৃতি প্রধান লোক। এই গ্রামের বৈদ্য বংশ সংস্কৃত ও কবিরাজির জন্য বিখ্যাত।

বিরাট গুহের বংশে অনেক কৃতি লোক জন্মিয়াছেন। বিশ্বকোষ পাঠে জানা যায় যে, মগ ও ফিরিঙ্গি বিজেতা জিতামিত্র গুহ, মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজা বসন্ত রায়, চাঁদ রায় প্রভৃতি এই বংশ সম্ভূত। মহারাজ প্রতাপাদিত্য মুর্শিদাবাদে নবাবের দেওয়ান ছিলেন এবং তাঁহার সহোদর ভ্রাতা নয়নানন্দ গুহ নবাবের সরকার ছিলেন। নয়নানন্দ সরকার কাবারধা গ্রামে বাসস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি না হওয়াতে মনোকষ্টে তিনি কাশী চলিয়া যান। সেখানে যাইয়া পুরশ্চরণ করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পুনরায় বানরিপাড়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার চারি পুত্র ও ১৬টি পৌত্র জন্মে। প্রতাপাদিত্য যশোহরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। নয়নানন্দ সরকারের বংশীয়গণ বানরিপাড়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। বল্লাল সেন কর্তৃক সমীকরণে অন্যান্য কুলীনদিগের সঙ্গে পর্যায়ে জেতা হওয়াতে তিনি ঠাকুরত্ব অথবা ঠাকুরতা উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বংশে সৃষ্টিধর গুহ নবাব সরকারে নায়েবের কার্য করিতেন বলিয়া বিশ্বাস উপাধি পান, ইহার বংশীয়েরা গুহ বিশ্বাস নামে খ্যাত। গুহ ঠাকুরতা বংশের কোন ব্যক্তি চন্দ্রদ্বীপ রাজাদিগের সঙ্গে বিবাহ ক্রিয়া উপলক্ষে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন, ইহার বংশীয়েরা গুহ রায় নামে পরিচিত। বানরিপাড়া গ্রামে গুহ ঠাকুরতা, গুহ বিশ্বাস এবং গুহ রায় এই তিন উপাধিধারী গুহ বংশীয়েরা বাস করেন, ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে কুলীন। এই গ্রামে ঘুড়ি খেলা উপলক্ষে একটি সমৃদ্ধশালী মেলার অবতারণা হইয়া থাকে, এখনও প্রতি অগ্রহায়ণ মাসে উহা মিলিয়া থাকে। এক সময়ে ঘুড়ি খেলা উপলক্ষে নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী, বিক্রমপুর ইত্যাদি স্থানের পণ্ডিতগণ এখানে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

নরোত্তমপুরের ঘোষ বংশ রায় উপাধিধারী। ইহারা গাভার ঘোষ দস্তিদারদিগের একই বংশ। এই গ্রামের কায়স্থগণের পাঁচকানি বাড়িই প্রধান যথা—বড় বাড়ি, পশ্চিমের বাড়ি, উত্তরের বাড়ি ও পুরাণ বাড়ি ও গঙ্গাচরণ রায়ের বাড়ি। এই গ্রামের বাবু উপকণ্ঠ রায় বি এল বাবু বরদাকান্ত রায় এল এম এম বিশেষ বিখ্যাত।

খলিসাকোটা

খলিসাকোটা গ্রামটি পিরোজপুরের অন্তর্গত স্বরূপকাঠি থানার এলাকাধীন। বহু সংখ্যক ভদ্রলোকের বসতি স্থান। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির বিশেষ প্রাধান্য। সংস্কৃত চর্চার জন্য এ স্থানটি বিশেষ বিখ্যাত। খলিসাকোটা নিবাসী প্রসিদ্ধ রায় বংশীয়দিগের আদিপুরুষ রামগোপাল রায়। এই মহাপুরুষ বর্তমান সময়ের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে গঙ্গানদীর পশ্চিম পাড়ের অর্থাৎ রাঢ় দেশীয় কোন স্থান হইতে এই বাকরগঞ্জ জিলার অধীন প্রথমত রণমতী গ্রামে এবং তাহার কিছুকাল পরে তথা হইতে খলিসাকোটা গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করেন। রামগোপাল রায় খলিসাকোটা গ্রামে আসিয়া, ঐ গ্রামের সকল স্থান অধিকার করেন এবং ঐ স্থানের পূর্বস্থিত সমুদয় জাতীয় লোকই রামগোপাল রায়ের আসীন হন। রামগোপাল রায়ের ক্রমে পাঁচটি পুত্র জন্মে ; যথা ১ম রামগোবিন্দ রায়, ২য় রত্নেশ্বর রায়, ৩য় গোপীকান্ত রায়, ৪র্থ রামজীবন রায়, ৫ম রামভদ্র রায়। এই পাঁচটি পুত্র সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। ইহারা সকলেই চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন ; অদ্য পর্যন্তও এই বংশে চিকিৎসা ব্যবসায় প্রচলিত আছে।

এই বংশের ৩য় পুরুষ রামকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের প্রস্তুত অনেক চিকিৎসা ব্যবসায়ের পুস্তক আছে, তন্মধ্যে 'রসসার' নামক গ্রন্থখানি অতি প্রসিদ্ধ এবং ৫ম পুরুষ রামমাণিক্য রায়মহাশয়েব প্রস্তুত অনেকানেক সংস্কৃত সাহিত্য আছে, তাহা অদ্যাপি জনসমাজে প্রচলিত দেখা যায়। রামমাণিক্য রায় ভূকৈলাসস্থ রাজবাড়ীর প্রধান চিকিৎসক এবং পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত একটি সংস্কৃত কবিতা ঐ বাড়ির দেবমন্দিরে অদ্যাপি খোদাই আছে। রামগোপাল রায়ের ১ম পুত্র রামগোবিন্দ রায়ের বংশই বিশেষ বিখ্যাত ; এই বংশে প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলিবর্দি খাঁ যখন বাঙ্গালির নবাব ছিলেন, তখন এই বংশের ৩য় পুরুষ রামকৃষ্ণ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ রায় মহাশয় নবাববাড়ির প্রধান পণ্ডিত এবং চিকিৎসক ছিলেন ; তাঁহার পাণ্ডিত্য-গুণে নবাব বাহাদুর বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। ঐ বংশের ৫ম পুরুষ মদননারায়ণ রায় মহাশয় চিকিৎসা শাস্ত্রে এতদূর কৃতী ছিলেন যে, তিনি রোগী দেখিয়া অন্তত জমা পূর্বে মৃত্যুর সময় নিরূপণ করিতে পারিতেন। বর্তমান সময়ে পার্বতীচরণ রায় মহাশয় এই বংশের মধ্যে প্রধান চিকিৎসা ব্যবসায়ী, তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নানাস্থানে বিদ্যমান আছে। ৬ষ্ঠ পুরুষে দীনবন্ধু রায় সংস্কৃতে এবং শিল্প বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন, তিনি একখানি মনসা দেবীর সিংহাসন নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ সিংহাসনের কারুকার্য অতীব চমৎকারজনক, তাহা অদ্যাপি বর্তমান আছে।

রামগোপাল রায় আদিপুরুষ হইতে বর্তমান ৯ম পুরুষ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আর পূর্ব পুরুষের ভার কিছুই নাই; কিন্তু এইক্ষণ যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও বিশেষ সম্মানিত এবং নানাস্থানের লোক সমাজে বিশেষ পরিচিত। বাবু গিরিশচন্দ্র রায় বরিশালে থাকিয়া মোক্তারি করিতেছেন ; ইনিও অত্যন্ত সম্মানিত। রায় বংশের ৫ম পুরুষের মধ্যে কাশীনাথ রায় নামক এক ব্যক্তি স্বনাম খ্যাতি পুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে বাকরগঞ্জ জিলার অধীন মাধবপাশা নগরীতে যখন মহারাজা উদয়নারায়ণের বংশধরগণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, অদ্বিতীয় প্রতিপত্তির সহিত একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, তখন কাশীনাথ রায় ঐ রাজবাড়ির পণ্ডিত এবং চিকিৎসক ছিলেন।

এই খলিসাকোটা গ্রামটি শত বৎসর পূর্বে এইরূপ সমৃদ্ধশালী ছিল যে, তথায় কখন কোন বিষয়ের অভাব কি অপ্রতুল ছিল না। সকল শ্রেণীর লোকের বসতি ছিল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কর্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, সূত্রধর, তন্তুবায় (জুগী, তাঁতী) গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কাংস বণিক, ধুপী, নাপিত, নট্ট, ভূঞ্জমালী, গোয়ালা প্রভৃতি নানা প্রকার বর্ণ সঙ্কর-জাতি ছিল। বর্তমানে সর্বশ্রেণীর বংশধরগণ অতি অল্পই আছে।

খলিসাকোটায় একটি স্কুল, গ্রাম্য রাস্তা, পোস্টাফিস, সংস্কৃত টোল প্রভৃতি থাকায় লোকের উপকার হইতেছে। বর্তমান সময়ে বাবু চন্দ্রকান্ত সেন, এম এ, বি এল, বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত উকিল, পণ্ডিত পার্বতীচরণ রায় কবিরাজ, প্রসন্নকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি লোক বিশেষ কৃতবিদ্য।

পটুয়াখালি

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এই মহকুমা স্থাপিত হয় এবং বাউফলের মুন্সেফী পটুয়াখালিতে পরিবর্তিত হয় ও কোটেরহাটের মুন্সেফী এবালিস হইয়া যায়। পটুয়াখালি বরিশাল সদর হইতে প্রায় ৩৮ মাইল দক্ষিণে সুন্দরবন বিভাগে অবস্থিত। এই মহকুমার উত্তর ও দক্ষিণ পূর্বদিকে দুইটি দোন থাকায় জলপথের সুবিধা হইয়াছে। বরিশাল হইতে পটুয়াখালি হইয়া আমতলী পর্যন্ত স্টিমার লাইন আছে। এ স্থানের জল লবণাক্ত ; সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে ; স্থানটির দৃশ্য ভাল। মহকুমায় এন্ট্রান্স স্কুল, পোস্টাফিস, হাট, বাজার, পাকা রাস্তা, পুল, জেল, কালেক্টরি ক্ষুদ্র দালান, দাতব্য ডাক্তারখানা, মিউনিসিপ্যাল আফিস প্রভৃতি আছে। মিউনিসিপ্যালের লোকসংখ্যা ৪৯৬৭৩৫ জন।

পটুয়াখালিতে ফৌজদারি মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক। নরহত্যা ব্যাপার ও অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়া থাকে। এ স্থানে একজন পুলিশের সাহেব ও ডিটেকটিভ পুলিশ থাকা একান্ত কর্তব্য। সর্বসাধারণকে বন্দুকের পাশ দেওয়া কর্তব্য নহে। মহকুমায় হাকিমদিগের বাসোপযোগী উপযুক্ত পাকাকোঠা বাঞ্ছনীয়, এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি থাকা প্রার্থনীয়।

পটুয়াখালির অধীনে কচুয়া নামক স্থানে চন্দ্রদ্বীপের পুরাতন রাজধানী ছিল। অদ্যাপি তাহার চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। কমলা নাম্নী রাজকন্যা কালাইয়া নদীর পাড়ে তিন দরুন তের কানি স্থান ব্যাপিয়া ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক দীঘি খনন করেন, উহার অংশ এখন বর্তমান আছে। পটুয়াখালির অধীন কালীসুরির মেলায় অতিশয় নির্দোষ আমোদপ্রমোদ উপভোগ করা যায়।

দক্ষিণ সাহাবাজপুর-ভোলা

দক্ষিণ সাহাবাজপুরকে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে সব ডিভিসন করা হয় ও মেহেন্দিগঞ্জের মুন্সেফী দৌলত খাঁয় পরিবর্তিত হয়। ১৮৭৬ অব্দের বন্যায় দৌলত খাঁয় প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইয়া সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায় ; ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ভোলায় সরকারি আফিসাদি সংস্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানটি বরিশাল সদর হইতে প্রায় ৪০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। দক্ষিণ সাহাবাজপুর একটি দ্বীপ। বরিশাল হইতে ভোলার ধার দিযা নোয়াখালি পর্যন্ত স্টিমার লাইন আছে। এই ডিভিশনের লোকসংখ্যা ২৫৮৪৫০ জন। অতি প্রাচীনকালে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে লবণের কারখানা ছিল। বহু সংখ্যক চোর, ডাকাইত ও ঠগ, কিন্তু বর্তমান সময়ে এই সম্বন্ধে ভোলা বাকরগঞ্জের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা উন্নত।

ভোলায় হাট, বাজার, রাস্তা, পুল, এন্ট্রান্স স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, জেল, আফিসাদির ঘর, পোস্টাফিস প্রভৃতি আছে। এই বিভাগে সর্ব প্রথমে সবডিভিসন স্থাপিত হয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, হাকিমগণের বাসোপযোগী পাকা গৃহাদি নাই, গভর্নমেন্টের অনুগ্রহ না হইলে দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ভোলার অন্তর্গত লালমোহন নামক স্থানে বড় বড় মহিষ, ব্যাঘ্র, হরিণ প্রভৃতি বাস করে।



সংযোজন

১



বর্তমান বাকরগঞ্জ জেলা

বর্তমানে বৃহত্তর বাকরগঞ্জ জেলায় মোট জেলা সংখ্যা ৫। সদর উত্তর ও সদর দক্ষিণ সহ নতুন তিনটি জেলা হল ভোলা, ঝালকাঠি এবং পিরোজপুর (১৯৮৪ সালে ঘোষিত)।

যে সব থানাকে উপ-জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয় :

১. গৌরনদী	২. বাকরগঞ্জ	৩. মঠবাড়িয়া
৪. চরফ্যাসন	৫. কাঁঠালিয়া	৬. বানরিপাড়া
৭. মুলাদি	৮. বাবুগঞ্জ	৯. তজুমুদ্দিন
১০. নলছিটি	১১. মেহেন্দিগঞ্জ	১২. লালমোহন
১৩. ভাণ্ডারিয়া	১৪. বোরহানউদ্দিন	১৫. নাজিরপুর
১৬. স্বরূপকাঠি	১৭. দৌলত খাঁ	১৮. কাউখালি
১৯. হিজলা	২০. উজিরপুর	২১. আগৈলঝড়া
২২. রাজাপুর	২৩. মনপুরা	২৪. বরিশাল সদর (কোতোয়ালি থানাসহ)
২৫. ঝালকাঠি	২৬. পিরোজপুর (ইঁদুরকানি থানা সহ)	২৭. ভোলা

গাঙ্গেয় বদ্বীপে অবস্থিত বাকরগঞ্জ জেলার উত্তরে ফরিদপুর জেলা, পূর্বদিকে মেঘনা নদী ও নোয়াখালি, পশ্চিমে বলেশ্বর নদী ও খুলনা জেলা এবং দক্ষিণে পটুয়াখালি জেলাও বঙ্গোপসাগর। মেঘনা নদী জেলাকে নোয়াখালি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। এখানকার মাটিতে ধানের ফলন ব্যাপক ও উৎকৃষ্ট মানের। তাছাড়া নারকেল এবং সুপারিও হয় পর্যাপ্ত। পাট, মরিচ, আখের ফলন যথেষ্ট। ৪২০০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট জেলায় আবহাওয়া মাঝামাঝি ধরনের। সাগরের কাছাকাছি হাওয়ায় লবণাক্ততা বেশি। একসময় এই জেলাকে বলা হত "বাংলার শস্যাগার" (Granary of Bengal)।

অবিভক্ত ভারত জুড়ে ছিল বাকরগঞ্জের বালাম চালের সুখ্যাতি। দেশভাগের পর, ভারতে বালাম চালের চাহিদা হ্রাস পায়। তাছাড়া এখানকার লবণ সরবরাহ হত অবিভক্ত বাংলার সর্বত্র। প্রচুর লবণের কারখানা ছিল। লবণের মানও ছিল উন্নত। মুঘল আমলে একাধিক নিমক মহলের উল্লেখ রয়েছে। সব থেকে বেশি লবণ পাওয়া যেত শাহবাজপুর, মনপুরা, সেলিমাবাদ পরগনা এবং লোহালিয়ায়। একসময় উৎকৃষ্ট মানের তাঁত বস্ত্র এবং নৌকাও তৈরি হত। শীতলপাটির খ্যাতি আজও অম্লান।

বাকরগঞ্জ জেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আগা বাখরের নাম। এই বাখর ছিলেন সেলিমাবাদ এবং বোজরগউমেদপুরের শাসক ও রাজস্ব আদায়কারী। তিনি ছিলেন ক্ষমতালিপ্সু। এই অঞ্চলের শাসনভার হাতে পাওয়ার পর একটি বাজার বা গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন বোজরগ উমেদপুরের

রত্নদ্বীপে। পরে সেই স্থানটির নাম হয় বাকরগঞ্জ। নবাব আলিবর্দি এবং নবাব সিরাজদৌলা ঢাকার শাসক করে পাঠান সুশাসক হোসেনউদ্দিনকে। ঢাকার মানুষের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন হোসেনউদ্দিন। কিন্তু আগা বাখর এবং তার ছেলে আগা সাদেকের চক্রান্তে নিহত হন হোসেনউদ্দিন। কিন্তু এই ঘটনায় ঢাকার ক্রুদ্ধ মানুষের হাতে নিহত হয়েছিলেন আগা বাখর। কেউ কেউ বলেন তার ছেলেও মারা গিয়েছিল সে সময়।

বাখর সম্পর্কে যে সব তথ্য মেলে, তার থেকে তাকে পরিচ্ছন্ন চরিত্রের মানুষ হিসাবে উপস্থিত করা কঠিন। মুঘল আমলে এইসব এলাকায় নিমক মহল নামে যে সব সম্পত্তি ছিল তার থেকে বিপুল পরিমাণ কর আদায় হত। বাখর এই নিমক মহলের কর বৃদ্ধি করায় রাজস্ব পরিমাণ বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া জমির কর বৃদ্ধি, জমি দখল করে নিজের অনুগতদের মধ্যে বিতরণের ফলে প্রজাদের অসন্তোষের পাত্র হয়ে ওঠেন। বোজরগউমেদপুর জঙ্গল আবাদ করে বসতি গড়ে তুলেছিলেন দয়াল চৌধুরী। আগা বাখর এবং তার পুত্র আগা সাদেক তাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। দয়াল চৌধুরীর পরিবার ধ্বংস হয়ে গেলেও, তাদের ঘরবাড়ি, দীঘির স্মৃতিচিহ্ন বহুকাল টিকে ছিল।

আগা বাখর এবং আগা সাদেকের মৃত্যুর পর ইদিলপুর পরগনা সহ সমস্ত মহল রাজা রাজবল্লভের করায়ত্ত হয়। এই অত্যাচারী জমিদার প্রজাদের ওপর দমনপীড়ন চালাতে পর্তুগীজ পাইক নিয়োগ করতেন। রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভ শাসন কেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে যান নলছিটিতে। কিন্তু নবাব মীরকাশেমের আদেশে ইংরেজ সুহৃদ রাজবল্লভ এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়।

সমগ্র জেলা বারবার পরিত্যক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং মগদেব অত্যাচারে। পরিত্যক্ত জনবসতি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে গেছে। গেই জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে ওঠে প্রথম যুগে। সেকারণে কাটি শব্দটি বহু গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মতই। সেরকম কাটিযুক্ত কয়েকটি গ্রাম হল : শিয়ালকাটি, কলসকাটি, মধুরকাটি, সমুদয়কাটি, ঝালকাটি, বরষাকাটি, রাজকাটি, ভরতকাটি, শ্রীবামকাটি, চাঁদকাটি, স্বরূপকাটি, সুতিয়াকাটি, দেবরকাটি, যাদবকাটি, কুলকাটি, কানাইদাসকাটি, ব্রাহ্মণকাটি, কচুয়াকাটি, ভীমকাটি, সিদ্ধকাটি, জেন্দোকাটি, ঘাঘরকাটি প্রভৃতি।

জেলায় বেশ কিছু পুরনো দিঘি আছে। এইসব দিঘি খননের ঐতিহাসিক কারণও আছে। দক্ষিণ বঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলের জল ছিল লবণাক্ত। বসতি গড়ে ওঠার কালে এইসব দীঘি খনন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেইসব দীঘির বেশ কিছু আছে এখনও। বরিশাল শহরের পরেশ সাগর, বিবির সাগর, কচুয়ার কমলা সাগর, মাধবপাশার রামসাগর, সুখসাগর ও দুর্গাসাগর এসব তো আজও ইতিহাস হয়ে আছে। অন্যান্য কয়েকটি দিঘি হল : সীতারাম বসুর দিঘি. ফুলমণির দিঘি, কন্দর্পনারায়ণের দিঘি, গজনীর দিঘি, কবিরাজের দিঘি, আদ্ধি, দোলাইরাজা, কাউলাদি প্রভৃতি।

মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ, বিহার, ওড়িষার দেওয়ানি লাভ করে ১৭৬৫ সালে। সে সময়ে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জ জেলা ছিল ঢাকা-জালালপুর রাজস্ব বিভাগে। বাকরগঞ্জ ছিল ঢাকার অংশ। তখন নলছিটি থানার বারইকরণে ছিল প্রশাসনিক দপ্তর। ১৭৮৪ সালে সুন্দরবনের জন্য কমিশনার নিযুক্ত হলে তার দপ্তরও বারইকরণে স্থাপিত হয়। ১৭৯২ সালে বরইকবণ থেকে বাকরগঞ্জে সদর দপ্তর উঠিয়ে আনেন কমিশনার মিডলটন। সে সময়ে দুষ্কৃতি দমন ছাড়া বিচারকেব ক্ষমতা ছিল না। ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন ৯-এ তাকে দেওয়া হয় সেই ক্ষমতা। তাছাড়া এই রেগুলেশন অনুসারে ঢাকা কোর্ট অফ সার্কিটের একটি স্টেশন হিসাবে উল্লেখ কবা হয়। কমিশনারের দপ্তর উঠিয়ে দেওয়া হয় ১৭৯৭ সালে। তখন ঢাকা-জালালপুর বিভাগকে দুটি ভাগ করা হয় : উত্তরাংশ ঢাকা-জালালপুর (ফরিদপুর) এবং

বাকরগঞ্জ। বাকরগঞ্জ ম্যাজিস্ট্রেট শাসিত স্বতন্ত্র জেলার স্বীকৃতি পায়। অবশ্য আগেই ১৭৯০ সালে একটি আইনে সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা আসে বাকরগঞ্জ কমিশনারের অধীনে। উদ্দেশ্য ছিল বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন। যে কারণে, কমিশনার পান ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা। অবশ্য দেওয়ানি বিচারের ক্ষমতা তার ছিল না।

জেলা সীমানার পুনর্বিন্যাস হয় ১৮০৬ সালে। যশোহর জেলা এবং বাকরগঞ্জের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত হয় বলেশ্বর নদী, ঝিনঝিনিয়া খাল ও গোপালগঞ্জ-মকসেদপুর সড়ক। তাছাড়া ঢাকা-জামালপুর থেকে গৌরনদী থানাকে বিভক্ত করে যুক্ত করা হয় বাকরগঞ্জের সঙ্গে। হাতিয়া দ্বীপের কিছু অংশ বাকরগঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন করে চট্টগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ১৮১১ সালে। ১৮১৬ সালে ঢাকা জেলার ইদিলপুর পরগনা আসে বাকবগঞ্জ জেলায়। তাছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের জন্য একজন স্বতন্ত্র কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। পরেব বছর ১৮১৭ সালে একজন স্বতন্ত্র কালেক্টর নিযুক্ত করার পরই বাকরগঞ্জ পরিণত হয একটি পূর্ণাঙ্গ জেলায়। এই পূর্ণাঙ্গ জেলায় তখনও অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান খুলনার কিছু অংশ এবং ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমা। ১৮২২ সালে ভোলা দ্বীপকে বাকরগঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নোয়াখালি জেলাভুক্ত করা হলেও ১৮৬৯ সালে আবার ভোলা দ্বীপকে বাকরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার আগে, ১৮৬১ সালে খুলনা জেলার যে অংশ বাকরগঞ্জ জেলাভুক্ত ছিল, তাকে নিয়ে যাওয়া হয় যশোর জেলায়। কিন্তু আগেই বলেশ্বর নদী রেখা পরিবর্তিত হওয়ায় জেলা সীমানা হিসাবে নদীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনবসতি এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ায়, মহকুমাগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হওয়ায়, ১৮৬৯ সালে সেইমত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হয়। ১৮৭৩ সালে মাদারিপুর মহকুমা ফরিদপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। জেলার সীমানা সরকারিভাবে স্থিরিকৃত হয ১৮৭৪ সালে। পরবর্তী পুনর্বিন্যাস হয় ১৯১২ সালে। জেলার উত্তরের কিছু অংশ ফরিদপুর জেলায় এবং পূর্বের কিছু অংশ নোয়াখালি জেলায যুক্ত হয়। তারপর দীর্ঘদিন জেলার সীমানা যথারীতি বজায় ছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি বাকরগঞ্জ থেকে পটুয়াখালি মহকুমা এবং পিরোজপুর মহকুমার বামনা ও পাথরঘাটা থানাকে বিচ্ছিন্ন করে গঠিত হয় পটুয়াখালি জেলা।

"...১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই জেলার সদর দফতর বাকরগঞ্জে অবস্থিত ছিল। শ্রীমন্তপুর খালের তীরে অবস্থিত উক্ত বাকরগঞ্জ বর্তমান বাকরগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত। এই স্থানটি পর্তুগীজ অধ্যুষিত পাদ্রী শিবপুর ও গোলাবাড়ির নিকটে ছিল। সেখানে বুজরগ উমেদপুরের তহশীলদারের কাছারি ছিল। এই স্থানটি অস্বাস্থ্যকর ছিল। তাছাড়া কাছারির সামনে চর পড়ে যাওয়ায় আরও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তবে এখানে একটি বড় বাজার ছিল। তাছাড়া, জেলা কারাগারও এখানে একটি খালের তীরে অবস্থিত ছিল। জেলখানার নাম অনুসারে এই খালটির নামকরণ করা হয়েছিল জেলখানা খাল। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর হেতু সদর দফতর অন্যত্র স্থানান্তরের জন্য অনেক লেখালেখি হয়। মিঃ মিডলটন জেলার সদর দফতর মোহনগঞ্জে স্থানান্তরের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু পরিশেষে বর্তমান বরিশালেই জেলার সদর দফতর স্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে জেলার সদর দফতর বরিশালে স্থানান্তরিত হয়।" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ. ২৫৪)

১৮০০ সালে বাকরগঞ্জ জেলায় পুলিস সার্কেল বা থানা ছিল ১০টি। সেগুলি হল :

১. বাউফল
২. খেলাখালি বা কাউখালি
৩. আঙ্গারিয়া
৪. তুগরা
৫. চান্দিও বা সন্দ্বীপ
৬. বোকাইনগর
৭. নলচিরা
৮. কচুয়া
৯. খলসাখালি (বর্তমানে বরগুণা জেলায়)
১০. বারইকরণ

১৮০৬ সালে বাকরগঞ্জ জেলাভুক্ত করা হয়-শাহবাজপুর দ্বীপপুঞ্জ (ভোলা মহকুমা), হাতিয়া (বর্তমান নোয়াখালি অন্তর্ভুক্ত), কচুয়া থানা (বাগেরহাট জেলাভুক্ত) এবং ফরিদপুর জেলার পূর্বাংশ সহ গৌরনদী থানা। ঢাকা থেকে ইদিলপুর পরগনা বিচ্ছিন্ন করে বাকরগঞ্জের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ১৮১১ সালে। ১৮২২ সালে দাক্ষিণ শাহবাজপুর (বর্তমান ভোলা) এবং হাতিয়ার দ্বীপগুলিকে নোয়াখালির অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, এসব এলাকা বাকরগঞ্জ জজের অধীনেই থেকে যায়। এরপর পরিবর্তন সূচিত হয় অনেক পরে। ১৮৬১ সালে জেলার পশ্চিম সীমানা হিসাবে স্থিরিকৃত হয় মধুমতী-বলেশ্বর-হরিণঘাটা নদী। তাছাড়া কচুয়া পুলিশ সার্কেল চলে যায় যশোহর জেলায়। দক্ষিণ শাহবাজপুর এবং পাশের বালিয়ারি (চর) ও মনপুরা দ্বীপপুঞ্জ বাকরগঞ্জ জেলার অধীন হয়। কিন্তু ১৮৭৩ সালে মাদারিপুর মহকুমা, পালং এবং কোটালিপাড়া থানাগুলিকে বাকরগঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফরিদপুর জেলাভুক্ত করা হয়েছিল প্রশাসনিক কাজে সুবিধার জন্য।

বরিশালে সদর মহকুমা গঠিত হয় ১৮০১ সালে। সদর মহকুমায় ১৮৭০-৭১ সালে ৮টি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও রাজস্ব আদালত ছিল। তখন সদর মহকুমার পুলিশ সার্কেল ছিল ৫টি : বরিশাল, নলছিটি, বাকরগঞ্জ, ঝালকাঠি এবং মেহেন্দিগঞ্জ। ১৮৭৫ সালে জেলার ৫টি মহকুমা ছিল : সদর, দক্ষিণ শাহবাজপুর, মাদারিপুর, পিরোজপুর ও পুটিয়াখালি।

১৯১৫ সালে সদর উত্তর মহকুমার থানাগুলি ছিল :

১. গৌরনদী
২. বাবুগঞ্জ
৩. উজিরপুর
৪. মেহেন্দিগঞ্জ
৫. মূলাদি
৬. হিজলা

১৯৭৪ সালে সদর উত্তর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) থানাগুলি হল :

১. গৌরনদী
২. মুলাদি
৩. মেহন্দিগঞ্জ
৪. হিজলা

১৯১৫ সালে সদর দক্ষিণ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) থানাগুলি ছিল :

১. কোতোয়ালি
২. বাকরগঞ্জ
৩. ঝালকাঠি
৪. নলছিটি
৫. বাজাপুর

১৯৭৪ সালে সদর দক্ষিণ মহকুমা (বর্তমানে জেলা) থানাগুলি হল :

১. উজিরপুর
২. বাবুগঞ্জ
৩. কোতোয়ালি
৪. বাকরগঞ্জ

১৯১৫ সালে ভোলা মহকুমার থানাগুলি ছিল :

১. ভোলা
২. দৌলত খাঁ
৩. বোরহানউদ্দিন
৪. তজুমুদ্দিন

১৯৭৪ সালে ভোলা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) থানাগুলি হল :

১. ভোলা
২. বোরহানউদ্দিন
৩. লালমোহন
৪. চরফ্যাসন
৫. মনপুরা
৬. তজুমুদ্দিন
৭. দৌলত খাঁ

বাকরগঞ্জ জেলা গঠনের সূচনা কাল থেকেই ভোলা (দক্ষিণ শাহবাজপুর) স্বতন্ত্র মহকুমা হিসাবে স্বীকৃত হলেও, পিরোজপুর মহকুমা গঠিত হয় ১৮৫৯ সালের ২৪ অক্টোবর। তখন ছিল ৩টি পুলিশ সার্কেল বা থানা : ১. কেয়ারি, ২. পিরোজপুর এবং ৩. মঠবাড়িয়া।

১৯১৫ সালে পিরোজপুর মহকুমার থানাগুলি হল :

১. পিরোজপুর
২. কাউখালি
৩. নাজিরপুর
৪. স্বরূপকাঠি
৫. বানারিপাড়া
৬. পাথরঘাটা
৭. মঠবাড়িয়া
৮. বামনা
৯. ভাণ্ডারিয়া
১০. কাঠালিয়া

১৯৭৪ সালে পিরোজপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) থানাগুলি হল :

১. নাজিরপুর
২. বানারিপাড়া
৩. স্বরূপকাঠি
৪. কাউখালি
৫. পিরোজপুর
৬. ভাণ্ডারিয়া
৭. মঠবাড়িয়া

পটুয়াখালি দীর্ঘকাল ছিল বাকরগঞ্জ জেলার একটি মহকুমা। ১৮৬৭ সালের ২৭ মার্চ গঠিত এই মহকুমাকে বলা হত পটুয়াখালি বা লাউকাঠি। ১৯১৫ সালে এই মহকুমার (বর্তমানে জেলা) থানাগুলি ছিল :

১. বাউফল
২. গলাচিপা
৩. বরগুণা
৪. বেতাগি
৫. আমতলী
৬. মির্জাগঞ্জ
৭. কলাপাড়া

১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি সম্পূর্ণ পটুয়াখালিসহ পিরোজপুর মহকুমার বামনা ও পাথরঘাটা থানা নিয়ে গঠিত হয়েছে স্বতন্ত্র জেলা।

ঝালকাঠি মহকুমা গঠিত হয় ১৯৭১ সালে। তখন এই মহকুমার থানাগুলি ছিল :

১. ঝালকাঠি
২. রাজপুর
৩. নলছিটি
৪. কাঠালিয়া

কচা নদীর ডাকাত দমনের জন্য ১৮৫৪ সালে মাদারিপুরে একটি মহকুমা গঠিত হয়। ১৮৭০ সালে এই মহকুমায় পুলিশ সার্কেল ছিল : ১. গৌরনদী, ২. কোটালিপাড়া, ৩. মাদারিপুর এবং ৪. মূলফতগঞ্জ।

জেলার পুলিশ সার্কেল ও পুলিশ স্টেশনের আয়তন ও জনসংখ্যা : ১৯৮১*

মহকুমা	পুলিশ সার্কেল	পুলিশ স্টেশন	আয়তন বর্গ মাইল	জনসংখ্যা
সদর (দক্ষিণ)	সদর 'ক' সার্কেল	১. কোতোয়ালি	১১৩	৩,৫০,৩৩৭
		২. বাকরগঞ্জ	১৫৬	৩,১২,৪৬৮
		৩. বাবুগঞ্জ	৫৭	১,২৬,০৩৯
		৪. উজিরপুর	৯৫	২,১১,৭০৯
সদর (উত্তর)	সদর 'খ' সার্কেল	৫. গৌরনদী	১১৬	২,৯৭,৬৭০
		৬. আগৈলঝাড়া	—	—
		৭. হিজলা	১১৭	১.৫৫,৯২০
		৮. মেহেন্দিগঞ্জ	১৩৫	২,৪১,২৮৭
		৯. মুলাদি	১০১	১,৩১,০১৫

* বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪

মহকুমা	পুলিশ সার্কেল	পুলিশ স্টেশন	আয়তন বর্গ মাইল	জনসংখ্যা
ঝালকঠি	ঝালকাঠি	১০. ঝালকাঠি	৭৫	১,৮০,৪০৫
	'গ' সার্কেল	১১. নলছিটি	৯০	১,৭৯,৮১৫
		১২. রাজাপুর	৬৩	১,২২,৪০০
		১৩. কাঠালিয়া	৬১	৮৯,৬৮২
ভোলা	ভোলা সার্কেল	১৪. ভোলা	১৬৬	২,৮৮,০৭২
		১৫. বোরহানউদ্দিন	১২৫	২,০২,৪৭৫
		১৬. দৌলত খাঁ	১১৬	১,৩৯,৪৮৪
		১৭. লালমোহন	২৯১	১,৯৩,৫২২
		১৮. চরফ্যাসন	১৯০	১,৯৭,৫৯৫
		১৯. তজুমুদ্দিন	১২৯	৪৫,৩৫৮
		২০. মনপুরা	৮৯	৩৩,৩৭২
পিরোজপুর	পিরোজপুর	২১. বানারিপাড়া	৫০	১,২৮,৫৭৮
	সার্কেল	২২. কাউখালি	৩১	৬৭,৩৫৪
		২৩. নজিরপুর	৮৭	১,৫৪,৪০৭
		২৪. পিরোজপুর	১০২	১,৬৪,৯৮৪
[১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ ইন্দুরকানি		২৫. স্বরূপকাঠি	৭১	১,৮৮,৯৯০
থানাকে পিরোজপুর থানার সঙ্গে		২৬. ভাণ্ডারিয়া	৬৩	১,৩০,৪৯৪
মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।]		২৭. মঠবাড়িয়া	১৩৮	২,২০,৮৯৩
		২৮. ইন্দুরকানি	—	৩৪,৩১৬

হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে বাকরগঞ্জ জেলায় জমিতে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত ছিল। সেই জমি মালিক

ছয়ভাগের একভাগ রাজস্ব দিতে হলেও, জরুরী অবস্থায় দিতে হত তিনভাগের একভাগ অথবা চারভাগের একভাগ। শস্যের মাধ্যমে রাজস্ব দিতে হলেও সেন আমলে নগদ টাকায় রাজস্ব দেওয়ার প্রথা চালু হয়ে যায়। এই ব্যবস্থাই বজায় ছিল তুর্কী আমলে। অবশ্য তখন ভূমি রাজস্বের পরিমাণ হয় তিন ভাগের একভাগ অথবা দুভাগের একভাগ। জমির মালিকানা স্বত্ব হিন্দু আমলের মতই থেকে যায়। পাঠান সুলতান শেরশাহের আমলে (১৫৩৯-১৫৪৫ খ্রিঃ) প্রথম সরকারি খাসজমি জরিপের কাজ শুরু হলেও, জায়গীর দেওয়া জমি জরিপ হয় নি। এই সময়ে রাজস্ব দেওয়ার পদ্ধতি সেই উৎপন্ন শস্যের অংশ দেওয়া চালু থাকলেও, সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা জমিতে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, বংশানুক্রমে ভোগদখল, বিক্রি বা বন্ধক দেওয়ার অধিকার লাভ। মুঘল সম্রাট আকবরের সময় (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ) ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ঘটে। গোটা বাংলা ১৯টি সরকার এবং ৬৮২টি পরগনায় ভাগ হওয়ার ফলে বাকরগঞ্জ জেলা তিনটি সরকারের অধীন হয়। জেলার পশ্চিমাংশ খলিফাতাবাদ সরকার, মাঝের অংশ বাকলা সরকার এবং ফতেহাবাদ সরকারের অধীন ছিল। এই টোডরমলীয় ভূমিব্যবস্থায় বিভিন্ন পরগনার যে রাজস্ব পরিমাণ নির্ধারিত হয়, তার মধ্যে বাকরগঞ্জভুক্ত পরগনাগুলির রাজস্ব পরিমাণ ছিল ঃ

খালিফাতাবাদ সরকার

পরগনার নাম	
সেলিমাবাদ :	৪,২১২ টাকা

বাকলা সরকার
(পরে চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত)

ইসমাইলপুর	১,০৮,৬৯৯ টাকা
শ্রীরামপুর	৬,৩০০ টাকা
ইদিলপুর	৩৮,৮৩৬ টাকা

ফতেহাবাদ সরকার

শাহবাজপুর	১৮,৩০৪ টাকা
মোট	১,৭৬,৩৫১ টাকা

দ্বিতীয়বার ভূমি বন্দোবস্ত হয় শাহজাদা সুজার আমলে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিঃ)। সরকার সংখ্যা ১৯ থেকে হয় ৩৪। পরগনার সংখ্যাও বেড়ে যায় নতুন ব্যবস্থায়। এ সময়ে সুন্দরবনের কিছু অংশ নিয়ে যে নতুন রাজস্ব এলাকা গঠন করা হয়, তার নাম হয় সরকার মুরাদখানা বা জিরাদখানা। এই সরকারের সঙ্গে ছিল আরও দুটি পরগনা—একলী এবং বুনজা। সে সময়ে রাজস্ব পরিমাণ ছিল ৮,৪৫৪ টাকা। আগের ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে (১৭০৩-১৭২৬ খ্রিঃ)। নতুন ব্যবস্থায় বাংলাকে ১৩টি চাকলা এবং ১৬৬০টি পবগনায় বিভক্ত করা হয়েছিল। তখন বাকরগঞ্জ জেলার পরগনাগুলি ছিল জাহাঙ্গীরনগর চাকলার অধীনে।

সুজাউদ্দিন খানের আমলে (১৭২৭-১৭৩৯) বাকরগঞ্জের বিভিন্ন পরগনার রাজস্ব পরিমাণ
জাহাঙ্গীরনগর চাকলা

ফতেহাবাদ সরকার

পরগনা	খালসা রাজস্ব টাকা
উত্তর শাহবাজপুর	৭,০৩০
দক্ষিণ শাহবাজপুর	৩,৪৩২
সেলিমাবাদ	৪৩,১৬৬

সোনারগাঁও সরকার

রসুলপুর	১৬,৯৭৪
কাশিমপুর সেলাপতি	৮,৫০০

বাকলা সরকার

ইদ্রাকপুর	১০,৮০৭
ইদিলপুর	৪৭,৭০৪
বীর শেহন	৫,২৮৮
বাঙরোরা	১১,০৪৪
চন্দ্রদ্বীপ	৬,৬০৮
জাহাপুর	৬৭১
মাইজারদী	৬,২৫৭

নাজিরপুর	২,২৩৯
রামনগর	১,০৯৫
শ্রীরামপুর	৮,৬০৫
সুলতানাবাদ	৬৩৩
শায়েস্তানগর	৩,৯৫৬
বাজুহা সরকার	
বজরগউমেদপুর	৪,৬৪৭
খানজা বাহাদুরনগর	৯
জাফরাবাদ	৪০
রাফিয়ানগর	১২৫
শায়েস্তাবাদ	৭২৬
জিরাদখানা সরকার	
একল (চারণভূমি)	৬,৪৪৪
বুনজা (কাঠের গুঁড়ি)	২,৩৩২
মোট	১,৯৩,৫১২

এইসময় থেকে ১৭৬৫ খ্রিঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের কালসীমার মধ্যে ভূমি ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে যায়। নতুন কর ধার্য হয়—যাকে বলা হয় আবওয়াব। এ ছিল অতিরিক্ত কর—এজন্য কোনরকম জরিপ বা হিসাব-নিকাশ দেখা হত না। অন্যায়ভাবে আদায় করা এই কর কৃষকরা দিতে বাধ্য হত। মুর্শিদকুলি-খাঁই প্রথম আবওয়াব ধার্য করেন। মজার ঘটনা, এই আবওয়াব থেকে প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হত না। আবওয়াব ছিল তিন রকমের :

১. খাসনোবিসী
২. কৈফিয়ৎ (নির্ধারিত কর আদায়ের পর এটা ছিল বাড়তি কর)
৩. তৌফির (গোপন করা রাজস্ব উদ্ধার)

—আবওয়াব ধার্য করার ফলে মীরকাশেম আলি খানের আমলে (১৭৬০-১৭৬৩) ১৭২২ সালের নির্ধারিত রাজস্বপরিমাণ ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা থেকে বেড়ে হয় ২,৫৬,২৪,২২৩ টাকা। সে সময়ে বাকরগঞ্জের জমিদারিগুলি সম্পর্কে জানা যায় :

পরগনার নাম	জমিদারির সংখ্যা	মহল সংখ্যা	১৭২৮ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব				১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব
			খালসা	জায়গীর	মোট	১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের আবওয়াব সহ রাজস্ব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
			টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
চন্দ্রদ্বীপ	১	২২	১,১৭০	৫৮,৫৮১	৫৯,৭৩১	৬৮,০০০	৭৩,৪৯৬
ইদিলপুর	৩	৮	২,৮১৬	৪৪,১৯৯	৪৭,০১৫	১,০৬,২৭০	১,০৬,২৭০
বোজরগ উমেদপুর	১	৮	৩,২২৭	২,৭০৮	৫,৯৩১	২,০১,২৭৪	২,০১,২৭৪
সেলিমাবাদ	৪	২	২,৬৯৪	১০,৮৮৬	১,৩৫৪	৪০,১৯০	৫৮,৫১১
রতনদি কালিকাপুর	১	১	১,৩৩৯	৪৩৭	১,৭৭৭	১৮,৬৪৩	১৯,৬১৯

পরগনার নাম	জমিদারির সংখ্যা	মহল সংখ্যা	১৭২৮ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব				১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব
			খালসা	জায়গীর	মোট	১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের আবওয়াব সহ রাজস্ব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
			টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
রসুলপুর (কার্তিকপুরসহ)	৪	৪	১৫,৩৫৬	১৪,৩৬৪	২৯,৭২০	৫০,৩৮৭	৫৬,১৩২
ইদ্রাকপুর এবং শায়েস্তানগর	২	২	২,০০১	৪,৮১৮	৬,৮১০	২৩,১৭৩	২৩,১৭৩
রামনগর	১	৩	১,৫৭৮	৪৯২	২,০১০	১৩,৯৫২	১৩,৯৫২
দক্ষিণ শাহবাজপুর এবং শ্রীরামপুর	৩	৩	১৬,০১৩	৭,১৬৬	২৩,১৯৯	৭৮,১৬৪	৭৯,৪৮৯
উত্তর শাহবাজপুর	৩	১	৯৩	৪,৯০১	৪,৯৯৪	১৩,৭৭৭	১৫,৪৯৯
নাজিরপুর	১	২	৮,১৭৬	১,২৪৭	৯,৪২৪	৩৭,৩১১	৩৭,৩১১
সুলতানাবাদ	১	১	৭৭৭	১০২	৮৮০	১৭,১৬৮	১৯,৮৫৬
হাবেলি সেলিমাবাদ	১	১	৩৭৩	২৫২	৬২৫	১১,০৯৬	১১,০৯৬
আজিমপুর	১	১	৯৫২	৩,৪৬০	৪,৪১২	১০,১৭১	১০,১৭১
মোট	২৭	৫২	৫৬,৫০৫	১,৫৫,৬০৯	২,৯০,১১১	৬,৯০,০৭৬	৭,২৫,৮৫০

দেখা যাচ্ছে, ১৭২৮ সালে রাজস্বের যে পরিমাণ ছিল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সময় সেই রাজস্বের পরিমাণ প্রায় চারগুণ বেড়ে। ১৭৬৯ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ব্যবস্থাতেই কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহ করতে থাকে। এ বছরই প্রথম কিছু য়ুরোপীযকে তদারকির দায়িত্বে আনা হলেও, কার্যক্ষেত্রে তারা ছিল অসফল। তাছাড়া ১৭৬৯-৭০ সালের মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষে বাংলার লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যুর পর কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্‌স নায়েব নিজাম মহম্মদ রেজা খানকে উৎপীড়ন ও তহবিল তছরূপের অভিযোগে পদচ্যুত করে। এবার য়ুরোপীয় কর্মীরাই জেলাগুলির কালেকটরের পদ লাভ করে। তারপর গঠিত হয় 'কমিটি অফ সার্কিট'। ১৭৭২-৭৭ সালে নিলাম ডাকের মাধ্যমে যে পাঁচশালা ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে, তা ছিল চরম ব্যর্থ। নিলামে চড়া দরে জমিদারি কিনে সে সময়ের পুরনো ও নতুন জমিদাররা প্রজাদের সর্বস্ব অপহরণ করে। বহু কৃষক ও প্রজা অত্যাচার এড়াতে অন্যত্র চলে যায়। ১৯৭৩-৭৬ সালে বাকি পড়া রাজস্ব পরিমাণও কম ছিল না। আতঙ্কিত হয়ে বোর্ড অব ডাইরেক্টর্‌স পাঁচশালা রদ করে এক বছরের বন্দোবস্তের সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা কার্যকরীও করা হয়। ১৭৯০ সালে দশশালা প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বজায় ছিল। এই দশশালাই পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রূপ নেয় ১৭৯৩ সালে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাকরগঞ্জের কৃষিজীবীদের জীবনে কিছুটা স্থিরতা ফিরে আসে। জেলার সম্পূর্ণ অংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বাকি ছিল সুন্দরবন অংশ। কিন্তু এই সুন্দরবন এলাকায় জঙ্গল হাসিল ও চাষাবাদ শুরুর পর জরিপ চালিয়ে যেমন তার রাজস্ব নির্ধারিত হয়, তেমনি নবগঠিত বেশ কিছু চর এলাকার রাজস্ব নির্ধারিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমগ্র বাংলার কৃষক সমাজকে ভিখারি পরিণত করেছিল। যে কারণে, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে ফ্লাউড কমিশন সুপারিশ করে ১৯৪০ সালে। কিন্তু যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ-নানাবিধ কারণে জমিদারি

উচ্ছেদে সরকারি উদ্যোগে ঘাটতি ছিল। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলা দেশ) জমিদারি উচ্ছেদ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। কিন্তু আইন কার্যকরী করার পক্ষে বিস্তর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায়, ১৯৫৮ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠন করেন। কমিশন এক বছরের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করে। সমগ্র জেলাকে ১০১টি রাজস্ব সার্কেলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সার্কেলের দায়িত্ব একজন সার্কেল অফিসারের ওপর বর্তায়। বাকরগঞ্জে জমিদারি প্রথা বিলোপের পর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল মোট ২,৭০,১১,৩৩৪ টাকা। এর মধ্যে নগদ টাকা ছিল ১,৯০,৪২,৫৮১ টাকা এবং ১৯,১৫,০০০ টাকা দেওয়া হয় বন্ডে। বিভিন্ন ধরনের মধ্য স্বত্বাধিকারীর সংখ্যা ছিল ২,২২,৯৫৭ জন। বাংলাদেশে স্বাধীন গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র সরকার গঠনের পর ছোট ছোট ভূস্বামী এবং প্রজাদের খাজনা দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। প্রতি পরিবারের জন্য সর্বোচ্চ জমি পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে ১০০ বিঘা।

নদনদী

"...আঠার শতকে গঙ্গা নদী মোটামুটিভাবে বর্তমান আড়িয়াল খাঁর পথে প্রবাহিত হত এবং ব্রহ্মপুত্র নদ সিলেট জেলায় মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। মেজর রেনেলের ম্যাপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই স্রোতের পশ্চিম তীরে বিক্রমপুর থেকে মেহেন্দিগঞ্জ এবং মেহেন্দিগঞ্জ থেকে ভোলা পর্যন্ত এক অখণ্ড ভূমি ছিল। এ ভূমি খণ্ডের অপর পাশ দিয়ে গঙ্গা নদী কিছুটা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হত। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের দিকে পশ্চিমদিকে বাঁক নিয়ে এই ভূখণ্ডকে ছেদ করে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়েছিল। এই মোড় পরিবর্তনের সঙ্গে নদীর ভাঙা-গড়া অত্যন্ত বেশি হয়েছিল। এর ফলে ভোলার একটি বিরাট অংশ ভেঙে গিয়েছিল। অপরপক্ষে নোয়াখালির সমুদ্র উপকূলে বহু মাইল বিস্তৃত নতুন এলাকা গড়ে ওঠে। আরও দক্ষিণে বাকরগঞ্জের উপকূল ভেঙে নদীর পূর্বদিকে দ্রুতগতিতে সারি সারি দ্বীপমালার সৃষ্টি হয়। ১৭৭০ সালে যখন মেজর রেনেলের জরিপের কাজ চলছিল তখন নদীর ভাঙনের কাজ শেষ হয়ে ভূমি গঠনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। সম্ভবত ১৭৮৭ সালে তিস্তা নদীর ঐতিহাসিক বন্যার ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ গতি পরিবর্তন করে গোয়ালন্দের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। গঙ্গা নদীও আড়িয়াল খাঁর বাঁক থেকে সরে গিয়ে পরিশেষে ১৮৭০ সালে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিলিত হয়। মোহানা সন্নিহিত এলাকায় এই পরিবর্তন খুবই ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়েছিল। এখনও প্রচুর জল গঙ্গার পুরাতন খাত বেয়ে নিচে নেমে আসে। এই পরিবর্তন সমূহের প্রভাবে মূল স্রোতোধারা পুনরায় পূর্ব দিকে মোড় নিয়েছে। ফলে পশ্চিমে ইলশা নদীতে চর পড়তে শুরু করেছে। সে সময়ে পশ্চিম দিকের দ্বীপমালার সঙ্গে ভোলার সংযুক্তি ঘটে। অন্যদিকে এই ভূমিখণ্ডের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে দ্রুতগতিতে পলি পড়ে ভূমি গঠিত হয়।" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ. ৯-১০)

—বাকরগঞ্জ জেলার ভূ-অবস্থান, ভূ-গঠন এবং নদী রেখার পর্যালোচনার সময়ে ওপরের উদ্ধৃত মন্তব্যটিকে মনে রাখা দরকার। জেলার বহু প্রাচীন নদী, দ্বীপ হারিয়ে গেছে কালপ্রবাহে। নতুন নতুন নদীরেখা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন দ্বীপ। জেলায় এখন মেঘনা ছাড়াও বড় নদীর সংখ্যা আট। নদীগুলি হল টিরকি বা পলারদি, আড়িয়াল খাঁ, বলেশ্বর, মধুমতী, তেঁতুলিয়া, সফিপুর, নয়াভাঙানি, গৌর নদী, বিশখালি, বিঘাই বা বুড়িশ্বর এবং লোহালিয়া। তাছাড়াও আছে অসংখ্য ছোটনদী।

বিভারিজের গেজেটিয়ারে বাকরগঞ্জের নদী সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ আছে। যে সব নদীর তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

১. মেঘনা,
২. আড়িয়াল খাঁ,

৩. বলেশ্বর,
৪. বরিশাল নদী—পশ্চিম দিকে নলচিতি এবং ঝালকাঠির মাধ্যমে প্রবাহিত। তারপর জলরেখার একটি শাখা দানসিদ্ধি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাউখালি এবং কচা নদীতে মিশেছে। অপর জলশাখা মিশেছে বিশখালি নদীতে। বরিশালের তিন মাইল দক্ষিণে বরিশালের একটি শাখা খৈরাবাদ নদী নামে রানীহাট এবং বাকরগঞ্জের দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।
৫. বাকরগঞ্জ থানার পুব দিকে প্রবাহিত নদী পাণ্ডব।
৬. বাকরগঞ্জ এবং বাউফলে প্রবাহিত নদীর নাম কারখানা।
৭. বাউফল থানাব ৬৩... লিয়া নদী।
৮. খৈরাবাদ নদী।
৯. বাকরগঞ্জ ও পটুয়াখালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত লোহালিয়া নদী। এই নদীর নিম্নাংশের নাম গলাচিপা। এটি গলাচিপা বাজার ও থানার পাশ দিয়ে প্রবাহিত।
১০. বিশখালি একটি বড় নদী। নিয়ামতি এবং কালামেঘ পেরিয়ে পুবদিকে বলেশ্বর এবং হরিণঘাটা সমান্তবালে প্রবাহিত।
১১. বিঘাইনদী জেলার সব থেকে চওড়া নদী—মিরজাগঞ্জ এবং গুলসাখালি দিয়ে প্রবাহিত।
১২. গুলসাখালি থানার মধ্য দিয়ে গেছে বৃহৎ ও প্রশস্ত নদী আঁধারমাণিক।
১৩. বিঘাই-এর একটি প্রবাহ বরিষহর নামে পরিচিত।
১৪. কালীগঙ্গা এবং কাউখালি নদীর স্রোতে গঠিত কাচানদীর উৎস হল কোটালিপাড়া ও স্বরূপকাঠি থানার জলাভূমি। নদীটি অত্যন্ত গভীর এবং পিরোজপুরের নিম্নভাগে বলেশ্বরে যুক্ত হয়েছে।
১৫. সাগরের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি নদী হল মঠবাড়ি থানার সাপলেজা, কাজলদ্বীপ এবং মূলভূভাগের মধ্যে কাজল এবং আগুনমুখী নদী, ছোট এবং বড় বৈসদিয়ার মধ্যে দরচিরা নদী।

এ রকম আরো কিছু নদীর কথা বলেছেন বিভারিজ। বেশিরভাগ নদীই দক্ষিণমুখী। বিভারিজ লিখেছেন : "The cross-rivers which connect them, and which generally flow in an easterly or westerly direction, are commonly called dones. The word done is applied rather loosely, but it generally means a channel which is larger than a khal, but not sufficiently wide or long to deserve the name of river. It is also distinguished from a khal or river by the fact of its having no source, properly so called. It generally has two mouths, one at each end of its course, and both may be equally large. Perhaps this characteristic may be the origin of the name done, which seems to have its root in the Bengali word for two." (*District of Backerganj—H. Beveridge, p. 16*)।

বিভারিজ উল্লিখিত দোনগুলি হল :

১. নিয়ামতির কাছে বিশখালি নদী এবং কোটারহাটের কাছে খৈরাবাদ নদীকে যুক্ত করেছে বিশখালি।
২. মঠবেড়িয়া থানায় বিশখালি এবং বলেশ্বর নদীকে যুক্ত করেছে আমুয়া দোন।
৩. বাকরগঞ্জ থানার কদমতলীতে উৎপন্ন হয়ে মুরাদিয়া দোন পটুয়াখালির উত্তর-পূর্বে লোহালিয়ায় যুক্ত হয়েছে।
৪. দামুদা দোন কচা এবং বলেশ্বরকে যুক্ত করেছে। (কলকাতা-বরিশাল স্টিমার চলাচলের পথ ছিল)।
৫. লোহালিয়া এবং বিঘাই-এর মাঝখানে পটুয়াখালি।
৬. বিঘাই এবং বিশখালি নদীকে যুক্ত করেছে আইলা—এবং খাক দোনেরই প্রবাহ— অত্যন্ত গভীর ও চওড়া।

৭. আঁধারমাণিক এবং আইলা নদীর মধ্যে বগি।

৮. বিশখালি এবং কাউখালির মধ্যে গজালিয়া ছিল স্টিমার চলাচলের পথ।

৯. কালীজিরিকে কখনও কখনও নদী বলা হত। নদীর উত্তরের অংশকে বলা হয় সুগন্ধা। জনশ্রুতি দেবী কালীর কর্তিত নাসার অংশ পড়েছিল এখানে।

একটু দীর্ঘ হলেও বাকরগঞ্জের নদী ও খাল সম্পর্কে বিভারিজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উদ্ধৃত হল : "Many of the khals and dones have a double tide—that is the tide flows in from each end and meets in the centre. This makes them apt to silt up. All the rivers and khals wear away their banks, and often do much damage to the adjacent lands : but the most destructive in this respect are the Arial Khan and the Meghna. They often change their course, and carry away great tracts of country. It is true that they restore the land farther down; but this seldom compensates the proprietor, especially as the new : formations remain for many years as barren sandbanks. At the present time the Ilsa—i.e. the Meghna is cutting away its west bank very rapidly in thana Mendiganj, and the estuary of the Meghna is doing the same with the east side of Dakhin Shahbazpur. The Arial Khan has for many years been diluviating its east bank and throwing up large chars at Kalkini and Gournadi. The old village of Gournadi, which was the seat of a police station, has been altogether washed away, and the station is now at Palardi. New chars have however, now formed on part of the old site of Gournadi village and east of Palardi close to the Palardi police station there is a curious mark of the changes which have taken place. This is the abutment of an old bridge, which must have been made at a time when these was much country to the east of the police station. The river came and swept away the country to the eastward and the bridge which at that time spanned a narrow khal. Palardi char has now formed opposite to the remains of the bridge, and the passage has become a khal once more. Three or four years ago the Arial Khan cut across the long neck of land at Kewaria, east of Palardi, and the appearance of the country is now in consequence very different from that represented in the survery map. There is something very desolate in the appearance of the country near these large rivers when the force of the streams begins to be directed against any particular tract. The peasants make haste to remove their houses, and to cut down their groves of betel and cocoanut trees; as the diluviation advances, nothing is to be seen near the bank but stumps of trees, the earthen foundations of houses, and the broken walls of tanks. The irruption of the Meghna into the tanks is perhaps the most melancholy of such sights; for Dakhin Shahbazpur and Hattia have many large takns, which must have been constructed at much expense and labour. They are surrounded by high walls of earth in order to keep out the salt water, and when a breach is made in them they become useless, and whole villages suffer in consequence. When the peasants are thus driven away by the rivers, they some times merely move farther inland; but when they cannot get fresh land there, they are obliged to go to new chars, or to distant parts of the country.... *(District of Backerganj. P. 18-19)*

তারপর বিভারিজ বলেছেন, সাধারণভাবে বাকরগঞ্জের নদীগুলির একদিকে গভীরতা বেশি অপরদিকে অগভীর। বেশিরভাগ নদীর দুপাড় বেশ উঁচু। অবশ্য একদিক বেশ উঁচু এবং গাছপালা সমৃদ্ধ। অপর পাড় অপেক্ষাকৃত নিচু এবং বালুকাময়। নদী প্রবাহরেখার ডানদিক বরাবর উঁচু এলাকা সব সময় থাকে না। কখনও কখনও ডানদিকে চর, এবং বামদিকে উঁচু এলাকা চোখে পড়ে। সাধারণভাবে এই উঁচু পাড় অনেকসময় দেশের অভ্যন্তর ভূভাগ থেকেও উঁচু হয়ে থাকে।

নদীর উঁচুপাড়কে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। তাছাড়া উঁচু এলাকায় গ্রাম ও চাষের জমি প্রায় সর্বত্র চোখে পড়ে। ধান, পান, সুপারির চাষ হয়।

গঙ্গা-পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বাহিত জলরাশির পলিমাটিতে জন্ম বাকরগঞ্জের। জেলার অর্থনীতি এবং পরিবহন সম্পূর্ণ নদী নির্ভর। প্রতিবছর নদী প্লাবিত ভূখণ্ডে পলি পড়ে কৃষি জমিকে চির উর্বর করে রেখেছে। নদনদী, খালবিল, জলাজমিও কম নয়। বিস্তৃত জঙ্গল সমাকীর্ণ অঞ্চল এক সময় ছিল নদীগর্ভে। পলি জমে গড়ে উঠেছে বদ্বীপ অঞ্চল। সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য দ্বীপ আর নদনদীর। তারপর বসতি গড়ে ওঠে কয়েকশ বছর ধরে। আজও অসংখ্য নদনদী জেলার মানুষের কাছে আশীর্বাদ, এবং অভিশাপও। সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় প্লাবিত নদীর জলরাশিতে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছে বারবার, বহু জনবসতি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

নদী যত দক্ষিণে সরে যেতে থাকে, ততই গড়ে উঠতে থাকে চর। উত্তর থেকে দক্ষিণে অসংখ্য চর আর দ্বীপ। এইসব চরে ধীরে ধীরে গাছপালার জন্ম হয়েছে। গড়ে উঠেছে মনুষ্যবসতি। এ. এফ. এম. আবদুল জলিল তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন চরের উল্লেখ করেছেন ঃ চর মমতাজ, চর গাজি, চর কুকরি-মুকুরি, চর কলমী, চরআণ্ডা, চর খাগকাটা, চর শ্যাম রায়, চর কাউয়া, চর জব্বার, রাঙাবালি, চরগাঁ, চর মনপুরা, চর মাদ্দি, দেবীর চর, চর অগস্তি, চর সীতারাম, চর বিশ্বাস, চর ইলশা, চর ফ্যাসন, চর বিভারিজ, চর কালি, বুড়ির চর, চর চন্দ্রপ্রসাদ, চর লর্ড হাডিঞ্জ, চর মোল্লাজি, চর আগুনমুখী, চর দিদারুল্লা, চর উদয়কালী এবং চর হিজলা। এইসব চরে যাদের বসতি গড়ে উঠেছে, তারা বেশির ভাগ এসেছে ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চল থেকে।

মেঘনা

মেঘনার গভীরতা খুব বেশি। সারা বছর নাব্য থাকে। বড় বড় নৌকা আর স্টিমার সবসময় চলাচল করে। পদ্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত জল লবণাক্ত। বর্ষাকালে নারায়ণগঞ্জ জেলার বৈদ্যের বাজার পর্যন্ত জোয়ার ভাটা খেলে। শুকনো মরশুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মারকুলি পর্যন্ত জোয়ার ভাটা থাকে।

মেঘনা নাম হল কেন? নানান কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। তার অন্যতম একটি হল, আকাশে মেঘ জমলেই মেঘনার তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই সময়ে নদীতে যান চলাচল বিপজ্জনক। মেঘ + না = অর্থাৎ মেঘ দেখলে, নৌকা ছাড়বে না।

মেঘনা নদীর উৎস সম্পর্কে অন্য নদী প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই আসে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নদী সুরমা-মেঘনা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী। সুরমা-মেঘনা, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, গংগার মিলিত স্রোতই এই নদীর সমৃদ্ধির মূল কারণ।

আসামের নাগামণিপুর পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে সিলেট-অমলসিদ সীমান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তারপর সিলেট, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, ভোলা, বরিশাল প্রভৃতি জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

আসামের নাগমণি পাহাড়ের দক্ষিণে উৎপন্ন বরাক নদীই হল সুরমা। কাছাড় জেলার কাছে বরাক নদী দুই অংশে বিভক্ত হয়ে উত্তরের শাখা সিলেট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ দিয়ে বাংলা দেশে প্রবেশ করেছে। সুনামগঞ্জে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মদনা পর্যন্ত পৌঁছে, কুশিয়ারা নদীর সঙ্গে মিশেছে। মেঘালয় মালভূমির বিভিন্ন নদীর জলরাশি এসে পড়ে সুরমায়। এর মধ্যে আছে লুবা, কুলিয়া, সারি গোয়াইন, চলতি নদী, চ্যাংগার খাল, পিয়াইন, বোগাপানি, যদুকাটা, সোমেশ্বরী, কংস প্রভৃতির ধারা যুক্ত হয়ে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হওয়ার পর মোহনগঞ্জের কাছে দুটি ধারায় বিভক্ত।

পশ্চিমের শাখার ওপরের অংশের নাম ধানু, মাঝখানের অংশের নাম বৌলাই এবং নিচের অংশের নাম ঘোড়া উত্রা। এই শাখাটি ময়মনসিংহ জেলার কুলিয়ার চরের কাছে মেঘনায় মিশেছে।

বরাকের দক্ষিণ শাখার নাম কুশিয়ারা। মৌলভী বাজার শহরের উত্তরে মনু নদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর দুটি শাখায় বিভক্ত—উত্তরের শাখা বরাক নামে এবং দক্ষিণশাখা বিবিয়ানা নামে পরিচিত। এই বিবিয়ানাই কালনী নামে আজমিরিগঞ্জের কাছে সুরমার সঙ্গে মিশেছে। ত্রিপুরা পাহাড় থেকে উৎপন্ন গোপালী এবং খোয়াইনদীর সঙ্গে বরাকের পশ্চিম অংশ মিলিত হয়ে মদনার কাছে সুরমার সঙ্গে মিশেছে।

বরাক-সুরমা-মেঘনা বিভিন্ন স্থানে নানা নামে পরিচিত। কোন্ জায়গা থেকে যে মেঘনা নামের সৃষ্টি তা নির্ণয় করা কঠিন। সুরমা নদী আজমিরিগঞ্জের ভাটি থেকে কোথাও কোথাও মেঘনা নামে পরিচিত। আবার মদনা পেরিয়ে প্রায় ২৬ কিলোমিটার ভাটিতে ময়মনসিংহ জেলার কাছে সুরমা-মেঘনার নাম ধলেশ্বরী। উত্তরে ধলেশ্বরী ভাঙনপ্রবণ ও পরিবর্তনশীল। কুলিয়াচর গ্রামের ৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে আজমিরিগঞ্জের ভাটিতে মূল প্রবাহ যেখানে ধানু ও ঘোড়া উত্রার সঙ্গে মিশেছে সেখানে নাম সুরমা। তারপর থেকেই মেঘনা নামে বেশি পরিচিত।

সুরমা বিভিন্ন হাওড় ও নিম্নাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। বর্ষার শুরু থেকেই এইসব হাওড় ও নিম্নাঞ্চল জলে ভরে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নদী প্রবাহিত জলরাশি। যার ফলে প্রতি বছর বন্যা দেখা দেয়। বর্ষা শেষেও এইসব হাওড়ের জল নদীপথে প্রবাহিত হয়। বর্ষার বাড়তি জল নদীর বহনের ক্ষমতা না থাকায় বন্যায় প্রতিবছর জন-মানব গবাদি পশু এবং কৃষি ফসলের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়।

মেঘনার দুটি অংশ-কুলিয়ার চর থেকে ষাটনল পর্যন্ত আপার মেঘনা। এই অংশের নদী সংকীর্ণ। ষাটনল থেকে সাগর পর্যন্ত লোয়ার মেঘনা। এই অংশে নদী বিশালরূপ পেয়েছে। গংগা ও ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি বুকে নিয়ে মেঘনা পড়েছে সাগরে। লোয়ার মেঘনা বিশালত্বের কারণে স্বতন্ত্র নদীর মর্যাদা পেয়েছে।

ত্রিপুরার পাহাড়ী নদীর জল এসে পড়ে মেঘনায়। এই নদীর অন্যতম কয়েকটি তিতাস, পাগলী, কাঁটালিয়া, ধনাগোদা, মতলব, গোমতী হাওড়া, কাগনী, সোনাইবুড়ি, বুড়িমংগল, কাকলী, কুরোলিয়া, বালুজুড়ি, হান, ডাচোড়া, জংগলিয়া এবং ডাকাতিয়া। এর বেশির ভাগ নদীই বন্যাপ্রবণ।

আপার মেঘনা ভৈরব বাজারের কাছে পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিশেছে। আবার ষাটনলের কাছে মিশেছে ধলেশ্বরীর সঙ্গে। এখানে নদী ৫ কিলোমিটার বিস্তৃত। মেঘনার উপরের অংশ যেমন ত্রিপুরার পাহাড়ী নদীর জল পায়, তেমনি পশ্চিম দিক থেকে আসে ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা ও শীতলাক্ষার জল।

ষাটনলের কাছে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার চোখে পড়ে। পুব দিক থেকে আসা জল স্বচ্ছ ও নীলাভ। আর পশ্চিম দিক থেকে আসা জল ঘোলা। মজার ব্যাপার এই দুটি জলধারা আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে দক্ষিণে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার প্রবাহিত হয়েছে। দুটি জল রেখা স্বতন্ত্রই থাকে।

ষাটনলের ১৬ কিলোমিটার ভাটিতে চাঁদপুরের কাছে গংগা-ব্রহ্মপুত্র-যমুনার মিলিত স্রোত পদ্মা নামে মিশেছে মেঘনায়। এখান থেকেই নদী বিশাল রূপ নিয়েছে। বিস্তৃতি প্রায় ১১ কিলোমিটার। বাংলাদেশে সুরমা-মেঘনার মোট দৈর্ঘ্য ৬৭০ কিলোমিটার। ভৈরব বাজারে এই নদীর বিস্তার প্রায় ১ কিলোমিটার, ষাটনলের কাছে ৫ কিলোমিটার এবং চাঁদপুরের কাছে ১১ কিলোমিটার। মোহানার কাছে ইলশা বা তেঁতুলিয়া এবং শাহবাজপুরের একত্র বিস্তৃতি প্রায় ৪০ কিলোমিটার। রামনাবাদ থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত ১৫৩ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা মেঘনার মোহানারূপে চিহ্নিত।

মেঘনার নিম্নাংশে রয়েছে তিনটি ধারা। ইলশা বা তেঁতুলিয়া, শাহবাজপুর এবং বামনী। তেঁতুলিয়া নদী ৬ কিলোমিটার বিস্তৃত। এই নদী ভোলাকে বরিশালের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন

করেছে। শাহবাজপুর প্রায় ৮ কিলোমিটার বিস্তৃত। রামগতি ও ছাতিয়া দ্বীপ থেকে ভোলাকে বিচ্ছিন্ন করেছে এই নদী। বামনী নদী আগে রামগতি ও চরলাক্ষ্যা দ্বীপের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হত। কোন এক সময়ে এই নদী ছিল মেঘনার নিম্নাঞ্চলের মূলধারা। বর্তমানে অস্তিত্ব হীন।

সুরমা-মেঘনা উভয় তীরে জনবসতি, শহর, বন্দর, কলকারখানা গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল আগেই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিলেট, সুনামগঞ্জ, নরসিংদি, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা। নৌ ও বাণিজ্য বন্দর হল মারকুলি, আজমিরিগঞ্জ, মদনা, কুলিয়ার চর, ভৈরব বাজার, চাঁদপুর (পুরনো বাজার) রামদাসপুর, কালুপুর, দৌলতখান প্রভৃতি। নদীর তীরে আশুগঞ্জে তাপ-বিদ্যুৎ এবং ফেঞ্চুগঞ্জে সার কারখানা নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশ জল উন্নয়ন বোর্ড মেঘনা উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়িত করেছে। এর ফলে মেঘনা নদীর পাশে বাঁধ নির্মাণ করে সিলেট, ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লা জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আর নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ায় ১,৮০,০০০ হেক্টর জমিতে সেচের জল ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

এই মেঘনা সম্পর্কে হান্টার লিখেছেন ঃ The next and last great channel on the sea face of the Sundarbans is the Meghna estuary, formed by the united waters of the Ganges and the Brahmapura and running along the eastern Sundarban boundary. Several islands and sandbanks split the mouth into numerous channels of approach. ...Scarcely any changes are perceptible in the courses of the Sundarban rivers as thy near the sea; but work of alluvion and diluvion goes on rapidly among the islands and sand-banks at their mouths, especially upon the Meghna, where tracts of land or *chars*, are cut away from one spot and added to another almost every year. The banks of the rivers are alternately abrupt or sloping according as the current strikes : i.e. the bank at which the force of the tide is greatest, is abrupt : while the other where the current is weakest, is sloping. Except in the cleared tracts, the banks are covered with jungle down to the waters edge. All rivers of the Sundarbans have a clayey bed, and all are affected by the tide. The only Sundarban estuaris known to have a *'bore'* are the Hugli on the eastern, and the Meghna on the Western boundary..." (Statistical Account of Sundarbans—W. W. Hunter. ed. 1998. p. 15-16

"জেলার পূর্বাংশ পশ্চিমাংশের মূল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির। পূর্বাংশে গঙ্গা ও যমুনার মিলিত স্রোত কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরের নিকটে মেঘনা নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অতঃপর এই সম্মিলিত বিশাল স্রোত প্রায় দশ মাইল বিস্তৃতি নিয়ে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে চর জাপুর ও চর বিশালকাঠির নিকটে পৌঁছে জেলার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। আরও কিছু দূর প্রবাহিত হওয়ার পর এ স্রোত ভোলা ও হাতিয়াকে মাঝে রেখে তিনটি পৃথক খাতে বিভক্ত হয়েছে। সর্বপশ্চিমে খাতটি অপেক্ষাকৃত শীর্ণ এবং তা দিয়ে বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে মেঘনার জলরাশি সামান্যই প্রবাহিত হতে পারে। এই খাত ইলশা-তেঁতুলিয়া নামে পরিচিত হয়ে ভোলা মহকুমাকে জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ভোলা দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে নদীটি পুনরায় প্রসারিত হয়ে পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা থানার পূর্ব সীমানা বেষ্টন করে বুড়া গৌরাঙ্গ ও আগুনমুখা নদীর সঙ্গে মিশে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। উল্লিখিত তিনটি খাতের মধ্যবর্তী স্রোতধারাকে শাহবাজপুর নদী বলা হয়। ভোলা ও হাতিয়া দ্বীপের মধ্য দিয়ে এ নদী প্রবাহিত হয়েছে এবং এর বিপুল জলরাশি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। এ এলাকায় প্রতিবৎসরেই জলোচ্ছ্বাস ঘটে। এই সকল কারণে ভোলা থানার প্রায় সিকি মাইল ভূখণ্ড ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে। বাকি খাতটি নোয়াখালির মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণে দুই ধারায় প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। একটি ধারা হাতিয়া ও সন্দিপের মধ্য দিয়ে হাতিয়া চ্যানেল নামে এবং অপর ধারাটি সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রামের উপকূলের মধ্য দিয়ে সন্দ্বীপ চ্যানেল নামে অভিহিত।" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ. ৮)

গেজেটিয়ার থেকে আরও জানা যায় ঃ "মেঘনা মোহানার এই বিশাল জল-এলাকায় ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে। এখানে বড় বড় দ্বীপগুলি দ্রুত জলমগ্ন হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ভেঙে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাধারণত মোহনায় নদীর গভীরতা কয়েক ফুটের বেশি না হলেও প্রায় আধমাইল প্রশস্ততা বিশিষ্ট মূল খাতগুলির গভীরতা অনেক বেশি। শীতকালে ভাটার সময়ে বিস্তৃত কর্দমাক্ত এলাকা ভেসে ওঠে। এই কাদামাটি জলের ওপরে জেগে ওঠার পর তাতে ঘাস জন্মায় এবং পলিজ অবক্ষেপণের ফলে তা ক্রমশ উঁচু ভূমিতে রূপান্তরিত হয়। ধীরে ধীরে পলি জমে জমির উচ্চতা বেড়ে গিয়ে চরের রূপ ধারণ করে। সমুদ্রের অতি নিকটবর্তী এলাকাগুলি ছাড়া অন্যান্য চরে তাড়াতাড়ি ফসল ফলানো যায়। বিশেষ করে বোরো ধানের ফলন খুবই ভাল হয়। সমুদ্রের নিকটবর্তী ভূস্তর শীত মৌসুমে জোয়ার ভাটার সীমার উপরে জেগে না ওঠা পর্যন্ত শস্যের আবাদ করা যায় না। অবশ্য তারপরেও মৃত্তিকার লবণাক্ততা দূর হতে কয়েক বৎসর সময় লেগে যায়। তবে ভোলার দক্ষিণে জয়নগর পর্যন্ত পানি লবণমুক্ত থাকে। দ্বীপ গড়ে ওঠার পর তার কেন্দ্র ভাগের উচ্চতা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে বন্যার উচ্চতম জল-সীমায় পৌঁছে যায় বলেই বাকরগঞ্জ জেলার মূল ভূখণ্ড অপেক্ষা ভোলা ও তৎসলগ্ন দ্বীপসমূহের ভূমির উচ্চতা বেশি। এ কারণেই মূল ভূ-খণ্ডের চেয়ে প্রবহমান নদী-নালার সংখ্যা ভোলা অঞ্চলে কম। যে নগণ্য সংখ্যক স্রোতধারা দ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সেগুলি বসন্তের জোয়ার এবং বর্ষার প্লাবনের সময় ব্যতীত অন্য সময়েই প্রায়ই শুষ্ক থাকে। ভোলা মহকুমায় ৬৬ গজ অপেক্ষা কম প্রশস্ত নদী এলাকার পরিমাণ জেলার মোট উঁচু জমির তিন শতাংশের সমান। জেলার মূল ভূ-খণ্ডে আমন প্রধান ফসল হলেও এখানকার মাটি আমন ফসলের জন্য বিশেষ উপযোগী নয়।" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ. ৯)

বরিশাল-বুড়ীশ্বর

পুরনো বাকরগঞ্জ মহকুমার দপদপিয়ায় কীর্তনখোলা নদী থেকে বরিশাল-বুড়ীশ্বরের উৎপত্তি। উৎপত্তির পর রানীরহাট, খয়রাবাদ, বাকরগঞ্জ, লেবুখালি, আলকি, মির্জাগঞ্জ, কারাবুনিয়া, আয়লা, বুড়াঘাটা, আমতলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পটুয়াখালি জেলার আমতলী উপ-জেলার মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

বরিশাল-বুড়ীশ্বর হল আড়িয়াল খাঁর নিম্নাংশ। আড়িয়াল খাঁর মূল প্রবাহ এই নদী পথেই প্রবাহিত। তেঁতুলিয়ায় সংযোগ স্থলে অসংখ্য নদীর শাখা প্রশাখা রয়েছে মাকড়শা জালের মত। নদীগুলি সবই দক্ষিণমুখী এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত। একটি শাখা বাকরগঞ্জ উপ-জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে দুটি ধারায় ভাগ হয়েছে। একটি ধারার নাম লেবুখালি। এর স্রোত তীব্র নয়। পটুয়াখালি উপজেলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে লাউকাঠি নদীতে পড়েছে।

অপর ধারাটি বাকরগঞ্জ, আঙাগারিয়া, কচা, বিঘাই ও বুড়ীশ্বর নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই নদীটির সঙ্গে যেসব ছোট ছোট নদী মিশেছে তার মধ্যে আছে—সুবিদখালি, আয়লা, গুলিশখালি, চওড়া এবং পাঙাসিয়া (গোলবুনিয়া), চরগাছিয়া প্রভৃতি।

দৈর্ঘ্য ১৫৮ কিলোমিটার। সর্বত্র জোয়ার ভাটা খেলে। নদীপথে বেশ কিছু বাঁক আছে। ভাঙনের ফলে আমতলী, সুন্দরপুর (মির্জাগঞ্জ), মাটিভাঙা, কাঁকড়াবুনিয়া, পাতাকাটা, পোড়াকাটা, গোলবুনিয়া, আঙুলকাটা প্রভৃতি স্থান বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ব্যাপকভাবে চরা পড়ায় নদীখাত ক্রমশ সংকীর্ণ হচ্ছে। এইসব চরায় চাষাবাদ হচ্ছে, বসতি গড়ে উঠছে।

বরিশাল-বুড়ীশ্বর নদী ইলিশমাছের জন্য বিখ্যাত। নদীতীরে বানীরঘাট, বাকরগঞ্জ, মির্জাগঞ্জ এবং আমতলী উপজেলা অবস্থিত। বাকরগঞ্জ উপ-জেলার সরকারি আফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, খাদ্যগুদাম, হাসপাতাল এই নদীতীরে অবস্থিত। নদীতীরের কলকাঠিতে আছে জমিদারবাড়ি। মির্জাগঞ্জ উপ-জেলায় আছে ইয়ারউদ্দিনের মাজার শরীফ।

বিশখালি

বরিশাল বুড়ীশ্বর থেকে উৎপন্ন। বলেশ্বর-হরিণঘাটা মোহানায় বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। আড়িয়াল খাঁ বরিশাল সদরের অন্তর্গত ভাসানীচরে এসে ভাসানীচর-নাম ধারণ করে। বরিশাল শহরের ৫ কিলোমিটার উত্তরে এই নদীর নাম কীর্তনখোলা। নলছিটি উপ-জেলার কাছে নাম হয়েছে নলছিটি। ঝালকাঠি উপ-জেলায় নাম সুগন্ধা। তারপর এই নদীর নাম বিশখালি। নদীর দৈর্ঘ্য ৯৬ কিলোমিটার। উৎপত্তিস্থল থেকে মোটামুটি দক্ষিণবাহী। পাথরঘাটার ১৩ কিলোমিটার ভাটিতে বলেশ্বর-হরিণঘাটা মোহানায় বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

নলছিটি নদী বরিশাল শহরের ৬ কিলোমিটার ভাটিতে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমদিকে বরাবর এগিয়ে গেছে। তারপর ঝালকাঠি শহরের কাছে এসে এক ভয়ঙ্কর বাঁক সৃষ্টি করে সোজা দক্ষিণে সাগরে প্রবাহিত হচ্ছে। এই বাঁকের পর থেকেই নদীর নাম বিশখালি। এই বাঁকের কাছে বিশখালি, কাউখালি এবং গাবখান খালের মাধ্যমে মধুমতী ও কচা নদীর জলপ্রবাহ এসে পড়ে মূল নদীস্রোতে। ঝালকাঠির ২৩ কিলোমিটার ভাটিতে জাংগালিয়ার কাছে আংগারিয়া, রাজাপুর জাংগালিয়া নদী পথে বিশখালি মধুমতী কচা নদীর জলপ্রবাহে এসে পড়ে। বুড়ীশ্বর নদীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে বামনা উপ-জেলার ভাটি এলাকায় বাকদুঘ, আয়লা প্রভৃতি নদীর মাধ্যমে। নদী এগিয়ে চলার সময় ভাঙন দেখা দিয়েছে দু পাড়েই। ভাঙনের ফলে বেতাগী, আমুয়া, বামনা প্রভৃতি নদী বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত। নদীর ভেড়ি বাঁধও ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত। নদীতে চরা পড়ে দ্বীপ গড়ে উঠছে। এই চরায় ক্রমে শুরু হচ্ছে জনবসতি, চাষাবাদ। বিশখালির শাখানদী বদনখালি দোন এবং খাক দোন নদীতে কোন স্রোত না থাকায়, নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। খাকদোন নদী তীরে বিখ্যাত বরগুনা

তেঁতুলিয়া নদী

মেঘনার নিম্ন শেষ একটি ধারা হল তেঁতুলিয়া। নদী দৈর্ঘ্য ৮৪ কিলোমিটার। জোয়ার ভাটা খেলে। ভোলা জেলার উত্তরে মেঘনা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে তেঁতুলিয়া, নিমদি, কালাইয়া, পূর্ব মুনিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তারপর গলাচিপা উপ-জেলার বংগোপালদি থেকে বুড়া গৌরাংগ নামে পরিচিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বহুকাল যাবৎ নদীটি ছিল ভয়ংকর খরস্রোতা। কিন্তু স্থানে স্থানে চরা পড়ে নদীর চেহারা এখন প্রশান্ত। তেঁতুলিয়া ভোলাকে বাকরগঞ্জের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এর ঠিক পশ্চিমদিকে রামনাবাদ দ্বীপ। শাহবাজপুরে মেঘনা নদীর একটি শাখা এসে মিশেছে।

তেঁতুলিয়ার একটি শাখা বাকরগঞ্জ, পটুয়াখালি ও বাউফল উপ-জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। নদীটি পটুয়াখালি শহরের কাছে পূর্ব দিকে এগিয়ে আবার দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে আগুনমুখা এবং রামনাবাদ নদীর সঙ্গে মিশে সাগরে পড়েছে।

নদীতীরে ধুলিয়া বাজার, গংগাপুর বাজার, মনিপুর বাজার, দাসমুনি বাজার, কালাইয়া বন্দর অবস্থিত। পটুয়াখালি জেলার বাউফল উপ-জেলার নাজিরপুর খাদ্য গুদাম, কালাইয়া বন্দরের খাদ্যগুদাম, স্কুল, মাদ্রাসা, ব্যাংক এবং তিনটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এই নদী তীরে অবস্থিত। নদীটি ভাঙনপ্রবণ হওয়ায়, নদীতীরবর্তী বহু স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তেঁতুলিয়ার শাখানদী লাউকাঠি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। হয়ত কোন একদিন পটুয়াখালি জেলা শহরের সঙ্গে নৌকা যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে।

পটুয়াখালি জেলা শহরের দক্ষিণ দিকে খরস্রোতা নদী বহালগাছিয়া আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তেঁতুলিয়ার বহু স্থানে চরা পড়ে দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এইসব দ্বীপে বসতি গড়ে উঠেছে। আবাদ হচ্ছে।

তেঁতুলিয়া নদীর নিম্নাংশে বুড়াগৌরাংগ ও কাজল নদী। এখানে নতুন নতুন চর গড়ে উঠেছে। চর মোন্তাজ, চর আন্ডা, চর আগস্তি অন্যতম। সরকার এইসব চরে বনোন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

কীর্তনখোলা নদী

শতাধিক বছর আগে কীর্তনখোলা ছিল খরস্রোতা ও গভীর নদী। প্রশস্ত ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ইংরেজ আমলে বরিশাল শহরকে রক্ষার জন্য বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। বাঁধটি বর্তমানে বান্দ রোড নামে পরিচিত। সে সময়ে কীর্তনখোলা প্রশস্ত ছিল প্রায় এক কিলোমিটার। কিন্তু দুপারে চড় পড়ায় নদী প্রশস্ততা আগের মত নেই। স্রোত যেমন কমেছে, গভীরতাও কোথাও আগের মত নেই। স্রোত বিপুল পরিমাণ পলি বহন করে। নদীর ভাঙন প্রবণতা বেশি।

ইংরেজ আমলেও নদীতে ছিল প্রবল স্রোত। এই নদীপথে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও অন্যান্য অঞ্চলে স্টিমার যাতায়াত করত। বরিশাল তখন গুরুত্বপূর্ণ স্থান। একটি ডক ইয়ার্ড ও স্টিমার ঘাট ছিল। এখনও এই পথে লঞ্চ চলাচল করে। কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিম তীরে আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়। তাছাড়া এই সংস্থার একটি ভাসমান ডক আছে কীর্তনখোলা নদীর বুকের ওপর। নদীর পশ্চিমতীরে আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থার স্টিমার ঘাটের দক্ষিণে আছে একটি ড্রাই ডক। নদীপথটি বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে নদীর দুপারে বা নদীর মাঝখানে কোথাও কোথাও চরা দেখা দিয়েছে।

কীর্তনখোলা নদীর প্রসঙ্গে গঙ্গার তিনটি শাখানদী নলিনী, হলদিনী ও পাবণীর প্রসঙ্গ আসে অনিবার্যভাবে। পাবণী পুরনো পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে (যার নাম সুগন্ধা) আন্দার খাল বা আড়িয়াল খাঁ নামে পরিচিত। এই নদী ফরিদপুর জেলার দক্ষিণে মাদারীপুর হয়ে বরিশালের মধ্যে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

সাগরে পড়ার আগে বিভিন্ন স্থানে নানা নামে পরিচিত। মাদারীপুরের দক্ষিণে আন্দার খাল বা আড়িয়াল খাঁ সুগন্ধা নামে পরিচিত। এই সুগন্ধা এক সময়ে দক্ষিণ বাংলার বা বাকলা চন্দ্রদ্বীপের বৃহত্তম নদী ছিল। কালক্রমে সুগন্ধার বদ্বীপের শাখানদীগুলির রেখা ক্ষীণ হতে হতে শুকিয়ে যাওয়ায় সুগন্ধা নাম হারিয়ে যায়, আড়িয়াল খাঁ প্রাধান্য পায়। এই আড়িয়াল খাঁর একটি শাখা আবার শায়েস্তাবাদের কাছে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় ভোলার দিকে মেঘনার সঙ্গে সাহাবাজপুরে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। আর একটি শাখা কীর্তনখোলা নামে বরিশাল শহরকে পশ্চিম তীরে রেখে দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে নলছিটি পর্যন্ত কীর্তনখোলা নামে পরিচিত। তারপর থেকে নদীটি নানা নামে পরিচিত। অবশেষে হরিণঘাটা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

বরিশাল শহরের কাছে নদীর দুটি শাখা ঃ পূর্বতীরে বুখাইনগর ও পটুয়াখালি—বাকরগঞ্জ খাল এবং পশ্চিম তীরে মীরগঞ্জ বা মাধব নদী। মাধব নদী ধানসিঁড়ি নদীর সঙ্গে মিশেছে।

আড়িয়াল খাঁ নদী

পদ্মার পূর্ব প্রান্তের শেষ শাখানদী আড়িয়াল খাঁ। দৈর্ঘ্য ১৬০ কিলোমিটার। গড় প্রস্থ ৩০০ মিটার। পদ্মার অন্যতম শাখা নদী গড়াই মধুমতী। তারপর আড়িয়াল খাঁর স্থান। আড়িয়াল খাঁর তিনটি উৎসমুখ। পিয়াজখালি (অকোট), হাজারখাল (বটেশ্বর) এবং ডবুলদিয়া। হাজার খালের উৎসমুখ খুবই ক্ষীণ। শুকনো মরশুমে শুকিয়ে যায়।

ডবুলদিয়ার উৎসমুখও শুকনো সময়ে ক্ষীণ হলেও, বর্ষায় পদ্মার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয়। পিয়াজখালি দিয়ে পদ্মার প্রধান স্রোত আড়িয়াল খাঁয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আবার পিয়াজখালি ও ডবুলদিয়ার স্রোত দুটি মাদারিপুরের অদূরে শম্ভুক নামক স্থানে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত স্রোত মাদারিপুর ও শরীয়তপুরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বরিশালের মুলাদি উপ-জেলার ছবিপুরে

মেঘনা নদীতে মিলিত হয়ে তেঁতুলিয়া নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। আবার পিয়াজখালি থেকে উৎপন্ন মূল স্রোতের অংশ বিশেষ শ্রীবর্দীর কাছে মাদারিপুর বিল পেরিয়ে মধুমতীতে পড়েছে। আগে এই খালটির নাম ছিল আনদাল খাল।

আড়িয়াল খাঁ-এর প্রবাহপথে নড়িয়াল খাল, পালং খাল, ময়নাকাটা, ভুবনেশ্বর, কুমার, কাইলার, নয়াভাঙানি প্রভৃতি জলরেখা যুক্ত হয়েছে। যার ফলে নদীটির সঙ্গে সরাসরি পদ্মার সংযোগ ঘটেছে। আঁকাবাঁকা নদীপথ, ভাঙনপ্রবণ। বহু জনপদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভাঙনে। মাদারিপুর শহর রক্ষা পেয়েছে জলউন্নয়ন দপ্তরের তৎপরতায়।

নদীতীরবর্তী প্রসিদ্ধস্থান পিয়াজখালি, চৌধুরীর হাট, উৎরাইল, দত্তপাড়া, কবিরাজপুর, লাউখোলা, ছবিপুর, মাদারিপুর। মাদারিপুর ঐতিহাসিক স্থান। বিখ্যাত পীর আউলিয়া শাহ মাদারের জন্মস্থান। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম এই শহরে। নদীতীরে আছে পাটকল এ. আর. হাওলাদার জুট মিল।

আড়িয়াল খাঁ নদী মাদারিপুর ও শরীয়তপুরের প্রাণ স্বরূপ। জেলা উন্নয়ন বোর্ড নদী উন্নয়নে তৎপর। জনসাধারণ পাম্পের সাহায্যে নদীর জল সেচকার্যে ব্যবহার করে। উচ্চফলনশীল ধানের আবাদ আছে।

বিভারিজ বলেছেন, বাকরগঞ্জের খালগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। এমন কিছু খাল আছে, যাদের রেখাপথ ধরা পড়ে বর্ষায়। প্রায় প্রতিটি গ্রামেরই খাল আছে দুটি বা তিনটি। গুরুত্বের দিক থেকে কয়েকটি খাল হল ঃ

১. বরিশাল নদীর যবখালি খাল।

২. ঝালুকাঠি নদীর ঝালুকাঠি খাল।

—এই দুটি খালের গুরুত্ব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ, কলকাতার সঙ্গে যাতায়াতের সময় অনেক সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। ঝালুকাঠি খালকে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এগার বা বার হাজার টাকা খরচ করে চওড়া ও গভীর করে।

৩. বরিশাল শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত লাকুটিয়া খালকে বলা হত জৈন্স খাল। ছয় মাইল দীর্ঘ এই খাল পথ দিয়ে কম সময়ে ঢাকায় যাতায়াত করা যেত। লাখুটিয়ার জমিদার বাবু রাজচন্দ্র রায় এই খাল কেটে ছিলেন। রোড কমিটি পরে খালটিকে গভীর করে।

৪. আগরপুর খাল
৫. শিকারপুর খাল
৬. তুর্কি খাল

} জেলার উত্তর দিক্ দিয়ে প্রবাহিত।

৭. শ্রীমন্তপুর খালকে শিবপুর খালও বলা হয়। এই খাল বাকরগঞ্জ ও শিবপুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

৮. রহমৎপুরের রাজার খালটিকে চন্দ্রদ্বীপের রাজা মাধবপাশার প্রাসাদের পরিখা হিসাবে খনন করেছিলেন—এরকমই জনশ্রুতি।

৯. দক্ষিণ সাহাবাজপুর দিয়ে এগিয়ে গেছে ভোলা খাল। এই খালটিকে চাওড়া ও গভীর করা হয়েছিল।

বর্ষার সময়ে প্রায় সমগ্র জেলাই পরিণত হয় জলাভূমিতে। জল শুকিয়ে যেতে সময় নেয় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি। তাছাড়া ব্যাপক নিম্নচাপের দরুন কোন কোন স্থানে সারা বছর জল জমে থাকে। এই সব এলাকাই বিল নামে পরিচিত। বিভারিজের বর্ণনা থেকে কয়েকটি বিলের কথা জানা যায়, যেমন গৌরনদী ও স্বরূপকাঠির ঝনঝনিয়া বিল; মাথাবেড়িয়ার রামপুর চিহারি বিল; বাউফল থানার ধারানদি আদমপুর এবং কালারাজা বিল। কোতোয়ালি পাড়া বিলের অধিকাংশ চলে যায় ফরিদপুর জেলায়। এইসব বিলে প্রচুর পরিমাণ মাছ পাওয়া যায়। স্বরূপকাঠি ও কোতোয়ালিপাড়া বিল থেকে মাছ রপ্তানি হত কলকাতায়। এইসব বিলে যে বিপুল পরিমাণ

নলখাগড়া জন্মাত, যার থেকে তৈরি মাদুর রপ্তানি হত। কালারাজা বিলের নামকরণ ঘটে, চন্দ্রদ্বীপের কোন রাজার কথা মনে রেখে। তাছাড়া সমগ্র জেলায় ছোটখাট বিলের অভাব নেই। প্রায় প্রতিটি বড় গ্রামেই একটি বিল দেখা যাবে। এইসব বিলে নলখাগড়া যেমন পাওয়া যায়, তেমনি গরু মহিষের খাবারও মেলে। ঝিনুক পাওয়া যায় সব বিলেই, যা পুড়িয়ে পাওয়া যায় চুন।

মাছ ঃ অন্যতম সম্পদ

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত বাকরগঞ্জে পাওয়া যায় নানারকম মাছ। অবিভক্ত বাংলায় কলকাতায় এই জেলার মাছ রাতারাতি নৌকায় চালান যেত। কোতোয়ালিপাড়া বিল থেকে কলকাতায় মাছ পাঠান হত নৌকার খোলে জল ধরে, তার মধ্যে জ্যান্ত অবস্থায়। রপ্তানি করা মাছের মধ্যে ছিল কৈ, শিঙি, মাগুর, খলিসা, শোল, গজার, ফলৈ, চ্যাঙ প্রভৃতি। জেলায় যে সব মাছ পাওয়া যায় তার অন্যতম কয়েকটি হল ইলিশ, ভেটকি, রুই, পাঙাশ, কাতলা। ইলিশের থেকেই একটি নদীর নাম ইলশা। নদীটি হল দক্ষিণ শাহবাজপুর এবং মূলভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। গৌরনদী উপ-জেলায় পাঙাস নামে একটি নদী আছে। এখন যেসব মাছ আছে, তার কয়েকটি হল ঃ

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
রুই	*Labeo rupita*	গলদা চিংড়ি	*Palaemon carcinus febricus*
কাতলা	*Labpo Catla*		
মৃগেল	*Chirrhina mrigala*	গুড়া চিংড়ি	*Palaemon lamarric*
কালবাউশ	*Labeo calbaus*	সিলন্দ	*Silondia*
ইলিশ	*Elisha Ilisha*	আড	*Mystas aor*
পাঙাশ	*Pangas Pangasus*	বোয়াল	*Wallagoattu*
টাকি	*Aphiocephalus punctatus*	রিটা	*Rita rita*
গজার	*Ophiocephalus marulius*	বাটা	*Labeo bata*
শোল	*Ophiocephalus striastus*	বেলে	*Eleotris ambinensis*
মাগুর	*Clarius batarachus*	ভেদা	*Nandus nandus*
শিঙি	*Hetro pensusha fosiles*	ভেটকী	*Lates Calcarifer*
কৈ	*Anubas testudines*	বৈচা	*Colisa chuna*
পোমা	*Setaoniedes ponis*	চাপিলা	*Gadusia chapra*
চিতল	*Notopterus chatala*	বাইন	*Mastacembelus pencalus*
ফোলই	*Ntoppterus notopterus*	বাজারী	*Mystus tengra*
তপসে	*(Mango fish) Polynemus paradiseus*	বাচা	*Silonia Silonia*
		গাগরা	*Arius Gagora*
বাঘা আইড়	*Bagerius begarius*	ঘৈনা	*Labeo genius*
তারা বাইন	*Rhynchoodella aculeata*	ঘারুয়া	*Clugisoma garua*
চেয়োবেলা	*Gohioides rubicudus*	গলসা টেংরা	*Mystus corsula*
সরপুঁটি	*Barbus (Puntius) sarana*	পাবদা	*Callichrous pabda*
ভাদিপুঁটি	*Barbus (Puntius) punti*	খালিশা	*Colisa fasciate*
কাঞ্চনপুটি	*Barbus (Puntius) conchanius*	ফেসা	*Engraulis Mystax*
		মায়া	*Rasbora daniconius*
টেংরা	*Mystus vittatus*	তিতপুঁটি,	*Barbus (Puntius) tecto*

বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার (১৯৮৪) প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, এই জেলায় ১৭,১৭৩টি জেলে পরিবারের বসবাস। পরিবারে ধীবরের সংখ্যা ৭১,৮০৩। এরা প্রধানত মাছ ধরে। অন্য জীবিকা এদের জীবনে প্রধান নয়। জেলায় জেলেপাড়ার সংখ্যা ৩৫৪। থানাভিত্তিক জেলেপাড়ার সংখ্যা ঃ

সদর উপ-জেলা	থানার নাম	জেলেপাড়ার সংখ্যা
	১. কোতোয়াল	২০
	২. বাকরগঞ্জ	৪০
	৩. বাবুগঞ্জ	১০
	৪ উজিরপুর	১৮
	৫. গৌরনদী	৭
	৬ মুলাদি	৩৫
	৭ হিজলা	৩০
	৮ মেহেন্দিগঞ্জ	২০
		১৮০
পিরোজপুর উপ জেলা	১ পিরোজপুর	১১
	২. কাউখালি	৭
	৩. ভাণ্ডারিয়া	৬
	৪. মঠবাড়িয়া	[illegible]
	৫. স্বরূপকাঠি	৫
	৬. নাজিরপুর	[illegible]
		৩৭
ভোলা উপ-জেলা	১. ভোলা	৫০
	২ দৌলত খাঁ	১৪
	৩ তজুমুদ্দিন	[illegible]
	৪ বোরহানউদ্দিন	১৮
	৫ চর ফ্যাসন	[illegible]
	৬ মনপুরা	৮
	৭. লালমোহন	[illegible]
		১৩৭

তাছাড়া জানা যায়, জেলায় প্রাথমিক ধীবর সমবায় সমিতির সংখ্যা ৩৮১। ৫টি কেন্দ্রীয় ধীবর সমবায় সমিতি হল ঃ

১ বরিশাল কেন্দ্রীয় ধীবর সমবায় সমিতি
২ ভোলা কেন্দ্রীয় ধীবর সমবায় সমিতি
৩. ঝালকাঠি কেন্দ্রীয় ধীবর সমবায় সমিতি
৪ পিরোজপুর কেন্দ্রীয় ধীবর সমবায় সমিতি এবং
৫ চর ফ্যাসন কেন্দ্রীয় ধীবর সমবায় সমিতি।

কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি প্রাথমিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে জেলেদের নানাবিধ সাহায্য করে থাকে। যেমন মাছ ধরার যন্ত্রচালিত নৌকা, দেশি জেলে নৌকা, নাইলন সুতো, বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদি। তাছাড়াও আছে নানাবিধ উদ্যোগ।

মাছ উৎপাদনের বিখ্যাত স্থানগুলি হল ঃ সাতলা, কচা নদী, আসকর, হরতাজালা, সাঁকোকাটি, নাজিরপুর, উজিরপুর, বড়পাইকা, চরফ্যাসন, মনপুরা, তালতলী, ছবিপুর, কাশেরহাট, তেঁতুলিয়া, নন্দীর বাজার, মুলাদি, হিজলা প্রভৃতি। মাছের প্রধান প্রধান কয়েকটি বাজার আছে—বরিশাল বাজার, ঝালকাঠি, কলসকাঠি, কাশেরহাট, নন্দীর বাজার, সাফা, পাতেরহাট, হরতা বাজার, মুলাদি, হিজলা, মাঠবাড়িয়া, তুষখালি, তেলিখালি, শ্রীরামকাঠি, ভাণ্ডারিয়া, কাউখালি, উজিরপুর, সাতলা বাজার, ধমুরা বাজার, ভোলা, দৌলত খাঁ, ইলিশা, চর ফ্যাসন, লালমোহন, টরকি, শরীকল, গৌরনদী, পীরের হাট, পিরোজপুর-এ।

নদী ও বিল সমাকীর্ণ হলেও সব নদী বা বিলে মাছ পাওয়া যায় না। যে সব নদী ও বিলে মাছ পাওয়া যায়, সেগুলি হল ঃ

নদীর নাম	দৈর্ঘ্য (মাইল হিসাবে)
১. হিজলা	১৫
২. ছবিপুর	১০
৩. নয়াভাঙানি	১৫
৪. আড়িয়াল খাঁ	২০
৫. জয়ন্তী	১০
৬. ববিশাল	১৫
৭. মেঘনা	৯৫
৮. কালীজিরা	১০
৯. বাকরগঞ্জ	১৫
১০. কচা	১০
১১. সন্ধ্যা	৫
১২. কালীগঙ্গা	১০
১৩. ধলেশ্বর	১৫
১৪. হালতা	১২
১৫. বুড়া গৌরাঙ্গ	৩০
১৬. তেঁতুলিয়া	৫০
১৭. ইলিশ গণেশপুর	৩০
১৮. চৌরকি পালরদি	১০
১৯. উজিরপুর	১০

বিলের নাম	আয়তন (একর হিসেবে)
১. আসকর	১০০
২. মাটিভাঙ্গা	৫০
৩. সাতলা	৫,০০০

বাংলা দেশের অন্যান্য জেলার মতই বাকরগঞ্জ-এর বড় বড় পুকুরে মাছ চাষের পরিমাণও বিপুল। গেজেটিয়ারে (১৯৮৪) উল্লেখ আছে মোট ৭,১৯৭ একর জায়গা জুড়ে আছে ১০,৩৮৫টি বড় পুকুর। এইসব পুকুরে নিযমিত মাছ চাষ হয়। পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে এইসব পুকুর মাছ উৎপাদনের পবিমাণ এবং সেইসব মাছ বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থের পরিমাণ ঃ

বৎসর	মাছ উৎপাদন	প্রাপ্ত দাম
১৯৭২-৭৩	১,২২,০০০ টন	৩০,৬৩,০০,০০০ টাকা
১৯৭৩-৭৪	১,০০,০০০ "	২৮,৫৪,০০,০০০ "
১৯৭৪-৭৫	৮৮,০০০ "	২৭,০৯,০০,০০০ "

এখানে মৎস্য দপ্তরের কয়েকটি কার্যক্রমের উল্লেখ করা যেতে পারে :

	মৎস্য খামারের নাম	অবস্থান	আয়তন (একরে)	স্থাপিত হওয়ার বছর
১	২	৩	৪	৫
১.	বরিশাল সদর মৎস্য বীজাগার (পোনা উৎপাদন খামার)	চৌহতপুর, কাশীপুর বরিশাল	৮.৭৩	১৯৬০-৬১
২.	পিরোজপুর মৎস্য বীজাগার (পোনা উৎপাদন খামার)	রানীপুর হুলার হাট	১০.৩৩	১৯৬২-৬৩
৩	ভোলা মৎস্য বীজাগার (পোনা উৎপাদন খামার)	চরজাঙানিয়া ভোলা	১০.৫০	১৯৬৩-৬৪
৪.	গৌরনদী মৎস্য বীজাগার (পোনা উৎপাদন খামার)	দক্ষিণ পালরদি	৭.৫৯	১৯৬৬-৬৭
৫.	ঝালকাঠি মৎস্য বীজাগার (পোনা উৎপাদন খামার)	কৃষ্ণকাঠি ঝালকাঠি	৭.৫০	১৯৬৭-৬৮
৬.	মেহেন্দিগঞ্জ মৎস্য বীজাগার (পোনা উৎপাদন খামার)	চুনার চর	৭.০০	১৯৬৭-৬৮

জীবজন্তু-পাখি-গাছপালা

একদা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গাছপালা আর জীবজন্তুর অভাব ছিল না। মনুষ্যবসতি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তুও লোপ পেতে থাকে। ভাঙায় এক সময় বন্য মহিষ চিতাবাঘ দেখা যেত। চিতা ছিল জেলার সর্বত্র। তখন জঙ্গলের পরিমাণ বেশি থাকায় বন্যজন্তুদের বসবাসের সুবিধা ছিল যথেষ্ট। এখন চিতা আর হরিণ দেখা যায় ভোলা অঞ্চলে। ভাণ্ডারিয়া বিল অঞ্চলে একধরনের হরিণ আছে।

নানাধরনের পাখি দেখা যায়। বাংলার চিরপরিচিত শালিক, বুলবুল, কোকিল, বউ কথা কও, মাছরাঙা, ভরতপাখি, টিয়া, পায়রা, চড়ুই প্যাঁচা, কাক, চিল, শকুন, বাজ এসব তো আছেই। তাছাড়া জলা ও ঝিল এলাকায় দেখা যায় কাদাখোঁচা, হাঁস, বাজহাঁস, বক, সারস কোড়া, কালিম প্রভৃতি।

বাকরগঞ্জ এলাকায় যে এক সময় সুন্দরী গাছ ছিল একথা আজ কারও বিশ্বাস হবে না। সুন্দরবন নাম হয়েছে সুন্দরীগাছের কারণে। কাঠের রঙ লাল। দেখতেও সুন্দর। বাকরগঞ্জ জেলার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে বহুকাল আগে সুন্দরী গাছ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। বুকরী-মুকরী দ্বীপ বিভাগপূর্বের সময়েও ছিল জঙ্গলময়। তা সত্ত্বেও এই দ্বীপে একটিও সুন্দরী গাছ ছিল না। পার্শ্ববর্তী

১নং চোপা দ্বীপে দু'চারটি কমবয়সী সুন্দরীগাছ তিনি দেখেছিলেন। এই দ্বীপে বেশি ছিল কেওড়াগাছ। পার্শ্ববর্তী চাপালিতে সুন্দরীগাছের পরিবর্তে গোমা এবং অন্যান্য গাছপালা বেশি। এখানকার মগ অধিবাসীরা এইসব গাছের ব্যাপক চাহিদা মেটায় কাঠ সরবরাহ করে। এখনও যে অংশ সুন্দরবন নামে পরিচিত, তা আর আগেকার অবস্থা... নেই। ক্রমশ চাষাবাদ বাড়ছে। রামনা-বামনা, আহিলা এবং তুষখালির জঙ্গল কেটে চাষাবাদ শুরু হয়ে গেছে। এখানে উৎকৃষ্ট ধান পাওয়া যায়। বাকরগঞ্জের প্রান্তিক দক্ষিণে তখন জঙ্গল এলাকা ছিল। এই জঙ্গল খুবই গভীর, অন্ধকারাচ্ছন্ন, গাছপালা আকাশমুখীন, নদী এবং খাল খরস্রোতা ও কাদায় ভরা। মারাত্মক জ্বরের আক্রমণ যেমন ঘটে, তেমনি আছে কুমির।

পটুয়াখালি জেলা গঠনের ফলে বনাঞ্চলের বেশিরভাগই চলে গেছে নবগঠিত জেলায়। এখনও বাকরগঞ্জে বেশ কিছু গাছ আছে যা সচরাচর সুন্দরবনাঞ্চলেই দেখা যায়। যেসব গাছ বিশেষভাবে চোখে পড়ে তার মধ্যে আছে গাব, হরিতকী, কেওড়া, বরই বা কুল, কড়ই, সোনালু, পশুর জিন ও লোহকড়ই। "নদীর উচ্চ তীরাঞ্চল, ভিটাবাড়ি ও অন্যান্য উঁচু জায়গা বর্ষায় প্লাবিত হয় না। এসকল উঁচু জমিতে যেখানে বাগানাদি নাই সেখানে ঝোপঝাড় ও স্বাভাবিক জঙ্গল দেখা যায়। এসব জায়গায় গাছ-গাছড়া আপনা আপনি অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদের মধ্যে অনেকগুলি বেশ লম্বা হয়। অপেক্ষাকৃত লম্বা গাছ-গাছড়ার মধ্যে আছে বিভিন্ন প্রজাতি ও শ্রেণীর বাঁশ, নারিকেল, সুপারি, পাম এবং সচরাচর দৃষ্ট-শিমুল গাছ জাতীয় বৃক্ষাদি। জলাভূমির উপবিভাগ বিভিন্ন প্রকার জলজ তৃণাদি, শাপলা এবং বিশেষত মাখনার সঙ্গে জট পাকান তৃণ ও নলখাগড়ার ভাসমান স্তর দিয়ে ঢাকা অথবা ঝরা-ধানে গাছের বিস্তৃত এলাকা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। হোগলা পাতা জলাভূমির মধ্যে অথবা নদীর ধারে জন্মায়। এগুলি বেড়া ও চাল ছাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। গোলপাতা এক প্রকার তাল জাতীয় শাখাহীন বৃক্ষ। দেশের সর্বত্র [illegible] ছাওয়ার জন্যে এর পাতা চালান দেওয়া হয়। গোলপাতার ফল খাওয়া যায় এবং রস [illegible] তৈরি হয়। এতদ্ব্যতীত এ জেলায় আম, বাদাম, কলা, জাম, তেঁতুল, বেল, জলপাই ইত্যাদি [illegible] গাছগাছড়া জন্মায়।" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ. ১৫)

গোল পাতার রস থেকে এক রকম দেশী মদও তৈরি হয়। সুন্দরবন অঞ্চল [illegible] বেত থেকে উৎকৃষ্ট মানের ঝুড়ি তৈরি হত একসময়।

গাব গাছ জেলার সম্পদ। এই গাছের ফল দিয়ে একরকম আঠা তৈরি [illegible] এবং মাছ ধরার জালে ব্যবহার করা হয়। সুন্দরবনাঞ্চল, নদীর ধার এবং জনবসতি এলাকা [illegible] গাছ দেখা যায়। একটি নৌকায় বছরে চারবার গাবের আঠা লাগাতে হলেও বালাম নৌকা[illegible] লাগাবার প্রয়োজন হয় না। আঠা তৈরির আগে ঢেঁকিতে গাবের ফল [illegible]ড়া করে সেই [illegible] মিশিয়ে জ্বাল দেওয়া হত। সেই আঠা কোন কৌটায় ঢাকা বন্ধ করে রাখা হয়, যাতে [illegible] এবং মশা না বসে। এই আঠা মশার প্রিয় খাদ্য। নৌকায় লাগাবার আগে আঠার [illegible] বা জঙ্গল পোড়ান ছাই মেশান হয়।

কৃষিসম্পদ

কৃষিপ্রধান জেলার শতকরা ৮৫ জনই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ধান, [illegible] তিল, সরিষা, আখ, কলা, নারকেল উৎপাদন অন্যান্য জেলা অনুপাতে বেশি [illegible] চাষে জেলার খ্যাতি বহুদিনের। ধানের মধ্যে আমন, আউশ, বোরো সবই চাষ হলেও [illegible] ফলন বেশি। পাট চাষও যথেষ্ট। রসুন, আদা, হলুদ, তরমুজ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, [illegible], মূলা, শিম, ঢ্যাঁড়শ, করলা, কচু, পটল, শসা, আলু, তুলা প্রভৃতির ফলন এখনও উল্লেখযোগ্য।

'৮৪ সালের জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে জেলার মোট জমির পরিমাণ ১৬৬৯,১২০ একর এর মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ এগার লক্ষেরও বেশি। এখন এই পরিমাণ অনেক বেড়ে

যাওয়া স্বাভাবিক। কারণ, এই হিসাবটি ১৯৭৪-৭৫ সালের। জেলার কৃষি নির্ভরতা বহুকালের। একটি পরিসংখ্যান থেকে তা বোঝা যাবে ঃ

মহকুমা (এখন জেলা) ভিত্তিক জমির পরিসংখ্যান ঃ ১৯৪০-৪২

	বর্গমাইল হিসাবে	চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ		চাষযোগ্য পতিত		চাষ বহির্ভূত	
	সমস্ত জমির পরিমাণ	বর্গমাইল	শতকরা	বর্গমাইল	শতকরা	বর্গমাইল	শতকরা
বরিশাল	৯১৫.৫৬	৭৫৫.৭১	৮৩	৫৮.৪০	৬	১০০.৯২	১১
পিরোজপুর	৫৫১.০৭	৪৬৯.৪৯	৮৫	২৯.৩৫	৬	৫২.২২	৯
ভোলা	৬৫৪.০৮	[illegible]	৮৩	২৭.৩৬	৫	৭১.৪৬	১২

জেলার এক বা একাধিক ফসলী জমির পরিমাণ (একর হিসাবে)

	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫
এক ফসলী জমির পরিমাণ	৭,৮২,৪৫০	৭,১০,০০০	৭,৭৪,৫৫০
দুই ফসলী জমির পরিমাণ	২,২২,৯৫০	২,৫০,০০০	২,২১,৪৭০
তিন ফসলী জমির পরিমাণ	১,৭০,৯০০	১৭৪,০০০	১,৫১,১০০

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং লবণাক্ততা জেলার চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক। তা সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন কমবেশ ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। সামুদ্রিক ও বড় বড় নদীবাহিত জলরাশির প্লাবনে চাষের ক্ষতি হয় প্রতি বছরই। "সাইক্লোনের সময় বঙ্গোপসাগরের থেকে উত্থিত প্লাবনের ফলে এ জেলার দক্ষিণভাগ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণতঃ এই প্লাবন জুন অথবা অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হয়ে থাকে। প্লাবনের জন্য উপকূলবর্তী কয়েক মাইল পর্যন্ত জমির উপর বালির স্তর পড়ে; ফলে ঐ বছরের ফসলই কেবল নষ্ট হয় না, পরবর্তী কয়েক বছরের জন্যে জমি তার উৎপাদন ক্ষমতা অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া জলোচ্ছ্বাসের ফলে প্রাণহানির সংখ্যাও হয় বেশ। লোনাপানির অনুপ্রবেশের ফলে জমির গুণগত মানের অবনতি ঘটা ছাড়াও সামুদ্রিক পানিতে আশেপাশে দীঘি-পুকুর ভরে যাওয়ায় খাওয়ার পানি হিসেবেও তা অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ ৬৩)।

এই চরম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাকরগঞ্জ বাংলা দেশের অন্যতম কৃষিপ্রধান জেলা। এখানকার মাটি সর্বত্র, কৃষি উপযোগী না হলেও, বেশ কয়েকটি এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। কয়েকটি উপ-জেলার মাটির গুণাগুণ পর্যালোচনা করা হয়েছে জেলা গেজেটিয়ারে। সেই পর্যালোচনায় বলা হয়েছে ঃ

গৌরনদী ঃ এখানকার উঁচু জমি রবিশস্য ও হেমন্তকালীন ফসলের উপযোগী। বিল এলাকায় অল্প জলে ভাল ধান হয়। মাটি মাঝারি ধরনের।

মেহেন্দিগঞ্জ ঃ এখানকার অধিকাংশ বেলে-দোয়াশ মাটিতে সব রকমের ফসল চাষ হয়, সুপারি সব থেকে বেশি পাওয়া যায়।

ঝালকাঠি : এখানকার মাটি শক্ত কাদাযুক্ত।

নলছিটি : এখানকার মাটি শক্ত কাদাযুক্ত। পলি পড়ে কম।

কোতোয়ালি : উত্তর দিক বাদে বাকি অংশে কাদামাটির ভাগই বেশি—যা সাধারণভাবে চাষের অনুকূল।

বাকরগঞ্জ : ধান চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল মাটি এখানে।

বোরহানউদ্দিন : সাগরের জলোচ্ছ্বাসে প্রায়ই পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের জমি প্লাবিত হওয়ায় চাষের ক্ষতি হয়। সে কারণে মোহানা সন্নিহিত এলাকা বাদে অন্য অঞ্চলের জমি বেশ উর্বরা। এবং ফসল ফলনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য।

স্বরূপকাঠি : এখানকার বিলে ধান হয় ভাল, যদি সে জমির জল আবদ্ধ হয়ে না থাকে। উত্তর-পূর্ব দিকের-তুলনায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকের জমি ফল চাষের উপযোগী।

পিরোজপুর : একসময় এখানে ভাল ফলের বাগান ও ধানের উৎপাদন ছিল পর্যাপ্ত। কিন্তু ক্রমশই সামুদ্রিক লবণাক্ত জলের প্রবেশে চাষাবাদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে।

ভাণ্ডারিয়া : এই উপ-জেলার উত্তরাংশে প্রচুর সুপারিগাছ জন্মায়।

মঠবাড়িয়া : এখানকার বিশখালি সন্নিহিত ভূমি চাষের উপযোগী। কিন্তু ধলেশ্বরী পার্শ্ববর্তী এলাকা বেলে ও লবণাক্ত।

ভোলা : এই উপ-জেলায় পর্যাপ্ত সুপারিগাছ আছে।

জেলা গেজেটিয়ারের এই তথ্য থেকে সমগ্র জেলার চাষাবাদের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে চাষের কাজে সেচের জল সরবরাহ পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। সেচ মাধ্যমগুলির অন্যতম হল পাওয়ার পাম্প, টিউবওয়েল, দুন, সাইং বাস্কেট এবং খাল।

ধানই জেলার প্রধান ফসল। তার মধ্যে শীতকালীন আমন ধানের পরিমাণ বেশি। তবে এই আমন ধানের পক্ষে জেলার সব অংশের জমিই উপযোগী নয়। দক্ষিণের জমি লবণাক্ত হওয়ায়, তা আমন চাষের অনুপযোগী। আমন চাষ হয় দুভাবে ছিটান অথবা বোনা। যে পদ্ধতিতে আমন চাষ হয় :

ফাল্গুন থেকে বৈশাখ—ছিটানো আমন বোনা হয়। কাটা হয় কার্তিক-পৌষ।

আষাঢ় থেকে শ্রাবণ—বোরো আমন লাগানো হয়। কাটা হয় চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ।

আউশ ধানের জন্য উঁচু জমি লাগে। চৈত্র মাসে বোনা এবং ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি কাটা হয়। বোরো ধানের চাষ হয় অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি। বিলের জল শুকিয়ে যাওয়ার পর সেই জমিতে এই চাষ হয়ে থাকে।

বাকরগঞ্জের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে ধান। তারপরই আসে ফলের বাগান। এইসব বাগানে সুপারি, আম, কাঁঠাল, খেজুর, নারকেল, পেয়ারা গাছ প্রচুর। রপ্তানিও ব্যাপক।

গৌরনদী ও মেহেন্দিগঞ্জে পাটের চাষ হয় বেশি। ১৯৭১-৭২ সালে ২৫,৫৩৫ একর জমিতে পাট চাষ হয়েছিল। উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৯,৫৪০ বেল। আর ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৯,৩১০ একর জমিতে পাট চাষ হয়। উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩০,৪৯৫ বেল।

বাকরগঞ্জে দুধরনের আখ চাষ হয়—খাগড়াই এবং বোম্বাই। খাগড়াই আখ থেকে গুড তৈরি হয়। বোম্বাই আখ প্রধানত চিবিয়ে খাওয়া হয়। সব থেকে বেশি আখ চাষ হয় গৌরনদী, মুলাদি এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপ-জেলায়।

রবিশস্যের অন্যতম ছোলা, মুগ, মুসুরি, মাসকলাই, খেসারি, সরিষা, তিল, তিসি প্রভৃতি। কোতোয়ালি এবং বাকরগঞ্জ এলাকায় সব থেকে ভাল মুসুরি ও খেসারি উৎপন্ন হয়।

ভোলা জেলায় সব থেকে ভালো লঙ্কার চাষ হয়।

নানারকম কচুর চাষের মধ্যে মানকচু ও পানিকচু উল্লেখযোগ্য। নদীর ধারের উঁচু জমিতে মানকচু এবং বিল ও জলাভূমিতে পানিকচুর চাষ হয়। মানকচুর বড় বাজার হল ঢাকা ও ফরিদপুর। সেখানে রপ্তানি হয় এই জেলা থেকে।

বাকরগঞ্জের অন্যতম উৎপাদন পান—যার চাহিদা ক্রমবর্ধমান। বাংলাপান, মিঠাপান, মাঘীপান, ছাঁচি পানের উৎপাদন ক্রমশ বাড়ছে। ঢাকায় এই পানের চাহিদা সবথেকে বেশি। গৌরনদী, বাউফল এবং পিরোজপুরে পানের বড় বড় বরোজে পান পাওয়া যায়। গৌরনদী ও তারকিতে পানের বাজার ছিল সব থেকে বড়। দেশভাগের আগে অধিকাংশ পানের বরোজের মালিক ছিল স্থানীয় বারুই সম্প্রদায়ের হিন্দুরা।

বিভারিজ বাকরগঞ্জে নীলের চাষ দেখতে পাননি। কিন্তু তাঁর পঞ্চাশ বছর আগে নীলের চাষ হত। ন্যাথানিয়েল মোনরো নামে এক ব্যক্তির নীলকারখানার উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এই ব্যক্তি ছিল লবণ দপ্তরের কর্মী। তার নীলকারখানার বড় বড় চৌবাচ্চা ছিল পঞ্চাকরণ এবং কাণ্ডাসুরায়।

জেলায় চাষে মহিষ ও বলদের ভূমিকায়ই প্রধান। এইসব পশুর নিতান্তই কষ্টকরভাবে বেঁচে থাকতে হয়। ভোলা ও পিরোজপুরে দুটি পশুহাসপাতাল, জেলা সদরে একটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে। পশুদের মধ্যে রোগ দেখা দেয় প্রতিবছর। গৌরনদীর কসবায় এবং বরিশাল থানার কাউনিয়ায় দুটি গরুর হাট বসে নিয়মিত।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়

সমুদ্রের বুকে গড়ে ওঠা, সমুদ্রের প্রতিবেশী বাকরগঞ্জের ইতিহাসের পাতা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনায় বারবার বিপর্যস্ত। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং তীব্র ঝড়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে তার বিবরণ। আবুল ফজলের বিবরণ থেকে জানা যায় : "...বাকলা সরকার সমুদ্রতীরে অবস্থিত; এখানকার দুর্গ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে নির্মিত। এখানে সমুদ্রজল, শুক্ল প্রতিপদের দিন হইতে বাড়িতে আরম্ভ হয় এবং চতুর্দশী পর্যন্ত বাড়িতে থাকে; তাহার পর হইতে চান্দ্রমাসের শেষ দিন পর্যন্ত কমিতে থাকে। বর্তমান বাদশাহের রাজত্বের ঊনবিংশ বৎসরে একদিন অপরাহ্ন তিনটার সময়ে সমুদ্রের জল বাড়িতে আরম্ভ হয়; অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন জলপ্লাবন হয় যে, সমস্ত বাকলা সরকার জলমগ্ন হইয়া যায়। বাকলার রাজা সেদিন একস্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। সমুদ্রের জল ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তিনি একখানি নৌকায় আরোহণ করেন। রাজপুত্র পরমানন্দ রায় কতকগুলি অনুচরসহ একটি উচ্চমন্দিরের চূড়ায় আরোহণ করেন। সওদাগরগণ যেখানে একটু উচ্চভূমি পাইল, সেইস্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমাগত পাঁচঘণ্টা ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি ও অশনিপাত হইয়াছিল, সমুদ্র ও উত্তাল তরঙ্গ ফুলিয়া সমস্ত রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। ঘর-বাড়ি সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া স্রোতের বেগে, প্রবল বায়ুর প্রকোপে কোথায় চলিয়া গেল; কেবলমাত্র দেবমন্দির ব্যতীত আর কিছুরই চিহ্ন রহিল না। প্রায় দুইলক্ষ প্রাণী জীবন বিসর্জন করিল।"(—আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী—আবুল ফজল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত। কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ। পৃ. ৯৭।)

এই প্লাবন ঘটে ১৫৮৫ সালে। তখন বাকরগঞ্জের রাজা ছিলেন জ্ঞানদানন্দ রায়। এই সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল সমুদ্রের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে।

মূলত কৃষি প্রধান এলাকা, চালের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র হলেও ভয়ঙ্কর খাদ্যাভাব ঘটেছে একাধিক বার। এর অন্যতম কারণ বন্যা এবং সামুদ্রিক ঝড়। অকালবন্যায়ও বহুবার ফসল নষ্ট হয়েছে, পোকাতে ধান নষ্ট করেছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে খাদ্য সংকট।

১৭৮৭ সালের নদী প্লাবন/দুর্ভিক্ষ

এই প্লাবনের কারণ তিস্তার বিধ্বংসী বন্যা। আমন ধান ওঠার আগে এই বন্যা হওয়ায় সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং বন্যার পরে মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষে মারা যায় মানুষ ও গৃহপালিত পশু। সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ছিল ইদি‌লপুর, মাইজারদী এবং শ্রীরামপুর।

১৮২২ সালের সামুদ্রিক ঝড়

লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু, ভোলার গবাদি পশু, সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্য এবং জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। একে বলা হয় "১২২৯ সনের বন্যা।" এই জলপ্লাবন ঘটে ১৮২২ সালের ৬ জুন। এই দিন সন্ধ্যার সময়ে ১২০ মাইল বেগে সামুদ্রিক ঝড় প্রবাহিত হয়েছিল। সমস্ত নদী ফুলে ফেঁপে ওঠে। ঘর বাড়ি বেশির ভাগ জলে ডুবে যায়। হাতিয়া দ্বীপ সম্পূর্ণ জলের নিচে চলে যায়। জীবিত জন প্রাণীর চিহ্নমাত্র ছিল না।

১৮৬৯ সালের সামুদ্রিক ঝড় ও প্লাবন

এবারের সামুদ্রিক ঝড়ে ও জলপ্লাবনে নাজোয়াট জলে ভেসে যায়, গ্রামাঞ্চলে গবাদি পশু মারা যায় জলে ডুবে এবং আউশধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই প্লাবনের একমাসের মধ্যে ভোলা দ্বীপ প্লাবিত হওয়ায় দ্বীপের পানীয় জল নষ্ট হয়ে যায় এবং মহামারী দেখা দেয় ব্যাপক আকারে।

১৮৭৬ সালের সামুদ্রিক ঝড় ও প্লাবন

এই ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড়, প্লাবন ও কলেরা মহামারী সম্পর্কে জানা যায় : "...এ ঝড় ৩১শে অক্টোবর সন্ধ্যাবেলায় আরম্ভ হয়। রাত্রি ১০টা থেকে ৩টা পর্যন্ত প্রচণ্ডবেগে উত্তরের বাতাস প্রবাহিত হয়। বায়ুর প্রচণ্ড গতি অস্বাভাবিক বেগে সামুদ্রিক ঝড়কে মোহানার দিকে তাড়িত করে। সাধারণ জোয়ারের সময় জলোচ্ছ্বাস নদীর প্রবেশ দ্বারে চড়ায় বাধাপ্রাপ্ত হলে সেখানে এর উচ্চতা বেড়ে যায়। পরিশেষে এর উচ্চতা মোহানার জলরাশি অপেক্ষা অধিকতর উঁচু ও শক্তিশালী হয়ে সামনের দিকে ছুটে যায়। এর ফলে নোনাজল দ্বারা আক্রান্ত অঞ্চলের সমস্ত পানীয় জল নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমে উত্তর দিকে ধাবমান বিশাল জলরাশি দ্বীপের সমগ্র এলাকাকে ১০ থেকে ৪৫ ফুট গভীর জলে প্লাবিত করে। ভাগ্যক্রমে এ জলপ্লাবন বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। প্লাবন শুরু হয় রাত ১১টায়, জলের উচ্চতা কমতে আরম্ভ করে ভোর ৪টায় এবং সকাল ৮টার পূর্বেই অধিকাংশ জল নেমে যায়। (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ ১৭)

গেজেটিয়ারের বিবরণ থেকে আরও জানা যায় মেহেন্দিগঞ্জ এবং বরিশাল থানার কয়েকটি অঞ্চলসহ সমগ্র বাকরগঞ্জ জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল সামুদ্রিক ঝড়। নদীতীর সংলগ্ন এলাকাগুলি ৮ মাইল পর্যন্ত প্লাবিত হয়েছিল। ভোলা মহকুমার পূর্বাংশে জল উঠেছিল ২৪ ফুট। সব থেকে কম জল উঠেছিল দবিযাল থানা এলাকায়। পটুয়াখালিসহ গোটা বাকরগঞ্জ জেলায় মারা যায় প্রায় এক লক্ষ মানুষ। শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ অধিবাসী এবং অসংখ্য গবাদি পশু মারা পড়ে। চারদিকে শবদেহের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দেখা দেয় চরম পানীয় জল সংকট। অনিবার্যভাবে শুরু হয় কালান্তক কলেরা মহামারী। কলেরার ভয়ে বহু মানুষ অন্যান্য জেলায় পালিয়ে যায়। ১৮৮১ সালের জন পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় সেবার জলপ্লাবনে ৭৩,৯১৪ জন এবং কলেরায় ৪১,৫৩৭ জন মারা গিয়েছিল। মোট মৃতের সংখ্যা ছিল ১,১৫,৪৫১ জন।

১৯১০ সালের সামুদ্রিক ঝড় ও প্লাবন

সমগ্র জেলার ক্ষতি না হলেও মঠবাড়িয়া থানার কালমগা দ্বীপ ও মনপুরা দ্বীপে সামুদ্রিক ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঝড় ও জলপ্লাবনে ১০০ জন মানুষ এবং অসংখ্য গবাদি পশু মারা যায়।

১৯১৯ সালের সামুদ্রিক ঝড় ও প্লাবন

সমগ্র জেলাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিপুল পরিমাণে।

১৯৬৫ সালের ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবন

১৯৬০ থেকে ৬৫ সালের মধ্যে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে এবারই ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। ১১ এবং ১২ মে দুদিন প্রবাহিত এই ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে ছিল ১১ ফুট উঁচু জল তরঙ্গ, যা জেলার বহু স্থানকে প্লাবিত করে। মারা যায় প্রায় ১৬,৪৫৬ জন। প্লাবনে কৃষিক্ষেত্রের ওপর দিয়ে লবণ জল প্রবাহিত হয় এবং জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে একাধিক বৃষ্টিপাতে সেই লবণাক্ততা না ধুয়ে যাওয়া পর্যন্ত কোনরকম চাষ করা সম্ভব হয় নি।

১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবন

স্মরণাতীত কালের সব থেকে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আগাম সতর্কবাণী প্রচার করে আবহাওয়া দপ্তর ৯ নভেম্বর। কিন্তু ১০ নভেম্বর থেকে এলোপাথাড়ি ঝড় বইতে থাকে। ১২ নভেম্বর রাত ৮টার পর উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে এগিয়ে আসে ঘূর্ণিঝড়। একঘণ্টা একটানা ঝড় বয়ে চলে। হঠাৎ ঝড়ের দিক বদল ঘটে। এবার দক্ষিণ দিক থেকে ৭০/৮০ মাইল বেগে প্রলঙ্কর ঝড় জেলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঙ্গে ১৮ ফুটেরও উঁচু জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়ে যায় বিস্তৃত এলাকা। তখন গভীর রাত। চারদিকের পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে ওঠে। মাঝরাতে ঝড়ের গতিবেগ সামান্য হ্রাস পেলেও আবার ১০০/১২০ মাইল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। এই ঝড়ের দাপট ছিল মুহুর্মুহুঃ। ঝড়ের তীব্র গতিবেগে বাড়িঘর গাছপালা ভেঙে পরিণত হয় এক মৃত্যুপুরীতে।

এক ভিন্ন বিপর্যয়

সুবোধ দাশগুপ্তের "নবাবপুরের গল্পগুচ্ছ" নামে একটা বই আছে। তিনি ছিলেন বরিশালের মানুষ। এই বই-এ বিভাগপূর্ব বাংলার এই অঞ্চলের ছবি ধরা আছে নানা ভাবে। সমুদ্র জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত বরিশালের তৎকালীন ভোলা মহকুমার উল্লেখ করে আর এক মর্মান্তিক বিপর্যয়ের কাহিনী শুনিয়েছেন : "১২৯৩ সালটি তাৎপর্যহীন নয়। এটি কুখ্যাত তিরাশী সালের দশবছর পরে। বারোশ তিরাশি সালে বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমার দৌলৎ খাঁয়ে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার লোক মারা যায়, বহুলোক নিখোঁজ হয় সমুদ্রে ভেসে গিয়ে। মেঘনার বুকে গোটা ভোলা দ্বীপ আর্তনাদে আছাড়ি পিছাড়ি করে। ৮৩ সালের বন্যা সারা বরিশাল জেলার বৃহত্তম শোকের কাহিনী হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের ছোটবেলাতেও আমরা অতদিন আগেকার ৮৩ সালের বন্যার গল্প শুনেছি। সর্বনাশের ভয়াবহতা ব্যাপকতার কথা বুঝিনি। কিন্তু অস্পষ্ট অবুঝ এক ভীতিতে বুক কেঁপে উঠেছে।

'৯৩ সালে মাত্র দশ বছর বাদে, অতি সীমিত পরিধিতে নবাবপুরেও (উজীরপুর) একই ঘটনা ঘটে। জলে ডুবে জলে ভেসে বহুলোক নিখোঁজ হয়, মারা যায়। তবে এটা প্রকৃতির উন্মাদ খামখেয়ালির পরিণামে নয়, মানুষের বিবেচনাহীন বল্গাহারা উৎসাহের দাপটে। দৌলত খাঁর বন্যার সাথে এই ঘটনাও নবাবপুরের চারপাশে সকলের মুখে মুখে একটি প্রধান দুঃখের কাহিনী হয়ে ওঠে।...

"নবাবপুরের বাজারে নববর্ষে প্রতি পয়লা বৈশাখের দিনে দুপুরের পরে প্রায় বিকালে একটি বড় মেলা বসত। একদিকে দোকানে দোকানে হালখাতার উৎসবের প্রস্তুতি, লোকসমাগম, মানুষের ভিড়, মেলার অবাধ কেনা-বেচা, ছোটদের উদ্বেল আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর ছুটাছুটি, আর বিশেষ একটি কারণে আরও বহু বহু লোকের সমাবেশ—বাইচের, দমবন্ধ উত্তেজক প্রতিযোগিতা।

এই বাইচের প্রতিযোগিতা শুরু হত বাজারের প্রায় এক মাইল দূর থেকে। মাহার ইচলাদি ছাড়িয়ে উত্তরে প্রায় কইকোটার গায়ে কুড়ি পঁচিশখানি নৌকো জড়ো হত। লম্বা সরু হালকা ডিঙ্গি নৌকার সার। প্রতি নৌকার এধারে ওধারে দুজন করে বারোজন বৈঠাধারী মাঝি, যুবা বা তরুণই বেশি। গলুইতে বড় বৈঠাধারী প্রায়ই একটি প্রধান মাঝি, নৌকার দিক ঠিক রাখবার জন্য। আর মাঝে, নৌকার খোলে, একটি লোক কাঁসর বাজিয়ে আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে নৌকার মাঝিদের উৎসাহিত করছে। এই-ই প্রায় সব চেহারা। পনের আনা মাঝিই মুসলমান, তারাই নির্ভয়ে নৌকা চালিয়ে বিরাট বিরাট নদী পেরিয়ে সমুদ্রেও চলে যায়। তাদের কাছে এ ব্যাপারে স্থানীয় হিন্দুরা দাঁড়াতেই পারে না। মাঝিদের মধ্যে সামান্য দু এক জনই নমঃশূদ্র বা শূদ্র জাতীয় লোকও আছে।

এই বাইচ খেলাকে কেন্দ্র করেই সেদিনকার মেলার উত্তেজনা তুঙ্গে উঠত। দূর দূরান্তর থেকে এসে জুটতো লোকের ভিড়। ছড়িয়ে পড়তো নদীর দুপারে। যত বাজারের কাছে, ভিড় ততই ঘন, ততই ঠাসাঠাসি। লোক নদীর ওপরে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কাঠের পুলে ভিড় করে দাঁড়াত শ'য়ে শ'য়ে। উৎসাহে লাফাত, ঝুঁকত পুলের কাঠের ধরণি দু'হাতে আঁকড়ে ধরে। উত্তেজনা ফুটত টগবগ করে নদীকে ঘিরে।

সেদিনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। প্রথম বিকেলে ইচলাদিতে বাইচের নৌকোর ভিড়। তখন 'স্টার্ট' দেবার প্রক্রিয়া কি ছিল কে জানে, হঠাৎ ইচলাদির দিক থেকে প্রচণ্ড এক চীৎকারে বোঝা গেল বাইচ শুরু হয়েছে। লোকেরাও নদীর তীর ধরে নৌকার সাথে সাথে ছুটছে। পুলের ওপরে এরই মধ্যে লাফালাফি আর ঠেলাঠেলি। চীৎকারের শেষ নেই।

নৌকার সার যতই এগোচ্ছে, ততই চিৎকার বাড়ছে। আইনদ্দি বছুর খাঁ, নিতাই মণ্ডল মাঝিদের নাম ধরে চিৎকারে আকাশ বাতাস ছেয়ে যাচ্ছে। সামনের তিন চারটে নৌকোই যেন এগিয়ে আসছে তীব্র বেগে। তাদের মাঝিদেরও যেন এখন পষ্টাপষ্টি চেনা যায়। তাদের নাম নিয়ে হাততালি লাফালাফিতে তোলপাড় চারদিক। কথা বোঝা যায় না শুধু এক ধরনের দুর্বোধ্য জয়ধ্বনি আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। পুলের উপরের জনতা যেন সব থেকে মাতোয়ারা সব থেকে পাগল। লাফালাফি মাতামাতি কোনও রকমে একে ওকে ঠেলে ফেলে একটু উঁকি মেরে একটু দেখবার প্রয়াস, সব মিলিয়ে•সে কি এক অবর্ণনীয় অনিশ্চিত অবস্থা—ঠিক এই এক সময়েই ব্যাপারটা ঘটে গেল। মাঝখানে অনেকগুলি কাঠ আর একদিকের ধরণি মড়মড় আওয়াজ তুলে হুড়মুড় করে একসঙ্গেই ভেঙে পড়ল নদীতে। এক মুহূর্তের ব্যবধানে উন্মত্ত বিজয় উৎসব রূপান্তরিত হল চতুর্দিক কাঁপানো শোকের হাহাকারে।

হয়তো অনেকদিনের পুরনো পুল, হয়তো ভেতরে ভেতরে ঘুণধরে ক্ষয়ে গিয়েছিল ওখানকার সব কাঠ। হয়তো আজকের এমন মাতামাতি কোন পুলেরই সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল না। যাইহোক অগুণতি লোক ছিটকে পড়ল কুড়ি হাত নীচে নদীর জলে। ভয়ার্ত ঠেলাঠেলিতে একটু দূরের লোকও অনেকে পড়ে গেল জলে।

বাইচের খেলা ভেঙে গেল মুহূর্তে। নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে এগিয়ে গেল মাঝির দল, যে যাকে পারে টেনে তুলতে বাঁচাতে। পাড় থেকেও ঝাঁপিয়ে পড়ল অনেকে। এসব চেষ্টার ফলে রক্ষা পেল অনেকেই। অবশ্য প্রায় সকলেই ত সাঁতার জানে। তাদের পাড়ে এসে উঠতে কোন অসুবিধে হল না। কিন্তু তলিয়ে গেল প্রবল স্রোতের তোড়ে অল্প বয়সী ছেলে বুড়ো আর বেকায়দার বেঘোরে পড়ে যাওয়া বেশ কিছু লোক। সংখ্যায় কত কেউ জানে না, জানবার উপায় কোথায়?

মেলা, হালখাতা তাও প্রায় ভেঙে গেল এমন অবস্থায়।

থানার সদর আঠারো মাইল দূরে। সেখান থেকে লোক এল পরদিন দুপুরে। জেলার সদর থেকেও এলেন তিনজন বড অফিসার। কিন্তু সত্যি যে কত লোক মারা গেল, সরকারি রিপোর্টে

দেখা গেল তার স্পষ্ট কোন হিসেব নেই। তিনচার মাইল দূরে পর্যন্ত অল্প কিছু শব পাওয়া গিয়েছিল পরে দু-তিন দিন ধরে।

* * *

এই ভয়াবহ ঘটনার উপরে একটা গ্রাম্য ছড়ার কয়েকটা লাইন শুনেছিলাম ছোটবেলায়। কিছু তার এখন মনে আছে : সন বারশ' তিরানব্বই সালে।

তেহার (মেলা), মেলে নবাবপুরের মোকামে
সন বারশ' তিরানব্বই সালে
লোক জুটিছেন কাতারে কাতারে।
তারা-তেহার দেইখ্যা কইব আছেন বাহার
আহাঃ গান বাদ্য মনে।
ওহো, দারুণ বিধি বাদী হইলেন রে,
অমঙ্গল ঘটিলেক নবাবপুর।
পুলেতে লোক হাজারে হাজার।
তখন তক্তা ছুটে কুলুপ ছুটে
লোক পড়িল নদীরই মাঝার।
ভাইরে, কত ডুবল, ভাইসে গেল, তার হিসাব মেলাই ভার।

নবাবপুরের গল্পগুচ্ছ—সুবোধ দাশগুপ্ত। পৃ. ৬৭-৭১

অর্থনৈতিক অবস্থা

নদীবহুল কৃষিনির্ভর জেলা। জনসংখ্যার অধিকাংশের বেঁচে থাকা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ভূমি নির্ভর জীবনযাত্রা ছিল সহজ। স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হত মানুষের জীবন। উনিশ শতকের জনজীবন সম্পর্কে জানা যায় : "জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। এখানকার প্রায় প্রত্যেক অধিবাসী, এমন কী গৃহভৃত্যগণও অল্প-স্বল্প জমির মালিক। তারা তাদের পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য ধান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করে থাকে। এই কারণে এখানে মজুরীর বিনিময়েও শ্রমিক পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। ফসল কাটার মৌসুমে যখন শ্রমিকের চাহিদা খুব বেশি থাকে তখন তাদের মজুরী দৈনিক এক শিলিং পর্যন্ত উঠে। গ্রামবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ এবং শাকসবজী। কিন্তু স্বচ্ছল মুসলমানরা খাদ্য হিসাবে প্রাণীজ আমিষ, বিশেষ করে হাঁস, মুরগী এবং খাসির মাংস পছন্দ করে। একজন শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা নির্বাহের মাসিক গড়পড়তা ব্যয় প্রায় ৬ শিলিং বলে মোটামুটি হিসাব করা হয়। বড় বড় গ্রাম ব্যতীত অন্যত্র জন বসতিগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। জেলার দক্ষিণাঞ্চল সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অধিবাসীগণ গ্রামে কদাচিৎ একত্রে বসবাস করে। প্রতিবেশীদের কথা চিন্তা না করে প্রত্যেকে নিজ নিজ জমির সবচেয়ে উঁচু জায়গায় বসতবাড়ি তৈরি করে। ফলে বসতবাড়িগুলি একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক বাড়ির চারপাশে ঘন নারিকেল ও সুপারি গাছের বেষ্টনী আছে। এইভাবে দেখা যায় যে পরিবারগুলির পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ অতি অল্পই থাকে এবং প্রতিবেশীর বাড়িতে কদাচিৎ যাতায়াত হয়। জেলা পুলিশ সুপারের রিপোর্ট দ্রষ্টে আমার ধারণা যে এ বিচ্ছিন্নতার জনাই এখানে সমাজিক বাধ্য-বাধকতার কোন বালাই নেই এবং এজন্যই তাদের স্বভাব দুর্বিনীত এবং উগ্র।" (W. W. Hunter, Statistical Account of Bengal Vol. V p. 2/1.. থেকে অনূদিত। বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার (১৯৮৪) পৃ. ৮৪)।

বিভারিজের বিবরণেও বাকরগঞ্জের স্বচ্ছল জীবনযাত্রার বিবরণ আছে। তিনি লিখেছেন : "বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাকরগঞ্জের মানুষের অভাব অনটন কম। জেলার জমি উর্বরা। রায়তরা স্বচ্ছলতার মধ্যে বসবাস করে। ধান চাল প্রচুর তাদের। খানা ও ডোবা মাছে ভরা,

বাগানভর্তি নারকেল, সুপারি, কলা। তারা লবণ, পোশাক আর তামাক ছাড়া কিছুই কেনে না।" (H. Beveridge—District of Bakarganj, Its History and Statistics—p. 192. বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার (১৯৮৪, পৃ. ৮৪)

কৃষি প্রধান জেলা। শিল্প বিকাশের তেমন সুযোগও নেই। শিল্প বলতে একমাত্র কুটির শিল্প। কুটির শিল্পে উল্লেখযোগ্য হল তাঁত, মাটির জিনিসপত্র, গেঞ্জি কারখানা, ইটভাটা, শীতল পাটি, মাদুর এবং নৌকা শিল্প। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকায় এই জেলার মানুষের ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্পগঠনে তেমন উদ্যোগ ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সবটাই পরিচালনা করত অন্য জেলার মানুষ। চাল, ডাল, মরিচ, পাট, নারকেল, সুপারি, পান এসব রপ্তানি হত। তবে সব থেকে বেশি রপ্তানি হত চাল।

এক সময়ে লবণ শিল্পের খ্যাতি ছিল। সেই লবণ স্বাভাবিক এবং সহজ পদ্ধতিতে পাওয়া যেত। কিন্তু কোম্পানি আমলে এই লবণ উৎপাদকদের নানাভাবে বিব্রত করা হত। প্রথমে কোম্পানি কর্মচারীরা লবণ ব্যবসা আত্মসাৎ করে। পরে লিভারপুল থেকে সস্তা দরের লবণ আমদানির পর এদেশে লবণ উৎপাদন ব্যবস্থার মৃত্যু ঘটে। বাকরগঞ্জের যে সব চর ভূমিতে লবণের সহজ উপকরণ মিলত, সেখানে চাষাবাদ শুরু হয়ে যায়। বিভারিজ লিখেছেন, বাকরগঞ্জের প্রাকৃতিক লবণের স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রয়োজনীয় লবণের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয় য়ুরোপের দিকে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এখানে লবণ উৎপাদন সম্ভব হবে। তিনি লিখেছেন :
'...It is obtained from the sea, and can also be extracted from the earth. The soil of new formations in the district is impregnated with salt, and in some of the chars for example, inparts of Dakhin Shahbazpur—the salt efforescence is sufficient to make the surface of the soil quite white, as if covered with hoarfrost. It has often been supposed that the illicit manufacture of salt is common in the district and this has led to a stringest system of salt—passes &c. It is however, impossible that the manufacture can take place on a large scale for apart from all other difficulties, the want of a sufficient quantity of fuel must prevent this. It is on the chars that the soil is most favourable for salt-making, but these are now highly cultivated in most parts, and there is comparatively little jungle. (H Beveridge—District of Bakarganj its History and Statistics. p. 258-59)—
জঙ্গলের গাছ কেটে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হত লবণ তৈরির সময়ে। চর অঞ্চলে দীর্ঘকাল ছিল জঙ্গল। তখন সেখানে চাষাবাদের কথা কেউ চিন্তাও করেনি। যেমন দক্ষিণ শাহবাজপুরের দ্বীপে বিশাল জঙ্গলে বাঘ থাকত। অথচ বড় জোর একটা চিতার দেখা পাওয়া যেত শেষ দিকে। চরের জঙ্গলের কাঠই ছিল লবণ তৈরির জ্বালানি। যার ফলে সেই জঙ্গলের বড় বাঘ অন্যত্র চলে যায়। চরের এক মুঠো লবণাক্ত মাটিতে লবণের পরিমাণ এত বেশি ছিল, যা দিয়ে সহজেই রান্নার কাজ চলত। নারকেল পাতা এবং বাঁশের পাতা পুড়িয়ে যে লবণ তৈরি হত, তা দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী বিভিন্ন পরিবারের বিধবারা রান্নায় ব্যবহার করত।

সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৪০-৪২, ১৯৪৫-৫২ সালে বাকরগঞ্জকে সব থেকে বেশিপরিমাণ চাল উৎপাদনকারী জেলা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আজও চাল উৎপাদনে বাকরগঞ্জের খ্যাতি ম্লান হয়নি। এখানকার বালাম্ চালের নানারকম শ্রেণীর মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য ছিল 'চির গোইরভূযি' এবং 'খিরোইজলী'। চাল রপ্তানিতে বাকরগঞ্জ জমজমাট হয়ে উঠত। বিভারিজের বিবরণে আছে, চাল রপ্তানির সময় হল নভেম্বর থেকে মার্চ। বাকরগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ নলছিটি, ঝালকাঠি এবং নিয়ামতি ছিল প্রধান চালের বাজার। সারা বাংলা থেকে নৌকা এসে এখানে। স্থানীয় ট্রেজারিতে শুরু হয়ে যেত ব্যস্ততা। শুনলে অনেকেই অবাক হবেন, চালরপ্তানিতে বাকরগঞ্জ জেলা সবার থেকে এগিয়ে থাকলেও এই জেলায় ধানের আমদানি করতে হত। বিশেষ করে বর্ষার সময়। ধান আমদানি হত ত্রিপুরা, মৈমনসিংহ এবং সিলেট থেকে। চাল আমদানি হত প্রধানত ঝালকাঠি, বাবুগঞ্জ এবং মীরগঞ্জ থেকে। আমন ধান যখন প্রায় শেষ, সে সময়ে আসত

এই আউশ ধান। বাকরগঞ্জের চাল এত উৎকৃষ্টমানের এবং চাহিদা এত ব্যাপক ছিল যে প্রায় সব চালই রপ্তানি হয়ে যেত। স্থানীয় চাহিদা মেটাবার মত সঞ্চয়ও থাকত না। সে কারণে, ঘাটতি পূরণ করতে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি থেকে আনা হত আউশ ধান। তাছাড়া বাকরগঞ্জ এবং কলকাতার মধ্যে যাতায়াত ছিল সহজসাধ্য। নদীপথ ছিল যথেষ্ট প্রশস্ত। পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি, যেমন ত্রিপুরা, ছিল কলকাতার বাজার থেকে বহু দূরবর্তী। নদীপথ সুগম্য ছিল না। যে কারণে, বাকরগঞ্জকে কেন্দ্র করেই চালের বড় বাজার গড়ে উঠেছিল।

বিভারিজের বিবরণে ধান চালের দরদামও জানা যায়। ১৭৯৭ সালে ৩ মণ ধানের দর ছিল এক টাকা, সে সময়ে ইদিলপুর পরগনায় টাকায় ৮ মণ ধান পাওয়া যেত। বিভারিজের সময়ে (১৮৭৬) ধানের দর ছিল এক টাকায় এক মণ। টাকায় ১৭ সের ভাল চাল পাওয়া যেত বরিশালে ১৮৭৫ সালে। সাধারণ চাল পাওয়া যেত টাকায় ২১ সের। ৪০ সের ধান থেকে পাওয়া যেত ৩০ সের চাল।

চালের পরেই সুপারি জেলার অর্থনীতিকে শক্ত করেছে। সুপারির রপ্তানি পরিমাণ কম ছিল না। অক্টোবর মাসে গ্রামাঞ্চল থেকে সুপারি সংগ্রহ করা হয়। ব্যবসা চলে সারা শীতকাল ধরে। দৌলত খাঁ, মেহেন্দিগঞ্জের লালগঞ্জে এবং নলছিটিতে সুপারির বাজার গড়ে ওঠে। আরাকান অঞ্চলের মগ, বর্মী এবং চীনা ব্যবসায়ীরা শীতের সময় নলছিটি আসত সুপারি কিনতে। নলছিটির মগ পাড়ায় থাকত সুপারির ব্যবসায় জড়িত মগরা। এখানেই এসে ভিড়ত তাদের নৌকা। কখনও সুপারি সরাসরি রপ্তানি হত চট্টগ্রাম এবং আরাকানে। সেখান থেকে স্টিমারে পাঠান হত কলকাতায়।

সুপারি সব থেকে বেশি পাওয়া যায় দক্ষিণ শাহবাজপুর এবং জেলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে। বাকরগঞ্জের প্রতিটি বাড়িতেই একসময়ে বেশকিছু সুপারি গাছ থাকত। জেলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে যারা কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছুক ছিল, তারা সুপারি বিক্রি করেই সংসার নির্বাহ করত।

দক্ষিণ শাহবাজপুরে প্রচুর নারকেল গাছ। এই নারকেল আভ্যন্তরীণ চাহিদা যেমন মেটায়, তেমনি রপ্তানিও হয় বিপুল পরিমাণ। তাছাড়া স্থানীয় ছোটখাট মিলে নারকেল তেল তৈরি হয়। চট্টগ্রাম থেকে ব্যবসায়ীরা এক সময়ে দক্ষিণ শাহবাজপুর আসত মাটির তেল নিয়ে। বিনিময়ে তারা নিয়ে যেত নারকেল।

বাকরগঞ্জের চিনি আমরা ছেলেবেলাতেও খেয়েছি। গোটা বাংলা জুড়ে ছিল এই চিনির চাহিদা। জেলায় উৎপাদিত চিনির মধ্যে সব থেকে বেশি খ্যাতি ছিল জাবর অমলের। গুণগত দিক থেকেও ছিল উৎকৃষ্ট। পিরোজপুর জেলায় জাবর অমলে ছিল চিনির প্রধান বাজার।

বাকরগঞ্জের অর্থনীতিতে আখের ভূমিকা নগণ্য নয়। জেলার প্রায় সব উঁচু জায়গায় আখ চাষ হয়। সাধারণ নদী তীর উঁচু হওয়ায় সেখানেই আখ চাষ বেশি দেখা যায়। আখ চাষ যথেষ্ট খরচ এবং ব্যয় সাপেক্ষ। আখ চাষের জমির মাটি তৈরি করতে হয় সযত্নে। আখের রস উৎকৃষ্টমানের পানীয়। আখ থেকে তাড়িও তৈরি হয়।

কাঠ এই জেলার অন্যতম সম্পদ। প্রচুর জ্বালানী কাঠও আছে। জেলার দক্ষিণে বিস্তৃত সুন্দরবন অঞ্চল ছিল কাঠের ভাঁড়ার। জঙ্গল থেকে সুন্দরী কাঠ কেটে নৌকা তৈরিতে ব্যবহার করা হত। এমন কী শালকাঠে তৈরি নৌকার নিচের অংশে থাকত সুন্দরীকাঠ। কারণ, লবণাক্ত জলে সুন্দরীকাঠের ক্ষতি হয় না। কেওড়া, গোমা, বোলি জাতীয় গাছ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ছিল প্রচুর। কেওড়া ও গোমা কাঠ দিয়ে পোস্ট তৈরি হত। বোলি কাঠের ছাই-এ লবণ ও পটাশের পরিমাণ বেশি থাকায়, ধোপারা সাবানের পরিবর্তে ব্যবহার করত। বোলি গাছের ভিতরে আঁশ এত শক্ত যা দড়ির পরিবর্তে ব্যবহার করা হত ঘরের চালা বাঁধার কাজে এবং গরু মহিষ বাঁধতে।

বাকরগঞ্জে কাঠুরে ছিল প্রচুর। তারা চাষাবাদও করত। বাউলি নামে পরিচিত ছিল এরা। এদের নৌকাকে বলা হত বাউলি নৌকা। এগুলো শক্ত ও মজবুত খোলা নৌকা। এই নৌকার দুপাশে সুন্দরীর কাঠ বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। সুন্দরীকাঠ ভারি হওয়ায়, ভেসে থাকতে পারত না।

বাকরগঞ্জের বহু প্রাচীন ব্যবসা নোনা ইলিশ এবং ইলিশ শুটকি। লবণ না দিয়ে রোদে মাছ ফেলে এই শুটকি তৈরি করা হয়। জেলার দক্ষিণে শুটকি মাছের ব্যবসা ক্রমশ বড় আকার নেয়। যার অধিকাংশই পড়েছে পটুয়াখালি জেলায়। চট্টগ্রাম এবং যশোর থেকে ব্যবসায়ীরা নৌকো করে আসে শুটকি কিনতে।

নৌকা শিল্পের প্রসার ও বিকাশের মূলে ছিল অসংখ্য নদীপথ। নানাধরনের নৌকা নির্মাণে দেশীয় কারিগরদের খ্যাতি ছিল। মেনদিগঞ্জের দেবাইখালি এবং শামপুরে তৈরি হত উচ্চমানের কোশা নৌকা। আগারপুরের কাছে ঘণ্টেশ্বরে এবং পিরোজপুরের বরষাকাঠিতে তৈরি হত পানসি। বরষাকাঠি মালবহনের বড় আকারের নৌকা নির্মাণে সুনাম অর্জন করে। সুন্দরবনাঞ্চলে কেরুয়াকাঠ থেকে মগরা একরকম ডিঙি বানাত। ঝালুকাঠিতে সুন্দরীকাঠ থেকে একধরনের ডিঙি তৈরি হত। এসব ছাড়াও নানাধরনের নৌকা পাওয়া যেত কালীগঞ্জ, বাকরগঞ্জ, ফালাগড়-এ।

নৌকা নির্মাণ বাকরগঞ্জ জেলার অন্যতম শিল্প। এই শিল্পের বিকাশ ঘটে বহু আগেই। অসংখ্য মানুষের জীবিকার মাধ্যম এই শিল্প। তাছাড়া নৌকা ব্যবহারকারীদের সংখ্যাও কম নয়। নৌকা সব নদীতে চলাচল করতে পারে না। ছোট নদী এবং বড় নদীতে চলাচল উপযোগী নৌকার মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করেও নৌকা তৈরি হয়। বাকরগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে যেসব নৌকা তৈরি হয়, তার বিবরণে পাওয়া যায় ঃ

১. **গয়না নৌকা**—বাংলার পরিচিত নৌকা। ৫০ থেকে ৬০ জন যাত্রী নিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করে। অগভীর জলে চলাচল করে। ছোট ছোট খাল বিলে চলাচল করলেও বড় বড় নদী স্বচ্ছন্দে পারাপার করে। ৫০ থেকে ৬০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং চওড়া ১২ ফুটের মতো।

২ **গোলের নাও**—ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তৈরি এই নৌকায় গোলপাতা বহন করা হয়। ২০ থেকে ২৫ ফুট লম্বা এবং ১০ থেকে ১২ ফুট চওড়া কাঠও বহন করা যায়। অর্থাৎ বেশি ওজনের জিনিস বহন করতে পারে। সেই ভাবেই তৈরি এই নৌকা।

৩. **বাছরি নাও**—সাধারণত নৌকা বাইচের জন্য তৈরি এই নৌকার দৈর্ঘ্য ৬০ থেকে ৭০ ফুট। চওড়ায় মাত্র ৪ থেকে ৫ ফুট। নৌকায় দাঁড় ও দাঁড়ির সংখ্যা ৮০ থেকে ১০০ পর্যন্ত দেখা যায়।

৪. **পাটের নৌকা**—বাংলাদেশে এই বিশেষ শ্রেণীর নৌকায় পাট বহন করা হয়। লম্বায় ঘাসি নৌকা থেকে কিছু ছোট। ২৫ থেকে ৪৫ ফুটের মধ্যে থাকে। তবে চওড়ায় ১২ থেকে ১৩ ফুট।

৫. **ঘাসি নৌকা**—ছোট ছোট খাল বা বিলের ওপর চলাচলের উপযোগী। ৫০/৬০ জন যাত্রী বহন করতে পারে। সাধারণ ৫০-৬০ ফুট লম্বা এবং ১২ ফুটের মতো চওড়া। স্বল্প দূরত্বে অগভীর জলে স্বচ্ছন্দে চলাচল করে। পারিবারিক প্রয়োজনে বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

৬. **ডোংগা নৌকা**—দৈর্ঘ্য ৯ থেকে ১২ ফুট। ছোট আকারের নৌকা। সব সময় ছোট ছোট নদী ও খালে-বিলে চলাচল করে। সাধারণত এসব নৌকায় কৃষকরা গরু, ছাগল, ঘাস, কাঠ বহন করে।

৭. **টাবইরা নৌকা**—সব ছোটখাট নদীতে এক দাঁড়ির ছই যুক্ত এই নৌকা চলাচল করে যাত্রী নিয়ে। এই নৌকা বেশির ভাগ সময় ভাড়া খাটে।

৮. পিনিস—এক সময় বাবুমহলের আদরের নৌকা ছিল। জমিদার বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়

পিনিস রাখতেন নিজেদের প্রয়োজনে চলাচলের জন্য। মজবুত ভাবে তৈরি এই নৌকা দেখতে হাউস বোটের মতো। আসবাবপত্রে সুসজ্জিত, ঘুমাবার এবং বসবার ব্যবস্থা, রান্না করার ব্যবস্থা থাকত এই নৌকায়। নৌকার ছাদে থাকত রেলিং। সেখানে বসে নদী সৌন্দর্য উপভোগ করা যেত।

৯. কাথানি নৌকা—বেশ বড় নৌকা। মালপত্র বহন করে। গভীর নদীতে চলাচল উপযোগী। নৌকায় ছই থাকে। ধান, চাল, সুপারি এবং অন্যান্য বহু মালপত্র বহন করে থাকে।

জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ শতকের প্রথম থেকেই ছিল ক্রমবর্ধমান। ১৮০১ সালের ১০ লক্ষ জনসংখ্যা ১৯০১ সালে দাঁড়ায় ২৪,৮৪,৮৭৮-এ। ১৯১১ থেকে ৮১ সালের মধ্যে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৬,৬৮,০০০ (পটুয়াখালি বাদে)। প্রতিবর্গ মাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৬৭২। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষিজমির ওপর চাপ বাড়তে থাকে। চাল উৎপাদনের উদ্বৃত্ত এলাকা পরিণত হয় ঘাটতি এলাকায়। জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি খাদ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের চাপ সৃষ্টি করে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েই চলে। জেলা গেজেটিয়ার (১৯৮৪) থেকে জানা যায় ১৮৭৫ সালে এক মণ চালের দাম ছিল ২.৫০ টাকা, ১৯৭৫ সালে হয় ২৮৮.১০। বৃদ্ধির হার একশ বছরে ১১৮.২ গুণ। শহরাঞ্চলের মত গ্রামাঞ্চলেও বৃদ্ধি ঘটেছে জনসংখ্যা। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সীমিত কর্মসংস্থানের কারণে মানুষ হয়েছে শহরমুখী। যার ফলে শহরাঞ্চলে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে করেছে ক্রমশ নিম্নমুখী। "মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে বর্তমান শতাব্দীর সত্তরের দশকের পূর্বে এখানে একজন ২০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা উপার্জনকারী ব্যক্তির আয় সত্তরের দশকে ১০০০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকা উপার্জনকারী ব্যক্তির সমান পর্যায়ে পড়ে। ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ অথবা ১,৫০০ টাকা আয় সম্পন্ন চার থেকে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি শহুরে পরিবারকে সুষম পারিবারিক বাজেট তৈরি করতে হলে, গ্রামের বাড়ি থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্য ও শস্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য কিছু সংখ্যক শহুরে ধনী ভাগ্যবান বাসিন্দা আছে। এদের হাতে প্রচুর নগদ অর্থ থাকে। এরা যথেচ্ছ নিত্যব্যবহার্য এবং বিলাসদ্রব্য ক্রয় করাব ক্ষমতা রাখে। এই শ্রেণীর সংখ্যা অবশ্য নগণ্য। আলোচ্য সময়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী হচ্ছে সীমিত আয়ের বৃত্তিজীবীগণ। দ্রব্যমূল্যের আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও এই শ্রেণীর লোকদের একটি নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে হয়।" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ. ৯১)

বাকরগঞ্জে আজও বেশিরভাগ মানুষের বসবাস গ্রামাঞ্চলে। একসময়ে কৃষিজীবীদের আর্থিক অবস্থা ছিল বেশ স্বচ্ছল। কালের বিবর্তনে সবকিছু বদলাতে থাকে। দেখা যাচ্ছে ১৯০৮-১৯৮০ সালের মধ্যে শতকরা ২০টি পরিবার আর্থিক দুর্দশার পরিমণ্ডলে চলে এসেছে। অথচ উনিশ শতকের শেষদিকে তাদের অর্থনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করতে গিয়ে ডবলু. ডবলু. হান্টার লিখেছিলেন ঃ "মূলতঃ বাকরগঞ্জ ছোটখাট ভূস্বামীদের জেলা। প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব কিছু কৃষি খামার আছে। এই কৃষি খামারে তারা পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় ফসলাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন করে। অতি অল্প সংখ্যক কৃষকই উর্ধ্বপক্ষে ১৭ একর জমি আবাদ করে থাকে। এইসব ভূ-স্বামীদের কৃষি খামারের পরিমাণ মোটামুটি ৫ একর থেকে ৭ একর পর্যন্ত হয়ে থাকে। জেলার কালেক্টরের অভিমত অনুযায়ী কৃষিখামারের গড় পরিমাণ কমপক্ষে চার একরের মত হয়। একটি হাল এবং এক জোড়া হালের গরু দ্বারা উর্ধ্বপক্ষে ৫ অথবা সাড়ে ৫ একরের মত কৃষি খামারে ফসল ফলানো সম্ভবপর হয়। ৫ একর জমির মালিক একজন কৃষকের আর্থিক অবস্থা একজন দোকানদারের চাইতে সচ্ছল ছিল না। কিন্তু একটি পরিবার ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক ১৬ শিলিং মাহিনার চাইতে কৃষি খামারে আবাদ করা অনেক লাভজনক ছিল। কৃষকগণ প্রায়ই ঋণগ্রস্ত হয়, কিন্তু তারা তাদের কৃষি জমি আবাদ করার উদ্দেশ্যে অগ্রিম ঋণ গ্রহণ

করে গ্রাম্য ব্যবসাদার এবং মহাজনদের খপ্পরে পড়ে না। ১৮৭১-৭২ সালে তদানীন্তন জেলার কালেক্টর সমস্ত জেলা সফর করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে—এ জেলার অধিবাসীগণ দারিদ্র্যের অভিশাপ মুক্ত। উক্ত সময়ে কৃষি খামারগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল ফলেছে এবং প্রতি বৎসরই জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।" (W. W. Hunter-Statistical Account of Bengal Vol. V—বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪ পৃ. ৯২)

দেখা যাচ্ছে ১৯৫২ সালের মধ্যে, বৃহৎ সংখ্যক কৃষি নির্ভর পরিবার জীবনধারণের নিম্নতম পর্যায়ে নেমে এসেছে। চাল উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অঞ্চল পরিণত হয়েছে ঘাটতি এলাকায়। জীবনধারণের অকৃষিজাত পণ্য সামগ্রীর দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে বিপুল পরিমাণ। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে। শিল্প নির্ভরতা না থাকার ফলে স্বতন্ত্র পেশার সুযোগ কম। তাছাড়া জমির খণ্ডিকরণ ঘটছে ক্রমশ। যার ফলে কৃষির ক্ষতি হচ্ছে। বড় বড় খামারের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। গ্রামীণ অর্থনীতি গত একশ বছরের মধ্যে পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

এর পিছনে আরও একটি বড় কারণ ঋণ। শতবর্ষ আগে কৃষককে ঋণ গ্রহণ করতে হলেও, তাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক অবস্থা তেমন বদলাত না। কিন্তু ক্রমশ ঋণ জালে জড়িয়ে তাদের জমিজমা, ঘরবাড়ি সবই জমিদার বা মহাজনের কবলে গিয়ে পড়তে থাকে। ক্রেডিট এনকোয়ারি কমিটির সুপারিশ-ঋণগ্রস্ত কৃষক পরিবারের ঋণ মুক্তির যেসব সুপারিশ করে, তা কার্যকরী করার ফলে, ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় কৃষক সমাজ। তবুও ১৯৬০ সালে ৫,০৭,৭৭৭ টি খামারের মধ্যে ২,৭৫,৫৬০ টি খামার ঋণভারে জর্জরিত ছিল। পঞ্চাশের দশকে আবাদযোগ্য জমির মাত্র এক তৃতীয়াংশে ছিল কৃষিজীবীদের স্বত্বাধিকার। ১৯৫০ সালে জমিদারি বিলোপ আইন পাশের পর কৃষিজীবীদের জীবনে শুরু হয় নতুন অধ্যায়। কর্ষিত জমির ওপর কৃষিজীবীদের বংশানুক্রমিক স্বত্বাধিকার স্বীকৃতি পায়। কৃষকদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা দেওয়ায় সরকারি উদ্যোগ কার্যকরী হতে থাকে। কৃষিব্যাংক ও সমবায় ব্যাংক মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি/মধ্য মেয়াদি/এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কৃষিজীবীদের আর্থিক পঙ্গুতা দূর করতে এই ঋণও ছিল অকিঞ্চিৎকর। তাছাড়া সরকারি আইনকে ফাঁকি দিতে মহাজন, জোতদার এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরা এখনও তৎপর। কৌশলে বহু বড় বড় আবাদী জমির মালিক তারা। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, কৃষক সমাজের একটা বৃহৎ অংশই পরিণত হচ্ছে ভূমিহীন চাষীতে। ১৯৭৫-৭৬ সালে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা ছিল ৪,৩২,১২৫—তা এখন আরও বেড়েছে। এই বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন কৃষক জেলার বিভিন্নস্থানে, এমন কী অন্য জেলাতেও কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। বর্গা প্রথায় চাষ আবাদের ব্যবস্থা ক্রমশ বাড়ছে। জমির মালিকের কাছে অগ্রিম ধার নিয়ে গরু, লাঙল, বীজধান কিনে তারা আবার আমৃত্যু ঋণজালে আবদ্ধ হচ্ছে।

বলা হয়, বাকরগঞ্জ জেলায় শতকরা ৮৫ জন কৃষিজীবী। বাকি ১৫ শতাংশের মধ্যে শতকরা ১০ জনের পেশার মধ্যে পড়ে মাছ ধরা, নৌকা তৈরি, মাদুর তৈরি, কামারের কাজ এবং ব্যবসা বাণিজ্য। আর শতকরা ৫ জন প্রশাসন এবং বৃত্তিমূলক কাজে জড়িত। গ্রামের দিকে মেয়েরা কৃষি কাজে জড়িত নানাভাবে।

পুরনো হলেও "বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ারে"র একটি পরিসংখ্যান থেকে জীবিকা ও পেশা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ছবি উপলব্ধি করা যাবে। পরিসংখ্যানটি ১৯৫১ সালের ঃ

মোট জনসংখ্যা	ঃ ৩৬,৪২,১৮৫ (পটুয়াখালিসহ)
পুরুষ	ঃ ১৯,০৩,২৭১
নারী	ঃ ১৭,৩৮,৯১৪
শ্রমিক সংখ্যা	ঃ ১০,৬২,৯৪৮
কৃষি শ্রমিক	ঃ ৮,৮৮,৪১৪

অ-কৃষি শ্রমিক : ১,৭৪,৫৩৪
" (পুরুষ) : ১,৭০,১৮১
" (নারী) : ৪,৩৫৩
কৃষি শ্রমিক (পুরুষ) : ৮,৭২,৬২২
" (নারী) : ১৫,৭৯২
ভূমিচাষী কৃষক (জমির মালিক ও বর্গাচাষী) : ৭,৯১,৬৫৭
রাখাল ও গোয়ালা : ১,৩৫১
ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক : ১,৬৭,৩৬৯
অন্যান্য কৃষি শ্রমিক : ৩৭

১৯৫১ সালে যেখানে ভূস্বামীদের সংখ্যা ছিল ৬,৫০,৬১০। সেই সংখ্যা ১৯৬১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৭,৭৭,৪১৪। বৃদ্ধির হার ১৯.৫।

শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের উপজীবিকা : ১৯৭৪*

	সর্বমোট	বৃত্তি ও কারিগরি মূলক	প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	কেরাণি	বিক্রয় সংক্রান্ত	চাকুরি	কৃষি	উৎপাদন ও পরিবহন
সমগ্র জেলায় পুরুষ ও নারী উভয়শ্রেণী	১,০৩৯,০৭১	২৩,৩৭২	৬৭৯	৮,৫৫৪	৫৮,২০১	১৩,৩২৯	৮১৪,৭৬৮	১২০,১৬৮
পুরুষ-সর্বমোট	১,০১২,৫৪৬	২২,৪৪৭	৬৬৯	৮,৪৯৫	৫৭,৯৭৯	১০,৯৭২	৭৯৮,৯৩৫	১১৩,০৪৯
নারী-সর্বমোট	২৬,৫২৫	৯২৫	১০	৫৯	২২২	২,৩৫৭	১৬,৮৩৩	৭,১১৯

নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি দ্রব্যের মূল্য তালিকা : ১৮৬৭-১৯১৪*

জিনিস	১৮৬৭ সালের দাম (প্রতি মণ হিসাবে)			১৯১৪ সালের দাম (প্রতি মণ হিসাবে)		
	টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই
১. সুপারি	৬	৬	১০	১২	০	০
২. রসুন	২	১২	২	৫	০	০
৩. নারকেল তেল	১৭	১২	৮	২২	০	০
৪. সরিষা	১০	৫	৯	১৮	০	০
৫. ঘি	৩৫	১৪	৯	১০	০	০
৬. আখের গুড়	৩	১২	৭	৮	৮	৮
৭. খেজুবের গুড়	৪	১০	৫	৬	০	০
৮. আমদানি করা গুড়	—	—	—	৪	০	০
৯. চিনি	৬	০	০	৯	৪	০

*বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪

জিনিস	১৮৬৭ সালের দাম (প্রতি মণ হিসাবে)			১৯১৪ সালের দাম (প্রতি মণ হিসাবে)		
	টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই
১০. লবণ (পাদি)	৪	৯	১	২	৪	০
১১. লবণ (রফ)	৬	৩	৪	৪	০	০
১২. তুলা	২৬	৮	১০	৩২	০	০
১৩. পাট	৩	০	০	৪	০	০
১৪. আখ	টাকায় ৩০ টি			টাকায় ৩২টি		
১৫. বাঁশ	টাকায় ৬ টি			টাকায় ৩ টি		
১৬. নারকেল	প্রতিজোড়া ১ আনা			প্রতিজোড়া ১$\frac{১}{২}$ আনা		
১৭. মুরগির ডিম	প্রতি আনায় ৪ টি			প্রতি চারটি ১$\frac{১}{২}$ আনা		
১৮. মোরগ/মুরগি	টাকায় ৮ টি			টাকায় ৩ টি		
১৯. দুধ (গরুর)	টাকায় ১৮ সের			টাকায় ১১ সের		

নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য তালিকা : ১৯৭১-৭৬*

দ্রব্যাদি	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬
			মণ			
১. সরু চাল (ভাল)	৪৬.৬৯	৬০.৮৮	৯০.৩৮	১২১.৭২	২৮৮.১০	১২২.১৯
মাঝারি চাল	৪১.৯২	৫৬.১১	৮৫.৭০	১১৫.৪৫	২৭৬.৬০	১১১.৭২
মোটা চাল	৩৮.৩৭	৫৩.২৬	৮০.২৩	১০৯.৫০	২০৭.১০	১০০.৩১
২. ডাল—মুশুর	৪০.১৯	৫১.৬৮	৮০.৪৭	১৩৮.৯২	১৬১.৭০	১১৬.৭৬
খেসারি	২০.৭৮	৩২.৩৮	৫৯.৮৮	৯৯.৮৬	১৩৫.৩০	৭৮.৫০
৩. তৈলবীজ—সারিষা	১৯৩.০০	২৬৯.৩৫	৪২৭.৯১	৫৯১.৯৯	৩৪৭.৫০	১৭৩.৭৫
৪. মরিচ (শুকনা)						
ভাল জাতের	১৪৫.২৮	২১২.৭৩	১৫৫.৪৫	৩৯২.৮২	১০৫৯.০০	২৯৭.৭৫
৫. সুপারি (শুকনা)						
তিনটি ভাল জাতের						
৩৫ পাউন্ড	২৮৭.০৮	২৬০.৪৪	৪৩৮.৫৬	৯৯.৭৮	১০০৪.০০	৬৬০.০০
৬. সুপারি (শুকনা পাতা)						
৬,৪০০ গদী	৩৩.৬৭	৯৮.৮৫	১৫৪.০২	৮৩৪.৮৪	১৯৬.৫০	২৮১.২৫
৭. নারকেল তেল						
(আমদানি করা						
বিশেষমানের)	২৪৬.৪৩	৩৩৪.২৯	৫৫১.১০	২৬৩.৭৩	১৬৫.৩৭	৫৮৫.০০

* বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪

নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য তালিকা : ১৯৭১-৭৬

দ্রব্যাদি	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬
			সের প্রতি			
৮. মাঝারি সাইজের ইলিশ	...	...	...	...	৬.৯২	৯.৭৫
৯. রুহিত মাছ	৪.৯৪	৪.৬৪	৭.৫৯	১১.২২	১৩.৯০	১৪.৫০
১০. গরুর মাংস	২.২৫	২.৪৮	৫.০৯	৬.৭৮	৮.৫৫	১০.০০
১১. খাসির মাংস	...	...	...	...	৪.৮৯	২.০৫
১২. মুরগির ডিম (১০০টি)	১৪.৮৭	১৪.৮৮	২৩.১৫	৩০.৪৮	২.১৯	২.২০ প্রতিহালি
১৩. জীবন্ত মোরগ/মুরগি একসের ওজনের	৩.০৬	৩.৫৫	৫.৬০	৭.১৩	১১.১৫	১১.০০
১৪. আলু (দেশি নৈনিতাল) মাঝারি	.৭৪	১.০১	১.৪৩	১.৮৮	২.০৫	১.৫০
১৫. পিয়াজ (ভাল মানের)	.৮৬	.৭৬	০.৮৮	২.২৪	১.৫৫	১.৬৯
১৬. রসুন	.৮৬	.৭৬	০.৮৮	২.২৪	৩.৯০	৩.২৫
১৭. হলুদ (প্রতিমণ)	...	...	...	১২০.০০	৭.১০	৬.০০
১৮. লবণ (স্থানীয়, সাদা উৎকৃষ্ট মানের)	০.২৫	০.৪৮	০.৩৮	০.৪৪	১.৮৮	১.২৫

বাকরগঞ্জের অন্যতম কৃষিপণ্য ধান হলেও এখন এই জেলা পরিণত হয়েছে ঘাটতি জেলায়। অর্থাৎ তাকেও চাল আমদানি করতে হয়। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মত চালের দামও ওঠা নামা করেছে বারবার। জেলা গেজেটিয়ার (১৯৮৪) চালের মূল্যবৃদ্ধির একটি ছবি পাওয়া যায়।

১৯১৫ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত চালের দাম ৬.৬২ থেকে ৮.০০ টাকার মধ্যে ওঠা নামা করেছে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর পেরিয়ে দেশভাগ। বাঙালির জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। যার থেকে বাদ পড়েনি বাকরগঞ্জ। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বাংলাদেশের সমস্ত জেলায়ই ঘটেছে। এই সময়ের সঠিক দ্রব্য মূল্য তালিকা পাওয়া যায় নি। কিন্তু দেশভাগের পর বাকরগঞ্জের খোলাবাজারে উৎকৃষ্টমানের বালাম চাল পাওয়া গেছে প্রতি মণ ১০টাকা থেকে ১২ টাকায়। এসময়ে মোটা চাল পাওয়া যেত প্রতি মণ ৯ টাকা থেকে ১০ টাকায়। ১৯৬১ সালে দেখা যাচ্ছে, বালাম চালের দাম হয়েছে প্রতি মণ ২০ টাকা থেকে ২২ টাকা এবং মোটা চাল প্রতি মণ ১৮ টাকা ২০ টাকা। এরপর থেকে চালের দর বৃদ্ধি কোন সময়ে থেমে থাকেনি। একটি পরিসংখ্যানে আছে :

চালের দরবৃদ্ধি

দ্রব্য	১৯৬৫	১৯৭০
	প্রতি মণ	
চাল—উৎকৃষ্ট	৩৪.৬৭	৪৬.৩৯
" —মাঝারি	৩২.৪৩	৪২.১৮
" — মোটা সাধারণ	২৯.০৮	৪০.০৯

এরপর দর আরও বেড়েছে। ১৯৭০ সালে যে চালের দর ছিল প্রতি মণ ৪৬.৩৯, ১৯৭৪ সালে তার দাম ওঠে ১২৬.৭২ টাকায়। ১৯৭৫ সাল ছিল মূল্যবৃদ্ধির এক অস্বাভাবিক পর্যায়। এসময় দাম ওঠে ২৮৮.১০ টাকায় প্রতি মণ।

উপজেলাভিত্তিক চালের উৎপাদন—জন সংখ্যা এবং ১৯৬৯-৭০ সালে জেলার মোট চালের পরিমাণ*

১৯৬৯ সালে উৎপাদিত মোট চালের পরিমাণ, জনসংখ্যা ব্যতীত ধানের হিসাব (হাজার মণ হিসাবে)									মোট সরবরাহ বীজ ধান সংরক্ষণ এবং অপচয় বাবদ শতকরা দশভাগ বাদে	১৯৬৯-৭০ সালে পরিকল্পিত জনসংখ্যা (হাজার হিসাবে)	প্রতিদিন মাথাপিছু চালের প্রয়োজন গড় হিসাব আধসের	বাড়তি (+) অথবা ঘাটতির (-) মাত্রা
উপজেলার নাম	আউস		আমন		বোরো			মোট				
	স্থানীয়	ইরি	বপনকরা বীজ থেকে	রোপিত চারা থেকে	ইরি	স্থানীয়	ইরি					
১. কোতওয়ালি	১৫৩	৭	৮৫	৫৯৬	১.৩	১৬	৬৮.৫	৯২৭	৮৩৪	২৮৯	১৩৪৭	৫১৩ (-)
২. ঝালকাটি	১২৩	–	১১০৫ ২৯৮	০.৩	১.৩	৭৬	৫৯১	৫৩৯	১৮১	৮৪৩	৩০৪	
৩. রাজাপুর	৭৮	০.২	৫৬	২২৭	১	–	২৮	২৯০	৩৫১	১৩১	৬১০	২৫৯ (-)
৪. নলছিটি	৫১	–	৭৮৬	৩৭৫	–	৯	৪২	৫৫৪	৪৯৯	১৭১	৭৯৭	২৯৮ (-)
৫. বাকরগঞ্জ	১২৮.৫১	৩৩.৫	৫৯৩	১.২	১.১	৪৩	৮০১	৭২১	৩১৪	১৪৬৩	৭৪২ (-)	
৬. চরমন্দি	৬৫.৫	০৪	২২৬	২৬০	–	১	২০.২	৩৭০	৩৩৩	–	–	৩৩৩ (+)
৭. গৌরনদী	২৮১	০.১	২০১.৭ ১২৮	১	৪	৫৬.৭	৬৭২	৬০৫	৩০৭	১৪৩১	৮২৬ (-)	
৮. উজিরপুর	২২৩.৫১০২	১৫১	২৯২	০.৩	৭	২১	৬৯৭	৬২৬	২০৫	৯৫৫	৩২৯ (-)	
৯. বাবুগঞ্জ	১১৯	০.০২	৪৪.৪	২৯৯	১	২	৬৪.৬	৫৩০	৪৭৭	১২৭	৫৯২	১১৫ (-)
১০. মুলাদি	১২৫.৪০১২	১৩৫	৪১৪	১	৫	১৫	৬৯৬	৬২৬	১৬৪	৭৬২	১৩৬ (-)	
১১. হিজলা	২৩৭	০.০৮	১০০.৫ ৪৪৮	০.১	৩০	১৬.৪	৮৩২	৭৪৯	১৫৯	৭৪১	৮ (+)	
১২. মেহেন্দিগঞ্জ	১৫৫	২	৭৩২	৮১৩	১	২০	১৫.৬	১০৮০	৯৭২	২৩৩	১০৮৬	১১৪ (-)
১৩. পিরোজপুর	৫৭	৭	৬১.৫	৫৬৮	২	০.১	১১২	৮০৮	৭২৭	১৯৯	৯২৭	২০০ (-)
১৪. স্বরূপকাঠি	১৯২	–	.৬৭	৩৭৫	০.১	২	১৭	৬৫৩	৫৮৮	১৮৯	৮৮১	২৯৩ (-)
১৫. বানরিপাড়া	৯৭	০.৩	৫৬.১	১৯০	০.১	১২	১২	৩৬৮	৩৩১	১২৫	৫৮৩	২৫২ (-)
১৬. নাজিরপুর	১৭৫	০.৫	১৫৭.৫	১৪২.৫	১৩	১২.৪	৩৩.৫	৫৩৪	৪৮১	১৫৯	৭৪১	২৬০ (-)

উপজেলাভিত্তিক চালের উৎপাদন—জনসংখ্যা এবং ১৯৬৯-৭০ সালে জেলার মোট চালের পরিমাণ*

উপজেলার নাম	১৯৬৯ সালে উৎপাদিত মোট চালের পরিমাণ, জনসংখ্যা ব্যতীত ধানের হিসাব (হাজার মণ হিসাবে)								মোট সরবরাহ বীজ ধান সংরক্ষণ এবং অপচয় বাবদ শতকরা দশভাগ বাদে	১৯৬৯-৭০ সালে পরিকল্পিত জনসংখ্যা (হাজার হিসাবে)	প্রতিদিন মাথাপিছু চালের প্রয়োজন গড় হিসাব আধসের	বাড়তি (+) অথবা ঘাটতির (-) মাত্রা
	আউস		আমন		বোরো			মোট				
	স্থানীয়	ইরি	বপনকরা বীজ থেকে	রোপিত চারা থেকে	ইরি	স্থানীয়	ইরি					
১৭. ভাণ্ডারিয়া	৩৭	–	৭	৪৪৮	৩	১	৩৮.২	৫৩৪	৪৮১	১৫৩	৬২০	১৩৯ (-)
১৮. কাঠালিয়া	৩৮	৩৪	...	৩৯২	২	..	৮৬	৪৭৫	৪২৭	১১১	৫১৭	৯০ (-)
১৯. মঠবাড়িয়া	৭৫১	৮.৬	১০৮৯	২৬	৩	৪৭৪	১৬৭৭	৫১৯০	...	...	...	*
২০. কাউখালি	২	০.১	১১.৭	২৪৪.৫	–	২	১৮.৭	২৯৮	২৬৮	৭৪	৩৪৫	৭৭ (-)
২১. ভোলা	১১৭	০.১	২২	৯৬৯	১৪	৬০.৭	৪.৭	১১৭৫	১০৫৭	২৩১	১০৮১	২৪ (-)
২২. দৌলত খাঁ	২৩১	৯	১৫০	৬১৪	৩	–	৫০.৬	৯২০	৮৩১	১৭৪	৮১১	২০ (+)
২৩. বোরহানউদ্দিন	২৯০	৩.৯	–	১১১৭	১৫	২.৩	১০৭.৫	১৫৩৬	১৩৮৭	১৮৬	৮৬৭	৫১৫ (-)
২৪. তাজুমুদ্দিন	৮২.৫	৩.৯	১	৯৫৭	৯.১	–	৭	১০৬১	৯৫৫	১১৫	৫৩৬	৫৩৬ (+)
২৫. লালমোহন	৫২২	৪.৭	১	৮৫৭	২	৩.৭	২৪	১৪১৫	১২৭৩	৩৩৬	১৫৬৬	১১৯ (+)
২৬. চরফ্যাশন	১০৩	–	–	১৫৪৬	২	৩.১	০.৯	১৬৫৮	১৪৯২	*	*	* (-)

বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪

দেখা যাচ্ছে, ২৬টি উপজেলার মধ্যে ২০টিতে চালের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় কম। মাত্র ৬টি উপজেলায় চাল উদ্বৃত্ত। সমগ্র জেলা ১৯৬৯-৭০ সালে চাল উৎপাদনে ছিল ঘাটতি এলাকা।

শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে পুরুষ ও নারী জনশক্তির অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা*

	মোট সংখ্যা	উভয় শ্রেণী নারী ও পুরুষ	কর্মরত		জীবিকা সন্ধানী		নিষ্ক্রিয়		গৃহবধূ
			পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
১০ বছরের উর্ধ্বে সর্বমোট সংখ্যা	২,৫৭৭,০২২	১,০৩৯,০৬৮	১,০১২৫৩৭	২৬,৫৩১	২৪,৬৮৯	২,৫৯১	৩০৬,৭২৬	২৬৬,৩২২	৯৩৭,৬১৮
শহরাঞ্চলে									
১০ বছরের উর্ধ্বে সর্বমোট সংখ্যা	১১০,৮৭১	৩৮,৭৮২	৩৬,২৪১	২,৫৪১	১,৬৩১	২৫০	২৫,৫৯৮	১৫,৬৮০	২৮,৯২৩
গ্রামাঞ্চলে									
১০ বছরের উর্ধ্বে সর্বমোট সংখ্যা	২,৪৬৬,১৫১	১,০০০,২৮৬	৯৭৬,২৯৬	২০,৯৯০	২৩,০৫১	২,৩৪৯	২৮১,১২৮	২৫০,৬৪২	৯০৮,৬৯৫

* বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪

জীবন ও সংস্কৃতি

জেলায় নদী প্রভাবিত জীবনযাত্রা। নদীবাহিত পলিমাটিতে গড়ে ওঠা দ্বীপমালা, অসংখ্য নদী সমাকীর্ণ কৃষিপ্রধান জেলায় নানা ধর্মের মানুষের বসবাস। সুদীর্ঘকালের সনাতন জীবনধারা ক্রমশ পরিবর্তনমুখী আকার নিচ্ছে। এই জেলার ওপর পড়েছে রাষ্ট্রশক্তি পরিবর্তনের প্রভাব। হিন্দুযুগ, মুসলমানযুগ, ইংরেজ আমল, পাকিস্তানী শাসনকালের শেষে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একটি অন্যতম জেলা বাকরগঞ্জ। নানা সময়ে জেলার আকারেরও পরিবর্তন ঘটেছে।

জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়, ১৮০১ সাল নাগাদ পটুয়াখালিসহ সমগ্র জেলার জনসংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি ছিল না। ১৮৭২ সালে প্রথম আদমসুমারিতে (পটুয়াখালিসহ) জনসংখ্যা ছিল ১৮,৮৪,৬৯৭ জন। ১৮৮১ সালের জনসংখ্যা ১৯,০০,৮৮৯ জন। ১৮৯১ সালে ২১,৫০৫১৫ জন, ১৯০১ সালে ২২,৮৮,০১৩ জন, ১৯১১ সালে ২৪,২৮,৯১১ জন, ১৯২১ সালে ২৬,২৩,৭৫২ জন, ১৯৩১ সালে ২৯,৩৯,০৫০ জন, ১৯৪১ সালে ৩৫,৪৫,০১০ জন , ১৯৫১ সালে ৩৬,৪৬,০৫৮ জন, ১৯৬১ সালে ৩০,৬৮,১২১ জন (পটুয়াখালিসহ ৪২,৬১৭৬৭ জন) এবং ১৯৭৪ সালে ৩৯,২৮,৪১৪ জন।

জেলার ওপর বারবার প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। জনবসতি এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। বিনষ্ট হয়েছে কৃষি সম্পদ। আবার নতুন করে সব গড়ে উঠেছে।

বাকরগঞ্জ জেলায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস হলেও মুসলমানদের সংখ্যাই বর্তমানে সব থেকে বেশি। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মগরা আরাকান থেকে এসে বসতি করেছিল আঠার শতকের শেষে। এই সাহসী মানুষরা সমুদ্রের গভীরে মৎস শিকারে অভ্যস্ত। এক সময়ে জলদস্যুতায় দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছে এরা ছিল বিভীষিকা। বর্তমানে এরা কৃষিকাজে অভ্যস্ত। তবে পটুয়াখালি জেলা পরবর্তীকালে নতুন জেলা হওয়ায় মগদের বেশির ভাগই এখন ঐ জেলার অধিবাসী। কাঠের কাজে এদের খ্যাতি সুপ্রাচীন কাল থেকে। মগদের জীবনযাত্রা আজও নানান কুসংস্কারে মোড়া। বিবাহ ব্যবস্থা নিজেদের সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি ছিল তথাকথিত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ। ব্রাহ্মণ কায়স্থদের বসবাস কম ছিল না। তবে এদের বসবাস জেলার সর্বত্র সমান ছিল না। ব্রাহ্মণদের অনেকই ছিল প্রচুর জমির মালিক। নানারকম চাকরি ছিল তাদের একচেটিয়া। তাছাড়া সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চায় জেলার ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল তারা। যেমন ইদিলপুরকে বলা হত দক্ষিণবঙ্গের নবদ্বীপ।

কায়স্থদের জীবনযাত্রাও ছিল জমিজমা নির্ভর। শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সামাজিক প্রতিপত্তিতে এদের প্রভাব ছিল সব থেকে বেশি।

জানা যায়, জেলায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের আদি বসতি ছিল ঢাকা অঞ্চলে। সেখান থেকে এই জেলায় আসার পর তাদের বেশির ভাগ মানুষ স্বরূপকাঠি ও গৌরকাঠির বিল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করলেও বর্তমান পিরোজপুর জেলায় ছিল তাদের বসতি সব থেকে বেশি। জীবিকার্জনের জন্য এরা নানান পেশায় জড়িত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে প্রধান ছিল কৃষিকাজ। তাছাড়া, রাস্তা তৈরি, পুকুর কাটা, এরকম নানান কাজে তাদের জড়িত থাকতে দেখা যেত।

থানাভিত্তিক জনসংখ্যা : ১৯২১*

থানা	জনসংখ্যা : প্রতি বর্গমাইলে
ঝালকাঠি	১,৪১০
নলছিটি	১,০১৪
পিরোজপুর	১,২৬৩

* বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার (১৯৮৪)

বরিশাল	১,০৬৪
বাকরগঞ্জ	১,০১৪
বানারিপাড়া	১,৫৪৯
বাবুগঞ্জ	১,১১৭
ভাণ্ডারিয়া	১,০৩২
রাজাপুর	১,০৮৮
স্বরূপকাঠি	১,১৬১

জেলা/মহকুমার আয়তন ও জনসংখ্যা : ১৯৬১*

জেলা/মহকুমা	আয়তন (বর্গ মাইল)	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী
বাকরগঞ্জ জেলা	৪,২৪০	৪২,৬১,৭৬৭	২১,৮৮,২৮৪	২০,৭৩,৪৮৩
বরিশাল সদর উত্তর মহকুমা	৬৮১	৮,১০,৫৯১	৪,১৮,৮৯০	৩,৯১,৭০১
বরিশাল সদর দক্ষিণ মহকুমা	৪৯৭	৭,৩৬,৩৫৬	৩,৮০,৫১৭	৩,৫৫,৮৩৯
ভোলা মহকুমা (দঃ শাহবাজপুর)	৮২৭	৭,০৭,৮৭০	৩,৬৮,৫৮৪	৩,৩৯,২৮৬
পিরোজপুর মহকুমা	৬০৭	৮,১৩,৩০৪	৪,০৯,৯১৩	৪,০৩,৩৯৩

জেলা/মহকুমার আয়তন ও জনসংখ্যা : ১৯৭১*

জেলা/মহকুমা	আয়তন (বর্গ মাইল)	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী
বাকরগঞ্জ জেলা	২,৭৯২	৩৯,২৮,৪১৪	২০,২১,৬২৯	১৯,০৬,৭৮৫
বরিশাল সদর উত্তর মহকুমা	৫২২	৭,১৮,৭৭৯	৩,৭১,৭১৭	৩,৪৭,০৬২
বরিশাল সদর দক্ষিণ মহকুমা	৪২৬	৮,১৭,৭০৩	৪,২১,০৩৪	৩,৯৬,৬৬৯
ভোলা মহকুমা (দঃ শাহবাজপুর)	১,০১৪	৯,৫৯,৭৬৮	৫,০১,৪৫৭	৪,৫৮,৩১১
ঝালকাঠি মহকুমা	২৮৯	৫,০০,০৮৫	২,৫৪,৫১৫	২,৪৫,৫৭০
পিরোজপুর মহকুমা	৫৪১	৯,৩২,০৭৯	৪,৭২,৯০৬	৪৫৯,১৭৩

ফরিদপুর জেলা থেকে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এসে বোরহানউদ্দিন থানা এলাকায় প্রথমে বসতি করে। পরে তারা ছড়িয়ে পড়ে জেলার অন্যত্র। কৈবর্তরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—চাষী কৈবর্ত এবং জেলে কৈবর্ত। এদের কৃষি সম্প্রদায়ের কাজেই জড়িত থাকতে দেখা গেছে বিপুল সংখ্যায়।

বাকরগঞ্জে সাহা সম্প্রদায়ের মানুষের বসতি কম ছিল না। এদের মধ্যে বড় বড় ব্যবসায়ীর সংখ্যা সব থেকে বেশি দেখা গেলেও, অনেকেই ছিল উচ্চ শিক্ষিত। তারা সাধারণত আইন ব্যবসা অথবা ডাক্তারি পেশায় জড়িত ছিল।

খ্রিস্টান মিশনারীরা এই জেলায় কাজ শুরু করে ১৮৩০ সালের পর। সে সময়ে জেলা কালেকটর মিঃ গ্যারেট নিজেই ছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনারী। পরে শ্রীরামপুর মিশন এবং অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায় কাজ শুরু করে। তাদের ধর্মান্তকরণের ডাকে সাড়া দেয় বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু। দেখা যাচ্ছে জেলায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা ১৯০১ সালে ছিল, ৫,৫৯১ জন, ১৯৪১ সালে ৯,৩৫৭ জন, ১৯৫১ সালে ১১,৩৪৫ জন এবং ১৯৬১ সালে ১১,৭৭৬ জন।

জেলার মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আছে সুন্নি এবং হানাফি। এই ধর্মপ্রাণ মানুষরা মহরম

* বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার (১৯৮৪)

রমজান, ঈদ-উল-জুহা, ঈদ-উল-ফিত্র এবং ঈদ মিলাদ-উন নবী পালন করে শ্রদ্ধার সঙ্গে। প্রায় সব গ্রামেই আছে মসজিদ। মুসলমানদের মধ্যে আছে বিবিধ সামাজিক অনুষ্ঠান।

জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে : "এ জেলায় বসবাসকারী লোকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নিম্নবর্গ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান। নিম্নবর্গের হিন্দু জনশ্রেণীর এত অধিক সংখ্যায় ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণ হিসেবে ডবলু. এইচ. বিভারিজ তৎকালীন বর্ণভিত্তিক হিন্দুসমাজ ব্যবস্থায় তাদের শোচনীয় অবস্থাকে দায়ী করেছেন। পক্ষান্তরে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা এবং রীতি-নীতি নিম্নবর্ণের হিন্দু জনশ্রেণীকে বিপুলভাবে আকর্ষণ করেছিল। স্বাভাবিকভাবে এবং স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা এত বৃদ্ধি পাওয়ার দরুনই, এ জেলার মুসলমানদের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। বাকরগঞ্জ জেলায় চণ্ডালদের মধ্যে ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা অতি সহজে ধর্মান্তরের কাজে অগ্রসর হতে পেরেছিল। সমুদ্রের প্রতি হিন্দুদের যে অনীহা, তাও এ অঞ্চলে হিন্দুদের সংখ্যালঘু হওয়ার কারণ হতে পারে বলে বিভারিজ উল্লেখ করেছেন।...মুসলিম সংখ্যাধিক্যের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বিভারিজ আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। হিন্দু শাসন ও সংস্কৃতি ধ্বংসের পর বাকরগঞ্জের অনেক এলাকা ছিল জনবসতিহীন। জেলার অনেক অংশ সম্প্রতিকালের সৃষ্টি, পুরনো অনেক জায়গা প্রায় হাল আমল পর্যন্ত জঙ্গলে ঢাকা পড়েছিল। পুরনো হিন্দু সভ্যতা বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণে অল্পই বিস্তৃত ছিল। মুসলমানরা এই জনবসতিহীন অঞ্চলে নতুন সভ্যতা গড়ে তোলে।...মগ আক্রমণের মুখে অধিকাংশ হিন্দু জনশ্রেণী এ অঞ্চল পরিত্যাগ করে। এর পরে যে সমস্ত, হিন্দু, পর্তুগীজ, মগ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক এ অঞ্চলে থেকে যায়, তারা স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করে।...বিভারিজ বর্ণিত মুসলিম সংখ্যাধিক্যের উল্লিখিত কারণ সমূহ ছাড়াও একথাও বলা যেতে পারে যে, ধর্মান্তর এ উপমহাদেশে চিরকালই ঘটেছে। বিশেষ করে সামাজিক প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভের সহায়ক পন্থা হিসাবে রাজার ধর্ম গ্রহণের প্রবণতাও স্বাভাবিক বলে অনেকে মত পোষণ করেন। অগণিত হিন্দু স্বেচ্ছায় যেমন ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল, তেমনি একথাও অনস্বীকার্য যে, অনেক সময় বাধ্য হয়ে বা অবস্থার চাপে পড়েও এদের অনেককে ধর্মান্তরিত হতে হয়েছিল।" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ. ৫১-৫২)

জেলার মেলা

অবিভক্ত বাংলায় গ্রামীণ মেলা ছিল মানুষের জীবনের এক ভিন্নতর চালচিত্র। ধর্ম এখানে উপলক্ষ হলেও, দূর দূরান্তের মানুষ এসে মিলিত হত কয়েকদিনের জন্য। নানা রকম পসরা সাজিয়ে তারা আসত। সম্বৎসরের জিনিসপত্র, চাষবাসের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং বিভিন্ন রকম গৃহস্থালীদ্রব্য সংগৃহীত হত মেলা থেকে। মেলা ছিল গ্রামবাংলার এক ভিন্নতর সামাজিক বন্ধন। যেখানে ধর্মীয় সংকীর্ণতার কোন প্রশ্রয় ছিল না; বাংলার জনজীবনে মেলার অসাধারণ ছবি বরিশালে অনুপস্থিত ছিল না। দেশভাগ সব পরিস্থিতি বদলে দিলেও বরিশালে তার ছবি একেবারে অনুজ্জ্বল হয়ে যায়নি। কতরকম বিনোদনই না এইসব জেলাকে জীবন্ত করে রেখেছিল একদিন। বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ারে (১৯৮৪) চেস. এ. বেন্টলির (১৯২১) উল্লিখিত মেলার একটি তালিকা উদ্ধৃত হয়েছে। সেই তালিকায় আছে :

	মেলার নাম	মেলার স্থান	তারিখ ও সময়	গড় উপস্থিতি
১.	দশহরা	বানারিপাড়া	জ্যৈষ্ঠ ১ দিন	১০,০০০
২	সূর্যমণি মেলা	"	মাঘ ১ দিন	১৫,০০০
৩.	শিবরাত্রি	শিববাড়ি	ফাল্গুন ১ দিন	১০,০০০
৪.	চৈত্র সংক্রান্তি	হাটখোলা, বরিশাল	চৈত্র ১ দিন	৫,০০০
৫.	নীলতলা মেলা	নাজিরপুর	বৈশাখ ১ দিন	৬,০০০

	মেলার নাম	মেলার স্থান	তারিখ ও সময়	গড় উপস্থিতি
৬.	গোপাল ঘোষের মেলা	বগুড়া মৌজা	বৈশাখ ৭ দিন	২,০০০
৭.	চৈত্র সংক্রান্তি	ঝালকাঠি	চৈত্র ১ দিন	৫,০০০
৮.	ঝালকাঠি কালীপূজার মেলা	"	কার্তিক ৭ দিন	৫,০০০
৯.	মাঘী সপ্তমী	পোনাবালিয়া	মাঘ ১ দিন	১,০০০
১০.	বাবুগঞ্জ মেলা	বাবুগঞ্জ	ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১ মাস	১,০০০
১১.	কালবৈশাখি	জরিয়াবাড়ি	বৈশাখ ১ দিন	১,২০০
১২.	পৌষ সংক্রান্তি	বাটাজোড়-গৌরনদী (বর্তমান উপজেলা)	নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮ দিন	১,০০০
১৩.	চৈত্র সংক্রান্তি	ভাণ্ডার	চৈত্র ১ দিন	৮০০
১৪.	চৈত্র সংক্রান্তি	মোরাকাটি	বৈশাখ ১ দিন	৭০০
১৫.	চৈত্র সংক্রান্তি	ধামুরা	চৈত্র ১ দিন	৬০০
১৬.	পৌষ সংক্রান্তি	ধামসার	পৌষ-ফাল্গুন ৭ দিন	৫০০
১৭.	শিবরাত্রি	কীর্তিপাশা	ফাল্গুন ৭দিন	৫০০
১৮.	"	কলসকাঠি	ফাল্গুন ৭ দিন	৫০০
১৯.	"	লাখুটিয়া	ফাল্গুন ১৫ দিন	৫০০
২০.	গলাইয়াওয়াজীপুর	উজিরপুর	বৈশাখ ৩ দিন	৫০০
২১.	পৌষ সংক্রান্তি	চাঁদসি	জুলাই ৩০ দিন	৫০০
২২.	চৈত্র সংক্রান্তি	মাধবপাশা	চৈত্র ১ দিন	১,০০০

দেশভাগের পর এইসব মেলার বেশির ভাগই এখন নেই। তবুও বাকরগঞ্জে যে ৩৪টি মেলা এখনও অনুষ্ঠিত হয় তার অন্যতম হল গৌরনদী উপজেলার কুতুবশাহের দরগাহের মেলা। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে আয়োজিত এই মেলা মুসলমানদের ধর্মীয় মেলা হলেও, নানা সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দেয়।

ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব

রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল ব্যাপক ভাবে। ঢাকায় স্থাপিত হয়েছিল 'পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজে'র শাখা। ঢাকা নর্মাল স্কুলের পাঁচজন ছাত্র নন্দকুমার সেন, হরিশচন্দ্র মজুমদার, গোপীনাথ রায়, বৈদ্যনাথ রায় ও ললিতমোহন সেন—ওখানকার পাঠ শেষ করে বরিশালে আসেন ১৮৬০ সালে। ওরাই সমবেত ব্রহ্ম-উপাসনার সূচনা করেন ১৮৬১ সালের ২৩ জুন। তখন বরিশালে রামতনু লাহিড়ী উপস্থিত থাকলেও অল্পদিনে বদলি হয়ে যান। লাখুটিয়ার জমিদার পরিবারের সন্তান রাখলচন্দ্র রায় চৌধুরী ছিলেন রামতনুর ছাত্র। এবং ব্রাহ্মধর্মে উদ্বুদ্ধ। তাঁর বাড়িতেই ব্রহ্ম-উপাসনার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। পরে পাঁচজনের সঙ্গে যোগ দেন অন্নদাচরণ বর্মা। এরা গোপনে উপাসনা কাজ চালালেও, কিছুকালের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় ব্রাহ্মসমাজের কাজ ব্যাহত হতে থাকে। প্রথমে আচার্য পদে ছিলেন হরিশচন্দ্র মজুমদার। তিনি পদত্যাগ করার পর প্রার্থনা পরিচালনা করতেন পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং রামপ্রসাদ সেন। ১৮৬৫ সালে দুর্গামোহন দাশ বরিশাল আসার পর ব্রাহ্মসমাজের কার্যাবলী বৃদ্ধি পায়। তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর, গিরীশচন্দ্র মজুমদার এবং সর্বানন্দ দাশ। ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী শহরের মাঝখানে যে জমি দান করেন, সেই জমিতে নির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৬৫ সালের ১ নভেম্বর। মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধি করা হয় ১৮৮৬ সালে।

'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় ১৮৬৬ খ্রিঃ জুন প্রকাশিত একটি পত্র থেকে জানা যায় : "প্রিয় সম্পাদক মহাশয় শুনিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইবেন যে বরিশাল দিন দিনই উন্নত হইতেছে। এখানে ব্রাহ্মগণ ক্রমশই ধর্মপরায়ণ হইয়া আত্মার প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে ক্রমেই সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সানন্দ চিত্তে লিখিতেছি যে বিক্রমপুর কাঁচাদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু হরকান্ত সেনের সহধর্মিণী ও প্রসিদ্ধ নীলকর ওয়াইজ সাহেবের দেওয়ান বিক্রমপুর যপশা গ্রাম সন্নিকটস্থ বজ্রবাজার নিবাসী শ্রীযুতবাবু গৌরসুন্দর রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সহধর্মিণী সমাজগৃহে গমনপূর্বক উপাসনা করিতেছেন। এক্ষণ প্রার্থনা করি এই নগরস্থ অন্যান্য ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের সহধর্মিণীরাও অনুচিত লজ্জা ত্যাগ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া সেই জীবনের জীবনভূমা ঈশ্বরের উপাসনা করেন।"

বরিশাল ব্রাহ্মসম্প্রদায় সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশে'র অপর একটি সংবাদ : "আজিকালি বরিশালের ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে কর্তব্যানুষ্ঠানে যেরূপ উৎসাহী ও অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়, মফস্বলের আর কোন স্থানের কোন ব্রাহ্ম সম্প্রদায় প্রায় তদ্রূপ দেখা যায় না। তাহারা অন্তরে বাহিরে ব্রাহ্ম ধর্মের উৎকর্য সাধনার্থ যত্ন করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্মের আলোচনা, ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এবং ব্রাহ্ম ধর্মানুযায়ী অনুষ্ঠান, ইহার কোন অংশেই তাঁহারদিগের অমনোযোগ লক্ষিত হয় না। যে সকল ব্রাহ্ম সমাজের বয়োক্রমের সহিত তুলনা করিলে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজকে নব প্রসূত বলিতে হয়, উন্নতি বিষয়ে বরিশাল তৎসমুদায়কে অনেক দূর-পশ্চাতে ফেলিয়া উঠিয়াছেন সন্দেহ নাই। যে কয়েকজন ধর্মপরায়ণ উৎসাহশীল ব্রাহ্মের যত্নে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের এত উন্নতি আমরা সর্বান্তঃকরণে তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি।...বরিশালের ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ব্রাহ্ম সমাজের নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটি গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের নিমিত্ত পৃথকরূপে বেতন দিয়া স্বতন্ত্র একজন উপাচার্য নিযুক্ত করিয়াছেন, ভাষান্তর হইতে ধর্ম প্রতিবাদক গ্রন্থ অনুবাদিত করাইয়া ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। তিন চারটি বিধবা অবলার বিবাহ দেওয়াইয়াছেন এবং এই সম্প্রদায় কয়েক ব্যক্তি পরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথার সমুচ্ছেদ করিয়া উপবীত পরিত্যাগপূর্বক প্রকাশ্য ব্রাহ্ম হইয়াছেন। পরন্তু সম্প্রতি বরিশাল হইতে আমরা যে পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তৎপাঠে অবগত হইলাম, কিছুদিন হইল বরিশালে একটি ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও ব্রাহ্মিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত সুবিধা করা হইয়াছে। আর সাধারণেও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার নিমিত্ত একজন প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছে। এই প্রচারক খৃস্টিয়ান পাদরিদিগের ন্যায় ঘাটে পথে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়া থাকেন।..." (১৮৬৬ খ্রিঃ জুন ২৪)

১৮৬৬ ডিসেম্বর ৩০ প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় : ..."লাখুটিয়ার জমিদার শ্রীযুতবাবু রাখালচন্দ্র রায় এবং বিহারীলাল রায় প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ও উপবীত পরিত্যাগ করিবার পর অবধি তাঁহাদের জ্ঞাতি কুটম্বেরা তাঁহাদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। একে ত বিষয়চ্যুত করিবার চেষ্টা, তাহাতে আবার মিথ্যা ফৌজদারী নালিশ সংস্থাপন করিয়া অকারণ দণ্ডগ্রস্ত করিবার চেষ্টা। সম্প্রতি দুইটি মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। এতচ্ছ্রবণে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের কোন কোন সর্বসংশয়ী পণ্ডিতাভিমানী নাস্তিক সম্পাদক কহিবেন "যেমন কর্ম তেমনি ফল।" আমরা ঐ নাস্তিক্যবাদীদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন আর ঐরূপ ব্যবহার দ্বারা সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ না হয়েন। লোকে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিয়াছে, এবং এমন কেহই তাহাদের ফলাফল বিবেচকতারূপ নাস্তিকতাকে অনুমোদন করিবে না। শশক মনে করে চক্ষু মুদিত করিলে আর জগতের কেহই তাহাকে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তাঁহার এই ভ্রম কতক্ষণ অপ্রকাশ থাকে? অতএব তাঁহারা অন্যকে সৎকর্ম করিতে বাধা দিয়া আর যেন অধিকতর প্রত্যবায় ভাগী না হয়েন।..."

১৮৬৬ সালের ডিসেম্বর ২০ প্রকাশিত একটি সংবাদে ছিল ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরনাথ গুপ্ত এবং যদুনাথ চক্রবর্তী সপরিবারে বরিশাল যান। তিনজনের ৬টি বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। বক্তৃতা শেষ করে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা এবং অঘোরনাথ চট্টগ্রাম গমন করেন। গোটা বরিশাল জুড়ে তখন ব্রাহ্মসমাজের উন্মাদনা। সেই সঙ্গে চলল রক্ষণশীল হিন্দুদের সামাজিক উৎপীড়ন। সে

উৎপীড়নও ছিল ভয়ঙ্কর। এমন কী নৌকার মাঝিরা ব্রাহ্মদের পারাপার করতে আপত্তি জানাত। ১৮৭৯-৮০ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী এসেছিলেন বরিশালে। ১৮২১ সালে দুর্গামোহন দাস আইন ব্যবসার কারণে কলকাতা চলে যান। তখন জেলা স্কুলের হেডমাস্টার জগদ্বন্ধু লাহা হন সমাজের পরিচালক।

নারী জাগরণ

ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনই বরিশালের নারী সমাজকে সচেতন করে তুললেও, জনসাধারণের ব্যাপক অংশই ছিল নারী শিক্ষার বিপক্ষে। ব্রাহ্ম সমাজ ১৮৬৫ সালে একটি নারী বিদ্যালয় স্থাপন করে। বিদ্যালয় বেশিদিন চালানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের আচার্য গিরীশচন্দ্র মজুমদার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী। মেয়েদের শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন তৎপর। তাঁর স্ত্রী মনোরমা মজুমদার, রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরীর স্ত্রী সৌদামিনী দেবী, দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবী শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন, নানান প্রতিকূলতার মধ্যে বসবাস করেও। স্থানীয় জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগদ্বন্ধু লাহা অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মকর্মীকে নিয়ে একটি নারীকল্যাণ সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এরা মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে এই নারীকল্যাণ সভার নাম হয় বাকরগঞ্জ হিতসাধিনী সভা।

সর্বানন্দ দাশ মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে বিদ্যালয়টি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সর্বানন্দ দাশের কন্যা স্নেহলতা দাশ এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার কাজ করে অবসর নেন।

অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৮০ সালে যখন ওকালতির জন্য বরিশালে বসবাস শুরু করেন, তখন থেকে বরিশালের সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা। নারী শিক্ষার প্রসার দ্রুত ঘটতে থাকে। ১৮৮৪ সালে পিতা ব্রজমোহনের নামে একটি বিদ্যালয় এবং ১৮৮৯ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বগ্রাম বাটাজোড়েও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

সমসাময়িক সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ থেকে সেকালের নারী সমাজ সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

বরিশালে বিধবা বিবাহ

"পূর্ব বাঙ্গালার মধ্যে এ পর্যন্ত বরিশালেই যাহা কিছু বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়াছে। কিন্তু বহু দিবস হইল সেখান হইতেও এতদ্বিষয়ক আর কোন অনুষ্ঠানবার্তা না শুনিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন, বুঝি পূর্ব বাঙ্গালার বিধবোদ্বাহ অনুষ্ঠান এই পর্যন্ত স্থগিত হইয়া গেল। কিন্তু, পূর্বাবধিই আমাদিগের দৃঢ় ভরসা আছে বরিশালের কতিপয় সৎসাহসী ব্রাহ্মের উৎসাহ বহ্নি নির্বাপিত হইবার নহে। সুযোগ স্বরূপ ইন্ধন প্রাপ্ত হইলেই তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, বরিশালের সব অ্যাসিস্টান্ট সার্জন শ্রীযুক্তবাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি ও ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য শ্রীযুক্তবাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহশালী ব্রাহ্মের প্রযত্নে গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার দিবস রজক জাতির মধ্যে একটি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বরের নাম শ্রীকিশোরচন্দ্র ধুপী, এ ব্যক্তি বরিশাল জেলার অন্তপাতী আওয়াবুনিয়া গ্রাম নিবাসী রামদুর্লভ ধুপীর পুত্র। বয়স ২৬/২৭ বৎসর। পাত্রীর নাম শ্রীমতী অন্নপূর্ণা। ইহার পিতার নাম পঞ্চানন ধুপী। নিবাস ঐ আওয়াবুনিয়া। বয়স অনুমান ২০ বৎসর।..." (ঢাকা প্রকাশ ১৮৬৬ খ্রিঃ জুলাই ২২)

"বরিশালের একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, বিগত ২৭শে শ্রাবণ বরিশাল নগরে একটি বিধবা বিবাহ অতিসমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মধর্মানুসারে এই বিবাহ নির্বাহ হইয়াছে। পাত্রপাত্রী উভয়েই শূদ্র বংশীয়। পাত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোষ, বয়ঃক্রম ১৯/২০ বৎসর। পিতার নাম নবকিশোরচন্দ্র।...বৎসরের বয়সের সময় উহার পূর্ব বিবাহ হয় এবং ১০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বৈধব্য

ঘটে। পাত্রের নাম বৈকুণ্ঠনাথ সরকার, বয়স ২৭ কি ২৮ বৎসর। পিতার নাম গোপীচন্দ্র সরকার। উভয়েরই নিবাস এই জেলার অন্তঃপাতী ইলহার গ্রামে। এই বিবাহে হিন্দু, খৃস্টান, মুসলমান ও ব্রাহ্ম সকল প্রকার লোকই সমাগত হইয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মিকাও বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। দেশের সৌভাগ্য।" ঢাকাপ্রকাশ ১৮৬৯ খ্রিঃ আগস্ট ২২

নারী স্বাধীনতা

"সম্প্রতি আমরা বরিশাল হইতে একখানি পত্র পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম, লাখুটিয়ার জমিদারবাবু রাখালচন্দ্র রায় ও তত্রত্য সব অ্যাসিস্টান্ট সার্জন বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি যাবতীয় অন্তরায় অতিক্রম করিয়া তাহাদিগের স্ত্রীকন্যা প্রভৃতিকে সম্যক স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। তাহারা মুক্তদ্বার শকটরূঢ় গতায়ত করেন এবং সময়ে সময়ে প্রকাশ্য সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। রাখালবাবু ও অন্নদাবাবু এক একটি সৎপ্রথার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শক বলিয়া অনেকের ধন্যবাদার্হ হইবেন, সন্দেহ নাই।..." (ঢাকা প্রকাশ ১৮৬৬ খ্রিঃ অগাস্ট ৫)

বাল্য-বিবাহ বিতর্ক

নারী স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা বিস্তারে বাকরগঞ্জের একশ্রেণীর মানুষ যখন এগিয়ে আসছে, সে সময়ে এক শ্রেণীর রক্ষণশীল হিন্দুর ভূমিকা ছিল পশ্চাদমুখীন। তারা বিভিন্নভাবে এইসব সৎ ক্রিয়াকর্মের বিরোধিতা করতে থাকে। বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন চলছিল। দেশব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রক্ষণশীলরাও নানাভাবে এই উদ্যোগের বিরোধিতা করতে থাকে। বরিশাল ধর্ম রক্ষিণীসভার প্রচারিত আবেদন থেকে জানা যায় ঃ

"নিবেদনমেতৎ—প্রকাশ যে "বালিকা বিবাহ নিবারক আইনের পাণ্ডুলিপি কৌন্সেলে উপস্থিত হইয়াছে," বহুলোকের আপত্তি অভাবে আইনপাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং পাশ হওয়ার পূর্বেই নানা স্থান হইতে বহু হিন্দুর স্বাক্ষরিত আবেদন বড়লাটের হুজুরে যাওয়া আবশ্যক। ঐ আইন পাশ হইলে হিন্দুধর্মে আঘাত করিয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ও বিশ কোটি হিন্দুর মনে বেদনা দেওয়া হইবে" ইত্যাদি আপত্তি থাকিবে।

"মহাশয় সময় নষ্ট না করিয়া শীঘ্র স্বধর্ম রক্ষার জন্য যত্নমান হওয়তঃ আবেদন পত্রের নকলসহ পত্রোত্তর দানে বাধিত করিবেন।

নিবেদক—
শ্রীজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কার্যাধ্যক্ষ
(ঢাকাপ্রকাশ। ১৮৯০ খ্রিঃ নভেম্বর ৩০)

রাজনৈতিক আলোড়ন

বরিশাল শহরে প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন "বরিশাল জনসাধারণ সভা" গঠিত হয় অশ্বিনীকুমার দত্তর উদ্যোগে। সভাপতি ছিলেন উকিল প্যারীলাল রায় এবং সম্পাদক রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী। সভ্য ছিলেন হরনাথ ঘোষ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, উগ্রকণ্ঠ রায়, মৌলবি মহম্মদ ওয়াজেদ, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয়ানন্দ দাস, ডা. তারিণীকুমার গুপ্ত, হরকান্ত সেন, বিহারীলাল রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ। পরে সম্পাদক হন অশ্বিনীকুমার। তিনি গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে স্বদেশের সম্পর্কে ভাষণ দিতেন। বাকরগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে এদের কয়েকটি শাখাও স্থাপিত হয়েছিল। বরিশাল জনসাধারণ সভা জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয় ১৮৮৬ সাল থেকে। তারপর সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে বরিশালের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন অশ্বিনীকুমার। "বরিশাল স্বদেশ বান্ধব" সমিতি নামে আর একটি সংগঠন

গড়ে তুলেছিলেন তিনি, যার দেড়শ'র ওপর শাখা সমিতি ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন স্থানে। অশ্বিনীকুমারের পাশে এসে দাঁড়ান চারণকবি মুকুন্দদাস। বিলেতি পণ্য বর্জনের আন্দোলন বরিশালে তীব্র রূপ পায়। সেই সঙ্গে বেড়ে যায় পুলিশের নির্যাতন। মুকুন্দদাসের গান, পিকেটিং, রাখীবন্ধন, শিবাজী উৎসব, জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

"স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে এমনি ছোট খাটো অত্যাচার, জোরজুলুম, ভীতিপ্রদর্শন ও হুমকি চলেছিল জিলার প্রায় সর্বত্র। কিন্তু দেশবাসীর সংকল্প ছিল দৃঢ় এবং মনোবল অটুট। দেশের নেতৃত্বে ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস। তাই আন্দোলন এগিয়ে চলল অপ্রতিহত গতিতে। সঙ্গে সঙ্গে চলল পিকেটিং। কিছু রাজানুগৃহীত ব্যবসায়ী মফস্বলে গোপনে বিলাতিবস্ত্র বিক্রয় করত। সেসব দোকানে চলত পিকেটিং। এছাড়া বরিশালে ও মফস্বলে মদের দোকানে পিকেটিং করা হত। ক্রমে লবণের নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া, হাটে বিলাতি কাপড় ও নুনের দোকানে অগ্নিসংযোগ করাও অনেক জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। উজিরপুর, মাহিলাড়া, বাটাজোড়, গৈলা, ভোলা এবং অন্যত্র এবংবিধ ঘটনা ঘটেছে। মাহিলাড়া ও বাটাজোড়ে সুরেন্দ্রনাথ সেন ও হীরালাল দাশগুপ্ত প্রভৃতি কর্মীগণ প্রকাশ্যে পিকেটিং এবং গোপনে ধ্বংসাত্মক কার্যের সাহায্যে বিলাতিদ্রব্যের ব্যবসায় অচল করে দিয়েছিল।" (স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল—হীরালাল দাশগুপ্ত। পৃ. ৪৬)

১৯০৫ ঃ বরিশাল

বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি

বিস্তারিত বিবরণ

স্টিমার পথে

বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র বৃটিশ ভারতে এ পর্যন্ত যাহা কখনও ঘটে নাই যাহা ঘটিতে পারে বলিয়া কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই, গত ১৩১৩ সালের ১লা ও ২রা বৈশাখ বরিশালে ফুলার লাটের অনুগ্রহে তাহাই ঘটিয়াছে। এই ঘটনায় একদিকে যেমন ইংরাজ শাসনের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে জন-সাধারণের চিত্তে ঘোর অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ বাঙ্গালীর জীবনে নূতন উদ্দীপনার সমাগম হইয়াছে, এক দিকে সভ্যতাভিমানী ইংরাজ শাসনকর্তাদিগের বিচার দেখিয়া যেমন বাঙ্গালীর মোহ ভঙ্গ হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ আত্মনির্ভরশীলতার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া বাঙ্গালী জাতীয় জীবনে নূতন শক্তি সঞ্চয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। বাঙ্গালীর সাহস ও একতার পরিচয়ও এই ঘটনায় যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা হইতে প্রস্থানের পর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ ও স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বিরাট স্বদেশী সভার অধিবেশন করিয়া স্টিমার যোগে বরিশালে গমন করিতেছিলেন। বরিশালের স্বেচ্ছাসেবকেরা কলিকাতার প্রতিনিধিদিগের প্রত্যুদ্গমনের জন্য খুলনা পর্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে স্টিমারের প্রত্যেক ঘাটেই স্থানীয় অধিবাসীগণের অভ্যর্থনার জন্য বিবিধ বর্ণের পতাকা হস্তে সমবেত হইয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি সহকারে চতুর্দিক কম্পিত করিয়াছিলেন। খুলনার স্টিমার ঘাটে সভাপতি মহাশয়ের যথোচিত সম্বর্ধনা হইয়াছিল।

পূর্ববঙ্গের স্টিমারস্টেশনে বহু প্রহরী বড় বড় লাঠি হস্তে লইয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি নিবারণের জন্য উপস্থিত ছিল। স্টিমার হইতে প্রতিনিধিগণ তীরস্থ ব্যক্তিদিগকে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কিন্তু পুলিশের ভয়ে তীরস্থ লোকেরা প্রথমে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যভিবাদন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর যখন এন্টিসার্কুলার সোসাইটির যুবকদিগের মধ্যে দুই একজন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "বল ভাই বন্দেমাতরম্। যদি বাঙ্গালী হও, তবে আজ প্রাণ খুলিয়া বল, বন্দে

মাতরম্, জীবন ধন্য হউক।" এই কথায় বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, লগুড়ধারী পুলিশ প্রহরীর ভয় ঘুচিল। তীর হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া ধ্বনি উঠিল 'বন্দেমাতরম্'। অনেক স্থানেই এইরূপ হইয়াছিল, পুলিশ প্রহরীরাও ভয়ে উচ্চবাচ্য করে নাই। মাঠের কৃষকেরা পর্যন্ত লাঙ্গল ছাড়িয়া নদীতীরে সমবেত হইয়া সেই বন্দেমাতরম্ উচ্চারণে যোগদান করিয়াছিল।

সভাপতি মিঃ এ রসুল মহোদয়ের অভ্যর্থনার জন্য প্রত্যেক স্টিমার স্টেশনই স্থানীয় অধিবাসীগণের দ্বারা পত্রপুষ্প কদলীবৃক্ষে ও আম্র পল্লবে সজ্জিত হইয়াছিল।

স্বতন্ত্র পথে

খুলনার পথে এই। নারায়ণগঞ্জের পথে সুরেন্দ্রনাথের স্টিমারে আরও উৎসাহপূর্ণ দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিবর্গ এই জাহাজেই কোন প্রকারে স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির সহিত "সুরেন্দ্রনাথের জয়" "সুরেন্দ্রনাথের জয়" ইত্যাদি ধ্বনি সর্বত্র পরিশ্রুত হইয়াছিল। কুমারীগণ মঙ্গল শঙ্খ নিনাদিত করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মুসলমানেরাও দলবদ্ধ হইয়া প্রায় প্রত্যেক স্টিমার স্টেশনেই সুরেন্দ্রবাবুর প্রতিনিধিবর্গের অভ্যর্থনার জন্য সাগ্রহে সমবেত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য সকলেরই বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল। ইদিলপুর স্টেশনের দৃশ্যই অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সেখানকার লোকেরা ৫ খানি নৌকা "বন্দে মাতরম্", Long live our Banerjee, আমাদের বাড়ুয্যে দীর্ঘজীবী হউন ইত্যাদি শব্দাঙ্কিত পতাকা নিচয়ে সজ্জিত করিয়া স্টিমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পুষ্পমাল্যে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহগামী প্রতিনিধিদিগকে ভূষিত করিয়াছিলেন। নৌকাগুলি স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণে এরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, যে নৌকায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। নৌকাস্থিত মহোদয়েরা স্টিমারে উঠিয়া "বন্দে মাতরম্" প্রভৃতি শব্দাঙ্কিত পতাকা দিয়া স্টিমারটিকে সজ্জিত করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের অনেক সহযাত্রী তাঁহার সম্মানের অংশ পাইয়াছিলেন।

"রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

তাঁহার সঙ্গে অনেকে সেইরূপ সুখে বরিশালে গমন করিয়াছিলেন। কতদূর হইতে কত প্রবীণ অশীতিপর বৃদ্ধ সুরেন্দ্রবাবুকে দেখিতে আসিয়াছিলেন ভাবিলে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়। কৃষক বালিকা হইতে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পর্যন্ত নদীর তীরে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সকলের নিকটেই সুরেন্দ্রবাবুর এক নিবেদন—"আপনারা স্বদেশী বস্তুর প্রচার ও ব্যবহার করুন, বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্জন করুন।"

বরিশালে পদার্পণ

শুক্রবার রাত্রি আটটার সময় কলিকাতা, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিগণকে লইয়া স্টিমার বরিশালে উপস্থিত হইল। স্টিমার ঘাটে লাগিবামাত্র সমাগত প্রতিনিধিগণ উচ্চ কণ্ঠে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করিলেন। তীরে বরিশালের মান্যগণ্য লোকেরা তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই প্রতিনিধিগণের জয়ধ্বনির উত্তরে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া প্রতিধ্বনি করিলেন না। তখন প্রতিনিধিগণের মধ্যেই যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে বরিশালের রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিতে হইবে। বরিশালের নেতৃবর্গ স্টিমারে উঠিয়া সুরেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রাজপথে "বন্দেমাতরম্" বলিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং দলবদ্ধভাবে রাজপথ দিয়া সভাপতি রসুল সাহেবকে লইয়া যাইতেও নিষেধ করিয়াছেন। অতএব সকলে নীরবে স্টিমার হইতে অবতরণ করিয়া ভূকৈলাসের

রাজবাটীতে চলুন। সেখানে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি প্রাণ ভরিয়া করা যাইবে, প্রতিনিধিগণের যথোচিত অভ্যর্থনাও সেইখানেই হইবে। অনুরোধ পালনে প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে অনেকেই সম্মত হইলেন। কিন্তু এন্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণ বলিলেন "ম্যাজিস্ট্রেটের আইন বিরুদ্ধ আদেশ আমরা মানিতে পারিব না। যদি "বন্দে মাতরম্" বলিতে দেওয়া না হয়, তবে আমরা কনফারেন্সে যোগদান করিব না।' অনেকে এন্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণের মতের সমর্থন করিলেন।

দ্বিতীয় জাহাজের আগমন

এই সকল প্রতিনিধি ঘাটে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এমন সময়ে নারায়ণগঞ্জের জাহাজে সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি বরিশালে আসিলেন। জাহাজ হইতে বন্দেমাতরম্ শব্দ উঠিল, তীর হইতেও পূর্ব জাহাজে সমাগত প্রতিনিধিমণ্ডলী সেই পবিত্র শব্দের প্রতিধ্বনিতে তীরভূমি কাঁপাইয়া তুলিলেন। তখন ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রথম জাহাজের যাত্রীরা ইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে থামাইয়া দ্বিতীয় জাহাজে সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে আসিলেন। বরিশালের নেতারা বলিলেন এখন পথিমধ্যে পুলিশের সঙ্গে বিবাদ করিলে আমরা অভ্যর্থনার যে উদ্‌যোগ করিয়াছি সে সকলই পণ্ড হইবে। তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, অন্তত সেদিনকার মত কোন বিবাদ করা হইবে না। প্রতিনিধিরা তখন রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে চন্দ্রাতপ তলে গমন করিলেন। রীতিমত অভ্যর্থনা হইলে যে যার নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন।

স্বেচ্ছাসেবক

স্বেচ্ছাসেবক বা ভলান্টিয়ারদিগের সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে আমাদিগের বিবৃতি সম্পূর্ণ হইতে পাবে না। সম্ভ্রান্ত বংশ সম্ভূত উচ্চপদস্থ ভদ্র সন্তানগণ সামান্য ভৃত্যের ন্যায় অভ্যাগতদিগের পরিচর্যায় কিরূপ আগ্রহ সহকারে রত হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া বুঝান দুঃসাধ্য। পুলিশ কুলিদিগকে উত্তেজিত করিয়া ভারবহনে অপ্রবৃত্ত করিলে এই মহোদয়গণের গুণে সেজন্য কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই। দলে দলে ভদ্র সন্তানেরা মাথায় মোট লইয়া প্রতিনিধিদিগের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় উপনীত হন। এ দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন তিনি কখনই ভুলিতে পারিবেন না। ইঁহাদিগের শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আজ্ঞানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকলেরই অনুকরণীয়।

প্রথম দিবসের ঘটনা

বেলা দুই ঘটিকার কিঞ্চিৎ পূর্বে এন্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণ দলবদ্ধ হইয়া রাজবাটী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ বাবু রজনীকান্ত গুহ, হাওড়া-হিতৈষী সম্পাদক বাবু গীষ্পতি রায় চৌধুরী ও সঞ্জীবনী সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন। ইঁহারা রাজবাটীর তোরণের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কেম্প সহসা এন্টিসারকুলার সোসাইটির সভ্যদের গতিরোধপূর্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং এক লাঠি দ্বারা বাবু ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিবুকে আঘাত করিলেন; চিবুক কাটিয়া শোণিতপাত হইতে লাগিল। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র পশ্চাৎদিক হইতে দৌড়িয়া আসিলেন এবং কেম্প সাহেবকে বলিলেন, "আপনি অকারণে ফণিভূষণকে প্রহার করিলেন কেন?" মিঃ কেম্প বলিলেন "আমি ইঁহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া যাইতে দিব না।" কৃষ্ণবাবু বলিলেন "পাছে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া না গেলে আপনারা বলেন যে রাস্তা বন্ধ করিয়া যাইতেছে, তাই ইঁহারা সুশৃঙ্খলভাবে গমন করিতেছিলেন। কেন ইঁহাদিগের গতিরোধ করিলেন? কেনই বা একজনকে প্রহার করিলেন?" মিঃ কেম্প এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "ইঁহারা প্রতিনিধি নহেন, ইঁহাদিগকে যাইতে দিব না।" কৃষ্ণবাবু বলিলেন, "ইঁহারা প্রতিনিধি, অবশ্য

যাইতে দিতে হইবে।" তখন কেম্প বলিলেন "ইঁহারা যাইতে পারেন।" অতঃপর ইঁহাদের সম্মুখ হইতে লালপাগড়ীর দল সরিয়া গেল, ইঁহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। নেতৃবর্গের আদেশ ছিল, সে দিন পুলিশের সহিত বিবাদ করিবে না, কাজেই এন্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিরা রক্তপাত দেখিয়াও নীরবে নিগ্রহ সহ্য করিলেন।

অতঃপর এন্টিসারকুলার সোসাইটির সভ্যগণ বাটীর প্রাঙ্গণে প্রথমে "বন্দেমাতরম" এবং "যায় যাবে জীবন চলে" সঙ্গীত গাইয়া সমবেত জনমণ্ডলীর হৃদয়ে অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে লাগিলেন।

বেলা আড়াইটার সময় মিঃ রসুল সহধর্মিণীসহ প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন এবং শকটারোহণে মণ্ডপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রহরী দল

পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কেম্প সাহেব বহুসংখ্যক কৃষ্ণপরিচ্ছদ সাধারণ পুলিশ ও খাকি কোর্তাধারী রিজার্ভ পুলিশ লইয়া বেলা একটার সময় রাজবাটীর দ্বারদেশে বাধা দিয়াছিলেন। অ্যাসিস্টান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট একটি বালক ফিরিঙ্গী মাত্র। তিনিও অশ্বপৃষ্ঠে তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বহুসংখ্যক বাঙ্গলী ইনস্পেক্টার রাস্তায় ও হাবেলীর প্রাঙ্গণে যাতায়াত করিতেছিলেন। তাহারা এন্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিদের উপর রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। হাবেলীর নিকটে রাস্তার অপর পার্শ্বে ঢাকার নবাব সলিমোল্লার কাছারি। সেই বাটী পুলিশের কেল্লায় পরিণত হইয়াছিল। সেই বাটীতে বহুসংখ্যক পুলিশ বন্দুক লইয়া সমবেত হইয়াছিল।

প্রতিনিধিগণ দেখিলেন, সাধারণ পুলিশ ও রিজার্ভ পুলিশ বড় লাঠি লইয়া রাজপথে অবস্থিতি করিতেছে, নবাবের কাছারিতে বন্দুকধারী পুলিশ সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে রিজার্ভ পুলিশের সুবাদারের হাতে লাঠি ও কটিদেশে তরবারি শোভা পাইতেছে। তথাপি বরিশালের রাজপথে "বন্দেমাতরম্" বলিবার জন্য তাঁহারা যে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তাঁহারা ফুলারের বেআইনী সারকুলার অগ্রাহ্য করিয়া রাজপথে "বন্দেমাতরম" বলিবার জন্য বহির্গত হইলেন; বাবু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও রাজপথে বহির্গত হইলেন, তাঁহাদের কিছু পশ্চাতেই এন্টিসোসাইটির প্রতিনিধি ছিলেন ইঁহারা ফটক পার হইয়া রাজপথে বহির্গত হইবামাত্র একদল তাঁহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। নিমেষ মধ্যে পূর্বগামী ও অনুসরণকারী প্রতিনিধিদিগের শ্রেণী হইতে তাঁহাদিগকে পৃথক করিয়া বহু "কৃষ্ণবর্ণ কোর্তা ও খাকি কোর্তাধারী" পুলিশ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিল। মিঃ কেম্প তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের উত্তরীয় (Badge) পরিত্যাগ কর;" তাঁহারা "বন্দেমাতরম" অঙ্কিত উত্তরীয় পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন কেম্প বলপূর্বক উত্তরীয় কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। তাঁহারা হস্ত দ্বারা বক্ষোপরিস্থ উত্তরীয় চাপিয়া ধরিলেন। তখন কেম্প স্বয়ং ও তাহার অনুচর পুলিশ তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন তাঁহারা "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিয়া অটল অচলের ন্যায় রাজপথে দণ্ডায়মান হইলেন। কেম্প ও পুলিশ বলপূর্বক তাঁহাদের উত্তরীয় অপহরণ করিতে লাগিল। ইহাদের উপর অবিশ্রান্ত লাঠি বৃষ্টি হইতে লাগিল, তথাপি ইঁহারা ছত্রভঙ্গ হইলেন না, বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পুলিশের লাঠিতে শচীন্দ্রপ্রসাদের বদনমণ্ডল ফাটিয়া রক্তপাত হইল। ফণীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গ লাঠিতে ক্ষত বিক্ষত হইল, বীরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, হেম আহত হইল, তথাপি কেহ বন্দেমাতরম্ বলিতে ক্ষান্ত হইল না। এন্টিসার্কুলার সোসাইটির প্রত্যেক প্রতিনিধি আহত হইল, তথাপি কেউ ভীত হইল না। শ্রেণী ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল না।

পুলিশের অত্যাচার

বহুসংখ্যক লাঠিধারী পুলিশ শূন্যহস্ত বালকদিগকে ঘিরিয়া যখন প্রহার করিতেছিল, তখন অগ্রগামী বা অনুসরণকারী কোন প্রতিনিধি জানিতে পারেন নাই যে, এন্টিসার্কুলার সোসাইটির প্রতিনিধিদিগকে কেহ এমন করিয়া প্রহার করিতেছে। অনুসরণকারী প্রতিনিধিগণ যখন ফটক পার হইয়া রাজপথে গমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন আর একদল পুলিশ তাঁহাদের উপর লাঠি চালাইয়া তাঁহাদিগকে বাটীর বাহির হইতে দিল না। পাছে তাঁহারা অগ্রসর হইয়া এন্টিসার্কুলার সোসাইটির প্রতিনিধিদিগকে সাহায্য করেন, সেই জন্য পথরোধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। ফটকের সম্মুখে কতকগুলি লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, লাঠির আঘাতে সেগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন দেখা গেল বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র হাবেলির ভিতর হইতে বহির্গত হইলেন। পুলিশের লাঠি বর্ষণের ভিতর দিয়া রাজপথে আসিলেন। তাঁহার পশ্চাতে কৃষ্ণনগরের উকীল বাবু বেচারাম লাহিড়ী যেই ফটক পার হইয়াছেন, অমনি কাল কোর্তাওয়ালা একটা বাঙ্গালী কনেস্টবল তাঁহাকে প্রহার করিল। বেচারাম বাবু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। তখন কৃষ্ণবাবু সেই কনেস্টবলটার গলা ধরিয়া টানিয়া আনিয়া মিঃ কেম্পের নিকট উপস্থিত করিলেন। কেম্প বলিলেন, "হাঁ আমি ইহাকে মারিতে দেখিয়াছি। আমি ইহাকে কয়েদ করিলাম।" প্রকাশ পাইল ইহার নাম শশিভূষণ দে।

কাব্যবিশারদের দুর্গতি *

বাবু ললিতমোহন ঘোষালের চীৎকারে ছাত্রদিগের নিগ্রহ হইতেছে শুনিয়া কাব্যবিশারদ একদিকে অগ্রসর হইয়া কয়েকটি যুবককে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করেন। তাঁহার উপরে লগুড় চালিত হইয়াছিল; কিন্তু আঘাতের মাত্রা কলিকাতায় ডাক্তারি পরীক্ষার পূর্বে সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় নাই। একজন হিন্দুস্থানী সুবাদার বলিয়া উঠিল "মারো মাৎ, ব্রাহ্মণ হ্যায়"। তাহাতেই সেযাত্রা তাঁহার নিষ্কৃতি লাভ ঘটিয়াছে।

আরও অত্যাচার

শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জের বাবু ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ফটক হইতে বাহির হইবামাত্র পুলিশের সুবাদারের হুকুমে প্রহৃত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। তাঁহার মস্তক ফাটিয়া গেল, হাত ভাঙ্গিয়া গেল। কৃষ্ণবাবু কিঞ্চিৎ দূর হইতে তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অগ্রসর হইলেন এবং সুবাদারকে এক ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। যে সকল পুলিশ প্রহার করিতেছিল, কৃষ্ণ বাবুর কথায় তাহারা সরিয়া গেল। তখন কৃষ্ণ বাবু মিঃ কেম্পের নিকট গমন করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া যেখানে ব্রজেন্দ্রলাল পড়িয়াছিলেন, সেইখানে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণবাবু কেম্পকে বলেন, "তোমার পুলিশ গুণ্ডার ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। তাহাদিগকে এখনই সরিয়া যাইতে বল। নতুবা আজ মহা বিপদ হইবে।" কৃষ্ণবাবু যখন কেম্পকে টানিয়া লইয়া গিয়া ব্রজেন্দ্রলালকে দেখাইলেন, তখন চারিদিকে 'বন্দে মাতরম্" ধ্বনি হইতে লাগিল।

সুরেন্দ্রবাবুর অবরোধ

বাবু ললিতমোহন ঘোষালের গগনভেদী স্বরে অগ্রগামী নেতারা যখন জানিতে পারিলেন যে পশ্চাদ্‌ভাগের শ্রেণীতে যুবকদিগের উপর লাঠি চালাইতেছে, তখন তাঁহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। পুলিশদলেও একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কনস্টেবলগণ লাঠি স্কন্ধে করিয়া রুদ্ধশ্বাসে সেই দিকে দৌড়িয়া গেল। কেম্পও সেই দিকে

ধাবিত হইলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে কেম্প সুরেন্দ্রবাবুকে বন্দী করিয়া ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পশ্চাতে লাঠির আঘাতে প্রতিনিধিদিগের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, ইহা শুনিতে পাইয়া বাবু সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ফিরিয়া আসিতেছিলেন। সম্মুখে কেম্পকে দেখিতে পাইয়া সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এসব কি হইতেছে? যদি কোন বে-আইনী কাজ করিয়া থাকি, তবে আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিতে পার, কিন্তু কাহাকেও প্রহার করার অধিকার তোমাদিগের নাই। যদি ইচ্ছা হয়, আমাকে বন্দি করিতে পার।" কেম্প বলিলেন "আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।" সুরেন্দ্রবাবু তখন বলিলেন, "বেশ গ্রেপ্তার কর ক্ষতি নাই, আমার ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। কাহাকেও প্রহার করিও না।" তখন মতিবাবু, ভূপেন্দ্রবাবু প্রভৃতি পশ্চাদ্দিকে আসিয়া বলিলেন, "আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।" চারিদিক হইতে বহু লোক বলিলেন, "আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।" কেম্প বলিলেন আপনাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম নাই। কেম্প সুরেন্দ্রবাবুকে লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি গেলেন। লাখুটিয়ার মনস্বী জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। গমনকালে সুরেন্দ্রবাবু অপর সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা মণ্ডপে গমন করিয়া কার্য নির্বাহ করুন।"

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

সুরেন্দ্রনাথের এই অবরোধের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীযুক্ত অনারেবল মিঃ জে. চৌধুরী ফটকের সম্মুখে আসিয়া কেম্পকে বলিলেন, "তুমি পুলিশকে শাসনে রাখিতে পারিতেছ না।" কেম্প বলিলেন, "আমার কর্তব্য কর্ম আমি বেশ জানি।" একজন কনেস্টবল আসিয়া মিঃ চৌধুরীর মাথায় লাঠি মারিয়াছিল। তাঁহার মাথায় টুপী না থাকিলে বোধ হয় তাঁহার মাথা ফাটিয়া যাইত। সে যাহা হউক, এমন সময়ে হঠাৎ সম্মুখে গভীর 'বন্দেমাতরম্" ধ্বনি হইল। কেম্প তখন সুরেন্দ্রবাবুকে বন্দি করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের বাটীতে গিয়াছিলেন। সুতরাং আসিস্টান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট অশ্বে কশাঘাত করিয়া দ্রুতবেগে সেই দিকে ছুটিলেন। প্রকাণ্ড লাঠি উত্তোলন করিয়া পুলিশদল সেই দিকে দৌড়িল। তখন পশ্চাৎদিক হইতে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি হইল। ছোট প্রভু ও পুলিশ আবার পশ্চাদ্দিকে দৌড়িয়া আসিলেন। তখন সম্মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শুনিয়া আবার পুলিশ সেই দিকে ধাবিত হইল। পুলিশ এইরূপ একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাদ্দিকে, ফুটবলের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। সমস্ত প্রতিনিধি রাস্তায় বহির্গত হইয়া বন্দেমাতরম্ রবে নগর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভাণ্ডার পত্রের অধ্যক্ষ বাবু কেদারনাথ দাসগুপ্ত রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। ছোট সাহেব ঘোড়ার উপর হইতে তাঁহার পেটে পদাঘাত করিলেন। কেদার বাবু তাঁহার ঘোড়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছোট বীর দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন। সকলের পশ্চাতে বাবু আনন্দচন্দ্র রায়, বাবু অনাথবন্ধু গুহ ও মিঃ জে. চৌধুরী নির্দিষ্ট স্থানে ছিল। তাঁহারা সমস্ত প্রতিনিধিদিগকে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে একজন যুবক সভাপতির মুদ্রিত বক্তৃতা লইয়া মণ্ডপের দিকে যাইতেছিলেন। ছোট হুজুর মনে করিলেন ঐ বুঝি রাজদ্রোহসূচক পুস্তিকা লইয়া যাইতেছে। তাই সে কয়েকখানি কাগজ কাড়িয়া লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কার্যারম্ভ

সভাপতি মিঃ আবদুর রসুল সপত্নীক সভাস্থলে উপস্থিত হইলে অধিবেশন আরম্ভ হইল। এত উত্তেজনা, সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধ পুলিশের অত্যাচার প্রভৃতি কিছুতেই সদস্যবর্গের হৃদয় টলিল না। তাঁহারা কার্যারম্ভ করিলেন। বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে গিয়াছিলেন। সুতরাং সহকারী সম্পাদক বাবু নিবারণচন্দ্র দাস তাঁহার পরিবর্তে আবাহন বক্তৃতা পাঠ করিলেন। "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিল।

ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে

পূর্বেই বলিয়াছি, সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে লাখুটিয়ার উচ্চমনা জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়, সুপ্রসিদ্ধ বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গমন করিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চাপরাসী দিয়া কাব্যবিশারদকে ডাকাইলেন। তাঁহার সেই অনাবৃত দেহ, শুভ্র উপবীত ও কৌষিক ধুতি চাদর অবশ্যই অসভ্যতা-ব্যঞ্জক বিবেচিত হইল। প্রভু ইমার্সন কেম্প সাহেবকে বলিলেন, "এইরূপ লোকদিগকে মাথায় 'হ্যাট' না দিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন পুরঃসর আমার অবজ্ঞা করিবার কি প্রয়োজন ছিল, বুঝিতে পারি না।" বিশারদকে বলিলেন "Get out"। এরূপ সম্ভাষণ পাইয়া সহাস্য হাস্যে, লগুড় গ্রহণ পূর্বক কাব্যবিশাবদ মহাশয় গাড়িতে আসিয়া বসিলেন ও কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের অভ্যর্থনা হইল। তাঁহার ধুতি চাদর জামা পরা ছিল, কিন্তু মাথায় হ্যাট বা সাহেবী টুপী ছিল না, সুতরাং তাঁহারও বহির্দেশে গমনের অনুমতি হইল। শেষে বিহারীবাবুকেও আরক্ত নেত্রে বাহিরে যাইতে বলা হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ডাকা হইল।

সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বিচার

বাবু সুরেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসিতে যাইতেছিলেন। ইমার্সন সাহেব তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "আপনি আসামী বসিতে পারেন না।" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমাকে কি অপমানিত করিবার জন্য এই স্থলে আনয়ন করা হইয়াছে?" হুজুর কোন উত্তর দিলেন না। আপন মনে কি লিখিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন আপনাকে দশ হাজার টাকার মুচলেখা দিতে হইবে ও প্রত্যেক পাঁচ হাজার করিয়া দশ হাজার টাকার দুইজন জামিন দিতে হইবে। অতঃপর এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হইল না। কোথায় বা জামিন, কোথায় বা মুচলেখা, কে দিবে আর কে বা গ্রহণ করিবে? এ কথাই আর উঠিল না! এ ব্যাপার এই পর্যন্তই চাপা পড়িল।

ইমার্সন লীলা

তখন কেম্পের এজেহার গৃহীত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "আপনাদিগের ব্যবহার কি লজ্জাজনক নহে?" তাহাতে সুরেন্দ্রবাবু কহিলেন, "আমি এরূপ ভাষা ব্যবহারের প্রতিবাদ করি।" ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে এরূপ ভাষা শোভা পায় না।" ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, আপনি আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন, সুতরাং আপনাকে অভিযুক্ত করিতেছি।

সুরেন্দ্রবাবু। তাহা হইলে আপনি ইহার বিচার করিতে পারেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমি আমার কর্তব্য বেশ বুঝি।

ইস্টার পর্বের ছুটির সময়ে, ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে আদালতের প্রতি অবজ্ঞা এই ভাবে গড়াইতে লাগিল। কাণ্ড দেখিয়া হুজুরের বন্ধুর আর এক হুজুর সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, "ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলুন।" সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমি তাহাতে প্রস্তুত নহি।"

ম্যাজিস্ট্রেট। আমি আপনাকে আব একবার সময় দিতেছি। আপনি আপনার কথা প্রত্যাহার করুন।

সুরেন্দ্র বাবু। আমি কোন অন্যায় কথা বলি নাই, সুতরাং কোন কথারই প্রত্যাহার করিব না।

আদালতের অবজ্ঞার জন্য সুরেন্দ্রবাবুর দুই শত টাকা জরিমানা হইল।

গ্রেপ্তারের পরিশিষ্ট

তখন সুরেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী কেম্প সাহেবের এজেহার গৃহীত হইতে লাগিল। এই এজেহারের সহিত সরকারি প্রকাশিত এজেহার কিরূপ মিলিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতেই পারিতেছেন। ১১৮ ধারার মামলায় বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে পারে না, তথাপি সুরেন্দ্রবাবু

অবরুদ্ধ ও দণ্ডিত হইলেন। দুইশত টাকা জরিমানা অথবা তাহার পরিবর্তে একমাস কারাবাসের অনুমতি হইল।

সুরেন্দ্রনাথের সভাপ্রবেশ

সভাস্থলে সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যাগত হইলে তথায় যে ভাবের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা মানব ভাষার অসাধ্য। দিগ্দিগন্ত জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সকলে সমস্বরে "সুরেন্দ্রনাথের জয়" "বন্দেমাতরম্" প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে লাগিল। ভাবাবেশে গদগদ কণ্ঠে সকলের হৃদয় দ্রব করিয়া সুরেন্দ্রবাবু সভাপতি [illegible] প্রস্তাবের যে প্রকারে অনুমোদন করিলেন, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুভব করা অল্পায়াস সাধ্য।

হৃদয়-বিদারক দৃশ্য

পূর্বকথিত আহত যুবক বাবু ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলীর ক্ষতস্থান চিকিৎসকেরা যে ভাবে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই ভাবে টেবিলের উপর দাঁড় করাইয়া জ্বরগ্রস্ত, আহত চিত্তরঞ্জনের পিতা বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, "বাল্যকালে মেঘনাদ বধ কাব্য পাঠ করিতে করিতে আমার দুইটি ছত্র বড় ভাল লাগিয়াছিল। পুত্রশোকাতুর রাবণ বীরবাহুর মৃত দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত দেখিয়া বলিয়াছিলেন :—

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাদ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ়; শতধিক্ তারে।"

আজি আমার পুত্রকে পুলিশ হস্তে নিগৃহীত দেখিয়া ও ধূলাবলুণ্ঠিত এই সকল বালককে দেখিয়া আমার মুখ দিয়া যেন বাহির হইতেছে—

যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাদ এ শয়নে
সদা!

এইরূপ ওজস্বিনী ভাষায় লোকের মর্মস্পর্শ করিয়া মনোরঞ্জন বাবু যখন বলিতে লাগিলেন, তখন সভাস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতার কেহই বোধ হয় অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। পুত্র জীবিত থাকিবে কি না, সেই শঙ্কা, এই উদ্বেগ, পিতার প্রাণে কি দারুণ আঘাত করিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু অন্তরের ভাষা বেশ সংযত করিয়া মনোরঞ্জন বাবু যে বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহা কি এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে বিফল হইবে?

শ্রীমান চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা

এই বীরবালক সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার অন্যতম পুত্র। ইহার অঙ্গে এন্টিসার্কুলার সোসাইটির নাম অঙ্কিত ছিল বলিয়া কাপুরুষ পুলিশের লোকেরা ইহাকে আক্রমণ করে। এদিক হইতে লগুড়ের আঘাতে উহাকে ওদিকে ফেলিয়া দেয়। বালক "বন্দেমাতরম্" বলিতে বলিতে ওদিকে গিয়া পড়ে, আবার ওদিক হইতে লাঠির ঘায় বালককে এদিকে ফেলিয়া দিলে বন্দেমাতরম্ বলিতে বলিতে এদিকে আসিয়া পড়ে। কঠোর আঘাতে একবারও বালক "বন্দেমাতরম্" বলিতে বিরত হয় নাই। শেষে পাষণ্ডেরা যখন তাহাকে পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিল ও লগুড়াঘাত করিতে লাগিল

তখনও শ্রীমান চিত্তরঞ্জন "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি পরিত্যাগ করে নাই। এই ভাবে তাহার প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা দেখিয়া একজন হিন্দুস্থানী পুলিশ কর্মচারী তাহাকে পুষ্করিণীর পাড়ে তুলিয়া দেয়। বালকের তখন মাথা ঘুরিতেছিল, তীরে আসিয়া দারুণ যন্ত্রণায় তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইলে, সে বিশ্রামলাভ করিল। তাহার পিতা আসিয়া যখন পুত্রকে দেখিলেন, তখন বালক বলিল, "বাবা শেষ পর্যন্ত আমি "বন্দেমাতরম্" বলিয়াছি। আর এক ঘা লাঠি খাইলে আমার মৃত্যু হইত।" পিতা মনোরঞ্জন বাবু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "বাবা দেশের জন্য তুমি যদি মরিতে, তাহা হইলে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইতাম না।" ঐ দিবস বালকের জ্বর হয়; এখন আমরা আহ্লাদের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি, তিনি ভাল আছেন।

বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র

ইনি যে প্রকার স্বদেশানুরাগ ও সৎসাহস প্রকাশ করিয়া বালকদিগকে কাপুরুষদিগের আক্রমণ রক্ষা করিবার জন্য অগ্রগামী হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমার বাবু রিক্ত হস্তে ৪ জন কনস্টেবলের গলদেশ ধৃত করিয়া তাহাদিগকে কয়েক হাত তফাতে নিক্ষেপ করেন তাহাতে কয়েকটি ছাত্রের নির্যাতন রহিত হয়।

বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু

ছাত্রদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নির্ভীক চিত্তে সশস্ত্র পুলিশ কনস্টেবলের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "মারো মৎ"। একজন মুসলমান প্রহরী তাঁহাকে বলিল, "তোমকোবি মারেগা" ভূপেন্দ্র বাবু বলিলেন, "মারো"। তাঁহাকে কিন্তু কেহ মারিল না।

সমিতির অন্যান্য কার্যবিবরণ

সভাপতি-নির্বাচন

বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যে তেজোগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিষম উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, একদিন সকলেই এদেশে ইংরাজরাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে করিত। কিন্তু অদ্যকার ব্যাপার দেখিয়া অন্যরূপ মনে হইতেছে। নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ভদ্রজনসমাজের প্রতি এরূপ ঘোর অবৈধ অত্যাচার কখনই রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর নহে। তাঁহার অগ্নি-গর্ভ বক্তৃতা শেষ হইলে ছয় সহস্র কণ্ঠে ভীষণ রবে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি হইল। বাবু মতিলাল ঘোষ এই প্রস্তাব অনুমোদন ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে উহা পরিগৃহীত হয়। তখন মিঃ রসুল সভাপতির আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার বক্তৃতার একাংশ শ্রীযুক্ত হালিম গজনভি মহোদয় পাঠ করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রস্তাব

সভাপতির বক্তৃতার পর বাবু মতিলাল ঘোষ প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সে প্রস্তাবের মর্ম এই :—যেহেতু আজ দিবালোকে, সমস্ত সহরের লোকের সম্মুখে ডিস্ট্রিক্ট ও আসিস্টান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের আদেশে পুলিশ সভাপতি মিঃ রসুলের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত প্রতিনিধিদের উপর অবৈধভাবে লাঠি চালাইয়াছে এবং দেশবাসীর নেতা বাবু সুরেন্দ্রনাথকে বিনা কারণে একরূপভাবে কয়েদ করিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, বরিশালে আইনসঙ্গত শাসনপ্রণালী বিলুপ্ত হইয়াছে।

যেহেতু পূর্ববাঙ্গালা ও আসামের নানা স্থানের লোক স্বদেশসেবা করার অপরাধে প্রহৃত ও নানারূপে নিগৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই প্রদেশে আর বৈধ শাসনপ্রণালী প্রচলিত নাই; সুতরাং নিজের শক্তির যে সকল কার্য নির্ভর করে, বর্তমান বর্ষের সমিতি কেবল সেই সকল প্রস্তাবের আলোচনা করিবেন। বর্তমান দায়িত্বশূন্য গভর্নমেন্টের উপর যে সকল কার্যের মীমাংসার ভার আছে, বর্তমান বর্ষের সমিতি তাহার আলোচনা হইতে ক্ষান্ত থাকিবেন। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইলে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিবস

অদ্য সহরে গুজবের অন্ত নাই। কেহ বলিল, আজ প্রতিনিধিগণ রাস্তায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাহির হইলেই পুলিশ গুলি চালাইবে। কেহ বলিল, রাস্তায় যে বন্দেমাতরম্ বলিবে, তাহাকেই পুলিশ গুলি করিবে বলিতেছে। এমন কি গুজব রটিল যে, ফুলার সাহেব বরিশালে আসিয়াছেন। তাঁহাকে ব্রহ্মকুণ্ড নামক স্টিমারে দেখা করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ইমার্সন সাহেব গমন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেইদিন ফুলার সাহেবের স্টিমার বরিশালের ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছিল, তবে ফুলার সাহেব সে স্টিমারে ছিলেন কি না তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

এই সকল জনরবে প্রতিনিধিগণ ভীত হন নাই। যথারীতি পূর্বাহ্ন ১১ টার সময় সভার অধিবেশন হইল। দলে দলে প্রতিনিধিগণ রাজপথ দিয়া উচ্চ কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে সমিতির মণ্ডপে উপনীত হইতে লাগিলেন। পূর্ব দিনের অপেক্ষা অদ্য মণ্ডপে অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। পূর্ব দিবসে দুই শত রমণী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, অদ্য উপস্থিত রমণীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চশত হইয়াছিল। সভাস্থল স্থির নিশ্চল বিশাল জন-সমুদ্রের আকার ধারণ করিল। প্রথমে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গীত হয়। সভায় উপস্থিত সমগ্র জনমণ্ডলী সসম্মানে দণ্ডায়মান হইয়া জন্মভূমির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে ভবানীপুরের স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় ও এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির যুবকগণ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া "মাগো যায় যেন জীবন চলে, শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দে মাতরম্ বলে" এই গানটি প্রাণ খুলিয়া গাইলেন।

স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব

তৎপরে অশ্বিনী বাবু একখানি পত্র অবলম্বন করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, গত কল্য যে স্থানে বালকদিগের রক্তপাত হইয়াছে ও সুরেন্দ্রবাবু বন্দি হইয়াছেন, সেই স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হউক। এই প্রস্তাব উপস্থিত হইবামাত্র চাঁদা সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। অবশ্য নগদ টাকা লইয়া অতি অল্প লোকেই সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সকলে সভাস্থলে অর্থদান করিতে পারেন নাই, তথাপি অনেকে হস্তের অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি খুলিয়া স্মৃতিস্তম্ভের সহায়তাকল্পে দান করিয়াছিলেন। বাবু তারাপ্রসন্ন বসুর পত্নী শ্রীমতী সরোজিনী বসু তাঁহার সোনার বালা খুলিয়া দান করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন বঙ্গদেশে "বন্দেমাতরম" রহিত করিবার অবৈধ আদেশ রহিত না হয় ততদিন তিনি আর হস্তে বালা পরিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সকলে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহারা এই স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার জন্য নগদ টাকা দান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে কলিকাতার জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দানের মাত্রাই সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল; তিনি সভাস্থলে নগদ একশত মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

ইহার পর দ্বিতীয় প্রস্তাবে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব ফরিদপুরের বাবু কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, চট্টগ্রামের বাবু যাত্রামোহন সেন, শ্রীহট্টের বাবু শশীন্দ্র সিংহ, কাছাড়ের

বাবু ইন্দুভূষণ মজুমদার, বর্ধমানের মৌলবী আবুল হোসেন, কৃষ্ণনগরের বাবু বেচারাম লাহিড়ী, হুগলীর বাবু মথুরানাথ গাঙ্গুলী, ২৪ পরগনার ডাক্তার গফুর প্রভৃতি উত্থাপন, অনুমোদন ও সমর্থন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি সহকারে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। এই প্রস্তাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাবু ব্রজসুন্দর রায়, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন, মৌলবী হেদাযৎ বক্স এই প্রস্তাবের অনুমোদন ও সমর্থন করেন। এই সময়ে সেই প্রসিদ্ধ বীর বালক রাজেন্দ্রলাল সাহাকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই বালক আসামীর কাঠগড়ায় থাকিয়া ও বিলাতী কলমে নাম স্বাক্ষর করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল; এবং কারাগারে বিলাতী কম্বল ব্যবহার করিতে চাহে নাই। তাহাকে দেখিয়া সকলে উচ্চরবে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিলেন। অতঃপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে গৌরীপুরের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতি বিশ্বেশ্বরী দেবী এক লক্ষ টাকা, বাবু সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তিন হাজার, বাবু অনাথবন্ধু গুহ দুই হাজার, ভুমহারের বাবু বরেন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় পাঁচশত টাকা নগদ দান করিতে স্বীকার করেন।

চতুর্থ প্রস্তাব

এই প্রস্তাবে স্বয়ং সভাপতি মহাশয় বিলাতী পণ্য বর্জনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আবুল হোসেন, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বাবু শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু মহিলাগণকে সম্বোধন করিয়া বিলাতী দ্রব্য বর্জনে দৃঢ়সংকল্প হইতে অনুরোধ করেন। মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি সহকারে রমণী সমাজ সে প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

পুলিশের প্রবেশ

কাব্যবিশারদ মহাশয় বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পুলিশ সাহেব মিঃ কেম্প সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ লইয়া মণ্ডপের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দ্বারস্থিত একজন ভলন্টিয়ার তাঁহাকে সভাস্থলে প্রবেশ করিতে দিল না। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে ভলন্টিয়ার (মুকুন্দলাল) তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "কাপ্তেনের অনুমতি ভিন্ন আমি কাহাকেও বিনা টিকিটে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিব না।" তখন মণ্ডপের বাহিরে বহুসংখ্যক বন্দুক ও লগুড়ধারী পুলিশ দণ্ডায়মান ছিল, দ্বারস্থিত ভলন্টিয়ার তথাপি ভীত হয় নাই। মিঃ কেম্প মণ্ডপে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সমিতি সম্পাদক বাবু রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা বাহির হইবামাত্র মিঃ কেম্প তাঁহাদিগের হস্তে নিম্নলিখিত পরোয়ানা প্রদান করিলেন।

কনফারেন্স সভার সভ্য সেক্রেটারী দর্শক ও শ্রোতাগণ প্রতি

যেহেতু আমার নিকট প্রকাশ করা হইযাছে যে, আপনারা অত্র বরিশাল সহরে ব্রজমোহন কলেজের উত্তর পার্শ্বে এক সভা করিযা বিনা কারণযুক্ত গোলমালজনক কার্য করিতেছেন। অতএব আমি এতদ্বারা আপনাদিগকে আদেশ করিতেছি যে, আপনারা অথবা সর্বসাধারণ কেহই ঐ সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না অথবা করিবেন না। প্রকাশ থাকে যে, অত্র সহরে রাজা বাহাদুরের হাউলীতে [বা অন্যত্র] ঐরূপ কোন কাজ করিবেন না।

T. Emerson, Magistrate.
15.4.09

As it appears from Police report that the breaking up of the meeting of the Conference which is being held at a Pandal in the town opposite the B. M. College is likely to be followed by unruly proceedings in the streets and noisy procession which have been forbidden by proper authority, I hereby order that the public or any persons are not to meet in the Pandal or elsewhere for the said purpose and the public are not to form crowds in the streets. As it also appears likely that the crowds may meet in Rajabahadur's Habeli and from unlawful assemly.

It is hereby ordered that this is also forbidden.

(Sd.) T. Emerson,
15.4.09

অশ্বিনী বাবু ও রজনী বাবু এই বিচিত্র ইংরাজী ও অশ্রুতপূর্ব বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পরোয়ানা লইয়া সভাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন উহা লইয়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইল। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, পুলিশ যখন আপত্তি করিতেছে, তখন আমাদের সভাভঙ্গ করাই উচিত। কৃষ্ণবাবু এই কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলেন,--আমরা কিছুতেই সভাগৃহ ত্যাগ করিব না। পুলিশ গুলি চালাক তথাপি আমরা নড়িবনা। এই বলিয়া তিনি বিপিন বাবুকে ভীরুতার জন্য তিরস্কার করেন। আলোচনায় স্থির হইল যে, এই অবৈধ আদেশ কেহ পালন করিবে না, যদি মিঃ কেম্প ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বলপূর্বক সভা ভঙ্গ করিতে পারেন। এই সময়ে মিঃ কেম্প সভাপতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। তখন চারিদিকে ভৈরব রবে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। উপস্থিত জনগণের চিত্তে বিষম উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। সেই ভীষণ উত্তেজনা দর্শনে কম্পিত কলেবর কেম্প সুরেন্দ্রবাবুর সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন "I hope now I am safe" অর্থাৎ ভরসা করি আপনার নিকট দাঁড়াইয়া আমি এখন নিরাপদ হইয়াছি। প্রতিনিধিগণ তখন মিঃ কেম্পকে বলিলেন, 'বল বন্দেমাতরম্',—চারিদিক হইতে বিশেষ উত্তেজনার সহিত ঐ কথা ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন মিঃ কেম্পও বন্দেমাতরম্ বলিলেন।

মিঃ কেম্পের মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উত্তেজিত জনসাধারণ শান্ত হইলে মিঃ কেম্প বলিলেন, সভা ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় কেহ রাস্তায় "বন্দেমাতরম্" বলিবে না। আপনারা যদি এ বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদিকে সভার কার্য নির্বাহ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইবে। বলা বাহুল্য, প্রতিনিধিগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন কেম্প বলিলেন, দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, শুধু নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধিদিগকে সভার বাহিরে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে নিষেধ করুন। তাহাতেও কেহ সম্মত হইলেন না। তখন কেম্প বলিলেন, অগত্যা আমাদিগের বল প্রকাশ করিতে হইবে।

অতঃপর নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরামর্শ আরম্ভ হইল। তাঁহারা বুঝিলেন যে, পুলিশ সাহেবের আদেশে সভাগৃহ ত্যাগ না করিলে বালকদিগকে অকারণে লগুড়াঘাত সহ্য করিতে হইবে। সুতরাং পুলিশকে অত্যাচার করিবার অবসর না দিয়া নীরবে সভাগৃহ ত্যাগ করাই কর্তব্য বলিয়া সকলে স্থির করিলেন। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহেন নাই। পরিশেষে অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে সভা ত্যাগ করিতে সম্মত করা হয়।

সভা-ভঙ্গ

পুলিশ সাহেব যখন বলেন যে, হয় আপনারা সভা হইতে স্বেচ্ছায় বাহিরে যান, না হয় আমি পুলিশ দিয়া এখনই সকলকে বাহির করিয়া দিব, তখন সেই নির্মম বাণী শুনিয়া সেই মণ্ডপস্থিত জন-সমুদ্র

অবিরাম কলবোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। মাতৃপূজার মন্ত্র "বন্দেমাতরম্" তখন মুহুর্মুহুঃ মণ্ডপ-গৃহচূড়া ভেদ করিয়া দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিল। উত্তাল-সমুদ্র-তরঙ্গ পাষাণ গাত্রে প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হইলে যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তেমনি এই অগণিত মনুষ্যমণ্ডলী ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইল। কিন্তু নেতার আদেশ অনতিক্রমণীয়। সুতরাং সকলেই ধীরে ধীরে মণ্ডপ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিলেন। মাননীয় মিঃ জে. চৌধুরী বলিলেন, যাও সকলে বাড়ি যাও, কনফারেন্স এ জায়গায় ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু গৃহে গৃহে কনফারেন্স হউক—গ্রামে গ্রামে আন্দোলন হউক। বিদেশী জিনিস একেবারে নির্বাসিত হউক। স্বদেশী দ্রব্য নির্মিত হউক। যাও, বাড়ি যাও। আজি আমাদের শোকের দিন নহে, আনন্দের দিন। যে দিন এই লাঠি বিলাতে ইহাদিগের পৃষ্ঠে পড়িবে, সেই দিন আমাদিগের প্রতিশোধের দিন আসিয়াছে বুঝিব।

ক্রমে সভাগৃহ জন-শূন্য হইল। উৎসবান্তে নাট্যমঞ্চ যেমন বিষাদ-মণ্ডিত হয়, এখানেও সেইরূপ বা ততোধিক বিষাদের কালিমা দৃষ্ট হইল। ইংরাজ রাজ্যে নবশাসন-প্রণালীর সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি সর্বজন সমক্ষে প্রকটিত হইল!

পরামর্শ সভার বাদানুবাদ

প্রাদেশিক সমিতি ভঙ্গ হইবার পরেই স্থানীয় মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বাবু রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের বাটীতে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। পরামর্শকালে কথা-প্রসঙ্গে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সহিত বাবু বিপিনচন্দ্র পালের কিঞ্চিৎ বাগবিতণ্ডা হয়। পুলিশের ভয়ে সমিতির মণ্ডপ পরিত্যাগ উপলক্ষে মতভেদই এই বিষয়ের সূত্রপাত হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় পুলিশের ভয়ে সভা ভাঙ্গিয়া সরিয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল কাব্যবিশারদ মহাশয়ের অনুযোগের উত্তরে বলেন, আমি লাঠি মানি, গভর্নমেন্ট মানি না। তাই লাঠি দেখিয়াই সরিয়া গিয়াছিলাম। কাব্যবিশারদ বলিলেন, আমি গভর্নমেন্ট মানি, লাঠি মানি না। এই কথা সভাপতি মিঃ রসুল, শ্রীযুক্ত হালিম গজনবি, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত গীস্পতি রায় চৌধুরী, মৌলবী আবুল হোসেন, বাবু মতিলাল ঘোষ এবং ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানের বহু প্রধান ব্যক্তির সমক্ষে হইয়াছিল।

প্রকাশ্য সভা

সেই সময়ে বাহিরে একটি প্রকাশ্য সভা করিবার প্রস্তাব হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় সেই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বিপিন বাবু সেই সভায় যোগদান করিবেন। তিনি বলিলেন, আমার বিশেষ কার্য আছে। এই বলিয়া তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ঐ প্রকাশ্য সভায় পুলিশের আদেশের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা বাঞ্ছনীয় কি না, এ চিন্তা তিনি ভুলিলেন না। সভা আরম্ভ হইতে না হইতে বিপিন বাবু অন্য দিক দিয়া চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রবাবুর অনুমতি লইয়া এ সভা আরব্ধ হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় প্রথমেই বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা মুখে অতীব ওজস্বিনী ভাষায় বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যের গ্রহণ, রাজপুরুষদিগের অত্যাচারের অবৈধতা, সেই দিবসের অত্যাচার ও সভাভঙ্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

কাব্যবিশারদের বক্তৃতার পর দেশের গৌরব, বাগ্মিপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ সেই সভাতে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবুর উদ্দীপনাপূর্ণ এবং প্রবল স্বদেশপ্রীতিব্যঞ্জক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমবেত জন মণ্ডলী উৎসাহে প্রদীপ্ত, করুণায় বিগলিত, রোষে উত্তেজিত, এবং অননুভূতপূর্ব ভাবাবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। ময়মনসিংহ প্রবাসী জনৈক হিন্দুস্থানী সুবক্তা হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা করিয়া স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করেন। সভাপতি মিঃ রসুল মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য

এই সময়ে উপস্থিত জনসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করায় সভাপতি মহাশয়কে একটি চৌকির উপর উঠাইয়া সকলকে প্রদর্শিত করা হয়। তাঁহার সৌম্যমূর্তি দর্শন করিয়া সকলে উৎসাহ বিহ্বল চিত্তে সমস্বরে আল্লা হো আকবর ও "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করেন। মৌলবী আবুল হোসেন ও শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়চৌধুরী মহাশয়েরা বক্তৃতা করিলে সুরেন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি সহকারে সভা ভঙ্গ হয়।

রহমৎপুরে সভা

সেই দিনেই অর্থাৎ সোমবার রহমৎপুরে একটি সভা হইয়াছিল। রহমৎপুর বরিশালের ৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। সেখানকার চক্রবর্তী জমিদারগণের যত্নেই এই সভার অধিবেশন হয়। নদীর তীরবর্তী একটি সুরম্য স্থানে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিবিধ বর্ণের পতাকা ও অন্যান্য উপকরণে সভাস্থল ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সুন্দর করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ (রায় চৌধুরী) মৌলবী আবুল হোসেন, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রভৃতি মহাশয়েরা স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে অতীব আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। স্বদেশ সেবক সম্প্রদায় জাতীয় সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ নাকি সে সভা ভঙ্গ করিবার জন্যও বহুসংখ্যক লগুড়ধারী পুলিশ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

লাখুটিয়ার সভা

রহমৎপুর হইতে প্রত্যাবর্তন কালে লাখুটিয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়ের বাটীতে আর একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতেও বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান ও স্ত্রীলোক যোগ দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু, কাব্যবিশারদ ও আবুল হোসেনের বক্তৃতায় সকলেই বিলাতী বর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন।

পরদিন মঙ্গলবার কলিকাতার অধিকাংশ প্রতিনিধি বরিশাল ত্যাগ করেন। প্রহৃতদিগের পক্ষ হইতে অভিযোগ করিবার জন্য মাননীয় মিঃ জে. চৌধুরী ও অন্য কয়েকজন মঙ্গলবার দিবসেও বরিশালে অবস্থান করেন। তৎপরদিন তাঁহারা বরিশাল ত্যাগ করেন। সকলেরই প্রস্থান কালে পুলিশ কনস্টবলেরা লাঠি লইয়া স্টিমার ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল।*

শিবাজী উৎসব

বিগত ৯ আশ্বিন, রবিবার বরিশালবাসীগণ বিপুল শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত যে মহাতর্পণের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এ হতভাগ্য, পতিত দেশের পক্ষে তাহা বিশিষ্ট গৌরব ও শ্লাঘার কথা। ঐ দিন হইতে বঙ্গের যাবৎ হিন্দু সন্তানই স্বর্গগত পিতৃপুরুষের কামনায় তিলতর্পণ আরম্ভ করিয়াছেন। উহাই শাস্ত্রানুগত তর্পণারম্ভের দিন।

ঊষার অরুণ-রাগ-রঞ্জিত শুভ প্রভাতে গৈরিকবসন পরিহিত, সহস্র বালক যখন পতাকা হস্তে সুকোমল মধুর কলকণ্ঠে ঃ

স্নেহময়ী মাকে কত কষ্ট দিলি,
লজ্জা রাখিতে স্থান না রাখিলি,—

গাহিতে গাহিতে প্রবল প্রবল স্রোতবৎ সহরের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল, জনমণ্ডলীর তাৎকালিক ভাব ও তীব্র তেজোময় বদন মণ্ডল এবং গীতপদের গভীরার্থ শ্রোতৃবৃন্দের নয়নযুগলে যুগপৎ অশ্রুপ্রবাহ আনয়ন করিয়াছিল। তেমন হৃদয়ভেদী মনোমদ, পদ ও গান ইতিপূর্বে শ্রুত হইয়াছে

---

* *১৯০৫ সালে বাংলা-সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে এই পুস্তিকাটি রচিত হয়েছিল। ৩৮ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন জীবনকৃষ্ণ তপস্বী।*

কিনা সন্দেহ। উৎসবের নাম 'শিবাজী উৎসব'—তাই এই জনমণ্ডলীর সমস্বরে গীত

শিবাজী ছবি বুকে ধরি,
গৈরিক বিজয় নিশান ঘিরি,
আযরে স্বার্থপাশ ছিঁড়ি
ঘুচিয়ে প্রাণের দায়
আয় আয় আয়

এই পদের সঙ্গে সঙ্গে সহস্রকণ্ঠে এককালে ''জয় ছত্রপতি শিবাজী'' রব দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলিতেছিল; সেই গীত, সেই জযধ্বনি, সেই উল্লাস ও উন্মত্ততায় আপনা হইতেই শ্রোতৃবর্গের পক্ষদ্বয় সিক্ত হইয়া গিযাছিল। বেলা ৯টার সময় সহরবাসীর প্রাণে তীব্র অনল ঢালিয়া গিয়া সংকীর্তন থামিল, সকলে একে একে বাড়ি ফিরিল।

বেলা দুই ঘটিকার পর ব্রজমোহন কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রগণ কর্তৃক বিবিধ মল্লক্রীডা প্রদর্শিত হয়। তৎপর উৎসবের সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় শ্রোতৃবর্গের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কলেজ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাধ্য হইযা প্রাঙ্গণেই উহার স্থান নির্দেশ করিতে হইল। শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান থাকিয়াই উৎসব সম্পন্নে প্রস্তুত হইলেন। বরিশালের স্বনামধন্য বাগ্মী বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, সুমধুর তানলয় সংযোগে, শ্রদ্ধেয়া ভারতী সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবীর ''অতীত-গৌরব বাহিনী মর্মবাণী'' এই গান আরম্ভ হইল, বিপুল জনসংঘ সুপ্ত মীন হ্রদের ন্যায় নিস্পন্দ, নীরব হইয়া গেল। সঙ্গীত শেষে ছাত্রবর্গ কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিল। অতঃপর বাবু নিবারণচন্দ্র দাস এম. এ. বি. এল, বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম এ. বি. এল, বাবু শরৎচন্দ্র গুহ এম. এ. বি. এল, বাবু তরণীকান্ত সেন এবং সভাপতি মহোদয়েরা বক্তৃতা করেন। সকলেই বিবিধ যুক্তির সহিত শিবাজী উৎসবের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা এবং প্রচলিত ইতিহাসের ভ্রম প্রদর্শন পূর্বক শিবাজী চরিত্রের মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।...সভার বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত ''শিবাজীর দীক্ষা'' নামক পুস্তক ও শিবাজীর উৎকৃষ্ট একখানা হাফটোন ছবি উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। উৎসবে বিতরণের জন্য দেউস্কর মহাশয় ৫০০ খণ্ড পুস্তক এবং বাবু ক্ষীরোদ বিহারী সেন ১৫০০ খণ্ড ছবি দান করিয়া ছিলেন।.. (ঢাকা প্রকাশ ১৯০৪ অক্টোবর ২)

যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা

''বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় এই জেলার প্রায় সর্বত্রই নিম্নভূমি। বর্ষাকালে জেলার প্রায় সমগ্র অংশই জলমগ্ন হয়ে যায়; শুধু উঁচু বসতিগুলি দ্বীপের মত জলের উপরে ভেসে থাকে। অসংখ্য নদনদী জেলাকে এমনভাবে বিভক্ত করেছে যে অন্যান্য জেলার তুলনায় এ জেলা যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক পশ্চাদপদ। গত দুইশত বৎসরেও এখানে তেমন স্থায়ী কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বিপুল ব্যয় ও কারিগরি বাধার জন্য সেকালে এক্ষেত্রে কোন নতুন উদ্যম গ্রহণ করা হয়নি। বিভাগোত্তর কালে সরকার, জেলা পরিষদ এবং স্থানীয় উদ্যোগে কিছু নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে। বর্তমানে নতুন রাস্তাঘাট তৈরির কাছে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।''

''প্রধান দুটি নদী মেঘনা এবং বলেশ্বর (মধুমতী) পূর্বে নোয়াখালী এবং পশ্চিমে খুলনা জেলাকে এ জেলা থেকে পৃথক করেছে। আন্তঃজেলা জলপথের মাধ্যম হিসাবে পূর্বদিকে এদুটি নদীর দ্বারা বাকরগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। আড়িয়াল খাঁ নদী থেকে সরাসরি জেলার পশ্চিমদিকে যাবার কোন জলপথ নেই। আড়িয়াল খাঁ নদী থেকে বরিশাল, ঝালকাঠি ও মাটিভাঙা হয়ে খুলনা পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য ঘোরানো জলপথ আছে। এ পথে, বড় বড় নৌকা চলাচল করতে পারে। অতীতে ছোট ছোট নদী ও খাল পূর্ব-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়ে বড় বড় নদীগুলিকে সংযুক্ত করেছিল। (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪। পৃ ১১৫)

নদীবহুল জেলা হওয়ায় নৌকাই নির্ভরশীল ছিল দীর্ঘকাল। এখনও জলপথে নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার চলাচল অব্যাহত। সড়কপথ তৈরি হয়েছে অনেক পরে। নৌকা নির্ভরতা জেলার নৌশিল্প বিকাশের ছিল অনুকূল। বহুকাল আগে নৌকার গুণ টানার জন্য নদী তীর বরাবর একধরনের পথ তৈরি হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বসতি গড়ে উঠতে থাকায় জনসাধারণের চলাচলের জন্য কিছু কিছু পায়ের পথ স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন স্থানে তৈরি হতে থাকে।

উনিশ শতকের বাকরগঞ্জের পথঘাট সম্পর্কে কিছু তথ্য বিভারিজ লিখেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, সম্ভবত এই জেলার প্রথম রাস্তা তৈরি করেন সাবি খান। এই সব রাস্তা উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমের জেলাগুলিতে, বিশেষ করে গৌরনদী এবং কোতোয়ালিপাড়া (পরে ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়) অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। রাস্তাগুলি ছিল বেশ উঁচু এবং চওড়া। কোথাও ভেঙে গেছে। আবার কোথাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবুও স্থানীয় মানুষ এইসব রাস্তা প্রয়োজনে ব্যবহারও করে। এরকমই একটি রাস্তা ছিল পালারদি থানার কাছে। সেই পথটি ধরেই পরে নতুন রাস্তা তৈরি হয় বরিশাল ও গৌর নদীর মধ্যে। সাবি খান কেবল রাস্তা নয়, নদী পারাপারের সেতুও নির্মাণ করেছিলেন।

এই সাবি খান কে ছিলেন? জনশ্রুতি তিনি কোতোয়াল ছিলেন। কোটালিপাড়া নাম এসেছে তার থেকে। আবার কেউ কেউ বলেন, সাবি খান ছিলেন এক ধনীর পুত্র। শিশুকালে তাকে অপহরণ করে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই বড় হতে থাকেন। যুবা বয়সে একজন দক্ষ শিকারী হয়ে ওঠেন। সে সময়ে তার বাবার বাড়ি শত্রুরা আক্রমণ করে বাবাকে মেরে ফেলে এবং মাকে অপহরণ করে জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেই জঙ্গলে থাকত সাবি খান। সেখানে সে তার মাকে পেলেও, মায়ের পরিচয় জানত না। তাকে নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিছুকাল বসবাসের পর মা সাবি খানের পায়ের একটি দাগ দেখে বুঝতে পারে, এই হচ্ছে তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে। তখন ছেলেকে সব জানায়। সাবি খান একজন ধার্মিক পুরুষের কাছে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত অপরাধের কথা জানায়। সাবি খানকে বলা হয়, তুমি জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করলে তোমার যাবতীয় অপরাধ নাশ হবে। এবার সাবি খান রাস্তা ও মসজিদ তৈরি করতে থাকে। গৌরনদী ও কোতোয়াল থানার মধ্যবর্তী তার তৈরি রাস্তা এখনও আছে। আগে এর নাম ছিল সাবি খানের জাঙ্গাল। তাঁর তৈরি রাস্তার অনেক জায়গা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও যে অংশগুলি আছে তা বেশ চওড়া আর উঁচু! সাবি খানের নামের গ্রামটি ছাবি খানের পাড় নামে পরিচিত। বড় কোন দীঘির পাশের গ্রাম নামের সঙ্গে পাড় যুক্ত হয়। সাবিখান এই পুকুরটি খনন করে ছিলেন।

বিভারিজের বিবরণ থেকে জানা যায় একটি রাস্তা বাকরগঞ্জের কোটারহাট, সূতালুরি, গৌরনদী হয়ে জলাভূমি পেরিয়ে খুলনা ও মকসদপুরের দিকে গেছে। এটা সাবি খানের জাঙ্গালেরই অংশ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন বিভারিজ। রাস্তাটি শীতের সময় বা বর্ষার আগে চলাচলের উপযোগী থাকত। গৌরনদী, কোটালিপাড়া, এমন কী বাকরগঞ্জ অঞ্চল এপ্রিল মাসে ছিল চলাচলের উপযোগী। বিভারিজ কাটারহাটের পরিত্যক্ত পুরনো রাস্তা দেখেছিলেন, যার তখন সংস্কার হয়েছে। বাকরগঞ্জ তখন জেলা সদর। সেসময় এই রাস্তাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আগে কোটারহাটে একটি মুন্সেফকোর্ট ছিল। সূতালুরি নামটি থেকে বোঝা যায় এটি প্রাচীন বসতি। যেখানে সূতা বা তাঁতশিল্প কেন্দ্র ছিল। এটির অবস্থান বরিশাল থেকে ঝালকাঠি যাওয়ার পথের ধারে এবং গুরুধামের কাছে। একটি মঠের চূড়া ভগ্ন অবস্থায় দেখা যেত। সম্ভবত এটি ছিল জেলার সব থেকে উঁচু বাড়ি। ইংরেজ আমলে তৈরি সব থেকে পুরনো রাস্তাটি বাকরগঞ্জ থেকে শিবপুর হয়ে গোলাবাড়ি ও কোটারহাটের মধ্যে অবস্থিত। শিবপুর রোড ৫ মাইলদীর্ঘ, সংস্কারও হয়েছে। রাস্তার ওপর কয়েকটি ব্রীজ আছে। ১৮০১ সালে জেলা সদর বরিশালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অঞ্চলের সব থেকে পুরনো রাস্তাটি হল বরিশাল থেকে খাজাঞ্চির হাট (তখনই নষ্ট হয়ে গেছে) চার মাইল দীর্ঘ। বর্তমানে রাস্তাটির নাম ধপধপিয়া হাট। এটি হল বাকরগঞ্জ যাওয়ার রাস্তারই অংশ। বরিশাল থেকে মাধবপাশা পর্যন্ত ৭ মাইল দীর্ঘ রাস্তাটি নির্মাণ করেন পার্বতী চৌধুরানী।

বিভারিজের বিবরণ থেকে জানা যায় অতীতে বাকরগঞ্জে গরুরগাড়ি চলাচল উপযোগী রাস্তা কম ছিল। অজস্র নদী আর খালে ভরা গোটা জেলা জুড়ে ছিল অসংখ্য ফেরিঘাট। লাখুটিয়ার জমিদার রামচন্দ্র রায় একটি ভাল রাস্তা নির্মাণ করেন লাখুটিয়া হয়ে গৌরনদী যাওয়ার। এই রাস্তার পাশ দিয়ে তিনি খালও কেটে ছিলেন নৌকা যাতায়াতের জন্য। সে সময়ের অন্যান্য প্রধান রাস্তাগুলি ছিল বরিশাল থেকে ঝালকাটি, বরিশাল থেকে নলছিটি, বরিশাল থেকে বাকরগঞ্জ এবং বরিশাল থেকে তালতলি। দক্ষিণ শাহবাজপুর মহকুমায় উৎকৃষ্ট কয়েকটি রাস্তা ছিল। ভোলা থেকে দৌলত খাঁর মধ্যে রাস্তা ও খাল, গাজিপুর এবং ধনিয়ামনিয়া থানায় পায়ে হাঁটাপথ, পিরোজপুর মহকুমায় একটি গুনটানার পথ এবং কুমারখালি থেকে রায়ের কাঠি যাওয়ার রাস্তা আছে। পটুয়াখালিতে কোন রাস্তা ছিল না। কেবলমাত্র পটুয়াখালি দোনের পাশে কয়েক মাইল পায়ে হাঁটার পথ তখন ছিল। এক সময় বলা হত বাকরগঞ্জের প্রতিটি মানুষের নৌকা থাকায়, সেখানে কোন রাস্তার প্রয়োজন পড়ত না। এটা ঠিক নয়। সব চাষির নৌকা নেই। কিন্তু যাদের আছে তারা মনে করে স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে নৌকা চালানোর থেকে, পায়ে হেঁটে গেলে অনেক তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো যায়। মহিলা ও বাচ্চারা কোথাও গেলে নিজেদের নৌকা না থাকলেও ভাড়া করে না। শুকনোর সময় মানুষের হাটাহাটি অনেক বেড়ে যায়। দক্ষিণ শাহবাজপুরে কোন নদী না থাকায় কোন নৌকা নেই। সেখানকার মানুষ হেঁটে চলাচল করে। জেলায় হাঁটাপথ দরকার যেমন, তেমনি খালের ওপর ব্রিজও প্রয়োজন। কাঠের বা বাঁশের যে কোন রকম ব্রিজ হলেই চলতে পারে। জেলায় বাঁশের ব্রিজই বেশি। প্রতিটি গ্রামেই এরকম দু-তিনটি ব্রিজ আছে। আবার কোথাও কোথাও প্রতিটি বাড়ির একটি। গুনটানা পথ আরও দরকার। বিশেষ করে বরিশাল থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে।

বিভারিজের এই বিবরণ থেকে উনিশ শতকের মধ্য পরবর্তীকালের বা শেষ সময়ের রাস্তাঘাট ও পরিবহনের ছবি পাওয়া যায়। যা বিশ শতকের প্রথম পর্বে বদলাতে থাকে। এর কারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার আমূল পরিবর্তন। সড়ক পথে যোগাযোগের সেই যুগ আর নেই। বরিশাল থেকে সরাসরি যাওয়া যায় পটুয়াখালি, পিরোজপুর, শিলারগঞ্জ, ভূরঘাটা ও ঝালকাঠি। বেশির ভাগ সড়কই নদীরেখা বরাবর প্রসারিত। বরিশাল থেকে বানারিপাড়া পর্যন্ত ১৬ মাইল দীর্ঘ রাস্তা গেছে সেটি পাকা। গৌরনদী বিলের মাঝখান দিয়ে বাটাজোড় থেকে আমবুলা পর্যন্ত যে রাস্তা গেছে সেটি অর্থনীতির দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুদীর্ঘকাল বাকরগঞ্জে রেলওয়ে যোগাযোগ ছিল না। অবিভক্ত ভারতে রেলযুগের সূচনা উনিশ শতকে। আর বাকরগঞ্জে রেল যুগ শুরু বিশ শতকের অন্তিমপর্বে।

দেশের অভ্যন্তরে চলাচলকারী লঞ্চ সার্ভিস *

লঞ্চ সার্ভিসের নাম	পথের গুরুত্বপূর্ণ ঘাট নদীপথ	নদীর নাম দূরত্ব (মাইল হিসাবে)
১. বরিশাল-বাকরগঞ্জ	দপদপিয়া হয়ে	আড়িয়াল খাঁ ২২.৬
২. বরিশাল-ভোলা খেয়াঘাট	রাজপুর হয়ে	আড়িয়াল খাঁ ৩৩.৩
৩. বরিশাল-ভোলা খেয়াঘাট	বুকাইনগর হয়ে	আড়িয়াল খাঁ ৩০.০
৪. বরিশাল-ভোলা খেয়াঘাট	বুকাইনগর, রাজারচর, টুঙ্গিবাড়ি হয়ে	২৪.৫
৫. বরিশাল-গলাচিপা	দপদপিয়া, বাকরগঞ্জ হয়ে	৬৯.৩
৬. বরিশাল-গলাচিপা	রাজাপুর, কারখানা, বগা হয়ে	৭১.৭

* বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪

লঞ্চ সার্ভিসের নাম	পথের গুরুত্বপূর্ণ ঘাট নদীপথ	নদীর নাম দূরত্ব (মাইল হিসাবে)
৭. বরিশাল-গোপালগঞ্জ	মধুমতী নদী পথে	৭৪.৩
৮. বরিশাল-হুলারহাট	...	৩০.৭
৯. বরিশাল-কাউখালি	...	২৭.৪
১০. বরিশাল-খেপুপাড়া	দপদপিয়া, বাকরগঞ্জ বগা, পটুয়াখালি, গলাচিপা হয়ে	৯৪.০
১১. বরিশাল-খেপুপাড়া	রাজাপুর, ধুলিয়া, নাজিরপুর চবভোলাই সিংহ, আগুনমুখী হয়ে	৯৫.৭
১২. বরিশাল-খুলনা	মঙ্গলা, ঘসিয়াখালি নদী পথে	১১৪.২
১৩. বরিশাল-খুলনা	মধুমতী নদী পথে	১১৪.২
১৪. বরিশাল-খুলনা	কচা নদী পথে	১৫৫,৩
১৫. বরিশাল-মাদারীপুর	নন্দীবাজার হয়ে	৫২.৯
১৬. বরিশাল-মঙ্গলা বন্দর	মঙ্গলা-ঘসিয়াখালি নদী পথে	৮৪.৭
১৭. বরিশাল-মঙ্গলা বন্দর	কচা নদী পথে	১২৭.০
১৮. বরিশাল-মঙ্গলা বন্দর	মধুমতী নদী পথে	১৪৩.৭
১৯. বরিশাল-নন্দীবাজার	...	২১.৪
২০. বরিশাল-পাথরঘাটা	ঝালকাঠি হয়ে	৭১.০
২১. বরিশাল-পটুয়াখালি	দপদপিয়া, বাকরগঞ্জ, বগা হয়ে	৪৮.৫
২২. বরিশাল-পটুয়াখালি	রাজাপুর, কারখানা নদী এবং বগা হয়ে	৫০.৯
২৩. বরিশাল পটুয়াখালি	দপদপিয়া, মন্দধ॰খালি, পটুয়াখালি হয়ে	৪৮ ৬
২৪. বরিশাল-পটুয়াখালি	দপদপিয়া, হলতাহাট, গোমা, ঝিলনা, বগা হয়ে	৪৬ ৩
২৫. বরিশাল-শান্তিরহাট	রাজাপুর হয়ে	৪৩ ৯
২৬. বরিশাল-শান্তিরহাট	বুকাইনগর হয়ে	৪০ ৯
২৭. বরিশাল-শান্তিরহাট	বুকাইনগর, রাজারচর, টুঙ্গিবাড়ি হয়ে	৩৫.১

ইংরেজ আমলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলিতে স্টিমার চলাচল শুরু হয়। বাকরগঞ্জের নদীতে ১৮৮০ সালের আগেই স্টিমার যাতায়াত করলেও খুলনা ও বরিশালের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত আরম্ভ হয় ১৮৮৪ সাল থেকে। ফলে দক্ষিণাঞ্চলে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বাকরগঞ্জের গুরুত্ব বেড়ে যেতে থাকে। সরাসরি কলকাতার সঙ্গে নৌপথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও যাতায়াত সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। স্টিমার স্টেশনে পরিণত হয় বরিশাল। সরাসরি স্টিমার চলতে শুরু করে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং মাদারীপুরের মধ্যে। পরিবহনে যুগান্তর আসে। মাল পরিবহন ও যাত্রী চলাচল সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

প্রথম পর্বে স্টিমার চলাচলের পথ ছিল নানাদিকে ছড়িয়ে। কেবল বাইরে নয়, জেলার অভ্যন্তরেও স্টিমার চলাচল করত। জেলার উত্তরাংশ এবং বরিশালের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করত তিরকি নদীপথের স্টিমার সার্ভিস। আর একটি স্টিমার সার্ভিস সাকিপুর ও নয়াভাঙানি নদীপথে ঢাকায় যেত। এই পথটি ছিল পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী। শাহবাজপুরের বিভিন্নস্থান হয়ে নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের মধ্যে একটি স্টিমার সার্ভিস ছিল। কলকাতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় ছিল দুটি স্টিমার সার্ভিস। জেলার পশ্চিম অংশে সংযোগ রক্ষাকারী স্টিমার সার্ভিস দুটির একটি যাতায়াত করত কালীগঞ্জ নদী হয়ে হুলারহাট থেকে উত্তরে এবং অপরটি কচা নদী পথে তুষখালি হয়ে দক্ষিণে। জেলার গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টিমার সার্ভিস ছিল খয়রাবাদ নদী পথে। এই স্টিমারগুলি যেত পটুয়াখালি ও গলাচিপা পর্যন্ত। আর একটি সার্ভিস ছিল বিশখালি নদী পথে ফুলঝুড়ির পর্যন্ত।

কয়েক বছরের মধ্যে বেশ কয়েকটি স্টিমার সার্ভিস জেলার বিভিন্ন স্থান হয়ে চলাচল করতে থাকে। সব নদীতে স্টিমার চলাচল করতে পারত না। ছোট ছোট নদীপথে নৌকায় যাত্রী ও মাল নিয়ে আসা হত স্টিমার স্টেশনে। এইভাবে শুরু হয় পরিবহন ব্যবস্থায় নতুন যুগের।

১৮৮৪ সালে ফ্লোটিলা কোম্পানি বরিশাল এবং খুলনা রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে স্টিমার চালানো শুরু করে। ইন্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন এবং রিভার স্টিম নেভিগেশন যৌথ কোম্পানির অধীনে চলে আসে ফ্লোটিলা কোম্পানি। বরিশালকে কেন্দ্র করে এরা চারদিকে স্টিমার চালাত। এদের বরিশালে একটা ওয়ার্কশপও ছিল।

বর্তমানে বরিশাল জেলায় যানবাহন অনেক সুনিয়ন্ত্রিত এবং যাতায়াতও অনেক সহজ। বিভিন্ন স্থানের মধ্যে দ্রুত যাতায়াতের জন্য রকেট সার্ভিস সব থেকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। জেলার স্টিমার সার্ভিস পরিচালনা করে বাংলাদেশ রিভার স্টিমার লিমিটেড এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। প্রথম সংস্থাটি আভ্যন্তরীন স্টিমার চলাচল তদারক করে এবং দ্বিতীয় সংস্থাটি সমুদ্রতীর থেকে দূরবর্তী দ্বীপসমূহে সংযোগ রক্ষা করে। তাছাড়া শিপিং কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে আছে বেশ কয়েকটি ফেরি সার্ভিস। সড়ক পথে আভ্যন্তরীণ বাস চলাচল করে। তেমনি আবার বরিশাল সদর থেকে খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর এবং ফরিদপুরের মধ্যে বিলাসবহুল কোচ সার্ভিস রয়েছে।

ফরিদপুরের সঙ্গে বরিশালের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রতিকালের। সড়কপথের অনেক উন্নতি হয়েছে। একটি সুপার হাইওয়ে নির্মিত হয়েছে বরিশাল শহর ও ফরিদপুরের মধ্যে।

পোস্টঅফিস এবং টেলিফোন সার্ভিস ছড়িয়ে আছে গোটা জেলা জুড়ে। তাছাড়া ডাকবাংলো এবং বিশ্রামাগার রয়েছে জেলার বিভিন্ন স্থানে।

বাংলাদেশ রিভার স্টিমার লিমিটেড এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত স্টিমার সার্ভিসগুলি হল ঃ

১. বরিশাল-নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা সার্ভিস।
২. বরিশাল-খুলনা মেইল সার্ভিস।
৩. বরিশাল-পটুয়াখালি-খেপুপাড়া স্টিমার সার্ভিস।
৪. বরিশাল-চিটাগাং সার্ভিস।
৫. চট্টগ্রাম কক্সবাজার সার্ভিস।

বরিশাল থেকে খুব সহজেই স্টিমারে ঢাকা, খুলনা, পটুয়াখালি-খেপুপাড়া অভিমুখে তিনটি পথে যাতায়াত করা যায়। বরিশাল বা কীর্তনখোলা নদী পেরিয়ে আড়িয়াল খাঁ নদী পথে শায়েস্তাবাদ, নন্দীবাজার পর্যন্ত যায়। এই স্টিমার পথ জয়ন্তী নদী হয়ে ফরিদপুরের ছবিপুর হয়ে মেঘনা তীরে নলমুড়ি পর্যন্ত যায়। তাছাড়া এই পথে চাঁদপুর, যাটনল, মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকা যাওয়া যায়। স্টিমার মেঘনা ধলেশ্বরী ও শীতলাক্ষা নদী পেরিয়ে যায়। খুলনায় স্টিমার যায় বরিশাল নদী, ভরাইল খাল, স্বরূপকাঠি, কচা, কালীগঙ্গা নদী পথে। ১৯৮০ সালে ঘাসিয়াখালি খাল খননের ফলে খুলনায় যাতায়াত অনেক সহজসাধ্য হয়েছে।

শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য

অতীতের মত আজও বাকরগঞ্জ কৃষিপ্রধান অঞ্চল। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটলেও, বৃহৎ আকারের শিল্প গড়ে ওঠেনি। সমুদ্র সন্নিকটবর্তী এলাকা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের অব্যাহত আঘাতে জনজীবন বার বার বিপর্যস্ত। নদী প্লাবণে জেলার বৃহৎ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেমন, তেমনি কৃষি সম্পদ সমৃদ্ধ জেলা হিসাবে বাকরগঞ্জকে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানে স্থাপিত করেছে। মগ ও ফিরিঙ্গি অত্যাচারের বর্বর নিদর্শন জেলার বুকে দুষ্ট ক্ষতের মত বহুকাল স্থনীয় মানুষের স্মৃতিতে জাগরুক থেকেছে।

বাকরগঞ্জে প্রথম থেকেই নৌশিল্প, লবণ, মাদুর, মাটিরপাত্র, মোটা তাঁতের কাপড়, চটের থলে এরকম কিছু শিল্পের বিকাশ ঘটে। আগা বাকরের শাসনকালে (১৭৪১-৫১) বেশ কিছু তাঁতি এসে বর্তমান বাকরগঞ্জ উপজেলার সদরে বসবাস শুরু করেছিল। তাদের উদ্যোগেই জেলার তাঁত শিল্পের বিকাশ। অতীতে জেলার শীতলপাটিব খ্যাতি ছিল সব থেকে বেশি। এটি ছিল সম্পূর্ণ পারিবারিক শিল্প। তাছাড়া নল বা হোগলা পাতার তৈরি মোটা মাদুরও তৈরি হত। এই ধরনের মাদুরের সঙ্গে শীতলপাটিও রপ্তানি হত অন্যান্য জেলায়। নলছিটি বিখ্যাত ছিল নানারকম মাটির তৈরি জিনিসের জন্য। উজিবপুর এবং বানারীপাডায় বানানো হত লোহার নানা রকম দ্রব্য ঃ ছুরি, কাঁচি, চামচ ইত্যাদি। তাঁতের কাপড় তৈরি হত উজিরপুর, বানারীপাড়ায়—যা গুণগত মানে ঢাকার প্রায় সমানই ছিল। গৌরনদীর কয়েকটি গ্রামে তৈরি হত চটের থলে। বরিশালে একটি অয়েলক্লথ কারখানা ছিল। মাধবপাশার মশারি ছিল বিখ্যাত। মেহেন্দিগঞ্জের খলনৌকা এবং আগারপারের পানশি নৌকা ছিল বিখ্যাত। ঝালকাঠির ডিঙি নৌকা, বর্তমান স্বরূপকাঠি উপজেলার শোহাগদলের মালবাহী নৌকা, পিরোজপুরের বরঘাকাঠির মালবাহী নৌকা ছিল উন্নতমানেরই কেবল নয়, নির্ভরযোগ্যও।

দেশভাগের পরবর্তী সময়ে মানুষের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটেছে নানাদিক থেকে। তেলের কল, ময়দার কল, লবণচূর্ণ করার কল, আসবাবপত্র, কাঠচেরাই, মাটির পাত্র, ছাপাখানা, স্বর্ণালঙ্কার, নিত্যব্যবহার্য লোহাব জিনিস, সাবান, ওষুধ, ছোবড়া শিল্প, বাঁশের নানারকম জিনিস, প্রসাধন সামগ্রী, লেখার কালি, শ্লেট-পেনসিল, বিড়ি, বিস্কুট, আলকাতরা, কবাত কল, সিগারেট, আইসক্রিম, চামড়ার দ্রব্য, ছাতা, জর্দা, জেলি, শাঁখা—এরকম বিভিন্ন দ্রব্যাদি জেলার বিভিন্নস্থানে তৈরি হচ্ছে। জেলায় বেশ কয়েকটি চালের কল রয়েছে।

জেলায় ১৯৭৮ সালে প্রথম বস্ত্রকল বরিশাল টেক্সটাইল মিল স্থাপিত হয়। এখানে বিভিন্ন ধরনের সূতা তৈরি হয়। বরিশাল কাউনিয়া রোডে স্থাপিত হয়েছে বাকরগঞ্জ শিল্পনগরী। এই নগরী গড়ে ওঠেছে ১৩২ একর জমির ওপর। যেখানে আছে ৪৪৩টি প্লট। এই শিল্পাঞ্চলটি গড়ে ওঠে পাকিস্থান আমলে। ২৫ একব জমির আর একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে স্বরূপকাঠিতে বাংলাদেশ গঠনের পর।

স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁতশিল্পকে বিকাশিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে। বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে যে সব অঞ্চল বিখ্যাত, তার মধ্যে আছে

১. গৌর নদী	৮. মুলাদি	১৫. মেহেন্দিগঞ্জ
২. হিজলা	৯. রাজাপুর	১৬. বানরিপাড়া
৩. স্বরূপকাঠি	১০. বাকরগঞ্জ	১৭. ভাণ্ডারিয়া
৪. কাউখালি	১১. পিরোজপুর	১৮. মঠবাড়িয়া
৫. ভোলা	১২. দৌলত খাঁ	১৯. বোরহানউদ্দিন
৬. তজুমুদ্দিন	১৩ লালমোহন	২০. চরফ্যাসন
৭. মনপুরা	১৪ নাজিরপুর	২১. বাবুগঞ্জ

২২. রিশাল (কোতোয়ালি)

চাল, পান, সুপারি, আখ, কাঠ, মাছ প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দেশভাগের আগে ব্যবসা ছিল প্রধানত কলকাতা-বরিশাল এবং চট্টগ্রাম-বরিশালের মধ্যে। বহিরাগত ব্যবসায়ীবা এই ব্যবসা পরিচালনা করত। ১৯৪৭ সালের পর স্থানীয় মুসলমান ধনীরা ব্যবসায়ে এগিয়ে আসে।

বর্তমানে জেলা থেকে রপ্তানি হয় ধান, চাল, শুকনো লঙ্কা, পান, সুপারি, মাছ, নারকেল, কলা, পেয়ারা, আমড়া, শন, সূতা, নারকেল তেল, তেঁতুল, পাপোশ, ছোবড়ার মাদুর, খেলার ম্যাট ইত্যাদি।

তাছাড়া জেলায় আমদানি হয় ডিজেল তেল, আলু, মশলাপাতি, জুতো, সাইকেল, রিকসা, নানাধরনের কাঁচামাল, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ।

জেলার ব্যবসা বাণিজ্য এখনও হাট ও বাজার নির্ভর। খুচরো বিক্রেতাদের কাছ থেকে ব্যাপারীরা মালপত্র আড়তজাত করে। তারপর সেই আড়ত থেকে ব্যবসায়িরা মালপত্র কিনে রপ্তানি করে অথবা জেলার বিভিন্নস্থানের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে। অতীতের মত আজও ব্যবসায়ের এই একই রীতি প্রবাহমান। এই সব হাট-বাজারের মালিক ছিল স্থানীয় জীমদাররা। হাট থেকে তাদের বাৎসরিক আদায়ের পরিমাণ কম ছিল। ১৯৫০ সালের নতুন আইনে এই সব হাট বাজারের মালিকানা সরকারের ওপর বর্তায়। কিন্তু তৎকালীন সরকার হাটবাজার বাৎসরিক চুক্তি অনুসারে ইজারা দেন। কিন্তু গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুরনো সব ব্যবস্থা বাতিল করে, পাঁচ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে বাজার কমিটি গঠন করেন। তাদের ওপরই বাজারের সার্বিক দায়িত্ব অর্পিত হয়।

বরিশালের কয়েকটি প্রধান হাট-বাজার

নলছিটি উপ-জেলায়	ঃ	নলছিটি বন্দর—(আড়তদারী)
বাকরগঞ্জ উপ-জেলা	ঃ	বাকরগঞ্জ (প্রাথমিক)
রাজাপুর উপ-জেলা	ঃ	রাজাপুর (প্রাথমিক)
মুলাদি উপ-জেলা	ঃ	মুলাদি বাজার (আড়তদারী)
হিজলা উপ-জেলা	ঃ	হিজলা (প্রাথমিক)
গৌরনদী উপ-জেলা	ঃ	গৌরনদী (আড়তদারী)
বাবুগঞ্জ উপ-জেলা	ঃ	রহমতপুর (আড়তদারী)
”	ঃ	মাধবপাশা (আড়তদারী)
”	ঃ	মোহনগঞ্জ (আড়তদারী)
উজিরপুর উপ-জেলা	ঃ	উজিরপুর (আড়তদারী)
পিরোজপুর উপ-জেলা	ঃ	পিরোজপুর (আড়তদারী)
কাউকালি উপ-জেলা	ঃ	কাউখালি (আড়তদারী)
নাজিরপুর উপ-জেলা	ঃ	নাজিরপুর (প্রাথমিক)
সাগরকান্দা উপ-জলা	ঃ	সাগরকান্দা (প্রাথমিক)
বানারিপাড়া উপ-জেলা	ঃ	বানরিপাড়া (আড়তদারী)
ভাণ্ডারিয়া উপ-জেলা	ঃ	ভাণ্ডারিয়া (আড়তদারী)
মঠবাড়িয়া উপ-জেলা	ঃ	মঠবাড়িয়া (প্রাথমিক)
কাথালিয়া উপ-জেলা	ঃ	কাথালিয়াঘাট (প্রাথমিক)
ভোলা উপ-জেলা	ঃ	ভোলা মার্কেট (আড়তদারী)
তাজুমুদ্দিন উপ-জেলা	ঃ	তাজুমুদ্দিন (আড়তদারী)

দৌলত খাঁ উপ-জেলা		দৌলত খাঁ (আড়তদারী)
কোতোয়ালি উপ-জেলা		নতুন বাজার (খুচরা বাজার)
	ঃ	বাংলাদেশ হাট (আড়তদারী)
”	ঃ	বাহানগঞ্জ (প্রাথমিক)
”	ঃ	হোগলা (প্রাথমিক)
”	ঃ	কালিগঞ্জ (প্রাথমিক)
”	ঃ	তালুকদারহাট (প্রাথমিক)
”	ঃ	আজমিরগঞ্জ (প্রাথমিক)
”	ঃ	শায়েস্তাবাদ (প্রাথমিক)
”	ঃ	শেলনা (প্রাথমিক)
”	ঃ	চন্দ্রমোহন হাট (প্রাথমিক)
”	ঃ	বুকেইনগর (প্রাথমিক)
”	ঃ	মাওলাভীর হাট (প্রাথমিক)

আধুনিক ব্যবসার অন্যতম অঙ্গ ব্যাংক ব্যবস্থা। বাকরগঞ্জ জেলার প্রায় সর্বত্র রয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা। যে কারণে, অতীতের যাবতীয় সংকট দূরীভূত হয়েছে। দেশভাগের আগে এই জেলায় যেসব ব্যাঙ্ক ছিল ঃ

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাংক	ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড
ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড	মহালক্ষ্মী ব্যাংক লিমিটেড
নোয়াখালি ব্যাংক লিমিটেড	বরিশাল ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড
বরিশাল ব্যাংক কর্পোরেশন	পিরোজপুর লোন কোম্পানি লিমিটেড

দেশভাগের পর ১৯৫৩ সালের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাংক, বরিশাল ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড এবং বরিশাল ব্যাংকিং করপোরেশন। অন্যান্য ব্যাংকগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী আমলে যে সব ব্যাংক গড়ে ওঠে সেগুলিকে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। এই সব ব্যাংকের শাখা এখন বাকরগঞ্জের সব শহরে এবং বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালের পরিসংখ্যান থেকে সক্রিয় ব্যাংকগুলির সম্পর্কে জানা যায় ঃ

	শাখা
১. অগ্রণী ব্যাংক (আগেকার হাবিব ব্যাংক লিমিটেড এবং কমারশিয়াল ব্যাংক লিমিটেড নিয়ে গঠিত)	বরিশাল, ভোলা, ভাণ্ডারিয়া, বানারিপাড়া, ঝালকাঠি, লালমোহন গৌরনদী
২. রূপালী ব্যাংক (আগেকার মুসলিম কমারশিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক লিমিটেড এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড নিয়ে গঠিত)	বরিশাল-সদর রোড, বরিশাল-হেমায়েত উদ্দিন রোড, ভবানীপুর (উজিরপুর উপ-জেলা), পিরোজপুর, কাউখালি, কাউরিখারা (স্বরূপকাঠি উপ-জেলা), ঝালকাঠি, ভোলার, রহমতপুর (বাকরগঞ্জ উপ-জেলা)

৩. জনতা ব্যাংক (আগেকার ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড এবং ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড নিয়ে গঠিত)	বরিশাল-সদর রোড, চকবাজার, বোবহানউদ্দিন, চরফ্যাসন, ঝালকাঠি, মিরজাকালু, পাটকেলঘাটা, পাথরঘাটা, পিরোজপুর, ভোলা, তরকীবন্দর।
৪. সোনালী ব্যাংক (আগেকার ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান, ব্যাংক অফ ভাওয়ালপুর এবং প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড নিয়ে গঠিত)	বরিশাল, চকবাজার, ভোলা, চাখার, গৌরনদী, ঝালকাঠি, মুলাদী, নলছিটি, পিরোজপুর, স্বরূপকাঠি, বাকরগঞ্জ, হাটখোলা, উজিরপুর, তুষখালি।
৫. পূবালী ব্যাংক (আগেকাব ইস্টার্ন মার্কেনটাইল ব্যাংক লিমিটেড)	বরিশাল, বাবুগঞ্জ, হিজলা, কাঠালিয়া, মেহেন্দিগঞ্জ, নাজিরপুর, পিরোজপুর, রাজাপুর, মাধবপাশা।
৬. উত্তরা ব্যাংক (আগেকার ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড)	বরিশাল-সদর রোড, দৌলত খাঁ, তজুমুদ্দিন, লালমোহন, ভোলা, মঠবাড়িয়া।
৭. কৃষি ব্যাংক (এই ব্যাংকটি আগেও ছিল)।	বরিশাল, গৌরনদী, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, লালমোহন, কাউরিখারা, মঠবাড়িয়া, তজুমুদ্দিন।

জেলার বিভিন্নস্থানে ব্যাংক যেমন আছে সক্রিয়, তেমনি জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনার সাফল্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রমশ সঞ্চয় পরিমাণ উর্ধ্বমুখী হওয়ায় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ত্বরান্বিত হচ্ছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

জেলার জীবনযাত্রা কৃষিনির্ভব হলেও, উনিশ শতকের প্রথম থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। অবশ্য তার গতি খুব দ্রুত ছিল না। এর অন্যতম কারণ ঢাকা বা কলকাতা থেকে বহু দূরবর্তী এই জেলায় যাতায়াতও আজকের মত সহজসাধ্য ছিল না। জনসাধারণ বেশির ভাগ নিজস্ব জমিজমা, বাগিচা, উৎপাদিত ফসল এসব নিয়েই ছিল সন্তুষ্ট। শিক্ষায় আকর্ষণহীনতার অন্যতম কারণ ছিল বৈচিত্র্যহীনতা। নিজের পেশার উপযোগী কাজকর্ম শিক্ষাই তাদের কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি আমূল বদলে যেতে থাকে। জেলার কৃতী সন্তানদের অনেকেই পরবর্তীকালে অখণ্ড ভারত, খণ্ডিত ভারত, পূর্বপাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা সূচনার আগে ছিল সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার টোল এবং কোরান শিক্ষার জন্য মক্তব। জেলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে মুখ্য ভূমিকা ছিল সরকার এবং শ্রীরামপুর মিশনের। ১৮২৮ সালের ৩১ মার্চ তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. গ্যারেট একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরের বছরেই ১৮২৯ সালে শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃপক্ষ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এভাবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৮৬০ সালের মধ্যে জেলায় শুরু হয়ে যায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন। ১৮৭৪ সালের মধ্যেই শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে যায়। এর মধ্যে ২টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় এবং ১৮টি মিডল ইংলিশ স্কুল স্থাপিত হয়। এইসব বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,৩০৪ জন।

১৮৯২ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮ এবং ছাত্র সংখ্যা ২,৬৯৮ জন। ১৯১০ সালে ৫৩টি বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪,৪৩৮ জন। এই শহরে বিভিন্ন মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যা ছিল :

	বিদ্যালয়	ছাত্র
সদর মহকুমা	৩৪	৩,৪৮৭
পিরোজপুর মহকুমা	৩১	৩,৩০৫
পটুয়াখালি মহকুমা (পরে স্বতন্ত্র জেলা)	৫	৪৫৫
শাহবাজপুর মহকুমা	৯	৯১১

এগুলিতে ছিল ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাক্রম। কেবলমাত্র দেশীয় ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল যেসব বিদ্যালয়ে তাদের বলা হত মিডল ভার্নাকুলার স্কুল। এবকম বিদ্যালয়েব সংখ্যা ছিল :

	বিদ্যালয়	ছাত্র
১৮৭৪	৩৪	১,৭৩৭
১৮৯২	৪৬	২,১৭১
১৯১০	৩১	১,৬৬৯

১৮২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর স্থাপিত হয়েছিল বরিশাল ইংরেজি স্কুল। ১৮৫৩ সালে এই বিদ্যালয় পরিণত হয় বরিশাল জেলা স্কুলে। বিদ্যালয়েব প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন মি. জন স্মিথ। বিদ্যালয় স্থানেব জমি মালিক ছিলেন মি. স্টুয়ার্ট নামে এক ইংবেজ। তার কাছ থেকে জমি লিজ নেওয়া হয়।

বিভারিজের বই থেকে জানা যায় : বিদ্যালয়টিকে বলা হত উচ্চ ইংবেজি বিদ্যালয়। অল্পদিনেই বিদ্যালযটি সুনাম অর্জন কবে। নিয়মিত হাজিবার সংখ্যা ছিল গড়ে ২৭৮। এর সঙ্গে ছিল স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদানের একটি বিদ্যালয়। বাসাণ্ডায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় থাকলেও, তাবা প্রবেশিকা পরীক্ষায় কোন ছাত্রকেই তৈবি করতে পাবে নি। ঝালকাঠিতে বিদ্যালয়টিকে সরিয়ে নিয়ে গেলে শিক্ষার সুবিধা হত অনেক। কারণ, ঝালকাঠিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং মুনসেফ অফিস। প্রতিটি মহকুমা সদবে ছিল মিডল ইংলিশ স্কুল। কিন্তু এগুলি খুব ভালো অবস্থায় ছিল না। এব মধ্যে তুলনামূলকভাবে বরিশাল স্কুলটিই ভাল। কারণ এখানে পড়তে আসত তাদেবই ছেলে মেয়ে, যারা চাকুরি কবতে আসত এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাব কিছুকালের জন্য বসবাস কবত। ১৮৭৪ সালের ৩১ মার্চ শেষ হওয়া বছরে জেলাব ৩৬৫টি বিদ্যালযেব ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২,১১০। এব মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশি। যেখানে হিন্দু ছাত্র ৭৫০০, সেখানে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ৪,৬০০। সেসময়ে মুসলমানদের মধ্যে গবিবের সংখ্যাই ছিল বেশি। শহব বা বাজাব এলাকায় তাদের বাসবাস ছিল কম। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যে গৃহশিক্ষা এবং আরবিক শিক্ষায় আগ্রহ ছিল প্রবল।

নারী শিক্ষা সম্পর্কে বিভারিজ বলেছেন, নারী শিক্ষার অগ্রগতি খুব বেশি ঘটেনি। বরিশাল এবং জেলার অন্যত্র একটা দুটো স্কুল থাকলেও, খুব গভীরে তার শিকড় পৌঁছায়নি। কয়েকটি প্রাইমারি স্কুলে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গেই পড়াশুনো করে। হিন্দু-মুসলমানদেব মধ্যে বাল্য বিবাহ নারী শিক্ষা প্রসারে অন্যতম প্রতিবন্ধক। এমন কী শিবপুরের ফিরিঙ্গি খ্রিস্টানরা তাদেব মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায়। কয়েক বছবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। নতুন পাঠশালা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পুরনো বিদ্যালয়েব কয়েকটিকে আর্থিক সাহায্যও করা হতে থাকে। জেলার দক্ষিণে ৮০ শতাংশই মুসলমান। সেখানে শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব হয় নি। স্থানীয় কৃষকদের শিক্ষায় কোন আকর্ষণ ছিল না। তারা চায় তাদের ছেলে মেয়েবা সুপারি সংগ্রহ কববে, নৌকা চালাবে গবাদি পশু পালন কববে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮৫৬ সালে ছিল মাত্র একটি। যেখানে মাত্র ২৬ জন ছাত্র লেখাপড়া করত। কিন্তু কয়েকবছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ২৩৫ এবং ছাত্র সংখ্যা ৬,৬৭৮। ১৮৯২ সালে দেখা যাচ্ছে উচ্চতর বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৭। ছাত্র সংখ্যা ৪,৫৯৭ জন। নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয় ২,৭২৭ টি। ছাত্র সংখ্যা ৬০,১১১ জন। ১৯১০ সালে উচ্চতর প্রাইমারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২০৯টি। ছাত্র সংখ্যা ১১,৮৪৫ জন। কিন্তু নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ২,৬২৩টি হলেও, ছাত্র সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৭,৪৬৮ জন।

বরিশালের কৃতী সন্তান ব্রজমোহন দত্ত ছিলেন নদীয়া জেলা স্মল কজ কোর্টের বিচারক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিকে কলেজে পরিণত করার বাসনা ছিল। কিন্তু মৃত্যু হওয়ায় তাঁর বাসনা রূপায়িত করতে না পারলেও, পুত্র অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রজমোহন কলেজ। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে অচিরেই। ১৯৬৫ সালে সরকার কলেজটি অধিগ্রহণ করে।

উনিশ শতকের শেষে জেলার অপর একটি বিখ্যাত কলেজ ছিল রাজচন্দ্র কলেজ। লাখুটিয়ার জমিদার বিহারীলাল রায় চৌধুরী ১৮৮৮ সালে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পিতা রাজচন্দ্র রায় চৌধুরীব স্মৃতি রক্ষার্থে বিদ্যালয়টিকে ১৮৮৯ সালে রাজচন্দ্র কলেজে রূপান্তরিত করেন। এই কলেজে এক সময় অধ্যাপনা করেন এ. কে ফজলুল হক।

বরিশালের সুসন্তান আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৯৪০ সালে চাখায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজটি এ. কে ফজলুল হক কলেজ নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭৮ সালে সরকার কলেজটি অধিগ্রহণ করে। বর্তমানে কলেজটির নাম শের-এ বাংলা মহাবিদ্যালয়।

বরিশাল মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৫৭ সালে। প্রথমে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক আর্টস পড়ান হত। পরে উচ্চমাধ্যমিক গার্হস্থ অর্থনীতি (১৯৬৩) এবং বি. এ. পাশ কোর্স (১৯৬৪) চালু হয়। ১৯৭৮ সালে সবকার কলেজটি অধিগ্রহণ করে।

বরিশাল নৈশ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৬৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর। বি. এম. কলেজ ভবনে। সেখান থেকে অশ্বিনীকুমার ভবনে উঠে আসে ১৯৬৫ সালে। প্রথমে কলা বিভাগের পাঠক্রম চালু হয়। পরে স্নাতক বাণিজ্য বিভাগ (১৯৬৪) যুক্ত হয়।

হাসপাতাল রোডে আইন কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৬৩ সালে।

বাকরগঞ্জে দারুস-সুন্নত জামেয়া-ই-ইসলামিয়া স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে।

বরিশাল সরকারি এতিমখানার সূচনা ১৯৪৬ সালে। তখন নাম ছিল বরিশাল সরকারি এতিমখানা। সরকারি এতিমখানার নাম হয় সরকারি শিশু সদন ১৯৭১ সালে। নিরাশ্রয় ছাত্রছাত্রীদের অন্নবস্ত্র, পড়াশুনোর ব্যবস্থা আছে এখানে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে এখানে নানারকম বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমানে বাকরগঞ্জে বেশ কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, শরীর চর্চা বিষয়ক শিল্পকেন্দ্র, চারুকলা বিদ্যালয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

বাকরগঞ্জের ডিগ্রি কলেজ ও উচ্চমাধ্যমিক কলেজ ঃ ১৯৭৫

১. সরকারি ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয়—বরিশাল।
২. ফজলুল মহাবিদ্যালয়—চাখার।
৩. পিরোজপুর মহাবিদ্যালয়—পিরোজপুর।
৪. বরিশাল মহাবিদ্যালয়—বরিশাল।
৫. ভোলা মহাবিদ্যালয়—ভোলা।
৬. গৌরনদী মহাবিদ্যালয়—গৌরনদী।
৭ ঝালকাঠি মহাবিদ্যালয়—ঝালকাঠি।

৮. বরিশাল মহিলা মহাবিদ্যালয়—বরিশাল।
৯. সৈয়দ হাতেম আলি মহাবিদ্যালয়—বরিশাল।
১০. পাতারহাট আর. সি. মহাবিদ্যালয়—মেহেন্দিগঞ্জ।
১১. স্বরূপকাঠি মহাবিদ্যালয়—স্বরূপকাঠি।
১২. চরফ্যাসন মহাবিদ্যালয়—চরফ্যাসন।
১৩. শাহবাজপুর মহাবিদ্যালয়—শাহবাজপুর।
১৪. মঠবাড়িয়া মহাবিদ্যালয়—মঠবাড়িয়া।
১৫. হেমায়েতউদ্দীন মহাবিদ্যালয়—ঝালকাঠি।
১৬. আবুল কালাম মহাবিদ্যালয়—রাকুদিয়া।
১৭. ভাণ্ডারিয়া মহাবিদ্যালয়—ভাণ্ডারিয়া।
১৮. মাটিভাঙা মহাবিদ্যালয়—মাটিভাঙা।
১৯ ধামুরা মহাবিদ্যালয়—ধামুরা।
২০. শের-এ বাংলা মহাবিদ্যালয়—শিকারপুর।
২১. কলসকাঠি মহাবিদ্যালয়—কলসকাঠি।
২২. রাজাপুর মহাবিদ্যালয়—রাজাপুর।
২৩. ফজিলাতুননেশা মহিলাবিদ্যালয়—ভোলা

উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ

১. বাকরগঞ্জ মহাবিদ্যালয়—বাকরগঞ্জ।
২. নিজামুদ্দিন মহাবিদ্যালয়—হোস্নাবাদ।
৩ বাংলাদেশ মহাবিদ্যালয়—ফুল্লশ্রী।
৪. মুলাদি মহাবিদ্যালয়—মুলাদি।
৫. নাজিরপুর মহাবিদ্যালয়—নাজিরপুর।
৬. কাউখালি মহাবিদ্যালয়—কাউখালি।
৭. আবদুল জব্বার মহাবিদ্যালয়—বোরহানউদ্দিন।
৮. নলছিটি মহাবিদ্যালয়—নলছিটি।
৯. আনসারউদ্দীন মহাবিদ্যালয়—হোগলা-বেতকা।
১০. জনতা মহাবিদ্যালয়—পয়সাহাট।

পুরসভা

বরিশাল পুরসভা

১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বরিশাল পুরসভার (মিউনিসিপ্যালিটি) দায়িত্বে ছিলেন ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড। সদস্যদের ১০ জন নির্বাচিত, ৪ জন মনোনীত এবং একজন পদাধিকার বলে সদস্য হতে পারতেন। অবশ্যই সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হতেন। ১৯১৪ সালে এই পুরসভার আয়তন ছিল সাড়ে ৭ বর্গ মাইল এবং করদাতার সংখ্যা ছিল ৩,৩৮২ জন। শহরে জল সরবরাহের আধুনিক ব্যবস্থা চালু হয় ১৯১১-১২ সালে। আমানতগঞ্জের কাছে নদী থেকে আনা জল পরিশ্রুত করে সরবরাহ করা হত শহরবাসীদের পাইপ লাইনের মাধ্যমে। এই জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য খরচ হয়েছিল ১,৬০,০০০ টাকা। এর মধ্যে সরকারি অনুদান ছিল ৬০ হাজার টাকা। বাকি টাকা এসেছিল জনসাধারণের চাঁদা, জেলাবোর্ড এবং পুরসভা থেকে। জল সরবরাহের জন্য আছে ২৫ মাইল দীর্ঘ পাইপলাইন। রাস্তায় পানীয় জলের কল আছে ২৫০টি। তাছাড়া আছে ৫০টি অগভীর নলকূপ।

সরকারি আদেশে বরিশাল পুরসভা, পুরসভা কমিটি হিসাবে গঠিত হয় ১৯৬০ সালে। তখন পুরসভার আয়তন ছিল ৭.৫০ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৭০,০৬৬। পুরসভা কমিটি বিভক্ত ছিল ১৬টি ইউনিয়ন কমিটিতে। বাংলাদেশ লোকাল কাউন্সিল অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল কমিটি (সংশোধন) আদেশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালে পুরসভা কমিটি বাতিল করে বরিশাল পুরসভাকে সক্রিয় করা হয়। সরকার একটি পুরসভা কমিটি গঠন করে দেয়, যারা সক্রিয় ছিল ১৯৭৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত। ১৯৭৪ সালে পুরসভার আয়তন হয় ৯ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৯৮,১২৭। মোট হোল্ডিং সংখ্যা ৬,৩১৩। মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ৫৫.৭৫ মাইল। তার মধ্যে ৪৭.২৫ মাইল পাকা এবং ৮.৫০ মাইল কাঁচা।

আগে পুরসভার অধিকাংশ নর্দমা ছিল কাঁচা। বর্ষায় মাটি জমে যাওয়ায়, বর্ষার পর সেই মাটি কাটাতে অতিরিক্ত পয়সা খরচ হত। এখন অবশ্য অনেক নর্দমাই পাকা হয়েছে। পুরসভার জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও আগেকার তুলনায় অনেক সক্রিয়। তবে ট্রাক ও ট্রাক্টরের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।

ঝালকাঠি পুরসভা

পুরসভা গঠিত হয় ১৮৭৫ এপ্রিল ১। ৯ জন মনোনীত সদস্যের মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ছিল পুরসভার যাবতীয় দায়িত্বে। ১৯১৪ সালে পুরসভার আয়তন ছিল ১.১২ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৯৬৩। ১৯৫৯ সালে পুরসভার পরিবর্তে টাউন কমিটি গঠিত হয় অন্যান্য পুরসভার মত। ১৯৬১ সালে পুরসভার আয়তন যথারীতি ১.১২ বর্গ মাইল থাকলেও জনসংখ্যা বেড়ে যায় ১০,৭২৪ জন। ১৯৭২ সালের সংশোধিত আইনে আবার পুরসভা গঠিত হয়। বর্তমানে পুরসভার আয়তন ১.১২ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ২১,২৭২। হোল্ডিং সংখ্যা ১,৬৬২। ৭ মাইল পাকা রাস্তা এবং ১.৫০ মাইল কাঁচারাস্তা আছে। ঝালকাঠিতে বিদ্যুৎ আসে ১৯৬৩ সালে। পুর এলাকায় পানীয় জলসরবরাহের জন্য ২২টি অগভীর নলকূপ আছে।

নলছিটি পুরসভা

এই পুরসভাটিও গঠিত হয় ১৮৭৫ সালে ৯ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে। ১৯৬০ সালে পুরসভা টাউন কমিটিতে পরিণত হলেও, আবার ১৯৭২ সালে পুরসভা দায়িত্বে আসে।

পিরোজপুর পুরসভা

১১ বর্গমাইল এলাকা এবং ১১ জন সদস্য নিয়ে ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় পিরোজপুর পুরসভা। ১৯৫৯ সালে নতুন আদেশে পুরসভার পরিবর্তে টাউনকমিটি গঠিত হয়। আবার পুরসভায় রূপান্তরিত হয় ১৯৭২ সালে। পুরসভার আয়তন ৬.২০ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ২২,২১৮ (১৯৭৪)। ৩৪.৮৮ মাইল রাস্তার ২৯.৩১ মাইল পাকা এবং ৫.৫৭ মাইল কাঁচা। এই পুরসভায় ৫৯৭টি শৌচাগার থাকলেও, ১৫হাজার লোকের জন্য কোন শৌচাগার নেই। পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত দীঘি এবং ১০০ টি অগভীর নলকূপ আছে।

ভোলা পুরসভা

এই পুরসভাটি গঠিত হয় ১৯২০ সালে। ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই পুরসভার সভপতি ছিলেন মহকুমা শাসক। ১৯৫৯ সালে পুরসভাকে টাউন কমিটিতে পরিণত করা হয়। আবার ১৯৭২ সালে পুরসভা পুনর্গঠিত হয়।

পুরসভার আয়তন ১.৫০ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ১২.৭৭৪। হোল্ডিং সংখ্যা ২,৬৩০ (১৯৭৪)। এই জনসংখ্যা ১৯৬১ সালে ছিল ৮,৪২৮। পুরসভায় ৩৮৫টি শৌচাগার আছে।

বিশিষ্টস্থান

বরিশাল

বাকরগঞ্জ জেলার সদর দপ্তর প্রথমে ছিল নলছিটি থানার 'বরইকবণ' গ্রামে। তারপর সদর দপ্তর সরিয়ে আনা হয় বাকরগঞ্জে। বাকরগঞ্জ থেকে জেলা সদর সরিয়ে আনা হয় বরিশালে ১৮০১ সালে। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উইন্টলে। সে সময়ে সামান্য কযেক একরের বরিশাল গ্রাম ছিল একটি মুসলমান পরিবারের সম্পত্তি। তখন গ্রামটি ছিল গীরদ বন্দর পরগনার অন্তর্গত। পরগনাটি বেশ কয়েকবার হস্তান্তরের পর মালিক হন সরকারি উকিল রামকান্ত রায়। তাঁর কাছ থেকে সরকার ১৮৩১ সালে স্থানটির চিরস্থায়ী ইজারা নেওয়ায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তর অফিস আদালত গড়ে ওঠে এখানে। অচিরাৎ স্থান সংকুলান না হওয়ায় বরিশাল শহরের সঙ্গে যুক্ত হয বগুড়া, আলেকান্দা, আমানতগঞ্জ এবং কাউনিয়া গ্রাম।

আড়িয়াল খাঁ নদীর শাখা কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত এই শহরের অন্যতম আকর্ষণ নদী তীরের সুদৃশ্য সড়ক বান্দ রোড বা স্ট্রান্ড রোড। রাস্তার দুপাশে পাম গাছের সারি। কেউ কেউ বলেন রাস্তাটি নির্মাণ করেছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উইন্টলে। রাস্তার ওপরে একটি ফলক থেকে জানা যায় ১৮১১ সালে ম্যাজিস্ট্রেট জন বার্টে, সেতুটি পুনর্নির্মাণ করেন।

বরিশাল প্রসঙ্গে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত বিবরণে আছে : "বাকরগঞ্জ জেলার সদর শহর বরিশাল কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত এবং খুলনা হইতে জলপথে ১০৪ মাইল দূর। মেল স্টীমারে সাড়ে দশ ঘণ্টার পথ। খুলনা ও বরিশালের মধ্যে প্রত্যহ দুইবার স্টিমার যাতায়াত করে। কলকাতা হইতে ২৪ পরগনা, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার নানা স্থান হইয়া বরাবার খাল দিয়া বরিশাল প্রভৃতি স্থানে নৌকার চলাচল আছে। এই খাল দৈর্ঘ্যে ১,১২৭ মাইল, ইহার মধ্যে মাত্র ৪৭ মাইল কৃত্রিম। খালটি সার্কুলার ও ইস্টার্ন খাল নামে পরিচিত। এই খাল দিয়া পূর্ববঙ্গ আসাম প্রভৃতি স্থান হইতে নৌকাযোগে মাল আসিয়া থাকে। এগুলি পৃথিবীর প্রধান খালপথের অন্যতম। কলিকাতা হইতে বরিশাল পর্যন্ত দুইটি খাল পথ আছে; একটি ভাঙড় খাল দিয়া শিবসা নদীতে পড়িয়া খুলনা এবং তথা হইতে ভৈরব দিয়া পিরোজপুর হইয়া বরিশাল। অপরটি আদিগঙ্গা ও বিদ্যাধরী দিয়া ক্যানিং এবং তথা হইতে সুন্দরবনের জলপথে বরিশাল। বরিশাল শহরের নদী তীর দিয়া স্ট্রান্ড রোড নামে একটি সুন্দর রাস্তা আছে। বহু লোকে সকাল ও সন্ধ্যায় এই রাস্তায় বেড়াইয়া থাকে। বরিশাল হইতে পটুয়াখালি, মাদারিপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে স্টিমার যাতায়াত করে। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে ব্রজমোহন কলেজ নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, ছেলেদের জন্য দুইটি ও মেয়েদের জন্য একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও একটি মূক-বধির বিদ্যালয় আছে। ব্রজমোহন কলেজটি বরিশালের স্বনামধন্য নেতা বাংলার অন্যতম সুসন্তান অশ্বিনীকুমার দত্ত কর্তৃক স্বীয় পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার "ভক্তিযোগ" নামক উপদেশ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। প্রসিদ্ধ স্বদেশী গানের প্রবর্তক মুকুন্দ দাস বরিশালের অধিবাসী ছিলেন। বরিশাল শহরে খৃস্টান মিশনারীগণের অনেকগুলি কর্মকেন্দ্র আছে। ১৮৪৪-৪৫ খৃস্টাব্দে এখানে যে ইংরেজ কলেক্টর ছিলেন, তিনি একটি বাঙ্গালী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাটীর সম্মুখে সমারোহে চড়ক পূজা করিতেন।" (বাংলায় ভ্রমণ—১ম খণ্ড। পৃ. ২৩৯-৪০)।

বর্তমানে বরিশালে একটি পুরসভা, ৪টি ডিগ্রি কলেজ, ১টি মেডিকেল কলেজ, ১টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাইমারি স্কুল ও মাদ্রাসা, ১টি মূকবধির বিদ্যালয়, ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় (১৮৭৭ সালে স্থাপিত), পুলিশ হাসপাতাল, সদর হাসপাতাল, ১টি টি বি হাসপাতাল, ১টি রেডক্রস মাতৃ সদন আছে।

বাজার রোড ও চকবাজার রোড প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে সারা বছর ধরে চাল, ধান, পাট সুপারি, জ্বালানী কাঠ, মরিচ ও ডাল বিক্রি হয়। তাছাড়া মরশুমী ইলিশ মাছ তো আছেই।

বরিশালে বেশ কয়েকটি মসজিদ আছে। তার অন্যতম দুটি হল জামে কশাই মসজিদ এবং এবাদুল্লাহ মসজিদ। হিন্দুদের মন্দির হল রামকৃষ্ণ মঠ, শঙ্কর মঠ, ভোলাগিরি আশ্রম, পাষাণময়ী কালীবাড়ি, সনাতন ঠাকুরের কালীবাড়ি। এবং ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির। খ্রিস্টানদের স্টেশন গির্জা (১৮৪৫), ব্যাপটিস্ট গির্জা (১৮২৯) এবং অক্সফোর্ড মিশন গির্জা (১৯০৪) আছে। তাছাড়া সক্রিয় কয়েকটি মিশন হল অক্সফোর্ড অ্যাংলিক্যান মিশন, রোমান ক্যাথলিক মিশন এবং ব্যাপটিস্ট মিশন।

বরিশাল শহরে ২টি পার্ক আছে। বেলস্ পার্ক এবং মিউনিসিপ্যাল পার্ক। বেলস্ পার্কটি অনেকদিনের। ১৮৯৬ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বিট্‌সন বেল। তাঁর নামেই পার্কটি নদীতীরে অবস্থিত। ১৮৫৪ সালে এখানকার প্রাচীনতম পাঠাগারটি স্থাপিত হয়েছিল। বরিশাল শহরের কাছে সূতালরীতে একটি মঠ আছে।

সুজাবাদ

বরিশালের ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে নলছিটি নদীর উত্তর তীরে সুজাবাদ গ্রামটিব নামকরণ হয়েছে সম্রাট শাজাহানের পুত্র শাহ্ সুজার নাম থেকে। শাহ্ সুজা ছিলেন বাংলার সুবাদার। মগদস্যু আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার জন্য শাহ্ সুজা এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। দুর্গের চাবপাশের দেওযাল বিলীন হয়ে গেছে। দুর্গের ভিতরের চারটি পুকুরও গেছে শুকিয়ে। স্থানটি জঙ্গলময়।

বাটাজোড়

বরিশালের ১৭ মাইল দূরে বাটাজোড় গ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে বরিশাল থেকে মাদারিপুর যাওয়ার সড়ক। ১৯২৭ সালে এখানে একটি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই গ্রামে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তেব জন্ম। বাটাজোড় পানের বড় ব্যবসা কেন্দ্র।

লাখুটিয়া

বরিশালের ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে লাখুটিয়া গ্রাম। গ্রামেব জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের পুত্র ইন্দ্রলাল রায় প্রথম মহাযুদ্ধের একজন কৃতী বৈমানিক। তিনি শত্রুপক্ষের কয়েকটি বিমান ধ্বংস করার পর মারা যান। এরা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপ পরগনার প্রধান জমিদার। পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামচন্দ্র খান। কিংবদন্তী, এদেব পূর্বপুরুষ ছিলেন চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের রসুইখানার পাচক।

চরামদ্দি

বরিশাল শহর থেকে আট মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত চবামদ্দি ও আশপাশের অঞ্চল বালাম চালের জন্য বিখ্যাত। এই গ্রামে ১৯২৪ সালে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

মাধবপাশা

বরিশালের ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের শেষ রাজধানী। বরিশাল থেকে মাধবপাশা যাতায়াতের প্রশস্ত রাস্তাটি বেশ প্রাচীন। জানা যায় স্থানীয় সাহা পরিবারের পার্বতী চৌধুরানী এই সড়কটি নির্মাণ করেন। বহু প্রাচীন ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিল দীর্ঘকাল। চন্দ্রদ্বীপ রাজপরিবারের রাজা জয়নারায়ণের মাতা প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ দীঘি ছিল এখানে। একটি পিতলের কামান ছিল বাজারের কাছে। মাধবপাশার কালপাথরের দুটি মূর্তি কাত্যায়নী ও মদনগোপাল দীর্ঘকাল পূজিত ছিলেন। জনশ্রুতি, রাজা দনুজমর্দন দেবের গুরু

চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নৌকায় ভ্রমণকালে ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন নৌকার কাছে জলের ভিতর যে বিগ্রহ রয়েছে, তা যেন তিনি উঠিয়ে আনেন। গুরুদেবের আদেশে দনুজমর্দন দেব জলের ভিতর থেকে এই বিগ্রহ দুটি তুলে অনেন।

রামসিদ্ধি

সদর (উত্তর) জেলার গৌরনদী থানায় অবস্থিত। এখানে একটি চারস্তম্ভযুক্ত সুদৃশ্য প্রাচীন মসজিদ আছে। কিংবদন্তী মসজিদটির নির্মাতা সাবি খান।

শরিকল

সদর (উত্তর) জেলার শরিকলে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং কামানের ভগ্নাংশ দেখা যায়। জনশ্রুতি, পলাশী যুদ্ধের পর সিরাজদৌলার অনুগামীরা এখানে এসে আশ্রয় নেয়। তারাই এখানে দুর্গ নির্মাণ করেছিল। ১৯২৯ সালে এখানে সরিকল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

মাহিলাড়া

বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম ছিল এক সময়। বরিশাল শহরের ১৮ মাইল দূরের এই জনপদকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে আড়িয়াল খাঁ-র একটি শাখা। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এই খালটি আড়িয়াল খাঁ-র জলে পুষ্ট। খালের ওপর জেলা বোর্ডের সেতু আছে ৪টি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা আছে। এই রাস্তা বরিশাল-মাদারিপুর রোড থেকে বেরিয়ে নলছিটি পর্যন্ত গেছে। গ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ দিয়ে গেছে লোকাল বোর্ডের দুটি রাস্তা। গ্রামটিতে বহু বিদগ্ধ জনের বসবাস ছিল। উচ্চশিক্ষিত বহুপরিবার ছিল গ্রামটির ঐশ্বর্য। গ্রামে প্রথমে মাইনর স্কুল স্থাপিত হলেও, পরে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এখানকার লাইব্রেরিটি ছিল ঈর্ষণীয়। সমবায় প্রথায় একটি ডাক্তারখানা চলত।

"গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে সরকার বাড়ির মঠ নামে ১৫০ ফুট উঁচু এবং প্রায় পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন একটি মঠ আছে। তার সঙ্গে অতি পুরাতন একটি দীঘিও আছে। মঠের প্রতি ইষ্টকখণ্ডে খোদিত আছে পৌরাণিক চিত্র। মদনমোহন সেনের বাড়িতে একটি সমসাময়িক মন্দির আছে—ফুল-ফল, রাম-লক্ষ্মণ খোদাই করা ইষ্টকে নির্মিত—আর্চ ও খিলানের উপরে রক্ষিত দালান। মঠবাড়ি বা শ্রীনাথ দাশগুপ্তের বাড়ির চারটি মঠ ও মন্দির দেখা যায়। বহু পুরাতন এবং গোকুল সেনের বাড়ির উত্তরের হাউলিতে একটি ইস্টক নির্মিত ফটক ও একটি প্রাচীন মন্দির দেখা যায়। এইসব প্রাচীন খোদাই ইস্টকে নির্মিত মন্দিরাদি দেখে মনে হয় এই নাতিবৃহৎ মাহিলাড়া গ্রামটি একটি প্রাচীন সম্পন্ন গ্রাম। এই গ্রামের কতকগুলি প্রাচীন দীঘি ও প্রাচীন বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ গ্রামের আভিজাত্যের সাক্ষ্য দেয়। গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বকোণে রুদ্র সেনের দীঘি এবং দীঘির উত্তর-পূর্ব কোণের অশ্বত্থ বৃক্ষ, দীঘির পাড়ের জঙ্গল একাধারে ভয় ও বিস্ময় জাগায় লোকের মনে। দুইটি বাড়ির নাম দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য। একটি রাজাবাড়ি ও আর একটি হাতিবাড়ি। রাজাবাড়ির কেউ কোনোদিন রাজা উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন কিনা এবং হাতিবাড়িতে কেউ কোনোদিন হাতি পুষেছিলেন কি না, তা কেউ জানে না।" (স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল—হীরালাল দাশগুপ্ত। পৃ. ২৯৩)।

ক্ষুদ্রকাঠি-খাঁপুরা

পাশাপাশি দুটি ছোট গ্রাম। একটি জনশ্রুতি ছড়িয়ে আছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশধর শ্রীরামকৃষ্ণ গুহরায় চন্দ্রদ্বীপের রাজার আতিথ্য গ্রহণ কারার পর, রাজা বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে রামকৃষ্ণকে ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামটি উপহার দেন। রামকৃষ্ণের বংশধর রামলোচন এখানে বসতিস্থাপনের

পর, ক্ষুদ্রকাঠি ও খাঁপুরায় এসে বসত করে বহু কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, ছুতার, ধোপা, নাপিত, শাঁখারি, ভূঞমালী, বারুজীবী নানা সম্প্রদায়ের মানুষ। তারা আশপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে।

রহমতপুর

বরিশাল শহরের ৯ মাইল দূরে নদী তীরবর্তী রহমতপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতুলালয়। বরিশাল-মাদারীপুর সড়কের পাশে এই সমৃদ্ধ জনপদটি ঐতিহ্য সম্পন্ন। বরিশাল থেকে সরাসরি ঘোড়া গাড়ি আসত এখানকার খেয়াঘাটে। যাত্রী পারাপারে নৌকা ছিল অপরিহার্য। নদী তীরের বড় বাজারটি একসময় বন্দরের চেহারা নিয়েছিল। এই গ্রামের জমিদার চক্রবর্তী পরিবার ছিল প্রভাবশালী। রহমতপুর শিক্ষা ও মর্যাদায় জেলার মধ্যে ছিল অগ্রণী। এই গ্রামের রাজারবেড় খালটি সম্পর্কে জনশ্রুতি হল, এটি ছিল চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের প্রাসাদের পরিখা। এখানকার চক্রবর্তী পরিবার চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের দেওয়ান নারায়ণ চক্রবর্তীর বংশধর হিসাবে পরিচিত ছিল। এরা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপ পরগনার বড় তালুকদার।

আধুনা

গৌরনদী উপ-জেলার উত্তর-পশ্চিমের গ্রাম আধুনা ছিল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রধান। গ্রামটির পশ্চিমে কোটালিপাড়া, উত্তরে মাদারিপুর, দক্ষিণে শিকারপুরের নদী এবং পূর্বদিকে আড়িয়াল খাঁ। এই নদীপথে মাদারিপুর-বরিশাল-খুলনায় যাতায়াত করা যায়। তাছাড়া একটি সড়ক বরিশাল-গৌরনদী মাদারিপুর গেছে। আধুনার মানুষ এই পথ দিয়ে স্থল পথে অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াত করে। "আধুনার পশ্চিমে চন্দ্রহার, বাটাজোড় এবং মাহিলাড়ার বিস্তীর্ণ বিল, উত্তরে নলচিটি, পূর্বে আগবপুর ও সবিকল এবং দক্ষিণে চন্দ্রহার খালের পাশের সিঙ্গা গ্রাম।.. এক সময়ে এই গ্রামে সংস্কৃত ভাষার চর্চা যথেষ্ট ছিল। আধুনার তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের টোল ছিল বিখ্যাত। এছাড়া আরও টোল এ গ্রামে ছিল। আধুনার ভট্টাচার্য পণ্ডিতগণের পণ্ডিত হিসাবে এতটা সুনাম ছিল যে তাঁরা নবাবের বৃত্তি পর্যন্ত পেতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে আর ছিল কয়েকটি পাঠশালা। ৮০/৯০ বৎসর পূর্বে প্রায় দশ মাইল দূরে গৈলা গ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল ছিল। অনেক পরে বাটাজোড় গ্রামে অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়িতে আর একটি হাইস্কুল স্থাপিত হয়। চন্দ্রহার, মাহিলাড়া, নলচিটি প্রভৃতি গ্রামে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় আরও পরে। তারও পরে আধুনা গ্রামের অক্ষয়কুমার গুপ্ত কাব্যতীর্থের চেষ্টায় আধুনার সংলগ্ন গ্রাম সরকলে হাই-ইংলিশ স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল।" (স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল—হীরালাল দাশগুপ্ত। পৃ. ৩০৫-০৬)।

চন্দ্রহার

গৌরনদী উপ-জেলার মাহিলাড়ার কাছের গ্রাম চন্দ্রহার। এই ছোট্ট গ্রামটির লোকসংখ্যাও ছিল কম। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের বাস ছিল বেশি। টোল, পাঠশালা, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, খেলার মাঠ সবই আছে গ্রামে। গ্রামের মাঝ দিয়ে একটি খাল গিয়ে মিশেছে ঝাপুর নদীতে। গ্রামে বহু বিশিষ্ট স্বনামখ্যাত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির বসবাস ছিল। এই গ্রামের সন্তান বিখ্যাত ডাক্তার সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্ত, 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক দুর্গামোহন সেন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কানু দাশগুপ্ত।

চন্দ্রহারের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটি গ্রাম সিঙ্গা। এখনকার তাঁতি ও কুমোরদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদূর। চন্দ্রহারের দক্ষিণে শৌলাকর গ্রাম।

চন্দ্রহারে একটি প্রাচীন মঠ আছে। ৯০ ফুট উঁচু অসমাপ্ত মঠটি ডানদিকে হেলানো। নবাব আলীবর্দি খানের (১৭৪০-৫৬) শাসনকালে এই মঠ নির্মাণ করেন জমিদার রূপরাম দাশগুপ্ত।

বাকরগঞ্জ

বরিশাল শহর থেকে বাকরগঞ্জের দূরত্ব মাত্র ১৩ মাইল। ১৮০১ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাকরগঞ্জে ছিল জেলা সদর। বরিশাল থেকে পটুয়াখালি স্টিমারে যাওয়ার পথে রঙ্গশ্রী স্টেশন। কাছেই বাকরগঞ্জ। রঙ্গশ্রী শীতলপাটির জন্য বিখ্যাত। গ্রামের নাম বাকরগঞ্জ হয় মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারের কর্মচারী আগা বাকরের নাম থেকে। তিনি এই গ্রামের জেলা সদর স্থাপন করেন। ১৭৪১-৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই অঞ্চলের সর্বময় কর্তা। ১৭৫০ সালে তিনি চট্টগ্রামের শাসনভার লাভ করেন। ১৭৫৩ সালে নায়েব নাজিমকে হত্যার পরদিন তিনি নিজেই নিহত হন। আগা বাকরের মৃত্যুর পর এই অঞ্চলের কর্তৃত্ব লাভ করেন রাজা রাজবল্লভ। তিনি কয়েকটি পর্তুগীজ পরিবারকে ব্যান্ডেল থেকে এনে গ্রামে বসতির ব্যবস্থা করে দেন। সেই পর্তুগীজ অধ্যুষিত অঞ্চলটি পাদ্রি শিবপুর নামে পরিচিত। পুরনো শহরে বিশেষ কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই। ১৯১৯ সালে বাকরগঞ্জে জে. এম. উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

পাদ্রি শিবপুর

বাকরগঞ্জের ৫ মাইল দক্ষিণে পাদ্রি শিবপুর। বরিশালের সঙ্গে সড়ক পথে যুক্ত। রাজা রাজবল্লভ যে সব পর্তুগীজদের ব্যান্ডেল থেকে এনোছলেন, তারাই এই গ্রামটিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছিল। গ্রামে তারা একটি গির্জা তৈরি করে। গির্জাটি প্রথমে ছিল মাদ্রাজের মায়লাপুরের বিশপের ডাইওসীসের অধীনে। এক সময় ছিল চাল ব্যবসায়ের বিখ্যাত কেন্দ্র। একজন পর্তুগীজ ডোমিঙ্গো ডি সিলভা ছিল বিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী। প্রতি বছর তার মৃত্যুদিনে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পাঁচশ টাকা বিতরণ করা হত।

'ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজেরাই সর্বপ্রথম অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শিবপুরে বসতি স্থাপন করে। কথিত আছে বুজরগ উমেদপুরের জমিদার, রাজা রাজবল্লভ ব্যাণ্ডেলের পর্তুগীজ মিশনের কিছুসংখ্যক বিদেশী লোককে এখানে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করেন। তদনুযায়ী এখানে কিছু সংখ্যাক পর্তুগীজ বসতিস্থাপন করে। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার জন্য একজন পাদ্রীকেও সেখানে আনা হয় এবং তাঁর ভরণপোষণের জন্য চারখণ্ড জমি, হাওলা হিসেবে তাকে দেয়া হয়। এই হাওলাগুলো পরে 'পাদ্রি তালুক' বা 'মিশন তালুক' নামে একটি তালুকে রূপান্তরিত হয়। প্রথম পাদ্রি ছিলেন 'ফ্রা রাফেলডাস অ্যানজোস'। ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে তাকে এই তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। পোড্রো-গণসালভেস নামে জনৈক পাদ্রী শিবপুরে প্রথম গীর্জা নির্মাণ করেন বলে কথিত আছে। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে ডমিঙ্গো ডি সিলভার ইচ্ছানুযায়ী তার পুত্র ম্যারেল পুরানো গীর্জা ভেঙে বর্তমান বৃহদাকার গীর্জাটি নির্মাণ করেন। গ্রামটি পূর্বে খুব সমৃদ্ধশালী ছিল। এখনও এখানে অনেক বড় বড় বাড়ি দেখা যায়।... এখানকার পর্তুগীজদের বর্তমান বংশধরেরা বাংলায় কথা বলে। ধর্ম ছাড়া এখানকার লোকদের সঙ্গে এদের আর কোন পার্থক্য নেই। এদের মধ্যে অনেকেই পেশাগত শিকারী। ধর্মযাজকদের অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে এখানকার শিক্ষা ও জীবনযাপনের মান অনেক উন্নত হয়েছে।" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ. ৩১৪-১৫)

লতা

বরিশাল শহরের ১৫/১৬ মাইল পূব দিকে মেঘনা তীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোরম গ্রাম। লতা ও আশপাশের গ্রামের অধিকাংশ মানুষই মুসলমান। বলা যেতে পারে শতকরা ৯৮ ভাগ। গ্রামের জমিদার দত্তদের জনসেবামূলক বহু কাজ ছিল। এই পরিবারের কৃতী সন্তান জিতেন্দ্রমোহন দত্ত এম. এস. সি পাশ করে লাহোর কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি নিজ অর্থে একটি বুনিয়াদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন গ্রামে। পরে একে সবাই বলত "গান্ধী আশ্রম।" কলকাতার 'খাদি প্রতিষ্ঠানে'র আদর্শে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান। সুতোকাটা, চামড়ার কাজ, ঘানির তেল তৈরি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। আশপাশের গ্রামের মানুষও শিক্ষার জন্য আসত এখানে।

লতায় আর একটি আশ্রম স্থাপিত হয়েছিল 'গান্ধী আশ্রম' প্রতিষ্ঠার অনেক আগে। কুঞ্জবিহারী বসু ছিলেন এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। প্রধানত এরা দুঃস্থরোগীদের সেবা করতেন। ব্যয় নির্বাহের জন্য কুঞ্জবিহারী চাঁদা হিসাবে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে ধান ও সুপারি সংগ্রহ করতেন। সে সব বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যেত, তাতেই আশ্রমের কাজ চলত।

শিয়ালঘুনি

এখানে একটি প্রাচীন কারুকার্য খোচিত মসজিদ আছে। মসজিদটি মোঘল আমলে নির্মাণ করেন জনৈক নসরত গণি। মসজিদের গায়ের পত্রপুষ্প ও আরবি হরফের লেখা এখনও দেখা যায়।

নারায়ণপুর—ভারুকাঠি

বরিশাল শহরের ১৪ মাইল পশ্চিমে পাশাপাশি অবস্থিত গ্রামদুটির মানুষ ছিল পরস্পর নির্ভরশীল। গ্রাম দুটির উত্তর দিক দিয়ে গেছে বরিশাল-বানারিপাড়া জেলা বোর্ডের রাস্তা। চক্রবর্তী পরিবার এবং মহলানবিশ এই দুটি পরিবার ছিল গ্রামের প্রভাবশালী জমিদার। গ্রাম দুটির বেশির ভাগ মানুষ জমিদারি স্টেটে চাকরি করত। গ্রামের সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারের অনেকেই শিক্ষকতা ও কবিরাজি ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। বৈদ্যদের মধ্যে মজুমদার পরিবারের খ্যাতি ছিল বহুদূর বিস্তৃত। জমিদার চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিলকচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মহলানবিশ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অন্নদাচরণ সেন। সেন পরিবারের অতুলচন্দ্র সেন ছিলেন রংপুর কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক।

বাইশারি

বানারিপাড়ার পশ্চিম দিক দিয়ে যে নদী গেছে তার অপর পারে বাইশারি গ্রাম। কয়েকটি পাড়া নিয়ে গঠিত গ্রামটি বহুকৃতী মানুষের জন্মভূমি ও কর্মক্ষেত্র। বরিশাল শহরের ২০ মাইল পশ্চিমের গ্রামটি একটি সড়কপথে বরিশালের সঙ্গে যুক্ত। ছোট গ্রামটির চারদিকে নদী আর খাল। পিরোজপুরে যাতায়াত করতে হয় নদীপথে। বাইশারি হাইস্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৯০১ সালে। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডঃ আনন্দমোহন রায়। বিদ্যালয়ের বিরাট দোতলা বাড়ি পরে নির্মিত হয়। প্রথমে এখানে সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পরে মেয়েদের জন্য স্বর্ণময়ী জুনিয়ার হাইস্কুল স্থাপিত হয়। ১৯১৮ সালে এখানে যে পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছিল, সরকারি রুদ্র রোষে তা বন্ধ হয়ে গেলেও, ১৯৩২ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও স্থায়ী আছে এই লাইব্রেরী। ১৯২১ সালে বাইশারিতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। "গ্রামের দান্তয়ঘাটপাড়া নামে একটি পাড়া আছে। সেখানে প্রধানত স্বর্ণকার শ্রেণীর লোকেরা বাস করে। গ্রামের আর একটি পাড়ার নাম দত্তপাড়া।

এ পাড়ায় ব্যবসায়ী সাহা-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বসতি। এই দত্ত পাড়ার বড়বাড়ির সাহারা বাংলাদেশের প্রায় সব বড় বড় বন্দরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। এই গ্রামে তাঁতি ও ছুতোর মিস্ত্রির সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। বাইশারির রায়-পরিবার এবং গুপ্ত পরিবার সর্বপ্রাচীন। রায়-পরিবারের যথেষ্ট দানশীলতার জন্য বাইশারি গ্রাম একদিন প্রথম পর্যায়ের স্তরে উঠেছিল। রায়দের বাড়ির সাথে দৈনিক বাজার, পোস্ট অফিস, পাবলিক লাইব্রেরি, হাইস্কুল, তাঁদেরই দেওয়া জায়গায় জনসাধারণের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে এই রায় জমিদারগণই প্রসিদ্ধ পঞ্চমুণ্ডী কালী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যাঁর পূজা আজও সেখানে চলছে। পূর্বে এই গ্রামে ১২৫ খানা দুর্গাপূজা হত। ১৯৭৩ সালে ৮টি দুর্গাপূজা হয়েছে।" (স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল—হীরালাল দাশগুপ্ত। পৃ. ৩২৫)

শিকারপুর

বরিশাল শহরের ১৫ মাইল উত্তরে শিকারপুর গ্রামে যাওয়ার জন্য বাস চলাচলের পথ যেমন আছে, তেমনি লঞ্চ এবং নৌকায়ও যাতায়াত করা যায়। শিকারপুকে বলা হত ভারতের ১৫০টি শক্তিপীঠের অন্যতম পীঠস্থান। এখানে সতীর নাসিকা পড়েছিল। এখানকার দেবীকে বলা হয় সুগন্ধা বা উগ্রতারা। দেবীর মন্দির আছে। গ্রামটি সুগন্ধা নদীতীরে অবস্থিত। এখানকার শিবরাত্রির মেলা ছিল বিখ্যাত। তাছাড়া কোজাগরী পূর্ণিমা থেকে শ্যামা পূজা পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ আসত উৎসবে যোগ দিতে। দোলযাত্রার সমারোহ ছিল।

জনশ্রুতি, অতীতে সুগন্ধা নদী প্রবাহিত হত পোনাবালিয়া-সামরাইলের পাশ দিয়ে। শিকারপুর এই নদীরেখার পূর্ব পাড়ে এবং পোনাবালিয়া-সামরাইল ছিল পশ্চিম পাড়ে। এখানকার বাজার বিখ্যাত। এখানে লঞ্চঘাট ও ফেরিঘাট আছে।

গৈলা

গৌরনদী উপ-জেলার অন্তর্গত গৈলা গ্রাম এক সময় ছিল সংস্কৃত চর্চাকেন্দ্র। বহু টোল ছিল। গৈলার অধিবাসী ছিলেন ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ টীকাকার পণ্ডিত ত্রিলোচন কবিভরণ। গৈলার পণ্ডিত মদনমোহন কবীন্দ্র এখানে কবীন্দ্র কলেজ নামে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বরিশাল শহর থেকে ২৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং ফরিদপুর জেলার সীমানা থেকে ৬/৭ মাইল দূরে অবস্থিত গ্রামটি। প্রায় সাড়ে চার বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে বৃহত্তর গৈলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গৈলা, মুড়িহার, ফুল্লশ্রী, দক্ষিণ ও মধ্য সিহিপাশা, উত্তর সিহিপাশা, কালুপাড়া ও মানসী—এই সাতটি মৌজা। শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা ছিল গৈলা গ্রামের। গৌরনদী স্টেশনে নেমে ৩ মাইল পশ্চিমে এই গ্রাম। ১৮৮৫ সালে প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। গ্রামের শিক্ষিতদের মধ্যে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিল বেশি। বর্তমানে গ্রামটি গুড় উৎপাদনে বিখ্যাত।

ফুল্লশ্রী

গৈলা গ্রামের ২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ফুল্লশ্রী বিখ্যাত স্থান। এখানে 'পদ্মাপুরাণ' বা 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা কবি বিজয়গুপ্তর জন্মস্থান। তাঁর জন্ম পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে। তিনি 'মনসামঙ্গল' রচনা করেন ১৪৮৪ সালে। বিজয়গুপ্ত এই গ্রামে মনসা দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নিত্যপূজার ব্যবস্থা ছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল এই দেবী খুবই জাগ্রত। জন সমাগত হত বিপুল।

চাঁদসি

গৌরনদী উপ-জেলার অন্তর্গত। বিনা অস্ত্রে চিকিৎসার জন্যে গোটা বাংলা জুড়ে ছিল এখানকার চিকিৎসকদের খ্যাতি। গৌরনদী থেকে ২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামটি উত্তর চাঁদসি ও দক্ষিণ চাঁদসি নামে বিভক্ত। ১৯৫১ সালে এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

ভোলা

আগে নাম ছিল শাহবাজপুর। বর্তমান ভোলা জেলা একটি দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের মোহানায় অবস্থিত। দ্বীপটির পুবদিকে মেঘনা, পশ্চিমে কালাবদর নদ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং মেঘনা, কালাবদর ও তেঁতুলিয়া নদীর সঙ্গম স্থল এবং উত্তরে ইলশা নদী। দ্বীপটির দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল এবং প্রস্থ ১০ মাইল। ভোলা শহরটিই আগে ছিল মহকুমা সদর। এখন জেলা সদর। বর্তমানে জেলার জনসংখ্যা ৩ লাখের ওপর। তার মধ্যে ৪০ হাজার হিন্দু। বাকি সবাই মুসলমান। সামান্য কিছু অন্য ধর্মাবলম্বী আছে।

বরিশাল থেকে চট্টগ্রামমুখী স্টিমার পথে পাঁচঘণ্টা পেরিয়ে ভোলা। তেঁতুলিয়া বা ইলশা নদী পূর্বপাড়ের দুই মাইল দূরে অবস্থিত ভোলা বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। সুপারি, লঙ্কা, নারকেল এবং পানের কারবার হয় সব থেকে বেশি।

১৮৭৬ সালের ভয়ঙ্কর বন্যায় দক্ষিণ শাহবাজপুর মহকুমা শ্মশানের চেহারা নেয়। তখন দক্ষিণ শাহবাজপুর থেকে মহকুমা সদর সরিয়ে আনা হয় ভোলায়। রমেশচন্দ্র দত্ত আই সি এস তখন ছিলেন মহকুমা শাসক। তারই পরামর্শে এই ব্যবস্থা হয়েছিল। বিশাল ধান খেত ছিল তখন এখানে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভোলার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। একটি ডিগ্রি কলেজ এবং কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৮ সালে। নাগরিক জীবনোপযোগী সুযোগ সুবিধা আছে এই শহরে।

'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় জনৈক সংবাদদাতার একটি চিঠির অংশ প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ জানুয়ারি ১৩। ঐ চিঠিতে ছিল ঃ "কয়েক দিবস হইল আমি কার্যোপলক্ষে বেঙ্গল ফুটিলা কোম্পানির এলোকেশী নামিকা বাষ্পীয় পোতারোহণে বরিশালের অন্তর্গত ভোলা নামক স্থানে গমন করিয়াছিলাম। বোধহয় আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই এস্থানটি দর্শন করেন নাই, তাই তাহাদের অবগতির নিমিত্ত ভোলার বৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"মেঘনা নদীর মোহানায় যে সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ বর্তমান আছে তন্মধ্যে দক্ষিণ শাহবাজপুর একটি সুবৃহৎ দ্বীপ। পূর্বে এই দ্বীপটি নোয়াখালির অন্তর্গত ছিল, কয়েক বৎসর হইল নোয়াখালি হইতে নীত হইয়া বাকরগঞ্জের অধীন হইয়াছে। এই দক্ষিণ শাহবাজপুরের অন্তর্গত দৌলত খাঁ নামক একটি গ্রাম। পূর্বে এই স্থানে একটি সব ডিবিসনাল আপীল ও মুনসেফ কোর্ট অবস্থিত ছিল। ১২৮৩ সনের কার্তিক মাসের প্রবল জল প্লাবনে এই স্থানটি একেবারে জলমগ্ন ও তৎসঙ্গে বহু লোকের প্রাণ বিনাশ হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে তৎকালীন সবডিবিসনাল ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই লোমহর্ষক কাণ্ডের পর দৌলত খাঁ হইতে আপীলগুলি "ভোলা" নামক স্থানে আনীত হইয়াছে। ভোলা নিতান্ত আধুনিক স্থান বলিয়া দৃষ্টিমাত্র প্রতিপন্ন হয়। বোধহয় ৫০/৬০ বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। কারণ আমি যতদূর দেখিতে পাইয়াছি, ইহাতে কোন পুরাতন বৃক্ষ, ইষ্টক নির্মিত কোন চিহ্ন নাই, বরং ইহার বালুকাময় ভূমি দৃষ্টে উপলব্ধি হয়, ইহা অতি অল্প দিন হইল নদী গর্ভে সঞ্জাত হইয়াছে। ভোলা স্থানটি উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত একটি অপ্রশস্ত খালের দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব দিকে এক খণ্ড ভূমি অনতি উচ্চ বান্ধ-দ্বারা সীমাবদ্ধ, তন্মধ্যে ডিপুটি কালেক্টরের আপীশ, তাঁহার বাসগৃহ প্রস্তুত হইতেছে। এই বান্ধের মধ্যে কয়েকটি

অনতিবৃহৎ পুকুর আছে, তন্মধ্যে পুলিশ স্টেশন সন্নিহিত পুকুরটির জল বড় সুস্বাদু। এই জল অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই পুকুরে কেহ অবগাহন করিতে পারে না। চতুর্দিকে বেষ্টিত বান্ধের পার্শ্বে পার্শ্বে নূতন রোপিত ঝাউ বৃক্ষ শ্রেণী, দূর হইতে বড় সুন্দর দেখায়। এখানে দুইটি মুন্সেফ কার্য করিতেছেন। খালের পশ্চিমদিকে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি সুন্দর বাজার; ঘর সমস্ত প্রায়শঃ লৌহপাত মণ্ডিত (carogated iron) এবং নানাপ্রকার দেশীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ। এখানে যত কিছু কারবার আছে তন্মধ্যে সুপারির কারবারই অধিক। আরাকান দেশ হইতে মগগণ এখান হইতে সুপারি লইয়া থাকে। বাজারের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে উকিল মোক্তার ও আমলাগণের বাসা। প্রায় সকলগুলিই সুপরিষ্কৃত সুপ্রশস্ত ও সুন্দর। এই বাজারে দুইটি চিকিৎসালয় আছে।

"এই স্থানের জলবায়ু বড় ভাল। অনেকেই বলিল এখানে বড় ব্যারাম হয় না। বাস্তবিক স্থানটি যে প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তৎদৃষ্টেই একথার যথার্থই সুন্দর উপলব্ধি হয়। ভোলায় দেশীয় খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, অথচ মূল্য অধিক নয়। অনেকেই বলিলেন এস্থানের এক প্রধান আশঙ্কা জলপ্লাবন। এই আশঙ্কা ১২৮৩ সনের জল প্লাবন হইতে অধিবাসীবৃন্দের মনে বদ্ধমূল হইয়া ছিল, কিন্তু কোন বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। ফ্লোটিলা কোম্পানির কল্যাণে এখানে এখন আসা যাওয়ার বড় সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু একটি বড় অসুবিধা রহিয়া গিয়াছে। যে স্থানে জাহাজ দাঁড়ায় সে স্থান হইতে ভোলা আপীশ প্রায় ৭/৮ মাইল। এই সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন করিবার কোন সুবন্দোবস্ত নাই।"

দৌলত খাঁ

ভোলার এক স্টেশন পরেই সুপারির বিখ্যাত কেন্দ্র দৌলত খাঁ মেঘনার পশ্চিম পাড়ে শাহবাজপুর দ্বীপে অবস্থিত। ১৮৭৬ সালের বন্যায় ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। "...প্রায় ৪০ বৎসর ধরে এখানে মহকুমা সদর ছিল এবং তখন এ স্থানের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ১৮৭৬ সালের ১৮ই মের প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে সমগ্র মহকুমা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানিতে গাছপালা, ঘরবাড়ি সব তলিয়ে যায়। লোকজন, পশুপাখি, সাপ ইত্যাদি আত্মরক্ষার জন্য এক সংগে গাছের মাথায় ও ঘরের চালে আশ্রয় নিয়েছিল। এই জলোচ্ছ্বাসের পরেই মহকুমার সদর দপ্তর এস্থান থেকে ভোলা শহরে স্থানান্তরিত হয়।" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ. ৩১৩)

"এ অঞ্চলে মেঘনার বান প্রসিদ্ধ। সারা বৎসর ধরিয়াই এই বান দৃষ্ট হয়। কিন্তু জোয়ারের সময়ে ইহা বিরাট আকার ধারণ করে এবং ১৪/১৫ ফুট উচ্চ হইয়া জলরাশি আসিতে দেখা যায়; গভীর জলে ইহা বিশেষ বুঝা যায় না। দেউলার বান দক্ষিণ শাহবাজদ্বীপ এবং নোয়াখালির জেলার হাতিয়া দ্বীপের মধ্য দিয়া আসিয়া মেঘনা নদী এবং সংশ্লিষ্ট জলপথ দিয়া উত্তরে উঠিতে থাকে; অপর দিকে চাটগার বান সন্দ্বীপ ও নোয়াখালির মধ্য দিয়া উপরে আসিয়া প্রথমত পশ্চিমে ও পরে দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়া দেউলার বানের সম্মুখীন হয়। দেউলার বানের আঘাত খাইয়া ইহা প্রত্যাবর্তন করে।" (বাংলায় ভ্রমণ। ১৯৪০। পৃ. ২৪৫-৪৬)

মনপুরা

বর্তমান ভোলা জেলার একটি উপ-জেলা মনপুরা ভোলা শহর থেকে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। জেলার পূর্ব প্রান্তের এই স্থানটি আগে ছিল তজুমুদ্দিন থানায়। এখন তজুমুদ্দিন এবং মনপুরার মধ্যে ফেরি যোগাযোগ রয়েছে। বিভারিজের বিবরণ থেকে জানা যায়, আঠার শতকে মান গাজি নামে জনৈক ব্যক্তি দ্বীপটি জমিদারদের কাছ থেকে লিজ নিয়ে এখানে চাষাবাদ শুরু করেন। তার নাম থেকেই স্থানটি মনপুরা নামে পরিচিত হয়। এখানকার উর্বর জমিতে প্রচুর ধান

জন্মায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবার বিপযস্ত হয়েছে দ্বীপটি। ১৮২২ এবং ১৮৭৬ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দ্বীপটি সম্পূর্ণ জলমগ্ন হওয়ায় সমস্ত গবাদি পশু এবং অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৭০ সালেও অতীতের দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

চাখার

পিরোজপুর জেলা এবং বানারিপাড়া উপ-জেলার অন্তর্গত চাখার শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের জন্মস্থান। বরিশাল শহর থেকে ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গ্রামটি পুরোপুরি আধুনিক নগর জীবনের সুযোগসুবিধাযুক্ত। ব্যাংক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ সবই আছে। এ. কে ফজলুল হকের নামে একটি কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করে। রাস্তাগুলি তুলনামূলকভাবে অনেক সুশোভিত।

চাখার একটি ব্যবসা কেন্দ্রও। ধান, পাট, ডাল, সরিষা, নারকেল, সুপারি প্রধান ফসল। এখানে উৎকৃষ্ট মানের তাঁতের কাপড়, মাটির পাত্র এবং বাঁশের নানাবিধ ব্যবহার্য জিনিস তৈরি হচ্ছে।

সরাসরি সড়ক পথে বরিশালের সঙ্গে যুক্ত।

পিরোজপুর

বর্তমানে জেলা। এখানে মহকুমা গঠিত হয়েছিল ১৮৬৬ সালে। ১৮৮৫ সালে পিরোজপুর পুরসভার জন্ম। শহরটিতে একটি কলেজ, চারটি উচ্চ বিদ্যালয় (একটি মেয়েদের), মাদ্রাসা, হাসপাতাল, ডাকঘর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ডাকবাংলো সবই আছে। পানীয়জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। পিরোজপুর শহরের কাজে রাজাগঞ্জে চাল ও সুপারির বড় বাজার। স্টিমার স্টেশন হুলার হাট শহরের ৪ মাইল দূরে।

স্বরূপকাঠি

পিরোজপুর জেলার উপ-জেলা সদর স্বরূপকাঠিতে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯২৭ সালে। এখানে একটি কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয় রয়েছে। নারকেল ও নারকেলজাত দ্রব্য এবং নৌকা নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। সুন্দরী কাঠের বড় বাজার এখানে।

বানরিপাড়া

বর্তমান পিরোজপুর জেলার একটি উপ-জেলা বানরিপাড়া বরিশাল শহরের ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। জেলা বোর্ডের একটি সড়ক আছে বরিশাল থেকে বানরিপাড়া পর্যন্ত। খুবই ঘন বসতিপূর্ণ। একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ১৮৮৯ সালে। বিদ্যালয়টির নাম বানরিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে বানরিপাড়ার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল একসময়ে।

"বরিশালের ইতিহাসে বানরিপাড়া—একটি অবিস্মরণীয় নাম। বানরিপাড়া একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র নয়—পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ নিয়ে যে বৃহত্তর গ্রাম সমষ্টি তাকেই বলা হয় বানরিপাড়া। নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত এক বৃহৎ সমাজগোষ্ঠী দ্বারা এ অঞ্চল অধ্যুষিত ছিল। নিম্ন ও উচ্চশ্রেণীর বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের আবাসভূমি হলেও বানারিপাড়া প্রধানত বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের অন্যতম পীঠস্থানরূপে সুপরিচিত ছিল। একদিকে যেমন শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, পূজাপার্বণে, গীতবাদ্যে, যাত্রা নাটকে, শিল্পে (তাঁত), বাণিজ্যে, আনন্দ উৎসবে এবং নানা অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে বানরিপাড়া সর্বদা প্রাণচঞ্চল ও কর্মমুখর ছিল, অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলনে—সহিংস বিপ্লবী আন্দোলন, অহিংস কংগ্রেস আন্দোলন এবং নানা বামপন্থী আন্দোলনে

বানারিপাড়া সবসময়ে প্রথম সারির স্থান দখল করেছে।" (স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল—হীরালাল দাশগুপ্ত। পৃ. ২৮০।)

মঠবাড়িয়া

জেলার সর্বদক্ষিণে সব থেকে বড় ধান চালের ব্যবসা কেন্দ্র। বর্তমানে পিরোজপুর জেলার উপ-জেলা সদর মঠবাড়িয়ায় একটি ডিগ্রি কলেজ আছে। কে. এম. লতিফ ইনস্টিটিউশন জেলার সব থেকে পুরনো শিক্ষা কেন্দ্র। ১৯২৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল।

রায়েরকাঠি

এখানে একটি প্রাচীন কালীমন্দির আছে। শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৬৪৩ সালে রুদ্রনারায়ণ রায় কালী বিগ্রহ স্থাপন করেন। ১৭৫৫ সালে রুদ্রনারায়ণের তৃতীয় বংশধর জয়নারায়ণ মন্দির নির্মাণ ও উদ্বোধন করেন। এই রায় পরিবার সম্পর্কে জনশ্রুতি হল, মদনমোহন রায়ের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ঢাকার নবাব তাকে সেলিমাবাদসহ কয়েকটি পরগনা পুরস্কার দেন। তখন রায় পরিবার তাদের প্রাচীন বসতি দ্বিগঙ্গা ছেড়ে এখানে চলে আসেন। এরাই জেলার প্রাচীনতম পরিবার।

ঝালকাঠি

বরিশাল শহরের ১২ মাইল দূরে নলছিটি ও ঝালকাঠি নদী সঙ্গমে ঝালকাঠি একটি বন্দর ও ব্যবসা কেন্দ্র। এখান থেকে ধান, চাল, কাঠ, নারকেল তেল প্রভৃতি রপ্তানি হয়। স্টিমার ঘাট, বরিশাল পর্যন্ত পাকা সড়ক এই শহরের গুরুত্ব বাড়িয়েছে। ১৯৬৪ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছেলেদের দুটি এবং মেয়েদের একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। ছেলেদের উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি হল সরকারি বিদ্যালয় ১৯০৯ সালে স্থাপিত। অপরটি ঝালকাঠি উদ্বোধন বিদ্যালয় ১৯৪৪ সালে স্থাপিত। কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। একটি ডাকবাংলো আছে।

বর্তমানে ঝালকাঠি জেলা সদর হওয়ায় এখানে সরকারি নানান দপ্তর স্থাপিত হয়েছে।

কীর্তিপাশা

ঝালকাঠির ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কীর্তিপাশায় 'বাকলা'-গ্রন্থের রচয়িতা রোহিণীকুমার সেন একটি গ্রন্থাগাব স্থাপন করেছিলেন। ঝালকাঠি-কীর্তিপাশা সড়কটি জমিদারদের তৈরি। এখানে উচ্চ বিদ্যালয়, ডাকঘর, ডাক্তারখানা সবই আছে।

নলছিটি

ঝালকাঠি জেলার নলছিটি বরিশাল শহরের ১০ মাইল দূরে নলছিটি নদী তীরে অবস্থিত, একসময় 'নিম্ন নবদ্বীপ' নামে পরিচিত ছিল। কারণ, সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চার অন্যতম কেন্দ্রে বাস করতেন বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত। টোলও কম ছিল না। একমাত্র ভট্টাচার্য বাড়িতেই টোল ছিল কমপক্ষে ১৬টি। রাজা রাজবল্লভ ক্ষমতা লাভের পর এখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এখানে মগরা আসত সুপারির ব্যবসায়। যে স্থানটিতে তারা এসে থাকত সেটি মগপাড়া নামে পরিচিত। নলছিটি মার্চেন্টস উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯২৯ সালে। এখানকার নারকেল বিখ্যাত। স্টিমার স্টেশন, ডাকবাংলো এবং শহর জীবনের অনুকূল সুযোগসুবিধা আছে। এখন ধান, চাল ও সুপারির বড় ব্যবসা কেন্দ্র।

পুনিহাটি

নলছিটি থানার এই ছোট গ্রামটির পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে খাল। উত্তরে সরমহল গ্রাম। গ্রামটি অতীতে ছিল হিন্দু প্রধান। গ্রামে শিক্ষিতের হার ছিল বেশি। উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার, এবং বিভিন্ন পেশার চাকুরিজীবীদের বসতিযুক্ত গ্রামে প্রথমে ছিল একটি এম. ই স্কুল। পরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

চর ফ্যাসন

মি. ফ্যাসন ছিলেন তৎকালীন রাজস্ব সংগ্রাহক। যাকে বলা হত কালেকটর। উনিশ শতকের শেষে এই চরটি গড়ে ওঠে এবং সরকারি খাসভূমি হিসাবে স্বীকৃতি পায়। কালেকটরের নাম অনুসারে চর ফ্যাসন নামে এই ভূভাগ পরিচিত হয় ১৮৯৫ সালে। ১৯৩২ সালে এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।



সংযোজন
২



প্রাসঙ্গিক বিবরণ

বাকলা

"আমি চাটি গাঁ থেকে রওনা হই নভেম্বর মাসে। পথে কিছু ঘুরে আমি বাকলা হয়ে আসি। ওখানকার পর্তুগীজরা দুবছরের উপর কোন যাজকের সাহায্য পায় নি। তাই তারা আমাকে ওখানে যেতে বলেছিল। ফাদার ফ্রান্সিস ফারনানদেজ আমাকে এখানে না এসে আরাকান যেতে বলেছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য খারাপ থাকাতে আমি যেতে পারিনি। মনে হয় এটা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে, কারণ এই সুযোগে আমি বাকলাতে একটা বাসা বানাতে আরম্ভ করি। আমি পৌঁছবামাত্রই সেখানকার রাজা আমাকে ডেকে পাঠান। রাজা আট বৎসরের বালক মাত্র; কিন্তু বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আমি সব পর্তুগীজদের নিয়ে রাজার কাছে যাই—তারা খুব খুশি হয়েই আমার সঙ্গে গিয়েছিল। প্রাসাদে পৌঁছবা মাত্রই রাজা লোক পাঠিয়ে দুবার খবর দেন যে তিনি আর সভাসদরা কেল্লাগুলির অধিপতিদের সঙ্গে আমার জন্য একটি বড় বাড়িতে অপেক্ষা করছেন। আমি পৌঁছতেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন। রাজার পাশে প্রধান জায়গাটিতে এই গরিব ফাদার আর অন্য পর্তুগীজদের জন্য একটি বড় কার্পেট বিছানো ছিল। যথা বিহিত নমস্কার বিনিময়ের পর রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি বললাম যে আমি চাঁদেকানের রাজার কাছে যাচ্ছি। শুনেছি তিনিই এই বাকলার রাজার শ্বশুর হবেন। তবে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি তাঁর রাজ্যে এসে পড়েছি, তখন আমি তাঁকে সম্মান দেখাতে চাই আর অনুরোধ করতে চাই যে তিনি যেন তাঁর রাজত্বে ফাদারদের আমন্ত্রণ করেন ও তাঁদের তাঁর রাজত্বে গির্জা বানাবার আর একমাত্র ঈশ্বরের জ্ঞান প্রচারের অনুমতি দেন। তিনি খুব খুশি হয়ে আমার কথা মেনে নিলেন, এমন কি এ বিষয়ে খুব আগ্রহ দেখালেন।...(বঙ্গপ্রসঙ্গ- -অসীমকুমার রায়। পৃ. ১৪৬)।

রালফ ফিচের বিবরণে আছে ঃ "বাংলাদেশের চাটি গাঁ থেকে আমি বাকলাতে [Bacola] আসি। এখনকার রাজা ধর্মহীন। লোকটি ভদ্র আর বন্দুক ছুড়তে ভালবাসেন। তাঁর রাজ্য বিশাল আর সুফলা। তাঁর ধান, সূতী আর রেশমী কাপড়ের বড় বড় ভাণ্ডার আছে। এখনকার বাড়িগুলি সুন্দর উঁচু, আর রাস্তাগুলি বেশ বড়। লোকেরা কোমরে একটু কাপড় জড়িয়ে রাখে, বাকি শরীর নগ্ন। মেয়েরা গলায় আর হাতে অনেকগুলি করে রূপার হার আর চুড়ি পরে। পায়ে তাদের রূপার বা তামার মল আর হাতির দাঁতের আংটি। (বঙ্গপ্রসঙ্গ—অসীমকুমার রায়। পৃ. ১৩৬)

চন্দ্রদ্বীপ

এ. এফ. এম. আবদুল জলিল লিখেছেন : "চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত কচুয়া নামক স্থানে দনুজমর্দন দেব রাজধানী স্থাপন করেন। কচুয়ার কমলা সাগর দীঘি সেকালে দেশের প্রসিদ্ধ জলাশয় ছিল। দনুজমর্দনের রাজ্য বাকরগঞ্জ জিলার দক্ষিণাংশ ও নোয়াখালির পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার মৃত্যুব পর তৎপুত্র রমাবল্লভ ও এইবংশের আরও কতিপয় নৃপতি রাজত্ব করেন। এই বংশের সপ্তম অধস্তন পুরুষ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়। তিনি কচুয়া হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইনি বঙ্গের বিখ্যাত বারভুঁঞার অন্যতম ভুঁঞা। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজা রামচন্দ্র রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জামাতা। রামচন্দ্র মাধবপাশায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।...(সুন্দরবনের ইতিহাস—পৃ. ৩০৯)

ধনঞ্জয় দাস মজুমদারের "বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে আছে : "এই 'সমুদ্রোত্থিত রাজ্যের প্রথম রাজা হইলেন শ্যামলবর্মার বংশধর 'দশরথদেব দনুজমাধবের পুত্র' যুবরাজ 'রামচন্দ্র'। 'তবকত-ই-নাসির-ই' ও 'তবকত-ই-ফিরোজসাহি'তে বিক্রমপুরের স্বাধীনরাজা 'দশরথদেব দনুজমাধবে'র পুত্র রামচন্দ্রকে নবোত্থিত চন্দ্রদ্বীপের স্বাধীন যুবরাজ বলা হইয়াছে। তাহার পরবর্তী ইতিহাস হইল 'আইন-ই-আকবর-ই' ও 'আকবর-নামা'। ইহাতে ওই বংশের রাজা বা বার ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া বলা হইয়াছে।" (পৃ. ২৫৭)

চন্দ্রদ্বীপ সম্পর্কে বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড একখানি মূল্যবান ইতিহাস লিখেছিলেন। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের ইতিহাস লিখেছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র। দটি বই-ই এখন দুষ্প্রাপ্য। বৃন্দাবনচন্দ্রের গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপ সম্পর্কে জানা যায় বহু প্রয়োজনীয় তথ্য। এই গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক বিবরণ এখানে উদ্ধৃত হল :

উৎপত্তি-বিবরণ

চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। "ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ বলেন—এখানকার সমস্ত ভূমি জলময় ছিল, মহাদেবের প্রসাদে ও তাঁহার ললাটস্থ অগ্ন্যুত্তাপে সেই জল শুষ্ক হয়। চন্দ্রচূড়ের মস্তকস্থ চন্দ্রকলার কিরণে এই দ্বীপ সিক্ত হইয়াছিল; এজন্য উহার নাম চন্দ্রদ্বীপ হইল। যথা—

চন্দ্রদ্বীপে পুরা বিপ্রাস্তোয় পূর্ণা চ ভূমিকা।
মহাদেব প্রসাদেন শুষ্কা ভূতাহি মৃত্তিকা।।
ললাটনল দাহেন বিলীনং হি জলং বহু।
স্থালী ভূতা চ পৃথিবী শৈবালাং সুখকারিকা।।
মহাদেবং মৃড়ানীচ পপৃচ্ছ সাদরান্বিতা।
পূর্ণচন্দ্রং বিহায়ৈ বধার্য্যতে শশিনঃ কলা।।
কিং নিমিত্তং ত্বয়া ধার্য্যং কিং সুখং জায়তে ততঃ।

মহাদেব উবাচ

আমাদি পৌর্ণমাস্যন্তাঃ যা এব শশিনঃ কলাঃ।
তিথয়স্তা সমাখ্যাতা ষোড়শৈব বরাননে।।
অমা ষোড়শভাগেন দেবী প্রোক্তা মহাকলাঃ।
সংহিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহ ধারিণী।।
অমানাম্নী কলামধ্যে যা বাসাং ত্বং প্রতিষ্ঠিত।

অতো হি ত্বং মমাধার্য্যা কলাকাল প্রমাথিনী।।
ত্যসা কলায়াঃ কিরণৈ সিক্তা দ্বীপা চ ভূসুরাঃ।
অতঃ প্রজাঃ কলাচন্দ্রদ্বীপে ধর্মপরায়ণাঃ।।

(ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড ১২।৮—৮ শোল্ক)।

আধুনিক বাকরগঞ্জ জেলাব দক্ষিণস্থ সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবন সংসৃষ্ট বিস্তৃত জনপদ যে প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ ছিল, তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। কালক্রমে মগ প্রভৃতি বিবিধ জাতির উপদ্রবে চন্দ্রদ্বীপের রাজা ক্রমশ এ জেলার উত্তরে আসিয়া, ক্রমান্বয়ে রাজনগর, রিশরিকাঠি, ক্ষুদ্রকাঠিতে অতি অল্প সময় বাস করিয়া, পরিশেষে হোসেনপুর এবং শেষকালে মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করেন। মাধবপাশাই শেষ রাজধানী। তথা হইতে আর রাজধানী পরিবর্তন করা হয় নাই।*

উৎপত্তি সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী

বিক্রমপুর নিবাসী চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য কাত্যায়নীর উপাসক ছিলেন। তাঁহার শৈশব হইতেই বৈরাগ্যের ভাব ছিল; ক্রমে কৈশোরে ও যৌবনে উক্ত বৈরাগ্যের ভাব পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়। তিনি তাঁহার মাতার একান্ত অনুরোধে অন্তত বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন এবং ভুবনেশ্বরী নাম্নী কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইলে, চন্দ্রশেখর তাঁদার কতিপয় জ্ঞাতি-কুটুম্ব সহিত কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। বিবাহের পূর্বে চন্দ্রশেখর তাঁহার ভাবী পত্নীর নাম জানিতেন না। দশ মহাবিদ্যার মধ্যে ভুবনেশ্বরী অন্যতম মহাবিদ্যা। শাক্ত সম্প্রদায় মধ্যে শক্তিমন্ত্রের উপাসক মাত্রেই উক্ত দশ মহাবিদ্যার যে কোন নামে দীক্ষিত হন ইহাই নিয়ম। চন্দ্রশেখর ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এদিকে সম্প্রদানকালীন পুরোহিত যেমন ভুবনেশ্বরীর নাম করিলেন, অমনি চন্দ্রশেখর জিভ্ কাটিয়া বিবাহের আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং মুহূর্ত মধ্যে দৌড়িয়া অলক্ষিতভাবে অন্তর্ধান করিলেন; চারিদিকে লোক ছুটিল, তৎকালে কেহ অনুসন্ধান করিয়া কোন খোঁজ করিতে পারিল না; বিবাহ সেই দিনের জন্য স্থগিত রহিল। বর-কন্যা উভয় পক্ষের লোকেরই সুখচ্ছবিতে বিষাদের ছায়া দেখা দিল। এদিকে চন্দ্রশেখর উক্ত বিবাহের রাত্রি কোন অলক্ষিত স্থানে অতিবাহিত করিয়া পরদিন এক গভীর অরণ্যে গিয়া, তাঁহার উপাস্য দেবীর নামে তাঁহার ভাবী পত্নীর নাম ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নিতান্ত অপরাধের কার্য হইয়াছে মনে করিয়া, ঐদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জন জন্য যাত্রা করেন। নৌকা বাহিতে ক্রমে এতদূর গিয়াছেন যে, স্থলভাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তখন জলে ঝাঁপ দিবার উদ্যোগ করিলে হঠাৎ এক ক্ষুদ্র তরণীতে একটি গৌরবর্ণা কন্যা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিতা হইল। কন্যা সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ওহে নির্বোধ ঠাকুর, জলে ঝাঁপ দিও না!" চন্দ্রশেখর ঘোর নিশীথে ভীষণ জলধি-গর্ভে হঠাৎ এবম্বিধ কন্যার আবির্ভাব দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। ক্ষণকাল আত্ম-সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে গা?" কন্যা উত্তর করিলেন—"আমি জেলের কন্যা, জাল ফেলা হইয়াছে, তাহার প্রহরীরূপে এখানে আছি" চন্দ্রশেখর বলিলেন—"তুমি আমাকে নির্বোধ বলিয়া জলে ঝাঁপ দিতে নিষেধ করিলে কেন?" কন্যা উত্তর করিল—"তোমার উপাস্য দেবীর নামে ভাবী পত্নীর নাম হইয়াছে বলিয়া তুমি ক্ষোভ ও লজ্জায় আত্ম-বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু, উহা তোমার গুরুতর ভুল। স্ত্রীলোক মাত্রেই স্বয়ং কাত্যায়নীর অংশ; সুতরাং তোমার উপাস্য দেবীর নামে ভাবী পত্নীর নাম হওয়ায় তোমার কোন পাপ বা অপরাধের কারণ

হয় নাই।" চন্দ্রশেখর বলিলেন—"আপনি সামান্যা মানবী বা জেলের কন্যা নহেন; আপনি আত্মগোপন করিতেছেন, প্রকৃত পরিচয় না দিলে আপনার সমক্ষে এই মুহুর্তেই আমি এই অতল জলে ডুবিয়া মরিব।" এই কথার উপরে কন্যা আর আত্মগোপন করিলেন না। স্নেহভরে বলিলেন—"বৎস চন্দ্রশেখর, আমিই তোমার সেই উপাস্য দেবী কাত্যায়নী। তুমি আমার আদেশানুসারে উক্ত কন্যাকেই বিবাহ কর; বরং আমার প্রতি তোমার ভক্তির ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য উক্ত পাত্রীর নাম পরিবর্তন করিয়া লও।

অদ্য হইতে সপ্তদশ দিবসে ইহার দক্ষিণাদিকস্থ ভীষণ সুগন্ধা নদীর মোহানায় সমুদ্রমধ্যে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপের ন্যায় চর পড়িবে, পরে তাহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইবে। তুমি তথায় গিয়া একটি রাজ্য স্থাপন কর; তোমার নামানুসারে উক্ত রাজ্যের নাম চন্দ্রদ্বীপ হইবে। যেস্থানে চর পড়িবে তাহার উত্তরাংশকে সুগন্ধা বলে; তুমি উহার উত্তর পাড়ে ডুব দিলে কাত্যায়নী ও মদনগোপাল মূর্তি প্রাপ্ত হইবে; ঐ মূর্তিদ্বয় তোমার রাজধানীতে স্থাপন করিবে।"

চন্দ্রশেখর দেবীর আদেশে আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বাড়ি আসিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত মাতৃদেবীর নিকট প্রকাশ করিলেন। তৎপর, ৭ম দিবসে যে বিবাহের দিন ছিল, তাহাতে উক্ত ভাবী পত্নীর নাম পরিবর্তন করিয়া ঐ নূতন নাম উল্লেখে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিলেন, এবং দেবীর আদেশানুযায়ী সপ্তদশ দিবসে সুগন্ধা নদীর নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া, প্রথম ডুবে কাত্যায়নী ও দ্বিতীয় ডুবে মদনগোপাল মূর্তি পাওয়া যাইত, এবং রাজ্যও চিরস্থায়ী হইত; কিন্তু, চন্দ্রশেখর আর ডুব দিলেন না। উক্ত মূর্তিদ্বয় এবং আপন প্রিয় শিষ্য, সঙ্গী দনুজমর্দন সহ দক্ষিণ দিকে চলিলেন এবং কতদূর অগ্রসর হইলে দেবীর কথিত দ্বীপ তাঁহাদের নেত্রগোচর হইল। তৎপর নিজ আবাসভূমি বিক্রমপুর হইতে বহুতর লোকজন আনিয়া, নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। দ্বীপের যে স্থানে রাজধানী স্থাপন করা হইল, সেই স্থানের নাম কচুয়া রাখা হইল। উহা বর্তমানে পটুয়াখালি মহকুমার অন্তঃপাতী বাউফল থানার অধীন তেঁতুলিয়া নদীর পশ্চিমপাড়ে কালাইয়ার সন্নিকটে অবস্থিত আছে; এইরূপ কিংবদন্তী যে, উক্ত দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে বৃহৎ কচুবন হইয়াছিল; তজ্জন্য সেই স্থানকে কচুয়া নামে অভিহিত করা হয়।

ঐতিহাসিক কিংবদন্তীর সহিত ভৌগোলিক তথ্যের তুলনা

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, হিমালয় বঙ্গোপসাগরের অংশ হ্রাস করিতেছে। এই কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা ভূগর্ভস্থিত স্তর ও তন্মধ্যস্থিত জল-জন্তুর অস্থি-পঞ্জর সাময়িকভাবে উহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। গত ১৩১৭ সনে মাঘ মাসে ঝালকাঠি স্টেশনাধীন হোসেনপুর গ্রামে লেখকের নূতন বাটিতে এক নাল জমির মধ্যে পুকুর খনন করিবার সময়ে সাত হাত মৃত্তিকার নীচে এক বিকট জল-জন্তুর অস্থি-পঞ্জর এবং একখানি বড় নৌকার হাতের অংশ পাওয়া গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় লেখকের অজ্ঞাতসারে নোয়াখালি নিবাসী মুসলমান কুলিগণ উক্ত জল-জন্তুর অস্থি-পঞ্জরগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু হালের ভগ্ন অংশটুকু অদ্যাপি রহিয়াছে। এই জেলায় এই প্রকার শত শত স্থানে পুকুর ও পগার নিম্নভূমি খননকালীন নৌকার তক্তা ও কাছি পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় পাইবার বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে।

প্রাকৃতিক শাস্ত্রবর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী অপরাপর দেশাপেক্ষা বঙ্গদেশে অধিকতর বিস্ময়-রসোদ্দীপক। বাকরগঞ্জে এই সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী সমধিক লক্ষিত হয়। এ জেলার উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক ক্রমশ ঢালু হইয়া চলিয়াছে। সমুদ্র হইতে উত্তর দিকে গড়ে প্রত্যেক মাইল ১০৮ ইঞ্চি উচ্চ। সুন্দরবনে চর বৃদ্ধি হইয়া এই জেলা ক্রমশ দক্ষিণে অগ্রসর

হইতেছে।

চন্দ্রশেখরের সহিত দেবীর কথোপকথন এবং চন্দ্রদ্বীপ স্থাপন বঙ্গাব্দ ৬০৬ সালে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং, ৭১৩ বৎসর পূর্বে সমগ্র বরিশাল, ফরিদপুর এবং খুলনার দক্ষিণ ভাগ অতল জলধি-জলে নিমজ্জিত ছিল, ইহা অসম্ভব নহে। তৎকালে, এই জেলার শিকারপুর, ফুল্লশ্রী ও পোনাবালিয়া এবং ফরিদপুর ও ঢাকার মধ্যে কুশদ্বীপ ও শঙ্খকোট দ্বীপ নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় দ্বীপ মাত্র অবস্থিত ছিল। ৮০০ শত বৎসর পূর্বে বঙ্গোপসাগর বিক্রমপুরের দক্ষিণ অংশেই যে গভীর গর্জন করিয়া প্রবাহিত হইত, ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়।

এই জেলার ঝালকাঠি ও গৌরনদী স্টেশনের সীমানাস্থিত রৈভদ্রদী গ্রামনিবাসী জনৈক ব্যক্তি কাশীধামে ত্রৈলঙ্গস্বামীর সহিত বহুকাল হয় দেখা করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বামীজি তাঁহার নিবাস জিজ্ঞাসা করায় তিনি রৈভদ্রদী গ্রামের উল্লেখ করেন। তদুত্তরে স্বামীজী তাহা বুঝিতে না পারিয়া "শিকারপুরের কোন্ দিকে" জিজ্ঞাসা করেন। ভদ্রলোকটি যেই বলিলেন—"শিকারপুরের দক্ষিণে", অমনি স্বামীজি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওসবও কি চর পড়িয়াছে?" উক্ত ভদ্রলোকের বাসগ্রাম রৈভদ্রদীও দ্বীপচর ছিল বলিয়াই সম্ভবত শেষাক্ষর 'দী' হইয়াছে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করা যায় না;' এতদ্ভিন্ন এ জেলার চর সংযুক্ত বহু গ্রামের নাম পাওয়া যায়। গৌরনদী স্টেশনাধীন চর সরিকল, চর জাহাপুর ইত্যাদি, ঝালকাঠিতে চর কেওতা, চর সাঙ্গর ইত্যাদি, কোতলিতে চর কাউয়া, চর বদনা, চর করমজি, চর কর্ণকাঠি ইত্যাদি, নলছিটিতে চর নলছিটি ইত্যাদি, বাকরগঞ্জে চড়াদি বা চরামদ্দী ইত্যাদি, মেহেন্দিগঞ্জে চর শ্যামরায়, চর খাগকাটা ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন ভোলা, পটুয়াখালি ও পিরোজপুরের চর সংযুক্ত গ্রামের অন্ত নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টত অনুমিত হইবে যে, ৭০০ বৎসর পূর্বে যে, এই প্রদেশ ভীষণ জলধিতলে নিমগ্ন ছিল, ইহা কিছু মাত্র আশ্চর্যের বিষয় নহে। তবে সর্বাপেক্ষা শিকারপুর গ্রামটি অতীব প্রাচীন যেহেতু তথায় দেবীর ৫১ পীঠ পতিত হইয়া বহুকাল যাবৎ উগ্রতারার মূর্তি স্থাপিত রহিয়াছে। এ জেলার ফুল্লশ্রী নিবাসী প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্ত ১৪০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ৫৩৮ বৎসর পূর্বে পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। তখন তিনি লিখিয়াছেন—

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুবে ঘণ্টেশ্বর,
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর।

উক্ত প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্তের লিখিত মতে দেখা যায়, পদ্মাপুরাণ রচনাকালীন ফুল্লশ্রী গ্রাম একটি দ্বীপে পরিণত ছিল। ফলত ফুল্লশ্রী এবং শিকারপুর যে তৎকালীন উত্তাল তরঙ্গময়ী জলধির মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে উহার চতুর্দিকস্থ নদীর অবস্থা বিল-উৎপত্তির পূর্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঘণ্টেশ্বর নদী চরা পড়িয়া মাত্র সায়েস্তাবাদের উত্তরাংশে জাহাপুরের নদী বর্তমান আছে। পশ্চিমে ঘাঘর বা ঘর্ঘরা নদীও খালে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণ কবির গুপ্তের পদ্মাপুরাণ কথিত, ঘাঘর নদীর উপর দিয়া পুরাপ্রসিদ্ধ নবাব-অনুচর ছবিখাঁ এক প্রকাণ্ড জাঙ্গাল বান্ধিয়াছিলেন; বর্তমানে ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড উক্ত জাঙ্গাল মেরামত করিয়া গৈলা হইতে আমবৌলার মধ্য দিয়া ঘাঘর পর্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন। এদিকেও ঘণ্টেশ্বরের নদীর মধ্য দিয়া জাহাপুরঘাট পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, দেবীর আদেশে এত বড় একটা প্রকাণ্ড চর পড়িয়া তাহা একটি বিশাল রাজ্যে পরিণত হইল, ইহা সম্ভবপব নহে। উহা প্রকৃতই কাল্পনিক ও কিংবদন্তী; কিন্তু, এই জেলার ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে ইহা কিছুতেই অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ৭০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ইলসা বা তেঁতুলিয়া, মাসকাটা, কালাবদর, মুলাদি ও জাহাপুরের নদী

এবং পিরোজপুরের কালীগঙ্গা, কচা, ও কোটালিপাড়ার ঘাঘর নদী যে একমাত্র সুগন্ধা নামেই প্রকাণ্ড নদীর মধ্যে ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। ভীষণ সুগন্ধা নদী মধ্যে ফুল্লশ্রী, শিকারপুর এবং পোনাবালিয়া বহুকাল পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাকারে অবস্থিত ছিল। কালক্রমে সমস্ত চর জাগিয়া এ জেলার সদর বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। জাহাপুরের চর এত নূতন যে, ১২১৯ সনে মাত্র উহা বন্দোবস্তের উপযুক্ত নির্ধারিত হইয়া বন্দোবস্ত হয়। সুগন্ধার পশ্চিমদিকের ব্রাহ্মণদিগকে এখনও সোন্ধারকুলি বলে, এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রণ সময়ে বাক্‌লা, বাঙ্গরোরা ও সোন্ধারকুলি নামে অদ্যাপি অভিহিত করিয়া থাকে। অতএব চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী এবং দেবীর আদেশ প্রভৃতি কথা গুলি আছে, তাহা যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে, তাহা ভৌগোলিক তথ্য দ্বারাও প্রতিপন্ন হইল।

বাকলা চন্দ্রদ্বীপের খারিজা পরগনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) গিধি বন্দর (বরিশাল টাউন), (২) বোজরগউমেদপুর, (৩) হাবেলি সেলিমাবাদ, (৪) হাবেলি, (৫) ইদিলপুর, (৬) নাজিরপুর, (৭) রত্নদি কালিকাপুর, (৮) কৃষ্ণদেবপুর, (৯) রামহরিচর, (১০) কল্‌মিচর, (১১) সুলতানাবাদ, (১২) জাফরাবাদ রফিয়ানগর, (১৩) খাঞ্জাবাহাদুর নগর, (১৪) আবদুল্লাপুর, (১৫) আজিমপুর, (১৬) ইদ্রাক্‌পুর, (১৭) রসুলপুর, (১৮) বঙারোড়া, (১৯) কোটালিপাড়া, (২০) জালালপুর, (২১) হবিবপুর, (২২) সায়েস্তাবাদ, (২৩) সায়েস্তানগর, (২৪) কাদিরাবাদ, (২৫) কাশিমপুর শেলাপট্টি, (২৬) মাদারিপুর (২৭) রামনগর, (২৮) সফিপুরকালা, (২৯) আমিরাবাদ, (৩০) বীরমোহন, (৩১) গোপালপুর, (৩২) দুর্গাপুর, (৩৩) সাহাজাদপুর, (৩৪) বৈকুণ্ঠপুর, (৩৫) আওরঙ্গপুর, (৩৬) গোপীনাথপুর, (৩৭) সৈদপুর, (৩৮) নাজিরপুর।

উক্ত পরগনা সমূহের মধ্যে কোটালিপাড়া, মাদারিপুর, গোপীনাথপুর এই তিনটি পরগনা সম্পূর্ণ ফরিদপুর কালেক্টরির তৌজিভুক্ত হইয়াছে এবং বৈকুণ্ঠপুর, আমিরাবাদ, সফিপুরকালা, কাশিমপুর, শেলাপট্টি, রামনগর, কাদিরাবাদ, জালালপুর, ইদ্রাক্‌পুর, রসুলপুর, ইদিলপুর, হবিবপুর—বরিশাল ও ফরিদপুব উভয় জেলার কালেক্টবিতে ঐ সকল পরগনার রাজস্ব দাখিল হইয়া থাকে এবং ঐ সকল পরগনার জমিগুলি উভয় জেলায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

হাবেলি সেলিমাবাদের রাজস্ব বরিশাল ও খুলনা জেলার কালেক্টরিতে দাখিল হইয়া থাকে এবং উক্ত পরগনার জমিসমূহ বরিশাল ও খুলনা জেলাভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

উক্ত পরগনাগুলির অধিকাংশ নামই মুসলমান নামের আদ্যক্ষর বা সম্পূর্ণ যথা—সায়েস্তানগর, সায়েস্তাবাদ, আলিনগর, রসুলপুর, সফীপুব বোজরোগ, উমেদপুর, আবদুল্লাপুর ইত্যাদি এবং এই সকল নাম তৎকালীন স্থানীয় গভর্নর বা স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোকের নামে সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। চন্দ্রদ্বীপের রাজার যখন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, তখন জনসংখ্যা ও লোকের বসতি খুব কম ছিল এবং উপরোক্ত পরগনার অধিকাংশের অন্তর্গত জমিগুলি বিলঝিলে পরিণত ছিল এবং উহা অল্পসংখ্যক বাসোপযোগী হইয়াছিল। তৎপর রাজার অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইতে আরম্ভ হওয়ায় উক্ত পরগনার সৃষ্টিকারী কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদাব ভাবে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহানুভব লর্ড কর্নওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তাহার কিছু পূর্ব হইতে যখন জমিদাবি বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়, তখন ঐ সকল পরগনার স্থান নিয়া তত্তৎ স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ লর্ড কর্নওয়ালিসের সহিত বন্দোবস্ত করেন। তখন চন্দ্রদ্বীপের নাবালক রাজা জয়নারায়ণের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীগণ আপন আপন উদর

পূরণের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। নাবালক রাজার দিকে তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া জমিদারি রক্ষা করিবার কোন উপযুক্ত লোক ছিল না ; সুতরাং চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য হইতে খারিজ হইয়া উল্লিখিত বহু পরগনা স্বাতন্ত্র্য বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বর্তমান সময় যাঁহারা এই বৃত্তান্ত পাঠ করিবেন, তাঁহারা হয়ত মনে করিবেন যে, উহা লেখকের কল্পনা এবং একদেশদর্শিতামূলক উক্তি, বস্তুত তাহা নহে। পরগনা সৃজন সময় যে সকল বন্দোবস্ত রোবকারী লিখিত হইয়াছে, তাহা বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা ও খুলনার কালেক্টরিতে অদ্যাপি বর্তমান আছে ; তাহা দৃষ্ট করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। উহার প্রত্যেক নূতন পরগনার সঙ্গেই গয়রহ্ শব্দ সংযোগ করার আদেশ আছে। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, কোটালিপাড়া, ইদিলপুব ও বোজরগউম্মেদপুর পরগনাত্রয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহু পূর্বে চন্দ্রদ্বীপ হইতে খারিজ হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। ঐ সকল পরগনাগুলি ছোট বড় উভয় প্রকার ছিল ; কারণ পরগনা সৃষ্টির সময় উহার তৎকালীন ভূম্যধিকারী যে প্রকার প্রবল ও ক্ষুদ্র ছিলেন, পরগনাও তদ্রূপ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হইয়াছিল ; অমরাপুর নামে একটি পরগনা সৃষ্টি হইযাছিল, তাহা বর্তমানে খাসমহলভুক্ত আছে ; উহা এত ক্ষুদ্র যে উহার সরকারি রাজস্ব বার্ষিক ৭ টাকা দু আনা মাত্র।

খারিজা তালুক

মহানুভব লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক জমিদারি বন্দোবস্ত হইলে, পরে জমিদারির নিম্নস্থ হকিয়তাদারগণ জমিদারের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তিপ্রয়াসে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সহিত হকিয়তগুলি বন্দোবস্ত করিয়া খাস গভর্নমেন্টের অধীনে থাকার প্রার্থনা করিলেন, সদাশয় গভর্নমেন্ট তাহাদের প্রার্থনাও উপেক্ষা করিলেন না। উক্ত মধ্যস্বত্বাধীকারিগণের রাজস্ব তদুপরিস্থ জমিদারি হইতে বাদ দিয়া তালুক, ওসত তালুক, নিম ওসত তালুক, এমন কি হাওলা স্বত্বের মালিকানা সহিতও বন্দোবস্ত করিলেন। বরিশাল কালেক্টরিতে ২০৪৬নং তৌজিতে হাওলা তিহাই নামে একটি মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, উহা উদাহরণ স্বরূপ এখানে প্রদত্ত হইল। এই প্রকারে প্রত্যেক পরগনা হইতেই বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, ইহাকেই বর্তমানে খারিজা তালুক ও খারিজা হাওলা বলে। বরিশাল কালেক্টরির অধীন যত পরগনা আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গারোড়া পরগনায় যত মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এতগুলি আর কোন পরগনায় দৃষ্ট হয় না। বাঙারোড়া পরগনাটি সম্পূর্ণ বর্তমান গৌরনদী থানার অন্তর্গত। এই পরগনায় ৯৩৯ খানি খারিজ তালুক সৃষ্টি হইয়াছিল। গৈলা গ্রামের লপ্ত মানসী গ্রামে একখানি খারিজ তালুক আছে, তাহার সরকারি রাজস্ব এক আনা ৪ পাই মাত্র ; এই তালুকের অন্তর্গত জমি সবেমাত্র অর্ধকানি পরিমিত একখানি তালভিটা, ইহাতে বহুকালের কয়েকটি তালবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। বাঙারোড়া পরগনার জমিদারির বার্ষিক সদর রাজস্ব ৩৬৫।৶৹।। পাই এবং ৯৩৯ খানি খারিজা তালুকের বার্ষিক সদর রাজস্ব ২০৭২৪৶ পাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সম্ভবত এ জেলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গৌরনদী থানার লোকসমূহ সমধিক শিক্ষিত ছিল ; এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক বন্দোবস্ত দ্বারাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙারোড়া পরগনার পরে বোজরগ উমেদপুর পরগনার অধীন ৪০৭ খানি, উত্তর সাহাবাজপুর পরগনার অধীন ২৯৪ খানি, ইদিলপুরের অধীন ১১৯ খানি এবং সায়েস্তানগরের অধীন ১৬১ খানি খারিজা তালুক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বর্তমান চন্দ্রদ্বীপ পরগনার মালিকগণের পরিচয়

আধুনিক চন্দ্রদ্বীপ পরগনা বাকরগঞ্জ কালেক্টরির তিনটি তৌজির অধীন ; যথা—১৭২০ নং হিস্যে ।।১২।। ক্রান্তি, ১৭২১-১৭২২ হিস্যে ।/১০ আনি এবং ১৭২৩ হিস্যে /১৭।/ ক্রান্তি। এই তিনটি তৌজির মধ্যে মধ্যে ১৭২০ নং তৌজির মালিক মাধবপাশা নিবাসী সাহাজাতীয় বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরি গং, ১৭২১, ১৭২২ নং তৌজির মালিক কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট সি আই ই এবং ফরিদপুর জেলার অধীন বাইশরশিব জমিদার শ্রীযুক্ত কামিনীসুন্দরী চৌধুরানি ও শ্রীযুক্ত শিবসুন্দরী চৌধুরানি এবং ১৭২৩ নং তৌজির মালিক বরিশাল টাউনের জমিদার বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্মন ; উক্ত তৌজিত্রয়ের মালিকানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৭২০ নং তৌজী

এই তৌজির যোল আনি রকমের হিস্যে ।।১২।। ক্রান্তির অংশে নিম্নলিখিত মালিকগণ বর্তমান আছেন।

(১) বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরি জমিদার মাধবপাশা হিং	।১৫ গণ্ডা।
(২) বাবু হীরালাল রায় চৌধুরি ,, ,,	।১৫ গণ্ডা।
(৩) সারদাসুন্দরী চৌধুরানী স্বামী মৃত গুরুদাস সাহা চৌধুরি স্থলে বর্তমান দখিলকার শচীনাথ সাহা হাল সাকিন বরিশাল পূর্ব মালিক কালীকুমার রায় চৌধুরি হইতে প্রাপ্ত ...	/৭।। গণ্ডা।
(৪) বাবু বিরাজমোহন রায় চৌধুরি এবং তাঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয় হাল সাকিন বরিশাল, শ্রীনাথ রায় চৌধুরি হইতে প্রাপ্ত	/৫ গণ্ডা।
(৫) শ্যামলাল রায় চৌধুরি জমিদার মাধবপাশা . .	/০ আনি।
(৬) বাবু রাধারমণ রায় চৌধুরি এবং তাঁহার মাতা ভাগ্যবতী চৌধুরাণী জমিদার মাধবপাশা	১০ গণ্ডা।
(৭) নিস্তারিণী চৌধুরানী জমিদার মাধবপাশা	১০ গণ্ডা।
(৮) মৌলবি এ কে ফজলুল হক্ এম্ এ বি এল, এবং মৌলবি মহম্মদ এসমাইল খাঁ চৌধুরি চড়ামদ্দী	/৭।। গণ্ডা।
	১ টাকা

মাধবপাশার সাহা জমিদার

মাধবপাশা নিবাসী বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরি এবং হীরালাল রায় চৌধুরি ও বাবু শ্যামলাল রায় চৌধুরির পূর্বাধিকারী পরলোকগত রামমাণিক্য সাহা চৌধুরি ১২০৬ সালে ঢাকার কালেক্টরির নিলামে আধুনিক চন্দ্রদ্বীপ পরগনার ।১২।।। ক্রান্তি অংশ খরিদ করেন। উক্ত রামমাণিক্য সাহা হইতে তাঁহার অধস্তন বংশধরগণের নিম্নলিখিত বংশপত্রিকা দেওয়া গেল। রামমাণিক্যের অপর ভ্রাতৃত্রয়ের নাম—(২) রঘুনাথ, (৩) রাধাকৃষ্ণ, (৪) শ্যামরাম। রামমাণিক্যের দুই পুত্র—(১) রামকানাই, (২) বলরাম। রামকানাইয়ের পুত্র গুরুদাস ও দীনবন্ধু। গুরুদাসের পুত্র কালীকুমার এবং দীনবন্ধুর পুত্র রাজকুমার ; রাজকুমারের পুত্র বিহারীলাল রায় চৌধুরি। বলরামের দুই পুত্র গোপাল ও গোবিন্দ। গোপালের পুত্র দ্বারকানাথ, রাধামাধব ও ব্রজনাথ। গোবিন্দের পুত্র প্যারীমোহন ; প্যারিমোহনের পুত্র শ্যামলাল রায় চৌধুরি। রামমাণিক্যের ভ্রাতা রঘুনাথের

চারিপুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। তন্মধ্যে রাম, লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন নিঃসন্তান। ভরতের পুত্র রাজবল্লভ ; তৎপুত্র মধুসূদন, তৎপুত্র হীরালাল রায় চৌধুরি। রামমাণিক্যের অপর ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণের পুত্র গৌরকিশোর, তৎপুত্র শ্রীনাথ, তৎপুত্র গোলকনাথ রায় চৌধুরি। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামরামের পুত্র মধুরানাথ, তৎপুত্র বর্তমান বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরি। উক্ত রাজকুমার রায় চৌধুরীর অংশ নিলাম হইলে, হাইকোর্টের উকিল মৌলবি এ কে ফজলুল হক এম এ বি এল এবং চড়ামদ্দীর জমিদার মৌলবী মহম্মদ ইসমাইল খাঁ চৌধুরি খরিদ করেন। শ্রীযুক্ত নিস্তারিণী চৌধুরানী পরলোকগত রাজবল্লভ রায় চৌধুরির কন্যা ; ইনি গোলকনাথ রায়ের অংশ হইতে জমিদারির ১০ অর্ধ আনা অংশ খরিদ করিয়াছেন। সারদাসুন্দরী চৌধুরাণী পরলোকগত কালীকুমার রায় চৌধুরীর অংশ খবিদ করিয়াছেন। বাবু বিরাজমোহন রায় চৌধুরি এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় বাবু নলিনীমোহন রায় চৌধুরি ও রমণীমোহন রায়চৌধুরি—ফরিদপুর জেলার অধীন উলপুর নিবাসী বরিশালের ভূতপূর্ব স্বনামপ্রসিদ্ধ উকিল পরলোকগত নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশযের পুত্র, তাঁহারা গোলোকনাথ বাবুর অংশ হইতে চন্দ্রদ্বীপেব ৫ গণ্ডা অংশ খবিদ করেন। বিরাজবাবু বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারি এবং বরিশাল টাউনের সকল শ্রেণির লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ; ইনি নিঃস্বার্থভাবে বরিশাল টাউনের কল্যাণ কামনায় অনধিক ১৫ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারির কার্য করিয়া আসিতেছেন।

মাধবপাশা রাজবাড়ির উত্তর দিকে রামমাণিক্য সাহা চৌধুরির বাড়ি। এই বাড়িতে বৃহৎ বৃহৎ দ্বিতল ইষ্টকালয় ও দেবমন্দির নির্মাণ করিয়া এই সাহা জমিদারগণ বসতি করিতেছেন। বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরিব পিতামহী পবলোকগতা পার্বতী চৌধুরানী সাধারণের কষ্ট অপনোদন জন্য মাধবপাশা হইতে বরিশাল পর্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন ; অদ্যাপি ঐ রাস্তাকে 'পার্বতী চৌধুরানীর রাস্তা' বলিযা থাকে। ঐ রাস্তা বর্তমানে বাকরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টবোর্ড গ্রহণ করিয়া মেরামত কবত ইহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। পার্বতী চৌধুরানী হিন্দুর পবিত্র তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনধামে এক দেবমন্দির নির্মাণ কবিয়া তথায় কালাচাঁদ নামে একটি বিগ্রহ স্থাপন করিযাছেন এবং একটি কৃত্রিম কুঞ্জবন নির্মাণ করিয়াছিলেন ; অদ্যাপি তথায় তৎকৃত অতিথিশালা ও উক্ত বিগ্রহের অর্চনা চলিতেছে। তিনি বৃন্দাবনধামে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া তথায় মানবলীলা সংবরণ করেন। মাধবপাশাতে পার্বতী চৌধুরানী কাষ্ঠ-নির্মিত কারুকার্য সমান্বিত ২৪ চাকাবিশিষ্ট একখানি রথ প্রস্তুত করিয়া তাহা চালাইতেন। তাঁহার লোকান্তরেও কিছুদিন উক্ত রথের অস্তিত্ব ছিল ; কিন্তু রাজকুমার বাবুর বিবাহের সময় উক্ত রথগৃহে বাজির আগুন পড়িয়া রথখানি ভস্মীভূত হইয়া যায়। রামমাণিক্য সাহা একজন পরদুঃখকাতর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণের কষ্টের কথা অবগত হইয়া বহু অর্থ ব্যয়ে বরিশালের পূর্বদিকে সাহেবের হাট হইতে উটমপুরের নদী পর্যন্ত একটি ভারানি খাল কাটাইয়া দিয়াছিলেন ; লোকে অদ্যাপি এই খালটিকে 'রামমাণিক্যের ভারানি' বলিয়া থাকে। সাম্প্রতিক এই খালটি মজিয়া যাওয়ায়, স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বহু অর্থ ব্যয় করিযা পুনরায় উক্ত খালটির পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। রাধাচরণ বাবুর বাড়ি হইতে প্রতি বৎসর দুর্গাসাগরের উত্তর পাড়ে চৈত্র বৈশাখ মাসে পথক্লিষ্ট পথিকগণের কষ্ট প্রশমনার্থে জলছত্র দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে পথিকগণ প্রত্যেকে আহার্যার্থ এক গ্লাস জল, কিছু মিষ্ট ও কিছু ফল পাইয়া থাকেন ; উহাতে ঘর্মাক্ত কলেবর পথিকের ক্ষণিক ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে। উক্ত জমিদারবাড়িতে একটি পোস্টাফিস ও একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত আছে। ইঁহাদের বাড়ি বার মাসে তের পার্বণ হয়। বাবু রাধাচরণ রায়চৌধুরি প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে একটি নিয়ম-সেবার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন. তাহাতে একমাসকাল বহু বৈষ্ণব ও কাঙ্গালি ভোজন করিয়া থাকে।

তৌজি নম্বর ১৭২১—১৭২২

উল্লিখিত দুই তৌজির মালিক রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অংশ বর্তমানে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের শাসনাধীন আছে। জেলা চব্বিশ পরগনার কালেক্টর সাহেব কর্তৃক নিযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস বর্তমান ঠাকুর ওয়ার্ড স্টেটের ম্যানেজার, ১৭২১ ও ১৭২২ নং তৌজির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বঙ্গাব্দ ১২০২ সালে চন্দ্রদ্বীপের রকম ⁄১২।। গণ্ডা অংশ নিলাম হইলে মিঃ জন্ পেনেটি খরিদ করেন, তাহা নিয়া ১৭২১ নং তৌজি গঠিত হয়। ১২০৪ ⁄১৭।। গণ্ডা অংশ উক্ত পেনেটি সাহেব খরিদ করেন, তদ্দারা ১৭২২ নং তৌজি গঠিত হয়। উক্ত নিলাম খরিদের পরে পেনেটি সাহেবের ওযারিসসূত্রে তদীয় দৌহিত্র ফুলি সাহেব উক্ত ।১০ আনি অংশের যোল আনি রকমের ।।১৩। ক্রান্তি অংশ প্রাপ্ত হন। মিঃ পেনেটি সাহেব ভাগ্যকুল নিবাসী বর্তমান রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের পূর্বপুরুষ মথুরামোহন রায়ের সরকারে কতক দেনা ছিলেন, উক্ত দেনার দায়ে উক্ত মথুরামোহন রায় হিস্যে ।⁄১৩।। ক্রান্তি অংশ নিলাম খরিদ করেন। উক্ত ফুলি সাহেবের ।।১৩।০ ক্রান্তি অংশ হইতে নিকলিস কালানুস সাহেব ১৭।।।।১০ দন্তি অংশ প্রাপ্ত হন ; পরে ঐ অংশ বাইশরশির জমিদার নীলকণ্ঠ বাবু ও বৈকুণ্ঠরাম বাবু খোদ খরিদ করেন। উক্ত ১৭।।।।১০ ডিসিম অংশ বাদে বাকি।।⁄২।৭০ ডিসিম অংশ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিঃ জন্ পেনেটী ও মিঃ ফুলী সাহেব এবং মথুরামোহন রায় হইতে খরিদ করেন। উক্ত দুই তৌজির অন্যতম স্বত্বাধিকারিণী শ্রীযুক্ত কামিনী সুন্দরী চৌধুরানি এবং শ্রীযুক্তা মঞ্জুরী চৌধুরানি ফরিদপুর জেলার অধীন বাইশরশি নিবাসী পরলোকগত স্বনামপ্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠ রায়চৌধুরির পুত্রবধূ এবং শ্রীযুক্তা শিবসুন্দরী চৌধুরানি উক্ত বাইশরশি নিবাসী পরলোকগত বৈকুণ্ঠরাম রায়চৌধুরির পুত্রবধূ। বরিশাল জেলায় ইঁহারা প্রসিদ্ধ জমিদার বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের বরিশালস্থ জমিদারির আয় লক্ষ টাকার উপরে হইবে। পটুয়াখালি মহকুমার অধীনে বাউফলে ইঁহাদের সদর কাছারি সংস্থাপিত আছে ; এজন্য ইঁহাদের বরিশালস্থ জমিদারিকে বাউফল স্টেট বলিয়া থাকে।

১৭২৩ নং তৌজি

বরিশাল টাউনের জমিদার বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্মনের পূর্বাধিকারী পরলোকগত বাবু দলসিংহ বর্মন বঙ্গাব্দ ১২০০ সালের শেষভাগে ঢাকা কালেক্টরির প্রথম নিলামে বর্তমান চন্দ্রদ্বীপ পরগনার ।১৭।।। ক্রান্তি অংশ খরিদ করেন। তৎকালীন বাকরগঞ্জ জেলার সৃষ্টি হয় নাই। বাবু দলসিংহ বর্মন চাকরি উপলক্ষে পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন।[৩৫] তিনি প্রথমত উত্তর বঙ্গের নাটোর রাজসরকারে মুন্সিসরকারের পদ গ্রহণ করেন এবং তথায় চাকরি উপলক্ষে লগ্নি ও জহরতের ব্যবসা আরম্ভ করেন। তৎপর তথা হইতে উক্ত কারবার উঠাইয়া ঢাকায় আসিয়া উয়াড়িতে এক বৃহৎ হাবেলি প্রস্তুত করেন ; অদ্যাপি ঢাকাতে উক্ত হাবেলি 'দলসিংহ বাবুর হাবেলি' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১২০০ সালে তিনি চন্দ্রদ্বীপের জমিদারি খরিদ করেন। ক্রমে বাবু দলসিংহ বর্মন, বাবু গোপালকৃষ্ণ বর্মন, রানী গোলাপ দেবী, রানী সর্বমঙ্গলা দেবী, বাবু রাজকৃষ্ণ বর্মন, বাবু নিরঞ্জনপ্রসাদ বর্মন জমিদারি শাসন করিয়া গিয়াছেন। বাবু নিরঞ্জনপ্রসাদের পরে তাঁহার সহধর্মিণী রানী শিবদেহী এবং তৎপরে রানী জ্বালাদেহী বর্মনী জমিদারি শাসন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্মনের শাসনাধীনে উক্ত জমিদারি ন্যস্ত আছে। দলসিংহ বর্মন হইতে আটজন উত্তরাধিকারী দ্বারা ইঁহাদের জমিদারির শাসন চলিয়া আসিতেছে। নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ; যথা—(১) দলসিংহ বর্মন, (২) রানি গোলাপ দেবী (স্বামী মৃত দলসিংহ বর্মন), (৩) রানি মঙ্গলা দেবী, পিতা মৃত দলসিংহ বর্মন (স্বামী মৃত বিশ্বেশ্বর বর্মন), (৪) বাবু রাজকৃষ্ণ বর্মন (রানি মঙ্গলা কর্তৃক গৃহীত দত্তক), (৫) রানি গঙ্গাদেবী (স্বামী মৃত রাজকৃষ্ণ বর্মন), (৬) বাবু

নিরঞ্জনপ্রসাদ বর্মন (রানী গঙ্গাদেবীর গৃহীত দত্তক), (৭) রানী শিবদেহী (স্বামী মৃত নিরঞ্জনপ্রসাদ বর্মন), (৮) বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্মন (উইলসূত্রে প্রাপ্ত)।

বিক্রমপুর ভরাকৈর নিবাসী মল্লিক পরিবারস্থ পরলোকগত গঙ্গাপ্রসাদ মল্লিক, তৎপুত্র ঈশানচন্দ্র মল্লিক, তৎপুত্র কালীপ্রসন্ন মল্লিক পুরুষানুক্রমে বহুদিন দেওয়ানের কার্য করিয়া গিয়াছেন। পাঞ্জাব নিবাসী বাবু বক্তারলাল সিংহ বর্তমানে এই দেওয়ানের কার্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি একজন স্বধর্মনিষ্ঠ, কার্যদক্ষ, বিনয়ী এবং বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি। বর্তমানে ইঁহার চেষ্টা ও যত্নেই এই স্টেট এক্ষণতক্ বজায় আছে। বাকরগঞ্জ স্টেশনাধীন চড়াদিতে ইঁহাদের এক কাছারি বাড়ি আছে। এখানে রানী গোলাপদেবীর নামানুসারে একখানি পুরাতন হাট আছে, এজন্য এ স্থানকে 'রানীর-হাট' বলে এবং স্থানীয় পোস্টাফিসের নামও রানীর-হাট বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। বরিশালের বাজারও এই জমিদারিরই অন্তর্গত। বরিশালের কাছারি বাড়িতে' কালীর মন্দির আছে। প্রত্যহ সরকারি ব্যয়ে এখানে পূজা, অর্চনা ও ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে।

দনুজমর্দন ও চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য

"পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা গণেশের মৃত্যুর পর যখন রাজ্য মধ্যে গোলযোগ চলিতেছিল, সেই সময় দনুজমর্দন দেব নামক অন্য এক হিন্দু রাজা বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলে চন্দ্রদ্বীপ নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। দনুজমর্দন দেবের যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বঙ্গাক্ষরে লিখিত। ইহার পূর্বে বাংলা ভাষায় কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী একস্থানে হলকর্ষণের সময় অনুরূপ দুইটি মুদ্রা পাওয়া যায়। উক্ত মুদ্রার একটি মহেন্দ্র দেব নামীয় এবং অপরটি দনুজমর্দন দেবের। উভয় মুদ্রা গোলাকৃতি।...

রাজা দনুজমর্দন দেবের মুদ্রার ওজন প্রায় ১৬৭ গ্রেন, পরিধি পৌনে চার ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "শ্রীশ্রীদনুজমর্দন দেব" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "শ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ পাণ্ডুনগর শকাব্দ (...) ৩৩৯।" সুন্দরবন অঞ্চলে খোলপেটুয়া নদী তীরে একটি কবর খননকালে ১৯১১ খৃস্টাব্দে দনুজমর্দনের একটি মুদ্রা পাওয়া যায়। উক্ত মুদ্রা গোলাকৃতি। ওজন ১৬০ গ্রেন। প্রথম পৃষ্ঠায় বাংলা অক্ষরে "শ্রীদনুজমর্দন দেব", দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "শ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ শকাব্দ ১৩৩৯ চন্দ্র দ্ব (...) প।" ১৩৩৯ শকাব্দ অথবা ১৪১৭ খৃস্টাব্দ হইবে। পূর্বোক্ত দুইটি মুদ্রার ১ সহস্রাংকটি কাটিয়া গিয়াছে। অতএব মহেন্দ্র দেবের মুদ্রায় ৩৩৬ শকাব্দ স্থলে ১৩৩৬ শকাব্দ এবং দনুজমর্দনের অপর মুদ্রায় ৩৩৯ স্থলে ১৩৩৯ শকাব্দ বা ১৪১৪ খৃস্টাব্দ হইবে। উপরোক্ত তিনটি মুদ্রা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে মহেন্দ্র দেবের পর দনুজমর্দন দেব পাণ্ডুয়ার রাজ সিংহাসনে আরোহন করেন।...দনুজমর্দনের মুদ্রায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাজ্যারোহণের অল্পদিন পরেই পাণ্ডুনগর ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে নূতন রাজ্য স্থাপন করত মুদ্রা প্রচার করেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় তখন রাজ্যারোহণ ব্যাপারে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও নরহত্যা চলিত। সম্ভবত এইরূপ সংকট এড়াইবার জন্য তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করেন। মিঃ স্টেপেলটন দনুজমর্দন দেবের বহু রজত মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাগুলিতে উপরোক্ত কথা লিখিত আছে।" (সুন্দরবনের ইতিহাস, এ. এফ. এম. আবদুল জলিল পৃ. ৩০২-৩০৩)

দনুজমর্দন দেব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ডঃ এনামুল হক, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, বিভারিজ, রোহিণীকুমার সেন, খোসালচন্দ্র রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায় প্রত্যেকের অভিমত বিশ্লেষণ করে এ. এফ. এম. জলিল লিখেছেন ঃ "রাজা গণেশ মুসলমানদের বিশেষ সমীহ করিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতেন। তৎপুত্র যদু স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম

গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করেন কিন্তু মহেন্দ্র দেবের সিংহাসন কণ্টকাকীর্ণ ছিল, তাহার অকালমৃত্যুই উহার অকাট্য প্রমাণ। দনুজমর্দন দেব পাণ্ডু নগরে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অক্ষম হইয়া রাজধানী ত্যাগ করেন। কি অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে পাণ্ডুয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহার কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সে যুগে মধ্যে মধ্যে হিন্দু সামন্ত রাজগণ বিদ্রোহী হইয়া রাজদণ্ড হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মুসলমানদের বিক্রম তাঁহাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা ধূলিসাৎ করিয়া দিত। গণেশ কিছুকাল হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন কিন্তু তৎপুত্র জালালউদ্দীন (যদু) পিতৃনীতির বিপরীত কাজ করিতে আরম্ভ করেন। মহেন্দ্রদেব সুখে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তৎপুত্র দনুজমর্দন সম্ভবত ভয়সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে রাজ্যারোহণ করিয়া পাণ্ডুয়া হইতে বড় এক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিয়া তুষ্ট থাকেন। ইহাই দনুজমর্দন দেব কর্তৃক চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত।" (সুন্দরবনের ইতিহাস। পৃ. ৩০৮)

এই চন্দ্রদ্বীপ সম্পর্কেও নানা মত রয়েছে। প্রবাদ, দনুজমর্দনের গুরু ছিলেন বন্দ্যবংশীয় চন্দ্রাচার্য। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে দনুজমর্দন সমুদ্রোপকূলের এই দ্বীপে এসে বসবাস শুরু করেন। গুরুর নামেই দ্বীপটির নাম হয় চন্দ্রদ্বীপ। কিন্তু নীহাররঞ্জন রায় বলেন, চন্দ্রদ্বীপ নাম ছিল আগে থেকেই। তিনি লিখেছেন ঃ "...আমরা শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেবের প্রসঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ দেখিযাছি (দশম-একাদশ শতক)। ১০১৫ খ্রিস্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপিতেও চন্দ্রদ্বীপের তারামূর্তি ও মন্দিরের ইঙ্গিত আছে। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য-পরিষদ-লিপিতেও বোধহয় চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে (ত্রয়োদশ শতক); এই চন্দ্রদ্বীপের ঘাঘরকাট্টিপাটিক নিশ্চয়ই ঘাঘরনদীর তীরবর্তী ঘাঘরকাটি-নামক কোনও গ্রাম (বরিশাল জেলার ঝালকাটি প্রভৃতি কাটি-পদান্ত নাম লক্ষণীয়); এই ঘাঘরনদীর তীরেই ফুল্লশ্রী গ্রামে মনসার পাঁচালীর কবি বিজয় গুপ্তের (পঞ্চদশ শতক) বাসভূমি ছিল।

"পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত-নগর।।
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়।।

মধ্য যুগে চন্দ্রদ্বীপ সুপ্রসিদ্ধ স্থান। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের বাক্‌লা পরগনার বাক্‌লা সরকার (বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলায়) আর চন্দ্রদ্বীপ একই স্থান বলিয়া বহুদিনই স্বীকৃত হইয়াছে। এই চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চল যে অন্তত ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাতো আগেই দেখিয়াছি।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব—নীহাররঞ্জন রায়। দে'জ সংস্করণ। পৃ. ১১২-১১৩)

নীহাররঞ্জন আরো লিখেছেন ঃ "ঢাকা জেলার রামপাল ও ধুল্লা, ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর এবং কেদারপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত চারিটি লিপি হইতে এক চন্দ্র রাজবংশের চারিজন রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে ঃ পূর্ণচন্দ্র, পুত্র সুবর্ণচন্দ্র, মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র (পত্নী শ্রীকাঞ্চনা) এবং পুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র। সুবর্ণচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী। ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও শ্রীচন্দ্র হরিকেলে অধিপতি ছিলেন এবং চন্দ্রদ্বীপ (বাকরগঞ্জ জেলা) ছিল তাঁহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র। লিপি-প্রমাণ হইতে মনে হয়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চল ইঁহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব—নীহাররঞ্জন রায়। দে'জ সংস্করণ পৃ. ৩৮৯-৩৯০।)

বরিশালের উপভাষা

বাংলাদেশের বাকরগঞ্জ জেলা অখণ্ড বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত জনপদ হিসাবে পরিচিত ছিল। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্রে জেলার এক ভিন্নতর স্বরূপ আজও আমাদের অভিভূত করে। ভাষা উচ্চারণে এই জেলার স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে মনে রাখার মত। আগ্রহী পাঠকদের জন্য এখানে মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের একটি রচনা উদ্ধৃত হল : ''কাবুলিওয়ালা গল্পের মিনি বলছিল, রামদয়াল দরোয়ান কিচ্ছু জানে না, সে কাককে বলে কৌয়া। ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে মিনিকে জ্ঞানদান করতে চেয়েছিলেন তার বাবা, কিন্তু সেদিকে মিনির মন ছিল না। তখন যদি মিনিকে নিয়ে তার বাবা বরিশাল যেতে পারতেন, মেয়েকে অবাক করে দিতে পারতেন। ওখানে গোটা জেলার লোকই কাককে বলে কাউয়া। শুধু কাককে কাউয়া নয়; তারা পায়রাকে বলে কৈতের, ছারপোকাকে বলে উবাস, আরশোলাকে বলে তেলাচোরা। মিনি হয়তো শোনে নি, রামদয়াল দরোয়ানও পায়রাকে বলে কৌতর, ছারপোকাকে বলে উড়স, আরশোলাকে বলে তিলচোট্টা। রামদয়ালের, তেমনি আরও কোন কোন দয়ালের ভাষার অনেক শব্দই বরিশালিয়াদের মুখে শোনা যায়।

একটা শব্দ বললাম 'বরিশালিয়া'। এটা কিন্তু সাধুভাষাও নয়, কোন অঞ্চলের মৌখিক ভাষাও নয়। গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষায় এ শব্দটির ব্যবহার নেই; পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষায় এই শব্দটি শোনা যায় যখন বরিশালবাসীদের নিয়ে কিছু ঠাট্টামস্করা চলে। তবে এটা বরিশালের উচ্চারণ নয়। বরিশালের উচ্চারণ 'বৈশ্‌শাল্যা'। এ উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গে আসে না। এটা যদি বা কোনমতে আসে, বরিশালে তথা পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের এমন উচ্চারণ আছে যা চেষ্টা করেও পশ্চিমবঙ্গবাসী অনুকরণ করতে পারেন না। ঘ ঝ ঢ ধ ভ হ অর্থাৎ প্রতিবর্গের চতুর্থ বর্ণ এবং হ-বর্ণের কথা বলছি—এদের বাঙলা উচ্চারণ ঘ ঝ ঢ ধ ভ হ। শব্দ দিয়ে বলছি—ঘাট, ঝপসা, ঢং ধোপা, ভাত, হাতি : এই ধ্বনি বাংলা লিপিতে প্রকাশ করা যায় না, কারণ ধ্বনি অনুযায়ী বর্ণ নেই। অনুরূপ ধ্বনি শোনা যায় গুজরাতী, রাজস্থানী, সিন্ধী, পাঞ্জবী এবং কোন কোন পাহাড়ী ভাষায়। শব্দতত্ত্বের পরিভাষায় এই ধ্বনির নাম কণ্ঠনালীয় স্পর্শধ্বনি—Glottal stop।

প্রথমেই বলে রাখি, আমি নিজে বাঙাল এবং বৈশ্‌শাল্যা বাঙ্‌গাল। পূর্ববঙ্গের 'বাঙ্‌গাল বাঙ্‌গালী' পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে 'বাঙাল বাঙালী'। গ-টা এদিকে লোপ পেয়েছে।

আমাদের বাল্যকালে কলকাতায় বাঙালদের জব্দ করার এক জবর উপায় ছিল। যখন কলকাতা এলাম, আমাকে বলতে বলা হল—গড়ের মাঠে ঘোড়ার গাড়ি গড়গড়িয়ে যায়। ড-এর উচ্চারণ সেদিন পারি নি, আজও পারি না। আমরা বলি—বিরাল ভ্যারা বারি-ভারা গারি-চবা। বরিশালে ড-এ বিন্দু ড় আসে না। তেমনি আসে না চন্দ্রবিন্দু। 'পাঁচ পঁচিশ বাঁশ হাঁস' আমাদের মুখে 'পাচ পচিশ বাস হাস'। 'অবজ্ঞা আত্মা' আমাদের মুখে 'অবগ্‌গা আত্তা'। কিন্তু অনুনাসিককে যদি আমরা খাতিরই করি, সুদে আসলে পুরিয়ে নিই। আমরা কাঁদি না, কান্দি। চান্দ বান্দর ধান্দা বান্ধন। ক্রিয়াপদের সম্ভ্রমাত্মক ন-টিকেও আমরা বর্জন করেছি। আমরা বলি, 'বাবায় যাইবে, মাস্টারমশায় পড়ায়, গুরুঠাকুর আইছিল'। এ ভাষা কিন্তু অশ্রদ্ধাসূচক নয়, এটা আমাদের বাগ্‌রীতি। বরিশাল গুরুজনকে নামিয়ে দিয়েছে, কিন্তু লঘুজনকে তুলে ধরেছে—তোরা যাও কৈ? তুই কর কী? তোরা খাইছ?

আপনাদের হাসি পাচ্ছে? আপনারাও কিন্তু সুর করে গেয়ে থাকেন—ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।

হাসতে হয় হাসুন। তবে একটা ব্যাপারে আমরা জিতে গেছি। আপনারা বলেন 'দিলুম নিলুম'। আবার 'দিলাম নিলাম'-ও আপনাদের মুখে শোনা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলেন, এই 'লাম' বিভক্তি আপনারা বাঙালদের কাছ থেকে নিয়েছেন। 'দিলাম নিলাম' আমাদের ভাষা। অবশ্য নদীয়া কিংবা হালিশহর অঞ্চলের অধিবাসীরা বলেন, তাঁরা কস্মিন্ কালেও 'লুম তুম' ব্যবহার করেন না, তাঁদের ভাষাও বাঙালদের মতোই 'লাম তাম'। যা-ই হোক, এ তর্ক আমার নয়। ভাষা-পণ্ডিতেরা

এ নিয়ে আলোচনা করুন। এই প্রসঙ্গেই আসে—সদ্য অতীতের প্রথম পুরুষের সকর্মক ক্রিয়াপদ। আপনাদের স্বকীয় ভাষা 'দিলে নিলে'। আমরা বলি 'দিল নিল'। এখন আপনারাও বলতে শুরু করেছেন 'সে আমাকে দিল, তারা এটা নিল'—বোধ হয় আমাদেরই সংস্পর্শে এসে।

তাচ্ছিল্যে আ-প্রত্যয় বাংলা ভাষার এক বৈশিষ্ট্য। 'রামা শ্যামা কেষ্টা' সর্বত্র চলে। গোপাল থেকে গোপ্‌লা, ভূপাল থেকে ভূপ্‌লা, গণেশ থেকে গণ্‌শা পশ্চিমবাংলায় বেশ চলে, পূর্ববাংলায়ও অচল নয়; তবে বরিশালের বিশেষ ভঙ্গি—গোপাল্‌য়া ভূপাল্‌য়া গোণেশ্‌য়া। ক্ষিতীশ বীরেন শরৎ বসন্ত-জাতীয় নামে আ-প্রত্যয় পশ্চিমবঙ্গে চলে না—বরিশালে 'আ' না থাকলে মনের ভাবটাই প্রকাশ পায় না। ক্ষিতীশ্‌য়া বীরেন্‌য়া শরৎয়া বসন্ত্‌য়া—আমাদের গালভরা ডাক। আ-প্রত্যয় যোগে 'হরি যতি যদু মধু'-কে আপনারা স্বরসঙ্গতি করে বলেন 'হোরে যোতে যোদো মোধো'। আমাদের আ-ধ্বনি অক্ষুণ্ণ—হোর্‌য়া যোত্‌য়া যোদ্‌-উআ মোধ্‌উআ। হৈরা যৈতা যৌদা মৌধা কিন্তু 'বরিশাইলা' উচ্চারণ নয়, ওটা 'ঢাকাইয়া'।

ক্রিয়াপদের ইয়া-প্রত্যয়ের কথাও এই সুযোগে বলে নিই। আপনাদের 'কিনে বেচে শুনে জেনে' বরিশালে 'কিন্‌য়া বেচ্‌য়া শুন্‌য়া জান্‌য়া'। এই প্রসঙ্গে লক্ষ করবেন আপনাদের অভিশ্রুতি আমাদের ভাষায় আসে না। আপনারা বলেন 'জেনে মেনে রেখে ঢেকে', আমরা বলি 'জান্‌য়া মান্‌য়া রাখ্‌য়া ঢাক্‌য়া'। 'ইতে ইলে ইবে'-র কথাও শুনুন। স্বরান্ত-ধাতুতে, আমরা প্রত্যয় বা বিভক্তিটি পুরোপুরি যোগ করে দিই—খাইতে খাইলে খাইবে, শুইতে শুইলে শুইবে। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে, আপনাদের মতোই, আমরা প্রত্যয়ের 'ই' বর্জন করি, কিন্তু ধাতুমধ্যস্থ স্বরের উচ্চারণে আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিল নেই। আপনারা বলেন 'চিনলে শুনলে দেখলে বোললে', আমরা বলি 'চেনলে শোনলে দ্যাখলে বললে'। 'লিখলে লিখবে'-র বেলা তো আমরা ই-কারকে ডবল প্রমোশন দিয়ে বলি 'ল্যাখলে ল্যাখবে'। 'ইতে ইত'-র ত-স্থলে আমাদের জিবে থ-ও আসে। 'উঠতে বোসতে' না বলে আমরা বলি 'ওঠথে বসথে'। সচরাচর দেখা যায়, মহাপ্রাণ খ ছ ঠ থ ফ, তিনটে শ আর লুপ্ত হ্‌-ধ্বনির পর ক্রিয়াবিভক্তির 'ত' থ-এ পরিণত হয়—মাখথো মোছথো ওঠথো গাঁথথো লোফথো কাশথো শোষথো আসথো গাইথো। অন্যান্য বর্ণের পরেও কখন কখন ত-স্থানে থ আসে—টেকথো চেনথো পরথো গড়থো তোলথো। ক্রিয়াপদের ত-স্থানে থ-এর প্রতি আমাদের যেরূপ আকর্ষণ, অনুকার শব্দে ট-স্থানে ঠ-এর প্রতিও তদ্রূপ। 'ফুল-টুল গান-টান লুচি-টুচি' আমাদের মুখে হয়ে যায় 'পুল-ঠুল গান -ঠান লুচি-ঠুচি'। আমাদের কণ্ঠ কর্কশ, রসনায় রস কম, তাই আমরা ট-কে করেছি ঠ, ত্‌-কে করেছি থ। আপনাদের কণ্ঠ মধুর, রসনায় রস বেশি, আপনারা স্থানবিশেষে থ-কে করেছেন ত, ছ-কে করেছেন চ। 'মাথা কথা' আপনাদের মুখে 'মাতা কতা'। এতে হয়তো মাধুর্য ঢেলেই দিয়েছেন। কিন্তু ছ-এর উচ্চারণ আপনাদের মুখে চ হওয়াতে লেখ্য ভাষায় বানান-সমস্যা দেখা দিয়েছে। 'আসিতেছে' শব্দ আপনাদের মৌখিক ভাষায় হয় 'আসচে'; লৈখিক ভাষায় তার বানান সাব্যস্ত হয়েছে 'আসছে'। 'আসছে' বললে পূর্ববঙ্গীয়রা বুঝবেন 'এসেছে'।

পুরাঘটিত বর্তমানে আপনারা বলেন 'দেখেছি দেখেচে'। আমরা একটি অক্ষর, মানে syllable, কমিয়ে দিয়েছি—'দেখছি দ্যাখছে'। কিন্তু ঘটমান কালের বিভক্তিকে আপনারা বেশ ছেঁটে ফেলেছেন। 'ইতেছে'-র ছে-টাকেই কেবল রেখেছেন তা-ও চে করে—দেখচে শুনচে। এখানে আমরা তেমন সংক্ষেপ করি নি। আমরা বলি—দ্যাখথেছে শোনতেছে। বিভক্তিটাকে ভেঙেও ফেলি—দ্যাখথে লাগজে, শোনতে আছে। কখন-বা একটা সহকারী ক্রিয়া আমদানি করি—দ্যাখথে লাগজে, শোনতে লাগজে। লাগজে মানে লাগিয়াছে। এই সহকারী ক্রিয়াটার প্রয়োগে মূল ক্রিয়ার স্থিতিকাল যেন একটু বেড়ে যায়, ক্রিয়ার আরম্ভটাও যেন নির্দিষ্ট হয়।

সম্ভ্রমাত্মক অনুজ্ঞায় আপনারা বলেন 'আসুন বসুন', আমরা বলি 'আসেন বসেন'।

ভবিষ্যৎ কালের 'কোরবো ধোরবো' বরিশালের ভাষায় 'কোরমু ধোরমু' 'কোরুম ধোরুম।'

ক্রিয়াপদের কথা আর থাক। অন্য দু-একটা কথা বলি। ই-বর্ণ উ-বর্ণের প্রভাবে বাংলা ভাষায় পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি 'ও-ধ্বনি' হয়ে যায়—পোত্তি সোতী মোধু বোধু। ই-বর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকলেও আপনাদের অ-কারের বিকৃতি ঘটে, আমাদের তা হয় না। আপনারা বলেন 'বোলতে বোলবো পোক্ষো বোক্ষো যোজ্ঞো ওন্বেষণ', আমরা বলি 'বলতে বলবো পক্ষো বক্ষো যজ্ঞো অন্বেষণ'। য-ফলাযুক্ত বর্ণ পরে থাকলে পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি আমাদের মুখেও সংবৃত হয়—সোভ্যো ভোব্যো জোন্যো বোন্যো। তবে সর্বত্র নয়—বোন্যা কিন্তু কন্যা, বোন্ধ্যা কিন্তু সন্ধ্যা, তোথ্যো কিন্তু পথ্যো, গোত্যন্তর কিন্তু সত্য হত্যা।

বাঙাল ভাষায় অভিশ্রুতি নেই, অপিনিহিতির প্রাচুর্য। 'আজ কাল ডাল চাল' আমাদের মুখে 'আইজ কাইল ডাইল চাউল'। 'মোষ বোস চোখ মেসো' আমাদের কাছে 'মোইষ বোউস চোউখ মাউসা'। আচ্ছা, আমাদের মুখের 'কাইব্বো বাইক্কো গোইদ্দো পোইদ্দো' আপনাদের কানে খুব লাগে? আপনারা কি মনে করেন আপনাদের মুখে 'কাব্বো বাক্কো গোদ্দো পোদ্দো' খুব সাধু উচ্চারণ? আবার আমরা যখন বলি 'ঘের্‌তো অমের্‌তো বের্‌ধো পের্‌থোক্', তখন তো আপনারা হেসে কুটিপাটি! কিন্তু আপনারা জানেন কি, আপনারা যখন শুদ্ধ করে আ-ব্রি-ত্তি কবেন, তখন আপনাদের কবি কেবল হাস্যকৌতুক করেন না, সুযোগ পেলেই আপনাদের ক্রি-ষ্টি নিয়ে খুব একচোট ব্যঙ্গ-কৌতুক করেন। ঋকারের শুদ্ধ ধ্বনি বাঙালি-রসনায় আসে না, তথাপি বরিশালের গেঁয়ো উচ্চারণ বরং মূলধ্বনির কাছাকাছি যায়—পণ্ডিতী উচ্চারণেই বি-ক্রি-তি দেখা দেয়।

র-ফলাযুক্ত আদ্যাক্ষর অ-কারান্ত হলে বরিশাল অ-কার কিংবা ও-কারকে আমল দেয় না। বরিশালের উচ্চারণ 'ক্রেমে ক্রেমে দের্‌ব্বো প্র্‌থোম প্র্‌ফুল্লো প্র্‌শান্তো। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গেও এই উচ্চারণ।

আদ্যাক্ষরে এ-কার থাকলে বরিশালের প্রবণতা অ্যা-কারের দিকে—ত্যাল্, ম্যাঘ্, দ্যাশ্, ক্যাবোল্, ক্যাশোব্। 'বেশি-কম'-কে সন্ধি করে বলি 'ব্যাশ্-কোম্'।

আ-কারান্ত শব্দ কর্তৃকারক হলে আমরা প্রায়ই 'এ'-বিভক্তি লাগাই। দাদায় ঘুমায়, মামায় যাইবে, ধোপায় কাপড় দিল। নামবাচক শব্দে 'এ'-বিভক্তি লাগে না, তবে তা-ও একেবারে বিরল নয়।

এইবার অনুন্নত শ্রেণীর উচ্চারণ কিছু কিছু শোনাই। সম্ভ্রান্ত সমাজে এই জাতীয় উচ্চারণ একেবারে নেই তা নয়, তবে কম।

চ ছ জ-এর উচ্চারণ tcha sa za। চ়লো চ়ল্লিশ ছ়য় ছ়বি জ়ল জ়ন্তু।

শব্দমধ্যে বা শব্দান্তে 'ক খ' হ-ধ্বনিতে পরিণত হয়। টাকা থাকে আর ঝাঁকায় ঝাঁকায় জিলিপি খায়—টাহা থাহে আর ঝাহায় ঝাহায় জিলফি খায়। কখন্ এসেছো, যখন্ তখন্ এলেই দেখা পাবে নাকি—কহোন্ আইচো, যহোন্ তহোন্ আইলেই দ্যাহা পাবা নাহি।

শব্দের আদিতেও ক-এর উচ্চারণ হ্ আছে। হরছো কী—করেছ কী।

আদ্যাক্ষরে শ-ধ্বনি হ-ধ্বনিতে পরিণত হয়। শিয়াল>হিয়াল, শূয়ার>হয়ার, শেষ>হ্যাষ, ষোলো>হোলো, সে>হে, সেবা>হ্যাবা।

শব্দমধ্যেও শ-ধ্বনি 'হ-ধ্বনি' প্রাপ্ত হয়, তবে এই হ আর মহাপ্রাণ থাকে না। শ্বশুর>হোউর, শাশুড়ি>হাউরি, আসেন>আয়্ন, বসো>বও।

'তাহা' শব্দের ত-স্থানে হ, পরবর্তী হ অল্পপ্রাণ হয়ে যায়—তাহা>হেয়া, তাহার>হ্যার, তাহা হইলে>হেইলে।

শব্দমধ্যে 'ক' গ হয়ে যায়—সকল>হগোল, দিকে>দিগে, শুকায়>হুগায়। আবার 'গ'-ও ক হয়। 'গলা'-কে ইতর ভাষায় বলা হয় 'ক্যাল্লা'।

'ট ঠ' ড-এ পরিণত হয়। ও জ্যাঠা, এখন ওঠো, হাটে যাবে না>ও জ্যাডা, অ্যাহোন [illegible] আডে যাবা না? ছোটো পাঁঠাটা কাটো>ছোডো পাডাডা কাডো। আখার ডালটা ফুটে উঠলে [illegible]

দিয়ে ঘুঁটে দিও>আহালের ডাইলডা ফড়য়া ওড়্লে কাডাডা দিয়া গুড়য়া দিও। আবার 'ড'-ও ঠ-এ পরিণত হয়—কাঁঠাল গাছের ডাল>কাডাল গাছের ঠাল।

বরিশালের ভাষায় বর্ণ-পরিবর্তনের দু'চারটে নমুনা দেখানো হল, আঞ্চলিক শব্দসম্ভার বা গেঁয়ো বাচনভঙ্গি সম্বন্ধে অবশ্য তেমন কিছু বললাম না।*

বরিশালের ত্রয়ী

মণিকুন্তলা সেন

নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অধিকারী বরিশালের একটি স্বর্গীয় সৌন্দর্যও ছিল। সে ছিল বরিশালের চরিত্র। নদীমাতৃক বরিশাল যেমন অফুরন্ত মাতৃস্তন্য পানে সদাপুষ্ট ছিল তেমনি তিনটি দেবতুল্য চরিত্রবান পুরুষের হাতে গড়া ছিল ঐ যুগের বরিশালের মানুষ। তাঁদের চরিত্রের মাধুর্য ও দেবত্বের প্রভাব থেকে তখনকার যুবা-বৃদ্ধ কেউই বড় একটা বাইরে ছিলেন না। অশ্বিনীকুমার দত্ত, কালীশচন্দ্র পণ্ডিত ও জগদীশ আচার্য ছিলেন সেই তিন মহাপুরুষ।

এই ত্রয়ীর মধ্যমণি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। দেবকান্তি পুরুষ। তাঁরই পাশের বাড়িটা ছিল আমাদের। তাঁর বাড়ির সামনেটায় রেলিং দেওয়া ছিল। রেলিং-এর বাইরে সুরকির সরকারি রাস্তা। আর বাড়ির সামনের উঠোনের ঠিক মধ্যস্থলে ছিল একটি মস্ত বড় তমালগাছ। গাছটির গোড়া বড় একটি গোলাকার বেদী করে বাঁধানো ছিল। আর বেদীর পাশে খানিক সবুজ ঘাসে ভরা গোল জায়গা ছেড়ে দিয়ে, ছিল একটি পায়ে-চলার গোল সুরকির রাস্তা। তমালের ঘনস্নিগ্ধ ছায়ায় চওড়া বেদীটির উপর কখন বা ক্লান্ত পথিক ঘুমোয়, কখনও বা ছেলের দল খেলে। আবার কখনও বা মধুচক্ররূপী অশ্বিনীকুমারকে ঘিরে ঈশ্বরীয় আলোচনার মধুপান করতেন শহরের গুণী ব্যক্তিরা।

অশ্বিনীকুমার ছিলেন সাধক, প্রেমিক, যোগী ও রাজনীতিজ্ঞ। তমালতলার বৈঠকে বা তাঁর ঘরে যে রাজনীতি-আলোচনার বৈঠক বসত তা বুঝবার বয়স আমাদের মতো ছেলেমেয়েদের তখন ছিল না। কখনও কখনও তমালতলায় খেলতে খেলতে চোখে পড়ত ঘরের বৈঠকের মধ্যে আরাম কেদারায় বসা একটি অপূর্ব পুরুষকে। আমার মা তাঁকে কাকাবাবু বলতেন। আমরা বলতাম দাদু। মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করতে যেতাম। আশীর্বাদ করতেন, 'লেখাপড়ায় ভাল হও'। মার সঙ্গে নানা কথা বলতেন।

ভারি সুন্দর লাগত দেখতে যখন রোজ ভোরবেলা গায়ে ধুতির খুঁটটি, নয়তো একটি পাতলা উড়ুনী গায়ে দিয়ে তমালতলার গোল চত্বরে হেঁটে বেড়াতেন। গৌরবর্ণ রূপ, গোঁফজোড়াটি ধবধবে সাদা, মাথায় ঝকঝকে টাক। কানের পাশে ও মাথায় কিছু সাদা চুল। হেঁটে বেড়াচ্ছেন যেন এক তপস্বী পুরুষ। ছেলেবেলার দেখা সে ছবিটি এখনও আমার চোখে ভাসে।

একদিন ভোরবেলা গোপাল মেথর বাড়ির পায়খানা সাফ করতে এসে ঝাড়ু হাতে খোদ কর্তাবাবুর সামনে পড়ে গেল। উপুড় হয়ে সে প্রণাম করতে গিয়ে দেখল কর্তাবাবুর বুকের উপর সে আলিঙ্গনাবদ্ধ। মুখে বলছেন, 'গোপাল তুই-ই ধন্য, তুই-ই প্রেমিক। মানুষকে ভালবাসিস বলেই তো তাদের এই নোংরা তুই অনায়াসে ঘাটতে পারিস।' এসব কথা বিন্দুবিসর্গও গোপালের কানে যায়নি, মাথায়ও না। তার দুই চোখের জলে সে তার কর্তাবাবুর পা দু'খানি ধুয়ে দিচ্ছিল। এ কাহিনী আমার জামাইবাবুর কাছে শোনা। তিনিও ঐ বাড়িতে খুব যেতেন সে সময়ে।

যে গভীর চিন্তায় তাঁকে আমরা ডুবে থাকতে দেখতাম তা প্রকাশ হলো তাঁর লিখিত 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থে। বড় হয়ে সে বই আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। বড় হয়ে জেনেছি যে, অশ্বিনী দাদু সে সময়ে বরিশালের অদ্বিতীয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। নীরবে তিনি সারা জিলার মানুষের উপরে যে বিস্ময়কর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাতে সুদূর গ্রামে-গঞ্জে তাঁর

দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত (সামগ্রিকী/পৃ ১০৮-১১৩)

বক্তৃতা করে বেড়াতে হতো না। অশ্বিনীবাবু সকলকে এটা করতে বলেছেন, মাত্র এই কথাটুকু তাদের কানে পৌঁছলেই যথেষ্ট। তাঁকে বরিশালের 'গান্ধীজী' বলা চলত। তিনি কৃষকদের এত কাছের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর উপর গ্রামের ভালবাসাও এত গভীর ছিল যে শুনেছি কৃষকরা তাঁর নাম করে ক্ষেতে ফসল লাগাত। তাদের বিশ্বাস ছিল—এতে ফসল ভাল হবে। সেবাব্রত ছিল তাঁর জীবনের অঙ্গ। দূরের মানুষকে কাছে টানতে তাঁর মধ্যে যেন একটি চুম্বকশক্তি কাজ করত।

জীবিতকালে তাঁর দেবকান্তি দেখে আমরা ছোটরা তাঁকে ভক্তি করতাম। বড় হয়ে জেনেছি তাঁর ধর্মজীবনের ইতিহাস। সর্বসংস্কার মুক্ত অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিজয়কৃষ্ণের কথা আমি অল্প বয়স থেকেই অনেক শুনতাম। তার প্রভাব আমাদের পরিবারেও ছিল। তাই অশ্বিনী দাদুকে বড় হয়ে যখন চিনতে শিখলাম তখন বরিশালবাসীর সঙ্গে আমিও তার দেবচরিত্রের প্রভাবে এসে গেছি।

আমার নিজের দাদু, দাদামশাই, অনেক আগেই পরলোকগত। আমি তাঁকে দেখিনি। অশ্বিনী দাদু ও আমার দাদু রজনীকান্ত দাসের মধ্যে সখ্য ছিল—মা'র কাছে শুনেছি। অশ্বিনীবাবু দাদুকে 'রজুদা' বলে ডাকতেন। দাদু শহরের শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন ও আমৃত্যু মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ওখানে তখন এই ধরনের বুদ্ধিজীবীরা এ্যানি বেসান্তের ভক্ত। থিওসফিক্যাল সোসাইটির একটি শাখা বরিশালেও গড়ে তুলেছিলেন। প্লানচেটে আত্মা আনবার দিকে এঁদের সকলের ঝোঁক ও বিশ্বাস ছিল। শুনেছি, শেষরাত্রে আমার দাদু বিছানার মধ্যেই ধ্যানে বসে থাকতেন। ঐ প্ল্যানচেট থেকেই হোক বা যে প্রকারেই হোক তাঁর মৃত্যু-দিনটি তিনি নাকি বহু পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। একদিন রাত্রে ঘুম থেকে দিদিমাকে ঠেলে তুলে তিনি নাকি বলেছিলেন-- 'জেনে রেখো অমুক সনের অমুক তারিখে আমার মৃত্যু। এ যদি সত্য না হয় তবে দেবধর্ম সব মিথ্যে।' দাদু তখন সুস্থ কর্মঠ পুরুষ। দিদিমা ওসব কথায় কানই দিলেন না। ভাবলেন রাত্রির দুঃস্বপ্ন।

কিন্তু আশ্চর্য, একথার কত পরে জানি না, কিন্তু অনেক বছর পরে শুনেছি, দাদুর মৃত্যু হয় ঠিক ঐ তারিখেই। মাথায় স্ট্রোক হয়ে তিনি অর্ধ অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় পাঁচ মাস পড়েছিলেন এবং ঐ নির্দিষ্ট দিনটিতেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব কথা উনিশ শতকের গোড়ার দিকের।

দাদুর দানশীলতার কথা শহরে সবাই জানত। বৈঠকখানার ঘরে ফরাস পাতা বড় চৌকিতে দাদুর একদিকে থাকত মক্কেলদের বসবার জায়গা, আর এক পাশে থাকত প্রার্থীদের। একটির পর একটি প্রার্থীর কথা একানে শুনতেন ও অন্যকানে নিজের পেশার কথা। ফাক পেলে যা জমা পড়ত তার কিছু কিছু কাগজ মোড়ক হয়ে চুপি চুপি প্রার্থীর হাতে চলে যেত। কাজটি গোপনে সারতেন মুহুরির ভয়ে।

দাদুর সংসারের মধ্যে ছিলেন দিদিমা আর আমার মা। মায়ের বিবাহের পরে তো দুটি প্রাণীর সংসার, কিন্তু তিনি পালন করতেন বিরাট একটি পরিবার। বাড়ির উত্তর পাশে একখানা মস্তবড় আটচালা ঘর ছিল। তাতে অন্তত জনা পঁচিশেক লোক থাকত। এঁরা কেউ ছাত্র, কেউবা সামান্য চাকুরীওয়ালা। ঐ ঘর ছিল তাদের আশ্রয়। দুবেলা খাবার ঘণ্টা বাজত। ঐ ঘণ্টা বাজার লোহার তারটি একটি নারকেল গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। সে আমি বড় হয়ে দেখেছি।

এছাড়া দেশের বাড়িতে যাবার সময় পারিবারিক খরচ বাদে দাদু ভিন্ন একটি ক্যাশবাক্স নিয়ে যেতেন। সেটি ভরা থাকত খুচরো টাকা-পয়সায়। বিকেলবেলা এক এক বৌ-এর এক একদিন ডাক পড়ত। দাদু তাদের কারো জ্যেষ্ঠ-শ্বশুর, কারো খুড়-শ্বশুর, কারো বা দাদা-শ্বশুর। বৌদের কাছ থেকে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন বাপের বাড়ির সংসারের কথা। তারপর বৌ-এর হাতে একটি মোড়ক চলে যেত। বলতেন, 'মাকে পাঠিয়ে দিও।'

নিজের প্রজাদের সঙ্গেও এই ব্যবহারই চলত। এক-একজন এক-এক প্রয়োজনে আসত এবং খুশি মনে চলে যেত।

দাদুর বিষয়ে একটা প্রবাদ ছিল ঃ তার এক হাত দান করত, অন্য হাত জানত না।

এই দানশীলতার সুযোগ নিয়ে মৃত্যুশয্যায় তাঁর নিজের আয়ে নির্মিত বসতবাটি ও তার সংলগ্ন ৭ বিঘা জমি পর্যন্ত দেশের বাড়ির জ্যেঠতুতো-খুড়তুতো তিন শরিকেরা চার ভাগের তিন ভাগ নিয়ে নিলেন। মা পেলেন এক ভাগ। উইল লিখে এনে কে যেন পড়ে শোনাল ও হাতে একটা কলম গুঁজে দিল। দাদু নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে সই করে দিলেন। তাঁর একমাত্র সন্তান, আমার মা, বঞ্চিত হলেন। দিদিমা কাঁদতে লাগলেন। ঘরে যাঁরা অন্য লোক ছিলেন হায় হায় করতে লাগলেন। মাকে গিয়ে বলতে বললেন তাঁর নিজের কথা। মা বলেছিলেন, 'আমি আমার এতবড় বাপের মেয়ে এই-ই আমার বড় পরিচয়, সামান্য সম্পত্তিতে আমার কি হবে?'

পরবর্তী সময়ে আমার বাবা জমির অর্ধাংশ ও বাড়িটার বাকি বারো আনা কিনে নিলেন অন্য শরিকদের কাছ থেকে। চার আনা মা'র প্রাপ্যই ছিল। তাই গোটা বাড়িটা আমাদের হয়েছিল। আমার দাদুর নামেই বাড়ির নামকরণ হলো। বাবার নামে নয়।

অশ্বিনীকুমারের সুহৃদ আমার এই দাদুর সঙ্গে হঠাৎ রাজনীতিতে অমিল হয়ে গেল। সেটা ১৯২৬ সন হবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রভাবে পড়লেন আমার দাদু। দাদুকে তাঁর মানবপ্রীতি ও দানশীলতার জন্য অশ্বিনীকুমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে আপসে লোক্যাল সেল্‌ফ গভর্নমেন্টের নির্বাচনে অশ্বিনীকুমারের ঘোরতর আপত্তি। আমার দাদু দাঁড়ালেন। অশ্বিনী দাদু বললেন, 'রজুদা, তুমি তুলসী বনের বাঘ।' দাদু হেরে গেলেন। এই দাদুই একবার বরিশালবাসীদের উপরে ফুলার সাহেবের অত্যাচারে অত্যন্ত চটে গিয়েছিলেন। শহর-প্রধান হিসাবে একখানা কড়া চিঠি তিনি ফুলার সাহেবকে পাঠালেন। সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে সে চিঠির জবাব দিয়েছিলেন।

নির্বাচনের পর আবার দুই বন্ধুর সৌহার্দ্য যেমন ছিল তেমনই রইল।

দাদুর মৃত্যুশয্যার পাশেও অশ্বিনীকুমার। দাদুর দানশীলতার কথা তখন শহরে সুবিদিত। তাছাড়া যে মিউনিসিপ্যালিটি তাঁর প্রাণ স্বরূপ ছিল, মৃত্যু-শয্যাতেও তার কথা ভুলতে পারছেন না। প্রলাপের মধ্যেও অশ্বিনীদাদুকে বলেছিলেন শহরের বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়। এক সময়ে দাদু চোখ বুজলেন। দাদুর একমাত্র সন্তান আমার মা। তিনিই তাঁর পিতার শেষকৃত্যের অধিকারী। তার কি ব্যবস্থা হবে আলোচনা ওঠায় উপস্থিত সকলে দাদুর সিন্দুক খোলার ভার দিলেন অশ্বিনীকুমারকে। তিনি খুলে সেখানে মাত্র সাড়ে চার টাকা পেলেন। অশ্বিনীদাদু আমার দাদুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, 'রজুদা, তুমি রাজর্ষি?'

একজন মহর্ষি, আর একজন রাজর্ষি। দুজনের সখ্য ছিল অচ্ছেদ্য। মতবিরোধ হলো আবার মিটেও গেল। সখ্যে চিড় খায়নি।

আজকাল রাজনীতি অনেক কড়া। সখ্য সহজেই শত্রুতায় পরিণত হয়।

অশ্বিনীকুমারের বিরাট জীবনের কথা আমি লিখতে বসিনি। আমি লিখেছি তাঁকে আমার বাল্যবয়সের চোখে যতটুকু দেখা এবং আমার মায়ের কাছে ও জামাইবাবুর কাছে যা শোনা।

চারণকবি মুকুন্দ দাস ছিলেন বরিশালের সন্তান। এ নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই। মুকুন্দ দাস যে একদিন চারণকবি হয়ে সারা পূর্ববাংলাকে মাতিয়ে তুলেছিলেন তা ঐ অশ্বিনীকুমারের প্রেরণায়। বরিশালের পশ্চিম প্রান্তে একটি কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মুকুন্দ দাস থাকতেন। কিন্তু তাঁর আসর ছিল খোদ কর্তামশাই অশ্বিনীকুমারের বাড়িতে। মাঝে মাঝেই গান হতো। আমাদের বাড়ি থেকেও শোনা যেত। মানুষকে পাল্‌টে গড়ে তোলার কি যে জাদুমন্ত্র জানতেন অশ্বিনীকুমার! নইলে মদ্যপ মুকুন্দ চারণকবি হয়ে বরিশালকে মাতালো আর কারাবরণ করল?

কাজী নজরুল ইসলামকে তখনও আমরা দেখিনি। কিন্তু তাঁর 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী'র কবিতাগুলি প্রাণপণে মুখস্থ করছি আর বুকের মধ্যে বই লুকিয়ে একে ওকে চালান করছি। যতদূর মনে পড়ে 'বিষের বাঁশী' নিষিদ্ধ বই ছিল। কিন্তু নজরুলকে আমি চিনেছি শুধু তাঁর বই পড়ে নয়।

বেশি করে চিনেছি ঐ মুকুন্দ দাসের কম্বুকণ্ঠের গানে ও আবৃত্তিতে। গেরুয়া পরা,গেরুয়া উত্তরীয় গলায়, নজরুলের মতোই একমাথা ঝাঁকড়া ও কোঁকড়া চুল—এই বেশে চারণকবি যখন স্টেজে উঠে দরাজ গলায় 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল্ কররে লোপাট', 'জাতের নামে বজ্জাতি সব'—ঐ সব গাইতেন তখন যেন এসব আর শুধু গান ও কবিতা থাকত না। আমাদেরকে যেন ইলেকট্রিক শক্ মারত। 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গানটি কেন যেন আমাকে অদ্ভুতভাবে স্পর্শ করত। যেন মনে হতো ঐ নারী আমি নিজেই, 'ধর্ষিতা নাগিনী' শুনলে মনে হতো আমিই যেন খাড়া হয়ে ফণা তুলেছি।

মুকুন্দ দাসের যাত্রা ছিল শহরের একটা প্রবল আকর্ষণ। সব যাত্রাই ছিল সমাজসংস্কার বা রাজনীতিতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। যাত্রাই ছিল সমাজসংস্কার বা রাজনীতিতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। যাত্রায় প্রায়ই উনি সাজতেন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। আর একটি ছেলে সাজত ওঁর বিধবা মেয়ে অথবা সন্ন্যাসিনী শিষ্যা। যাত্রার বিষয়বস্তু হতো কোন সময়ে বাল্যবিধবা মেয়ের উপর সামাজিক অত্যাচারের কাহিনী অথবা গরিবের উপরে অত্যাচার। যাত্রাগুলিকে সবাই 'স্বদেশী যাত্রা' আখ্যা দিয়েছিল। নজরুলের গান, তাঁর নিজের স্বরচিত গান, যাত্রার সংলাপ সব মিলে দেশাত্মবোধ জাগানো ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষের মানসিক বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলাই ছিল এই যাত্রার মূল কথা।

মেয়েরা এ যাত্রা দেখতে ভেঙে পড়ত আর কেঁদে ভাসাত। গানগুলো যেন জাদু জানত। নইলে যখন গাইতেন—'ও আমার বঙ্গনারী, পরো না বিলিতি শাড়ি, ভেঙে ফেল বেলোয়ারী চুড়ি'—তখন যেন কে আগে স্টেজে গিয়ে হাতের চুড়ি ভেঙে দিয়ে আসবে—তার একটা প্রতিযোগিতা লেগে যেত। শুধু ভাঙা নয়, কাঁদতে কাঁদতে হাতের সোনার চুড়ি খুলে দিয়ে আসতেও আমি দেখেছি। ঘরে গিয়ে বিলিতি কাপড় ছেড়ে 'বঙ্গলক্ষ্মী' মিলের মোটা শাড়ি ধরতে মেয়েদের আর অন্য প্রচারের দরকার হতো না। একা মুকুন্দ দাসের যাত্রাই যথেষ্ট ছিল। সেই দীর্ঘ চেহারার সন্ন্যাসীর গলায় ঝক্‌মক্ করছে সব মেডেল আর বজ্রকণ্ঠ, এ যেন আজও আমার চোখে ভাসে, কানে বাজে।

আজ কবি নজরুলও নীরব, মুকুন্দ দাসও নীরব। আজ সেই অনুভূতি আর কোথায় পাব? তারুণ্যের তরল রক্ত তো আজ ঘন।

কিন্তু সেদিনের সেইসব শিহরণ ও উত্তেজনাময় মুহূর্তগুলি—সবই হয়তো আমার অজান্তেই আমার ভবিষ্যত জীবনের কিছুটা রূপরেখা রচনা করেছিল।

অশ্বিনীদাদুকে ঘরের মানুষ ভেবেছি, তাঁর প্রতি আমার মায়ের শ্রদ্ধাভক্তি থেকে মনে হতো তিনি একজন বড় দরের মানুষ। কিন্তু কত বড় দরের সেটা বড় হয়ে বুঝেছি তাঁর লেখা বই পড়ে এবং তাঁর হাতের জীবন্ত রচনা মুকুন্দ দাসকে দেখে।

ত্রয়ীর দ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর চিরব্রহ্মচারী জীবন ও ধর্মপ্রাণতার জন্য তিনি লোকের কাছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বলে পরিচিত ছিলেন। আচার্য পদবীটি ছিল তাঁর প্রতি লোকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অশ্বিনীকুমারকে বুঝবার বয়স আমার ছিল না কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে খুব কাছে থেকে দেখবার ও বুঝবার বয়স আমার হয়েছিল। আমি তখন ব্রজমোহন কলেজে পড়ি। উনি ছিলেন অশ্বিনীকুমার প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন (অশ্বিনীকুমারের পিতা) স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষকতায় ও পরিচালনায় অসাধারণ দক্ষতা তাঁর জীবনে এসেছিল। ইংরেজি, অঙ্ক ও দর্শন—এই তিনটি বিষয়ে তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি ছিল। একদিন তাঁর আশ্রমে গিয়েছি। তখন তিনি বার্ধক্যের দুয়ারে। গিয়ে দেখি অঙ্ক কষছেন। জিজ্ঞেস করলম—"এ কি করছেন আপনি? এখন আপনি অঙ্ক দিয়ে কি করবেন?" বললেন, "দিদি, মানুষের মাথায় মাকড়সার জালের মতন থাকে। ওগুলো কেটে যায় অঙ্ক কষলে।" তিনি ডিফারেন্শিয়াল ক্যালকুলাসের অঙ্ক করছিলেন। আমাকে বললেন, "তুইও রোজ

অঙ্ক করিস, বুদ্ধি খুলবে।" মনে ভাবলাম—বুদ্ধিতে আর কাজ নেই, অমন নীরস জিনিস আমার দ্বারা হবে না। সর্ব বিষয়ে ও সর্ব শাস্ত্রে এমন অগাধ পাণ্ডিত্য অথচ এমন নিরভিমানী আর কেউ আমার চোখে পড়েনি।

ত্রয়ীদের এক বিষয়ে অদ্ভুত মিল ছিল। ইনিও ছিলেন দেবকান্তি পুরুষ। গায়ের রং যেন ফেটে পড়ত। মাথায় ও মুখে কাঁচা-পাকা চুল-দাড়ি। দেখলেই মনে হতো ঋষি।

তাঁর আশ্রমটি ছিল একটি ছাত্রাবাস। একটি ঠাকুরঘর ও তাঁর নিজের বাসগৃহটি নিয়েই এই ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসের খরচ চলত কিছুটা অল্প সংখ্যক ছাত্রদের দেওয়া টাকায়। গরিব খানা। ডাল, ভাত, তরকারি। আচার্যদেবের খাদ্যও তাই-ই। ঠাকুরঘরের সকালবিকাল পূজা, আরতি উনি নিজে করতেন না। কয়েকজন ভক্ত ছিলেন—তারাই করতেন। ছিল না মন্ত্রশিষ্য তাঁর—কিন্তু ওঁর ভক্ত ছিল শহরের অগণিত মানুষ। সন্ধেবেলা আমার মা ও ছোড়দির সঙ্গে আমি প্রায়ই যেতাম। গান শুনতে ভালবাসতেন। অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের ভক্তিমূলক গান শুনতে চাইতেন। একটার পর একটা ফরমাস হতো। আর ছোড়দি একটার পর একটা গেয়ে যেতেন। সঙ্গে আমাকে ঠেকা দিতে হতো। উনি যেন গান শুনে কোন্ অতলে ডুবে যেতেন।

প্রতি রবিবার সকালে পুজো, মন্দিরের পাঠঘরে গান ও পাঠের আসর চলত। কত লোক যে নীরবে উপবিষ্ট থাকতেন। কাপড়ের পর্দার এপিঠে মেয়েরা, ওপিঠে পুরুষেরা। তাঁর ফরমাস্ মতন গান চলত। তারপর উনি গীতা, ভাগবত বা উপনিষদের অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। মা'দের সঙ্গে আমিও প্রায়ই যেতাম। এছাড়াও তাঁর বাসগৃহে সর্বদা ধর্মালোচনা শুনতে গুণগ্রাহীরা কেউ না কেউ আসতেন। শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ। নানারকম গাছপালায় ঘেরা আশ্রমটি যেন প্রাচীন ঋষিদের আশ্রমকে স্মরণ করিয়ে দিত।

একবার জন্মাষ্টমীতে উনি আমায় আদেশ করলেন—শ্রীকৃষ্ণের গীতাধর্মের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে। আমার তো হৃৎকম্প। লিখেছিলাম একটা এবং পাঠের আসরে কম্পিত বক্ষে পড়েও দিয়েছিলাম। আজও সেকথা মনে পড়লে হৃৎকম্পটাই বেশি মনে পড়ে। কিন্তু পর দিন সকালবেলা দেখি, একি কাণ্ড! স্বয়ং সেই দেবপুরুষ একখানি মালা নিয়ে আমাদের বাড়িতে হাজির। আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও দিদি তোমার শিরোপা, বড় ভাল লেগেছিল তোমার রচনাটি।" আমি এখন কি করি! এমন পুরস্কার জীবনে এই প্রথম। গলা থেকে মালাখানি খুলে নিয়ে তাঁরই পায়ে দিয়ে প্রণাম করলাম।

তাঁর স্নেহ প্রকাশের অনেক ঘটনার একটির উল্লেখ না করে পারছি না। ওঁর শোবার ঘরের পিছনে একটা চালতা গাছ ছিল। একদিন আমি তার তলায় ঘুর ঘুর করছি দেখে বললেন, "কি খুঁজছিস দিদি, চাল্‌তা?" হেসে ফেললাম। পরদিনই সকালে দেখি চাদরের তলায় দু'হাতে দু'টি চালতা নিয়ে উনি এসে হাজির। অবাক হয়ে ভাবলাম—এত ক্ষুদ্র জিনিস নিয়েও মহাপুরুষরা ভাবেন?

তখন আমি ভাগবত পড়েছি। সন্ন্যাসিনী হবার আকাঙ্ক্ষাই তখন আমার প্রবল। আমার সন্ন্যাসিত্বের ধারণা—অতি কঠিন এক কৃচ্ছ্রসাধন। তার মধ্যে কোন মধুর রস-টসের স্থান নেই। ভগবানের সঙ্গে পিতা-মাতা ছাড়া আর কোন সম্পর্ক স্থাপন? অসম্ভব, চলতেই পারে না। আমি গীতাধর্মের অনুরাগী। একদিন দুপুরে তর্ক করতে গেলাম জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে। দুম্ করে বলে ফেললাম, "আপনাদের ভাগবত পড়তে আমার ভাল লাগে না।" বললেন, "কেন?" বললাম "অনেক অশ্লীল কথা লেখা আছে।" যেন দুঃখ পেলেন। বললেন, "এখন তো ও জিনিস বুঝবে না, আগে দাঁত উঠুক তবে কাঁচা আমের মর্ম বুঝবে।" আমার শান্ দেওয়া সব ধারালো যুক্তিগুলো আর বলাই হলো না। যেন থাবড়া মেরে বন্ধ করে দিলেন।

এই জগদীশচন্দ্রের তৈরি ছাত্রাবাসের সংযমী ছাত্রদের ও পূজাঘরের পবিত্রমনা পূজারীদের প্রভাবে এবং শহরের ঘরে ঘরে তাঁর নিজের যাতায়াতে, জ্ঞান ও প্রেম বিতরণে বরিশাল শহর

তখন ভরপুর। এই মানুষটির নীরব সাধনা তাঁর ক্ষুদ্র আশ্রমটি ছাড়িয়ে সারা শহরে যেন কি এক প্রভাব বিস্তার করেছিল—যার বাইরে যাওয়া তখন কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাঙলাদেশের যুদ্ধের সময়েও শুনেছি তারা জগদীশ-আশ্রমের গায়ে হাত দেয়নি।

আসল কথাটাই এতক্ষণ বলা হয়নি। ইনিও অশ্বিনীকুমারের আসরের মানুষ ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের সত্য, প্রেম, পবিত্রতার প্রচারক ছিলেন এই সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী মানুষটি।

তৃতীয় পুরুষ কালীশচন্দ্র। লোকে কালীশ পণ্ডিত মশাই বলে জানত। ব্রজমোহন স্কুলের ইনি ছিলেন সংস্কৃতের পণ্ডিত। ইনিও অশ্বিনীকুমারের আমলের মানুষ। কিন্তু এঁর ধর্ম পাণ্ডিত্যে প্রকাশ পেত না—পেত লোকসেবায়। ইনি একটি আতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সেখানে রোগীরা সেবা পেত। নিজে অকৃতদার ছিলেন এবং এই নিয়েই থাকতেন। পথ থেকে রোগী কুড়িয়ে নিয়ে এসে ওখানে তুলতেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তাদের সারিয়ে তুলতেন। অশ্বিনীকুমার নিজের ছাত্রদের নিয়ে বরিশালে 'লিট্‌ল ব্রাদারস অফ দি পুয়োর' নামক সংগঠন করেছিলেন এবং তাদের সেবামন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। সেই সংগঠনের ভার নিলেন অশ্বিনীকুমারের যোগ্য উত্তরপুরুষ এই পণ্ডিত মশাই। তিনি তাঁর ছাত্রদের অসীম মমতায় সেবাব্রতী করে তুলেছিলেন। যুবক ছেলেরা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে তাঁকে ঘিরে থাকতেন এবং পণ্ডিতমশাই-এর নির্দেশে চলতেন। এই স্বেচ্ছাসেবক ছেলেরা শুধু আতুরাশ্রমেই রোগীসেবা করতেন—তাই নয়, শহরের যে কোন বাড়ি থেকে ডাক পড়লে এঁরা সেখানে গিয়ে প্রয়োজনমতো রোগীর সেবা করে আসতেন। পণ্ডিতমশাই এদের 'ডিউটি' ভাগ করে দিতেন। তখনকার দিনে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড এ সবের তো কোন চিকিৎসাই ছিল না। আর মহামারীরূপে প্রতিবছর শহর-গ্রামে এদের আগমন ছিল অবাধ। চিকিৎসা না থাকলে একমাত্র সেবাই রোগীকে একটু সান্ত্বনা ও আরাম দিতে পারে। অতএব স্বেচ্ছাসেবকের কাজ ছিল খবর পেলেই পাখা আর জলপট্টি নিয়ে রোগীর শিয়রে বসা, আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শেষ গতিটি করে ফিরে আসা। রাত দশটা থেকে দুটো এবং দুটো থেকে সকাল পর্যন্ত এরা দু'জন করে আসতেন। এই ডিউটির কোন নড়চড় হতো না। কোন বাড়িতে এরা কিছু খেতেন না। অনেক সময় বাড়ির লোকেরাও অনুপস্থিত থাকত কিন্তু এরা বসে থাকতেন। আমার দাদার একবার টাইফয়েড হয়েছিল। মা আর একলা পেরে উঠছিলেন না। আশ্রমে খবর দিতে হলো। ওরা সন্ধ্যার পরে দু'জন এসেই মার হাত থেকে জলের পাইপটা ও পাখাটি নিয়ে নিতেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ানো আর জ্বর দেখার কাজও ওরাই করতেন—মাকে করতে দিতেন না। মাকে পাশে শুয়ে একটু বিশ্রাম করাবার জন্য ছেলেরা কি চেষ্টাই না করতেন।

এইসব সেবাব্রতীরাই ছিলেন কালীশ পণ্ডিতের সন্তানদল। নিজে সন্তানের পিতা ছিলেন না কিন্তু যে সন্তানদের তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন অন্তিমকালে তাদের সেবাধর্ম নিজে চোখে দেখে যেতে পেরেছিলেন—এই ছিল তাঁর আদর্শের সার্থকতা। বরিশালের এই চারিত্রিক আবহাওয়াই এই ছোট্ট শহরটিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল।

আর যাঁরা নিজ নিজ চরিত্রবলে বরিশালে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁরাও খুব কম ছিলেন না। তাঁদেরও আমি ভুলিনি এবং মনে হলে আজও প্রণাম করি।

বরিশালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিল জীবনানন্দের বাড়ি। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। তিনিও এক সাধক ও পণ্ডিত পুরুষ ছিলেন। সত্যানন্দ দাশের ভগ্নী স্নেহলতা দাশ ছিলেন আমাদের স্কুলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। সর্বদা সাদা সরু পাড়ের ধবধবে ধুতি পরা বেশ। চিরব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মিকা। পরবর্তী জীবনে সমাজের আচার্য। স্কুলজীবনে ইনি ছিলেন আমাদের 'প্লেইন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিংকিং'-এর আদর্শ। আমরা স্কুলে যেতাম সাদা শাড়ি ও সাদা জামা পরে এবং খালি পায়ে। এর বেশি পোশাক আমরা জানতামই না। বড়দির সামনে সাজপোশাক করার কথা মনেও হতো না। শাড়িটা পেঁচিয়ে পরার ঢংটা তখনও বরিশালে পৌঁছে উঠতে পারেনি। রেললাইন ছিল না তো! কলকাতার হাওয়া পৌঁছাতেই যুগ পার হয়ে যেত। বরিশালের

আবহাওয়াটা ঐসব মহাপুরুষদের প্রভাব এবং রেলযোগের অভাবের জন্যই বোধহয় বেশ কিছুকাল বেঁচে ছিল।

আমরা যখন আই. এ. ক্লাসে পড়ি তখন বন্ধুরা মিলে যুক্তি করলাম এবার আমরা চটি পায়ে দেবো। বোধকরি চটি না পরেই ছিলাম ভাল। লাল সুরকি পায়ে ফুটতো না। আর এখন আত্মরক্ষার তাগিদেও খালিপায়ে দু'পা ছুটতে পারব না।

ব্রাহ্মসমাজের আর একজন প্রচারক ও আচার্য ছিলেন মনমোহন চক্রবর্তী। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। অনেকের বাড়িতেই তাঁর যাতায়াত ছিল। নিরভিমান সদালাপী বৃদ্ধটি মাঝে মাঝে তাঁর 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় আমার লেখা নিতে আসতেন। মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকাদিবসে আমাকে বলতেন লেখা পাঠ করতে। দু'একবার করেও ছিলাম, এই নিয়ে অনেক ঝগড়া করতাম তাঁর সঙ্গে। 'আপনাদের মেয়ের কথাটি বলবেন না, আর আমাকেই মঞ্চে ওঠাবেন। ভারি আহ্লাদ পেয়েছেন।' এ রকম ঝগড়ায় আমরা উভয়েই আমোদ পেতাম।

এছাড়া বরিশালের বিপ্লবী রাজনীতির ধারক ছিল স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত ওখানকার শঙ্কর মঠ। স্বামীজী ব্যক্তিগতভাবে এই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু ঐ মঠ যুগান্তর পার্টির কেন্দ্র ছিল বলে আমরা জানতাম। আমি ওখানে আমার ছোড়দিব সঙ্গে কয়েকবার গেছি। ছোড়দি যেতেন মঠ দেখতে। আমার চোখ দু'টো ঘুরত মঠের বড়গোছের একটি লাইব্রেরীর বইগুলোর উপব। ভাবতাম, ঐ সব বই-এর পিছনে নিশ্চয়ই পিস্তল রাখা হয়। আর বিপ্লবীরা এখানে কেউ থাকেন কিনা জানবার জন্যও উৎসুক থাকতাম। হঠাৎ শুনলাম, একদিন পুলিস ঐ মঠের সমস্ত কিছু তল্লাসী করে; এমনকি মাটি খুঁড়ে, মন্দিরের বেদী খুঁড়ে পর্যন্ত দেখে। অস্ত্রশস্ত্রও নাকি পায়। গ্রেপ্তার হলেন নিশিবাবু, যিনি আমাদের লাইব্রেরী দেখতেন। এই শঙ্কর মঠের প্রভাব নিঃশব্দে ওখানকার যুবমানসে বিপ্লবের অঙ্কুর রোপণ করত। জানি না, অন্য কোন জেলায় বিপ্লবীরা এই ধরনের মঠকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলেন কিনা। ববিশালের ধর্মীয় আবহাওয়ার সঙ্গে এই বিপ্লবী আবহাওয়া মিশ্রিত হয়ে তাকে নিঃসন্দেহে নতুন বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল।....*

গৈলার কথা

বরিশালের গৈলার মানুষ কালীপদ সেনগুপ্তর জন্মস্থান গৈলা। দেশভাগের আগেই এপার বাংলায় চলে আসেন। হুগলি জেলার শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ "গৈলা থেকে বক্সা"। বক্সা বন্দি শিবির থেকে শুরু করেছেন স্মৃতিচারণ। ফিরে গেছেন নিজের জন্মস্থান গৈলায়। এক বিস্ময়কর বর্ণনা বলা যেতে পারে। জনজীবনের বৈচিত্র্যে ভরপুর। উৎসব, পালপার্বণ, ব্রতকথা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, বিভিন্ন পরিবার, জনবসতি যেমন তিনি দেখেছিলেন ছেলেবেলায়, বড়বেলার কলম দিয়েই তাকে তুলে ধরেছেন। দেশভাগ পূর্ববর্তী বরিশালের জনজীবনের এক নির্মল প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে তাঁব লেখায়। সেই রচনা থেকে কেবলমাত্র গৈলা প্রসঙ্গের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।

... গৈলা গ্রামটি বরিশাল সহর থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং ফরিদপুর জেলার প্রান্ত থেকে মাত্র ছ-সাত মাইল দূরে। "পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর" (মনসামঙ্গল)। গৈলার পূর্বে ঘণ্টেশ্বর (বর্তমান গৌরনদী বা পালর্দি) থেকে বরিশাল জেলার পয়সার হাট পেরিয়ে পশ্চিমে ফরিদপুর জেলার ঘাগর নদী। এই দুই নদীর মধ্যবর্তী খালের একাংশে দু পার জুড়ে আমার স্বপ্নের গ্রাম গৈলা।

গৈলা, মানসী ফুল্লশ্রী, দক্ষিণ সিহিপাশা, মধ্য সিহিপাশা, উত্তর সিহিপাশা, কালুপাড়া ও মুড়িহার নামের সাতটি মৌজা একত্রে গৈলা নামে পরিচিত। কবে থেকে যে উপরিউক্ত সাতটি

* নবপত্র প্রকাশিত সেদিনের কথা। পৃ. ১৩-২৩

মৌজা নিয়ে গঠিত বিরাট অঞ্চলটি 'গৈলা' এই সাধারণ নামে পরিচিত হয়েছে, তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। বিজয় গুপ্ত রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে কবির গ্রাম হিসাবে মানসী ফুল্লশ্রীর উল্লেখ আছে 'হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়'' অন্যত্র ''মা মনসার প্রিয়ভূমি তাই তার মানসী এক নাম।'' কিন্তু গৈলার কোন উল্লেখ ''মনসা মঙ্গলে'' নেই। পুরান দলিল পত্রের ভিত্তিতে অনেকের অনুমান যে উপরিউক্ত মৌজাগুলি নিয়ে গঠিত অঞ্চল সাধারণভাবে 'গৈলা' নামে পরিচিত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। অনেকে মনে করেন 'মানসী ফুল্লশ্রী' কখনও বৃহত্তর গৈলার সাথে যুক্ত ছিল না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রশ্নে 'মানসী ফুল্লশ্রী' বৃহত্তর গৈলার সাথে যুক্ত একটি সুসংবদ্ধ অঞ্চল। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে গৈলা ও ফুল্লশ্রীর মানুষজন একত্রে কাজ করে এসেছেন এবং সকলেই গৈলার লোক হিসাবে সাধারণ্যে পরিচিত হয়েছেন। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার-এ ফুল্লশ্রীকে গৈলা জনপদের অন্যতম মৌজা বলা হয়েছে। কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে গৈলাকে বাদ দিয়ে যেমন মানসী ফুল্লশ্রীর ইতিহাস রচিত হতে পারে না, ঠিক তেমনি মানসী ফুল্লশ্রীকে বাদ দিয়েও এককভাবে গৈলার ইতিহাসও রচনা করা যায় না।..''

জলাভূমির দেশ বরিশালে জনবসতির সূচনাপর্ব থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল রাস্তাঘাট। নবাবী আমলে যেসব রাস্তাঘাট নির্মিত হয়েছিল, ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্ব থেকেই তা আরও বিস্তৃত হতে থাকে। কিছু কিছু সড়ক নির্মিত হলেও, বড় বড় নদী, খাল চারদিকে ছড়িয়ে থাকায়, সাধারণ পরিবহন হিসাবে ছিল নৌকার প্রাধান্য। আভ্যন্তরীণ এবং দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের জন্য তৈরি হত নানাধরনের নৌকা। নৌকা নির্মাণ শিল্পে সুখ্যাতি ছিল বাকরগঞ্জের কয়েকটি স্থানে। পাড়ায় পাড়ায় সংযোগ রক্ষার মাধ্যমও ছিল নৌকা। ছিল বাঁশের সাঁকো বা পুল। কাঠের পুলও তৈরি হত। জলের সঙ্গে সহবাস করে এসেছে বাকরগঞ্জের মানুষ। কালীপদ সেনগুপ্তর রচনায় ধরা আছে জনজীবনের সুন্দর ছবি।

''সপ্তদশ শতকে নবাবী আমলের কোন নবাব জেলা সদর ও জেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে লোক চলাচলের জন্য রাস্তা ও জলপথ তৈরি এবং পানীয় জলের জন্য দীঘি খনন করতে তার প্রধান উজীর ছবি খাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন। সেই কারণে নবাবের আদেশে নবনির্মিত সড়ক, জলপথ ও দীঘি 'ছবি খাঁর জাঙ্গাল' ও 'ছবি খাঁর দীঘি' নামে এলাকায় পরিচিত হয়েছিল। বৃহত্তর গৈলা জনপদে এরকম বহুরাস্তা, খাল এবং বেশ কয়েকটি বড় দীঘির ছবি আমার আজও মনে পড়ে। পরবর্তী সময়ে বরিশাল জেলা বোর্ড ঘণ্টেশ্বর (গৌরনদী বা পালর্দি নদী) থেকে জেলার শেষ সীমানায় আমবৌলা গ্রাম পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তা এবং বারমাস নৌকা চলাচলের উপযোগী চওড়া খাল নির্মাণ করেন। এই রাস্তা ও খাল ফুল্লশ্রীর মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে গিয়ে ফরিদপুর জেলা বোর্ড নির্মিত এবং ঘাঘর নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত জলপথ ও স্থলপথের সাথে যুক্ত হয়েছে। আর একটি রাস্তা ও খাল গৌর নদী থেকে মাহিলাড়া, বাটাজোর, রহমতপুর, লাখুটিয়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়ে বরিশাল শহরের সাথে যুক্ত ছিল। গৈলা-গৌরনদী রাস্তা ও খাল চাঁদসী ও বানিয়াদুরির মধ্যে দিয়ে বরিশাল—ভুরঘাটা—মাদারীপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ও খালের সাথে গৌরনদী (পালর্দি)-তে এসে মিশেছে। গৌরনদী বা পালর্দি টরকী ও গৌরনদী বন্দর সংলগ্ন নদী।

''ছোটবেলায় এইসব পথে বরিশাল শহর, মাহিলাড়া ও মাদারিপুর যাবার স্মৃতি আমার আজও বেশ মনে পড়ে। জল পথে যাবার সময় দেখেছি খালে যখন ভাটার টান তখন নৌকার সাথে লম্বা তার বেঁধে একজন মাঝি পাড়ে উঠে অপর প্রান্তে বাধা বাঁশের টুকরো কাঁধে চাপিয়ে নৌকাটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একে বলা হত গুনটানা। এই সময় অপর একজন হাল ধরে থাকত। আবার জোয়ারের সময় নৌকায় পাল তোলা হত, আর পালে লাগা হাওয়ার টানে নৌকাটা এগিয়ে যেত। জল পথে যাওয়া আসার পথে প্রায়ই আমরা ছেলেরা নৌকা থেকে নেমে অনেকটা পথই হেঁটে যেতাম, আবার নৌকায় উঠে বিশ্রাম নিতাম। অনেক সময় গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে যখন দেড়-

দুমাইল বাকি তখন নৌকা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে নৌকার অনেক আগেই গ্রামে পৌঁছে সকলকে খবর দিতাম, এটা আমাদের ছোটদের কাছে খুবই আনন্দের ব্যাপার ছিল।

"যে অঞ্চলে মানসী ফুল্লশ্রী সহ বৃহত্তর গৈলা জনপদটি অবস্থিত সেটি ছিল বিশাল এক জলাভূমি। বছরে প্রায় পাঁচ মাসই জল-প্লাবিত থাকত। পরবর্তী সময়ে জনপদ, প্রশস্ত সড়ক, অসংখ্য ছোট বড় খাল, দীঘি ও পুকুর তৈরি হবার ফলে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। গৈলা গ্রামের প্রতিটি বাড়ি (পাড়ার) নিজস্ব ঘাট ছিল বাড়ির সংলগ্ন খালে বা খাল যুক্ত দীঘিতে। বাইরে যাবার জন্যে অনেকেরই নিজস্ব একখানি নৌকা ছিল। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যাবার জন্য গোটা গ্রাম জুড়ে খালের উপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো বা পুল ছিল। কাঠের তৈরি পুলও ছিল। কোন কোন বছর বর্ষাকালে বাড়িগুলি জলপ্লাবিত হলে এক একটি বাড়ির এক ঘর (পৃথক বাড়ি বা গৃহ) থেকে আরেক ঘরে যাবার জন্য চট জলদি বানানো চার-বাঁশের সাঁকো বানিয়ে নেওয়া হত। আমরা একে বলতাম 'বাঁশের চার' বা পুল। এই সময়ে জলভাঙা, বা 'চার' পেরিয়ে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যাওয়া-আসা এক মজার ব্যাপার ছিল।

"গ্রামের বড় বড় দীঘিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে মাছ জন্মাত। এর জন্য অন্যস্থান থেকে মাছের চারা আনার প্রয়োজন ছিল না। ছোট খাল ('যান')-এর সাহায্যে বাইরের বিল বা প্রধান খালের সাথে সংযোগ ঘটান হত, আবার তাল গাছের খোল দিয়েও এই কাজ করা হত। বর্ষার সময় এই সব পথে নানা ধরনের মাছের পোনা দীঘিতে প্রবেশ করত।

"বরিশাল জেলায় রেলপথ ছিল না। অথচ শিক্ষা, চাকুরী ও ব্যবসার কারণে গৈলার মানুষজনের কলকাতার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। কলিকাতা যেতে হলেই আমাদের খুলনা (অবিভক্ত বাংলার একটি জেলা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) হয়ে ট্রেনে যেতে হত। আমাদের গ্রামের লোকেরা দুটি পথে খুলনা যেতেন। গৈলা থেকে হাঁটা পথে বা নৌকায় গৌরনদী (বন্দর) এসে স্টিমার যোগে বরিশাল হয়ে খুলনা অথবা নৌকায় পাটগাতি (বন্দর) এসে সেখান থেকে স্টিমারে খুলনা। পাটগাতি স্টেশনটি ছিল ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়ার কাছে। উভয় জেলার মানুষজনই কলিকাতা বা অন্যত্র যাবার প্রয়োজনে এই দ্বিতীয় পথটিই বেশি ব্যবহার করতেন। পাটগাতি বন্দর এলাকায় প্রয়োজনে যাত্রীদের বিশ্রাম ও খাবার খুবই সহজলভ্য ছিল। পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রান্নার ঘর, উনুন ও প্রয়োজনীয় সব কিছুই খুব সস্তায় এখানে পাওয়া যেত। চাল, ডাল, কাঠ ইত্যাদির অনেক দোকান ছিল। কত রকমের মাছই না পাওয়া যেত। নদীর তীরে খোলামেলা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা পরিবেশে যাত্রীরা বনভোজনের আনন্দের মাঝে সময় কাটিয়ে দিতেন। এরপর স্টিমারে ওঠার পালা। দুবারের এ রকম অভিজ্ঞতার কথা আমার আজও বেশ মনে পড়ে।

'আমার ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের জলপথে (খালে) এক ধরনের 'নৌকা-বাস' চালু ছিল, একে আমরা বলতাম 'গয়নার নৌকা', এগুলি ছিল বিশালকায় যাত্রীবাহী নৌকা। একটি নির্দিষ্ট পথে যাত্রীরা ইচ্ছেমত ওঠা নামা করতে পারতেন এবং সেই অনুযায়ী কেয়ারা (ভাড়া) দিতেন। এই নৌকা কোন স্থান ছেড়ে পরবর্তী গন্তব্যস্থলে যাবার সময় বেশ বড় আকারের একটি নাগারা (বাদ্যযন্ত্র) ব্যবহার করা হত। ঢাকের মত নাগারায় কাঠির আঘাত পড়লেই অনেক দূর থেকে তার শব্দ শোনা যেত।

"উপরে উল্লিখিত সড়ক পথ ও জলপথ ছাড়াও গৈলার বিভিন্ন 'বাড়ি'র এলাকা থেকে আরও অনেক রাস্তা ও খাল মূল জলপথ (খাল) ও স্থলপথের সাথে যুক্ত হয়েছে। এর অধিকাংশই গ্রামের লোকেরা নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করেছিলেন। রাস্তা ও খাল তৈরির সময় খালের উপর দিয়ে বাঁশের চার (সাঁকো)ও বানান হত যাতে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি বা খাল পেরিয়ে এক সড়ক থেকে আরেক সড়কে পৌঁছান যায়।..."

.. আমরা পাড়াকে বলতাম বাড়ি যা পশ্চিম বাংলার মাঝারি মাপের যে কোন গ্রাম বা শহরের অনেক পাড়ার চেয়ে অনেক অনেক বড় এবং আকার আকৃতি ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক। বড়

দীঘি, পুকুর ও বাগান ইত্যাদি নিয়ে একটি বিরাট এলাকায় একই জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কিন্তু পৃথক অন্নভুক্ত বহু পরিবারের বাস ছিল এক একটি বাড়িতে। পঞ্চাশ বছর আগের কথা। সব বাড়ির নাম আমার মনে নেই। স্মৃতির মণিকোঠায় আজও ঘোরাফেরা করে গৈলা ফুল্লশ্রীর এমন কিছু বাড়ির নাম উল্লেখ করছি। এগুলি হল ঃ কবিরাজ বাড়ি (গৈলা), কবিরাজ বাড়ি (ফুল্লশ্রী), মনসাবাড়ি (গৈলা), মনসাবাড়ি (ফুল্লশ্রী), আলোক গুপ্তের বাড়ি, কবীন্দ্র বাড়ি, কালুপাড়া সেনের বাড়ি, গোলার পাড় গুপ্তের পাড়ি, রামনাথ দাশের বাড়ি, দুহি সেনের বাড়ি, রামমোহন দাশের বাড়ি, রাজমোহন দাশের বাড়ি, গাঙ্গুলী বাড়ি, বক্‌শী বাড়ি, শংকর গুপ্তের বাড়ি, পিপলাই বাড়ি, গুপ্তের বাড়ি (রথবাড়ি), মুনসী বাড়ি, সিমলাই বাড়ি, লালুগুপ্তের বাড়ি, নয়দাশের বাড়ি, ভরদ্বাজ বাড়ি, নিম দাশের বাড়ি (গৈলা দাশের বাড়ি বা বড় দাশের বাড়ি), নরসিংহ দাশের বাড়ি (ফুল্লশ্রী), বৈদিক বাড়ি, পৃষীলাল বাড়ি, বারুরী বাড়ি, মজুমদার বাড়ি, নয়া বাড়ি, মাণিক সেনের বাড়ি, গুপ্তের বাড়ি, সত্য সেনের বাড়ি, পাঠক বাড়ি, বিনায়ক সেনের বাড়ি। এছাড়াও মুচি বাড়ি, কাহার বাড়ি (মশাল ও পাল্কী বাহকদের পাড়া) ধোপা বাড়ি, বাজনদার বাড়ি (ঢাক-ঢোল ইত্যাদি বাদকদের পাড়া) কুমার বাড়ি, (প্রতিমা, হাঁড়ি, কলসী প্রস্তুত কারকদের পাড়া), কামার বাড়ি (লোহা, পিতল, তামা, ইত্যাদি নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের পাড়া) ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট বাড়ি। স্মৃতি থেকে লেখা তাই নামের মধ্যে ভুল ত্রুটি কিছু থাকতেও পারে।..."

কালীপদ সেনগুপ্তর বিবরণে আছে হিন্দু বসতি এলাকার বৈচিত্র্যময় প্রতিচ্ছবি। দীঘি-পুকুর-গাছপালা ঘেরা বিরাট এলাকাজুড়ে একই জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর বসবাস ছিল ছড়িয়ে। আজকের মত এত খণ্ড বিচ্ছিন্ন বসবাস ছিল না তখন। নানারকম ফল, ফুল ফুটে থাকত ঋতুক্রমে। সেকালে প্রচুর বেতের ঝোপ ছিল। এই বেতকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল এক বিশেষধরনের কুটির শিল্প। বট, অশ্বত্থ, তাল, অশোক, বকুল, নারকেল, সুপুরি, পলাশ কতরকম গাছপালা ছিল। সেকালেও ছিল স্থলপদ্ম, জবা, টগর, করবী, শেফালী, দোপাটি, অতসী, চাঁপা, কাঞ্চন, অপরাজিতা, বকুল, গেঁদা, সন্ধ্যামালতি, হাসনুহানা, মধুমালতি, গন্ধরাজ নানারকম ফুলগাছ ছিল। হাটে বাজারে ছিল মিষ্টির দোকান। আজকের মত রকমারি মিষ্টির বৈচিত্র্য ছিল না। চিনি, আখের গুড়, খেজুর গুড় ও পাটালি, চিনির গোল্লা, মিছরি, রসগোল্লা, সন্দেশ এ সব পাওয়া যেত। সব থেকে দামি ছিল সন্দেশ।

"... নানা ধরনের গাছ, লতা ও ঝোপঝাড় গ্রাম ও বসতবাটীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এর ফলে গ্রামের পরিবেশ ছিল বেশ ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধ। কতশত ফুল ও ফলের গাছই না ছিল। নারিকেল ও সুপারির গাছ ছিল অসংখ্য। এছাড়া আম, জাম, জামরুল, কাঁঠাল, কলা, জম্বুরা (বাতাপি লেবু), আনারস, বেল, পেয়ারা, চালতা, গাব কি না ছিল। বড়ই (কুল), আমড়া, জলপাই, লিচু, হরিতকী, আমলকী, করমচা, গন্ধরাজ লেবু, কাগজি লেবু, জাম্বির, কামরাঙা, খেজুর ও তাল গাছ প্রায় সব বাড়িতেই কিছু না কিছু ছিলই। ঝোপে-ঝাড়েও নানা সুস্বাদু ফল পাওয়া যেত। সব কিছুর নাম আমার মনে নেই। তবে এসব ফল কোনটাই আমাদের কিনে আনার প্রয়োজন কখনও হয়নি। আর এসব যে কিনে খেতে হয় সেটাই আমরা জানতাম না। নারকেল প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বার মাসই মজুত থাকত। আমাদের গ্রামে খুব ভাল জাতের আম গাছ ছিল না। মিষ্টি আম দু'একটা গাছে হত না এমন নয়, কিন্তু বেশিরভাগ গাছের আমেই পোকা হত। কমলালেবুর মত দু'একটা ফল, যা সব মাটিতে ভাল হয় না, তা-ই শুধু পালা-পার্বণের সময় কিনে আনা হত। এগুলি বাইরে থেকে আমদানি হত। গ্রামে বেশ বড় বড় বেতের ঝোপ অনেক ছিল। ঢাক, ঢোল বাজাবার কাঠি থেকে শুরু করে মোড়া ও শক্ত লাঠি তৈরি হত বেত দিয়ে। ছোটবেলায় পাঠশালা ও স্কুলে পণ্ডিত মশাই ও শিক্ষকদের হাতে একখানা করে বেতের ছড়ি আমাদের কাছে খুবই আতঙ্কের কারণ ছিল। বেতের কচি ডগা ভাতে সেদ্ধ করে নুন তেল দিয়ে বা শুক্তো তৈরি করে খেতে আমাদের খুবই ভাল লাগত। আবার পাকা বেত-ফল হলুদ নুন মেখে, নারকেলের খোলে রেখে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নরম করে নিয়ে খেতে বাড়ির কম বয়সী

মেয়েরা খুব পছন্দ করতেন। ফুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যেত স্থলপদ্ম, জবা, টগর, করবী, শেফালিকা, দোপাটি, আতসী, চাঁপা, কাঞ্চন, অপরাজিতা, বকুল, গেঁদা, সন্ধ্যামালতি, হাসনুহানা, মধুমালতি ও গন্ধরাজ। এছাড়া বড় বড় পলাশ গাছে লাল পলাশ। এত ফুল যে পাতাই দেখা যেত না। শুধু ফুল আর ফুল। কি অপূর্বই না লাগত। নানান ধরনের মৌসুমী ফুলও কিছু কিছু পাওয়া যেত। নাম মনে করতে পারছি না। বিচিত্র সব লতা ও গুল্মের মাঝে যেটি আমাদের ছোটদের কাছে ছিল বিস্ময়ের, সেটি হল লজ্জাবতী লতা। সামান্য স্পর্শ পেলেই এর পাতার ডাঁটা নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ত, আর পাতাগুলিও সম্পূর্ণ ভাঁজ হয়ে যেত। এই লতা নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গবেষণা করেছেন। আমাদের কাছে এই লতা ছিল এক মজার খেলার সাথী। মারাত্মক 'চোতরা পাতা' (এক ধরনের বিছুটি পাতা)-র কথা বিশেষ মনে পড়ে। গ্রামের সব ডাঙার পাড়ে অসংখ্য হিজল, জারুল ও মাদার গাছ যেমন ছিল, তেমনি রাস্তার ধারে ধারে বিরাট বট, অশ্বত্থ, শিমুল, তাল, অশোক ও বকুল গাছের সারি। এই সব কিছুর স্মৃতিই মাঝে মাঝে মনকে খুব নাড়া দেয়।...

বাজারে মিষ্টির দোকানগুলিতে সাধারণত যে সব মিষ্টি পাওয়া যেত তার মধ্যে ছিল চিনি, আখের গুড়, খেজুর পাটালি ও ঝোলাগুড় (মাটির কলসিতে ভরা গুড়), খেজুর রস দিয়ে তৈরি ভির গুড় (তেলের মত তরল গুড়), চিনির গোল্লা, তকতি ও সন্দেশ, ছানার তৈরি জোড়া-সন্দেশ ও রসগোল্লা, বাতাসা, ফেনী (খুব বড় বাতাসা), মিছরি। এ সবই সের দরে বিক্রিত হত। সব চেয়ে বেশি দাম ছিল ছানার সন্দেশের—সের প্রতি ছ' আনা। সবচেয়ে কম দাম ছিল মিছরির—এক সের এক আনা। পাটালি গুড় তৈরির কাজকে একটা বিশেষ শিল্প বলা যায়, আর এ শিল্পটি একান্ত করেই ওপার-বাংলার নিজস্ব সম্পদ। স্লেটের মত পাতলা ও হাল্কা খেজুর পাটালি ও মুচি গুড়ের স্বাদ ভোলা যাবে না। এপার-বাংলায় এসে খাঁটি খেজুর গুড় অনেক পেয়েছি। কিন্তু সেই স্বাদ ও গন্ধের সন্ধান কোথাও পাইনি।"

নদী সমাকীর্ণ, বহু দূরবর্তী জেলা, মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগহীন বাকরগঞ্জ কিন্তু দ্রুত শিক্ষাক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছিল। একসময় বলা হত বাংলার অক্সফোর্ড। উনিশ শতকের মধ্যপর্ব থেকে বিশ শতকের প্রথমপর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে বাকরগঞ্জের বিস্তৃত অঞ্চলে। তার আগে বহু বিস্তৃত ছিল টোলের শিক্ষাব্যবস্থা। স্থানীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতজনের তত্ত্বাবধানে নানান শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্রেরা আসত। বিভিন্ন টোলে শিক্ষালাভের পর তাদের অনেকেরই সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতব্যাপী। বরিশাল শহরে প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তী একশবছর অগ্রগতির ইতিহাস।

"বরিশাল-কে শুধু বাংলার শস্যাগার-ই বলা হত না, এক সময়ে এই জেলাকে বাংলার অক্সফোর্ড (Oxford of Bengal)-ও বলা হত। ছেলেবেলায় একথা বইতেও পড়েছি। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির, বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার অসামান্য অগ্রগতি ঘটেছিল বরিশালে। আর এই অগ্রগতির এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি আমাদের গৈলা গ্রাম।

ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের পূর্ব থেকেই গৈলা গ্রাম ছিল শিক্ষা-চর্চার অন্যতম আদর্শ পীঠস্থান। অন্তত ন'-দশটি টোল আমাদের গ্রামে ছিল। কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়শাস্ত্র ও কবিরাজী শাস্ত্র ইত্যাদির এক বা একাধিক বিষয়ে অধ্যয়নের কেন্দ্র ছিল এই সব টোল। বিভিন্ন বিষয়ে সুপণ্ডিত খ্যাতনামা ব্যক্তিরা এই সব টোলে অধ্যাপনা করতেন। দূর দূর জেলার ছাত্ররা এখানে অধ্যয়নের জন্য আসতেন। সব কয়টি টোলের কথা আমার খুব বেশি মনে নেই। উনিশ'শ ছত্রিশ থেকে ছে-চল্লিশ সাল পর্যন্ত আমি গৈলায় ছিলাম না। পাঁচ বছর কলিকাতা এবং প্রায় তিন বছর বরিশাল শহরে কাটিয়ে পাকাপাকিভাবে আমি শ্রীরামপুর চলে আসি। মাঝে তেতাল্লিশ ও ছেচল্লিশে একবার গৈলা গ্রামে গিয়েছিলাম। তখনও কয়েকটি টোল আমি দেখে এসেছি। কিন্তু যে টোলটির কথা আমার আজও বিশেষ করে মনে পড়ে সেটি হল কবীন্দ্র বাড়ির টোল। সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ শতাব্দীর শেষ দশকে সম্ভবত আঠারো'শ

ছিয়ানব্বই সালে এই টোলটি কলেজে (কবীন্দ্র কলেজ) রূপান্তরিত হয়। বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, বিক্রমপুর, ত্রিপুরা ও আসামের শ্রীহট্ট থেকে ছাত্ররা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এখানে আসতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ নলিনীরঞ্জন সেন, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মধুসূদন তর্কতীর্থ সহ অবিভক্ত বাংলার বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিরাই উচ্চতর শিক্ষার শুরু এই কলেজের ছাত্র হিসাবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা সুলেখিকা মৈত্রেয়ী দেবী এই কবীন্দ্র বাড়িরই সন্তান।

উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের যুগে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ইংরাজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিয়েছিল এবং তার ঢেউ এসে বরিশালকেও প্লাবিত করেছিল। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বরিশালে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। রামমোহন, লর্ড মেকলে ও অন্যদের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় ইংরেজি শিক্ষার স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে এ প্রচেষ্টা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের গ্রামে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৩ সালে। কিন্তু তার পূর্বেই গ্রামে তেরজন গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৫-তে বরিশালের প্রথম গ্রাজুয়েটের একজন হলেন গৈলা-ফুল্লশ্রীর নরসিংহ দাসের বাড়ীর চন্দ্রকুমার দাস।

বরিশাল শহরে ১৮৫৪ সালে তদানীন্তন জেলা সমাহর্তা গ্যারেট সাহেব প্রথম ইংরাজী স্কুলটি স্থাপন করেন এবং চার বছর পরে এটি সরকারি স্কুলে রূপান্তরিত হয়। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার বি. এম কলেজ স্থাপন করেন ১৮৮৪ সালে। ১৮৯৩ সালে গৈলা স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা লাভ ছিল এক কষ্টকল্পিত বিষয়। ইংরেজি শিক্ষার জন্যে তখন গ্রামের ছেলেদের যেতে হত বরিশাল, ঢাকা বা কলিকাতা, আর এসব স্থানে যেতে হলে জলপথে নৌকাই যে একমাত্র অবলম্বন সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জলপথে স্টিমারে বরিশাল ও অন্যত্র যাতায়াত শুরু হয়েছিল সম্ভবত ১৮৮৪-তে। তাই এই সময়ের পূর্বে অনেক ঝুঁকি নিয়েই আমাদের গ্রামের ছেলেদের পাঁচ থেকে আটদিনের বিপদসঙ্কুল জলপথ নৌকায় পাড়ি দিতে হত বরিশাল, ঢাকা বা কলিকাতা গিয়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের জন্যে। বরিশাল শহরে ইংরেজি স্কুল এবং বি. এম. কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। দেশ বিভাগের অনেক আগেই গৈলা গ্রামের উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত কোন পরিবারে পঁচিশ উর্ধ্বে ছেলেরা গ্রাজুয়েট নয় এমনটা বোধ হয় খুব বেশি ছিল না। ত্রিশের দশক থেকে গ্রামের মেয়েরাও খুব একটা পিছিয়ে থাকে নি। বিশেষ করে চাকুরীর কারণে অনেকেই বিভিন্ন শহরে গিয়ে সপরিবারে বসবাস করতে থাকায় এ সুযোগ বৃদ্ধি পায়। দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত আমাদের গ্রামের অনার্স গ্র্যাজুয়েট মহিলার সংখ্যা কম করেও আশী, যার মধ্যে এম. এ পাশ করেছেন অন্তত পঞ্চাশ জন। আমাদের গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে ডক্টরেট করেছেন পঁয়তাল্লিশ জন, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন প্রায় সমসংখ্যক মানুষ, মেডিকেল গ্রাজুয়েটের (উচ্চতর শিক্ষাসহ) সংখ্যাও ত্রিশের উপর। আমাদের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কতজন যে অধ্যাপক, শিক্ষক-শিক্ষিকা তার হিসাব নির্ণয় করা আজ আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমাদের দাশের বাড়িতেই তিনজন কলেজ অধ্যক্ষ ও একজন অধ্যক্ষা ছিলেন। আমাদের গ্রামের অসংখ্য মানুষ যেমন উচ্চ-পদস্থ সরকারি কর্মচারি ছিলেন তেমনি অনেকেই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাম্যবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত কর্মী ও নেতা। আমাদের গ্রামের অন্তত সত্তর জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভিন্ন সময়ে জেলে, অন্তরীণে বা নিজগৃহে আটক থেকেছেন, তারকেশ্বর সেনগুপ্ত শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন।....''

গোটা বাকরগঞ্জ জুড়ে নানান দেবদেবীর পূজা ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমপর্বে মন্দির তেমন না থাকলেও পারিবারিক পূজার্চনার প্রচলনই ছিল বেশি মনসা, শীতল, দুর্গা, কালী, কার্তিক, বিশ্বকর্মা

পূজা উপলক্ষে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হত, তা কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল সৌহার্দ্য। যে কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষও হিন্দুর পাল-পার্বণে ছিল সমাদৃত। মনসা পূজার আধিক্য ছিল সব থেকে বেশি। মেলা, যাত্রা, সঙ্গীত ছিল প্রাণ। ঝুলন উৎসরেও প্রচলন ছিল। বাইচ বা নৌকার দৌড় ছিল খুব জনপ্রিয়। দুর্গা পূজার ছুটিতে প্রবাসীরা ফিরে আসত বাড়িতে। তারা মিলে অভিনয় করত নাটক। গোটা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এটা ছিল বিশেষ বিনোদন। পারিবারিক জীবন ছিল নানান বৈচিত্রে ভরা। একমাত্র একটি গ্রামের যে ছবি এঁকেছেন কালীপদ সেনগুপ্ত, তা সমগ্র বাকরগঞ্জের হিন্দু সমাজের সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কত ঘটনার বিবরণ তিনি দিয়েছেন স্মৃতি থেকে। আছে নবান্ন উৎসবের কথা, পিঠে-পার্বণ অনুষ্ঠানের বিবরণ, নীল উৎসব, দোলযাত্রা এবং যাত্রা ও নাটিকাভিনয়ের প্রসঙ্গ।

"... গ্রামের পালা-পার্বণের শুরু বৈশাখ মাস থেকে—শীতলা পূজা দিয়ে। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন ছিল না। গ্রামের লোকেরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী পূজার দিন স্থির করতেন। গ্রামের প্রায় অধিকাংশ বাড়িতে শীতলা খোলা নামে পরিচিত একটি নির্দিষ্ট স্থানে শীতলা পূজা অনুষ্ঠিত হত। এটা ছিল একধরনের বারোয়ারী অনুষ্ঠান। এর সাথে ছেলেদের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ছিল বাড়ির মেয়েদের। আমাদের দাশের বাড়ির তিন হিস্যার বহির্বাটির সর্ববৃহৎ আটচালাটির এক কোণে ছিল একটি 'শীতলা খোলা'। আমার যতটা মনে পড়ে বড়, ছোট ও চৌধুরী এই তিন হিস্যার সব ঘরের মেয়েরা উপস্থিত হয়ে খোলায় প্রতিষ্ঠিত শীতলা মূর্তির সামনে মঙ্গল ঘটে প্রণাম জানিয়ে আপন আপন ছোট মঙ্গল ঘট ও কুলা মূল ঘটে স্পর্শ করাতেন। এর পর ঐ ঘট ও কুলা মাথায় নিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে শীতলার গান সহকারে গোটা বাড়ি পরিভ্রমণ করতেন এবং সব ঘর থেকে চাল ভিক্ষে করে নিয়ে আসতেন। এই চাল বিক্রি করেই পূজার খরচ সংগ্রহ করে নিতে হত। সব ঘর থেকে ফল ও মিষ্টি সহ এত নৈবেদ্য'র থালা খোলায় জমা হত যে অনেক সময় স্থান-সংকুলানই হত না। সে এক এলাহি ব্যাপার। শেষ দিনে ছিল কুলা-ধোয়া এবং প্রতি ঘরে ঘরে চরু ভোগ বা পায়সান্নর আয়োজন। পূজা শেষে মেয়েরা শান্তিজল, আশীর্বাদ নিয়ে নিজ নিজ ঘট ও কুলা সহ গৃহে ফিরে আসতেন। মূল ঘট ও কুলা খোলাতেই বড় একখানা ডালা দিয়ে ঢেকে বেঁধে রাখা হত। আষাঢ় মাসে এই বাঁধন খুলে নিয়ে আবার পূজা হত এবং তিন হিস্যার নির্দিষ্ট কোন এক গৃহে মূল ঘট ও কুলা রেখে দেওয়া হত। পরের বছর পূজার পূর্ব দিন এই ঘট ও কুলা বিসর্জন দেওয়া হত। আমাদের বাড়ির মেজ হিস্যা এবং গ্রামের অন্যত্রও এই উৎসব অনুষ্ঠান হত। এই উৎসব কদিন হবে তার কোন ঠিক ছিল না, গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির সুবিধা অনুযায়ী তিন থেকে ছ'-সাতদিন পর্যন্ত হত। বসন্ত রোগের মহামারীতে গ্রাম যাতে আক্রান্ত না হয় তার জন্য দেবী শীতলার কাছে প্রার্থনা জানানই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

"বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের কোন সময়ে হরিনাম সংকীর্তন ও হরির লুঠ দেওয়া হত। তিন হিস্যার বহির্বাটিতে কালী-মন্দিরে বাড়ির ছেলেরাই খোল-করতাল সহযোগে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তনে অংশ নিতেন। ছেলে বেলায় আমি নিজেও এতে অংশ নিয়েছি। হরির লুঠের প্রতি আকর্ষণটাই আমাদের বেশি ছিল। লুঠের বাতাসা সংগ্রহ করাটাই ছিল আমাদের ছোটদের কাছে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার।...

"... আষাঢ় মাসে প্রায় প্রতি ঘরেই লক্ষ্মী পূজা হত। সকলেই সামর্থ অনুযায়ী পূজার আয়োজন করতেন। এই মাসেই সমগ্র গৈলা-ফুল্লশ্রীতে গৈলা থেকে পয়সার-হাট-মুখী বড় খালের পাশে ইন্দ্রসেনের পাড়ে দাসেদের বাড়ির রথের উৎসব হত। বৃহত্তর গৈলায় এই একটি মাত্র রথই ছিল। সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এখানে এই উৎসবটির প্রচলন হয়েছিল। আমার ছোটবেলায় উপরিউক্ত রথ-বাড়ির তখনকার মালিকের আমার সমবয়স্ক একমাত্র পুত্রটির মৃত্যু হয়। এর পর থেকে কেন জানি না ছেলেটির মা ও বাবা আমাকে পুত্রের মতই স্নেহ করতেন এবং রথযাত্রার আগের দিন ওরা আমাকে নিয়ে যেতেন, আর কি যত্নই না করতেন। ঘটনাটি আমার মনে এমন

একটা প্রভাব ফেলেছিল যে আজও স্মরণে আছে। রথের দিন জগন্নাথ দেবকে রথে বসিয়ে দাসেদের বাড়ির ওখান থেকে খালের পাড়ের রাস্তা দিয়ে গৈলা স্কুলের দিকে নিয়ে যাওয়া হত। রথযাত্রা উপলক্ষে খালের পাড়ে রাস্তার দু'দিকে রথযাত্রা উপলক্ষে বেশ বড় মেলা বসত মনে আছে।

আমাদের গ্রামে বিশেষ করে গৈলার মনসা বাড়ি ও মানসী ফুলশ্রীর মনসা বাড়িতে খুবই ধুমধামের সাথে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হত। শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু করে গোটা মাস জুড়ে এই অনুষ্ঠান বারোয়ারী উৎসবের রূপ নিত। বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালি ছাড়াও দূর দূর স্থান থেকে অসংখ্য মানুষ দেবী দর্শন ও পূজা দেবার জন্য গৈলা ও ফুল্লশ্রীতে সমবেত হতেন। রোগ মুক্তি, সন্তান লাভ ও অন্য কোন কামনা নিয়েই সকলে এখানে আসতেন। আমাদের দাশের বাড়ি ও কবিরাজ বাড়ির মাঝামাঝি অংশে অবস্থিত মনসা বাড়ির পূজা ও উৎসবের রূপটি এখনও আমার বেশ কিছুটা মনে পড়ে। এই সময়ে কয়েকদিন এখানে আত্মীয় বাড়িতেই কাটিয়ে দিতাম। মনসা বাড়ির এক প্রান্তে বেশ বড় একটি দীঘির পাড়ে আঠার ফুট লম্বা ও দশ বার ফুট চওড়া ইটের তৈরি পাকা বাড়িটি ছিল আমাদের মনসা মন্দির। দীঘির দুই পাড়ে ছিল সান বাঁধান ঘাটলা বা ঘাট। মন্দিরের বারান্দাটি বেশ চওড়া। সামনেই চওড়া পাকা পোস্তা এবং বিরাট একটি আটচালা। এই আটচালায় সপ্তাহব্যাপী মনসামঙ্গলের গান হত। একে রয়ানী বা ভাসান বলা হত। দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন যাঁরা পূজা দিতে আসতেন তাঁরাই অনেক সময় রয়ানী গানের দল নিয়ে আসতেন। মূল গায়ক সহ চৌদ্দ-পনের জন গায়ক গায়িকার এক একটি দল। সঙ্গে ঢোল, খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম। রয়ানী গান শুনতে গৈলা গ্রাম ও আশেপাশের বহু গ্রামের কত মানুষেরই না সমাগম হত। গ্রামের মহিলাদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রায় পুরো মাসটা গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতে প্রতিদিন গ্রামের বয়স্কা মহিলারা সুর করে ফুল্লশ্রীর কবি বিজয়গুপ্ত রচিত মনসামঙ্গল পাঠ করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কবি বিজয়গুপ্ত 'পদ্মাপুরাণ' (মনসামঙ্গল কাব্য) রচনা করেছিলেন হুসেন শাহ্'র রাজত্ব কালে চোদ্দশ চুরানব্বইতে। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে এটিই প্রাচীনতম। সমসাময়িক সমাজের ও রাজনৈতিক অবস্থার বহু মূল্যবান উপাদান এতে পাওয়া যাবে। ফুল্লশ্রীর মনসা পূজা ও উৎসবের ছবি আমার স্পষ্ট মনে পড়ে না।...

"ঝুলন-উৎসবের সাথে এপার-বাংলার মানুষ খুবই পরিচিত। পাড়ায় পাড়ায় কাঁচ-কাঁচাদের কিছু আব্দার শুনতেই হয়। শ্রাবণ মাসে আমাদের গ্রামের সব বাড়িতে কচি-কাঁচার দল মহা-উৎসাহে ঝুলন-উৎসবের অনুষ্ঠানে সামিল হত। আমরা ছোটরা নিজেরাই অনেকটা জায়গা নিয়ে পাহাড়ের মত একটা পরিবেশ মাটি ও ইট-পাথর, নানা ধরনের গাছপালা বা সবুজপত্রযুক্ত গাছপালার ডাল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করে নিতাম এবং রাধাকৃষ্ণ ও পুতুল-আকৃতির নানান মূর্তি দিয়ে আমাদের ছোটদের কাছে বিরাট ঐ পাহাড়টাকে সাজাতাম। এই সাথে ফুল, ফল ও মিষ্টির আয়োজনও নেহাত মন্দ ছিল না।

"ভাদ্র সংক্রান্তির দিনে গৈলা এবং ফুল্লশ্রীর পরে আইগলঝাড়া হাটসংলগ্ন খালে বাইচ বা নৌকার-দৌড় প্রতিযোগিতা হত। এই সাথে খালের পাশে রাস্তায় মেলা বসে যেত। গৈলার রামনাথ দাসের বাড়ির এবং গৈলা স্কুলের সামনের খালেও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত এই প্রতিযোগিতা। খালের দু'পাড় ঘিরে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ আর অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা। প্রতিযোগিতা শুরু হলে ছেলে-বুড়ো সকলের সে কি উৎসাহ, হৈ-চৈ চিৎকার, প্রতিযোগী মাঝিদের উৎসাহ-দান সব কিছু মিলিয়ে এক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান। এই প্রতিযোগিতার জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি নৌকা দু'শ তিনশ' হাত লম্বা কিন্তু চওড়ায় খুব ছোট। নৌকার দুপাশে নৌকার আয়তন অনুযায়ী পঁচিশ থেকে চল্লিশ জন মাঝি তালে তালে বৈঠা ফেলে কি দ্রুতই না নৌকা চালনা করত। নৌকার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে সর্দার মাঝি বৈঠা ফেলার তালে তাল মিলিয়ে

বিরাট আকারের কাঁসরে কাঠির ঘায়ে আওয়াজ তুলে বৈঠাধারীদের উৎসাহিত করতেন। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কারও দেওয়া হত।

"ঐ ভাদ্র সংক্রান্তির দিনের আরেকটি অনুষ্ঠান বিশ্বকর্মা পূজা। এই উপলক্ষে লোহা ও কাঠের সিন্দুক, বাক্স, দা, বটি খুন্তি প্রভৃতির গায়ে সিঁদুর দিয়ে পুতুলের ছবি আঁকা হত। খুব ঘটা করে এবং ধুমধামের সাথে এই পূজার আয়োজন করতেন গ্রামের কর্মকারগণ।

"এই ভাদ্র মাসেই অনেক বাড়িতে ললিতা সপ্তমী, দূর্বা অষ্টমী ও রামনবমীর ব্রত অনুষ্ঠিত হত। নামগুলোই শুধু মনে আছে।

"অবিভক্ত বাংলার সর্বত্র যেমন, আমাদের গৈলা গ্রামেও তেমনি দুর্গাপূজাই ছিল প্রধান পূজা ও উৎসব। গৈলা ও মানসী ফুল্লশ্রীর প্রায় সব বাড়িতেই দুর্গোৎসবের আয়োজন হত। অনেক বাড়িতেই পূজার সংখ্যা ছিল পাঁচ-ছ'টি বা তার চেয়েও অনেক বেশি। সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব নয়। তবে শুনেছি গ্রামে মোট পূজার সংখ্যা দুই শতাধিক। আমাদের দাসের বাড়িতেই চার হিস্যায় চারটি পৃথক পূজার কথা বেশ মনে আছে।..

"..যদিও আশ্বিন মাসটি ছিল দুর্গাপূজার মাস, উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়ে যেত শ্রাবণ মাসে-ই। আমরা ছোটরাও চঞ্চল হয়ে উঠতাম। প্রতি পরিবারেই মা, ঠাকুমা, জেঠীমা, কাকীমা ও পিসিমায়েরা গৃহের ঢেঁকীশালে উপস্থিত হয়ে পূজার আতপ-চাল তৈরি করতেন। ঘরে ঘরে চিঁড়া, মুড়ি ও খই-এর মোয়া, নারকেলের নাড়ু ও মাটির 'সাজে' (অনেকটা ছবির ব্লকের মত) মাছ, আনারস প্রভৃতি নানান আকৃতির সন্দেশ তৈরির ধুম পড়ে যেত। বাড়ির মেয়েরাই এসব করতেন। আমরা ছোটরাও এতে হাত লাগাতাম এবং কারটা ভাল হয় তাই নিয়ে হত প্রতিযোগিতা।...

"মানসী-ফুল্লশ্রী সহ বৃহত্তর গৈলার অনেকেই জেলা শহরে, কলিকাতা বা অন্যত্র সরকারি ও বেসরকারি নানা কাজে যুক্ত ছিলেন। অনেককে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাইরে (আমাদের তখনকার ভাষায় "বিদেশে") থাকতে হত। এদের সকলের কাছেই গ্রামের পূজার একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। যত অসুবিধাই থাক না কেন এ সময়ে বাড়ি আসা চাই-ই। পূজোয় এদের বাড়ি আসাটাই সকলের কাছে এক অপরিসীম আনন্দের ঘটনা। আমরা বাড়ির ছোটরা ক'দিন ধরে বিরাট দীঘিটার পাড়ে ঘুরে-ফিরেই চলে আসতাম, কারণ বাইরে থেকে যাঁরা আসবেন তাঁদের নৌকা বা ছোট 'লঞ্চ' এই দীঘির ঘাটেই এসে থামত। আগেই বলেছি, দীঘির দুপাশ দিয়ে দুটি খাল গ্রামের প্রধান খাল যেটি পশ্চিমে ঘাঘর নদী ও পূবে ঘণ্টেশ্বর বা গৌরনদীর সঙ্গে মিশেছে তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাড়ির লোকজন ছাড়াও পূজার সময় আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অনেকেই আসতেন। শুধু আমাদের দাশের বাড়িই নয়, গৈলা গ্রামটাই লোক সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। আনন্দ কোলাহলে-পূর্ণ গ্রামের এই সময়কার ছবিটি ভোলার নয়।...

"প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রতিমার সামনে আরতি-নৃত্যের অনুষ্ঠান হত। বাড়ির যুবকের দল পালা করে আরতি-নৃত্যে অংশ নিতেন। কাপড়ে মালকোঁচা দিয়ে গেঞ্জি গায়ে বা খালি গায়ে মণ্ডপের সামনের বিশাল প্রাঙ্গণে এই নৃত্যোৎসব অনুষ্ঠান হত। আরতি শুরু হবার আগে একসঙ্গে অনেকগুলো বেশ বড় ধুনুচি (ধূপ জালাবার পাত্র)-তে নারকেলের ছোবড়া ও ধূপ দিয়ে দেশলাই কাঠি বা অন্য কিছুর সাহায্যে জ্বালিয়ে দেওয়া হত। ধুনুচি থেকে শুধু ধোঁয়া বের হত, আর মাঝে মাঝে হাওয়ার তোড়ে আগুনের কণা, যারা আরতি করবেন তারা এক একজন একটি থেকে তিনটি পর্যন্ত ঐ ধুনুচি তুলে নিতেন। যিনি তিনটি নিতেন তার দু'হাতে দু'টি ও মুখে বা মাথায় একটি। নিপুণ নৃত্য-শিল্পীর মতই ঢাক, ঢোল ও কাশর ঘণ্টার তালে তালে তাদের এই আরতি-নৃত্য ছিল এককথায় অপূর্ব। কয়েকজন সব সময়ে তৈরি থাকতেন এবং আরতি-নৃত্যের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে গিয়ে ধুনুচির মধ্যে ধূপ ছড়িয়ে দেওয়া বা কোন ধুনুচির আগুন ফুরিয়ে গেলে নতুন ধুনুচি এগিয়ে দেবার জন্য। পুরুষ ও মহিলা, অসংখ্য মানুষের সমাগম হত আরতি-নৃত্যের প্রাঙ্গণে।

"গ্রামে ইলেকট্রিক আলো ছিল না। বড় ও খুব ভারি ডে-লাইট, হ্যাসাক বাতির আলোকেই

গ্রাম ও গ্রামের পথঘাট আলোকিত হয়ে যেত। মণ্ডপে মোমবাতি, কেরোসিনের ঝাড়-লণ্ঠনও ব্যবহার করা হত। ইলেক্‌ট্রিক না থেকেও আলোর ছড়াছড়ি।....

"বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের পরেই ছিল প্রণাম ও আলিঙ্গনের ('কোলাকুলি'র) পর্ব। ছোটরা বড়দের প্রণাম করতেন। আর বড়রা ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। নানা প্রচলিত মাঙ্গলিক দ্রব্যে পূর্ণ ডালা সকলের মাথায় ছোঁয়াবার ঘটনাও আমার বেশ মনে পড়ে। পরের দিন থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ, প্রণাম ও আলিঙ্গন, আর নারকেলের নাড়ু, সন্দেশ ও বাতাসার ছড়াছড়ি। সব তো খেতে পারতাম না। বাটি ভরে নিয়ে আসতাম। দাশের বাড়ির চার হিস্যার বিভিন্ন পরিবার, তার উপর গোটা গ্রামের অসংখ্য পরিবার। কোন বাড়ি বাদ দেওয়া যাবে না। তাই বিজয়া-পরবর্তী এই সাক্ষাৎকারের পর্ব একমাসেও শেষ হত না। চল্লিশের দশকেও, আমার বেশ মনে পড়ে, কলিকাতার বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের আমরা যারা থাকতাম তারা এই সময়ে একে অপরের বাড়ি যেতাম-ই। বিজয়ার পরবর্তী এই পর্বটিতে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, আন্তরিকতা, সামাজিক সম্পর্কের যে ছবিটি আমার স্মৃতিতে আজও স্পষ্ট তা আমাদের সমাজজীবনের সহজাত মূল্যবোধগুলির বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ...

"দুর্গাপূজার পর আমাদের দাশের বাড়ির বড়রা দু'তিনটি নাটক করতেন। পূজার কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হত নাটকের মহড়া। দাশের বাড়ির যাঁরা কলিকাতা বা অন্যত্র থাকতেন তাঁরা এসে পড়লে নাটকের মহড়া জমে উঠত। আমার বাবা থাকতেন কলিকাতায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনিই নাটক পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন। তিনি নিজেও নাটক লিখতেন, গানও রচনা করতেন, আবার নিজেই সুর দিতেন। তার লেখা 'মিলন' নাটকটি ও নাটকের গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। পূজার অব্যবহিত পরেই নাটক মঞ্চস্থ হত। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকই বেশি হত। সামাজিক নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে। নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারটা আমাদের পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মেয়েব ভূমিকায় ছেলেরাই অভিনয় করতেন। অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে আশেপাশের সব 'বাড়ি' থেকেই লোকজন আসতেন। দূর থেকে যাঁরা আসতেন তাঁরা হ্যারিকেন ও লাঠি সঙ্গে আনতেন। এছাড়া আমাদের গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে নট্ট কোম্পানি ও অন্যান্য দলের 'যাত্রা' ও পালা গানের অনুষ্ঠান হত। এছাড়া সারা বছর ধরেই মাঝে-মধ্যে আমাদের বড় আটচালায় নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন গ্রামের তরুণেরা। এর ফলে সহজ সুন্দর আন্তরিকতায় ভরা একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল আমাদের বাড়িতে ও গ্রামে।

"দুর্গাপূজার পরবর্তী পূর্ণিমাতে প্রায় প্রতি গৃহে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান হত। একে বলা হত "কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা"। সাধারণতঃ কলা গাছ দিয়ে 'কলা বউ' তৈরি করে তাকে লাল পাড় সাদা শাড়ি পরিয়ে সামনে ঘটস্থাপন করে সেই ঘটে ডাব ও আম্রপল্লব দিয়ে ঘটের উপর পূজা হত। কোন কোন বাড়িতে মাটির তৈরি চিত্রিত সরা (হাঁড়ি কলসীর ঢাকনি) বা লক্ষ্মী প্রতিমাও দেখা যেত। বাড়ির মেয়েরা সারাদিন উপবাসী থেকে পূজান্তে অঞ্জলি দিতেন। আড়ম্বর ও আয়োজন কতটা হবে তা নির্ভর করত পরিবারের আর্থিক ক্ষমতার উপর। ঘট বা প্রতিমার সামনে বিরাট একটি ঘরের প্রশস্ত স্থানটি পরিপূর্ণ হয়ে যেত নানা ফল, মিষ্টি, চাল-ডাল তরকারি ও আরো অনেক কিছু দিয়ে সাজান নৈবেদ্যর থালায়। গৃহের প্রবেশ দ্বার থেকে শুরু করে ভেতরে সর্বত্র, বিশেষ করে পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আলপনার ছড়াছড়ি। পায়ের ছাপ দিয়ে লক্ষ্মীর আগমনকে কল্পনা করে নেওয়া হত। বাড়ির মেয়েরা আতপ চালের গুঁড়ো জলে মিশিয়ে বৈচিত্র্যময় অপূর্ব সব আলপনা আঁকতেন। আজকের অনেক শিল্পী ও শিল্প-রসিকও এসব দেখতে পেলে বিস্মিত হয়ে যেতেন। কোন দক্ষ শিল্পীব কাছে এসব ওদের শিখতে হয়নি। কোন তুলির টান ছিল না। হাতের আঙুল, একটুকরো কাপড়ের ছেঁড়া ন্যাকড়া, চালের গুঁড়া ও জলের সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে মেয়েরা কি অপূর্ব শৈল্পিক সৌন্দর্যই না সৃষ্টি করতেন।

"কার্তিক মাসের সব চেয়ে বড় উৎসব দীপান্বিতা কালীপূজা। পূজার উৎসব ছাড়াও প্রতিটি গৃহের চারিদিকে মাটির তৈরি পাত্রে (আমরা বলতাম 'মুচি') তেল ও সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালান হত। এই দীপান্বিতার আলো সন্ধে থেকে আমাদের বাড়ি ও গ্রামকে নতুন সাজে সাজিয়ে দিত। এ আলোক সজ্জায় কোন উগ্রতা ছিল না। একটা শুভ্র, সুন্দর ও স্নিগ্ধ আলো যেন কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও গোটা গ্রামকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ফেলেছে। দীপান্বিতা উৎসবে অনেক বাড়িতেই কলাগাছ দিয়ে ভেলা তৈরি করে বাঁশের বাখারি দিয়ে ও নানা রংয়ের কাগজ দিয়ে নৌকা বা জাহাজের রূপ দেওয়া হত। কদিন আমরা ছোটরা এই নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। ভেলাকে সাজাবার কাজে আমরা বড়দের সাহায্য করতাম তাদের হাতের কাছে নানান উপকরণ যুগিয়ে দিয়ে। দীপান্বিতার দিনে এ নৌকা ও জাহাজকে আলোকমালায় সজ্জিত করে দীঘি বা খালের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত। দাশের বাড়ির চার হিস্যার দীঘিতে এরকম কত নৌকা ও জাহাজ-ই না ভাসত। আমাদের কি ভালই না লাগত।

"কার্তিক মাসে কার্তিক পূজা। বেশ বড় কার্তিক তৈরি করতেন কুমারেরা (কুম্ভকার)। কার্তিক পূজা অনুষ্ঠিত হত আমাদের ভেতর বাড়িতে। গ্রামের পূজার সংখ্যা ছিল অনেক। সব কিছু মনে নেই। তবে পূজার কয়েকদিন আগে মূল ঘট যেখানে প্রতিষ্ঠা করা হত সেই স্থানে চতুর্দিকে ধানের বীজ রোপণ করা হত। পূজার শেষে ঐ বীজ থেকে যে চারা হত সেই চারা বসতবাটীর খুঁটিতে বা অন্যস্থানে বেঁধে রাখা হত। এই কার্তিক মাসের আরেকটি অনুষ্ঠান ছিল প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী দেবতা ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য গ্রামের সর্বত্র "আকাশ প্রদীপ" জ্বালান (বাঁশের ডগায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা)।

"অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন ছিল এক বিরাট আনন্দের উৎসব। ওপার বাংলার প্রতিটি গৃহের অন্যতম প্রাণবন্ত উৎসব নবান্ন। আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী এই পার্বণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি ছিল বেশ বড় আকারের। এই উৎসবের মধ্য দিয়েও দেবার্চনার প্রতি পল্লী বাংলার হিন্দুদের আন্তরিক অনুরাগ ও পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটত। অগ্রহায়ণ মাসে চাষী ক্ষেত থেকে নতুন আমন বা হেমন্তকালীন ধান কেটে আনত। এই ধান কিছুটা বাজারে আসত এবং হাটে বাজারে বিক্রির জন্যও আমদানি হত। কিন্তু গৃহদেবতা বা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন না করে গ্রামের কোন গৃহেই এই নতুন চালের অন্ন ব্যবহার করা হত না। দেবতা ও পূর্বপুরুষদের 'নবান্ন' নিবেদনের পর্বটিকে বলা হত 'পার্বণ-শ্রাদ্ধ'। নবান্ন উৎসবের প্রথম পর্বে গ্রামের সর্বস্তরের প্রতিটি পরিবারের মেয়েরা ভক্তি-নম্র চিত্তে ও পবিত্রভাবে নিজ নিজ ঢেঁকিশালে ধান ভানতেন অর্থাৎ ঢেঁকিতে কুটে ধানের তুষ থেকে কুলার সাহায্যে চাল বের করে নিতেন। সাধারণত শুক্ল পক্ষের কোন একটি ভাল দিনে নবান্ন উৎসব হত। খুব ভোরে উঠে আমরা অর্থাৎ বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েরা দাঁড় কাককে (ঘোর কৃষ্ণবর্ণ) নবান্নের আমন্ত্রণ জানাতে বেরিয়ে পড়তাম। "কাউয়া কো-কো-কো, আজ আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন"—এইরূপ ছড়া কেটে ঐ আমন্ত্রণ জানাতাম। সবটা মনে নেই তবে ঐ ছড়ায় 'যাইয়ো খাইয়ো' এবং 'পাতি (নিম্ন শ্রেণীভুক্ত) কাউয়ারে বলি দিয়া'—এসব কথা ছিল। এই জন্যই হয়ত নবান্ন উৎসবের এই আমন্ত্রণ পর্বটিকে বলা হত 'কাক বলি'। দাঁড় কাককে মনে করা হত যমের দূত। এর পর পার্বণশ্রাদ্ধ। 'খোল ডোঙ্গায়' অর্থাৎ কলা গাছের বাকল (ছাল) দিয়ে তৈরি পাত্রে নতুন চালের গুঁড়া, ডাবের জল, নতুন পাটালি, কমলা লেবুর কোয়া ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রেখে মন্ত্রপাঠ করে তা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে নিবেদন করা হত। এরপর ঐ ডোঙ্গায় রাখা নবান্ন দাঁড় কাককে খাওয়াবার জন্য আমরা নিয়ে যেতাম। খাবার লোভে পাতি কাকেরা দল বেঁধেই চলে আসত, আর ওরা যাতে না খেতে পারে তার জন্য গাছের ডাল, লাঠি বা বাঁশের কঞ্চি হাতে নিয়ে ওদের তাড়াবার জন্য আমাদের সেকি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। এর পরে হত লক্ষ্মীপূজা। আমাদের ছোটদের কাছে সব চেয়ে আকর্ষণীয় পর্বটি হল পরিবার-পরিজনদের জন্য নবান্নের প্রস্তুতি পর্ব। আগেই বলেছি ঢেঁকিতে প্রস্তুত নতুন

চালের গুঁড়ো, ভোরে ভিজিয়ে রাখা সোনালী রংয়ের অতি সুস্বাদু চাকা চাকা আখের গুড়, প্রচুর ডাবের জল, নারকেল কোরা ও কমলা লেবুর কোয়া দিয়ে প্রস্তুত সিন্নির মত অতি উপাদেয় খাবার এই নবান্ন। সেই কাক ভোর থেকেই আমরা যত কিছুতেই ব্যস্ত থাকি না কেন, মন পড়ে থাকত ঐ নবান্ন কখন প্রস্তুত হবে তার দিকে। নবান্ন প্রস্তুত হয়ে যাবার পর কে কত নবান্ন খেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। বাড়ির লোকজন ছাড়া নিমন্ত্রিত মানুষজনও এতে যোগ দিতেন। ঐ দিন কোন গৃহেই মধ্যাহ্নে ভাতের ব্যবস্থা প্রায় ছিলই না। রাতে নানান ব্যঞ্জন সহ নতুন চালের ভাতের নবান্ন হত।

"পৌষ মাসের শেষ দিনে ঘরে ঘরে পৌষ সংক্রান্তির উৎসব বা পিঠে-পার্বণ অনুষ্ঠান হত। কয়েক দিন আগে বাড়ির মেয়েরা মাটি দিয়ে 'সাজ' তৈরি করে শুকিয়ে রাখতেন। এই সাজ মাঝারি আকারের থালার মত, মাঝখানে ঝিনুক দিয়ে কুরান অনেকগুলি গর্ত। সংক্রান্তির দিন ঐ সাজ উনুনে চাপিয়ে একটু গরম হলেই সরষের তেল মাখান ন্যাকড়া দিয়ে গর্তগুলি বুলিয়ে নিয়ে হাতা বা চামচ দিয়ে নতুন চালের গুঁড়োর গোলা ঐসব গর্তে ঢেলে দেওয়া হত। উনুনের তাপে ওগুলো শুকিয়ে সাদা বাতাসার রূপ নিত, বড় ছোট নানা আকৃতির। এসবকে বলা হত 'চিতৈ পিঠা'। খুন্তি বা চামচের হাতল দিয়ে চাড় দিলেই পিঠেগুলো উঠে আসত। এই সময়ে খেজুর গাছের নতুন রস থেকে প্রস্তুত একরকম গুড় পাওয়া যেত। একে বলা হত নলেন (নতুন) গুড়, ঠিক সরষের মত পাতলা। আমরা একে বলতাম 'ভির গুড়'। নারকেল কোরা সহযোগে ভির গুড় দিয়ে চিতৈ পিঠা খাবার আনন্দ আজও ভুলতে পারিনি। পিঠা-পার্বণের দিনে চুষি ও পুলি (ভেতরে নারকেল কোরা বা ক্ষীরের পুর) নলেন গুড় দেওয়া দুধে ফেলে জ্বাল দিয়ে তৈরি হত অপূর্ব স্বাদের পায়েস। এই সময়ে নারকেল কোরার পুর (চিনি বা গুড় দিয়ে তৈরি ও দুধে জ্বাল দেওয়া) বা ক্ষীর দিয়ে তৈরি 'পাটিসাপটা' (পিঠে)'র স্বাদও ভুলিনি। এখনও এ পিঠে হয় কিন্তু দুধের স্বাদ কখনও ঘোলে মেটে না। পৌষ-সংক্রান্তির দিনেও প্রতি ঘরে লক্ষ্মীপূজা হত।

"আমাদের গ্রামের মেয়েরা সারা বছরে বিভিন্ন সময়ে নানা ব্রত উদ্‌যাপন করতেন। যেটির কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়ে সেটি হল মাঘ মাসে 'মাঘ মুণ্ডলের ব্রত' ও 'থোকের ব্রত'। এটি ছিল গ্রামের বালিকাদের একটি অনুষ্ঠান। একটি কাঠির মাথায় দূর্বার গোছা বেঁধে ফুল দিয়ে 'থোক' বানান হত। মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অতি প্রত্যুষে কাক ডাকার পূর্বেই ছোট মেয়েরা ঐ 'থোক' নিয়ে আপন আপন পুকুর ঘাটে গিয়ে থোকের দূর্বা গুচ্ছ জলে ডুবিয়ে মাথায় ও শরীরে তার জল ছিটিয়ে দিত। থোকের জল মাথায় দেবার সময় সকলে সুর করে ছড়া কাটত :

"যে জল ছোঁয় নাই কাকে আর বগে
সেই জল ছুঁইলাম মোরা দূর্বার আগে।"

"মাঘ মাসের আরেকটি বড় উৎসব বারোয়ারী কালীপূজা। মহা ধুমধামের সাথেই পালিত হত এই উৎসব। সব কিছু আজ মনে নেই। গ্রামের অনেক বাড়িতেই সমারোহের সাথে এই পূজা অনুষ্ঠিত হত। অধিক রাত পর্যন্ত চলত পূজার অনুষ্ঠান। ঢাকের বাজনা, হৈ-চৈ এসব মনে আছে। এই উপলক্ষে 'ঢপ কীর্তন' কবি গানের আসর'-এর আয়োজন করা হত। কলেরার মহামারীর আক্রমণ থেকে গ্রাম ও গ্রামবাসী রক্ষা পাবে এই বিশ্বাস থেকেই এই সময়ের কালীপূজার অনুষ্ঠান।

"নির্মল হৈ-হুল্লোড় ও আনন্দের আরেক উৎসবের নাম "দোলযাত্রা"—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার দিনের অনুষ্ঠান এটি। এই উপলক্ষে নির্মিত হত মাটির 'দোলমঞ্চ'। অনেক বাড়িতে পাকা দোলমঞ্চও ছিল। এখানে রাধা-কৃষ্ণের দোলা ঝুলান থাকত। এই উৎসবকে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-উৎসবও বলা হয়। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা, মলিনতা শূন্য সম্প্রীতি ও আন্তরিকতায় ভরা অপূর্ব অনুষ্ঠান যা আজকের দিনের দোল-উৎসবের দিনে কল্পনা করা যাবে না। এখনকার এই উৎসব নির্মল আনন্দের পরিবর্তে আতঙ্কের বার্তা নিয়ে আসে। আমার দেখা ছেলেবেলার চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। দোলের দিন গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকের হাতে একটি করে বাঁশের তৈরি পিচকারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়ির বড়রা ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে এনে এই পিচকারী তৈরি করে দিতেন।

উৎসবে নানা রংয়ের আবিরের ছড়াছড়ি। ছোটরা বালতিতে আবির গুলে পিচকারী দিয়ে সেই জল ছুঁড়ে দেবার খেলাটাই পছন্দ করত। কোথাও সামান্যতম আবিলতার চিহ্ন ছিল না, ছিল শুধু অনাবিল আনন্দের ঢেউ। দোল উৎসবের পূর্বদিন সন্ধ্যায় "বাইল" অর্থাৎ নারকেল গাছের পাতা সহ ডাল দিয়ে বানানো 'বুড়ির ঘর' সন্ধ্যার পরে ছড়া কাটতে কাটতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। ছড়ার একটি লাইন মনে আছে ঃ 'ও বুড়ি তোর ঘরে আগুন—বাইরে যে তুফান।' দোল উৎসব উপলক্ষে গৈলা বাজারের সব মিষ্টির দোকানে চিনি বা মিছরি দিয়ে নানা রংয়ের মঠ বা খেলনা আকৃতির মিষ্টি তৈরি হত। সব বাড়িতেই এই মিষ্টি প্রচুর পরিমাণে আনা হত—বিশেষ করে ছোটদের জন্য। ছোটরা বড়দের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করত। আর বড়রা ছোটদের মাথায় আবির ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করতেন। সকলেরই জুটত মঠ বা মিষ্টি খেলনা।...

"চৈত্র মাসের সব চেয়ে বড় উৎসব ছিল "নীল-উৎসব" বা 'নীলকণ্ঠ শিবের পূজা'। খেজুর ভাঙ্গা বা খেজুরের ছড়া (থোকা) ভাঙা দিয়ে উৎসবের শুরু। চার দিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলত। অনুষ্ঠানটি বেশ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। সব কিছু আজ আর স্মরণে নেই। আমাদের বাড়ির চার হিস্যাব চারটি বেশ বড় কাঠ ও টিনের তৈরি 'দোলা' (পাল্কী) ছিল। উৎসবের পূর্বে নানান রংয়ের কাগজ দিয়ে দোলাগুলি সুন্দর করে সাজান হত। প্রথম দিন দাশের বাড়ির তিন হিস্যার কেন্দ্রস্থলে চারটি দোলা আনা হত। পঁচিশ ত্রিশজন বা তার চেয়েও বেশি সংখ্যক 'বালা' (পাল্কীবাহক) ওখানে জড়ো হয়ে নানা ধরনের ছড়া কাটত, যেমন ঃ

'হেমন্ত বসন্ত কালে নানা পুষ্প ফোটে,
ফোটে ডালে জবা পুষ্প দেখিতে সুন্দর।'
বা 'ছেঁড়া কাঁথা মুড়ো (ন্যাড়া) মাথা
সোনার মানুষ যায়।'

এর পর বালারা দোলা নিয়ে বিভিন্নস্থানে চলে যেত ভিক্ষে করতে। গ্রামে গ্রামে খোল করতাল সহযোগে নানা রকম নাচ গান ও নীলের ছড়া কেটে শিবের কাছে গৃহস্থদের মঙ্গল কামনা করত। তিন চার দিন পরে বালারা আমাদের বাড়ি ফিরে আসত। সন্ধে থেকে কিছুটা রাত পর্যন্ত নানান অনুষ্ঠনের পর বালারা দোলা নিয়ে গৈলা বাজারে চলে যেত। বাজারে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির অনেক দোলা ও অনেক বালার সমাবেশ হত। সারা রাত ধরে এক বীভৎস উৎসব হত। চলত নাচ, গান ও ছড়া কাটার ধুম। ছড়ার কয়েকটা শব্দ আমার মনে আছে ঃ "যা যা মরা ছুইয়া (বা ছাইয়া) জ্যান্ত খা", আর সে কি বলার ধরন। গা ছমছম করত। কিন্তু সব কিছুই আমাদের বাড়িগুলি থেকে বেশ দূরে ঐ বাজারের খোলা স্থানটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বড়রা আমাদের বড় একটা ওখানে যেতে দিতে চাইতেন না, আমরা ভয় পেতে পারি এই কারণে। নীলের এই পর্বকে বলা হত 'পাট ভাঙা' বা 'বাজার সন্ন্যাস'। এর আগে দুটি পর্ব ছিল 'শিকার' ও 'গৃহসন্ন্যাস'। চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে শিব-পূজার মধ্য দিয়ে শেষ হত নীল উৎসব।

চৈত্র মাসে, অনেক সময় ফাল্গুনে গৈলা বাজারে সব দোকানীরা মিলে চাঁদা তুলে মহা ধুমধামের সাথে বাজারের একপাশে শ্মশানকালীর পূজার আয়োজন করতেন। এই উপলক্ষে যাত্রা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান হত।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন ও পয়লা বৈশাখ রামনাথ দাশের বাড়ি, গৈলা বাজার এবং ফুল্লশ্রীতে বেশ বড় আকারের মেলা হত। আমরা এই মেলাকে বলতাম "খৌল"। মেলায় কতকিছুই না পাওয়া যেত। সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তু জিনিস ছাড়াও পুতুল ও নানারকম খেলনাও পাওয়া যেত। বড়রা আমাদের পয়সা দিতেন পছন্দমত খেলনা বা খাবার জিনিস কেনার জন্য। এক পয়সা দিলেই একটা খেলনা পাওয়া যেত। মেলায় খুব ভিড় হত।

উপরে যে সব পালা-পার্বণের কথা লেখা হল সেসব ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে গ্রামের মহিলারা পঞ্চমীর ব্রত ও এয়োসংক্রান্তি ফলদান, সাবিত্রী, অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় সিন্দুর, অশোকাষ্টমী, ডোবের ব্রত, খাড়া আকুলাই, বৈঠা আকুলাই, খাড়াই চণ্ডী প্রভৃতি ব্রত উদ্‌যাপন

করতেন। অনেক ক্ষেত্রেই বহুলোক, বিশেষ করে মেয়েদের খাওয়ান হত, পুরোহিতদের অনেক কিছু দান করা হত। বাড়ির বয়স্ক মহিলারা ব্রত কথা শোনাতেন এবং ব্রতকথার আসরে উপস্থিত মহিলারা দূর্বা হাতে নিয়ে ভক্তি-নম্র চিত্তে ব্রতকথা শুনতেন। কুমারী মেয়েরা 'মাঘ মুণ্ডলের ব্রত' ছাড়াও 'যম বুদ্দি' 'থুরপোলী' 'তারার ব্রত'ও উদ্‌যাপন করতেন। 'শিবরাত্রির ব্রত' ছোট-বড় সকল মেয়েরাই পালন করতেন। বারমাসিক অন্যান্য পূজার মধ্যে ছিল রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী পূজা।

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, মনসাপূজা প্রভৃতি কয়েকটি অনুষ্ঠানে পাঁঠা বলি হত। কোনটিতে আবার মহিষ বলির ব্যবস্থাও ছিল। আমি ছোটবেলায় ঐসব অনুষ্ঠানের বলির পর্বে উপস্থিত হতাম না। কয়েকবার দেখার পরই বলির ও বলির বাজনা আমার অসহ্য মনে হত। একটা কষ্ট ও যন্ত্রণা অনুভব করতাম। পাঁঠার করুণ আর্ত-চিৎকার, পরবর্তী অবস্থা ও রক্তের বন্যা আর সেই সঙ্গে বলির বাজনা—সব মিলিয়ে একটা বীভৎস ছবি। আমি এ সময়ে পূজার প্রাঙ্গণে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ছ'বছর থেকে পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি পাঁঠার মাংস স্পর্শ করিনি। পূজা উপলক্ষে প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি বাড়িতে মহিষ বলি হত, ঐ একই দৃশ্য। অনেকেরই হয়ত ভাল লাগত না, ভাল না লাগারই কথা। তথাকথিত শাস্ত্রের অনুশাসন (দোহাই) ও অন্ধ আবেগের তাড়নায় ফলশ্রুতি এসব ঘটনা। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, শিক্ষিত জনের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এবং সর্বোপরি স্বদেশী আন্দোলনের চাপে পূজায় বলিদান প্রথার আকর্ষণ কমে আসে, মহিষ বলি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।"

বলিদানের পর্বটুকু বাদ দিলে গ্রামের সব পালা-পার্বণই ছিল আকর্ষণীয়। ছেলে বেলার স্মৃতিপটে আঁকা পালা-পার্বণের ছবি যতটা সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা আমি করেছি। সব কিছু মনে নেই, তাই সঠিক চিত্রটি তুলে ধরাও সম্ভব হল না। এপার বাংলা—ওপার বাংলায় পালা-পার্বণ আজও আছে, সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু আকারে, প্রকারে ও আন্তরিকতার প্রশ্নে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এসব পালা-পার্বণই ছিল গ্রামের হিন্দু-সম্প্রদায়ের পালিত অনুষ্ঠান। কিন্তু এসবের মাঝেই ছিল সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের মঙ্গল কামনা, অন্যায় ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কিছু একটা করার মানসিকতার প্রতিফলন। জীবনে চলার পথে যেসব রোগ, শোক, বিপদ-আপদ ও ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হতে হয় তার উৎস সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও অনভিজ্ঞতাই মানুষকে প্রতিকারের কথা ভাবতে শিখিয়েছে। এই সব পালা-পার্বণের মধ্যে সেই সব ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে। আর তাই সব সম্প্রদায়ের মানুষকেই এই সকল অনুষ্ঠান এক সময়ে আকৃষ্ট করেছে। আমার দেখা পালা-পার্বণের অনুষ্ঠানে সম্প্রীতি, মিলন ও সামাজিক ঐক্যের সুর আমি প্রত্যক্ষ করেছি। দুর্গোৎসব বা অন্য অনেক অনুষ্ঠানে নতুন সাজে নমঃ-শূদ্র বা অন্য কোন তথাকথিত নিম্নবর্ণের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতি যেমন দেখেছি, তেমনি পূজা প্রাঙ্গণে মুসলিম-সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলে-মেয়েদেরও সামিল হতে দেখেছি। কারো ক্ষেত্রেই অবহেলা চোখে পড়েনি। সব মিলিয়ে মিলনের ঐক্যের সুর। আর সম্ভবতঃ এই কারণেই দেশ ভাগাভাগির প্রাক্-মুহূর্তে দেশজোড়া ভয়াবহ দাঙ্গার পরিবেশেও মৌলবাদী শক্তি অন্ততঃ আমাদের গ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। দেশ বিভাগের পর আমাদের গ্রামের সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ মানুষজন অন্যত্র বিশেষ করে এপার বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেটা মূলতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে, সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত কোন পরিবেশের চাপে নিশ্চয়ই নয়।*

*বাংলা থেকে বাংলা—কালীপদ সেনগুপ্ত।

বাকরগঞ্জ
দেশভাগের সময়
বাকরগঞ্জ জেলার সাধারণ বিবরণ

সীমা:
উত্তরে—ফরিদপুর জেলা,
দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর,
পূর্বে—নোয়াখালি জেলা,
পশ্চিমে— খুলনা জেলা।
লোকসংখ্যা—চব্বিশ লক্ষ।
পরিমাণ—৪৫০০ বর্গ মাইল।

প্রধান নদী—মেঘনা, কীর্তনখোলা, আড়িয়ালখাঁ, বিষখালি, তেতুলিয়া, মধুমতী, দামোদর, ইলসা, কচা, ফুলতলা, নলচিটি, স্বরূপকাঠি, কালীজিরা, কালাবদর, সাতবাড়িয়া।

মহকুমা—(১) বরিশাল (সদর), (২) পিরোজপুর, (৩) পটুয়াখালি, (৪) ভোলা বা দক্ষিণ সাহাবাজপুর।

(১) বরিশাল (সদর) মহকুমা

সীমা :
উত্তরে—ফরিদপুর জেলা;
দক্ষিণে—পটুয়াখালি;
পূর্বে—মেঘনা ও তেতুলিয়া নদী;
পশ্চিমে—পিরোজপুর ও মাদারিপুর মহকুমা।

প্রধান নগর :

বরিশাল—চারিটি স্কুল ও একটি কলেজ হল—(১) বরিশাল জেলা স্কুল; (২) বি. এম্ স্কুল; (৩) টাউন স্কুল (৪) আস্মত্ আলি খাঁ ইনস্টিটিউশন। কলেজটির নাম—ব্রজমোহন কলেজ। দুটি বাজার, একটি হাট ও স্টিমার অফিস।

পুলিশ স্টেশন ও থানা :

বরিশাল (সদর) মহকুমায় মোট এগারটি থানা: (১) কোতওয়ালি, (২) বাকরগঞ্জ, (৩) রাজাপুর, (৪) নলচিটি, (৫) ঝালকাঠি, (৬) গৌরনদী, (৭) উজিরপুর, (৮) বাবুগঞ্জ, (৯) মেন্দিগঞ্জ, (১০) বদরটুনি, (১১) মূলাদি।

১। কোতওয়ালি থানা (বরিশাল)

সীমা :
উত্তরে—বাবুগঞ্জ ও মেন্দিগঞ্জ থানা;
দক্ষিণে—নলচিটি থানা;
পূর্বে—মেন্দিগঞ্জ ও তেতুলিয়া নদী;
পশ্চিমে—ঝালকাঠি ও বাবুগঞ্জ থানা।

প্রধান শহর—বরিশাল।

প্রধান স্থানসমূহ :

সায়েস্তাবাদ—মীর উপাধি বিশিষ্ট সৈয়দ বংশীয় মুসলমান জমিদারদেব বাসস্থান।
লাখুটিয়া—রাসপূর্ণিমায় প্রকাণ্ড মেলা হত।

কাশীপুর—বিরূপক্ষ শিব ও মহামায়া দেবীর মন্দির বিখ্যাত।

প্রধান গ্রাম : জগদ্দল, হিজলতলা, রূপাতলী, জাগুয়া, রায়পাশা, কালীজিরা, কড়াপুর, শোলনা ও কলসগ্রাম।

প্রধান বন্দর : কালীগঞ্জ, সাহেবের হাট ও বুখইনগর।

স্টিমার স্টেশন : বরিশাল, সায়েস্তাবাদ ও জাহাপুর।

২। বাকরগঞ্জ থানা

সীমা:

উত্তরে—কোতওয়ালি থানা;

দক্ষিণে—পটুয়াখালি থানা;

পূর্বে—তেতুলিয়া নদী ও বাউফল থানা;

পশ্চিমে—নলচিটি ও রাজাপুর থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

বাকরগঞ্জ—জেলার প্রধান নগর।

সাহেবগঞ্জ—প্রধান বন্দর।

কলসকাঠি—বহু ব্রাহ্মণ জমিদার বসবাস করতেন। গণেশ পূজার মেলা বিখ্যাত ছিল। উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে।

দুধল—জমিদারপ্রধান স্থান।

শিয়ালগুণি—নসরৎ গাজির মস্‌জিদ।

নন্দপাড়া—ক্রমখাঁর দিঘি ও বার আওলিয়ার দরগা। ১২ জন প্রসিদ্ধ আওলিয়াএখানে নমাজ পড়তেন।

কোটের হাট—সুপারির ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।

প্রধান গ্রাম : বাদলপাড়া, দাড়িয়াল, বলইকাটি, কাজলাকাটি, বীরনারায়ণ, ভাতশালা, বাহাদুরপুর, রঘুনাথপুর, হেলেঞ্চা, কারধা প্রভৃতি।

স্টিমার স্টেশন : রাণীরহাট, হল্‌তা, খয়রাবাদ; বীরনারায়ণ, কলকাঠি ও সাহেবগঞ্জ।

৩। রাজাপুর থানা

সীমা :

উত্তরে—নলচিটি;

দক্ষিণে—বেতাগি থানা;

পূর্বে—বাকরগঞ্জ থানা;

পশ্চিমে—ঝালকাঠি থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

রাজাপুর—বন্দর। দাতব্য চিকিৎসালয়, সাবরেজেস্টারি অফিস ও স্টিমার স্টেশন।

ভবানীপুর—মুসলমান প্রধান স্থান। ঢাকার নবাব সাহেবের তহশিল কাছারি ছিল। স্টিমার স্টেশন।

৪। নলচিটি থানা

সীমা :

উত্তরে—কোতওয়ালি থানা,

দক্ষিণে—করাজাপুর থানা;

পশ্চিমে—ঝালকাঠি থানা;

পূর্বে—বাকরগঞ্জ থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

নলচিটি—বন্দর। নলচিটি মিউনিসিপ্যালিটি। তৈলের কল, স্টিমার স্টেশন ও রাজ রাজবল্লভের তারামন্দির ছিল।

সিদ্ধকাটি—কুলীন বৈদ্য জমিদারের বাসস্থান ছিল।

মানপাশা—পণ্ডিতদের বাসস্থান ছিল।

নথুল্লাবাদ—বসুবংশীয় কায়স্থদের বসবাস ছিল। এখানকার দক্ষিণ চক্র নামক শালগ্রাম শিল বিখ্যাত ছিল।

অভযনিল—কুলীন কায়স্থ প্রধান গ্রাম।

হয়বৎপুর, কুলকাঠি, সরমহল, বারইকরণ ও কুশঙ্গল।

৫। ঝালকাটি থানা

সীমা :

উত্তরে—উজিরপুর থানা;

দক্ষিণে—রাজাপুর থানা;

পশ্চিমে—কাউখালি, স্বরূপকাটি ও বানারিপাড়া থানা,

পূর্বে—বাবুগঞ্জ, কোতওয়ালি ও নলচিটি থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

ঝালকাঠি—বিখ্যাত বন্দর। এক সময় বলা হত মহারাজগঞ্জ। দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল, লবণের আফিস ও স্টিমার আফিস এবং তেল কলের জন্য পরিচিত ছিল।

কীর্তিপাশা—জমিদার প্রধান স্থান ছিল। একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে।

বাসন্ডা, রামচন্দ্রপুর ও কেওড়া—জমিদার প্রধান স্থান ছিল।

গাভা—ঘোষ বংশীয় কুলীন কায়স্থগণ বসবাস ছিল। একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও বাজার আছে।

পোনাবালিয়া—পীঠস্থান। বিখ্যাত শিবমন্দিরে প্রতিবৎসর শিবচতুর্দশীতে যাত্রীব সমাগম হয়।

বড়হাট : নবগ্রাম, আমুরাবাদ, বামন ও কাকড়াবাড়িতে।

বিখ্যাত গ্রাম : বেলদাখান, ওটিয়া, হানুয়া, বাউকাঠি, বারপাইকা, নারায়ণপুর, রৈভদ্রদি, পাঁজিপুঁথিপাড়া, পিপুইলতা, পঞ্চকরণ, হোসনপুর ও ভারুকাঠি।

৬। গৌরনদী থানা

সীমা :

উত্তরে —ভূরঘাটা নদী;

পশ্চিমে—মাদারিপুর থানা;

দক্ষিণে—উজিরপুর ও বানারিপাড়া থানা;

পূর্বে—মূলাদি ও বাবুগঞ্জ থানা।

প্রধান স্থানসমূহ ·

গৈলা—শিক্ষিত বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদের বসবাস ছিল। একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল, কবীন্দ্র কলেজ, ও মধ্য ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়।

ফুল্লশ্রী—মনসামঙ্গল প্রণেতা কবি বিজয় গুপ্তের বাড়ি। মনসাদেবীর পবিত্র ঘটের জন্য বিখ্যাত।

চাঁদসি—একসময় ক্ষতচিকিৎসকগণ বিখ্যাত ছিলেন।

নলচিরা—একসময় নিমন বদ্বীপ বলা হত।

বাটাজোড়—অশ্বিনীকুমার দত্ত ও রায়বাহাদুর দ্বারকানাথ দত্ত বাসস্থান। প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে এখানে মেলা হত।

টরকি—একটি বন্দর।

পালারদি—বন্দর ও স্টিমার স্টেশন।

পিপ্‌লাকাঠি ও খাজুরতলা—স্টিমার স্টেশন।

রামসিদ্ধি—একটি প্রাচীন মস্‌জিদ আছে।

বারথি, চাঁদসী, চন্দ্রহার ও লক্ষ্মণকাঠি—উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় বিশিষ্ট গ্রাম।

প্রধান গ্রাম : আগরপুর, মাহিলারা, অধুনা, শোলোক, লক্ষ্মণকাঠি, বাঁকাল, আটক, জয়শিরকাঠি, বাসুদেবপাড়া, বিল্বগ্রাম, হস্তীশুন্ড, বাগ্‌ধা ও বাঁকাই।

৭। উজিরপুর থানা

সীমা :

উত্তরে—গৌরনদী থানা;

পশ্চিমে—বানরিপাড়া থানা;

দক্ষিণে—ঝালকাঠি থানা;

পূর্বে—বাবুগঞ্জ থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

উজিরপুর—সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল। অনেক টোল, এবং একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের বাসস্থান।

শিকারপুর—উগ্রতারা দেবীর মন্দির বিখ্যাত ছিল। একটি পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত।

প্রসিদ্ধ গ্রাম : জয়শ্রী, হবিবপুর, ধামসার, কেশবপুর, বামরাইল, মুণ্ডপাশা ও রাজগঞ্জ।

৮। বাবুগঞ্জ থানা

সীমা :

উত্তরে—গৌরনদী থানা;

পশ্চিমে—ঝালকাঠি থানা;

দক্ষিণে—কোতওয়ালি থানা;

পূর্বে—মূলাদি, মেন্দিগঞ্জ ও কোতওয়ালি থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

মাধবপাশা—এখানে ছিল চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের রাজধানী। দুর্গাসাগর নামক প্রকাণ্ড জলাশয় ও সাহা জাতীয় জমিদারগণ প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রতাপপুর—চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের একটি শাখার বাসস্থান ছিল।

রহমৎপুর—শিক্ষিত ও কুলীন ব্রাহ্মণের বসতি এবং ব্রাহ্মণ জমিদার ও উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রধান বন্দর : বাবুগঞ্জ, মীরগঞ্জ ও মোহনগঞ্জ।

প্রধান গ্রাম : দ্বারিকা, রাকুদিয়া, খাতুরা, মুসুরিয়া, পাংশা, চরমলঙ্গা, চন্দ্রপাড়া, বাদলা ও বারৈখালি।

৯। মেন্দিগঞ্জ থানা

সীমা :

উত্তরে—বদরটুনি থানা;

পশ্চিমে—কোতওয়ালি থানা ও মূলাদি থানা,

দক্ষিণে—কোতওয়ালি থানা;

পূর্বে—তেতুলিয়া নদী।

প্রধান স্থানসমূহ :

গোবিন্দপুর—চাঁদ রায়, কেদার রায় প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব মন্দির বিখ্যাত ছিল।

উত্তর সাহাবাজপুর—একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাসস্থান ছিল।

লতা—একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি সার্কেল স্কুল ছিল। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক বসবাস করতেন।

উলানিয়া—মুসলমান জমিদারগণের বাসস্থান। একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল ছিল।

প্রধান বন্দর : পাতারহাট, শ্যামেরহাট, হিজলা, প্রফুল্লগঞ্জ বাতুলাতলি ও কালীগঞ্জ।

স্টিমার স্টেশন : ভাসানচর, পাহারহাট, লালগঞ্জ ও দাদপুর।

প্রধান গ্রাম : সাহসপুর, নলগোড়া, চরহোগলা, মল্লিকপুর, আজিমপুর, আঁধারমাণিক, সরিপের চর, সোনাপুরা, হাড়িয়া, উদয়পুর, কাদিরাবাদ, সন্তোষপুর, ভঙ্গা, গাগুরিয়া, ও কাঠালতলি।

১০। বদরটুনি থানা

সীমা :

উত্তরে—হাটুরিয়া ও মেঘনা নদী;

পশ্চিমে—মুলাদি থানা;

দক্ষিণে—মেন্দিগঞ্জ থানা;

পূর্বে—মেঘনা ও মেন্দিগঞ্জ থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

শ্রীরামপুর—স্টিমার স্টেশন ও থানার জন্য বিখ্যাত।

কাউরিয়া—হিন্দু জমিদার ও বহু ভদ্রলোকের বাসস্থান ছিল।

প্রধান স্থান : মাউলতলা, গঙ্গাপুর, গুয়াবাড়িয়া, হরিনাথপুর, রামনগর, মহিষখোলা, চিড়াখোলা, ধূলখোলা, কানাইগঞ্জ, নরসিংপুর।

১১। মূলাদি থানা

সীমা :

উত্তরে—হাটুরিয়া নদী;

পশ্চিমে—বাবুগঞ্জ ও গৌরনদী থানা;

দক্ষিণে—মেন্দিগঞ্জ ও কোতওয়ালি থানা;

পূর্বে—বদরটুনি ও মেন্দিগঞ্জ থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

মূলাদি বা সাগঞ্জ—প্রসিদ্ধ বন্দর। ধনী মহাজনদের কারবারের জন্য বিখ্যাত। প্রতি সোমবার বড় বাজার বসত।

গাছুয়া—স্টিমার স্টেশন, মুসলমান জমিদারগণের বাস ছিল।

সাফিপুর—স্টিমার স্টেশন ছিল। মুসলমান জমিদারদের বাস।

নন্দিবাজার, কালেখাঁর চর—এই দুইটি স্থানেও স্টিমার স্টেশন আছে।

ইচলি—দত্তবংশীয় জমিদারদের বাসস্থান ছিল।

প্রধান গ্রাম : কাজির চর, লক্ষ্মীপুরা, কুতুবপুর, মনসাগঞ্জ, হোসেনাবাদ ও চরপদ্মা।

(২) পিরোজপুর মহকুমা

সীমা :

উত্তরে—মাদারিপুর মহকুমা ও বরিশাল সদর মহকুমা;

পশ্চিমে—বলেশ্বর নদী;

দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর;

পূর্বে—বরিশাল সদর মহকুমা ও পটুয়াখালি মহকুমা।

প্রধান শহর :

পিরোজপুর—দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত। এই শহরে আছে জলের কল ও উচ্চ ইংরেজি স্কুল।

পুলিশ স্টেশন বা থানা :

পিরোজপুর মহকুমা নয়টি থানায় বিভক্ত, যথা—

(১) পিরোজপুর; (২) বানরিপাড়া; (৩) কাউখালি; (৪) ভাণ্ডারিয়া, (৫) স্বরূপকাঠি; (৬) নাজিরপুর; (৭) মঠবাড়িয়া; (৮) পাথরঘাটা; (৯) বামনা।

১। পিরোজপুর থানা

সীমা :

উত্তরে—নাজিরপুর থানা;

পশ্চিমে—বলেশ্বর নদী;

দক্ষিণে—ভাণ্ডারিয়া ও পাথরঘাটা থানা;

পূর্বে—কাউখালি থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

রাণীপুর—শিক্ষিত লোকের বাসস্থান ছিল।

রায়েরকাঠি—কায়স্থ জমিদার প্রধান স্থান ছিল। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে দীর্ঘকাল।

কদমতলা—একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে।

কুমারখালি—দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

হুলারহাট—কচা নদীর তীরে অবস্থিত; স্টিমার জংশন। তাছাড়া আছে সাব্‌পোস্ট অফিস।

প্রধান গ্রাম : পাড়েরহাট, উমেদপুর, তারাবুনিয়া, কুমিরমারা।

২। বানরিপাড়া থানা

সীমা :

উত্তরে—গৌরনদী থানা;

পশ্চিমে—নাজিরপুর থানা;

দক্ষিণে—স্বরূপকাঠি থানা;

পূর্বে—উজিরপুর ও ঝালকাঠি থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

বানরিপাড়া—শিক্ষিত কুলীন কায়স্থ প্রধান স্থান ছিল। এখানে আছে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, মডেল বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ঝুলন্ত লোহার পুল।

চাহার—শিক্ষিত মুসলমানগণের বাসস্থান।

নরোত্তমপুর—ঘোষবংশীয় কুলীন কায়স্থদের বসবাস ছিল। পরমহংসদেবের একটি আশ্রম বিখ্যাত ছিল।

আল্‌তা—শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ছিল।

বাইশারি—এখানে হাট, বাজার ও একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে। গণ্যমান্য লোকের বাসস্থান ছিল।

মাছরঙ্—বাদ্যকরা ছিল বিখ্যাত।

দত্তপাড়া—সাহা জমিদারগণের বাসভূমি ছিল।

খলিসাকোটা—শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের বাসস্থান ছিল। একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও একটি সংস্কৃত কলেজ ছিল।

বিখ্যাত বন্দর : চাউলাকাট, বসুরহাট, নন্দরায়ের হাট ও বানরিপাড়া।

প্রধান গ্রাম : কুন্দহার, বাগ্‌পুর, ইলুহার।

৩। কাউখালি থানা

সীমা :

উত্তরে—নাজিরপুর ও স্বরূপকাঠি থানা;

পশ্চিমে—পিরোজপুর থানা;

দক্ষিণে—পিরোজপুর থানা;

পূর্বে—স্বরূপকাঠি ও ঝালকাঠি থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

কাউখালি—প্রসিদ্ধ বন্দর; স্টিমার স্টেশন।

আমরাজুরি—দত্তবংশীয় জমিদারদিগের বাসভূমি ছিল।

সাটুরিয়া—এখানকার মিঞা উপাধিধারী মুসলমান জমিদার বিখ্যাত ছিল।

প্রধান গ্রাম : গোপালপুর, ধারবী, বিজয়নগর, নোয়াপাড়া।

৪। ভান্ডারিয়া থানা

সীমা :

উত্তরে—কাউখালি থানা;

পশ্চিমে—পাথরঘাটা থানা;

দক্ষিণে—বামনা থানা;

পূর্বে—রাজাপুর ও বেতাগি থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

ভাণ্ডারিয়া—বড় বন্দর। সুপারির ব্যবসাকেন্দ্র। বড় মেলা হত।

প্রধান গ্রাম : সাতবেড়িয়া, রাজপাশা, গাজিপুর।

৫। স্বরূপকাঠি থানা

সীমা :

উত্তরে—বানারিপাড়া থানা;

পশ্চিমে—কাউখালি ও নাজিরপুর থানা;

দক্ষিণে—ঝালকাঠি থানা;

পূর্বে—ঝালকাঠি থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :

স্বরূপকাঠি—শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাসস্থান ছিল; মধ্য ইংরেজি স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্টিমার স্টেশন ও বন্দর।

জলাবাড়ি—কায়স্থ জমিদার-প্রধান স্থান ছিল। উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও স্টিমার স্টেশন।

সোহাগদল—শিক্ষিত ভদ্রলোক-বহুল স্থান ছিল। এখানে একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল, মাদ্রাসা ও বন্দর ছিল।

সুতিয়াকাটি—কাঠের ব্যবসাকেন্দ্র।
বড়ছাকাটা—একটি বন্দর;
প্রধান গ্রাম : কামারকাটি—শর্শিনা, জ্ঞানপাড়া, মুনিনাগ, কৌড়িখারা ও সমুদয়কাটি।
৬। নাজিরপুর থানা
সীমা :
উত্তরে—মাদারিপুর মহকুমা;
পশ্চিমে—বলেশ্বর নদী;
দক্ষিণে—কাউখালি ও পিরোজপুব থানা।
পূর্বে—বানরিপাড়া ও স্বরূপকাঠি থানা।
প্রধান স্থানসমূহ :
নাজিরপুর—অধিকাংশই নমঃশুদ্র প্রধান স্থান ছিল; স্টিমার স্টেশন।
প্রধান গ্রাম : ঘোষকাঠি, নন্দিপাড়া, বামনগর, জয়পুর, সাতকাছিমা।
৭। মঠবাড়িয়া থানা
সীমা :
উত্তরে—পাথরঘাটা থানা;
পশ্চিমে—হরিণঘাটা নদী;
দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর;
পূর্বে—বামনা থানা।
প্রধান স্থানসমূহ :
মঠবাড়িয়া—প্রসিদ্ধ বন্দর। খাসমহালের কাছারি ছিল। সাবরেজেস্টারি অফিস।
আমরগাছিয়া বা দেবনাথপুর—টাকির জমিদারগণের তহশিল কাছারি ছিল।
তুষখালি—প্রসিদ্ধ বন্দর।
প্রধান গ্রাম : জিয়াল পাড়া, চরদুয়ানি, কালামিএগ।
দুইটি নদী : (১) সাপলেজ ও (২) আগুনমুখা।
৮। পাথরঘাটা থানা
সীমা :
উত্তরে—পিরোজপুর থানা;
পশ্চিমে—বলেশ্বর নদী;
দক্ষিণে—মঠবাড়িয়া থানা;
পূর্বে—ভান্ডারিয়া ও বাম্‌না থানা।
প্রধান স্থানসমূহ : আতরখালি, তেলিখালি ও বালিপাড়া।
৯। বাম্‌না থানা
সীমা :
উত্তরে—ভান্ডারিয়া থানা,
পশ্চিমে—মঠবাড়িয়া থানা;
দক্ষিণে—মঠবাড়িয়া থানা;
পূর্বে—বিষখালি নদী।
প্রধান স্থানসমূহ :
বাম্‌না—মুসলমান জমিদারদিগের বাসস্থান ছিল। বড় হাট বসে।
অন্যয়া—প্রধান বন্দর। স্টিমার স্টেশন।
প্রধান গ্রাম : লক্ষ্মীপুর, সোনামুখী, মণ্ডলপাড়া।

(৩) পটুয়াখালি মহকুমা

সীমা :
উত্তরে—বরিশাল সদর মহকুমা;
পশ্চিমে—পিরোজপুর মহকুমা;
দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর;
পূর্বে—তেঁতুলিয়া নদী ও বঙ্গোপসাগর।

পুলিশ স্টেশন ও থানা :
পটুয়াখালি মহকুমায় আটটি থানা। যথা —
(১) পটুয়াখালি; (২) বাউফল; (৩) গলাচিপা; (৪) আমতলি; (৫) মৃজাগঞ্জ; (৬) বেতাগি; (৭) কলাপাড়া; (৮) বরগুণা।

(১) পটুয়াখালি থানা

সীমা :
উত্তরে—বাকরগঞ্জ থানা ;
পশ্চিমে—মৃজাগঞ্জ ও বেতাগি থানা ;
দক্ষিণে—গলাচিপা ও আমতলি থানা ;
পূর্বে—বাউফল থানা।

প্রধান স্থানসমূহ :
পটুয়াখালি—একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে।
বগা ও ভূরিয়া—বড় বড় চাউলের ব্যবসাকেন্দ্র।
আয়লা—ঢাকার নবাবের তহশিল কাছারি ছিল।
আঙ্গারিয়া—বড় বন্দর ও স্টিমার স্টেশন।
কনকদিয়া—বাণিজ্য স্থান।
প্রধান গ্রাম : চাঁদখালি, কুক্ষা ও ঝিনা।

(২) বাউফল থানা

সীমা :
উত্তরে—বাকরগঞ্জ থানা ;
পশ্চিমে—পটুয়াখালি থানা ;
দক্ষিণে—গলাচিপা থানা ;
পূর্বে—তেঁতুলিয়া নদী।

প্রধান স্থানসমূহ :
বাউফল—একটি বড় বন্দর।
কালাসুরি—বড় মেলা হত।
কচুয়া—চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন রাজধানী।
কালৈয়া—তেঁতুলিয়া নদীর তীরে মুগডাইল জন্য বিখ্যাত।
প্রধান গ্রাম : আদাবাড়িয়া, খাজুরতলা, তাতেরকাঠি, রাজনগর ও বীরপাশা।

নদী :
ধুলিয়া ও খয়রাবাদ এই দুইটি নদী। তিনটি প্রসিদ্ধ বিল : ধরন্দি ; আদনপুর ও কালারাজা।

(৩) গলাচিপা থানা

সীমা :
উত্তরে—পটুয়াখালি ও বাউফল থানা ;

পশ্চিমে—আমতলি থানা ;
দক্ষিণে—কলাপাড়া থানা ;
পূর্বে—কাজল নদী ;
প্রধান স্থানসমূহ :
গলাচিপা—গলাচিপা নদীর তীরে অবস্থিত। স্টিমার স্টেশন।
প্রধান গ্রাম : গজালিয়া, রতনদি, কালিকাপুর, কাজল।
নদী :
বিষখালি ও গলাচিপা।

(৪) আমতলি থানা

সীমা :
উত্তরে—মৃজাগঞ্জ ও পটুয়াখালি থানা ;
পশ্চিমে—বরগুণা থানা ;
দক্ষিণে—কলাপাড়া থানা ;
পূর্বে—গলাচিপা থানা।
প্রধান স্থানসমূহ :
আমতলি—সাব-রেজেস্ট্রি অফিস।
প্রধান গ্রাম : চাঁদখালি, টিয়াখালি, পচাকোড়ালিয়া।

(৫) মৃজাগঞ্জ থানা

সীমা :
উত্তরে—বেতাগি ও পটুয়াখালি থানা ;
পশ্চিমে—বেতাগি থানা ;
দক্ষিণে—আমতলি থানা ;
প্রধান স্থানসমূহ :
মৃজাগঞ্জ, কলাগাছিয়া, ঝোপখালি ও আটবাড়ি।

(৬) বেতাগি থানা

সীমা :
উত্তরে—রাজাপুর থানা ;
পশ্চিমে—ভাণ্ডারিয়া থানা ;
দক্ষিণে—বড়গুণা থানা ;
পূর্বে—পটুয়াখালি ও মৃজাগঞ্জ থানা।
প্রধান স্থানসমূহ :
বেতাগি—বিষখালি নদীর তীরে বিখ্যাত বন্দর। জমিদারি কাছারি ছিল।
ন্যামতী—বড় বন্দর।
চামটা—ঢাকার নবাব সাহেবের কাছারি ছিল।
সুবিদখালি—একটি বড় বন্দর।

(৭) কলাপাড়া থানা

সীমা :
উত্তরে—আমতলি ও গলাচিপা থানা ;
পশ্চিমে—বিষখালি নদী ;

দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর ;
পূর্বে—বঙ্গোপসাগর।

প্রধান স্থানসমূহ :

সুন্দরবন—অসংখ্য মহিষ, বাঘ ছিল। বন থেকে কাঠ ও হোগোল পাতা সংগ্রহ করা হয়। মুরাদখানা বা জিরাদখানা নামে পরিচিত ছিল।

উল্লেখযোগ্য স্থান : মৌডুবি, বড়বগি, লতাচাপালি, খাপ্‌রাভাঙ্গা, চন্দনপাড়া, আন্দাপাড়া, কুক্‌রি ও মুক্‌রি দ্বীপ, ছোটবগি ও কচুপাতরা।

(৮) বরগুণা থানা

সীমা :

উত্তরে—বেতাগি থানা ;
পশ্চিমে—বিষখালি নদী ;
দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর ;
পূর্বে—বিমাই নদী।

প্রধান স্থান :

বরগুণা—ঝালকাঠি ও বরগুণার মধ্যে স্টিমার লাইন ছাড়াও সাব-রেজেস্ট্রি অফিস্ ও মধ্য ইংরেজি স্কুল আছে।

ফুলঝুরি—ঢাকার নবাব বাহাদুরের বড় তহশিল কাছারি ছিল।

প্রসিদ্ধ গ্রাম : কেওড়াবুনিয়া, বকুলতলা ও হরিণবাড়িয়া।

(৪) ভোলা মহকুমা

সীমা :

উত্তরে—মেঘনা নদী ;
পশ্চিমে—তেতুলিয়া নদী ;
দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর ;
পূর্বে—মেঘনা ও সাহাবাজপুরের নদী।

পুলিশ স্টেশন বা থানা :

ভোলা মহকুমা চারিটি থানায় বিভক্ত। যথা—(১) ভোলা, (২) দৌলতখাঁ, (৩) তজুমদ্দি, (৪) বরানদ্দীন।

(১) ভোলা থানা

সীমা :

উত্তরে—মেঘনানদী ;
পশ্চিমে—তেঁতুলিয়া নদী ;
দক্ষিণে—দৌলতখাঁ থানা ;
পূর্বে—মেঘনা নদী।

প্রধান স্থানসমূহ :

ভোলা—প্রসিদ্ধ বন্দর। হাট, বাজার, উচ্চ ইংরেজি স্কুল, সরকারি ডাক্তারখানা ও সরকারি অফিস ছিল।

কাচিয়া—প্রসিদ্ধ গ্রাম, এখানেও একটি সার্কেল স্কুল ছিল।

প্রধান গ্রাম : গঙ্গাপুর, রামদাসপুর, আলিনগর, চরবৈরাগী, ইল্‌সা, নবিপুর, কালুপুরা ও গণেশপুর।

বিখ্যাত বন্দর : গাজিপুর ও জয়নগর।

(২) দৌলতখাঁ থানা

সীমা :

উত্তরে—ভোলা থানা ;

পশ্চিমে—ভোলা থানা ;

দক্ষিণে—তজুমদ্দি ও বরানদ্দীন থানা ;

পূর্বে—সাহাবাজপুরের নদী।

প্রধান স্থানসমূহ :

দৌলতখাঁ—উচ্চ ইংরেজি স্কুল, সাব-রেজেস্ট্রি অফিস ও বেল সাহেবের নামানুসারে একটি বিশ্রাম গৃহ।

প্রধান বন্দর : হাটশশীগঞ্জ ও শুকদেব।

স্টিমার স্টেশন : দৌলতখাঁ ও নিশ্চিন্তপুর।

প্রধান গ্রাম : বিজয়পুর, নারায়ণপুর, বাঞ্ছাপুর, ন্যামতপুর ও রাধাবল্লভ।

(৩) তজুমদ্দি থানা

সীমা :

উত্তরে—দৌলতখাঁ থানা ;

পশ্চিমে—বরানদ্দিন থানা ;

দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর ;

পূর্বে—সাহাবাজপুরের নদী।

প্রধান স্থানসমূহ :

তজুমদ্দি—সাব-রেজেস্ট্রি অফিস ও দাতব্য চিকিৎসালয়।

মির্জাকালু—একটি বন্দর। পুরাতন দিঘি ছিল।

প্রধান গ্রাম : ধলী, গৌরনগর, চণ্ডীপুর, লর্ড হার্ডিঞ্জ চর, কেশবপাড়া, চর কৃষ্ণপ্রসাদ, রামদেবপুর ও মঙ্গল শিকদার।

মঙ্গল শিকদার—প্রসিদ্ধ বন্দর।

(৪) বরানদ্দিন থানা

সীমা :

উত্তরে—ভোলা থানা ও দৌলতখাঁ থানা ;

পশ্চিমে—তেঁতুলিয়া নদী ;

দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর ;

পূর্বে—তজুমদ্দি থানা।

প্রধান স্থানসমূহ

বরানদ্দিন—অনেক জমিদারের বসবাস ছিল।

প্রধান বন্দর : কালীগঞ্জ, মুন্‌সিরহাট, বরানদ্দিন ও লালমোহন।

প্রধান গ্রাম : রাণীগঞ্জ, গোকুলগুহ, দেবীর চর, দেউলা, রামরামপুর।

বাকরগঞ্জ জেলার গমনাগমনের সুবিধা

"এই জেলায় অনেক বড় বড় নদী থাকিতে নৌকা ও স্টিমারে গমনাগমন সুবিধাজনক, এইজন্য বাকরগঞ্জ জেলায় অনেকগুলি স্টিমার লাইন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

(১) বরিশাল-খুলনা মেইল সার্ভিস—স্টিমার বরিশাল হইতে খুলনা পর্যন্ত যায়। বরিশাল, নলচিটি, ঝালকাঠি, রাজাপুর, কাউখালি হুলারহাট, শ্রীরামকাঠি, নাজিরপুর ও মাটিভাঙা হইয়া স্টিমার খুলনা গিয়া থাকে ;

(২) বরিশাল-ঢাকা মেইল সার্ভিস—বরিশাল হইতে স্টিমার ছাড়িয়া জাহাপুরঘাট, নন্দীবাজার, কালেখাঁর চর, সফিপুর ও বদরটুনি হইয়া ঢাকা পর্যন্ত যায়।

(৩) বরিশাল-মাদারিপুর তারপাশা মেইল সার্ভিস—স্টিমার বরিশাল হইতে ছাড়িয়া সায়েস্তাবাদ, জাহাপুরঘাট, নন্দীবাজার, পিঙলাকাঠি, টর্কি, গৌরনদী, খাজুরতলা, মাদারিপুর ও তারপাশা পর্যন্ত যাতায়াত করে।

(৪) বরিশাল-ভবানীগঞ্জ লাইন—বরিশাল হইতে স্টিমার ছাড়িয়া বুখইনগর, ভাসানচর, পাতারহাট, কাজিরহাট, ভোলা, লালগঞ্জ, দাঁদপুর, কুচিয়ামোড়া, চরবৈরাগি প্রভৃতি স্টেশন দিয়া ভবানীগঞ্জ পর্যন্ত যায়।

(৫) বরিশাল-চট্টগ্রাম লাইন—বরিশাল হইতে স্টিমার ছাড়িয়া পাতারহাট ; ইল্‌সাঘাট ; ন্যামতপুর ; দৌলতখাঁ ; নিশ্চিন্তপুর প্রভৃতি স্টেশন হইয়া চট্টগ্রাম পর্যন্ত যায়।

(৬) বরিশাল-পটুয়াখালি মেল সার্ভিস—বরিশাল হইতে স্টিমার ছাড়িয়া রাণীরহাট, বীরনারায়ণ, হাল্‌তা, খায়রাবাদ, তারাবুনিয়া, কলসকাছি, আঙ্গারিয়া, কদমতলা, ঝিনা, বগা প্রভৃতি স্টেশন হইয়া পটুয়াখালি পর্যন্ত যাতায়াত করে।

(৭) পটুয়াখালি-আমতলী লাইন—পটুয়াখালি হইতে স্টিমার ছাড়িয়া মৃজাগঞ্জ, সুবিদখালি, কাকড়াবুনিয়া, আয়লা স্টেশন দিয়া গুলিসাখালি পর্যন্ত যায়।

(৮) পটুয়াখালি-গলাচিপা লাইন—পটুয়াখালি হইতে স্টিমার ছাড়িয়া ভূরিয়া আমখোলা, গজালিয়া স্টেশন দিয়া গলাচিপা পর্যন্ত যায়।

(৯) ঝালকাঠি-পরগুণা মেইল-সার্ভিস—ঝালকাঠি হইতে স্টিমার ছাড়িয়া ভবানীপুর, ন্যামতী, আউরাবুনিয়া, বেতাগি, কচুয়া, আমুয়া, বাম্‌না, বাদনিখালি, ফুলঝুরি, কাকাচিরা প্রভৃতি স্টেশন হইয়া বরগুণা পর্যন্ত যায়।

(১০) হুলার-হাট বানারিপাড়া মেইল সার্ভিস—হুলার হাট হইতে স্টিমার ছাড়িয়া কাউখালি, জলাবাড়ি, সোহাগদল, স্বরূপকাঠি ইলুহার স্টেশন হইয়া বানারিপাড়া পৌছায়।

(১১) পিরোজপুর-বাগেরহাট লাইন—পিরোজপুর হইতে স্টিমার ছাড়িয়া হুলারহাট, ভাণ্ডারিয়া, বাউদ্‌রা, পাড়েরহাট, চণ্ডীপুর, তুষখালি প্রভৃতি স্টেশন হইয়া বাগেরহাট পর্যন্ত গমনাগমন করে।"

সূত্র ঃপ্রফুল্লকুমার গুহর 'বাকরগঞ্জের ভূগোল' অনুসরণে।

বাকরগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ

মি. বিভারিজের গেজেটিয়ারে বাকরগঞ্জে ইংরেজ বণিকদের শোষণ এবং জমিদারদের নিষ্পেষণের ছবিও ধরা পড়েছে। তাছাড়া প্রশাসনিক বিবরণও। বোলাকিশাহের বিদ্রোহ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গও আছে।

I have said that the magisterial records of Bakarganj do not extend farther back than 1792. The Collectorate records are not much older, the earliest being a letter dated 6th January 1790, which recommends the making of advances to the proprietors on account of the severe famine of 1787. It should also be noticed that the early Collectorate records are merely copies, the originals being at Dacca. The copies were obtained by Mr. Hunter, the first Collector of Bakarganj, who came to Barisal in 1817 (see his letter to Board, 24th March 1819). They are not always perfect, and contain lacunae as well as errors ; but, on the other hand, they are probably in better preservation and more legible than the originals now are.

Next to the formation of the Permanent Settlement, the most important event in the history of Bakarganj during the last century was probably the famine of 1787. This appears to have caused a very great loss of life, especially in the northern part of the district. It was the result of floods, not of drought i) and indeed it may be said that the destruction of the crops by floods is the only possible cause of an extensive famine in Bakarganj. The country is so well watered that it is little in need of irrigation, and should the rain fail, enough water is brought into the southern parts of te districts by the tides in some measure to supply its place. I have not been able to find any detailed description of the famine, but the following reference to it is made by Mr. Douglas in a later to the Board of Revenue, dated 6th April 1790. The occasion of Mr. Douglas's writing was his having to report on the proposals for the Decennial Settlement of the District. "However unwilling I am", he writes, "to animadvert on Mr Day's proposed plan of a ten years' settlement, yet a regard for my own character, and from a perfect conviction that I cannot conclude the Settlement with many of the mahals at the jama recommended by him, impels me to deliver my sentiments freely on the subject, relying on the Board's candour for putting a favourable construction on the motives by which I am actuated. It is necessary to observe that Mr Day did not send down his proposed plan of settement for upwards of six months after this district [Dacca Jalalpur, which included Faridpur and Bakarganj] had been visited by the most dreadful calamity ever remembered by the oldest inhabitant of the district, and which deprived it (by Mr. Day's calculation) of upwards of 60,000 of its inhabitants, who either miserably perished, or were reduced to the painful necessity of forsaking their habitations in search of a precarious subsistence. Mr Day visited some of the parganas when the famine raged with the greatest violence, and had ocular proofs of the extreme misery to which the wretched inhabitants were reduced. He saw the parganas inundated, whole crops destroyed, and cultivation totally neglected. He had the mortification of beholding hundreds of the poor wretched inhabitants daily dying without the means of affording them the smallest relief. After a local investigation of the cruel effects of the inundation, after a full conviction of the very heavy loss many of the principal parganas sustained both in their inhabitants and crops, and the consequent

decline of cultivation, it is a matter of great surprise that Mr Day should, in many of the parganas which had suffered so materially by the inundation and loss of tenants, recommend an increase to be taken in the ensuing year's Settlement. That gentleman observes that his plan was founded on the 'Idea of a Ten Years' Bandobast. Admitting of this, can it be supposed that districts which had been deprived of one half of their natural resources, could in the short period of one year so far recover as to yield the customary revenue, much less bear an increase which would have added to the miseries they had already suffered, and in all probability have obliged the remaining ryots to desert their habitations and seek refuge in more favourable districts?"

Elsewhere the Collector reports of the pargana Idilpur, that he has been told from respectable authority that the northern part of this zamindari lost three-fourths of its inhabitants in the dreadful calamity of 11954 B. S. (1787). It will be seen that Mr Douglas's words, "the most dreadful calamity ever remembered by the oldest inhabitant of the district", imply the Bakarganj did not suffer from the celebrated famine of 1770, which desolated so many districts in Bengal.

The famine of 1787 no doubt chiefly affected the northern and eastern parts of the district, and the more westerly and central portions probably escaped in great measure, for then, as now, the northern and eastern parts were especially exposed to being flooded. They are the first to feel the effects of the risings of the rivers, and they are full of low-lying lands and swamps. A great part of Faridpur and of the Gournadi thana consists of swamps and it is seldom that a year passes without their suffering some loss from floods....

It is evident enough that the system of collecting the revenues before the Permanent Settlement was a very hand-to-mouth one, and that everything depended on the personal qualities of the Collector and his subordinates. Estates were let in farm from year to year, and if the farmers, as was often the case, fell into arrears, they were imprisoned, of their farms were placed under the management of a sazawal or other Government officer. The following extract from a Collector's letter, dated 8th October 1790, gives some hint of the state of matters :

"The Board observing in almost all the accounts *Jama Kharach*, a charge made for diet to prisoners, desire to be informed of what description they are, and upon what grounds, the charge is admitted into the sazawal's account. This is an allowance for diet made to ryots and others who, upon proving refractory or dilatory in paying their rents, are put under restraint or confined for a time in the sazawal's [house]? The have no other means of subsistence. It amounts in all the accounts to about Rs. 10 or Rs. 12 for the whole year." In another letter (14th July 1790) the Collector writes. "I have confined the farmer for the balance due on account of *mahai* [fish] and *Bajantri* [music] mahals, and trust to recover the same in a few days." A letter of 19th July 1790 notices the depredations of wild elephants in Kassimpur and Bhowal, and reports that Birmohan is infested with tigers, and that the Collector has in vain endeavoured to encourage the tiger-killers to repair to the pargana. On 9th August 1970 the Collector report that he has, agreeably to the Governor-General's orders, done away with the gazar duty-i.e., duty on washermen. It yielded only Rs. 60 a year, which seems to show that washermen were even more scarce in the district in former times than they are now.

There were other mahals belonging to the sayer, such as the *Dumdari*, which was collected from bird-catchers, monkey and bear dancers, faqirs, sanke-dancers, conjurors, &c. (9th August 1790). This farm yielded in one year Rs. 1444, and the bajantri or music farm yielded as much as Rs. 3102. There was another farm, called *mushrat Kotwali*, which was composed of collections from artificers-i.e., bricmakers, &c. *Punya* charges, or the charges for the ceremonial of the first receipt of rent for the year, were disallowed by the Board, though the Collector says they were invariably incurred and included under the head of chakla expenses (12th April 1792). In another letter the Collector writes about the charge for guarding treasure : "Your Board deem the sum of Rs. 550 on account *Barkandazes* excessive, and expect I will considerably reduce them. I trust you will deem this sum indispensable, when you are informed that the barkandazes are entretained as guards over the Mofussil cutchery and treasure ; that they always escort the revenues to my treasury ; that for that purpose it requires a strong guard to prevent the boats conveying the treasure from being plundered by the dacoits who infest the Meghna river. Were not the barkandazes regularly kept at the Mofussil treasury, it would be liable to be attacked and robbed by the dacoits who inhabit the Sundarbans, to which Selimabad pargana is adjoining and indeed forms part of the Sundarbans. The established rate of boat-hire from Selimabad to Dacca is Rs. 9."

A letter of 16th February 1792 records an attempted isurrection of one Bolaki Shah, a faqir, who had collected an armed force, and proclaimed to his followers that the reign of the Feringhies or Europeans was at an end. He was said to have erected a fort at Subandia ; and a revenue peon who was seized by him reported that he was at his place seven cannon, twelve ginjals, and five or six muskets. two spears, and two men employed in making gunpowder. A Naib and forty-eight sepoys were sent to apprehend him. I have been told that it was this faqir who removed the old cannon which used to lie in Sujabad Fort.

It was part of the arrangements of the Permanent Settlement that the zamindars should give their ryots pattas or leases, and Mr Douglas was called on to report what progress had been made in this matter. On 6th December 1792 he reports as follows :—

"Some zamindars object to giving pottahs. The zamindar of Nurallapur says that, by the ancient custom of the country, pottahes are not granted to the old-established ryots, that they paid according to the rates fixed on their respective villages, or by a measurement. That any new ryots delivering in proposals for cultivating jungle-lands, to such ryots pottahs are granted, and they paid according to the quantity of land they annually cultivated. Others, again, do not take out pottahs for cultivating the jungle-lands, the demands from them are regulated according to the rates paid by other ryots who cultivate jungle-lands. That ever since the commencement of the current year he has been busily engaged in drawing out pottahs, framing accounts in conformity to the regulations ; but his lands are much scattered. He finds it extremely difficult to carry into immediate effect the orders of Government. Besides, the old-established ryots obstinately oppose the receipt of pottahs, and threaten to leave their lands.

"The zamindars or Rasulpur, Baikanthpur, Sultanabad, Ratandi Kalikapur, have delivered in similar representation with the above. As it appeared to me very extraordinary that any ryot should object to the receipt of pottahs which

would secure him from any arbitrary demands, I called several of them before me to state their grounds of objection, which they did as follows : That they enjoyed the same lands possessed by their froefathers ; that they cultivate the same, and pay the same revenue ; that their ancestors never received pottahs ; that their acceptance of them would be disgraceful, as it would betray a mutual want of confidence of their and the zamindar's part ; that they should lose the honorary title of being called old -established ryots, and thereby become degraded by being styled new ryots. When I consider the perjudices of this people—how bigoted they are to old-established customs, and how extremely averse they are to old- established customs, and how extremely averse they are to any innovation which militates against former usage—I am the less surprised at the objection started by the ryots for receiving pottahs ; but being convinced it will ultimately redound to their ease, comfort, and benefit, by carrying into effect the regulation, I have again issued peremptory orders to the landholders for granting pottahs to every description of ryots, and directed those who have not yet delivered to me forms of pottahs, to do so immediately. Many of the landholders have granted pottahs to their ryots, according to the forms approved by me."

There are a few letters among the records about the weavers and the salt manufacture. One forwards a petition from some ryots in Rajnagar complaining that the Commercial Resident a Lakhypur forces advance on them as weavers, although, in fact, they never had woven anything. Another letter dated 2nd October, 1790, states that the ryots are seized by the agents of the Salt Department to act as smiths, and that not only were they seized, but they were made to pay *piadgan*, or the fees of the *piada* who seized them! This piadgan is a well-known zamindari charge in the present day, and is one which must strike even the apathetic Bengali with a sense of injustice. It seems so iniquitous first to drag a man away from his home, and then to make him pay for the outrage which has been committed on him.

Bakarganj was, as I have said, a great seat of the salt manufacture. The establishments on the islands of Hattia and Dakhin Shahbazpur were managed from Noakali, or Bhulua, as it is also called ; but that in Selimabad, &c., was managed from Jhalukatti, which appears to be identical with Rai Mongal, and also with Jainagar. The last-mentioned place was situated near the Ghosal Rajah's seat at Gurudham. The name of Mr Ewart, who figures in Mr Westland's "Jessore", is still remembered at Jhalukatti. He had a large house there, and is said to have been so magnificent as to have had a European baker and a European barber.

As appears to have been the case everywhere, the salt manufacture in Bakarganj led to oppression and lawlessness, and to consequent disputes between the salt officers and the Magistrates. In 1826 the Magistrate of Bakarganj was called upon by the Board of Customs, salt and opium, to state the result of the suits brought by and against the salt officers, and replied as follows.

"I beg leave to state that the issue of the suits since my taking charge of this district has been generally proved against the salt officers for atrocities and oppression of every description, and I do not hesitate in giving my opinion that the greatest coercion is had recourse to in order to force advances on the molunghies by the *baiparies* or salt contractors, many of whom have been found guilty and punished, and nine have been lately committed for trial before the Judge of Cir-

cuit, convicted, and sentenced to seven and six years' imprisonment, besides many who have been punished both by the former Magistrates and also by the Court of Circuit" (12th June 1826)

The remissions made to the zamindars of Dakhin Shahbazpur and Selimabad and other places, on account of lands used for the salt manufacturs, were a fruitful source of correspondence at various times (see an elaborate report by Mr Collector Sutherland, 13th June 1866)

The first Collector of Bakarganj was Mr Day. He was succeeded by Mr Douglas, who made the Permanent Settlement, and then followed Messrs Thompson, Armstrong, and Massie. All these, however, and their successors up to 1817, resided at Dacca, and scarcely ever visited Bakarganj. Mr Hunter, the first independent Collector of Bakarganj, received charge of his office of 8th December 1817. The Collectorate was established partly from an idea that the cultivation of the Suudarbans would thereby be facilitated, and apparently Mr Hunter was chosen on account of his supposed sptitude for such duty. (He was one of those who afterwards set about reclaiming Saugor Island.)

Bakarganj was not, however, entirely without resident revenue officers before Mr Hunter's arrival. In 1814 there was and Assistant-Collector at Barisal who had charge of the treasury, and who, I believe, also tried summary suits for rent. He was subordinate to the Collector of Dacca, but also corresponded directly with Calcutta. There was a similar officer at Faridpur. The first officer appears to have been Mr. E. Bagge. He was succeeded by Mr E. Lee Warner, and he in his turn was succeeded by Mr. Pigou and by Mr Frazer. It was Mr Frazer who gave over charge to Mr Hunter. These Assistant-Collectors were also assistants to the Magistrate.

On 18th April 1818 Mr Hunter sent a list of the establishment proposed by him for the collectorship, and this was corrected by a subsequent letter dated 27th May. His pay was Rs. 1500, and the cost of the proposed establishment was, including this, Rs. 2458 a month.

Mr Hunter remained in charge of the Collectorate till 6th November 1819, when he made over charge to Mr Barlow, who was succeeded 5th April 1820 by Mr Lara. Mr Hunter, however, took charge again on 30th October 1820, but finally made over charge to Mr Maxwell on 22nd January 1821.

Mr Hunter was engaged actively in collecting information about the chars or alluvial formations which had been formed since the time of the Permanent Settlement, for this was the time of resumptions. He visited the remote parts of the district, including the island of Kukri Mukri, and he employed a Mr Jackson to make a sort of survey of the Sundarbans.

After the Permanent Settlement was fairly completed, the work of the Collectorate became tolerably easy, and consisted chiefly in the trial of rent suits. After the passing of Regulation II of 1819, the work of resumption became considerable, and the number of island and chars resumed in the district was very large. These resumption also led to numerous Government suits, which the Collector had to look after. Not withstanding this, it is probable that a Collector's work continued to be tolerably light until the passing of Act 10th of 1859, and the subsequent combination of the offices of Collector and Magistrate.

ডবলু ডবলু হান্টার "স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গলের" ৫ম খণ্ডে উদ্ধৃত তৎকালীন বাকরগঞ্জের মানুষের অপরাধ প্রবণতার বিষয়ে জে এইচ বিলির "পুলিশ রিপোর্টে" (১৮৭১) জানা

যায় দলবদ্ধ ডাকাতি ছিল বাকরগঞ্জের নৈমিত্তিক ঘটনা। ডাকাতিই ছিল তাদের একমাত্র জীবিকা। সাধারণত এরা নৌকা চেপে নদীপথে এসে ডাকাতি করত। তখন জলপুলিশের ব্যবস্থা ছিল না। সে সময়ে বেদিয়াদের একশ্রেণীর জীবিকা ছিল চৌর্যবৃত্তি। কেবল বাকরগঞ্জ নয়, পূর্ববাংলার বিভিন্ন নদীপথে এরা নৌকায় বসবাস করত। বিভিন্ন গঞ্জ বা হাটে যেত অথবা মেলায় মেলায় ঘুরত। পুলিশ রিপোর্টে আছে : It is difficult to explain why the crime of murder is so common is Bakarganj. On asking the people, the only answer they give is that the men of the Bhati Des (tidal country) are very passionate. The people are quite right that the men in the southern portion of Bakarganj are prone to violent and sudden outburts of passion. I attribute this disposition to freedom from all wholesome some restraints and to the feeling independence in having money at their command, which has a tendency to make these men domineering. In the older districts it is well known that the inhabitants congrugate together for mutual protection against robbers, and live communities. The country is divided into clusters of houses for ming villages, with the cultivated land lying round each village. The men and women associate with each other, and are acquinted with each other's affairs. But in Bakarganj the features of the country are very different, and there are dtrictly speaking no villages. Each man builds his homestead on his own land, generally on the highest spot appertaining to his holding, without any reference to his neighbours. She consequence is, that the homesteads are far apart from each other, with dense plantations of cocoa-nut and betel-nut surrounding each homestead. Families, for this reason, have little communication with each other and owing to the numerous, *Kkals* or water courses, and the swampy nature of the country neighbourly visits are seldom exchanged between them. I believe this isolation of families has a great effect upon the character of the people. In the older districts, owing to the social relationships subsisting between families, domestic disputes are settled either by neighbous or by a *Panchayet* of the villagers, and a man finds himself restrained in his temper and manners by the fact that the eyes of his neighbours are upon him ; if he beats his wife, it is known at once in the village, and forms the gossip of his friends. But in Bakarganj, owing to the isolation of families, the owner of the homestead is sole arbiter and ruler independent of every social restrainat. If a man of bad temper he often develops into a despot or domestic tyrant. This will expiain how a man of this lordly disposition, whose pride has been fostered by wifely homage, when returning home after a hard day's ploughing and finding his rice uncooked or cold, seizer a club or a knife, and either batters or packs his wife to death. It is crimes of this class that are so common in the district—hastly and violent ebullitions of temper leading to sudden murder. I believe the house hold habit's of the people, caused by the secluded lives they lead, will account in a great measure for the ocial and domestic murders so prevalent in the district. The presention of murder among such a race is not the work of the police officer ; it is the work of the school master and teachers, who by inculcating a purer religion and a higher standard of humanity, may civilize these savages, and soften their hearts and manners ; until that is effected, murder will continue to be common in the District.

বেদিয়াদের সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্টে উল্লেখ আছে : "They are expert picpockcters and notorious gamblers. Their boats are of one uniform pattern, resembling and egg

in shape. They are rapidly embracing Muhammadanism, with firm determination not to live in shore. There is a well undestood rule with them that at encampment the men and women must be on board their boats before jackal's howl is heard in the evening : any member absenting himself at this time, more especially a female, is instantly put out of caste. Beyond their extreme expertness in pilfering they are comparatively harmless."

ইংরেজ শাসনের আগে বাকরগঞ্জের মানুষ ছিল শান্তিপ্রিয়। গোলার ধান, গরুর দুধ আর নদীর মাছ নিয়ে ছিল তাদের শান্তির সংসার। চাউল ও নারিকেল ও সুপারির জন্য বিখ্যাত জেলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকেই প্রজা অসন্তোষের সৃষ্টি। প্রতিষ্ঠিত হয় জমিদারি ব্যবস্থা। জমিদারদের শোষণ ও শাসনে জেলার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। "অন্যান্য জেলার মতই বাকরগঞ্জের কৃষকেরা ও জমিদার গোষ্ঠীব লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করে নাই। তাহাদের রক্ষা করিবার আর কেহ ছিল না বলিয়া তাহারা নিজেরাই জমিদার ও তাঁহাদের নায়েব, মৃধা, জমিদারের গোমস্তা প্রভৃতি কর্মচারীদের উৎপীড়ন ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে এবং নিজেরাই এই উৎপীড়নকারী নায়েব ও মৃধাদের শাস্তি দিতে আরম্ভ করে। এই জন্যই তৎকালীন শাসকগণ তাহাদের "দাঙ্গাবাজ" ও "হাঙ্গামাপ্রিয়" প্রভৃতি আখ্যা দিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য কেবল জমিদারগণই দায়ী নহে। ইংরেজ শাসকগণই ইহার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই দায়িত্ব তাহাদের অনুচর জমিদার গোষ্ঠীর উপর ও বাকরগঞ্জের কৃষকদের চরিত্রের উপর চাপাইয়া দিয়া নিজেদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায় : পৃঃ ১২৭)

পুলিশ সুপার বাকরগঞ্জবাসীকে দাঙ্গাবাজ ও হাঙ্গামাপ্রিয় বলেছিলেন। যা হান্টার এবং বিভারিজের গেজেটিয়ারে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে জে সি জ্যাক বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ারে লেখেন : "সমগ্র বঙ্গদেশে বাকরগঞ্জের অধিবাসীদের একটা অখ্যাতি আছে যে তাহারা দাঙ্গাবাজ ও হাঙ্গামাপ্রিয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অখ্যাতি তাঁহাদের প্রাপ্য নহে। অতীতে (ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে-সু.রা) তাহাদের জমিদার প্রভুরা তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন করিত। এই জমিদারগণ কোন আইন মান্য করিয়া চলিত না, আর শাসকগণও ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। কৃষকেরা দেখিত যে, নায়েব ও মৃধাদের হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেও কোন শাস্তি হয় না এবং সরকারের দিক হইতে এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করিবার কোন চেষ্টাই নাই। এই অবস্থায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। ... মিঃ রিলির পুলিশ রিপোর্ট-এর মধ্যে সামান্য সত্য থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। ইহা অতিশয়োক্তি। তিনি যে অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন, এখন আর তাহা নাই।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম-সুপ্রকাশ রায়। পৃঃ ১২৬-২৭)

জমিতে জমিদারদের অধিকার স্বীকৃতি দিয়ে ইংরেজ শাসকরা স্থানীয় মানুষের জীবনে এক যন্ত্রণাকাতর অধ্যায় সূচনা করেছিল। তাছাড়া চাউল, লবণ, সুপারি, নারকেল সব ব্যবসাই ইংরেজ বণিকরা করায়ত্ত করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করত। বাকরগঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলে ইংরেজ বণিকদের ৫২টি বড় বড় চাউলের গুদাম ছিল। কম দামে চাউল কিনে অনেক বেশি দামে তা বিক্রি করত। ফলে বাকরগঞ্জবাসী এক মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের শিকার হল ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। বিভারিজের বিবরণ থেকে জানা যায়, এই দুর্ভিক্ষে ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা পড়ে। প্রাণরক্ষার জন্য বহু মানুষ স্থানান্তর গমন করে। কিন্তু বাংলার কোথাও খাদ্যের সংস্থান না থাকায়, তাদের বেশির ভাগ সুন্দরবন অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এবং দস্যুবৃত্তি নির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। এই অঞ্চলে চলাচলকারী ইংরেজ বণিক, কালেক্টরদের নৌকায় ডাকাতি করে তারা জঙ্গলে পালিয়ে

যেত। একবার কিছু সৈন্য সহ শ্রীহট্টের কালেক্টর আক্রান্ত হন। কয়েকদিন জলযুদ্ধের পর কৃষক-ডাকাতরা আত্মসমর্পণ করে। তাদের ঢাকায় এনে বিচার হয়। এদের সর্দার মহম্মদ হায়াৎ-এর প্রথমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, পরে প্রিন্স অফ ওয়েলস দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়।

ইংরেজ বণিক আর জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পূর্ব ভারতের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকে। যার থেকে বাকরগঞ্জ বাদ পড়েনি। ফকির বোলাকি শাহের ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম ইতিহাসের পাতায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আলোচিত হয়নি। দক্ষিণ সাহবাজপুরের সুবাদিয়া গ্রামে ছিল তার বসতি। স্থানীয় জমিদারের কাছারিতে ৮৮ জন বন্দুকধারী প্রহরী থাকত সবসময়। তারপর ছিল ইংরেজ বণিকদের সহযোগিতা। এই সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য বোলাকি কৃষকদের সংঘবদ্ধ এবং অস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকে। সুবাদিয়া গ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণ করে সেখানে অস্ত্র ও বারুদ তৈরির ব্যবস্থা করে। বিভারিজও তার বিবরণ দিয়েছেন। দুর্গে ছিল সাতটি কামান এবং বারটি মাস্কেট বন্দুক। একসময় তারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বোলাকির দুর্গ আক্রান্ত হয়। তার অশিক্ষিত সৈন্যরা পরাস্ত হলে বোলাকি পালিয়ে যায়। সুকান্দিয়া বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

মেলা : হান্টারের বিবরণ

হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায় ১৮৭০ সাল নাগাদ বাকরগঞ্জ জেলায় পাঁচটি প্রধান মেলা হত : লাখুটিয়া বানরিপাড়া, কলসকাঠি, পিরোজপুর এবং ঝালকাঠি। নভেম্বর মাসে মেলা হত লাখুটিয়া, বানরিপাড়া এবং কলসকাঠিতে। অক্টোবর মাসে ঝালকাঠি এবং মার্চে পিরোজপুরের মেলায় ব্যাপক জনসমাগম হত। আমোদপ্রমোদ এবং জিনিসপত্র কেনাকাটা হত এই মেলায়। সব থেকে বড মেলায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষের ভিড় হত। উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় কখনও কখনও দেখা দিত কলেরা।

পরগনা : হান্টারের বিবরণ

জেলা রাজস্বদপ্তরের সহায়তায় হান্টার সমগ্র জেলার বিভিন্ন পরগনার তালিকা পান। সেগুলি হল : ১. আবদুল্লাপুর ২. আলিনগর তপ্পা ৩. আমিরাবাদ ৪ অমরাপুর ৫. ঔরঙ্গপুর ৬. আজিমপুর তপ্পা ৭. বাহাদুরপুর তপ্পা ৮. বৈকুণ্ঠপুর ৯. বানগোরোরা ১০. বিক্রমপুর ১১. বীরমোহন ১২. বীরমোহন তপ্পা ১৩. বোজরগউমেদপুর ১৪ চন্দ্রদ্বীপ ১৫. দক্ষিণ সাহাবাজপুব ১৬. দুরদনা খানম ১৭. দুর্গাপুর ১৮. ফতেজঙ্গপুর ১৯. গিরদবন্দর ২০. গোপালপুর ২১. হাবিবপুর ২২. হাভিলি সেলিমাবাদ ২৩. হাভিলি ২৪. ইদলপুর ২৫. ইদ্রাকপুর ২৬. জাজিরা ২৭. জালালপুর ২৮. জাহানপুর ২৯. কাদিরাবাদ তপ্পা ৩০. কাশিমনগর ৩১. কাশিমপুর শিলাপটি ৩২. খানজা বাহাদুবনগর ৩৩. কোতওয়ালিপাড়া ৩৪. কৃষ্ণদেবপুর তপ্পা ৩৫. লক্ষ্মীমিরদিয়া তপ্পা ৩৬. মাদারিপুর ৩৭. মাইজারদি ৩৮. মুরশিদ কোতওয়ালি জায়গির ৩৯. নাজিরপুর তপ্পা ৪০. রাজনগর ৪১. রাজ বাজেশ্বরপুর ৪২. রামনগর ৪৩. রসুলপুর ৪৪. রতনদি কালিকাপুর ৪৫. সেলিমাবাদ ৪৬. সৈয়দপুর ৪৭. সফিপুর কালা ৪৮. শাহজাদপুর ৪৯. সায়েস্তাবাদ ৫০. সায়েস্তানগর ৫১. শ্রীরামপুর ৫২. সুলতানাবাদ তপ্পা এবং ৫৩. উত্তর সাহাবাজপুর।

এর আগে বাকরগঞ্জের গ্রামসংখ্যা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ১৮৭০ সালের আদমসুমারী থেকে ৩০৫৬টি গ্রামের নাম পাওয়া যায়। প্রতিটি গ্রামে জনসংখ্যা ধরা হয় ২৭২ জন। ১৮৭২ সালের আদমসুমারীতে ৪২৪৬টি গ্রামের নাম রয়েছে। প্রতিটি গ্রামের বাসিন্দা ছিল ৫৫৭ জন। এই আদমসুমার থেকে পাওয়া যায় ৫৪টি রাজস্ব বিভাগের নাম। সেগুলি হল :

১. আবদুল্লাপুর—আয়তন জানা যায়নি। তিনটি তালুক নিয়ে গঠিত। দক্ষিণ সাহাবাজপুর দ্বীপের দৌলতখানে অবস্থিত নিম্ন আদালতের অধীন।

২. অম্বরপুর—আয়তন ২ একর। তালুক ১। জনসংখ্যা ২৫। দৌলতখানে অবস্থিত নিম্নআদালতের অধীন।

৩. আমিরাবাদ—আয়তন ৪০,৪৫৭ একর বা ৬৩.২১ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ২০০। মাদারিপুর নিম্ন আদালতের অধীন।

৪. ঔরঙ্গপুর—আয়তন ৫৭,৮৮৪ একর বা ৯০.৪৪ বর্গমাইল। তালুক ৪৬। জনসংখ্যা ৪০,০০০। পটুয়াখালি আদালতের অধীন।

৫. আজিমপুর তপ্পা—আয়তন ১৬,১৭৮ একর বা ২৫.২৭ বর্গমাইল। তালুক ৪৭। জনসংখ্যা ২০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

৬. বাহাদুরপুর তপ্পা—আয়তন ৬৩২১ একর বা ৯.৮৭ বর্গমাইল। তালুক -৪। জনসংখ্যা ৬০০০। বরিশাল ও মাদারিপুর আদালতের অধীন।

৭. বৈকুণ্ঠপুর—আয়তন জানা যায়নি। তালুক ২৬। জনসংখ্যা জানা যায়নি। দৌলতখান আদালতের অধীন।

৮. বাঙরোড়া—আয়তন ৭৭,০৪৬ একর বা ১২০.৩৮ বর্গমাইল। তালুক ৯৪৯। জনসংখ্যা ৫০,০০০। মাদারিপুর ও পিরোজপুর আদালতের অধীন।

৯. বিক্রমপুর—আয়তন ১৪৮ একর বা .২৩ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ৪০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

১০. বীরমোহন—আয়তন ২৫,২২৪ একর বা ৩৯.৪১ বর্গমাইল। তালুক ২৮৫। জনসংখ্যা ১০,০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

১১ বীরমোহন তপ্পা—আয়তন ১৮,১৫৬ একর বা ২৮.৩৭ বর্গমাইল। তালুক ১৪৯। জনসংখ্যা ৮০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

১২. বোজরগউমেদপুর—আয়তন ২৮৭,৯৭১ একর বা ৪৪৯.৯৫ বর্গমাইল। তালুক ৪০৫। জনসংখ্যা ১৪০,০০০। বরিশাল, পটুয়াখালি এবং পিরোজপুর আদালতের অধীন।

১৩. চন্দ্রদ্বীপ—আয়তন ৩০৩,২০২ একর বা ৪৭৩.৭৫ বর্গ মাইল। তালুক ১৩৩। জনসংখ্যা ১৫০,০০০। মাদারিপুর, বরিশাল এবং দৌলতখান আদালতের অধীন।

১৪. দক্ষিণ শাহবাজপুর—আয়তন ২১৬,৪৬০ একর বা ৩৩৮.২১ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ১৬১। দৌলতখান আদালতের অধীন।

১৫. দুরদানাখানম—আয়তন ৪৮৪ একর বা .৭৫ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ১৬০। পটুয়াখালি আদালতের অধীন।

১৬. দুর্গাপুর—আয়তন ২৪৭২ একর বা ৩.৮৬ বর্গমাইল। তালুক ৩। জনসংখ্যা ১৫০। দৌলতখান আদালতের অধীন।

১৭. ফতিজঙ্গপুর—আয়তন ২২,৯৮১ একর বা ৩৫.৯০ বর্গমাইল। তালুক ১১০। জনসংখ্যা ১০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

১৮. গিরদ্ বন্দর—আয়তন ১৬৫ একর বা ২৫ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ২০০০। বরিশাল আদালতের অধীন।

১৯. হাবিবপুর—আয়তন ১০,২৩৫ একর বা ১৫.৯৯ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ৬০০০। পিরোজপুর এবং মাদারিপুর আদালতের অধীন।

২০. হাভিলি সেলিমাবাদ তপ্পা—আয়তন ২২,৮২৭ একর বা ৩৫.৬৬ বর্গমাইল। তালুক ১৩। জনসংখ্যা ২০,০০০। বরিশাল আদালতের অধীন।

২১. হাভিলি তপ্পা—আয়তন ৩০৮৩ একর বা ৪.৮১ বর্গমাইল। তালুক ৭। জনসংখ্যা ৫০০০। বরিশাল আদালতের অধীন।

২২. আইল্যান্ড—আয়তন ৬০,১৪২ একর বা ৯৩.৯৭ বর্গমাইল। তালুক ৭৮। জনসংখ্যা ৮০০০। আদালত জানা যায়নি।

২৩. ইদলপুর—আয়তন ১৫৫,৩৮৭ একর বা ২৪২.৭৯ বর্গমাইল। তালুক ৫০২। জনসংখ্যা ১০৪,০০০। মাদারিপুর ও দৌলতখান আদালতের অধীন।

২৪. ইদ্রাকপুর—আয়তন ৮৬৬৭ একর বা ১৩.৫৪ বর্গমাইল। তালুক ৬৩। জনসংখ্যা ৩০০০। মাদারিপুর ও পটুয়াখালি আদালতের অধীন।

২৫. ঈশ্বরদত্ত—আয়তন ৫৭১৭ একর বা ৮.৯৩ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ১৫৭। পিরোজপুর আদালতের অধীন।

২৬. জালালপুর—আয়তন ৫৫৪২ একর বা ৮.৬৬ বর্গমাইল। তালুক ৫। জনসংখ্যা ৩০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

২৭. জাহানপুর—আয়তন ৫৯৮৭ একর বা ৯.৩৫ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ১০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

২৮. কাদিরাবাদ তপ্পা—আয়তন ২১৬৪ একর বা ৩.৩৮ বর্গমাইল। তালুক ২। জনসংখ্যা ১০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

২৯. কলমিবচর তরফ—আয়তন ১৮২৮ একর বা ২.৮৫ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ২৫০০০। পটুয়াখালি আদালতের অধীন।

৩০. কাশিমনগর—আয়তন ৪৬৯১ একর বা ৭.৩৩ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ১০০০। পটুয়াখালি আদালতের অধীন।

৩১. কাশিমপুর শিলাপটি—আয়তন ৩৯৫৪ একর বা ৬.১৭ বর্গমাইল। তালুক ৯৯। জনসংখ্যা ৫০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

৩২. খাঞ্জাবাহাদুর নগর—আয়তন ১০,২৬৭ একর বা ১৬.০৪ বর্গমাইল। তালুক ৬৫। জনসংখ্যা ৫০০০। পটুয়াখালি আদালতের অধীন।

৩৩. কোতওয়ালিপুর—আয়তন ৫৪,০৯৮ একর বা ৮৪.৫২ বর্গমাইল। তালুক ৫০২। জনসংখ্যা ২৫,০০০। পিরোজপুর ও মাদারিপুর আদালতের অধীন।

৩৪. লখসমিরদিয়া তপ্পা—আয়তন ১৫,৭১৭ একর বা ২৪.৫৫ বর্গমাইল। তালুক ২৭। জনসংখ্যা ৫০০। দৌলতখান আদালতের অধীন।

৩৫. মাদারিপুর—আয়তন ৭৮৩৬ একর বা ১২.২৪ বর্গমাইল। তালুক ৫। জনসংখ্যা ২০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

৩৬. মইজারদি—আয়তন ৭১০ একর বা ১.১১ বর্গমাইল। তালুক ৩০। জনসংখ্যা ৫০০। দৌলতখান আদালতের অধীন।

৩৭. মুরশিদ কোতওয়ালি জায়গির—আয়তন ১৩৮ একর বা .২১ বর্গমাইল। তালুক ৪২। জনসংখ্যা ২০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

৩৮. নাজিরপুর তপ্পা—আয়তন ৯৫,৯৮৩ একর বা ১৪৯.৯৭ বর্গমাইল। তালুক ১৭। জনসংখ্যা ২০,০০০। বরিশাল, পিরোজপুর, মাদারিপুর এবং দৌলতখান আদালতের অধীন।

৩৯. বাজনগর—আয়তন ৩০০ একর বা .৪৭ বর্গমাইল। তালুক ১০। জনসংখ্যা ১০০। দৌলত খান আদালতের অধীন।

৪০ বাজরাজেশ্বরপুর—আয়তন ১২,৩৩২ একর বা ১৯.২৭ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ১০০। পিরোজপুর আদালতের অধীন।

৪১. রামনগর—আয়তন ৭৬৬২ একর বা ১১.৯৭ বর্গমাইল। তালুক ১৮। জনসংখ্যা ২৫০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

৪২. রামপুর—আয়তন জানা যায়নি। তালুক ১। জনসংখ্যা জানা যায়নি। দৌলতখান আদালতের অধীন।

৪৩. রসুলপুর—আয়তন ৯৪৬ একর বা ১.৪৭ বর্গমাইল। তালুক ৪৭। জনসংখ্যা ২৭০০। পটুয়াখালি আদালতের অধীন।

৪৪. রতনদি কালিকাপুর—আয়তন ৩৭,৪৬৮ একর বা ৫৮.৫৪ বর্গমাইল। তালুক ১৮। জনসংখ্যা ১৩,০০০। বরিশাল, পিরোজপুর এবং দৌলতখান আদালতের অধীন।

৪৫. সেলিমাবাদ—আয়তন ২৪৪,০৬৫ একর বা ৩৮১.৩৫ বর্গমাইল। তালুক ৭৪ জনসংখ্যা ১০১,০৯০৩। বরিশাল ও অন্যান্য আদালতের অধীন।

৪৬. সৈয়দপুর—আয়তন ৬৪,৮৫৫ একর বা ১০১.৩৩ বর্গমাইল। তালুক ৯। জনসংখ্যা ৫৫,০০০। পিরোজপুর আদালতের অধীন।

৪৭. সফিপুর কালা তপ্পা—আয়তন ২০৪৮ একর বা ৩.২০ বর্গমাইল। তালুক ৮৬। জনসংখ্যা ১৪০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন।

৪৮. শাহজাদপুর—আয়তন ১৩,৪০৭ একর বা ২০.৯৫ বর্গমাইল। তালুক ৩৭। জনসংখ্যা ৫০০০। বরিশাল আদালতের অধীন।

৪৯. সায়েস্তাবাদ—আয়তন ১০,৭৭০ একর বা ১৫.৮২ বর্গ মাইল। তালুক ৬। জনসংখ্যা ৫০০০। বরিশাল আদালতের অধীন।

৫০. সায়েস্তানগর—আয়তন ১৭,৯৮১ একর বা ২৮.০৯ বর্গমাইল। তালুক ১৭৪। জনসংখ্যা ১০,০০০। বরিশাল ও পটুয়াখালি আদালতের অধীন।

৫১. শ্রীরামপুর—আয়তন ৮১৮৭ একর বা ১২.৭৬ বর্গ মাইল। তালুক ১৩৭। জনসংখ্যা ৫০০০। দৌলতখান আদালতের অধীন।

৫২. সুলতানাবাদ তপ্পা—আয়তন ৫৪,০৮৫ একর বা ৮৪.৫০ বর্গমাইল। তালুক ১৮। জনসংখ্যা ২৫,০০০। পটুয়াখালি আদালতের অধীন।

৫৩. তেলিহাটি—আয়তন জানা যায়নি। তালুক ১০। জনসংখ্যা জানা যায়নি। দৌলতখান আদালতের অধীন।

৫৪. উত্তর সাহাবাজপুর—আয়তন ১৭৬৯০ একর বা ২৭.৬৪ বর্গমাইল। তালুক ৩২৪। জনসংখ্যা ৭৫০০। দৌলতখান আদালতের অধীন।

মোট আয়তন ২,০৪১,৯০০ একর বা ৩১৯০.৪৭ বর্গমাইল। রাজস্ব ১৩২,০৫৬ পাউন্ড ১২॰ শিলিং। জনসংখ্যা ৯০৮,৪৩৫।

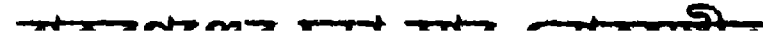
হান্টার এই তালিকা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কয়েক বছর আগেকার এই সার্ভে রিপোর্টে উল্লিখিত জনসংখ্যা সঠিক নয়. এমনকী নাম ও সংখ্যার দিক থেকেও ভুল ছিল বলে তিনি উল্লেখ করে ছিলেন।

বাকরগঞ্জ পোস্ট অফিস মাধ্যমে প্রাপ্ত ও প্রেরিত চিঠিপত্র, সংবাদপত্র, পার্সেল ও গ্রন্থ ১৮৬১—১৮৭১

	১৮৬১-৬২	১৮৬৫-৬৬	১৮৭০-৭১
প্রাপ্ত সরকারি চিঠিপত্র	১৬,২৮৫	১৩,৭৪৪	...
প্রাপ্ত বেসরকারি চিঠিপত্র	৫১,৬১৮	৬১,৫৬১	..
প্রাপ্ত মোট চিঠির সংখ্যা	৬৭,৯০৩	৭৫,৩০৫	১৭৩,৮০৩

প্রাপ্ত সরকারি সংবাদপত্র	৭০৬	৫০৭	...
প্রাপ্ত বেসরকারি সংবাদপত্র	৫৯৯৩	৭৩৫৯	...
প্রাপ্ত মোট সংবাদপত্র	৬৬৯৯	৭৮৬৬	১৫,১৭৭
প্রাপ্ত মোট সরকারি পার্সেল	১৯৯৪	১২৬৮	...
প্রাপ্ত মোট বেসরকারি পার্সেল	৩০৮	২৫২	...
প্রাপ্ত মোট পার্সেল	২৩০২	১৫২০	৬১৪৯
প্রাপ্ত গ্রন্থাদি	৮৬৯	১১৪৩	২৪৭৭
প্রেরিত সরকারি চিঠিপত্র	৮৩৫৯	১০,২০৪	...
প্রেরিত বেসরকারি চিঠিপত্র	৪৮৯৩৪	৬৬,১৬৮	...
প্রেরিত মোট চিঠিপত্র	৫৭,২৯০	৭৬,৩৭২	
প্রেরিত সরকারি সংবাদপত্র			
প্রেরিত বেসরকারি সংবাদপত্র	৫০৩	১০৭২	...
প্রেরিত মোট পার্সেল	৬৪৫	১২৬৫	...
প্রেরিত গ্রন্থ	৮৬	১৫২	...

* হান্টারের গ্রন্থ থেকে



লৌকিক জীবনের অন্যতম সম্পদ ছড়া আর সঙ্গীত। গ্রামভিত্তিক জনজীবনের বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় নানারূপে ধরা আছে এইসব ছড়া আর গানে। ছেলে ভুলানো ছড়া, গান, দেবদেবী নির্ভর সঙ্গীত ও নৃত্য, বাঙালি জীবনের সনাতন ঐতিহ্যের দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশ বিভাগ ও পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থা বাঙালি জীবনের ভিত্তিভূমিকে নাড়া দিয়ে গেলেও, আজও তা আমাদের প্রাণে নতুন এক উন্মাদনার সৃষ্টি করে। বাকরগঞ্জ জেলার কিছু ছড়া আর লোকসঙ্গীত এখানে নিদর্শন হিসাবে সংকলিত হল। অধুনা যারা পশ্চিমবঙ্গবাসী তারা তাদের অতীতকে ফিরে পেতে পারেন যেমন, তেমনি বাকরগঞ্জের বর্তমান প্রজন্ম তাদের ঐতিহ্যের দিনগুলিকে নতুন ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

ছড়া

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমাগো বাড়ি যাইও
ঠাই নাই পিঁড়ি নাই খোকার চোখে বইও।
বাটা ভইরা পান দিমু গাল ভইরা খাইও
চাউল কড়াই ভাজা দিমু যত খাইতে চাও।
দাঁত থাকে নাতো গুড়াইয়া দিমু ভয় নাহি পাও।
যত ছেলের চোকের ঘুম খোকার চোখে দ্যাও।

২

আল্লাদির পোটলা
কাইন্দো না।
চিড়া খাইয়া শুইয়া থাকো
রাইন্দো না।

৩

আইকম বাইকম তাড়াতুড়ি
যদুমাস্টার শুশুর বাড়ি।
রেন কাম ঝমাঝম,
না পিছলে আলুর দম।
জল সাবু তাতি নেবু,
বলে গেছেন ডাক্তার বাবু।
ইষ্টিশানের মিষ্টি কুল,
শখের বাদাম গোলাপ ফুল।
রাম দুই সাড়ে তিন
অমাবস্যে ঘোঁড়াব ডিম।

— প্রথম চার লাইন এইভাবে পড়লে অর্থ সহজবোধ্য হবে

I come, ভাই Come তাড়াতুড়ি
যাদু master শ্বশুর বাড়ি।
Rain come ঝমাঝম,
পা পিছলে আলুর দম।

—অর্থাৎ আমি আর আমার ভাই তাড়াতাড়ি আসছিলাম। ঝমঝম করে বৃষ্টি এলো। পা পিছলে পড়ে আলুর দম হয়ে গেলাম।

৪

ঘুসই — দা কই?
দা দিয়ে করবি কি? — পাত কাড়ুম।
পাত দিয়ে করবি কি? — বউ ভাত খাইবে।
বউ কোথায়? — জলে গেছে।
জল কোথায়? — ডাউকে খাইছে।
ডাউক কোথায়? — তারাবনে গেছে।
তারাবন কোথায়? — পুড়িয়া গেছে।
ছাইমাড়ি কোথায়? — ধোবায় নিছে।
ধোবা কোথায়? — যুদ্ধে গেছে।
যুদ্ধ কোথায়? — ভাইঙ্গা গেছে।
ভাঙ্গাযুদ্ধা ভাইঙ্গা গেছে,
বড়ীর ঘরে আগুন লাগ্ছে।

৫

ঘুঘু সই, বাসা কই?
শিমূল গাছে — শিমূল গাছ কই?
সূতারে নিছে — সূতার কই?
পিঁড়ি চাছে — পিঁড়ি কই?
বৌভাত খায়। — বৌ কই?
জলে গেছে। — জল কই?
ডাউকে খাইছে। — ডাউক কই?
বনে গেছে। — বন কই?
পুইড়া গেছে। — ছাইমাটি কই?
ধোপায় নিছে। — ধোপা কই?
হাটে গেছে। — হাট কই?
মিইল্যা গেছে।
বুড়ি লো বুড়ি। (তোর) হাঁড়ি পাতিল সরা।
কোন খাট? — সোনার না রূপার?
সোনার। — এই পড়ল।

৬

দিদিলো দিদি, একটা কথা,
কি কথা? ব্যাঙের মাথা।
কি ব্যাঙ? সরু ব্যাঙ।
কি সরু? বামন গরু।
কি বামন? ভাট বামন।
কি ভাট? গুয়াকাট।
কি গুয়া? চিকি গুয়া।
কি চিকি? সোনার চিকি।
কি সোনা? ছাই সোনা
তার অর্ধেক ভাগ নে না।
ভাগ নিয়ে করব কি?
তোর ভাগ তোরে দি।

৭

খাল জলে নাইরে — আমরা বৌ আনতে যাই।
বৌ আনতে গেলাম আমরা খোকনের শুশুর বাড়ি।
তারা কাপড় চোপড় কাইর‍্যা নিল মারল জুতার বাড়ি।
খালে জল নাইরে—
বৌ আনতে গেলাম আমরা খোকনের শ্বশুর বাড়ি
তারা ফ্যানে ফ্যানে ভাত দিল (আর) আমসী ধোয়া পানি।
খালে জল নাইরে—
বৌ বাহির কর, বৌ বাহির কর ;
দেখি, বৌয়ের বদলে খোকনের শাশুড়ি বুড়ি,
বেসাতি বাহির কর ; বেসাতি বাহির কর।
দেখি, তিনটা ক্ষুদের হাঁড়ি।
খালে জল নাইরে—

৮

আয় ঘুম আয়,
শেয়ালে তেঁতুল খায়।
তারা নুন পাবে কোথায়?
সাগরের বালিঝুর ঝুরানি
নুন বলে বলে খায়।

৯

সুন্দরবনে বাঘের অত্যাচার এবং বাঘের নামে মাগন সংগ্রহের ছড়া—

হাট্যা হাট্যা চলরে? ধ্রু।।
হাট্যা চল পাঁচিল পাড়।।
ঝপৎ গিরি রে।
ঝপৎ গিরি সজাগ হয়।
সজাগ হয়্যা না করে রব।।
সুন্দের বনে রে। ধ্রু।।
সুন্দের বনে বাঘের ছাও।
হাম্বুর হুম্বুর করে রাও।
য়্যাক বাঘরে। ধ্রু।।
য়্যাক বাঘ চৈতা।
বাওন মার‍্যা নিলো পৈতা।।
য়্যাক বাঘের গলায় দড়ি।
হারা আট লড়ালড়ি।।
য়্যাক বাঘের কপালে সিন্দুর।।
পুড়্যা খায় বাত্যা ইন্দুর।।
আর য়্যাক বাঘ হৈ চৈ।
গোয়াল মার‍্যা খাইল দে।।
আর য়্যাক বাঘ ছোপার আড়ে।
লাফ দিয়া পড়ে ধোপার ঘাড়ে।।
আর য়্যাক বাঘের গলায় ব্যাত।
আর য়্যাক বাঘ বাপে-পুতে।
আর য়্যাক বাঘ হিজল গাছে।
আর য়্যাক বাঘ রাইঙ্গা।
কাড় ফ্যালাইলো ভাইঙ্গা।।
আর য়্যাক বাঘের হাতে মিঠা।
মোরে য়্যাকখান চিতে পিঠা।।
আব য়্যাক বাঘ কাল্যা
গাঙ্গের মারে জাল্যা।
আর য়্যাক বাঘের মাথাফাটা।
ধান দেবারে কত কাঠা।।
বার বাঘের লেখা পড়ি।
চাউল দেও একবুড়ি।।
(সমবেত কণ্ঠে) - ঠাকুর কুলাই তো।

১০

দাঁড় কাউয়ারে আহ্বান কর‍্যা,
পাঁতি কাউয়ারে বলি দিয়া,
কোঁ কোঁ কোঁ,
আজ কৈলাম মোগো বাড়ি শুভো নবান্নো।।
আইয়ো যাইয়ো কাক বলি লইয়ো,
হাত ভর‍্যা সন্দেশ দিমু —
পেট্‌টী-ভর‍্যা খাইয়ো।

১১

আইডারে আইডারে। ––
আইলাম রে স্মরণে,
লক্ষ্মী দেবী বরণে।
লক্ষ্মী দেবী দিলেন বর,
ধান চাউলে গোলা ভর।
ধান না দিয়া দিলেন কড়ি,
তাতে হইল সোনার নড়ি,
সোনার নড়ি রূপার পাশা
পাঁচ খাটালে টাকার ছালা,
একটি টাকা পাইরে,
বানিয়া বাড়ি যাইরে।
বানিয়া বাড়ি কত জন?
কুলাইবে দিবে কতধন!
ঠাকুর কুলাই ভো।।

১২

আয়রে নলিয়া।
অস্তি ঘোড়ায় চড়িয়া।।
অস্তি ঘোড়ায় কি কাজ করে।
রাজার ময়না খাইয়া লড়ে।।
রাজার বাড়ি হাজার বাঁসা।।
তা দেখ্যা ওড়ে হাঁসা।।
হাঁসা ওড়ে দিযা মোড়া।
পায়রা ওড়ে বত্রিশ জোড়া।
ও পায়রা তরাসিয়া।
লোয়ার বাইগন তরাসিয়া।।
লোয়ার বাইগন সরল পথে।
ভিখদেও আন্যা লক্ষীর আতে।।

১৩

উত্তর আলা কদম গাছটি দক্ষিণ আলা বাওরে
গো তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাও রে।।
শিয়রে চন্দনের বাটি বুকে ছিটা পড়ে রে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাও রে
কাঁস বাজে করতাল বাজে তবু সূর্যাইর ঘুম নাহি ভাঙ্গে রে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমাব মাও রে।।

১৪

বাস্তু পুজোর গান

স্বর্গের হাড়িয়া হাড়িয়া হাড়িয়া রে।
মঞ্চে লামিয়া খোলা চাঁচ্যা দে।
বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা খোলা চাঁচ্যা দে।
স্বর্গের হাড়িয়া হাড়িয়া হাড়িয়া রে,
মঞ্চে লামিয়া ফুল তুল্যা দে।
বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা ফুল তুল্যা দে।

১৫

ধুয়াপদ

অকান্দনে কান্দন কান্দেন মনসা,
প্রভু, মোর না যাও ছাড়িয়া।
আঁচলের নিধি, আহারে, দারুণ বিদি,
এখন আমি মরিব কান্দিয়া।।

২

গা তোল, ওগো, অভাগিনী কমলা।
কেন, প্রিয়ে, হেনবুদ্ধি করিলা।।

৩

কান্দে ধোনা মোনা দোঁহে বিষাদ ভাবিয়া।
ঘরেতে রহিব, গুরু, কার মুখ চাহিয়া।।

৪

শাক তুলিতে পড়িয়া গেল সাড়া।
নাচে ধাই দিয়া বাহু লাড়া।।

৫

চান্দর করুণার সীমা নাই।
বাকল খাইল চোবাগাই।।

১৬

পার্বণ সঙ্গীত

বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ
পেরথোমে বন্দিলাম, মাগো, দুগ্গার চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ।।
তারপরে বন্দিলাম মোবা অসুরের চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ।।
তারপরে বন্দিলাম মোরা জয়ারি চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ।।
তাবপরে বন্দিলাম মোরা বিজযাব চবোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ।।
তারপরে বন্দি যে দেব কার্তিকের চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ।।
তারপর বন্দি যে দেব গোণেশের চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী নারায়ণ।।

১৭

পুরাণের গান

নারদ মুনি বীণা করেতে
বীণার হরিগুণ গান করিতে
উপনীত হয় গিরিপুরেতে,
বলে, ধন্য ধন্য ধন্যা রাণী এক কন্যা ধরেছ গর্ভেতে;
জামাই এনেছি তোমার সাক্ষাতে।
সে যে দেবের দেব ভব মৃত্যুঞ্জয়,
ইচ্ছা হয় কি মনেতে।
শুনে গিরি রানী মুখে দেয় বসন,
বলহে, ওহে তপোধন,
জামাই এনেছ অতি সুলক্ষণ,
ও তার পাকাদাড়ী চুল নিশাতে আকুল,
ঢুলু ঢুলু করে দুই নয়ন।
চান্ বদনে লৈরা গিছে দশন।
হৈল সতীর ভাগ্যে জামাতা যুগ্য অতি নব্য পঞ্চানন।
তার সর্ব অঙ্গে ছাই মাখিছে
গলেতে দিছে ফণি-হার।
কটি ভরা ব্যাঘ্র চর্ম মাথায় জটা ভার।
ও তার বয়েস হয়েছে শতেকের উপরে,
ও হেঁটে যেতে ঢুলে পড়ে বৃষোপরে আরোহণ করে।
ও তার হস্তপদ ক্ষীণ শরীর জীর্ণ,
যেন গুল্‌ম হয়েছে উদরে।
জামাই দেখে প্রাণ কান্দে ডরে
যবন আলাম বলে ভাবলে কি হবে,
যার যার কপালে করে।

১৮

বিবাহের গান

বর সরাসরি কনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করছে এই গানে—

উত্তরে পাতিয়া মেঘ, দক্ষিণে গঞ্জ রে রে, ও রাম কানাই রে।
তুমি এমন সুন্দর গো শ্রীমতী, তোমার সিঁথি রয়েছে খালি।
হুকুম যদি করতা গো শ্রীমতী সিন্দুর পরাইতাম
আমি, হুকুম দারোগা।
আগে আছে পঞ্চ সখি, রাই, কলসি চোবাইতে, চল যাই
যে না ঘাটে যাবা গো কলসি চোবাইতে,
সেই না ঘাটে নাইবের পানসি।

ঠেলিয়া যাও নাইবের পানসি, ভরিয়া আন কাঞ্চের
কলসি, ও রাম কানাই রে।

১৯

তুমি আমি লেখিপড়ি একই গুরুর ঠাই।
পড়িয়া গেল হস্তের কলম,
তুলিয়া দেও মোর হাতে, মালঞ্চ কন্যা।
ওনা কথা থুইয়ারে, মাধব কুমার, আরও কথা কও।
আমার বাপ বরুণ রাজা, এনা কথা শুনলে
গরদান মারবে তোমার।
আমার বাপের চাকর হইছে তোমার বাপে উজির।
আমার বাপের তালুকে বান্ধে তোমার বাপে ঘোড়া।
আমার বাপের চাকরি কবিয়ারে, মাধবকুমার,
খাইল তোমার বাপ ও দাদা চিরকাল।
ঐ সব থুইয়ারে মালঞ্চ কন্যা,
বিয়া করমু আমি তোমারে।
আমার বাপে এই কথা শুনলে, মাধবকুমার, তোমার মালামাল
সব নিবে সরকারে

২০

আয়রে নাপিত ত্বরায় কইরে, দেখিবে রে রূপ নয়ন ভাইরে।
বিয়ারে পাঠাইছে রে, নাপিত, বেলা গেল সন্ধ্যে হ'ল।।
সোনা রূপোর দুটির বাটী, নাপিত সঙ্গে কইরা লইও
ওহে দেখিব তোরে নয়ন ভইরে।
পাওখানি কামাও, নাপিত রে, জুতে জুতে জুতে চাপে,
হাতখানি কামাও নাপিত রে আলেদার ক্ষুরে।।
মুখখানি কামাও নাপিত রে যেন পূর্ণিমার চন্দ্র, ওহে,
আয় রে, নাপিত, ত্বরাই কইরে দেখিবে নয়ন ভইরে।।

২১

সে ত যমুনারই ও ঘাটে।
গো যেয়ে রানী দিলদরশন।
ওগে সখী, চল যাই।।
সে ত গঙ্গা গঙ্গা বলি সখী দিল তিনডাক,
সে ত মকর-বাহনে গো গঙ্গা, গঙ্গা উঠিল জাগিয়া সখি, চল যাই।
সে ত কাটিনে কাটিয়া গঙ্গা, গঙ্গায় তৈল সিন্দুর দিয়া
সে ত তৈল সিন্দুর দিয়া গো রানী, রানী গঙ্গা পূজা করে
সখি, কলসী ভরি যাই, সখি চল যাই।।

২২

চল, দুর্গা, গোচল নিমন্ত্রণে, ত্বরাই করে নিশীথ প্রভাতে
রামচন্দ্র রাজা হবে, যাইতে হবে তোমার,
তোমার যাইতে হবে অতি সকালে।
পদ্মা, চল গো চল নিমন্ত্রণে, ত্বরাই করে নিশীথ প্রভাতে,
রামচন্দ্র রাজা হবে যাইতে হবে তোমার
তোমার যাইতে হবে অতি সকালে।।
গঙ্গা, চল গো চল নিমন্ত্রণে, ত্বরাই করে নিশীথ প্রভাতে,
রামচন্দ্র রাজা হবে যাইতে হবে তোমার,
তোমার যাইতে হবে অতি সকালে।

২৩

বিবাহের ক্ষণপূর্ব মুহূর্তে কন্যার উদ্দেশ্যে গীত—

ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া তোতা বুনায় ফুলের সাজি.
ঝোপের বেত কাটিয়া তোতা বুনায় ফুলের সাজি।
ফুলের সাজি লইয়াছে তোতা ফুল তুলিতে যায়।
এ ফুল তোলে ও ফুল তোলে তোতা বাছিয়া চাম্পা ফুল।
বিনা সুতে গাঁথেরে মালা পতি পাবার আশে

২৪

দশরথের বেরধ নারী বরণ কুলা সাজন করি
অই যে সাজায় কুলায় হীরামণ মানিক রাম রঘুনাথে
দশরথের মনের সাধ, রাজা হবে রঘুনাথ
দশরথের নারী, অঘ্য সরা সাজন করি
সাজায় কুলায় হীরামণ মানিক রঘুনাথ।

২৫

কনে সাজাবার গীত—

আইওগণ মিলে আয় তোরা চলে,
সাজাইতে হবে সীতারে গলায় মোহন মালা।
হাতে কঙ্কণ বালা, চল যাই, চল যাই সখী,
রাম সীতারে সাজাইতে।
একে রামের সুন্দর আখি, তাতে শোভে কাজল রেখি,
আহা, কাজল দিয়ে সাজায়েছ, আর কি বাকী রেখেছ।
একে রামের সুন্দর মাজা, তাতে শোভে চেলির কোচা,
আহা চেলি দিয়ে সাজায়েছ,
আর কী বাকী রেখেছ।

২৬

একে রামের চিকণ মাঞ্জা, তাইতে শোভা করে তাঁতির জোড়ে।
আমরা রামের রূপে আলো করে,
আমার সীতার রূপে আলো করে,
দেখ না, সখী, তোমরা হে নেহার কইরে।
একে রামের সাদা অঙ্গ, তাইতে শোভা করে সখি কড়ির গয়না,
আমার রামের রূপে আলো করে,
আমার সীতার রূপে আলো করে,
দেখ না, সখি, তোমবা নেহার কইরে।।
আমার এক রামের ছাঁটা বাবরী, তাইতে ঐ শোভা
করে গো, সখি, মালীর পুষ্প।
আমার রামের রূপে আলো করে,
আমার সীতার রূপে আলো করে,
সাজাইয়া দেও না, সখী, তোমরা বিয়ার বেশে।

২৭

কনের মাকে ব্যঙ্গ করে প্রতিবেশিনীদের গীত—

আম পাতার চাতুর মুতুর কাডাল পাতার নাও
ওই ঘাটে বাতাস, মাঝি, এই ঘাটে ভিড়াও নাও
বিবির মায়ে রান্ছে সিন্নি একবার খাইয়া যাও।
বিবির মায়ে লাগছে বিছান একবার যাইয়া যাও।
বিবির মায়ে পরছে শাড়ী একবার দেইখ্যা যাও।

২৮

আমতলা ঠাকুল জামাই জামুতলা চায়।
সেইয়া দেইখ্যা দুফেল বিবি মায়েরে বোলায়।।
মাও তোমার দূর দেশে বাপও তোমার পর।
খোদাতালায় লেইখ্যা থুইছে তোমার আমার ঘর।।
এত যদি জানতাম, আল্লা, মাও হইবে পর।
দুয়ারেতে উইয়া থুইতাম জল টুঙ্গির ঘর।।
জলটুঙ্গির ঘরের মাঝে আবের বান্ধন (বন্ধন)।
তাইয়ার মধ্যে দুফেল বিবি জুড়িল কান্দন।।
কত কান্দন কানবা, গো বিবি, বেলা হইলে শেষ।।
দোলায় আসিয়া চল বিবি বিবি হাপন দেশ।।

২৯

উঠ্ উঠ্ উঠগো কন্যা, জলদি উঠ নায়,
বড় সুন্দর দাঁড়ি মাঝি শুইয়া ঘুম যায়।
এক ঘড়ি বিলম কর আপছায়ার তলে
মামাজি তো রন্ধন করে সিন্দুরালী ঘরে।
খাইয়াছি মামাজির দুধ পোলাইয়া আসি তারে না।
বাবাজি তো কোরান পড়ে দরজার মোজানে,
খাইয়াছি বাবাজীর কামাই,
বোলাইয়া আসি তারে।
আরো ঘড়ি বিলম কর আপছায়ার তলে।
বাবাজি তো পুস্তক পড়ে দরজার মোজানে।
খাইয়াছি বাবাজীর কামাই,
বোলাইয়া আসি তারে না।

৩০

বাদ্যি বাজে আমার আনন্দে বাদ্যি বাজে আমার বিনন্দে,
বাদ্যি বাজে আমার নবীন শ্বশুর দেশে।।
সাথেরি গুরুয়া লোক পুছাবালা করে,
কতদূর কতদূর কইনার বাপের বাড়ি?
উরু যেন দেখা যায় বৈঠক সারি সারি
সেইখানে সেইখানে কইনার বাপের বাড়ি।।
সাথেরি গুরুয়া লোক পুছাবালা করে;
কতদূর কতদূর কইনার চাচার বাড়ি?
উরু যেন দেখা যায় দলান সারি সারি
সেইখানে সেইখানে কইনার চাচার বাড়ি।।

৩১

রানী গো, গা তেলে গা তোল, প্রভাত সময়,
চেয়ে দেখ সুখের নিশি প্রভাত হইয়া যায়।
খাটালে রাখিয়া পিঁড়ি বসাও আনিয়া নীলমণি
দধিমঙ্গলের সময় যায়।

গুণাই যাত্রার গান

বাকরগঞ্জ জেলার লৌকিক প্রেমসঙ্গীত গুণাই যাত্রার গান বা গুণাই বিবির গান ছিল খুবই জনপ্রিয়। একে গুণাই বিবির পালাও বলা হত। নায়িকা গুণাই আর নায়ক তোতা। তাদের বিচ্ছেদই হল গানের বিষয়। বাকরগঞ্জের বাইরেও মুসলমান সমাজে গানটি ছিল সুপ্রচলিত। গুণাই বিবির গানের কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

(ক)

আমি ছালাম জানায় মাস্টারের চরণে গো।।
ছালাম ছালাম ছালাম জানায় মাস্টার গো
ও-না-আপনার ও চরণে।।
শাহজানের কন্যা আমি মাস্টার গো
ও না জেলা বরিশালে।।

(খ)

আমি আর যাব না হাই স্কুলে পড়তে গো।।
হাই স্কুলে — পড়তে গেলে ভাইজান গো—
ও আমার সম্মান রাখে না গো।।
পড়াবার যদি ইচ্ছা থাকে ভাইজান গো
ও না — মাস্টার রাখেন বাড়ি।।

(গ)

চরণ ধরে বলছি, চাচা, দেবেন পাঁচশ টাকা।।
দেবেন পাঁচশ টাকা, চাচা, দেবেন পাঁচশ টাকা গো—
ও দেবেন পাঁচশ টাকা।।

(ঘ)

ও আমার কালেজা ধরিল দারুণ বিষে গো।।
ভাইএ ভাইএ বিচ্ছেদ করে খালেক রে —
ওনা বিষ খাওয়ালি শেষে।।
নাইকো মাতা, নাইকো পিতা, খালেক রে—
ওনা-কেহ নাই সংসারে।।
আরে ও ভাইজান মরেছে মরেছে
গুণোর কপাল ভেঙেছে।
অভাগিনী গুনাই রে ডাকে, ও ভাই সঙ্গে করে নে।।
খালেক রে খালেক রে, ও বিষ আমার হস্তে দে,
নাইকো মাতা নাইকো পিতা এবার আমিও যাই চলে।।

(ঙ)

আরে ও সখি, চল যাই চল যাই আমরা ফুল বাগানে যাই—
ফুল বাগানে গিয়া রে, সখি, পরাণ জুড়াই।।
আরে ও ফুল তুলিব তুলিব আমরা ডালা সাজাব।
বিনা সূতের হার গাঁথিয়া আমরা গলায় পরিব।।

(চ)

আরে ও কে তোমরা কে আছ কে আছ তোমরা কে আছ বনে,
আরে সরল মনে দাও পরিচয় তোমরা দুজনে।।

আরে ও তোমরা কথা কও কথা কও — তোমরা একটি কথা কও।
এখনি ছাড়িব গুলি বক্ষা নাই পাও।।

(ছ)

ফলে ফুলে, সখি, বনে ফুলে নাচ
বনফুলে নাচ, লো সই!
বনফুলে না।
আমরা গাঁথিব মালা আমরা সাজাব ডালা
পরাব তোমার গলে।।

গাজনের গান

১

পড়ল কৈলাসেতে বিয়াব সাড়া বাজিল ঢোলডগর কাঁড়া
শানাই শঙ্খ বাজে শত শত,
সেতারা চৌতারা বাজে জগঝম্প মাঝে মাঝে
মৃদঙ্গ তানপুরা শত শত।
সঙ্গে চলে যত জনা ঠিক যেন সব যুদ্ধের সেনা
ঢাল তলোয়ার ঘোরে উল্টা পাকে।
কবে চলে তলোয়ারে কাটাকাটি কেহ মারে কারে লাঠি
কেহ জোর করিয়া পুরীর মধ্যে ঢোকে।

২

আর, এভবে যারা করে বিয়া দুই
তার কপালে সুখ নাই কিছুই।
দেখ, শিবের ঘরে গঙ্গা-দুর্গা দুই রমনী
তারা বিবাদ করেন দিবারাতি।
একজনের থালে দুইজন বইসে,
প্যাট না ভরলে কান্দন আইসে।
আর অভিমানে রাগে কথা কয় না
গাল ফুলাইয়া রয়।।

ছাদ পিটানোর গান

তোমরা হরি বল না,
আসা যাওয়ার নৌকাখানি লইয়া গেল চোরে।
কেমন তোমার মা-বাপ, কেমন তাগো হিয়া,
এতবড় ডাগর হইছ না হইছে বিয়া।

নীলের গান

উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ।
তোমারে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ।।
খোলা চন্দন কাঠের কপাট দেও দুগ্ধ গঙ্গাজল।
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।।

সংযোজন

ও

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস

বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড

প্রকাশক
বরিশাল সেবা সমিতি
কলিকাতা-১৩
ভাদ্র ১৩২০

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস

উপক্রমণিকা

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষ এবং তন্মধ্যস্থ বঙ্গভূমি হিন্দু রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দ এবং ৬১০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত হিন্দু রাজগণ নিরাপদে বঙ্গভূমি শাসন করিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু, তৎপরেও সমগ্র বঙ্গভূমিতে দ্বাদশজন নরপতি ছিলেন। তাঁহারা বারভুঁইয়া নামে বিখ্যাত ছিলেন। উক্ত বারভুঁইয়াগণ বখতিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক বঙ্গভূমি অধিকারের সময় হইতে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগ পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উক্ত দ্বাদশ নরপতির মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায় দ্বিতীয় স্থানীয় রাজা ছিলেন। (৩য়) বিক্রমপুরের চাঁদ রায় কেদার রায়। (৪র্থ) ভূষণার মুকুন্দরাম রায়। (৫ম) ভুলুয়ার লক্ষণমাণিক্য। (৬ষ্ঠ) খিজিরপুরের ইশা খাঁ মসনদ আলী (পিতা কালিদাস) ইহার সন্ততিগণ বর্ত্তমানে জঙ্গলবাড়ী ও হয়বৎপুর নগরে বাস করিতেছেন। (৭ম) ভাওয়ালের রাজা শিশুপাল, ইহাকে ফাজেলগাজী দিল্লী হইতে আসিয়া জয় করিয়া তথাকার রাজত্ব প্রাপ্ত হন। (৮ম) বিষ্ণুপুরের হাম্বিরমল্ল। (৯ম) তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। (১০ম) দিনাজপুরের রাজা গণেশের বংশধর। (১১শ) রাজশাহী জিলার পুঠিয়ার রাজা। (১২শ) পাবনার রাজা।*

উপরোক্ত দ্বাদশজন নরপতি মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহের হস্তে বন্দী হন এবং তদবধি যশোহরের গৌরব-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রকৃত স্বাধীন রাজা ছিলেন ; তৎপর নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সময় পর্য্যন্ত করদভাবে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু, ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে চন্দ্রদ্বীপের অবস্থা নানা কারণে একান্ত শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হয়। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ প্রথম বাখরগঞ্জ নামধেয় জনপদগুলি অধিকার করে। তৎপূর্ব্বে এ প্রদেশে তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপ রাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। মুসলমান কর্ত্তৃপক্ষ খৃষ্টাব্দ ১৫৭৪ বঙ্গাব্দ এবং ৯৮১ সালের পরেও মধ্যে মধ্যে নামমাত্র কর গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন; ফলতঃ প্রকৃত পক্ষে যাবতীয় শাসনকার্য্য রাজার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। উক্ত চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি স্থিতি এবং রাজবংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

প্রস্তাবিত ইতিহাস বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জিলার একটি পরগণার ইতিহাস মাত্র ; যদিও বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপ বরিশাল জিলার একটি মাত্র পরগণা; কিন্তু, এই চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি অতীতের অদূরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশের সমগ্র বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালী এবং খুলনা

* কেহ কেহ পাবনার রাজার পরিবর্ত্তে সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের কথা বলেন। সাতৈল পাবনা জিলার অন্তর্গত চাটমহল থানার মধ্যে একটি গ্রাম। উল্লিখিত (৮ম) রাজা হাম্বিরমল্লের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ চাঁদ প্রতাপ পরগণার চাঁদগাজীর কথা উল্লেখ করেন।

জিলার অধীশ্বর ছিলেন। ইহাদের রাজত্বকাল বহু বিচিত্র ঘটনাসমূহে পূর্ণ ছিল। চন্দ্রদ্বীপের রাজা এবং ইহার রাজত্বকালের ঘটনা বাদ দিলে বাখরগঞ্জের ইতিহাস প্রাণহীন হইয়া পড়ে। এই স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের রাজত্বের বিবরণ ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুধু বরিশালবাসীর কেন সমগ্র বঙ্গবাসীর জানিবার ও শুনিবার বিষয় ; যেহেতু, ইহার অশ্রুতপূর্ব্ব প্রকৃত তথ্যমূলক ঘটনাগুলি জনসমাজে প্রচারিত হইল নব্য শিক্ষিত সমাজে বিস্ময় উদ্রেক করিবে। আমরা ইংলণ্ডের রাজা, গ্রীসের রাজা এবং ভারতবর্ষীয় মুসলমান রাজগণের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুখে বলিতে পারি; ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবনের স্থূল বিবরণগুলি কণ্ঠস্থ করিতে পারি ; কিন্তু, নিজ জন্মভূমির পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কীর্ত্তিনারায়ণ নামে চন্দ্রদ্বীপের জনৈক অধীশ্বর যে প্রধান যোদ্ধা ছিলেন এবং উদয়নারায়ণ নামে একজন পরম দানশীল নরপতি ছিলেন তাঁহাদের নামটিও অবগত নহি, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? বাখরগঞ্জের দুর্ভাগ্য ; তাই, এহেন রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত কুত্রাপি রক্ষিত হয় নাই। তথাপি এক্ষণও যতদূর অনুসন্ধানে জানা যাইতে পাবে, তাহাতেও যথেষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাখরগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর, বেভারিজ এবং পরলোকগত খোসালচন্দ্র রায় বাখরগঞ্জের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে এ জিলার অবশ্যজ্ঞাতব্য চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস সম্বন্ধে যেরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন তাহা যথোপযুক্ত হয় নাই, ইহা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। তদ্ভিন্ন, পরলোকগত প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী বাখরগঞ্জের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে কতদূর কি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই। আশা করি, এবম্বিধ আলোচনায় চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধীয় কতিপয় অতীত ঘটনা সর্ব্বজনসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইলে সমগ্র বঙ্গে না হইলেও বরিশালবাসিগণের আংশিক বিস্ময়োৎপাদন করিতে পারিবে। অলমতি বিস্তারেণ।

প্রথম অধ্যায়

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস

সীমা-নির্ণয়

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা বিভাগস্থ বর্ত্তমান বরিশাল, ফরিদপুর এবং নোয়াখালী জিলা এবং বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগেব খুলনা জিলার অধিকাংশ স্থান চন্দ্রদ্বীপ নামধেয় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। "দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃতি" নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের এক স্থানে ইহার সীমা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—

পূর্ব্বে ইছামতী সীমা পশ্চিমে চ মধুমতী
বাদাভূমি দক্ষিণে চ কুশদ্বীপোহি চোত্তরে॥
সমন্তাৎ মাসমার্গস্য শাসকোহয়ম্ মহীপতিঃ। (৬২১ শ্লোক)।

পূর্ব্ব সীমা ইছামতী, পশ্চিমে মধুমতী নদী, দক্ষিণে বাদাভূমি, এবং উত্তরে কুশদ্বীপ।

আবার ঐ গ্রন্থে বাক্‌লার বর্ণনা স্থলে বর্ণিত আছে;—

মেঘ্নানদী পূর্ব্বভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী।
ইন্দিলপুরী যক্ষ সীমা দক্ষিণে সুন্দরং বনং॥
ত্রিংশৎ যোজন বিমিতো সোমকান্তাদ্রি বর্জ্জিতঃ।
সোমকান্তে চ দ্বৌ দেশৌ বিখ্যাতৌ নৃপশেখরঃ॥
জম্বুদ্বীপ পশ্চিমে চ স্ত্রীকারোহি তথোত্তরে
বাক্‌লাখ্যে মধ্যভাগে রাজধানী সমীপতঃ॥

পূর্ব্ব সীমা মেঘনা নদী, পশ্চিমে বলেশ্বরী নদী, উত্তরে ইদিলপুর, দক্ষিণ ভাগে সুন্দরবন; ইহাব মধ্যে গিরি-বর্জ্জিত সোমকান্ত। ইহার পবিমাণ ৩০ যোজন। সোমকান্তের মধ্যে আবার দুইটি জনপদ আছে ;—পশ্চিমে জম্বুদ্বীপ, উত্তরভাগে স্ত্রীকার, মধ্যভাগে বাক্‌লা নামক রাজধানী।

আকবর বাদশাহের সময় বঙ্গদেশের মধ্যে বাক্‌লা পাঁচটি অংশে বিভক্ত ছিল। যথা—(১) সরকার বাক্‌লা, (২) ইসমাইলপুর, (৩) শ্রীরামপুর, (৪) সাহাবাদপুর, (৫) ইদিলপুর বা অলীপুর (ইদিলপুর)। এই বাক্‌লাতে ১৫০০০ পদাতিক ও ৩২০ গজ থাকিত এবং বাক্‌লা হইতে ৭১৫০৬০৫ দাম অর্থাৎ ১৭৮৭৬৷৷১৫ আনা কর গ্রহণ করা হইত।
(আইন-ই-আকবরী)।

"ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে" চন্দ্রদ্বীপস্থ কয়েকটি নগর ও গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় ; যথা—ব্রহ্মপুর (নগর), বারাণসীপুর, সহ্যশাল, নালিকা সরিৎ পার্শ্বে কুমুদ গ্রাম, কোটালী, কাকিনীগ্রাম, কণ্ঠস্থালী, বেনুবাটী, রণানদীর নিকট ডম্বুর, চেদী নগর, যাদবপুর, বেত্রগ্রাম, তেলীগ্রাম, ধুলগ্রাম, কাকুলগ্রাম, সুরাগ্রাম, মাধবপার্শ্ব ও পিঙ্গলপত্তন। (ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড। ১৩ শ্লোক)।

উপরোক্ত প্রধান নগর বা গ্রামগুলির মধ্যে মাধবপার্শ্ব যে বর্ত্তমান মাধবপাশা এবং কোটালী বর্ত্তমান কোটালীপাড়া, ইহা নিশ্চিত; এবং ধুলগ্রাম বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলার একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম। অবিশিষ্ট গ্রাম বা নগরগুলি যে বর্ত্তমান নোয়াখালী এবং খুলনা জিলার

অন্তর্গত গ্রাম হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্ব সীমা

"দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃতি" নামক গ্রন্থে পূর্ব্ব সীমানায় ইছামতী নদী মোহনায় নোয়াখালী যে পূর্ব্ব সীমানায় ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। রাজা রামচন্দ্র রায় ভুলুয়ার (নোয়াখালীর) রাজা লক্ষণমাণিক্যকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের রাজধানীতে আনয়ন করেন তদবধি ভুলুয়া প্রদেশ (নোয়াখালী) চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের শাসনাধীন হয়। সুতরাং, বর্ত্তমান নোয়াখালী যে চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল ইহা সুনিশ্চিত। আরও একটি কারণ এই মতের সমধিক সমর্থন করে, তাহা এই—

প্রথমত, ভুলুয়ার (নোয়াখালীর) অনেক ব্রাহ্মণের বৃত্তি-ব্রহ্মত্র এবং শিষ্য চন্দ্রদ্বীপের নানা স্থানে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রহমৎপুরের শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ এ জিলার খ্যাতনামা ভূম্যধিকারিগণ উক্ত ভুলুয়ার ঠাকুরদের শিষ্য; এ ভিন্ন এ জিলায় তাঁহাদের আরও অনেক শিষ্য ও যজমান আছে।*

দ্বিতীয়ত, কোতালী ষ্টেশনাধীন রায়পাশা লস্করবাড়ির দক্ষিণাংশে এক কায়স্থের বাড়ি আছে, তাঁহারা গুহবংশসম্ভূত। বহুকাল হয় এই বংশের কোন লোক এই জিলা হইতে নোয়াখালীতে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। এক্ষণ তাঁহাদেরই কোন বংশধর আসিয়া পুনরায় রায়পাশাতে বসতি করিতেছেন। বরিশালের কুলীন কায়স্থ-প্রধান গাভা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ভুলুয়া পরগণার দত্তপাড়া গ্রামে দেওয়ানবাড়ি বিবাহ করিয়াছেন। কাশীপুর গণপাড়া পল্লীর পরলোকগত চণ্ডীচরণ ঘোষ এবং দক্ষিণ কাশীপুর নিবাসী বাবু শ্রীশচন্দ্র গুহ নোয়াখালী ভুলুয়ার কায়স্থ পরিবারে বিবাহ করিয়াছেন। সুতরাং চন্দ্রদ্বীপ রাজার রাজত্ব সময় যে এই জিলাস্থ কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ তথায় গিয়া বিবাহাদি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই ; অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃষ্টান্ত বিবল নহে। অতএব তত্রত্য ব্রাহ্মণগণের এবম্বিধ শিষ্য যজমান ও বৃত্তি-ব্রহ্মত্র পাওয়া এবং এ জিলাস্থ চন্দ্রদ্বীপ সমাজের কায়স্থগণের বিবাহাদি ক্রিয়া প্রভৃতি নানা কারণে চন্দ্রদ্বীপবাসিগণসহ যেরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়, তদ্দ্বারা, স্পষ্টতই প্রমাণ হইবে যে, একদা নোয়াখালী চন্দ্রদ্বীপ রাজার করতলগত ছিল এবং তৎকারণেই ভুলুয়ার ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সহিত চন্দ্রদ্বীপবাসিগণের এবম্বিধ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছে।* *

পশ্চিম সীমা
(মধুমতী ও বলেশ্বরী নদী)

বর্ত্তমান বলেশ্বর ও মধুমতী নদীর অধিকাংশ ভাগ যে খুলনা জিলার অন্তর্গত তাহা সম্ভবত অনেকেই অবগত আছেন। যে চাক্‌শ্রী বা চাক্‌সিরি পরগণা, রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের আমলে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যভুক্ত ছিল, এবং যে চাক্‌শ্রী পাওয়ার প্রত্যাশায় যশোহরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজা প্রতাপাদিত্য আপন দুহিতা বিন্দুমতীকে রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, সেই চাক্‌শ্রী পরগণাই বর্ত্তমানে খুলনা জিলার অন্তর্গত। সুতরাং, বর্ত্তমানে খুলনা

* ভুলুযাব তারিণীশঙ্কব, হবিশঙ্কর ও উমাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য চন্দ্রদ্বীপেব কোন রাজার গুরু ছিলেন।

* * বর্ত্তমান নোয়াখালীব অধীন হাতিয়া সন্দ্বীপ ইংবেজ গভর্নমেন্টের আমলেও বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ছিল। ১৮২২ সনে উহা নোয়াখালী জিলাভুক্ত হইয়াছে।

জিলার অধিকাংশ স্থান যে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহা জানা যাইতেছে। চাক্‌সিরি নিতান্ত ছোট স্থান ছিল না। একটি প্রাচীন ছড়া আছে—"সাত রাত পাক্ ফিরি, তবু না পাই চাক্‌সিরি।" মাননীয় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার প্রতাপাদিত্যের জীবনীর ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা যশোহর, খুলনা এবং বরিশাল জিলার মধ্যে কোন চাক্‌সিরি নামক পরগণা কি স্থান নাই", কিন্তু নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে ইহা সম্যক উপলব্ধি হইবে যে, চাক্‌শ্রী নামক স্থান বর্ত্তমান খুলনা জিলারই অন্তর্গত। বিবরণটি এই—১৮৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে সুন্দরবনের সার্ভে কমিশনার ড্যাম্পিয়ার সাহেব সুন্দরবনের যে একটি ম্যাপ প্রস্তুত করেন, তাহাতে তিনি যে সময়ে যতদূর পর্য্যন্ত সমুদ্র তীরবর্ত্তী বাদাবন পাইয়াছিলেন, তাহার সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া একটি রেখা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই রেখার নাম **ড্যাম্পিয়ার রেখা**। এই রেখা হইতে ৫ মাইল উত্তরে পশারি ও মঙ্গলা নদীর সঙ্গমস্থল হইতে ১১ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ধৌতখালী নদীর কূলে পরগণা মধুদিয়ার অন্তর্গত চাক্‌শ্রী গ্রাম বর্ত্তমান আছে। ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইহা যে একটি পুরাতন নগর বা শহর ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বর্ত্তমান খুলনা জিলাব বাগেরহাট মহকুমা হইতে ৭-৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এই চাক্‌শ্রী নামক স্থান। ড্যাম্পিয়ার সাহেবের ম্যাপের রেখা দেখিলে বোধ হয় ১৮৩২-৩৩ সালে এই স্থান সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী ছিল ; বর্ত্তমানে সমুদ্র ক্রমশ দক্ষিণে সরিয়া যাওয়ায় সমুদ্র হইতে এ স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যবধান হইয়াছে; কিন্তু এখনও সমুদ্র ঐ স্থান হইতে বড় বেশি দূর নয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ঈশ্বরপুরী রাজ্যের সীমানাও এই স্থান হইতে বহুদূর নয়। সাধারণ লোকে এই স্থানকে "চাক্‌সি" বলিয়া থাকে।

ঋজু পথে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রবেশ-দ্বার এবং সমুদ্র পথের প্রবেশ-দ্বার, প্রবল নদীবহুল স্থলে এই চাক্‌সিরি যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বৈবাহিক কন্দর্পনারায়ণ রায়ের চাক্‌সিরি ছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দ ও ৯৬৮ বঙ্গাব্দে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয় এবং ১০১৩ বঙ্গাব্দে তাঁহার দেহান্তর হয় ; মাত্র ৪৫ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই চন্দ্রদ্বীপরাজ কন্দর্পনারায়ণের সহিত আত্মীয়তা করিয়া প্রতাপাদিত্য চাক্‌সিরি গ্রহণ করেন।

চাক্‌সিরির অনতিদূরে নৌবাহিনী স্থাপিত করিয়া খাঞ্জাহান আলীসা নামক জনৈক মুসলমান উক্ত চাক্‌সিরির ৩-৪ মাইল ব্যবধান সুন্দরবনের মধ্যে মগরহাট বা জাহাজঘাটা নামক স্থানে ভৈরবনদের উপর এক সৈনিক আবাস নির্ম্মাণ করেন। উক্ত খাঞ্জে আলীকে শাসন করা এবং সমুদ্র হইতে কোন জলদস্যু আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে উৎপাত করিতে না পারে, তজ্জন্য মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহার বৈবাহিক চন্দ্রদ্বীপ-অধীশ্বর হইতে উক্ত চাক্‌সিরি গ্রহণ করেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোন বণিক, বাণিজ্য-ব্যপদেশে পশ্চিমবঙ্গে জলপথে যাইতে হইলেই চাক্‌সিরি ভিন্ন যাওয়ার আর গত্যন্তর ছিল না ; সুতরাং আধুনিক খুলনা, যশোহর ও বরিশালে চাক্‌শ্রীর ন্যায় পূর্ব্বোক্ত সুবিধা-সম্পন্ন দ্বিতীয় স্থান আর ছিল না। বর্ত্তমান খুলনার হাবেলী পরগণার কায়স্থ প্রধান কাড়াপাড়া গ্রাম হইতে এই চাক্‌সিরি মাত্র ৩-৪ মাইল ব্যবধান ; সুতরাং, এহেন চন্দ্রদ্বীপস্থ চাক্‌সিরির নামধেয় প্রসিদ্ধ স্থান বর্ত্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত থাকায় পুরাকালে খুলনার অধিকাংশ স্থান যে চন্দ্রদ্বীপের রাজার করতলগত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।*

---

* ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বলেশ্বর নদের পশ্চিমপাড়স্থ কচুয়া ষ্টেশন এবং মোড়লগঞ্জ থানার স্থানগুলি বাখরগঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যশোহর জিলাভুক্ত হয়, পরে খুলনা নূতন জিলা হইলে বর্ত্তমানে খুলনার অন্তর্গত হইয়াছে।

দক্ষিণ
(বাদাভূমি দক্ষিণে চ)।

বাদাভূমি, শব্দে যে সুন্দরবন ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, কারণ, অদ্যাপি কাষ্ঠ-বিক্রেতারা সুন্দরবনে যাইবার সময়ে "বাদাবনে যাই" ইহা সচরাচর বলিয়া থাকে।

উত্তর
(কুশদ্বীপোহি চোত্তরে)।

জিলা ঢাকার দক্ষিণে সীতালক্ষার নিকট শঙ্খকোট ও তাহার দক্ষিণে কুশদ্বীপ নামে একটি দ্বীপের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় ; সুতরাং উহা যে বহু পূর্ব্বে পদ্মানদীস্থিত কোন দ্বীপ ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ফরিদপুর জেলার কথা

বাখরগঞ্জ শব্দ সৃষ্টির পূর্ব্বে বাখরগঞ্জ নামধেয় জনপদগুলি বাকলা চন্দ্রদ্বীপ বলিয়াই প্রখ্যাত ছিল ; মুর্শিদকুলিখাঁর শাসনসময়ে, উক্ত নবাবের জনৈক কর্ম্মচারী বোজরগমেদপুর পরগণা ও সেলিমাবাদ পরগণার কর্ত্তৃত্ব নিয়া বোজরগমেদপুর পরগণার ভূমিতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার নাম ছিল, আগাবাকর। ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে উক্ত আগাবাকর এই স্থানে বস-বাস করিযাছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারেই বাকরগঞ্জ নাম হয। বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ থানা বোজরগমেদপুর পরগণার অন্তর্গত। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ থানাব ঠিক উত্তরাংশে বাখরগঞ্জ জিলা স্থাপিত হয়। এক্ষণ উক্ত জিলার স্থানসমূহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে ; মাত্র একটি পুরাতন নারিকেল বৃক্ষ সামান্য স্থান নিয়া অতীতেব সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বাখরগঞ্জ হইতে বরিশালে সদর কাছারী সংস্থাপিত হইয়াছে। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাখরগঞ্জকে ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক জিলা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইংরেজ অধিকারের পরও ৩৫ বৎসর কাল বাখরগঞ্জ জিলা ঢাকার অন্তর্গত ছিল। ইহার বহুকাল পরে ঢাকা ও বাখরগঞ্জের কতিপয় স্থল লইয়া ফরিদপুব জিলা গঠিত হয়। ফরিদপুর জিলা গঠনের পরেও মাদারীপুর মহকুমা কিছুদিন বরিশালের অন্তর্গত ছিল এবং গৌরনদী থানার বাগধা, বাকাল, ফুল্লশ্রী, গৈলা প্রভৃতি বহু গ্রামের দলীল মাদাবীপুরে রেজিস্টারি হইত। অদ্যপি বরিশাল সদর রেজিস্টারি আফিসের মহাফেজখানা হইতে উক্ত দলীলসমূহের নকল বাহির হইতেছে।

বর্ত্তমান বরিশাল কালেক্টরির ইদ্রাকপুর, রছুলপুর পরগণার খাজানা কতক ঢাকার কালেক্টরিতে, কতক ফরিদপুর কালেক্টরীতে এবং কৃতক বরিশাল কালেক্টরিতে দাখিল হয় এবং ইদিলপুর বীরমোহন ও কাশীমপুর সেলাপটি নামিক পরগণার খাজানা কতক ফরিদপুর কতক বরিশালে দাখিল হইয়া থাকে। সুতরাং, এতদ্দারা স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে যে, বাখরগঞ্জ নাম সৃজনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলার স্থানগুলি পুরাকালে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

"দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃতি" গ্রন্থের সীমা-বিষয়ক দ্বিতীয় বর্ণনাতে দ্বিতীয় প্রমাণে ইতিপূর্ব্বে যে শ্লোকটি পাঠ করা হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে : —**মেঘনা নদী পূর্ব্ব ভাগে**। ঐ মেঘনা নদী ঢাকা ত্রিপুরা হইয়া নোয়াখালীর বড় নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সুতরাং মেঘনার কতকাংশ যে বর্ত্তমান নোয়াখালীর সীমার অন্তর্ভুক্ত তাহা সুনিশ্চিত।

পশ্চিমে চ বলেশ্বরী

বলেশ্বরী নদী যে বর্ত্তমান খুলনা জিলার অধিকাংশ স্থলে প্রবাহিত তাহা বোধহয় অনেকেই অবহিত নহেন। যেহেতু, বলেশ্বরের তীরভূমি বনগ্রাম, মঘিয়া প্রভৃতি গ্রাম বর্ত্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত। বনগ্রাম ও মঘিয়ার কতিপয় জমিদার বাখরগঞ্জের সেলিমাবাদ পরগণার আংশিক মালিক। এই ছলিমাবাদ বা সেলিমাবাদ পরগণা যুক্তভাবে খুলনা ও বরিশাল জিলা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। উক্ত সেলিমাবাদের সরকারি রাজস্ব কতক বরিশালে এবং কতক খুলনার কালেক্টরিতে দাখিল হইয়া থাকে। সুতরাং বলেশ্বরী প্রবাহিতা প্রদেশগুলি এবং চাকসিরি পরগণা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত থাকায় পুরাকালে বর্ত্তমান খুলনার সমগ্র না হইলেও অধিকাংশ স্থান কি অন্তত বাগেরহাট মহকুমা অবশ্যই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহা ব্যতীত আরও একটি ঘটনা এই যে খুলনা জিলার অধীন বাসুদেবপাড়া নামক গ্রামে গত সন পৌষ মাসে দনুজমর্দ্দনদের নামে একটি রৌপ্যমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ইন্দিলপুরী যক্ষসীমা

ইন্দিলপুরীকেই বর্ত্তমান ইদিলপুর বলে। প্রাচীন আইন-ই-আকববী গ্রন্থে দেখা যায়—জগদ্বিখ্যাত আকবর বাদসাহের প্রধান রাজস্বসচিব মহাত্মা তোড়লমল ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে যে রাজস্ববিষয়ক বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে ইদিলপুরকেও বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করেন। সুতরাং ইদিলপুর যে পুরাকালে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ এবং ইদিলপুর চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত থাকায় আধুনিক ফরিদপুর জিলার অধিকাংশই যে চন্দ্রদ্বীপ অধিকারভুক্ত ছিল, ইহা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হয়।

"দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃতি" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপের সীমা ৩ যোজন বা ২৪০ মাইল উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৮৭ মাইল, এবং প্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬০ মাইল মাত্র অবধারিত করা হইয়াছে, এবং ইহার পরিমাণ মাত্র ২৪৫৩৪৯৭ একর (এক একর ৩ বিঘা আধ কাঠা) ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং চন্দ্রদ্বীপের পরিধিগত ৩০ যোজন পরিমাণ হইলে ইহা আধুনিক বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও খুলনা জিলায় ব্যাপ্ত ছিল, এরূপ না ধরিলে একথা সত্য হইতে পারে না। বরিশাল হইতে খুলনা ১০৪ মাইল এবং বরিশাল হইতে নোয়াখালী ৯০ মাইল, মোট পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৯৪ মাইল, সুতরাং উক্ত ৩০ যোজন মধ্যে গিরিবর্জ্জিত প্রদেশ খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী সমন্বিত না হইলে কদাপি সম্ভব হয় না। ইহার পশ্চিমে জম্বুদ্বীপ, উত্তর ভাগে স্ত্রীকার, মধ্যভাগে বাক্‌লা রাজধানী। এতদ্বারাই প্রতীতি হইবে যে, মধ্যভাগে মাধবপাশা বা শ্রীনগর রাজধানী, উত্তরদিকে স্ত্রীকার (শ্রীকারপুরের উগ্রতারা মহামায়ার মন্দির)** এবং পশ্চিমদিকে বলেশ্বর ও মধুমতীর মধ্যে কোন দ্বীপাকার ভূমিকে জম্বুদ্বীপ বলা হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের সীমানা যে উত্তরকালে আধুনিক বরিশাল, নোয়াখালী, ফরিদপুর এবং খুলনা জিলায় পরিব্যাপ্ত ছিল, তাহা সম্যকরূপেই প্রতিপন্ন হইল।

** শিকারপুরের নাসিকাপীঠের বিবরণ এই পুস্তিকার স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উৎপত্তি-বিবরণ

চন্দ্রদ্বীপের.উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। "ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ বলেন—এখানকার সমস্ত ভূমি জলময় ছিল ; মহাদেবের প্রসাদে ও তাঁহার ললাটস্থ অগ্ন্যুত্তাপে সেই জল শুষ্ক হয়। চন্দ্রচুড়ের মস্তকস্থ চন্দ্রকলাব কিরণে এই দ্বীপ সিক্ত হইয়াছিল; এজন্য উহার নাম চন্দ্রদ্বীপ হইল। যথা—

চন্দ্রদ্বীপে পূরা বিপ্রাস্তোয় পূর্ণা চ ভূমিকা।
মহাদেব প্রসাদেন শুষ্কা ভূতাহি মৃত্তিকা॥
ললাটানল দাহেন বিলীনং হি জলং বহু।
স্থালী ভূতা চ পৃথিবী শৈবালাং সুখকারিকা॥
মহাদেবং মৃড়ানীচ পপৃচ্ছ সাদরান্বিতা।
পূর্ণচন্দ্রং বিহায়ৈ বধার্য্যতে শশিনঃ কলা॥
কিং নিমিত্তং ত্বয়া ধার্য্যং কিং সুখং জায়তে ততঃ।

মহাদেব উবাচ

অমাদি পৌর্ণমাস্যন্তাঃ যা এব শশিনঃ কলাঃ।
তিথয়স্তা সমাখ্যাতা ষোড়শৈব বরাননে॥
অমা ষোড়শভাগেন দেবী প্রোক্তা মহাকলাঃ।
সংহিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহ ধারিণী॥
অমানাম্নী কলামধ্যে যা বাসাং ত্বং প্রতিষ্ঠিতা।
অতো হি ত্বং মমাধার্য্যা কলাকাল প্রমাথিনী॥
তস্যা কলায়াঃ কিবণৈঃ সিক্তা দ্বীপা চ ভুসুরাঃ।
অতঃ প্রজাঃ কলাচন্দ্রদ্বীপে ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥

(ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড ১২।৮—৮ শ্লোক)।

আধুনিক বাখরগঞ্জ জিলার দক্ষিণস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুন্দরবন সংসৃষ্ট বিস্তৃত জনপদ যে প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ ছিল, তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। কালক্রমে মগ প্রভৃতি বিবিধ জাতির উপদ্রবে চন্দ্রদ্বীপের রাজা ক্রমশ এ জিলার উত্তরে আসিয়া, ক্রমান্বয়ে রাজনগর, রিশরিকাঠী, ক্ষুদ্রকাঠীতে অতি অল্প সময় বাস করিয়া, পরিশেষে হোসেনপুব এবং শেষকালে মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করেন। মাধবপাশাই শেষ রাজধানী। তথা হইতে আর রাজধানী পরিবর্তন করা হয় নাই।*

* ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

মগজাতি শস্ত্রপাতৈর্মত্তব্যাঃ সকলাঃ প্রজাঃ।
মগাধিকারে ভাবী চ বেদভ্রষ্টা ভবিষ্যন্তি॥

(ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ১৩/১৩)

উৎপত্তি সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী

বিক্রমপুর নিবাসী চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য কাত্যায়নীর উপাসক ছিলেন। তাঁহার শৈশব হইতেই বৈরাগ্যের ভাব ছিল ; ক্রমে কৈশোরে ও যৌবনে উক্ত বৈরাগ্যের ভাব পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়। তিনি তাঁহার মাতার একান্ত অনুরোধে অন্তত বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন এবং ভুবনেশ্বরী নাম্নী কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইলে, চন্দ্রশেখর তাঁহার কতিপয় জ্ঞাতি-কুটুম্ব সহিত কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। বিবাহের পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর তাঁহার ভাবী পত্নীর নাম জানিতেন না। দশ মহাবিদ্যার মধ্যে ভুবনেশ্বরী অন্যতম মহাবিদ্যা। শাক্ত সম্প্রদায় মধ্যে শক্তিমন্ত্রের উপাসক মাত্রেই উক্ত দশ মহাবিদ্যার যে কোন নামে দীক্ষিত হন ইহাই নিয়ম। চন্দ্রশেখর ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এদিকে সম্প্রদানকালীন পুরোহিত যেমন ভুবনেশ্বরীর নাম করিলেন, অমনি চন্দ্রশেখর জিভ্ কাটিয়া বিবাহের আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং মুহূর্ত মধ্যে দৌড়িয়া অলক্ষিতভাবে অন্তর্ধান করিলেন; চারিদিকে লোক ছুটিল, তৎকালে কেহ অনুসন্ধান করিয়া কোন খোঁজ করিতে পারিল না; বিবাহ সেই দিনের জন্য স্থগিত রহিল। বর-কন্যা উভয় পক্ষের লোকেরই মুখচ্ছবিতে বিষাদের ছায়া দেখা দিল। এদিকে চন্দ্রশেখর উক্ত বিবাহের রাত্রি কোন অলক্ষিত স্থানে অতিবাহিত করিয়া পরদিন এক গভীর অরণ্যে গিয়া, তাঁহার উপাস্য দেবীর নামে তাঁহার ভাবী পত্নীর নাম ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নিতান্ত অপরাধের কার্য্য হইয়াছে মনে করিয়া, ঐদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জ্জন জন্য যাত্রা করেন। নৌকা বাহিতে বাহিতে ক্রমে এতদূর গিয়াছেন যে, স্থলভাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তখন জলে ঝাঁপ দিবার উদ্যোগ করিলে হঠাৎ এক ক্ষুদ্র তরণীতে একটি গৌরবর্ণা কন্যা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিতা হইল। কন্যা সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ওহে নির্ব্বোধ ঠাকুর, জলে ঝাঁপ দিও না!" চন্দ্রশেখর ঘোর নিশীথে ভীষণ জলধি-গর্ভে হঠাৎ এবম্বিধ কন্যার আবির্ভাব দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। ক্ষণকাল আত্ম-সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কেগা?" কন্যা উত্তর করিলেন—"আমি জেলের কন্যা, জাল ফেলা হইয়াছে, তাহার প্রহরীরূপে এখানে আছি।" চন্দ্রশেখর বলিলেন—"তুমি আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়া জলে ঝাঁপ দিতে নিষেধ করিলে কেন?" কন্যা উত্তর করিল—"তোমার উপাস্য দেবীর নামে ভাবী পত্নীর নাম হইয়াছে বলিয়া তুমি ক্ষোভ ও লজ্জায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু, উহা তোমার গুরুতর ভুল। স্ত্রীলোক মাত্রেই স্বয়ং কাত্যায়নীর অংশ ; সুতরাং তোমার উপাস্য দেবীর নামে ভাবী পত্নীর নাম হওয়ায় তোমার কোন পাপ বা অপরাধের কারণ হয় নাই।" চন্দ্রশেখর বলিলেন—"আপনি সামান্য মানবী বা জেলের কন্যা নহেন; আপনি আত্মগোপন করিতেছেন, প্রকৃত পরিচয় না দিলে আপনার সমক্ষে এই মুহূর্ত্তেই আমি এই অতল জলে ডুবিয়া মরিব।" এই কথার উপরে কন্যা আর আত্মগোপন করিলেন না। স্নেহ-ভরে বলিলেন) "বৎস চন্দ্রশেখর, আমিই তোমার সেই উপাস্য দেবী কাত্যায়নী। তুমি আমার আদেশানুসারে উক্ত কন্যাকেই বিবাহ কর ; বরং আমার প্রতি তোমার ভক্তির ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য উক্ত পাত্রীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লও।

অদ্য হইতে সপ্তদশ দিবসে ইহার দক্ষিণদিকস্থ ভীষণ সুগন্ধা নদীর মোহনায় সমুদ্রমধ্যে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপের ন্যায় চর পড়িবে, পরে তাহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইবে। তুমি

তথায় গিয়া একটি রাজ্য স্থাপন কব; তোমাব নামানুসারে উক্ত রাজ্যের নাম চন্দ্রদ্বীপ হইবে। যেস্থানে চর পড়িবে তাহার উত্তরাংশকে সুগন্ধা বলে : তুমি উহার উত্তর পাড়ে ডুব দিলে কাত্যায়নী ও মদনগোপাল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে ; ঐ মূর্ত্তিদ্বয় তোমাব রাজধানীতে স্থাপন করিবে।"

চন্দ্রশেখর দেবীর আদেশে আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বাড়ি আসিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত মাতৃদেবীর নিকট প্রকাশ করিলেন। তৎপর, ৭ম দিবসে যে বিবাহের দিন ছিল, তাহাতে উক্ত ভাবী পত্নীব নাম পরিবর্তন করিয়া ঐ নূতন নাম উল্লেখে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, এবং দেবীর আদেশানুযায়ী সপ্তদশ দিবসে সুগন্ধা নদীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া, প্রথম ডুবে কাত্যায়ণী ও দ্বিতীয় ডুবে মদনগোপাল মূর্তি প্রাপ্ত হইলেন। কেহ কেহ বলেন—তৃতীয় ডুব দিলে লক্ষ্মী মূর্তি পাওয়া যাইত, এবং রাজ্যও চিরস্থায়ী হইত ; কিন্তু, চন্দ্রশেখর আর ডুব দিলেন না। উক্ত মূর্তিদ্বয় এবং আপন প্রিয় শিষ্য, সঙ্গীয় দনুজমর্দ্দনসহ দক্ষিণ দিকে চলিলেন এবং কতদূর অগ্রসর হইলে দেবীব কথিত দ্বীপ তাঁহাদের নেত্রগোচর হইল। তৎপব নিজ আবাসভূমি বিক্রমপুর হইতে বহুতব লোকজন আনিয়া, নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। দ্বীপের যে স্থানে রাজধানী স্থাপন করা হইল, সেই স্থানের নাম কচুয়া রাখা হইল। উহা বর্তমানে পটুয়াখালী মহকুমার অন্তঃপাতী বাউফল থানাব অধীন তেতুলিযা নদীর পশ্চিমপাড়ে কালাইয়ার সন্নিকটে অবস্থিত আছে ; এইরূপ কিংবদন্তী যে, উক্ত দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে বৃহৎ কচুবন হইয়াছিল ; তজ্জন্য সেই স্থানকে কচুয়া নামে অভিহিত করা হয়।

ঐতিহাসিক কিংবদন্তীর সহিত ভৌগোলিক তথ্যের তুলনা

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, হিমালয বঙ্গোপসাগরের অংশ হ্রাস করিতেছে। এই কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা ভূগর্ভস্থিত স্তব ও তন্মধ্যস্থিত জল-জন্তুর অস্থি-পঞ্জর সাময়িকভাবে উহার সাক্ষ্য প্রদান কবিযা থাকে। গত ১৩১৭ সনের মাঘ মাসে ঝালকাঠী ষ্টেশনাধীন হোসেনপুর গ্রামে লেখকের নূতন বাটীতে এক নাল জমির মধ্যে পুকুব খনন করিবার সময়ে সাত হাত মৃত্তিকার নিচে এক বিকট জল জন্তুর অস্থি-পঞ্জব এবং একখানি বড় নৌকার হালের অংশ পাওয়া গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় লেখকের অজ্ঞাতসারে নোয়াখালী নিবাসী মুসলমান কুলিগণ উক্ত জল-জন্তুর অস্থি পঞ্জরগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে ; কিন্তু, হালের ভগ্ন অংশটুকু অদ্যাপি রহিয়াছে। এই জিলায় এই প্রকার শত শত স্থানে পুকুর ও পগার নিম্নভূমি খননকালীন নৌকার তক্তা ও কাছি পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় পাইবার বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে।

প্রাকৃতিক শাস্ত্রবর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী অপরাপর দেশাপেক্ষা বঙ্গদেশে অধিকতর বিস্ময়-রসোদ্দীপক। বাখরগঞ্জে এই সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী সমধিক লক্ষিত হয়। এ জিলার উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক ক্রমশ ঢালু হইয়া চলিয়াছে। সমুদ্র হইতে উত্তর দিকে গড়ে প্রত্যেক মাইল ১০৮ ইঞ্চি উচ্চ। সুন্দবনে চর বৃদ্ধি হইয়া এই জিলা ক্রমশ দক্ষিণে অগ্রসর হইতেছে।*

চন্দ্রশেখরেব সহিত দেবীর কথোপকথন এবং চন্দ্রদ্বীপ স্থাপন বঙ্গাব্দ ৬০৬ সালে সঙ্ঘটিত হইযাছিল। সুতরাং, ৭১৩ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র বরিশাল, ফরিদপুব এবং খুলনার

* চব যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইযাছে, তাহাতে আমবা শীঘ্রই পটুয়াখালী জিলা এবং কলাপাড়া বা আমতলী তাহাব উপবিভাগে পবিণত হইযাছে, ইহা দেখিতে পাইব। লেখক

দক্ষিণ ভাগ অতল জলধি-জলে নিমজ্জিত ছিল, ইহা অসম্ভব নহে। তৎকালে, এই জিলার শীকারপুর, ফুল্লশ্রী ও পোনাবালিয়া এবং ফরিদপুর ও ঢাকার মধ্যে কুশদ্বীপ ও শঙ্খকোট দ্বীপ নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় দ্বীপ মাত্র অবস্থিত ছিল। ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর বিক্রমপুরের দক্ষিণ অংশেই যে গভীর গর্জ্জন করিয়া প্রবাহিত হইত, ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়।

এই জিলার ঝালকাঠী ও গৌরনদী ষ্টেশনের সীমানাস্থিত রৈভদ্রদী গ্রামনিবাসী জনৈক ব্যক্তি কাশীধামে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত বহুকাল হয় দেখা করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বামীজি তাঁহার নিবাস জিজ্ঞাসা করায় তিনি রৈভদ্রদী গ্রামের উল্লেখ করেন। তদুত্তরে স্বামীজী তাহা বুঝিতে না পারিয়া "শীকারপুরেব কোন দিকে" জিজ্ঞাসা করেন। ভদ্রলোকটী যেই বলিলেন—"শীকারপুরের দক্ষিণে", অমনি স্বামীজি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওসবও কি চর পড়িয়াছে?" উক্ত ভদ্রলোকের বাসগ্রাম রৈভদ্রদীও দ্বীপচর ছিল বলিয়াই সম্ভবত শেষাক্ষর 'দী' হইয়াছে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করা যায় না;* এতদ্ভিন্ন এ জিলার চর সংযুক্ত বহু গ্রামের নাম পাওয়া যায়। গৌরনদী ষ্টেশনাধীন চর সরিকল, চর জাহাপুর ইত্যাদি, ঝালকাঠীতে চর কেওতা, চর সাঙ্গর ইত্যাদি, কোতালীতে চর কাউয়া, চর বদনা, চর করমজী, চর কর্ণকাঠী ইত্যাদি, নলছিটিতে চর নলছিটি ইত্যাদি, বাখরগঞ্জে চড়াদী বা চরামদ্দী ইত্যাদি, মেহেন্দীগঞ্জে চর শ্যামরায় চর খাগকাটা ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন ভোলা, পটুয়াখালী ও পিরোজপুরের চর সংযুক্ত গ্রামের অন্ত নাই। ইহাদ্বারা স্পষ্টত অনুমিত হইবে যে, ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে যে, এই প্রদেশ ভীষণ জলধিতলে নিমগ্ন ছিল, ইহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবে সর্ব্বাপেক্ষা শীকারপুর গ্রামটি অতীব প্রাচীন যেহেতু তথায় দেবীর ৫১ পীঠ পতিত হইয়া বহুকাল যাবৎ উগ্রতারার মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। এ জিলার ফুল্লশ্রী নিবাসী প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্ত ১৪০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ৫৩৮ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মপুরাণ রচনা করেন। তখন তিনি লিখিয়াছেন—

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর,
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর।

উক্ত প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্তের লিখিত মতে দেখা যায়, পদ্মাপুরাণ রচনাকালীন ফুল্লশ্রী গ্রাম একটি দ্বীপে পরিণত ছিল। ফলত ফুল্লশ্রী এবং শীকারপুর যে তৎকালীন উত্তাল তরঙ্গময়ী জলধির মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে উহার চতুর্দ্দিকস্থ নদীর অবস্থা বিল-উৎপত্তির পূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঘণ্টেশ্বর নদী চরা পড়িয়া মাত্র সায়েস্তাবাদের উত্তরাংশে জাহাপুরের নদী বর্ত্তমান আছে। পশ্চিমে ঘাঘর বা ঘর্ঘরা নদীও খালে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণ কবিবর গুপ্তের পদ্মাপুরাণ কথিত, ঘাঘর

* অনুমান ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দেহান্তর হইয়াছে। যাঁহাবা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাবা বলেন স্বামীজির বয়স অনুমান ১৫০ বৎসব হইযাছিল। তাহা হইলে সম্ভবত একশত বৎসব কি তৎপূর্ব্বে তিনি শীকারপুরেব নাসিকা পীঠ দর্শনার্থ আগমন করিযাছিলেন তখন বর্ত্তমান শীকাবপুবের দক্ষিণাংশেব নদী প্রবল আকারে পরিণত ছিল এবং তিনি শীকাবপুবের দক্ষিণাংশেব ভূভাগগুলি প্রকাণ্ড নদীবহুল স্থান মনে করিয়া থাকিবেন, নচেৎ শত বৎসরের বহু পূর্ব্বে বৈভদ্রদী এবং তাহাব পূর্ব্ব পার্শ্বেব গুঠিয়া গ্রাম বহু লোকেব আবাসভূমি হইযাছিল, কিন্তু শীকারপুরের নদীর অবস্থা বর্ত্তমান সময অপেক্ষা তৎকালীন যে দশগুণ প্রস্থ ছিল ইহা নিশ্চিত। কারণ উক্ত শীকারপুরেব নদীতে চব পড়িয়া চব সাধুহাটী, কবমুল্লাকাঠী নামে একটি নূতন গ্রামেব সৃষ্টি হইযাছে তাহাব সীমানা নিতান্ত কম নহে।

নদীর উপর দিয়া পুরাপ্রসিদ্ধ নবাব-অনুচর ছবিখাঁ এক প্রকাণ্ড জাঙ্গাল বান্ধিয়াছিলেন ; বর্ত্তমানে ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড উক্ত জাঙ্গাল মেরামত করিয়া গৈলা হইতে আমবৌলার মধ্য দিয়া ঘাঘর পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন। এদিকেও ঘণ্টেশ্বরের নদীর মধ্য দিয়া জাহাপুরঘাট পর্য্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, দেবীর আদেশে এত বড় একটা প্রকাণ্ড চর পড়িয়া তাহা একটা বিশাল রাজ্যে পরিণত হইল, ইহা সম্ভবপর নহে। উহা প্রকৃতই কাল্পনিক ও কিংবদন্তী ; কিন্তু, এই জিলার ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে ইহা কিছুতেই অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইলসা বা তেতুলিয়া, মাসকাটা, কালাবদর, মূলাদী ও জাহাপুরের নদী এবং পিরোজপুরের কালীগঙ্গা, কচা, ও কোটালীপাড়ার ঘাঘর নদী যে একমাত্র সুগন্ধা নামেই প্রকাণ্ড নদীর মধ্যে ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। ভীষণ সুগন্ধা নদীমধ্যে ফুল্লশ্রী, শীকারপুর এবং পোনাবালিয়া বহুকাল পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাকারে অবস্থিত ছিল। কালক্রমে সমস্ত চর জাগিয়া এ জিলার সদর বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। জাহাপুরের চর এত নূতন যে, ১২১৯ সনে মাত্র উহা বন্দোবস্তের উপযুক্ত নির্দ্ধারিত হইয়া বন্দোবস্ত হয়। সুগন্ধার পশ্চিমদিকের ব্রাহ্মণদিগকে এখনও সোন্ধারকুলী বলে, এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রণ সময়ে বাক্‌লা, বাঙ্গরোরা ও সোন্ধারকুলী নামে অদ্যাপি অভিহিত করিয়া থাকে। অতএব চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী এবং দেবীর আদেশ প্রভৃতি কথাগুলি আছে, তাহা যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে, তাহা ভৌগোলিক তথ্য দ্বারাও প্রতিপন্ন হইল।

তৃতীয় অধ্যায়
চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের কচুয়ায় অবস্থিতি
প্রথম (আদি) রাজা দনুজমর্দ্দন দে
বঙ্গাব্দ ৬০৬ সাল ইং ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ

দেবীর আদেশে চন্দ্রশেখর ভট্টচার্য্য কচুয়ায় গিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন; কিন্তু সংসারাশ্রম তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি বঙ্গাব্দ ৬০৬ সালে তাঁহার শিষ্য দনুজমর্দ্দনকে চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি করিয়া হিমালয় প্রদেশে চলিয়া যান। দনুজমর্দ্দনই চন্দ্রদ্বীপের আদি কায়স্থ রাজা। দনুজমর্দ্দন দেব চন্দ্রশেখর। ব্রহ্মচারীর এক প্রিয় শিষ্য ছিলেন ; তাঁহার আদিম বাসস্থান গৌড়ে ছিল। ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আপন ইষ্টদেব চন্দ্রশেখরের আহ্বানে বিক্রমপুরে উপনীত হন এবং তথা হইতে ঋষিকল্প চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারীসহ বর্ত্তমান বরিশাল জিলার দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র উপকূলে নবোত্থিত দ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার রমাবল্লভ নামে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় এক পুত্র হয়; এই পুত্র অচিরে ক্ষমতাপন্ন হইয়া বর্ত্তমান বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর জিলা ব্যাপক জনপদগুলিতে নিজ রাজ্য বিস্তার করেন। দনুজমর্দ্দন দের রাজত্বের শেষভাগে বহুদূর রাজ্য বিস্তৃত হয় এবং দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী স্বাধীন রাজা সাধারণ্যে জ্ঞাপন জন্য, নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। গত বৎসর পৌষ মাসে বড়দিনের বন্ধের সময় খ্যাতনামা বিজ্ঞানচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক ভদ্রলোক এবং উক্ত রায় মহাশয়ের ভ্রাতা রায়সাহেব নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় সুন্দরবনে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়া বহির্গত হন। তাঁহারা প্রথমত চাঁদখালী দর্শন করিয়া কালকীর খাল ও ঢেউটী নদী দিয়া খোলাপাটুয়ার নদীতে পড়িয়া গত ১৯১১ সনের ২৬শে ডিসেম্বর বিছট্ গ্রামে পৌঁছেন। উক্ত বিছট্ গ্রামে তাঁহারা একটি পোতাশ্রয় বা প্রকাণ্ড ডক্ দেখিতে পান। ঐ স্থানে যে পুরাকালে জাহাজ, শুলুক প্রস্তুত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন তথায় আরও অনেক কীর্ত্তি-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। ঐ স্থান ও ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুর গ্রামটা বর্ত্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত। উক্ত বাসুদেবপুর গ্রামে একটি মুসলমান কবর খননকালীন একটি প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। ঐ মুদ্রাটি উক্ত বাসুদেবপুর গ্রামনিবাসী জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় নামক জনৈক ভদ্রলোকের হস্তগত হয়। তিনি উহা পাইয়া দৌলতপুর আসিয়া মুদ্রাটি পরিষ্কার করিয়া উহার পাঠোদ্ধার করেন। উহার এক পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দন দে এবং অপর পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ সম্বৎ ১৩৩৯ এবং উহার চতুষ্কোণে 'চন্দ্রদ্বীপ' লিখা আছে। উহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের বিশিষ্ট কর্ম্মাধ্যক্ষ মুদ্রাতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ, মহাশয় অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এদিকে বঙ্গাব্দ ৬০৬ সালের সহিত উক্ত মুদ্রার লিখিত সম্বৎ ১৩৩৯ তুলনা করিলে বর্ত্তমান সম্বৎ ১৯৭০ হইতে ১৩৩৯ বাদ দিলে ৬৩১ বৎসর হয় এবং বর্ত্তমান বঙ্গাব্দ ১৩১৯ হইতে ৬৩১ বাদ দিলে দনুজমর্দ্দন যে স্বীয় রাজত্বের ৮২ বৎসরের সময় নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহার অকাট্য প্রমাণ হয়। বিশেষত তৎকালে লোকের যেরূপ আয়ু

ছিল, তাহাতে তিনি ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে কচুয়ায় আগমন করিলেও ১১২ বৎসর তাঁহার আয়ুষ্কাল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করারও কোন কারণ দেখা যায় না। যেহেতু ১১২ বৎসর বয়স্ক জীবমান বৃদ্ধের অনুসন্ধান করিলে প্রতি জিলায় ৭-৮টি লোকের সন্ধান মিলিতে পারে।*

(২য় রাজা) রমাবল্লভ

রমাবল্লভ রায়ের সময়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। রমাবল্লভের পুত্র (৩য়) কৃষ্ণবল্লভ এবং তৎপুত্র (৪র্থ) হরিবল্লভ এবং হরিবল্লভের পুত্র (৫ম) জয়দেব বা জগৎবল্লভ রায়। উক্ত জগৎবল্লভ রায়ের পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, তাঁহার দৌহিত্র এই জিলার দেহেরগতি নিবাসী বসুবংশীয় বলভদ্র বসুর পুত্র পরমানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

(৬ষ্ঠ রাজা) পরমানন্দ রায়

বঙ্গদেশীয় প্রাচীন হিন্দু নরপতি মাধব বা কেশব সেন নামধারী রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিবার নিমিত্ত ৯৯৯ শকাব্দে কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তৎসঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম (১) মকরন্দ ঘোষ, (২) দশরথ বা পুষণ বসু, (৩) বিরাট গুহ, (৪) কালিদাস অথবা তারাপতি মিত্র, (৫) পুরুষোত্তম দত্ত। উল্লিখিত পাঁচজন ব্রাহ্মণ যেমন তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি আনাইয়া এতদ্দেশে বসবাস করেন, উক্ত পাঁচজন কায়স্থও তদ্রুপ তাহাদের স্ব স্ব স্ত্রী, সন্তানসন্ততিদিগকে কান্যকুব্জ হইতে আনাইয়া এতদ্দেশে বসবাস করিতে থাকেন। বঙ্গদেশে উক্ত কায়স্থ জাতির মানসম্ভ্রম চন্দ্রদ্বীপ-রাজার চেষ্টায় যেরূপ উন্নত হইয়াছিল, বঙ্গের অন্যত্র কোথাও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। বঙ্গদেশের মধ্যে অদ্যাপি চন্দ্রদ্বীপ সমাজের অপরাপর স্থানের কায়স্থগণ অপেক্ষা শীর্ষস্থানীয়। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় উক্ত আদি পুষণ বসু হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ ; যথা—

(১) পুষণ বা দশরথ বসু, (২) দিবাকর বসু, (৩) বাভট বসু, (৪) তমারবহু বসু, (৫) পুরু বসু, (৬) ভাই বসু, (৭) থাক বসু, (৮) কন্দর্প বসু, (৯) মার্কণ্ড বসু, (১০) ঊষাপতি বসু, (১১) বলভদ্র বসু, (১২) পরমানন্দ বসু বা রাজা পরমানন্দ রায়।

রাজা পরমানন্দ রায় কুলীন কায়স্থগণের বিষয়ে অনেক নিয়ম করেন। কায়স্থগণের গণনাস্থলে পূর্ব্বে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা হইত। ইহার সময় হইতে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা আরম্ভ হয়। রাজা পরমানন্দ রায়ের মূল পূর্ব্বপুরুষ দেহেরগতির বসুবংশ। উক্ত দেহেরগতির বসু বংশ দেহেরগতি ও রামচন্দ্রপুর বাস করিতেছেন। উক্ত বসু বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ অদ্যাপি নামের সহিত "নারায়ণ" শব্দ যোগ করিয়া থাকেন। দেহেরগতি নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশনারায়ণ বসু এবং রামচন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নবীননারায়ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের বংশের নাম করিয়া স্বীয় বংশে গৌরবান্বিত আছেন। রাজা পরমানন্দ রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে,—উক্ত রাজা শক্তিপূজায় একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি গঙ্গার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যেন অন্তকালে তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। একদা তেতুলিয়া নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া, রাজবাটীর গৃহ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল। রাজা এই বিস্ময়কর ব্যাপার

* মুদ্রাপ্রাপ্তির বিবরণটি ১৩১৯ আষাঢ় মাসের প্রবাসী হইতে সঙ্কলিত।

অবলোকন করিয়া, স্মরণ করিলেন বুঝি গঙ্গা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আগমন করিতেছেন। তখন কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গার প্রতি নিবেদন করিলেন, মা! যদি আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে আমাকে গ্রহণ করুন। তাহাতে গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়া হস্ত প্রসারণ করিলে রাজা পরমানন্দ দেবীর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। মুহূর্তমধ্যে তিনি অন্তর্হিত হইলেন এবং নদীর জল যথাস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

(৭ম রাজা) জগদানন্দ রায়

রাজা পরমানন্দের নদীস্রোতে জীবন বিসর্জ্জনের পর তৎপুত্র জগদানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। তাঁহার কন্দর্পনারায়ণ রায় নামে এক পুত্র ও কমলা নাম্নী এক কন্যা থাকে। রাজকুমারী কমলা লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বাউফল ষ্টেশনাধীন কচুয়া ও কালাইয়ার মধ্যস্থানে এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। অদ্যাপি উহা কমলার দীঘি বলিয়া বিখ্যাত আছে। বর্ত্তমান সময় উক্ত দীঘির অধিকাংশ স্থান ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং দীঘির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

(৮ম রাজা) কন্দর্পনারায়ণ রায়

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ৯৮৯ সাল।

রাজা জগদানন্দ ইহলোক ত্যাগ করিলে, তৎপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত কন্দর্পনারায়ণ রায় চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার আমলে চন্দ্রদ্বীপের বিস্তৃতি পশ্চিমে যশোহর জিলা ও উত্তরে ঢাকা জিলা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি হয়। ইনি বসুবংশের তৃতীয় রাজা; ইনি তৎকালীন সমগ্র বঙ্গদেশের কায়স্থ সমাজের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার সমাজের প্রতিপত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার অধিকারস্থ চাক্‌সিরি পরগণা প্রাপ্তির আশায় তৎকালীন যশোহরের প্রতাপশালী মহারাজা প্রতাপাদিত্য স্বীয় দুহিতা বিন্দুমতীকে কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের নিকট দেওয়ার জন্য চন্দ্রদ্বীপ রাজধানীতে ঘটক প্রেরণ করেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফন্সিকা (Foncica) নামক জনৈক পাদরী চন্দ্রদ্বীপ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের ডায়েরীতে পাওয়া যায় যে, তৎকালীন যুবরাজ রামচন্দ্রের বয়স মাত্র ৮ বৎসর, তখন মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ৬ষ্ঠ বর্ষীয়া কন্যার সহিত তাঁহার সম্বন্ধের প্রস্তাব চলিতেছিল। উহার কিছুদিন পরেই যুবরাজ রামচন্দ্রের বিবাহ হয়।

কন্দর্পনারায়ণ রায়ের সময় (১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে) ভীষণ বন্যা হয়, তাহাতে রাজধানীর বিস্তর ক্ষতি হয় এবং অনেক লোকজনের মৃত্যু হয়, রাজপরিবার বহু কষ্টে জীবন রক্ষা করেন। কতক লোক মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করেন এবং উক্ত বন্যা উপলক্ষে তৎকালীন প্রায় দুই লক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হয়। বহুকাল হয় কচুয়া রাজধানী সীমানাস্থিত অনেক স্থান বিলে পরিণত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে কালারাজা ও ধলারাজার বিল নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত বিলের মধ্যে প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা ও ভগ্নাবশেষগুলি অদ্যাপি-বিদ্যমান আছে। উক্ত স্থানগুলি এক্ষণ বৃহদাকার সর্প প্রভৃতির আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে।

দুর্গ নির্মাণ

রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় সমুদ্র উপকূল হইতে স্বরাজ্য আক্রমণ আশঙ্কায় বঙ্গোপসাগরের লুপ্ত রাবণাবাদ নদীর সঙ্গমে একটা সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কচুয়া রাজধানী পরিত্যাগ ও রাজনগর গমন এবং বিশারীকাঠিতে রাজধানী স্থাপন

পটুয়াখালী মহকুমাধীন প্রতাপপুরের নিকট রাজনগর নামক স্থানে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় রাজধানী করার ইচ্ছুক হইয়া তথায় কয়েকটি দীঘি খনন এবং গড় নির্মাণ করেন ; কিন্তু অবশেষে তথায় রাজধানী করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইহার পূর্ব্বোত্তরে রাজধানীর স্থান অন্বেষণ করেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর সহিতর যুবরাজ রামচন্দ্রের বিবাহ হইলে পর উক্ত যশোহরের লোকের ইঙ্গিতে এবং অন্যান্য অসুবিধায় রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় রাজধানী পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প করেন এবং তদনুসারে কচুয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া রাজনগর গমন করেন এবং তৎপর তাহার প্রায় দেড় প্রহর ব্যবধান উত্তর-পূর্ব্ব দিকে কাকরধা ও ভাতশালার নিকট বিশারীকাঠীতে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজার পরিবারবর্গও রাজার সঙ্গে সঙ্গে তথা হইতে আসিয়া বিশারীকাঠীর নিকটবর্ত্তী ভাতশালা ও কাকরধা এবং কোশাবর গ্রামে বস-বাস করিতে আরম্ভ করেন। এজন্য অদ্যাপি ভাতশালা ও কালরধা কুলীন কায়স্থগণের আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। উক্ত বিশারীকাঠীতে অদ্যাপি রাজবাটীর চিহ্ন ভগ্ন ইষ্টকালয়াদি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহা ভূমিকম্প কি ভূগর্ভের অন্য কোন পার্থিব কারণে মৃত্তিকাগর্ভে অধিকাংশ দালান-কোঠাগুলি বসিয়া গিয়াছে ; এক্ষণ তন্মধ্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তু বিচরণ করিয়া থাকে। কথিত আছে, বিশারীকাঠীর নিকট রাজার প্রকাণ্ড ৬৪ দাঁড়ের কোশ নৌকার ঘাট ছিল বলিয়া ঐ গ্রাম কোশাবর নামে প্রসিদ্ধ আছে।

কচুয়া রাজধানী পরিত্যাগের কারণ

বর্ত্তমান সময় সুন্দরবনের দক্ষিণাংশে অনুসন্ধান করিলে স্থানে স্থানে অনেক জঙ্গলাবৃত ইষ্টকালয়-মণ্ডিত প্রাচীন বাড়ির ভগ্নাংবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল স্থানে প্রাচীনকালে যে বহু লোকের বসতি এবং বিস্তৃত জনপদ ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা কচুয়া নগরীতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎকালীন বর্ত্তমান পটুয়াখালী মহকুমাস্থিত গলাচিপা, গুলিসাখালী, মৃজাগঞ্জ, আমতলী, বরগুনা প্রভৃতির সন্নিহিত স্থানসমূহ এবং পিরোজপুরের অধীনস্থ সুন্দরবনের অধিকাংশ স্থানেই বৃহৎ জনপদ ছিল, তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা যেমন মধ্যে মধ্যে উত্তরবঙ্গে আসিয়া অত্যাচার করিত এবং সেই অত্যাচারকে লোকে বর্গীর হাঙ্গামা বলিত* তদ্রূপ আবাকান এবং পূর্ব্বাঞ্চলস্থ মগ প্রভৃতি জল-দস্যুর অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া, সম্ভবত প্রোক্ত সুন্দরবনের অধিবাসিগণও ঐ সকল স্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমিক উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পুরাকালে যখণ বঙ্গোপসাগর বর্ত্তমান ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের নিকটবর্ত্তী ছিল, তৎকালে চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্যের স্বপ্নাদিষ্ট একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ (চর) সৃষ্টি হওয়া বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশ ও চন্দ্রদ্বীপের উত্তরাংশের নদীতে ক্রমশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক চর ও অবশিষ্ট অংশগুলি বিলের বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সৃষ্টি করিতেছিল। সদর এলেকায় প্রত্যেক থানায় এক্ষণও কিছু কিছু বিল বর্ত্তমান আছে। গৌরনদী ষ্টেশনে আস্কর, জল্লা, সোমাইরপাড়, কালবিলা, কুড়লিয়া, বিশারকান্দী, হারতা প্রভৃতি বিলগুলি উক্ত প্রমানের সমর্থন করিতেছে; সুতরাং,

* এক্ষণও ছেলেমেয়েদিগকে এতদঞ্চলে ঘুম পাড়ানোর সময় একটি ছড়া বলিয়া থাকে।
"খোকা ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল বরগী আইল দেশে.
বুলবুলীতে ধান খাইল খাজনা দিমু কিসে?
ঘুম আয় লো আয়।"

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপন হইলে বিক্রমপুর হইতে চন্দ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত স্থানগুলিতে মাঝে মাঝে লোকের বাসোপযোগী হইয়াছিল। ঐ উত্তরদিকে যখন ক্রমশ বাসোপযোগী হইতে লাগিল, তখন দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলের লোকগণ মগ প্রভৃতির অত্যাচার হইতে অসুবিধা-নিবারণের জন্য ক্রমশ উত্তরদিকে আসিতে লাগিলেন। বিশেষ তৎকালীন মগজাতি এত ঘৃণার্হ ছিল যে, কোন হিন্দুর বাড়ির উপর দিয়া মগ হাঁটিয়া গেলে তাহার জাতি যাইত। রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের কুলীন সম্প্রদায় মধ্যে দেবীবর যে মেলবন্ধন করেন, তন্মধ্যে চন্দ্রশেখর মেল এই মগ বাদে হইয়াছিল, অর্থাৎ বাড়ির উপর দিয়া মগ হাঁটিয়া যাওয়ায় তাহার জাতিপাত হয় বলিয়া তৎকালে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।* ব্রহ্মখণ্ড নামিক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে— মগদিগের উৎপীড়নে বিস্তৃত জনপদের দক্ষিণাংশ উৎপন্ন হয়। এ জিলার গাভা গ্রামের প্রসিদ্ধ কুলীন কায়স্থগণও কতকাংশ দক্ষিণ দেশ ভাতশালা, কাকরধা হইতে ক্রমশ গাভা ও বাণারিপাড়া প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন।

ক্ষুদ্রকাঠীতে অবস্থান

রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় বিশারীকাঠি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, বর্ত্তমান বরিশালের পশ্চিম-উত্তর কোণে ক্ষুদ্রকাঠিতে আসিয়া রাজধানী স্থাপন মানসে তথায় এক দীঘি খনন করেন। পক্ষান্তরে ঐ স্থানে রাজধানী স্থাপন না করিয়া অন্যত্র ভাল স্থান পাওয়া যায় কি না, তজ্জন্য দক্ষিণদিকে অনুসন্ধান করেন এবং পঞ্চনদের সঙ্গমস্থলের পশ্চিমপাড়ে হোসেনপুর গ্রাম মনঃপূত হওয়ায় তথায় রাজধানী স্থাপন করাই সুস্থির করেন। তৎকালীন হোসেনপুর একজন বলবান্ সরদারের অধীনে বহু মুসলমান সমাকীর্ণ জনপদ ছিল। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় উক্ত মুসলমান সরদারকে তাহার অনুচরগণসহ হোসেনপুর ত্যাগ করিতে বলেন ; কিন্তু সরদারও তেমন সহজ লোক ছিলেন না, তাহার যথেষ্ট লোকবল ও কিছু যুদ্ধোপকরণ ছিল; তজ্জন্য সরদার দম্ভের সহিত রাজার আদেশ প্রত্যাহার করিলেন ; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। রাজা কন্দর্পনারায়ণ সরদারকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন এবং হোসেনপুরের উত্তরাংশে বর্ত্তমান কথিত ডহরপাড়া নামক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। উক্ত সংগ্রামে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের অমিততেজে মুসলমান সরদার সদলবলে নিহত হইলেন; অবশিষ্ট মুসলমানগণ ভীত ও ত্রাসিত হইয়া হোসেনপুর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। হোসেনপুরের উত্তর পূর্ব্বে দুই মাইল পরিমাণ স্থান মুসলমান শূন্য হইল। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় স্বয়ং সেই যুদ্ধে আহত হন এবং ক্ষুদ্রকাঠি পৌঁছিয়াই দেহত্যাগ করেন। এই ক্ষুদ্রকাঠিতেই কন্দর্পনারায়ণ রায়ের দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল।

(৯ম রাজা) রামচন্দ্র রায়
হোসেনপুরে রাজধানী স্থাপন ও অবস্থিতি
বঙ্গাব্দ ১০০৫ খ্রিস্টাব্দ ১৫৯৮

কবিবর বিজয় গুপ্ত তাঁহার রচিত পদ্মাপুরাণে উল্লেখ করিয়াছেন—

ঋতুশূন্য বেদশশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেনসাহ নৃপতি তিলক।

---

* "মগ যোগী ভুলাই দ্বিজে চন্দ্রশেখর মজে।
তাই কেশরী অজের কুলে ধর্ত্তে বিবাজে॥" মেঘমালা

উক্ত শ্লোকানুসারে ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে তৎকালীন হোসেন শাহ রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি খুব প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। সম্ভবত তাঁহার নামানুসারেই হোসেনপুর নাম হইয়া থাকিবে। হোসেন শাহ এবং তাঁহার পুত্র নাসিব সাহকে তৎকালীন হিন্দুরা কীরূপ চক্ষে দেখিতেন, নিম্নলিখিত বৈষ্ণব পদাবলী পড়িলে তাহা বুঝা যাইবে। পদাবলীটি এই—

"সে যে নসিরা সাহজানে
যারে হানিল মদন বাণে,
চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌরেশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভণে।"

দেশস্থ প্রধান নরপতি বিধর্মী এবং ভিন্ন জাতি হইয়াও প্রজারঞ্জক হইলে হিন্দুরা তাঁহাকে চিরদিন ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন, এবং তদ্রূপ অদ্যাপি ভক্তি করিয়া থাকেন। সুতরাং তৎসাময়িক প্রধান নরপতি সোহেনসাহের নামানুসারে হোসেনপুর গ্রামের নাম হওয়া বিচিত্র নহে। *ক্ষুদ্রকাঠিতে হঠাৎ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হওয়ায় রাজা রামচন্দ্র রায় তথায় রাজধানী স্থাপনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, হোসেনপুর গ্রামে উপনীত হন। পরে পঞ্চমুখী নদের সঙ্গমস্থলের পশ্চিমপাড়ে একটি দীঘি খনন করেন এবং তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমপাড়ে দুইখানি প্রকাণ্ড ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট দিয়া দেন এবং উক্ত দীঘির পূর্ব্বপাড়ে একটি কালীর মন্দির নির্মাণ করেন। উক্ত মন্দিরের ইষ্টকগুলিও উহার চুনকাম দেখিলে উহা যে অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। চুনকামগুলি স্থানে স্থানে এক্ষণও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। উক্ত দীর্ঘিকা এবং উহার পাড়ের কালীর মন্দিরাদি এ যাবৎ গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়া ব্যাঘ্রাদির আবাসভূমি ছিল ; সম্প্রতি স্থানীয় আলীমদ্দীন নামক জনৈক মুসলমানের চেষ্টায় উহার কতকাংশ আবাদ হইয়াছে। ঐস্থানে পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী একত্র মিলিত ছিল বলিয়াই ঐ স্থানকে পঞ্চকরণ বলিত। প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্চকরণ হোসেনপুর গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তভাগ। রাজা রামচন্দ্র রায় পঞ্চকরণ হইতে পশ্চিমদিকে প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যবধানে রাজবাড়ি প্রস্তুত জন্য চতুর্দ্দিকে পরিখা (গড়) প্রস্তুত করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপিত করেন। বর্ত্তমানে উক্ত রাজবাড়ির উত্তরদিকে গোবিন্দ, শঙ্খবণিকের বাড়ি, দক্ষিণে রামদয়াল, নট্টের বাড়ি, পশ্চিমদিকে শ্রীকান্ত খানসামা ও রতিরাম খাসখালের বাড়ি এবং পূর্ব্বদিকে প্রকাণ্ড মাঠ অবস্থিত। রাজবাড়ি হইতে এক প্রকাণ্ড জাঙ্গাল পঞ্চকরণ কালীর মন্দির পর্যন্ত গিয়াছে। উক্ত জাঙ্গালটী স্থানে স্থানে উচ্চ ও জঙ্গলাকীর্ণ থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজবাড়ির তিনদিকেই তৎকালে নদী ছিল। উত্তর দিকের সীমা নির্দ্ধারণ জন্য রাজা, শ্রীবল্লভ নামক জনৈক কর্ম্মচারীর দ্বারা পূর্ব্ব-পশ্চিমরোক এক বেড় খনন করেন। উক্ত বেড়ের লপ্ত উত্তর পার্শ্বের গ্রামকে তজ্জন্য বেড়কাঠী বলিয়া থাকে, বর্ত্তমানে উহার অপভ্রংশে বৈড়কাঠীও বলিয়া থাকে এবং সাধারণত উক্ত বেড় 'বল্লভের খাল' বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে।**

হোসেনপুরের মুসলমান অধিবাসীগণকে বিতাড়িত করিয়া রাজা রামচন্দ্র রায়

* যখন বর্ত্তমানে এ জিলায় রমানাথপুর, গোবিন্দপুর, সায়েস্তাবাদ, ছলিমাবাদ, সুজাবাদ, রমজানকাঠী, রহমতপুর, আওরঙ্গাবাদ, চরবুলার, চরহার্ত্তিঞ্জ, ওয়েষ্টনগঞ্জ, লালমোহন, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামের নাম দৃষ্ট হয়। তখন হোসেনসাহ নৃপতির নাম অনুসারে হোসেনপুর গ্রামের নাম সৃজন হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে করা দূষণীয় নহে।

** বেড় শব্দটি বেষ্টন শব্দেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রাজধানীর চতুর্দ্দিকে নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থ, শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, মালাকার, কুম্ভকার, রাজ, পাটনী, কাহার, তৈলিক, কর্মকার প্রভৃতি জাতির বসতি করান। রাজার স্থাপিত ব্রাহ্মণাদি জাতির যে সকল লোক বর্ত্তমানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

(১) ব্রাহ্মণ

(ক) কুলীন—রাজার স্থাপিত বন্দ্যঘটী বংশীয় সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বেচারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লক্ষ্মীনারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পূর্ব্বপুরুষ; গাঙ্গুলী বংশের রজনীনাথ গাঙ্গুলীর পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বন্দ্যবংশে সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শশিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শোলক গ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন। উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালঙ্কার উপাধিবিশিষ্ট নবদ্বীপ প্রত্যাগত স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন ; ইহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া রাজা ইহাকে কতক ভূমি ব্রহ্মত্র দেন এবং তাঁহাকে দ্বারপণ্ডিত মনোনীত করেন। ইহার বংশধর গৌরচন্দ্র শিরোমণিও নবদ্বীপ প্রত্যাগত স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার একমাত্র বৃদ্ধ পুত্র বিদ্যমান আছে।

(খ) বংশজ—হবিষ্মশী বংশে কালীকিঙ্কর ন্যায়বাচস্পতি নবদ্বীপ প্রত্যাগত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। ইহারও অসাধারণ নাম ও প্রতিপত্তি ছিল এবং ইনি রাজার প্রধান দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। ইনি এবং এই বাটীস্থ স্বর্গীয় হরিরাম তর্কভূষণ প্রভৃতি বহুতর পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া হোসেনপুর উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইহাদের এক প্রকাণ্ড চতুষ্পাঠী ছিল, বহুদেশ ও দিগ্দিগন্তর হইতে ছাত্রগণ আসিয়া উহাতে অধ্যাপনা করিত। এ জিলায় ইহাদের বিস্তর মন্ত্রশিষ্য এখনও বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান কালস্রোতে ইহারা শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছেন ; শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ ক্রমিক এক একটি করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন ; বর্ত্তমানে এই বংশে একটি প্রৌঢ় ও কতিপয় যুবক বিদ্যমান আছে।

(গ) শ্রোত্রীয়—রাজা রামচন্দ্র প্রথমত কুসুমকুলী এবং পিপলাই বংশের শ্রোত্রীয়গণকে হোসেনপুরে আনয়ন করেন। পরে কুসুমকুলী বংশের আত্মীয় স্বরূপ বাগপুর হইতে বটব্যাল বংশ আনিয়া হোসেনপুরে অবস্থিতি করান। পিপলাই বংশে সূর্য্যনারায়ণ পিপলাই একজন খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী ছিলেন। গ্রামস্থ অপরাপর যে সকল কুলীন, বংশজ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা রাজা রামচন্দ্রের বহুদিন পরে হোসেনপুরে আসিয়া বসবাস করিতেছেন।

রাজপুরোহিত—রাজবাড়ির লাগ দক্ষিণদিকে রাজ-পুরোহিত বাড়ি অবস্থিত ছিল, বর্ত্তমানে সেই স্থানে রামানন্দ বাউলের আখড়া বিদ্যমান আছে। রাজা রামচন্দ্র রায় যখন মাধবপাশায় চলিয়া যান, তৎকালীন আর সমস্ত জাতি হোসেনপুরে থাকিয়াই মাধবপাশায় কার্য্যাদি করিতেন, কিন্তু রাজ-পুরোহিতকে রাজা আর ছাড়িলেন না; পুরোহিতকে নিয়া তিনি শ্রীনগরে বসাইলেন। শ্রীনগরের বর্ত্তমান ডাকনাম বাড়ৈখালী। এই রাজপুরোহিতবংশে স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং জগবন্ধু বিদ্যারত্ন অতি নিষ্ঠাবান ও আচারপুত ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই বংশে বর্ত্তমানে দুটি যুবক মাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহারা পুরুষানুক্রমে হোসেনপুর আখড়া বাড়ির কর পাইত, এক্ষণে পায় কিনা তাহা লেখক অবগত নহেন।

বৈদ্যজাতি—রাজা রামচন্দ্র রায় প্রথমত ভরদ্বাজবংশীয় রামরত্ন দাশগুপ্ত কি তৎপূর্ববর্তী কেহকে আনিয়া হোসেনপুরে বসতি করান। হোসেনপুর রাজধানী থাকা পর্য্যন্ত ইহারা রাজার প্রধান অমাত্যের কার্য্য করিতেন। রাজা রামচন্দ্র রায়ের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ

রায়ের আমলে মাধবপাশা, রাজধানীতে উক্ত রামরত্নের বংশধরগণ বক্সীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তদবধি পুরুষানুক্রমে বক্সীর কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। পরলোকগত গঙ্গাগোবিন্দ দাশগুপ্ত রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের আমলে পুনঃ অমাত্যের পদে কার্য্য করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইহারা চন্দ্রদ্বীপের রাজার অনুগ্রহে হোসেনপুরে দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী স্বরূপে অদ্যাপ বাস করিয়া আসিতেছেন। ইহারা উপরোক্ত বক্সীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া এক্ষণও 'বক্সী' উপাধিতে সাধারণ্যে বিখ্যাত আছেন।

কুলীন কায়স্থ—রাজা রামচন্দ্র রায়ের সময় বসুবংশীয় কুলীনগণ হোসেনপুরে যাঁহারা বসতি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ঐ বংশীয় রামচন্দ্র বসুর কোন বংশধর নাই। বর্ত্তমানে বসুবংশে দুটি প্রৌঢ় ব্যক্তি মাত্র বর্ত্তমান আছেন।

খানসামা—রাজা রামচন্দ্র রায়ের খানসামাগণের মধ্যে শ্রীকান্ত খানসামা রাজার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইহাকে রাজা অনুগ্রহ করিয়া যে ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন, তাহাতে হোসেনপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বালীঘোনা গ্রাম এবং বর্ত্তমান স্বরূপকাঠী থানার অধীন সাতবাড়িয়ার সম্পত্তিতে বার্ষিক তাহার ২০০০ টাকা আয় ছিল। বর্ত্তমানে খানসামাগণের ঐ সকল সম্পত্তির কিছুমাত্র বর্ত্তমান নাই। উহার অধিকাংশ রামচন্দ্রপুর নিবাসী স্বনাম প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী, তাঁহার ভ্রাতাগণ এবং হাইকোর্টের উকিল বাবু অবিনাশচন্দ্র গুহ চৌধুরী এম. এ. বি. এল খরিদ করিয়াছেন। খানসামা বাড়িতে মনসাদেবীর ইষ্টকনির্মিত মন্দির আছে। ইহারা বারমাসে তের পার্বণ করিতেন। কালস্রোতে ইহাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে, শুনিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। বাড়িখানি প্রায় জঙ্গলাবৃত হইয়াছে ; ইষ্টকনির্ম্মিত মনসাদেবীর ভগ্ন মন্দিরটি অধুনা অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই বংশের তিনটি যুবক ও একটি অল্পবয়স্ক ছেলে মাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহাদের অধিকারে প্রসিদ্ধ রামানন্দ বাউলের আখড়াবাড়ি ছিল। রামানন্দ বাউলের এরূপ সাধনা ছিল যে, বহু দেশ দেশান্তর হইতে লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। অদ্যাপি রামানন্দ বাউলের আখড়ার নাম বহু দেশ বিখ্যাত আছে। এই আখড়ায় একটা প্রাচীন মন্দির আছে, এখানে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসে। উক্ত খানসামাগণের অধিকারে খালের দক্ষিণ পাড়ে বালীঘোনা গ্রামে 'বশিষ্ঠ মুনি' নামধেয় একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা আছে, দেখিলে বহুকালের বলিয়া ধারণা হয়। এরূপ জনশ্রুতি আছে, বশিষ্ঠ মুনির কোন শিষ্যের বংশধর পশ্চিম দেশ হইতে ঐখানে আসিয়া প্রাচীন কালে ঐ দীঘিটা খনন করিয়া চলিয়া যান।

খাসকাল জাতি—রাজা রামচন্দ্র রায়ের আমলে রতিরাম খাসকাল প্রথম হোসেনপুরে বসতি করে। বর্ত্তমানে উক্ত খাসকাল বাড়িছাড়া হইয়াছে। তাহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমানে সাহেবগঞ্জের নিকট লক্ষ্মীপাশা গ্রামে গিয়া বাস করিতেছে। খাসকালগণ নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ ছিল এবং তাহাদের নিম্নলিখিত কার্য্য ছিল; যথা—

চন্দ্রদ্বীপের সমাজস্থ কোন কায়স্থের স্বীয় পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে হইলে তাঁহাকে বিবাহের পূর্বে রাজার অনুমতি লইতে হইত এবং রাজাকে রাজমধ্যস্থ দিতে হইত। যদি কোন কুলীন কায়স্থ রাজার অনুমতি বিনা ঐ কার্য্য করিতেন, তাঁহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত। রাজার খাসকালগণ ঐরূপ অপরাধী ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত করিত। রাজা বিচার করিয়া তাহার দণ্ড বিধান করিতেন।

শঙ্খবণিক—রাজা রামচন্দ্রের আমলে অনেক শঙ্খবণিক জাতীয় লোক হোসেনপুরে

আগমন করে, তন্মধ্যে বর্ত্তমানে কয়েকখানি বাড়িতে লোক বর্ত্তমান আছে, অবশিষ্ট বাড়িগুলি ছাড়া পড়িয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে রাজার আমলের শঙ্খবণিক বংশধর মধ্যে কতিপয় শঙ্খবণিক অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, ইহাদের শঙ্খ-নির্মিত শিল্প-নৈপুণ্য প্রশংসার যোগ্য।

গন্ধবণিক—এই জাতীয় লোকের কোন বংশধর এক্ষণ আর বর্ত্তমান নাই, ইহাদের বাড়িতে বর্ত্তমানে জনৈক নমঃশূদ্র বাস করিতেছে।

মালাকার—রাজা রামচন্দ্র রাজধানীর দক্ষিণ ও রাজপুরোহিত বাড়ির পূর্ব্ব দিকে মালাকরদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। উক্ত মালাকর বংশ পরম্পরায় দুইটি প্রৌঢ় ও কতিপয় যুবক বর্ত্তমান আছে। ইহারা নিজ হোসেনপুর ও মাধবপাশা ভিন্ন রামচন্দ্রপুর, গাভা, নরোত্তমপুর প্রভৃতি বহু গ্রামে বিবাহের ফুল-মুকুট যোগাইয়া থাকে এবং এ জিলার অন্যান্য মালাকার অপেক্ষা রাজার স্থাপিত মালী বলিয়া ইহারা মালাকার সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হওয়ার রীতি আছে।

কুম্ভকার—এই জাতীয় লোকগণ রাজবাড়ির পশ্চিমদিকে বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিল। ইহাদের কয়েকখানি বাড়ির মধ্যে দুইটি প্রৌঢ় ও কতিপয় যুবক বর্ত্তমান আছে। ইহারা স্বীয় ব্যবসা ভিন্ন টালী, ইট প্রস্তুত করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

তৈলিক ও কর্মকার—এই জাতীয় লোকদের কোন বংশধর এক্ষণ বর্ত্তমান নাই। ইহাদের বাড়িতে বর্ত্তমানে নমঃশূদ্রগণ বাস করিতেছে।

সাহা জাতি—পঞ্চকরণের নিকটবর্ত্তী সথানে অদ্যাপি সাহাজাতির বাড়ি জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পতিত রহিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হর্ম্ম্য-নির্মাণকারী রাজ—এই রাজবংশ নিম্নশ্রেণীর কায়স্থবংশসম্ভূত; এই বংশের ভৈরব রাজের অল্পদিন হয় মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের বাড়ি, রাজবাড়ির উত্তর-পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

পাটনী—পঞ্চনদের সঙ্গমস্থল পঞ্চকরণের অপর পাড়ে যাওয়ার জন্য জাঙ্গালের লাগ দক্ষিণাংশে পাটনী বাড়ি ছিল। ১০-১২ বৎসর হইল কলেরায় পাটনীবংশের কতিপয় পাটনীর মৃত্যু হওয়ায় অবশিষ্ট যুবকগণ অন্য দেশে চলিয়া গিয়াছে। এই পাটনীপাড়াকে অদ্যাপি পাটনীয়াকাঠী বলিয়া থাকে।

মাহার বা চাকর—এই বংশের কানাই প্রভৃতি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এবং ইহারা ডুলী বহিয়া থাকে।

নৌকার মাঝিগণ—রাজা রামচন্দ্রের ৬৪ দাঁড়ের একখানা প্রকাণ্ড পান্সী নৌকা ছিল। এতদ্ব্যতীত ছোট বড় আরও অনেক নৌকা ছিল। যেহেতু তৎকালীন চন্দ্রদ্বীপ নদীবহুল স্থান ছিল; সুতরাং এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলেই নৌকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। রাজার মাঝিগণ হোসেনপুরের উত্তর দিকে বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিল। উক্ত মাঝিগণের একখানি স্বতন্ত্র হাট ছিল, তাহা অদ্যাপি মাঝিরহাট নামে বিখ্যাত আছে। উক্ত হাটের উত্তরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তাহা আশ্রাপ মাঝির দীঘি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বহুকাল অতীত হইলে উক্ত মাঝিগণ ভারুকাঠীর মিঞাবংশের সহিত প্রতিযোগিতায় না পারিয়া, মাঝিরহাটের পশ্চিমদিকস্থ খালের পশ্চিমপাড়ে গিয়া বসতি করিতে থাকে। উক্ত মাঝিগণের বংশধর জাহাঙ্গীর মাঝি, আব্বাছ মাঝি প্রভৃতি অদ্যাপি জীবিত আছে; তাহাদের বসতি স্থানগুলিকে অদ্যাপি “মাঝিগাতি” বলিয়া থাকে।

রঘুনাথ ও অনন্তদেব বিগ্রহ স্থাপন

রাজধানীর উত্তর দিকে রাজা দুইটি বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং উভয় বিগ্রহের নৈমিত্তিক অর্চ্চনার জন্য প্রচুর দেবত্র ভূমি দান করেন। প্রায় ২৫ বৎসর অতীত হইল, রঘুনাথ বিগ্রহের সেবাইত জনৈক বৈদ্যবংশধর উক্ত মূর্ত্তি নিয়া এই জিলার খলিসাকোটা গ্রামে গিয়া বসতি করিতেছেন। অনন্তদেবের বাড়ি প্রতি বৎসর মাঘী সপ্তমীতে মেলা বসিত। বহুদূর হইতে লোকসমূহ অনন্তদেবের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া দর্শনাভিলাষে গমন করিত। গ্রামিক জনৈক বৈদ্যবংশধর পুরুষানুক্রমে অনন্তদেবের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

পঞ্চকরণে হাট ও বাজার স্থাপন

রাজা রামচন্দ্র রায় হোসেনপুর জয় করিয়া উপরোক্ত নানা শ্রেণীর লোক বসাইয়া এবং রাজধানীর পত্তন করিয়া রাজবাড়ির দরজার পূর্বদিকের শেষ সীমা পঞ্চকরণে একখানি বাজার বসান এবং বাজার ব্যতীত ঐ স্থানে সপ্তাহে দুই দিন হাটও বসিত। উক্ত হাট রাজা রামচন্দ্র রায়ের আমল হইতে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ছিল ; অর্থাৎ চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের রাজা রামচন্দ্র রায় হইতে একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত উক্ত হাট ছিল। বর্ত্তমানে উক্ত হাটের স্থানে সামান্য দুইখানি খড়ের ঘর মাত্র বর্ত্তমান আছে। উক্ত স্থানের বর্ত্তমান মালিক মাধবপাশার জমিদার বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী। ১৮৬০ সনের থাকবস্তার জরিপের সময় পঞ্চকরণ হাটের স্থানটুকু হোসেনপুর হইতে পৃথকভাবে পরিমাপ করিয়া পঞ্চকরণ হাট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার হলকা ১। রেভিনিউ সার্ভে নং ২১৮৮। পুরাকালে পঞ্চকরণ হাট একটি প্রধান বন্দর ছিল। রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের আমল পর্য্যন্ত উক্ত পঞ্চকরণ হইতে বড় বড় নৌকা পণ্যসম্ভারে বোঝাই হইয়া, দিগ্দিগন্তরে প্রেরিত হইত ; উহা বাখরগঞ্জ জিলার বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রস্থল ছিল। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জুলাই (বঙ্গাব্দ ১১৯৬ সালে) সেলিমাবাদের জমিদারীর ॥১২ ক্রান্তি অংশ ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবার (রাজা বাহাদুর) খরিদ করিয়া, ঝালকাঠী বন্দরে পরিণত করেন। ইতিপূর্ব্বে ঝালকাঠীতে কোন কারবার ছিল না, এবং নড়াল ষ্টেট হইতে সেলিমাবাদের ৪ গণ্ডা অংশ খরিদের পূর্ব্বে নবগ্রামেও কোন হাট ছিল না। তৎকালে বেড়মহলেও প্রসিদ্ধ বামনের হাট ছিল না ; সুতরাং তৎকালে একমাত্র পঞ্চকরণ বন্দরই বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান ছিল।

পঞ্চনদের পূর্ব্বপাড় দিয়া পূর্ব্বমুখী পঞ্চনদের অপর একটি নদী বর্ত্তমান কালীজিড়া নদের সহিত মিলিত ছিল। বর্ত্তমানে উক্ত নদীর অস্তিত্ব নাই, সামান্য খাৎ মাত্র বর্ত্তমান আছে। উক্ত ক্ষুদ্র নদীর উত্তর পাড়ে একটি নীলকুঠীর অফিস ছিল। তৎকালে উহার নিকটবর্ত্তী আশিয়ার, বহরমপুর, সৈদকাঠী প্রভৃতি স্থানে নীলের চাষ হইত এবং তাহার কারবার ছিল নীলকুঠীর ইষ্টক নির্ম্মিত অফিসবাটী জঙ্গলাকীর্ণ থাকিয়া অদ্যাপি অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের আমলে এখানে সপরিষদ নীলকুঠীর সাহেবগণ বাস করিতেন।

পঞ্চকরণস্থ পাঁচটি ক্ষুদ্র নদী দিয়া তৎকালে দিগ্দিগন্তর যাওয়ার সুবিধা ছিল। উহার একটি দক্ষিণে ঝালকাঠীর সহিত মিলিত হইয়াছে, একটি হোসেনপুর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক বেষ্টন করিয়া স্বরূপকাঠী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, একটি পূর্ব্ব উত্তরাভিমুখে গিয়া গুঠিয়া নদের সহিত মিলিত হইয়াছে, অপর একটি উত্তরাভিমুখে গিয়া উজিরপুর ও কমলাপুরের নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

রামচন্দ্রপুর গ্রাম স্থাপন

হোসেনপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া, রাজা রামচন্দ্র রায় বিশারীকাঠী, কাকরধা এবং কোষাবর হইতে যে সকল কুলীন কায়স্থ আনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে হোসেনপুরের লপ্ত পশ্চিমে (খালের পশ্চিম পাড়ে) বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং নবাগত কায়স্থগণের অভিপ্রায় ও পরামর্শমতে দেহেরগতি হইতে রাজার জ্ঞাতি-বংশের কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত খালের পশ্চিম পাড়ে বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া, তথায় নিজ ব্যয়ে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিয়া তাহার আবাসভূমি নির্দেশ করিয়া দেন। উক্ত জ্ঞাতিগণ রাজা শিবনারায়ণ রায়ের সময়ে পুনরায় দেহেরগতি প্রত্যাবর্তন করেন। পরে রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের আমলে চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজন্যবর্গের জ্ঞাতিকুলের ভারতনারায়ণ বসুর পূর্ব্বপুরুষ আসিয়া, রাজা রামচন্দ্র রায়ের নির্দেশিত বাড়িতে বসতি করিতেছেন ; বর্ত্তমানে ঐ বংশের নবীননারায়ণ বসু ও ষষ্ঠীনারায়ণ বসু বর্ত্তমান আছেন। রাজা রামচন্দ্র রায়ের জ্ঞাতিগণ ও তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত কুলীন কায়স্থগণের অনুরোধে রাজা রামচন্দ্র রায় কতিপয় বৈদিক ব্রাহ্মণকে ঐ স্থানে স্থাপন করেন। উক্ত বৈদিক বংশে কালীকুমার শিরোমণি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, আচারপূত ও নিষ্ঠাবান বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। রাজা রামচন্দ্র রায়ের নামানুসারে উক্ত জনপদ বিশিষ্ট স্থান রামচন্দ্রপুর নামে অভিহিত হইয়াছে এবং অদ্যাপি উক্ত গ্রামের নাম ঐ নামেই প্রসিদ্ধ আছে। এখানে রাজার হাট বলিয়া একখানি ভূখণ্ড আছে, সম্ভবত রাজা তথায় হাট মিলাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই নাম লুপ্ত হইয়াছে।

রাজা রামচন্দ্র রায়ের সময়ে উক্ত গ্রামের বিলভূমি ক্রমে উন্নত হইয়া লোকবাসের যোগ্য হইয়াছিল। উহার পশ্চিমের স্থানগুলি 'কাঁচা বালি' পূর্ণ ছিল বিধায় উহা অদ্যাপি 'কাঁচাবালিয়া' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রামচন্দ্রপুরের দক্ষিণদিকের জলাভূমিকে 'চর নারায়ণদী' বলিত এবং অদ্যাপি ঐ নামেই প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত চর শব্দের সহিত 'নারায়ণ' সংযুক্ত থাকায় উক্ত চর ভূমিগুলি রাজার আনীত জ্ঞাতিগণের স্বত্ব দখলে ছিল বলিয়াই অনুমান হয় এবং তাঁহাদের মালিক থাকারও প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমের স্থানগুলি তের আনা পরিমাণ বিল ছিল বলিয়া অদ্যাপি সেই গ্রামকে 'তের আনা' বলে। কাঁচাবালিয়ার পশ্চিম উত্তরে ভাদুসার প্রভৃতি গ্রাম অদ্যাপি বিলভূমিতে পরিণত রহিয়াছে। *

দূর্গ-নির্মাণ

রাজা রামচন্দ্র রায় পঞ্চকরণের অর্দ্ধ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে গুঠীয়া নদীর সঙ্গমস্থলে 'নয়াবাড়ি' নামধেয় স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। উক্ত দুর্গের চতুর্দিকে প্রায় ১০০ শত হাত দূর হইতে উহা ক্রমশ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। উহা মৃত্তিকা নির্ম্মিত থাকিলেও উহার ভিতরে সৈন্য থাকিবার বিশেষ সুবিধা ছিল। বর্ত্তমানে উক্ত দুর্গের পশ্চিমদিকস্থ সামান্য চিহ্ন

---

* রামচন্দ্রপুরের কায়স্থগণ মধ্যে বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ বি, এল, বাবু উমাপ্রসন্ন গুহ, এম. এ. ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বাবু তারাপ্রসন্ন গুহ বি. এল. বাবু অবিনাশ গুহ এম. এ. বি. এল. কৃতবিদ্যা ও স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইঁহারা এ জিলার প্রসিদ্ধ ভূস্বামীরূপে বসবাস করিতেছেন। এই পরিবারের ন্যায় একত্রে সরস্বতী ও কমলার কৃপা লাভ করা প্রায়শ দৃষ্ট হয় না। কাঁচাবালিয়া গ্রামে বসু বংশে বাবু রজনীনাথ বসু বি. এ. ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তত্রত্য গুহবংশের বাবু কৈলাসচন্দ্র গুহ বরিশাল দেওয়ানী আদালতে উকিল এবং তৎপুত্র বাবু প্রিয়নাথ গুহ কলিকাতার 'নায়ক' নামক দৈনিক পত্রের সম্পাদক।

মাত্র বর্ত্তমান আছে। দুর্গের অবশিষ্ট স্থানগুলি গুঠীয়া নদীতে শিকস্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণ স্থানীয় কৃষকেরা উহাকে 'কেল্লাঘাটা' বলিয়া থাকে। প্রধান সেনাপতি নানা ফর্নাণ্ডিজের পর্তুগিজ প্লান অনুসারে উক্ত দুর্গটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

মাধবপাশা রাজধানী নির্মাণ

প্রাচীনকালে মাধবপাশা, বাদলা, দেহেরগতি, প্রতাপপুর প্রভৃতি স্থান উত্থিত বিল ছিল। রাজা রামচন্দ্র রায় উক্ত বিলের মধ্যে রাজধানী স্থাপন করা মনন করিয়া, হোসেনপুর থাকিয়াই মাধবপাশা রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। রাজধানীর স্থান নিম্নভূমি ও নবোত্থিত বিল থাকায়, উহা বাসোপযোগী করিতে রাজার বহুতর অর্থ ব্যয় হয়। তিনি প্রথমত রাজধানীর পশ্চিমদিকে প্রতাপপুর হইতে কালীজিড়া নদী পর্যন্ত একটি খাল খনন করেন, তাহা 'রাজার বেড়' বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত আছে।

তৎপর ক্রমশ রামসাগর, শুকসাগর নামে দুইটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন ; উহার একটি রাজধানীর পশ্চিমে ও একটি রাজধানীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ; এক্ষণ উহার একটির মধ্য দিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। তদ্ব্যতীত রাজবাড়ির উত্তরদিকে দুইটি প্রকাণ্ড দীঘি এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুকুর দৃষ্ট হয়। একটি ছোট দীঘির মাটিদ্বারা দোলমঞ্চ বান্ধা হইয়াছিল। এখনও দোলমঞ্চের চূড়া দেখিতে মাথা উঁচু করিয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়। বর্ত্তমান বাজারখোলার উত্তরাংশে অপর একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে এবং উক্ত দীঘির দক্ষিণ পাড়ে একটি প্রকাণ্ড মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরের সম্মুখে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্তি অঙ্কিত আছে ; অপর দুইটি মূর্ত্তি ঠিক করা যায় না। রাজবাড়ির বসতিখণ্ডের পূর্ব্বদিকে প্রথমত নহবৎখানার দালান, তৎপর নাটমন্দির বা চিলছত্র ; চিলছত্রের উত্তরে দুর্গামন্দির, চিলছত্রের পশ্চিমদিকে দ্বিতল নন্দ মহল, তৎপশ্চিমে অন্দর মহলের অট্টালিকা নির্মিত হয়। অন্দর মহলের ও নন্দমহলের দক্ষিণদিকে কাত্যায়নী ও মদনগোপালের বাড়ি। চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচরী যে কাত্যায়নী ও মদনগোপাল মূর্ত্তি নদীগর্ভে পাইয়াছিলেন, সেই উভয় মূর্ত্তিই কচুয়া হইতে বিশারীকাঠী ও হোসেনপুর হইতে আনিয়া মাধবপাশায় উক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের নূতন অভিষেক ও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। কাত্যায়নী ও মদনগোপালের বাড়ির উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণের ভিটায় প্রাচীনকালীয় তিনটি 'ঝিকটি' দালান অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে একটিতে কাত্যায়নী মূর্ত্তি ও অপর একটিতে মদনগোপালের মূর্ত্তি এবং অবশিষ্টটিতে অন্যান্য বিগ্রহ স্থাপন করা হইয়াছিল। রাজবাড়ির দক্ষিণদিকে শিববাড়ির দালান অবস্থিত আছে। শিববাড়ির দিকে রাজার কোষনৌকা রক্ষার জন্য এক ডকের ন্যায় স্থান খনন করা হয়, তাহা অদ্যাপি 'কোষঘাটা' বলিয়া বিখ্যাত আছে। বর্ত্তমানে উক্ত কোষঘাটা স্থান দিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কর্তৃক ভেদরিয়া নামক খাল খনন করা হইয়াছে।

যশোহর যাত্রার বন্দোবস্ত

রাজা রামচন্দ্র রায় মাধবপাশা রাজধানীর কার্য্য শেষ করিয়া সস্ত্রীক নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করার জন্য রাণী বিন্দুমতীকে আনিতে যশোহর গমনের বন্দোবস্ত করেন। তিনি বিবাহের পর আর শ্বশুবালয় যান নাই। তৎপর পিতৃবিয়োগ এবং রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া দেশ হইতে দেশান্তর ভ্রমণে রাজা রামচন্দ্রের কিয়ৎকাল অতিবাহিত হয়। নূতন রাজধানীতে সস্ত্রীক অভিষিক্ত হওয়া প্রয়োজন, বিশেষ রাণী বিন্দুমতীও তখন বয়স্থা হইয়াছেন ; সুতরাং,

তিনি প্রধান ওলন্দাজ সেনাপতি নানা ফার্নান্ডিজ এবং কতিপয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং শরীররক্ষক রামমোহন মাল ও রমাই ভাঁড় প্রভৃতি শতাধিক লোকজন সমেত যশোহর যাত্রার বন্দোবস্ত করেন।

প্রতাপাদিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

"যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী
দণ্ডশ্চ ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
শব্দকল্পদ্রুম॥"

"যশোহর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ॥
বড় পুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ যাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"
(ভারতচন্দ্র)

ইংরেজি ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে এবং বঙ্গাব্দ ৯৬৮ সালে যশোহর নগরে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে তিনি অত্যন্ত. তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য এবং তস্য পিতৃব্য বসন্ত রায় কৈশোরেই তাঁহাকে দিল্লীতে বাদসাহের দরবারে প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্য অতি অল্প সময়েই স্বীয় প্রতিভাবলে বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং আকবর বাদসাহ হইতে নিজ নামে সনন্দ গ্রহণপূর্বক যশোহরে প্রত্যাবর্তন করেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীনতার ভাব বদ্ধমূল হয় এবং বঙ্গভূমি বিধর্মী রাজার করতলস্থ দেখিয়া, তিনি কী প্রকারে বঙ্গভূমিকে মুসলমানদের কবল হইতে মুক্ত করিবেন, অহর্নিশি এই চিন্তা করিতে থাকেন। এই সকল কারণে তিনি যশোহরে আসিয়াই স্বীয় বাসনা কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশে প্রথমত পিতৃব্য বসন্ত রায় সহিত পৃথক হইয়া, তাঁহাকে রায়গড় দিয়া নিজে ধূমঘাট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। তৎপর রাজ্যের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া নানাস্থানে ঘাঁটি বসাইবার জন্য তাঁহার চাক্‌সিরি পরগণা নামক স্থানের একান্ত আবশ্যক হয়। তৎকালে উক্ত স্থান পরাক্রান্ত চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কন্দর্পনারায়ণ রায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে সর্ব্বপ্রধান সমাজপতি ছিলেন।* চাক্‌সিরি পরগণার আবশ্যক নিবন্ধন কৌশলী প্রতাপাদিত্য আপন দুহিতা বিন্দুমতীকে রাজা রামচন্দ্র রায়ের করে অর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। অবশেষে কিছুদিন পরেই যশোহর নগরীতে ধুমধামের সহিত উক্ত বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। সম্ভবত প্রতাপাদিত্যের পক্ষীয় লোকের ইঙ্গিতে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় উক্ত দক্ষিণ রাজ্য (সুন্দরবন) ত্যাগ করিয়া ক্রমশ উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

* চন্দ্রদ্বীপং শিরঃ স্থ নং যত্র কলীনমণ্ডলং। কায়স্থকারিকা।

অতঃপর মহারাজ প্রতাপাদিত্য শঙ্কর চক্রবর্তী নামক জনৈক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সমর-সচিব নিযুক্ত করিয়া, তৎকালীন রডা নামিক জনৈক পটু গীজকে আপন সৈন্যদলভুক্ত করেন এবং তাহার দ্বারা সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করেন। সূর্যকান্ত গুহ নামে জনৈক বলিষ্ঠ যুবককে প্রধান সেনাপতি করিয়া তদধীন রঘু, মদন প্রভৃতি রীরপুরুষগণ ও কমল খোজাদ্বারা একদল অশ্বারোহী সৈন্য সংগঠন করেন। এই প্রকার সৈন্যদল ও গোলা বারুদ, কামান, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক ক্রমশ বঙ্গের অন্যান্য একাদশ ভূঁএ্রা এবং অন্যান্য নরপতিকে আপন দলভুক্ত করেন, তৎপরে ধুমধাটে রাজধানী স্থাপন, করত নূতন অভিষিক্ত হইয়া নিজে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এদিকে ক্রমে প্রতাপাদিত্যের এই স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী দিল্লীশ্বরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি প্রতাপাদিত্যকে দমন করার জন্য প্রথমত সেরখাঁকে বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে যশোহরে প্রেরণ করেন। পরে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য সেরখাঁকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বন্দী করেন। তৎপর ক্রমিক ৭-৮ বার তাঁহার জন্য দিল্লীশ্বর আকবর দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল প্রেরণ করেন ; কিন্তু প্রতাপাদিত্য অমিততেজে তাহাদের সকলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বঙ্গের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন। তৎপরে আকবরের মৃত্যু হইলে, সম্রাট-পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই প্রথমত প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং স্বীয় শ্যালক মানসিংহকে যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া বহুতর সৈন্য-সামন্তসহ তাঁহাকে যশোহরে প্রেরণ করেন। রাজা মানসিংহও ক্রমিক দুইবার পরাভূত হন। তৃতীয়বার যুদ্ধে জ্ঞাতি-শত্রু প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়ের পুত্র রাঘব নামান্তর কচু রায় হঠাৎ বিপক্ষ পক্ষে যোগদান করিয়া যুদ্ধের সময় প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু সংবাদ রটনা করিলে প্রতাপাদিত্যের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং প্রতাপাদিত্য পরাজিত ও বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন ; কিন্তু দিল্লীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, তাঁহার মৃত শরীর এক লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিল ; দিল্লীশ্বর সেই শরীর দর্শন করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এমন বলিষ্ঠ শরীর মৃতাবস্থায় আমার নিকট না পাঠাইয়া, জীবিতাবস্থায় পাঠান উচিত ছিল। জ্ঞাতি-বিরোধেই বঙ্গদেশ উৎসন্ন গেল। না হইলে সম্ভবত যশোহর হইতে বঙ্গের স্বাধীনতা সূর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইত না।

প্রতাপাদিত্য বাঙালি জাতির শিরোমণি ছিলেন। তিনি যেমন সত্যবাদী ছিলেন, তেমন স্বদেশ ও স্বদেশবাসীকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। তিনি আমরণকাল কিসে বাঙালির উন্নতি হইবে, সেই চিন্তা করিয়া নিজের জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ এবং অতীব দানশীল নরপতি ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগে সমগ্র বাঙালি জাতি মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি একমাত্র চন্দ্রদ্বীপ ভিন্ন তৎকালীন আর যত হিন্দু রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নিজে করায়ত্ত করেন। তাঁহার আর একটি গুণ ছিল যে, তিনি যাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন, তাঁহার সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিতেন এবং তাঁহাকে মাত্র স্বদেশবাসীর ও তাঁহার সাহায্য করিতে পরামর্শ দিতেন। প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যাও জয় করিয়াছিলেন এবং বহুদিন যাবত উড়িষ্যার নরপতি প্রতাপাদিত্যের অধীনে ছিলেন। একমাত্র চন্দ্রদ্বীপ অধিকারস্থ জনপদ ভিন্ন সমগ্র বঙ্গদেশের উপর তাঁহার একচ্ছত্র প্রভূত্ব ছিল। চন্দ্রদ্বীপ অধীশ্বরকে তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমাজপতি ও অগ্রণী বলিয়া মান্য করিতেন, কিন্তু রাজা হিসাবে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। তাঁহার জ্ঞাতি-শত্রু কচু রায় দিল্লীতে গিয়া ঘরভেদী বিভীষণের ন্যায় প্রতাপাদিত্যের সমস্ত আভ্যন্তরীণ সংবাদ

মানসিংহকে বলিয়া না দিলে এবং সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধের সাহায্য না করিলে কস্মিনকালেও প্রতাপাদিত্যের ঐরূপ অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইত না। তাঁহার অশ্বারোহী পদাতিক ও ঢালীতে প্রায় দুই লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ ছিল। রাজা মানসিংহ না হইলে, স্বয়ং দিল্লীশ্বর তাঁহাকে দমন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। বঙ্গদেশে এক্ষণও যেরূপ জ্ঞাতি-বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহাতে এ জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত।*

রাজা রামচন্দ্র রায়ের যশোহর গমন

প্রতাপাদিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। রাজা রামচন্দ্র রায়ের যশোহর গমনের বৃত্তান্ত বলা হইতেছে ;—রামচন্দ্র রায় পূর্ব্বকথিত মতে মস্ত লোকজন সহ হোসেনপুর হইতে যশোহর রওনা হন এবং কতিপয় দিবস পরে তাহার ৬৪ দাঁড়ের পান্সী ভৈরব নদ বাহিয়া প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর সন্নিকট এক খালের মধ্যে আসিয়া নোঙ্গর করে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য জামাতাকে তাঁহার অমাত্যগণ দ্বারা বিশেষ আদর আপ্যায়িত করিয়া রাজধানীতে লইয়া যান। রাজা রামচন্দ্র রায় তখনও অল্পবয়স্ক যুবক ; তিনি এক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, সঙ্গীয় রমাই ভাঁড়কে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া অন্তঃপুরে নিয়া যান এবং তাঁহার সম্পর্কীয়া শালিকাগণ নানাবিধ বিদ্রূপাত্মক কথা বলিলে রামচন্দ্রের পরিবর্ত্তে সেই স্ত্রীবেশধারী রমাই ভাঁড় তাঁহাদের কথার তীব্র উত্তর প্রদান করেন ; ইহাতে তাঁহাদের সন্দেহ হয় এবং রমাই ভাঁড় যে পুরুষ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ক্রমে এই কথা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কর্ণগোচর হয়। প্রতাপাদিত্য এবং বিধ আচরণকে অত্যন্ত ঘৃণিত ও তাঁহার অপমানজনক মনে করিয়া এবং রামচন্দ্রকে তাঁহার জ্ঞাতিশত্রু বসন্ত রায়ের সহিত পরামর্শ করিতে দেখিয়া রামচন্দ্রের প্রতি এতদূর কুপিত হন যে, অবিলম্বে রামচন্দ্রের শিরচ্ছেদ করিবেন বলিয়া আদেশ করেন। প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য ভগিনীপতির এবং বিধ আকস্মিক বিপদবার্ত্তা অবগত হইয়া গভীর নিশীথে উহা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর করেন। রামচন্দ্র ইহা শ্রবণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জীবনরক্ষক রামমোহন মালকে উহা জ্ঞাপন করান। তৎপর উদয়াদিত্য, রামমোহন ও রামচন্দ্র এই তিনজন ঐ রাত্রেই রাজধানী পরিত্যাগ করা স্থির করেন। তদনুসারে উদয়াদিত্য সীতারাম নামিক একজন শাস্ত্রীর সহায়তায় রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরের প্রথম ফটক মুক্ত করিয়া দিলে, মহাবল রামমোহন রামচন্দ্রকে পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া দ্বিতল অট্টালিকা হইতে রজ্জুর সাহায্যে নিচে অবতরণ করেন এবং নৌকায় উঠিয়া অবিলম্বে নৌকা খুলিয়া দেন। যে খালের মধ্যে নৌকা নোঙ্গর করা ছিল, এরূপ জনশ্রুতি আছে যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আদেশে তথায় মধ্যে মধ্যে বৃহৎ শালবৃক্ষ ফেলিয়া নৌকার গতিরোধ করার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল ; কিন্তু মহাবল রামমোহনের অসীম সাহসে নৌকা ঐরূপ বাধা অতিক্রম করিয়া ঐ রাত্রি মধ্যে ভৈরব নদে পতিত হয়। ভৈরব নদে পড়িবামাত্রই সেনাপতি ফার্ণাণ্ডিজ মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি করেন ; কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য জানিতে পারিয়াও আর অগ্রসর হন নাই। পর দিবস উদয়াদিত্যকে রামচন্দ্রের মুক্তির কারণ জানিয়া প্রতাপ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। এদিকে

---

* বরিশাল জিলার বাণারিপাড়ার গুহঠাকুরতাগণ বলেন—যুদ্ধ বিশারদ জিতামিত্র গুহ, মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজা বসন্ত রায়, চাঁদ রায় প্রভৃতি উক্ত গুহ বংশসম্ভূত। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতা নয়নানন্দ গুহ সরকার এই জিলার কাকরধা গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার বংশপরম্পরা ব্যক্তিগণ বাণারিপাড়া গ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন। প্রকৃত ইতিহাস আলোচনা করিলে শেষভাগের কথাগুলির সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না। লেখক।

রাজা রামচন্দ্র কয়েকদিন মধ্যেই হোসেনপুর পৌঁছিয়াই সদলবলে মাধবপাশা নূতন রাজধানীতে চলিয়া যান এবং মাধবপাশা গিয়া কী প্রকারে শ্বশুরকে এই অপমানের প্রতিশোধ দিবেন তাহা ভাবিতে থাকেন।

রামমোহনের পুনঃ যশোহর গমন

মহারাজ প্রতাপাদিত্য রাজা রামচন্দ্রের শিরশ্ছেদের আদেশ করায় অনেকে প্রতাপাদিত্যকে নির্ম্মণ মনে করিতে পারেন ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের বাঙালি অপেক্ষা তাঁহার মানসিক বল সহস্রগুণে বর্দ্ধিত ছিল। স্নেহের পুত্তলী দুহিতা বিধবা হইবে, এই ভীতিব্যঞ্জক দুর্বলতা তাঁহার হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই ; তখন প্রতাপাদিত্যের পরিবারস্থ লোকে নিজেদের জীবনাপেক্ষা সম্মানকেই বড় মনে করিতেন। রাজা রামচন্দ্র যেমন বাল-স্বভাব-সুলভ ইতর জনোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে অবস্থাবিশেষে ঐ রূপ আদেশ দেওয়ার জন্য প্রতাপাদিত্যকে সম্পূর্ণ দোষী করা যাইতে পারে না। বিশেষত কথাটা প্রতাপাদিত্যের কর্ণে যে অতিরঞ্জিতভাবে উঠিয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে মনে করা যাইতে পারে।

রাজা রামচন্দ্র দেশে আসিলে রামমোহন মাল অবসর বুঝিয়া যশোহর যাইয়া রাণীকে আনিবার জন্য রাজাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং এক্ষেত্রে রাজকুমারী বিন্দুমতী যে নির্দোষী তাহা রাজাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া যশোহর যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন। ক্রমিক রামচন্দ্রের মনটি রাজকুমারী বিন্দুমতীর দিকে আকৃষ্ট হইল এবং তিনি একদিন রামমোহনকে যশোহর যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

রামমোহন রাজার অনুমতি লাভ করিয়া যশোহর রাজধানীতে গিয়া রাণীকে প্রণাম করিলেন; পুরনারীগণ রামমোহনকে দেখিয়া আশাতীত সন্তুষ্ট হইলেন। এবারে স্বয়ং প্রতাপাদিত্য কন্যাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করার জন্য বিবিধ প্রকার উদ্যোগ করিয়া দিলেন। রওনার সমস্ত ঠিক হইলে রাণী বিন্দুমতী যাত্রা করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে প্রণামাদি করিয়া যেখানে ভ্রাতা উদয়াদিত্য বন্দী ছিলেন, তথায় গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। উদয়াদিত্য বিন্দুমতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "বিন্দু! তুমি ত চলিয়া গেলে, আমার আর কোন গতি হইল না!" সহসা এই কথা শুনিয়া বিন্দুমতী হঠাৎ যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন। এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রামমোহনকে বলিলেন, আমার এবার যাওয়া হইবে না। হঠাৎ বিন্দুমতীর মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন এবং রাজকুমারীকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ঐরূপ তিরস্কার শ্রবণে তিনি কেবল রোদন করিলেন মাত্র ; কিন্তু না যাওয়ার কী কারণ আছে, তাহা সর্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিলেন না, ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ সর্বনাশের সূত্রপাত হইয়া রহিল। রামমোহন মাল অগত্যা ক্ষুণ্নমনে মাধবপাশা ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা রামচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পরিণয়

রামমোহন মাল যশোহর হইতে একাকী ফিরিয়া আসিলে পর রাজা তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন এবং বলিলেন যে, আমি প্রথমেই তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম ; রামমোহন ম্রিয়মান হইয়া রহিলেন। তৎপর প্রাচীন আত্মীয়বর্গের অভিমতানুসারে দ্বিতীয় পরিণয় করা সাব্যস্ত করিলেন এবং তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য নয়ানচাঁদকে এক পত্র দিয়া যশোহর পাঠাইলেন। পত্রের মর্ম ছিল যে, "যশোহররাজের সহিত তিনি আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং রাজকুমারী বিন্দুমতীকে আর তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন।"

নয়ানচাঁদ যথাসময়ে যশোহর রাজধানীতে পৌঁছিয়া চিঠি প্রতাপাদিত্যের গৃহিণীর নিকট অর্পণ করিলেন। তিনি চিঠির মর্ম অবগত হইয়া নীরবে রোদন করিলেন এবং গোপনে স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া বিন্দুমতীকে অবিলম্বে চন্দ্রদ্বীপ প্রেরণ করা স্থির করিলেন। ক্রমে রওয়ানার উদ্যোগ চলিতে লাগিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য অপরিমিত ধনরত্ন এবং বহুতর অনুচর ও রাজকুমার উদয়াদিত্যকে সঙ্গে দিয়া এক প্রকাণ্ড বজরা নৌকায় তাঁহাদিগকে রওনা করিয়া দিলেন।

এদিকে রাজা রামচন্দ্র রায় বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জিলাবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ শম্ভুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দুহিতার পাণিগ্রহণ করা সাব্যস্ত করিয়া অবিলম্বে বিবাহের তারিখ ধার্য করিয়া ফেলিলেন। রাজোচিতভাবে বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন সবেগে চলিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিবাহের পূর্বদিন রাণী বিন্দুমতীর বজরা যশোহর হইতে রওনা হইয়া হোসেনপুরের খালে মাঝির হাটখোলার পশ্চিম পাড়ে আসিয়া নোঙ্গর করিল। বজরার অনুচরগণ হোসেনপুর নগরীতে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজা রামচন্দ্র রায় মাধবপাশার নূতন রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে বিবাহের দিন রাণীর বজরা মাধবপাশাভিমুখে রওনা হইল এবং রাজার বেড় বা মাধবপাশার খাল যেস্থানে আসিয়া কালীজিরা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই খাল ও নদীর সঙ্গমস্থলে বজরা নোঙ্গর করিয়া রহিল। রাণী বিন্দুমতী হোসেনপুর খালের পশ্চিমপাড়ে নৌকা নোঙ্গর করায় উহা অদ্যাপি রাণীপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণও প্রাচীন কি আধুনিক দলিলপত্রে উক্ত স্থান রাণীপুর বলিয়াই উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই রাণীপুর নামধেয় অনতিবিস্তৃত জনপদ হোসেনপুর বক্সী পরিবারের তালুকভুক্ত এবং অদ্যাপি বক্সিগণ ইহার ভূম্যধিকারী বর্ত্তমান আছেন।

বউঠাকুরাণীর হাট

রাজকুমার উদয়াদিত্য মাধবপাশার খাল ও কালীজিরা নদীর সঙ্গমস্থলে নৌকা নোঙ্গর করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজবাড়ির নহবৎ বাজনা ও অন্যান্য বাদ্যভাণ্ড শ্রবণ করিয়া রাত্রিযোগে ছদ্মবেশে রাজধানী গিয়া অবগত হন যে, গোধূলি লগ্নে রাজা রামচন্দ্র রায়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া এই কথা ভগিনী বিন্দুমতীকে জানাইলেন। বিন্দুমতী তাঁহার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন এবং রাজবাড়ি আর না গিয়া আপন বজরায় থাকিয়া গেলেন। রাণীর আবশ্যকীয় দধি দুগ্ধ ও মৎস্যাদি খরিদ জন্য তথায় একখানি হাট বসিয়াছিল। রাণী যতদিন ঐ স্থানে বজরা নোঙ্গর করিয়াছিলেন, ততদিনই ঐ স্থানে প্রত্যহ হাট বসিত এবং তজ্জন্য অদ্যাপি উক্ত স্থান বউঠাকুরাণীর হাট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সম্প্রতি উক্ত স্থানে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশীয় প্রহরীগণের বংশগত মাধবপাশার নিকটবর্তী হাদিবসকাঠী নিবাসী বলরাম সিং ও তাহার সহযোগী কলমদার খাঁ নামক জনৈক মুসলমানের প্রযত্নে উক্ত 'বউঠাকুরাণীর হাট' নামধেয় ভূমিখণ্ডে একখানি হাট বসিয়াছে। প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও মঙ্গলবার তথায় হাট বসে। কালীজিরা নদী পূর্বাভিমুখী হইয়া যে স্থান দিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে, ঐ সঙ্গমস্থলে এখন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। তাহাই এখন বহুদূর হইতে প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিয়া, বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপ অধিবাসিগণকে অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে।

রাণী বিন্দুমতীর সারসীতে অবস্থিতি

বউঠাকুরাণীর হাট নামধেয় স্থানে রাণী বিন্দুমতী চারিমাসকাল থাকিয়া রাজা কর্তৃক উপেক্ষিত কি অনুপেক্ষিত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তথা হইতে রওনা হইয়া লাখুটীয়ার সন্নিকট বিল্ববাড়ি ও সারসী গ্রামের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বমুখী প্রবাহিতা ক্ষুদ্র নদীতে বজরা নোঙ্গর করিয়া থাকেন; তথায় তিনি কখন কখন তীরে তাঁবু ফেলিয়া তাহার মধ্যে উঠিয়া বসিতেন; এদিকে স্থানীয় অধিবাসিগণের জলকষ্টের কথা রাণীর কর্ণগোচর হইলে তিনি সারসী গ্রামে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এক প্রকাণ্ড দীঘিকা খনন করিয়া তাহা উৎসর্গ করেন এবং তদুপলক্ষে নিকটস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গরিব-দুঃখিকে যথেষ্ট অর্থ দান করেন। রাণী বিন্দুমতীর এবং বিধ সৎকার্য্য ও দানশীলতার কথা মাধবপাশা রাজধানীতে আলোচিত হইলে, ক্রমে উহা অন্দরমহলে রাজমাতার কর্ণগোচর হয়। তৎপর রাজমাতা বিশিষ্ট লোক দ্বারা রাণী বিন্দুমতীর আগমন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া, স্বয়ং পুরনারীগণ সমভিব্যাহারে শিবিকাসহ সারসীতে আগমন করেন। রাজমাতা গিয়া নববধূর সহিত দেখা করিলে, রাণী বিন্দুমতী শাশুড়িকে এক থাল মোহর দিয়া প্রণাম করিলেন এবং রাজমাতাও যথাবিধানে বধূকে আশীর্বাদ করিলেন। তৎপর উদয়াদিত্য আসিয়া রাজমাতাকে প্রণাম করিয়া পূর্বাপর তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য প্রমুখাৎ রাজমাতা যশোহর সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত খিদ্যমানা হইলেন এবং তাঁহার আদেশে অবিলম্বে পুত্রবধূ এবং উদয়াদিত্য ও তৎসহচরগণসহ মাধবপাশা রাজধানীতে উপনীত হইলেন। রাজা রামচন্দ্র রায় রাণী বিন্দুমতীর রাজপুরীতে আগমন জানিয়া, পূর্ব্ব জাতক্রোধ ক্রমিক তিনদিন যাবৎ কিছুতেই দেখা করিলেন না ; পরন্ত, নিজ শয়নকক্ষের কপাট বন্ধ করিয়া রহিলেন। তৎপর উদয়াদিত্যের অনেক অনুনয় বাক্যে বাধ্য হইয়া চতুর্থ দিন বাহির হইলেন এবং তাঁহার অনুচর এবং সঙ্গীয় লোকদিগকে চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া একাকী উদয়াদিত্যকে আপন ভৃত্য নয়নচাঁদের সহিত যশোহরে প্রেরণ করিলেন।

রাজা রামচন্দ্র রায় অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। রাণী বিন্দুমতীকে তিনি প্রথমত গ্রহণ করিবেন না বলিয়াই মনস্থ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অবশেষে মাতার নিতান্ত অনুরোধে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। রাণী বিন্দুমতীও স্বীয় বুদ্ধি বলে ক্রমশ রাজার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। কালক্রমে রাণী বিন্দুমতীর গর্ভে মহাবল কীর্তিনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজার দ্বিতীয় পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভে বাসুদেবনারায়ণ রায় নামক এক পুত্র হয়।*

---

* এই ঘটনাকে সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকৃত বউঠাকুরাণীর হাট নামক গ্রন্থে অত্যন্ত বিকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি রাজা রামচন্দ্র রায়ের যে কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তির উচিত হয় নাই। লেখক স্থানীয় লোক, তজ্জন্য তাঁহার ঐরূপ চিত্র দেখিয়া বিশেষ কষ্টানুভব করিয়াছেন। স্বর্গীয় বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র তৎকৃত চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশে রাণী বিন্দুমতীকে মিলন করাইয়াই কাশীতে পাঠাইয়াছেন; কিন্তু তাহাও ঠিক নহে। রাণী বিন্দুমতীকে রাজা রামচন্দ্র মাতৃ অনুরোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৎগর্ভে মহাবল কীর্তি নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজা রামচন্দ্র রায়ের লোকান্তরে এই কীর্ত্তিনারায়ণই রাজা হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন রাজা রামচন্দ্রকে তদীয় শ্বশুর প্রতাপাদিত্য রাত্রিতে সম্প্রদানের পরই নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিবেন, এরূপ কলঙ্কের কথা প্রতাপাদিত্যের প্রতি আরোপ করিয়াছেন ; ফলত ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। যেহেতু রামচন্দ্রের বিবাহ সময় তদীয় পিতা কন্দর্পনারায়ণ জীবিত ছিলেন, সুতরাং রামচন্দ্রকে বধ করিলেও প্রতাপাদিত্য তখন তাঁহার রাজ্য নিতে পারিতেন না ; মাত্র আপন দুহিতাকে বৈধব্যানলে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। বঙ্গীয় বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ কেন, ইতরলোকেও ইহা করে না। এইরূপ কিংবদন্তীর মূলে আদৌ কোন সত্য নিহিত নাই। ঐ ঘটনা বিবাহের অনেক পরে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এই পুস্তিকার যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। –লেখক।

কাশীপুরে ব্রাহ্মণ স্থাপন

হোসেনপুর হইতে আসিবার সময়ে রাজা রামচন্দ্র রায় একমাত্র রাজপুরোহিত ব্যতীত আর কোন ব্রাহ্মণই সঙ্গে আনিতে পারেন নাই ; সুতরাং রাজধানী মাধবপাশার অনতিদূরে কাশীপুর গ্রামে কতিপয় ব্রাহ্মণ আনিয়া তাঁহাদিগকে যথারীতি বৃত্তিভূমি প্রদান করত তথায় তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কাশীপুরে রাজা যে সকল জনহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল ;—

গণপাড়া পল্লী—এই পল্লীতে জল-কষ্ট দেখিয়া রাজা এক দীঘি খনন করিয়া দেন এবং স্বীয় পিতৃনামে উক্ত জলাশয় উৎসর্গ করেন। অদ্যাপি উক্ত দীঘি কন্দর্পনারায়ণ রায়ের দীঘি নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই পল্লীতে রাজার আনীত গুড় শ্রোত্রীয় বংশের রামকান্ত বিদ্যাভূষণ, হরিরাম ন্যায়পঞ্চানন, রামকেশব পঞ্চানন, দেবীচরণ বাচস্পতি, রামশরণ বিদ্যাবাগীশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং রামকৃষ্ণ গুড় নামে এই বংশে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল ; তিনি নবাব সরকারের দরকার করিয়া, উত্তর কালে (১১৪৩ সনে) মামুদ সা বা সাকুলী খাঁ নামিক মোহর দস্তখতি এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই গণপাড়া পল্লীতে পুণ্ডরীকাক্ষ ভট্টাচার্য্য নিজ প্রতিভাবলে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ; ইনি একজন কলাপ ব্যাকরণের টিকাকার। ক্রমে ইহার বংশে কৃষ্ণনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, মদনমোহন ভট্টচার্য্য, হরিনাথ তর্কপঞ্চানন, রঘুনাথ সিদ্ধান্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে এই বংশে দুইজন প্রৌঢ় ব্যক্তি জীবিত আছেন।

ঢেউরিয়া পল্লী—এই পল্লীতে প্রথম শ্রীকর আচার্য্য নামিক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা রামচন্দ্র রায়ের সময়ে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের বংশানুসারে কতিপয় প্রৌঢ় ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন। তৎকালীন দক্ষিণ কাশীপুরে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। ইহাদের বাড়িতে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। তদ্ব্যতীত চব্বিশ পরগণার এড়েদহ হইতে দৈবকীনন্দন মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ কাশীপুরে আসিয়া বাস করেন। ইহার পুত্র হরিহর, তৎপুত্র কৃষ্ণদেব তর্কালঙ্কার, তৎপুত্র রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রঘুরাম ন্যায়ালঙ্কার এবং লক্ষ্মণচন্দ্র তর্কভূষণ ; ইহারা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।-ইহারা পিতামহের প্রাপ্ত রাজদত্ত নিষ্কর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাশীপুরে সুখ্যাতির সহিত বসতি করিতেছেন। লাখুটীয়ার স্বর্গীয় রাজচন্দ্র রায় মহাশয় এই বংশের শিষ্য ছিলেন। ইহাদের চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে প্রাপ্ত ব্রহ্মত্রের বার্ষিক আয় অন্যূন ১৫০০ দেড় হাজার টাকা। বর্ত্তমানে এই বংশে দুইজন প্রৌঢ় ও দুইটি যুবক জীবিত আছেন।

কায়স্থ—গুহ মুসবিফ বংশের রাঘবেন্দ্র গুহ তৎকালীন কতক মহোত্তরাণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, বংশপরম্পরায় কাশীপুরে বসতি করিয়া আসিতেছেন। দত্ত বংশে কৃষ্ণানন্দ দত্তের রামগঙ্গা, কাশীনাথ, রঘুদেব নামে কতিপয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রদ্বীপরাজানুগ্রহে ইহাদের যে সকল ভূসম্পত্তি ছিল, তন্মধ্যে বাখরগঞ্জ কালেক্টরির তৌজী ১৭৫৮ নং খারিজা তালুক রামমোহন দত্ত অন্যতম উক্ত রামমোহন দত্তের পুত্র কালিদাস দত্ত বিক্রমপুর বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতে থাকেন। উক্ত কালিদাস দত্তের পৌত্র বর্ত্তমানে পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর। নাগবংশের জিতামিত্র নাগ নামিক জনৈক ব্যক্তি আসিয়া প্রথমে কড়াপুর বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন এবং রাজবাড়ি কন্যা সম্প্রদান করিয়া চন্দ্রদ্বীপ কায়স্থ সমাজে বিশষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। ঘোষ বংশে—পঞ্চানন্দ ঘোষ রায়পাশাতে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া বংশপরম্পরায় বসতি করিতেছেন।

দুর্গ ও গড় নির্মাণ

রাজা রামচন্দ্রের পিতা রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে চন্দ্রদ্বীপ রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গোপসাগর সঙ্গমে রাবণাবাদে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন ; তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। হোসেনপুরের দুর্গ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

কাঠের বেড়াদ্বারা গড় নির্মাণ

বরিশাল নদী ও মাধবপাশা রাজধানী ইহার ঠিক মধ্যস্থলে কাশীপুরে কাঠ নির্ম্মিত বেড়াদ্বারা একটি গড় তৈয়ার করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে পাটনা দেশীয় বক্সারী সৈন্যগণ বাস করিত এবং নিকটবর্ত্তী প্রকাণ্ড মাঠে ইহারা কুচ্‌কাওয়াজ করিত। কাশীপুরে যে পল্লীতে উক্ত সৈন্যবাস ছিল, তাহাকে অদ্যাপি আঠগড় বলে। রাজা উদয়নারায়ণ রায়ের সময় এই পল্লীতে মহামায়া নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করা হয়।

সৈন্যবল বৃদ্ধি

রাজা রামচন্দ্র ও তৎপুত্র কীর্তিনারায়ণের সময় প্রভূত সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং পাটনা হইতে বহুতর সিপাহী ও বক্সারী সৈন্য আমদানী করা হয়। এতদ্ব্যতীত পর্তুগীজ সৈন্যসংখ্যাও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়। জনগেরী নামে জনৈক পর্তুগীজ দলপতি তৎকালে দশ সহস্রাধিক সৈন্যসহ বঙ্গদেশে বাস করিতেছিলেন ; রাজা রামচন্দ্রের আহ্বানে তিনি তাঁহার দলবলসহ চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হন।* তৎকালে অশ্বারোহী, পদাতিক, পর্তুগীজ প্রভৃতি সমস্ত সৈন্য সংখ্যা একত্র করিলে রাজা রামচন্দ্রের লক্ষাধিক সৈন্য হইত।

বক্সারী সৈন্য

রাজা রামচন্দ্র পাটনা, মজঃফরপুর, ত্রিহুত প্রভৃতি স্থান হইতে বহু সংখ্যক ছত্রিজাতীয় লোক আনিয়া সৈন্যদল গঠন করেন। কাশীপুর, নথুল্লাবাদ পল্লীর নিকট ইহাদের ৩৬০ খানা বাড়ি ছিল। ক্রমে ইহাদের অধিকাংশ এদেশে রহিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট কতক দেশে গিয়াছে। বর্ত্তমানে মাধবপাশা (শ্রীনগরের) দক্ষিণদিকে হাদিবসকাঠী এবং কালীজিড়ায় ইহাদের বংসধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং কাশীপুরেও কতক বর্ত্তমান আছে।

অসভ্য শ্রেণীর সৈন্য

এই রাজার সময় কতক পাহাড় অঞ্চলের সৈন্য ছিল। ইহারা প্রায়শ পদাতিক সৈন্যের কাজ করিত এবং সময় সময় তীর ধনু ব্যবহাব করিত। বর্ত্তমান কাশীপুর জঙ্গলের ফাগু সিং,

*A large number of Portuguese their dwell in freedom at the ports on this coast of Bengal ; they are also very free in their lives being like exiles. They do only traffic, without any fort, order or police, and live like natives of the country. They dare not return to India, for certain misdeeds they have committed, and they have no clergy among them. There is one of them named Jean Garie, who is greatly obeyed by the rest ; he commands more than ten thousand men for the king of Bengal.

The voyage of pyrard De Leval, p. 334 Vol. 1.

কাঞ্চন সিং, বীর সিং বুনুয়াগণ সম্ভবতঃ তাহাদের বংশধর ; ইহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও শ্রমশীল।

বাঙালি সৈন্য

রঘুনন্দন ফৌজদার নামে বিখ্যাত বাঙালি বীর রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ইহার অধীনে বহু সৈন্য থাকিত। ইহার চারি পুত্র। (১) লক্ষ্মীনারায়ণ, (২) রামনাথ, (৩) রঘুনাথ, (৪) রামমোহন। রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর তাঁহার বলশালী পুত্রগণও চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হন। রামনাথের বংশধরগণ হোসেনপুরের নিকট শিমুলেশ্বর বা শিমুলিয়া গ্রামে বাস করেন এবং রামমোহনের পুত্র রামরাজা সিংহ কাশীপুরের চহটা পল্লীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসতি করিতে থাকেন। তাঁহার দুই পুত্র রামশেখর ও রামকিশোর। রামকিশোর নিঃসন্তান; বর্ত্তমানে তাঁহার দৌহিত্র কুশঙ্গল নিবাসী বাবু শ্যামাচরণ দত্ত বি. এল. বরিশালে ওকালতী করিতেছেন। রামশেখরের বংশে বর্ত্তমানে শশিভূষণ ও জানকীভূষণ সিংহ ও এসিষ্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার।

বর্ত্তমান মূলাদী ষ্টেশনাধীন ইচালী গ্রামে যে দত্ত চৌধুরী বংশ বিদ্যমান আছে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ রামেশ্বর দত্ত একজন বাঙালি সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন এবং চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। রাজার অনুগ্রহে ইহারা যে ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমানে আজিমপুর পরগণায় রাজারাম দত্ত চৌধুরী নামিক ১নং জমিদারী। ইহা ব্যতীত ১৯৮৩নং জিরান্দী জাহাপুর নামে ইহাদের আর একটি জমিদারী আছে ; তাহা প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ; যথা—এই বংশীয় রামেশ্বরের সহযোগী অপর এক যোদ্ধবীর ভগবান দত্ত ঢাকার নিকটস্থ মজিদবাড়ি নামক স্থানে শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করত ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাহাপুর নদীর পাড়ে সসৈন্যে বিশ্রাম করেন * (জিরান)।

চন্দ্রদ্বীপ রাজা ঐ যুদ্ধে জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত বাঙালি বীরকে ঐ চরভূমি ও তৎসংলগ্ন কতিপয় ভূমি দান করেন। ইহাই উত্তরকালে ১৯৮৩ নং জমিদারীর সৃষ্টি করিয়াছিল ; এই জমিদারী জাহাপুর পরগণার অন্তর্গত। অদ্যাপি এই বংশীয় ব্যক্তিগণের বিবাহকালীন তলোয়ার ব্যবহার করা এবং ঘোড়ায় চড়ার রীতি আছে। বর্ত্তমানে এই বংশে কালীপ্রসন্ন দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি নামে কতিপয় যুবক বর্ত্তমান আছে।

কামান

রাজা রামচন্দ্রের সময় যে দুই দল পর্তুগীজ সৈন্য ছিল, তাহারা যেমন শিক্ষা দিয়া সৈন্যদল গঠন করিত, পক্ষান্তরে বন্দুক, কামান, গোলাগুলি প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ করিত। এতদ্ব্যতীত বাঙালি বীর মদন সিংহের কর্ত্তৃত্বাধীনে ভিন্নভাবে দেশীয় লোকদ্বারাও কামান, বন্দুক তৈয়ার করা হইত। রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের সময়ে সম্ভবত উজিরপুরে কামান তৈয়ার হইত ; মাত্র ১৫/১৬ বৎসর অতীত হইল, মাধবপাশার রাজবাড়িতে দুইটি কামান পাওয়া গিয়াছিল। তাহার একটির উপর ৩১৮ অঙ্ক এবং কন্দর্পনারায়ণ রায়ের নাম খোদা ছিল এবং

* বিশ্রাম শব্দ পূর্ব্বকালে "জিরান" শব্দে ব্যবহৃত হইত।

অপর কামানটিব উপরে 'গোবিন্দচন্দ্র কর্মকার কৃত' এই কথা খোদিত ছিল। উক্ত কামান দুইটি পরলোকগত সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বিবাহ উপলক্ষে কীর্ত্তিপাশা গ্রামে নিয়াছিলেন। কতিপয় অশিক্ষিত লোক উক্ত কামানের ভিতর ইষ্টকখণ্ড ও বারুদ বোঝাই করিয়া আগুন দিয়াছিল, তাহাতে একটি কামান ভীষণ গর্জন করিয়া ফাটিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিল। অপরটি কিছুদিন বরিশাল পুলিশ কোর্টের নিকট পড়িয়াছিল। বর্ত্তমানে উহার একটি কামান অত্রত্য সহৃদয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর বরিশাল সাহিত্য পরিষদ শাখায় দান করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। উক্ত রাজবাড়িতে এক পুষ্করিণী আছে, তাহাকে কামানতলা বলে ; বোধহয় সেখানে অনেক কামান থাকিত। মাধবপাশা হইতে এক রাস্তা পূর্বকালে কাগাশুড়া, মুকুন্দপট্টি ও মতাসারের মধ্য দিয়া তৎসম্মুখবর্ত্তী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; তথায় মাটিয়া বুরুজ অদ্যাপি এমন উচ্চভাবে ন্যস্ত আছে, দেখিলে বোধহয় ঐ স্থানে কামান দাগান হইত।

রামমোহন মাল

রামমোহন মাল সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে ইহার পৈত্রিক নিবাস বর্ত্তমান উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ছিল (North West Provinces)। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইহার পিতা ঘটনাচক্রে পূর্ব্ববঙ্গের ভুলুয়া (নোয়াখালী) প্রদেশের শিঙ্গারগাও গ্রামে বসতি করেন। বাল্যকালে রামমোহন অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির যুবক ছিলেন। কৈশোরেই ইঁহার বলিষ্ঠ চেহারা দেখিয়া প্রবীণ ব্যক্তিগণ বলিয়াছিলেন, রামমোহন পরিণত বয়সে একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা হইতে পারিবেন। ক্রমে রামমোহনের শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে চন্দ্রদ্বীপ-রাজের কর্ণগোচর হইলে, রাজার আহবানে রামমোহন আসিয়া চন্দ্রদ্বীপ-রাজ কন্দর্পনারায়ণ রায়ের শেষ জীবনে তাঁহার শরীররক্ষক পদে নিযুক্ত হন। বিশারীকাঠী (নিশিন্দা) হইতে কন্দর্পনারায়ণ রায় ক্ষুদ্রকাঠিতে আগমন করিলে বরিশালের নিকটবর্ত্তী জগদ্দল গ্রামে রামমোহনের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। পরে তথা হইতে ক্ষুদ্রকাঠির নিকট রাকুদিয়া গ্রামে তাঁহার বাসস্থান পরিবর্তন করা হয়। তৎপর রামমোহনের পুত্র প্রাণকৃষ্ণের অভিপ্রায় মতে ইহারা রাকুদিয়া গ্রামের সংলগ্ন পশ্চিমাংশে উজিরখাঁ নামক জনৈক মুসলমান সরদারকে সদলবলে নিহত করিয়া, উজিরপুর নামক স্থানে স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া লন। রাজা রামচন্দ্র রামমোহনকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহার বংশস্থ ব্যক্তিগণকে মীরবহর উপাধিতে ভূষিত করেন এবং চন্দ্রদ্বীপ হইতে প্রভূত ভূসম্পত্তি দান করেন ; উহাই রামমোহনের বংশধর রত্নেশ্বরের নামানুসারে রত্নদী-কালিকাপুর নামে একটি পরগণা হইয়াছে, ইহা সামান্য জমিদারী নহে। বর্ত্তমানে এই পরগণায় ছয়খানি খারিজা তালুক সমেত গভর্নমেন্ট রাজস্বের পরিমাণ ২৮৫৫।৪।১০ পাই। এই পরগণার ভূমিগুলি ৭২টি মৌজায় বিভক্ত। কামান ছুঁড়িতে এবং মল্লযুদ্ধ ও অসি চালনায় রামমোহন বিশেষ দক্ষ ছিলেন ; ইহা ব্যতীত প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা ইহার অন্যতম গুণ ছিল। রামমোহনের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রত্নেশ্বর এবং জীবনকৃষ্ণের পুত্র নরোত্তম। রত্নেশ্বরের চারিপুত্র—(১) কৃষ্ণরাম, (২) কন্দর্পরাম, (৩) কীর্ত্তিচাঁদ, (৪) রামকিশোর রায়। এই বংশের বাবু অখিলচন্দ্র রায় বরিশাল খাসমহলের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন; এক্ষণ পেন্সন্ ভোগ করিতেছেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র রায়। এই বংশে রসিকচন্দ্র,

স্বর্ণকুমার রায় প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন। উক্ত জমিদারী নিলাম হওয়ায় রামচন্দ্রপুরের গুহ পরিবার ঐ পরগণার অধিকাংশ অংশ ক্রয় করিয়া ভোগ করিতেছেন।

লক্ষ্মণমাণিক্যের পরিচয়

বর্ত্তমান নোয়াখালী জিলা বা ভুলুয়া প্রদেশ অতীতের অদূরবর্ত্তীকালে বঙ্গোপসাগরের অংশ ছিল। এক সময় ঐস্থানে ভীষণ উর্ম্মিমালা উত্থিত হইয়া মানবের ভীতি সঞ্চার করিত। ফেনী নদীর পশ্চিম, মেঘনা নদীর পূর্ব্ব, ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মেহারের দক্ষিণ, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগই ভুলুয়া দেশ নামে বিখ্যাত। এই প্রদেশের অধিপতিগণমধ্যে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম নরপতি ছিলেন ; ইহারা শূরবংশীয় কায়স্থ। এই বংশের ভুলুয়া আগমন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ প্রচলিত আছে ; যথা—আদিশূরের বংশসম্ভূত বিশ্বম্ভর শূর চন্দ্রনাথতীর্থ দর্শন করিবার বাসনায় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া, বঙ্গীয় ৬১০ সালে চন্দ্রনাথ তীর্থে উপনীত হয়েন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় আকাশ ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন থাকায় নাবিকগণের দিগ্‌ভ্রম হয় এবং সাতদিন পরে অর্ণবপোতখানি বঙ্গোপসাগরের উপকূল সমীপে একটা চরের নিকট উপনীত হয়। তখন নিদ্রাবস্থায় বিশ্বম্ভর শূর স্বপ্ন দেখেন যে, বারাহী দেবী তাঁহাকে বলিতেছেন—"আমি তোমার অর্ণবপোতের দক্ষিণপার্শ্বে আছি, তুমি আমাকে উত্তোলন করিয়া পূজা কর। এই যে ক্ষুদ্র চর দেখিতেছ, অবিলম্বে ইহা প্রকাণ্ড দ্বীপের আকার ধারণ করিয়া মানবলোচনের গোচরীভূত হইয়া মনুষ্যের আবাসভূমি হইবে এবং তোমার বংশধরগণ ইহাতে সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত নিরাপদে রাজত্ব করিবে ; তৎপর পঞ্চদশ পুরুষ পর্য্যন্ত হীনভাবে রাজত্ব করিবে।"

বিশ্বম্ভর শূর স্বপ্নাদেশ অনুসারে অর্ণবযানের দক্ষিণাংশ অনুসন্ধান করিয়া বারাহী দেবীর শক্তিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং কুয়াসার মধ্যে পূর্ব্বমুখী স্থাপন করিয়া সময়োপযোগী উপকরণ দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিলেন। কুয়াশান্তে সূর্য্য কিরণে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হইলে দেখা গেল যে, পশ্চিমমুখী হইয়া বারাহী দেবীকে অর্চনা করা হইয়াছে। সুতরাং সকলে বলিয়া উঠিল 'ভুল হুয়া' এই শব্দ হইতে ঐ প্রদেশ উত্তরকালে ভুলুয়া নামে অভিহিত হইয়াছে।

বারাহী দেবীর স্বপ্নাদেশ মতে বিশ্বম্ভর শূর উক্ত ভুলুয়া প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করিয়া, রাজধানীকে কল্যাণপুরী নামে অভিহিত করেন। বর্ত্তমানে কল্যাণপুরী হইতেই কল্যাণপুর হইয়াছে। তিনি বিক্রমপুর ও চন্দ্রদ্বীপ হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করিয়া ভুলুয়া প্রদেশে বসতি করান। কালক্রমে তাঁহার চেষ্টায় জঙ্গলাকীর্ণ চর সুশোভন মানব-নিকেতনরূপে পরিণত করা হয়। এই বিশ্বম্ভর ভুলুয়ার প্রথম রাজা। বিশ্বম্ভরের পুত্র গণপতি, তৎপুত্র শূরানন্দ, তৎপুত্র দেবানন্দ, তৎপুত্র মাধবচন্দ্র, তৎপুত্র রাজা রাজবল্লভ। এই রাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য। রাজা রাজবল্লভ আরাকানের মগের আক্রমণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া যোগদিয়া ও দাদড়া নামক জনপদ জনৈক দুর্দ্দান্ত মুসলমান ও জনৈক হিন্দুসেনাপতিকে প্রদান করেন। পরে তাঁহাদের সাহায্যে রাজা রাজবল্লভ মগদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করেন।

রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি সংগ্রামকালে যে কবচ পরিধান করিতেন, তাহা কল্যাণপুর রাজবাটীতে রক্ষিত আছে; এই কবচের ওজন ন্যূনাধিক একমণ। লক্ষ্মণমাণিক্যের সহিত চন্দ্রদ্বীপরাজ কন্দর্পনারায়ণ রায়ের মধ্যে মধ্যে সীমানা নিয়া

বল পরীক্ষা হইত। তৎপর নিম্নলিখিত কারণে রাজা রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয় এবং সেই মনোমালিন্যের ফলে যে যুদ্ধ হয়, তাহাই লক্ষ্মণমাণিক্যের চির-নিদ্রার কারণ হইয়াছিল।*

দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্যের বিবরণ

শ্রীহট্ট প্রদেশ হইতে জনৈক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ভুলুয়ার নিকটবর্ত্তী মেহারের কালীবাড়িতে আসিয়া বাস করেন। কালক্রমে তাঁহার অসাধারণ শক্তির কথা ভুলুয়া—রাজা অবগত হইয়া ভুলুয়ার অন্তর্গত বর্ত্তমান বাবুপুর নামক স্থানে তাঁহাকে বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া লক্ষ্মণমানিক্য নিজে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে তথায় তাঁহার তিনটি পুত্র হয়। কিছুকাল পরে তিনি চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত শিকারপুরের নাসিকাপীঠ দর্শনমানসে আগমন করিলে তাঁহার অলৌকিক শক্তির কথা ক্রমে চন্দ্রদ্বীপ-রাজের কর্ণগোচর হয়। তৎপর রাজা উক্ত তান্ত্রিক ভট্টাচার্য্যের সহিত দেখা করিয়া—"তিনি এতদ্দেশে বাস করিলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন" এইরূপ অঙ্গীকার করেন। তৎপর ঐ ভট্টাচার্য্য এদেশে বাস করিতে স্বীকার হইলে রাজা তাঁহাকে খাপুরা গ্রামে বসতি স্থান নির্দেশ করিয়া দেন এবং ঐ ইষ্টদের জন্য মালাকার, কুম্ভকার প্রভৃতি নানাবিধ জাতিতে খাপুরা গ্রামখানি সমৃদ্ধিশালী গ্রামে পরিণত করেন। উক্ত ভট্টাচার্য্যের জনৈক পুত্র উজিরপুরের নিকটবর্ত্তী মূলপাইন নামক এক গণ্ডগ্রামে পাকরতা উপাধিবিশিষ্ট জনৈক ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশে উজিরপুর নিবাসী স্বর্গীয় তারা প্রসন্ন বিদ্যারত্ন স্মৃতিশাস্ত্রের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য্য ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। এই বংশে ভুলুয়া পরগণায় বাবুপুর গ্রামে তারণীশঙ্কর, হরিশঙ্কর, উমাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমানে বাবুপুরে কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বাস করিতেছেন। চন্দ্রদ্বীপে ইঁহাদের বহু শিষ্য বিদ্যমান আছে। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের বসুবংশ দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। মিত্র বংশে রাজাদের গুরু ঢাকা সুলতানাবাদ পরগণার অন্তর্গত মিতারার ভট্টাচার্য্যগণ এবং রাণীদের গুরু অদ্যাপি ভুলুয়ার দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্য বংশ।**

* নোয়াখালী ইতিহাস লেখক বলেন—তিনি জনশ্রুতি শুনিয়াছেন, লক্ষ্মণমাণিক্য চন্দ্রদ্বীপে দুইবার বিজয় পতাকা উড্ডীন করিলে রাজা রামচন্দ্র ভুলুয়া গিয়া তাঁহার সহিত ভালবাসা করিয়া, কোষ নৌকায় জলখেলা করিতে যান এবং রামচন্দ্রের ইঙ্গিতে রামমোহন মাল নৌকা খুলিয়া নিরস্ত্র লক্ষ্মণকে বন্দী করেন। এই কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি সর্বৈ মিথ্যা ; ইহার মূলে আদৌ কোন সত্য নিহিত নাই। ইতিহাস লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া রামচন্দ্রকে 'পামর' বলিতেও বিমুখ হন নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। নোয়াখালীর ইতিহাস লেখক এক জলখেলার প্রসঙ্গ করেন, লক্ষ্মণমাণিক্যের সহিত রামচন্দ্রের ঐরূপ সম্যভাব করা অসম্ভব ছিল ; কারণ তৎকালীন রামচন্দ্র কৈশোর অতিক্রম করিয়া পূর্ণ যৌবনেও পদার্পণ করে নাই ; কিন্তু তখন লক্ষ্মণমাণিক্য অতি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন।

** চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় ভুলুয়া প্রদেশও বহু পরগণায় বিভক্ত হইয়াছে ; যথা—যোগদিয়া, বাবুপুর, গোপালপুর, অমরাবাদ, জয়নগর, সায়েস্তাবাদ, বেদারাবাদ, আমিরাবাদ, রোশনাবাদ। ইহা ব্যতীত নিজ ভুলুয়াও একটী বিস্তৃত পরগণা। ভুলুয়া জমিদারী নিলাম হইলে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর লালাবাবুর স্ত্রী রাণী কাত্যায়নী খরিদ করেন। বর্ত্তমানে ইঁহার স্থলবর্ত্তীগণ গিরিশচন্দ্র সিংহ, পূর্ণচন্দ্র সিংহ, কান্তিচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি। ভুলুয়ার জমিদারগণ প্রধানত মাইজদী, দত্তপাড়া, বাবুপুর ও আমিসাপাড়া গ্রামে বসতি করিতেছেন। বর্ত্তমানে রাণী শশীমুখীর প্রদত্ত বৃত্তিদ্বারা বারাহী দেবী তথায় পূজিতা হইতেছেন।

ভুলুয়াই লুটের বিবরণ

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অধীন বর্ত্তমান বরিশাল থানার অন্তর্গত খাপুরা নামক গ্রামে দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্যবংশে সর্ববিদ্যার সন্তান ও কতিপয় কুলীন কায়স্থ এবং অন্যান্য নবশাখ শ্রেণীর লোকসমূহ বসতি করিত। চন্দ্রদ্বীপ অধীশ্বর রামচন্দ্র রায় রাজা হওয়ার পর একদা ভুলুয়া-রাজ লক্ষ্মণমাণিক্য প্রায় পাঁচ সহস্র সৈন্য ও লোকজন প্রেরণ করিয়া গভীর নিশীথে তৎকালীন বর্ত্তমান জাহাপুর নদীর পাড়স্থ খাপুরা গ্রাম ঘেরাও করিয়া, তথাকার সর্ববিদ্যার সন্তান ভট্টাচার্য্য বংশীয় ব্রাহ্মণ এবং ঐ গ্রামস্থ তাবৎ লোকগুলিকে তাঁহাদের বাড়িঘর সমেত নিয়া গিয়া ভুলুয়া প্রদেশে তাঁহাদিগকে বসতি করান। তদবধি ঐ সকল লোক ভুলুয়াতেই বসতি করিতেছেন। হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে একখানি গ্রাম জনমানবশূন্য হওয়ায় পার্শ্ববর্তী গ্রামিকগণ ভীত ও ত্রাসিত হইয়া এই অভিনব লুটের বৃত্তান্ত রাজা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর করিলেন। রাজা রোষে ও ক্ষোভে সমধিক উত্তেজিত হইয়া, অবিলম্বে ইহার প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করিলেন। বহুদিন হইতে এ জিলার আবালবৃদ্ধ সকলেই ঐ লুটের বৃত্তান্ত উপলক্ষ করিয়া কথাচ্ছলে 'ভুলুয়াই লুটের' কথা বলিয়া থাকে।

লক্ষ্মণমাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা

খাপুরা গ্রাম হইতে রাজার ইষ্টদেব সর্ববিদ্যার সন্তান দ্বিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্যকে এবং অন্যান্য গ্রামিকগণসহ লুটিয়া নেওয়ায় রাজা রামচন্দ্র উক্ত ইষ্টদেবকে সপরিষদ পুনঃ প্রত্যাবর্তন জন্য রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের নিকট এক চিঠিসহ দূত প্রেরণ করেন। ভুলুয়ারাজ লক্ষ্মণমাণিক্য দূত মারফতে চিঠি পাইয়া অহঙ্কারে বক্ষঃস্ফীত করিয়া এইরূপ উত্তর দেন যে, "বালক রাজার এত স্পর্দ্ধা ভাল নহে।" রাজা রামচন্দ্র এই চিঠি পাইয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইলেন এবং রাজসভায় বলিলেন যে, অবিলম্বে বালক রাজার বলবিক্রম লক্ষ্মণমাণিক্যকে দেখাইতে হইবে। সুতরাং রামমোহন মাল, রামেশ্বর দত্ত, ভগবান, দাস, মদনসিং, নানাফার্নান্ডিজ ও জনগেরীকে রণসজ্জা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। বড় বড় রণপোতগুলিতে কামানরাজি স্থাপিত হইল এবং তাঁহার পাঁচদল সৈন্য মধ্যে একদল মাত্র রাজধানীতে রাখিয়া দুইদল পর্তুগীজ সৈন্য এবং একদল বক্সার সৈন্য ও একদল বাঙ্গালী সৈন্যসমভিব্যাহারে কালীজিড়া নদী হইতে রওনা হইয়া কতিপয় দিবস পরে লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজধানীর সমীপবর্তী হইলেন এবং তথায় শিবির সংস্থাপন করিলেন। রাজা রামচন্দ্র রোষে ও ক্ষোভে স্বয়ং অধিনায়কের পদ গ্রহণ করত সৈন্য সমাবেশ করিয়া চতুর্দিকে ঘাটি বসাইলেন এবং তৎসংক্রান্ত কাজ শেষ হইলে লক্ষ্মণমাণিক্যকে আগমন-বার্তা জ্ঞাপনার্থে মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি করিলেন। গভীর নিশীথে কামানের ভীষণ গর্জনে লক্ষ্মণমাণিক্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি হঠাৎ শত্রুরাজি শিয়রে দর্শন করিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু মৌখিক দাম্ভিকতায় পশ্চাৎপদ হইলেন না ; অবিলম্বে আপন সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা রামচন্দ্র, সৈন্যগণসহ লক্ষ্মণমাণিক্যকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিলেন এবং রণবাদ্য ও কামান গর্জ্জনে প্রাচীন ভুলুয়াভূমি কম্পিত করিয়া তুলিলেন। উভয় পক্ষীয় বীরগণ অশ্রুতপূর্ব্ব ক্ষিপ্রকারিতাসহকাবে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিপটলে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল ; যুদ্ধ মদোন্মত্ত বীরগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া, ঘোরতররূপে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য যুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ রামচন্দ্রের চক্রব্যূহে প্রবেশ করিলেন। রাজা

রামচন্দ্রের সৈন্যগণ চতুর্দিক হইতে লক্ষ্মণমাণিক্যকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। এদিকে লক্ষ্মণমাণিক্যের সৈন্যগণ ভুলুয়াধিপতিকে দেখিতে না পাইয়া তিনি বিনষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বীরাগ্রগণ্য রামমোহন মাল অবিলম্বে লক্ষ্মণমাণিক্যকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করত লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাজা রামচন্দ্রের নৌকায় লইয়া গেলেন। অবিলম্বে লক্ষ্মণমাণিক্যের পরাজয় এবং রাজা রামচন্দ্রের বিজয়বার্তা ঘোষিত হইল। রাজা রামচন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া মদনসিং ও ফার্নান্ডিজের হস্তে সৈন্যগণের আগমন বন্দোবস্তের ভারার্পণ করিয়া, রামেশ্বর ও ভগবানকেসহ আপন রণতরী চন্দ্রদ্বীপাভিমুখে রওনা করিয়া দিলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে মাধবপাশায় আসিয়া উপনীত হইলেন। লক্ষ্মণমাণিক্যের পরাজয় ও বন্দীর দিন হইতে ভুলুয়া রাজ্য কিছুদিন চন্দ্রদ্বীপের অধীন হইয়া রহিল এবং তখন হইতে ভুলুয়ার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির সহিত চন্দ্রদ্বীপ অধিবাসীর ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল এবং ভুলুয়াতে লক্ষ্মণমাণিক্যের স্বাধীনতা-সূর্য্য কিছুদিনের জন্য অস্তমিত হইল।

লক্ষ্মণমাণিক্যের মৃত্যু

ভুলুয়া হইতে ফার্নান্ডিজ, জনগেরী ও মদনসিং আসিবার কয়েক দিন পরে লক্ষ্মণমাণিক্যের বিচার হয় এবং সামরিক বিচারে রাজা রামচন্দ্র তাঁহাকে ফাঁসীর আদেশ করেন। কোমলহৃদয়া রাজমাতা রাজধানীতে ফাঁসী হইবে শুনিয়া লক্ষ্মণমাণিক্যকে বধ করিতে নিষেধ করেন। রামচন্দ্র মাতৃ আজ্ঞা প্রাণান্তে ও লঙ্ঘন করিতেন না ; সুতরাং লক্ষ্মণমাণিক্যের ফাঁসীর হুকুম প্রত্যাহার করা হইল। বহুদিন পর্য্যন্ত লক্ষ্মণমাণিক্য কারাগারে বন্দী ছিলেন। একদিন রাজা স্নানার্থ তৈল মাখিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মাতার অনুরোধে ভীমকায় মহাবল লক্ষ্মণমাণিক্যকে তথায় আনয়ন করা হইল। রাজা নানাবিধ কথোপকথন করিতেছিলেন, লক্ষ্মণমাণিক্য একটা নারিকেল বৃক্ষের সহিত হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমিক লক্ষ্মণমাণিক্য নারিকেল গাছটাকে দোলাইতে দোলাইতে রাজা রামচন্দ্রের সম্মুখে বিকট শব্দে ফেলিয়া দিলেন লক্ষ্মণের মনোগত অভিপ্রায় ছিল, নারিকেলবৃক্ষ ফেলিয়া বৈরনির্যাতন করিবেন। কিন্তু তাহা রামচন্দ্রের গায় না পড়িয়া তাঁহার এক পার্শ্বে পড়িল, দৈবাৎ রাজা রক্ষা পাইলেন। ইহা দেখিয়া রাজমাতা তৎক্ষণাৎ এবং বিধ দুর্দান্ত বীরকে বধ করিতে আদেশ দিলেন এবং অবিলম্বে ঘাতকের হস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ লক্ষ্মণের ছিন্ন মস্তক ভূতলে পতিত হইল। তৎপর রাজা রাজোচিত নিয়মে লক্ষ্মণের সৎকার করাইলেন।

পরিব্রাজক বৃত্তান্ত

১৫৯০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে এবং বাঙ্গালা ৯৯৭ সালের আশ্বিন মাসে ফন্সীকা (Fonseca) নামক জনৈক পাদরী সাহেব যশোহর নগরে উপনীত হন। যশোহরে আসিবার অল্পদিন পূর্ব্বে ইনি চন্দ্রদ্বীপে রাজা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সে সময় রামচন্দ্রের বয়স ৮-৯ বৎসরের অধিক নহে, তিনি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত পর্যটক আরও বলেন—রাজা রামচন্দ্র অল্পবয়স্ক হইলেও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সুতীক্ষ্ণ ছিল। ঐ সময় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ৬ষ্ঠ বর্ষীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের কথা হইতেছিল ; সম্ভবত উহার ২-৩ বৎসর মধ্যেই উক্ত বিবাহ হইয়া থাকিবে।

রাজা রামচন্দ্রের পিতা রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালে র‍্যালুফ ফিচ নামক

জনৈক ইউরোপীয় পরিব্রাজক ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি বলেন—শ্রীপুর হইতে আমি বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হই। এ স্থানের 'রাজা হিন্দু ; তিনি সৎপ্রকৃতির লোক, বন্দুক ছুঁড়িতে তিনি বড় ভালবাসেন, ইহার রাজ্য বৃহৎ ও উর্বরা, এ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে চাউল, তুলা ও রেশমের কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ স্থানের গৃহ সকল সুন্দর ও উন্নত, রাস্তা সকল প্রশস্ত, অধিবাসীরা নগ্নপ্রায়, কেবলমাত্র কটিদেশ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত রাখে। এদেশের স্ত্রীলোকদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য রক্ষিত হইয়া থাকে, তাঁহারা গলায় হাতে ও পায়ে রৌপ্য এবং তাম্র ও হস্তিদন্ত-নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে। অতি প্রাচীন বৈদেশিক মানচিত্রে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের নাম বড় অক্ষরে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সামাজিক বিধান

রাজা রামচন্দ্রের সময় কায়স্থ সমাজে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১) কুলীনের সকল সন্তানই পিতার তুল্য কুলীন গণ্য হবেন।

(২) কুলীনের পোষ্যপুত্র কুলীন নহেন।

(৩) কুলীনের পোষ্যপুত্রকে যদি অপর কুলীন কন্যা দান করেন, তাহাতে যে দোষ স্পর্শে তাহা শত কুলকার্য্য দ্বারাও খণ্ডন হয় না।

(৪) যে সকল কুলীন ক্রমাগত কুলীনের সহিত আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কুল গঙ্গাশ্রুত কুল নামে খ্যাত।

(৫) কুলীনগণ পর্য্যায় অনুসারে আদান-প্রদান করিবেন, পর্য্যায় বিপর্য্যায় হইলে কুলভঙ্গ হয়।

(৬) যে সকল কুলীন স্বীয় পর্য্যায়ক্রমে পাত্র বা পাত্রী না হইবেন, কুলজ অথবা মধ্যল্য তাঁহার বিশ্রামস্থল। তাঁহারা উহাদের সহিত আদান-প্রদান করিতে পারেন। নিতান্ত মহাপাত্রদিগেরও সহিত আদান-প্রদান করিতে পারেন। যদি তাঁহাদের তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কেহ কুলীনে কন্যা দান ও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কুল বজায় থাকিবে।

(৭) কুলীনগণ যখন কুলীনদের সহিত আদান-প্রদান করেন, তখন অবস্থানুসারে তাঁহাদের এই কার্য্য 'আত্ম' 'উচিত' 'গৃহ', 'করি' এই চারি ভাব হয়। যখন তাঁহারা কুলজের সহিত কার্য্য করেন, তখন তাঁহাদের সেই কার্য্য 'উপ' ভাব লেখা যায়। তখন তাঁহারা মধ্যল্যের সহিত কার্য্য করেন তখন 'ক্ষম' ভাব লিখিত হয়। যখন তাঁহারা মহাপাত্রের সহিত কার্য্য করেন, তখন তাহা 'অপ' ভাব লেখা হয়। ছোট কুলীন যদি বড় কুলীনের সহিত কার্য্য করেন, তাহা হইলে ছোট কুলীনের পক্ষে ঐ কার্য্যের 'সৎ' ভাব হয়। কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্র ইঁহারা কুলীনের সহিত কার্য্য করিলে তাঁহাদের পক্ষে সেই কার্য্যের 'সৎ' ভাব গণ্য হয়।

(৮) কুলীনগণ যদি তিন পুরুষের মধ্যে কুলীনের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া পুরুষানুক্রমে 'অপ' সম্বন্ধ করে, তাহা হইলে তাঁহারা কুলচ্যুত হইয়া হীন হয়েন। কুলীনগণ তাঁহাদিগের সহিত আদান-প্রদান করিলে তাঁহাদের সেই সম্বন্ধ

অবস্থানুসারে কুলীনের পক্ষে 'অপ' ও অত্যল্প সম্বন্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

(৯) কুলীনের তিনপুরুষ পর্য্যন্ত যদি দৌহিত্র দোষ জন্মে, অর্থাৎ তিনপুরুষ মধ্যে যদি এক পুরুষেরও মাতামহ কুলীন না হয়, তাহা হইলে কুলে দোষ স্পর্শ হয়।

চন্দ্রদ্বীপের সামাজিক সীমানা

উত্তরে ঢাকা, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে তেলিহাটী পরগণা। ইহার বাহিরে কোন কুলীন বাস করিলে তাঁহার কুল থাকিবে না ; তবে উক্তরূপ কুলভ্রষ্ট কুলীনগণ পুরুষানুক্রমে কুলীনগণ সহিত আদান-প্রদান বজায় রাখিলে তিনি কুলজ আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন।

ঘটক ও স্বর্ণামাত্য

রাজা রামচন্দ্রের সময় ঘটক ও স্বর্ণামাত্য এই দুইটি পদের সৃষ্ট হয়। এই উভয়পদ ব্রাহ্মণজাতিকে অর্পণ করা হয় এবং এই জাতীয় ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা ঘটকের কার্য্য করিতেন, তাঁহারা (১) কায়স্থদিগের বর্দ্ধনশীল বংশাবলী, (২) তাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা, (৩) কে উৎকৃষ্ট বংশ কে নিকৃষ্ট বংশ, ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। আবশ্যক হইলে রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া কায়স্থদিগের কুল-কার্য্যাদির বিবরণ বিশেষরূপে রাজসমাশে নিবেদন করিতেন।

স্বর্ণামাত্য

স্বর্ণামাত্যদিগের উপর এই ভার অর্পিত হইল যে, তাঁহারা রাজসভায় ভোজনার্থ রাজ-নিমন্ত্রণে আগত কায়স্থদিগের ভোজনস্থলে মর্য্যাদানুসারে কায়স্থদিগের কে রাজার নিকটে কে তাহার পরে এইরূপ স্থান নির্ণয় করিয়া দিবেন। প্রথমত স্র্ণামাত্যগণ ঘটকদিগের পুস্তক দেখিয়া কায়স্থদিগের এই মর্যাদার ক্রম নির্ণয় করিতেন। পরে তাঁহারা আপনারাই ঘটকদিগের ন্যায় কায়স্থদিগের বিবাহাদি বিষয়ের এক পুস্তক রাখিতে লাগিলেন ও তাহার কার্য্য এক্ষণও প্রচলিত আছে।

নিমন্ত্রণে ভোজনের নিয়ম

কায়স্থগণ যে রাজবাড়িতে ভোজন করিবেন, তাহার নিমিত্ত চিলছত্তর বা চিলছত্র নামে এক বৃহৎ ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যস্থলে রাজা আসন গ্রহণ করিতেন, তন্নিকটে কুলীনগণ বসিতেন এবং তাহার পর কুলজ, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অন্যান্য কায়স্থগণ ক্রমান্বয়ে চতুষ্পার্শ্বে বসিতেন। বর্ত্তমানে রাজবাড়ির উক্ত চিলছত্র ভগ্নাবস্থায় থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সম্প্রতি সমগ্র চিলছত্রটি একটি প্রকাণ্ড জীনবৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় সমাচ্ছন্ন হইয়া অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। চন্দ্রদ্বীপ কায়স্থ সমাজে রাজার এমন প্রতিপত্তি ছিল যে, অদ্যাপি কোন কুলীন কায়স্থের বাড়ি নিমন্ত্রণ সময় রাজার জন্য একখানি আসন পৃথক রাখিয়া তৎপর সকলে অন্যান্য আসনে উপবেশন করত ভোজন করিয়া থাকেন।

সামাজিক অপরাধীর দণ্ড

চন্দ্রদ্বীপ কায়স্থ সমাজের কোন কায়স্থের স্বীয়-পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, তাহাকে বিবাহের পূর্ব্বে রাজার অনুমতি লইতে হইত এবং রাজাকে রাজমধ্যস্থ নামে এক প্রকার

সম্মানার্হ কর দিতে হইত। অদ্যাপি গ্রাম্য ভূস্বামিগণ নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের নিকট হইতে সাদিয়ান শুভলভ্য* আদায় করিয়া থাকেন। অনেক কবুলিয়তে উক্ত সাদিয়ান দেওয়ার কথা লিখা হয়। চন্দ্রদ্বীপ-রাজের সামাজিক বিধি কেহ লঙ্ঘন করিলে খাসখাল নামিক নিম্নশ্রেণীর শূদ্রজাতীয় এক সম্প্রদায় উক্ত অপরাধীকে ধৃত করিয়া রাজ-সমীপে হাজির করিত এবং তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিতেন।

পত্র লিখিবার পাঠ

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি পত্র লিখিবার জন্য নিম্নলিখিত পাঠ ব্যবহারের আদেশ প্রদান করিতেন।

ব্রাহ্মণ—নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ।

কুলীন কায়স্থ-শ্রীঅমুক—সানুগ্রহ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে'।

নিম্ন শ্রেণী-রোক্কা বিশেষ।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ রাজাকে পত্রলিখিবার সময় 'আরদাস শ্রীঅমুক—নিবেদনঞ্চ বিশেষ,' এই পাঠে অত্র লিখিবার নিয়ম ছিল। কায়স্থগণ রাজসকাশে উপস্থিত হইলে কুর্ণিশ অর্থাৎ ললাটে হস্ত স্পর্শ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিতেন। এই সকল রীতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

(১০ম রাজা) কীর্ত্তিনারায়ণ, (১১শ রাজা) বাসুদেবনারায়ণ
বঙ্গাব্দ ১০৭৫-১০৯৫ সালের মধ্যবর্তী সময়।
(পর্টুগীজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা)

রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দৌহিত্র রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সময় সমরবিভাগের বিশেষ উন্নতি হয়। রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের সময় ইউরোপ হইতে দলে দলে পর্টুগীজ, ওলন্দাজ ও দীনেমারগণ (ডেন্মার্কবাসিগণ) বঙ্গদেশে আগমন করিতে লাগিলেন এবং সুবিধা পাইলেই তাঁহারা নানাস্থানে অত্যাচার করিতেন। রাজা রামচন্দ্রের সময়ের পর্টুগীজ সেনাপতি জনগেরী দশ সহস্রাধিক সেনা নিয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতি সুচতুর রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের সন্দেহ হওয়ায় জনগেরীকে তিনি বরখাস্ত করেন। ইহাতে জনগেরী তাঁহার সৈন্যসমূহ নিয়া ও অপর একদলসহ একত্রে চন্দ্রদ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব সীমানায় উৎপাত-উপদ্রব আরম্ভ করিতে থাকে। তখন মহাবীর কীর্ত্তিনারায়ণ আপন সুশিক্ষিত সেনাদলসহ উক্ত পর্টুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মেঘনা নদীর উপকূলে বর্ত্তমান মেহেন্দীগঞ্জ ষ্টেশনের অন্তর্গত সুলতানী, লারুয়া, বল্লভপুরের নিকটবর্ত্তী নদীতটে ও নদীমধ্যে ক্রমাগত তিন দিবস কীর্ত্তিনারায়ণ অমিততেজে সৈন্য চালনা করেন। বীরবর রামমোহন, রামেশ্বর, মদনসিং প্রভৃতি সৈন্যগণ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিয়া শত্রুসৈন্য ভস্মীভূত করিতেছিলেন। রণবাদ্য ও কামানের গুড়ুম গুড়ুম শব্দে তখন মেঘনা-উপকূল কম্পিত হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে তিন দিবস যুদ্ধের পর পর্টুগীজ দিগের বহু পরিমাণে বলক্ষয় হইলে তাঁহারা নিরস্ত্র হইয়া, কীর্ত্তিনারায়ণের সহিত সন্ধির প্রার্থী হন এবং 'তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপ সীমার ভিতরে আর থাকিতে পারিবেন না এবং অত্যাচার-উপদ্রব করিবেন না' এইরূপ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করায়, রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ আপন সৈন্যবলসহ চন্দ্রদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। যে স্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন,

* সাদিয়ান পারস্য শব্দ। ইহার বঙ্গানুবাদ বিবাহে ভূস্বামীর প্রাপ্য কর।

তাহাকে সংগ্রামপুর বলিত ; উক্ত স্থান এক্ষণ মেঘনা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। ঐ স্থানে বহিঃশত্রুর আক্রমণ রক্ষার্থ একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল; তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

রায়গড় দুর্গ নির্মাণ

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ জন্য কালীজিড়া নদীর পূর্ব্বপাড়ে নলছিটী নদীর সঙ্গমস্থলে জাগুয়াগ্রামের নিকট একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গটি মৃত্তিকানির্ম্মিত হইলেও আশ্চর্য্য কৌশলে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল ; উক্ত দুর্গের অধিকাংশই বর্ত্তমান আছে।

রায়পুর দুর্গ নির্মাণ

রাজা রামচন্দ্র কালীজিড়া নদীর পশ্চিমপাড়ে বর্ত্তমান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তার দক্ষিণে নলছিটী নদীর পাড়ে নিম্নে পাকা গাঁথনীর নির্ম্মিত একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ উহার পুনঃ সংস্কার সাধন করেন।*

কোটের দোনের গড়খাই

বরিশাল হইতে বাখরগঞ্জ যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার কাছে কোটের দোনের নিকট একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত গড়খাই আছে ; উহাও রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের আমলের নির্ম্মিত।

ঢাকার নবাবের সহিত মিত্রতা স্থাপন

ঢাকার নবাব কীর্ত্তিনারায়ণের বীর্য্যবত্তার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ঢাকায় আহ্বান করিয়া তৎসহ মিত্রতা স্থাপন করেন এবং আবশ্যক হইলে তাঁহার সাহায্য করিবেন, এমত অনুরোধ করেন। একদা নবাব একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধে কীর্ত্তিনারায়ণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। সেই যুদ্ধ অন্তে নবাব এবং কীর্ত্তিনারায়ণ এক তাবুর ভিতরে ছিলেন ; হঠাৎ নবাবের রন্ধনাগারের গন্ধ কীর্ত্তিনারায়ণের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। তিনি নাকে রুমাল দেওয়ায় নবাব তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তৎপর নবাব বলিলেন, "আপনাদের শাস্ত্রে আছে, 'ঘ্রাণে চার্দ্ধ ভোজনং' সুতরাং আপনার জাতি গিয়াছে।" এই কথায় কীর্ত্তিনারায়ণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বৈমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাসুদেবনারায়ণকে মন্ত্রাভিষিক্ত রাজা করিয়া নিজে রাজ্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রহিলেন। ফলতঃ বাসুদেব নারায়ণ নামমাত্র রাজা রহিলেন ; কীর্তিনারায়ণই কর্ত্তৃত্বাদি করিতেন। ইহার ঐ অবস্থার সময় রাজবাড়ির

* ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাহজাহানের পুত্র সুলতান সুজা বাঙ্গালার গভর্নর হইয়া এদেশে আগমন করেন। তাঁহার নামানুসারে উক্ত দুর্গের নির্ম্মিত স্থানকে সুজাবাদ রাখা হয় ; অদ্যাপি ঐ নাম প্রচলিত আছে। তিনি তাঁহার নাম ভবিষ্যৎ স্মরণার্থ রাখার জন্য ঝালকাঠীর পূর্বদিকে সুতালরীতে হিন্দু নির্ম্মিত অত্যুচ্চ দেউলের উপরে নিজ নাম অঙ্কিত করিয়া যান। উক্ত দেউলে পারস্য অক্ষরে 'সাসুজা' লিখিত আছে। সুজাবাদে চন্দ্রদ্বীপ রাজার আনীত বক্সারী হিন্দুস্থানী বহুতর সৈন্য স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়া বাস করিত। এইখানেই আসমান সিং ও রামদুর্গার লোমহর্ষণ ঘটনা হইয়া আসমান সিংহের ফাঁসী হইয়াছিল। হিন্দুস্থানী আসমান সিং ও তাঁহার স্ত্রী রামদুর্গার বিবরণ সম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক জনৈক মুসলমান লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া এ জিলার নানাস্থানে প্রচলিত আছে।

পশ্চিমমুখী বেড়ের পশ্চিমপাড় বাদলা নামক স্থানে নিজ ব্যয়ে মুসলমানদের ভজনার্থ একটি মসজিদ ও একটি দরগাখোলা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন। মাঠের মধ্যে উক্ত মসজিদটীর ভগ্নাবশেষ এক্ষণও বিদ্যমান আছে। বরিশাল হইতে বাণারিপাড়া যাইতে ডিস্ট্রিক্টবোর্ড রাস্তা হইতে উহা দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুষ্পাঠীর সাহায্য

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের সময় চন্দ্রদ্বীপের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষার উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। তাঁহার সময় এ জিলার নলচিড়া, উজিরপুর, শিকারপুর, রাকুদিয়া, রহমতপুর, মানপাশা, বৈচণ্ডী, হোসেনপুর, গৈলা, ফুল্লশ্রী, তারাকুপী, খলিশাকোঠা প্রভৃতি স্থানের টোলের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষা নলচিড়ার চতুষ্পাঠী সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এজন্য নলচিড়াকে নিম্ন নবদ্বীপ বলিত। অদ্যাপি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়াকালীন নলচিড়াবাসী পণ্ডিতগণকে অগ্রে বিদায় প্রদত্ত হইয়া থাকে।

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ সম্বন্ধে প্রাচীন কায়স্থ-কারিকা গ্রন্থাকার কী লিখিয়াছেন দেখুন—

"কীর্ত্তিনারায়ণো বীরো মহামানি তদঙ্গজঃ।
জগদেক শূরো সোহপি নৌ যুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ॥
মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গ সৈন্যকৈঃ সহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্ব্বান্ তাড়য়ৎ॥
জাহাঙ্গীর পুরাধীশো নবাব যবনস্ততঃ।
স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্দ্ধ তেন প্রযত্নতঃ॥"

দ্বাদশ নৃপতি প্রতাপনারায়ণ

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ ও বাসুদেবনারায়ণের লোকান্তরে বাসুদেবনারায়ণের পুত্র প্রতাপনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপনারায়ণের এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্রের নাম প্রেমনারায়ণ এবং কন্যার নাম বিমলা-সুন্দরী। প্রতাপনারায়ণ রায়ের জীবিতাবস্থাতেই রাজকুমার প্রেমনারায়ণের মৃত্যু হয়। রাজকুমারী বিমলার সহিত ঢাকা জিলার অন্তর্গত উলাইল গ্রাম নিবাসী গৌরীচরণ মিত্র মজুমদারের বিবাহ হইয়াছিল। প্রেমনারায়ণের মৃত্যুর সময় রাজা প্রতাপনারায়ণের দুইটি দৌহিত্র বর্ত্তমান ছিল। উহার জ্যেষ্ঠটির নাম উদয়নারায়ণ এবং কনিষ্ঠের নাম রাজনারায়ণ। প্রেমনারায়ণের মৃত্যু হইতেই চন্দ্রদ্বীপে বসুবংশের রাজত্ব শেষ হয়। রাজা প্রতাপনারায়ণ যাহাতে তাঁহার দৌহিত্রগণ রাজত্ব পাইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার বিশ্বস্ত দেওয়ান রহমতপুর নিবাসী রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে দিল্লীতে সনন্দ আনিতে প্রেরণ করেন। উক্ত দেওয়ান বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তিকার বিবিধ বিবরণে লিখিত হইল।

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি

রাজা প্রতাপ নারায়ণের সময় মাধবপাশার ও উজিরপুরের তন্তুবায়গণ অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণ করিত এবং উহা ঢাকার মসলিনের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিল। অদ্যাপি পূজার বাজারে এই

তন্তুবায়কূল বিস্তর সূক্ষ্ম বস্ত্র ও মশারির ছিট সর্ব্বসুন্দর প্রভৃতি নানা প্রকার রঙ্গীন কাপড় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করে। বরিশালবাসীর দুর্ভাগ্য, নচেৎ ইহারা এক্ষণও উৎসাহ পাইলে পূর্ব্ববৎ সূক্ষ্ম শিল্প প্রদর্শন করিতে পারে। রাজা বাসুদেবনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণের সময় এবং ইহাদের পরবর্তী রাজা উদয়নারায়ণের সময় ইহাদের প্রস্তুত কাপড়, ছিট প্রভৃতি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইত ; সুতরাং তৎকালীন ইহাদের প্রত্যেকের গৃহ ধন-ধান্যে পরিপূরিত ছিল।

ত্রয়োদশ নৃপতি রাজা উদয়নারায়ণ
(বঙ্গাব্দ ১১৩০-১১৭৫ সাল)

রাজা প্রতাপনারায়ণ জীবিত থাকিতেই তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ পরলোকগমন করায়, কন্যা বিমলার পুত্রদ্বয় উদয়নারায়ণ ও রাজনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। উক্ত উভয় ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ উদয়নারায়ণ অভিষিক্ত হইয়া রাজাসন গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ রাজমাতা নাম্নী একখানি বৃহৎ তালুকের স্বত্ব নিয়া মাধবপাশার উত্তরাংশে প্রতাপপুর নামক গ্রামে বসতি স্থান নির্দেশ করত তথায় বাস করিতে থাকেন। উক্ত রাজনারায়ণের বংশধরগণকে লোকে অদ্যাপি রাজা বলিয়া থাকে। রাজা উদয়নারায়ণ ও রাজা রাজনারায়ণের আদিপুরুষ কান্যকুজাগত কালিদাস হইতে সপ্তদশপুরুষ। নিম্নে তাহার একটি বংশপত্রিকা দেওয়া গেল :—

(১) কালিদাস মিত্র (২) গোট মিত্র (৩) বাহন মিত্র (৪) সৌরী মিত্র (৫) পাই মিত্র (৬) সুলোচন মিত্র (৭) ত্রৈলোক্য মিত্র (৮) সুপ্রসাদ মিত্র (৯) ভাস্কর মিত্র (১০) থাক মিত্র (১১) বিদ্যাধর মিত্র (১২) শিবানন্দ মিত্র (১৩) সানন্দ মিত্র, ইহার অন্য নাম শ্রীরাম খাঁ (১৪) বলরাম মিত্র (১৫) হরিনারায়ণ মিত্র (১৬) গৌরীচরণ মিত্র, ইহার দুই পুত্র—উদয়নারায়ণ রায় ও রাজনারায়ণ।

রাজা উদয়নারাযণ চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ভিন্ন ঢাকা জিলার অন্তর্গত পরগণে সুলতানপ্রতাপ, ইসপসাহি, নরুল্লাপুর ও অন্যান্য পরগণার জমিদার ছিলেন। সুলতানপ্রতাপ পরগণার জমিদারী ১২৪৮ সাল পর্য্যন্ত উদয়নারায়ণের বংশধরদের ছিল ; তৎপর উহা বাকী রাজস্বে নিলাম হইয়া যায়। রাজা উদয়নারায়ণের জন্মভূমি উলাইল গ্রাম ঢাকা জিলার বংশনদীর তটে অবস্থিত ছিল। বহুকাল অতীত হইল উক্ত উলাইল গ্রাম বংশ ও সাভারের নিকটস্থ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে এবং রাজার জ্ঞাতিগণ বর্ত্তমানে ঢাকা জিলার অন্তর্গত তেতুলাঝোরা, দৌলতপুর, জালালদী গ্রামে বাস করিতেছেন।

রাজা উদয়নারায়ণ রাজত্ব লাভ করিবার পর ঢাকার নবাব তাঁহার শ্যালক খাদি মজুমদার দ্বারা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন ; ইহাতে রাজা উদয়নারায়ণ খিদ্যমান হইয়া নবাব সমীপে গমন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নবাবের বিচিত্র মতি, তিনি বলিলেন "তুমি যদি এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রকে শিকার করিয়া অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পার, তাহা হইলে বুঝিব তুমি রাজ্যলাভের উপযুক্ত ব্যক্তি।" ইহা শুনিয়া উদয়নারায়ণ নবাব ও অপর বহুজন সমক্ষে সদ্য ধৃত এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করেন এবং ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া অক্ষত শরীরে আসিয়া নবাবের নিকট পুরস্কার প্রার্থনা করিলেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণের অনুমতি দিলেন।

রাজা উদয়নারায়ণ অত্যন্ত দানশীল নরপতি ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ব্রাহ্মণমাত্রেই তাঁহার প্রদত্ত ব্রহ্মত্র ভূমি আবহমানকাল ভোগ করিয়া

আসিতেছেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কালীন এবং প্রায় প্রত্যেক পুণ্যাহ তিথিতেই ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের সমগ্র রাজন্যবর্গ মধ্যে কেহই দানশীলতায় রাজা উদয়নারায়ণের সমকক্ষ নহেন ; তিনি দেব-দ্বিজে অসাধারণ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন।

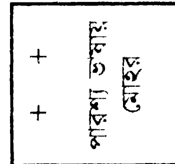
পাঁচখানি সনন্দের বিবরণ

রাজা আদিশূর কর্তৃক ৯৯৯ শকাব্দে* বঙ্গদেশে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণমধ্যে ছান্দর ঋষির আট পুত্রমধ্যে ধীর পূততুণ্ডের ধারায় একাদশ পুরুষে গোবর্দ্ধনাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। এই গোবর্দ্ধনাচার্য্য মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রদাতা গুরু ও পঞ্চরত্নের (পশুপতি, ধোয়ী, শরণ, গোবর্দ্ধন ও জয়দেব) একরত্ন ছিলেন। ১৪১৬ শকাব্দে এ জিলার ফুল্লশ্রীনিবাসী প্রাচীন কবি বিজয়গুপ্ত পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। ঐ সময় ফুল্লশ্রী মানসীর মনসাদেবীর প্রত্যক্ষের কথা বঙ্গদেশের বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্যের অধস্তন প্রপৌত্র চক্রপাণি পূততুণ্ড তাঁহার আটপুত্র মধ্যে ব্যাস, পুণ্ডরীকাক্ষ, ভূধর এই তিন পুত্র সহ ফুল্লশ্রীতে মনসার পূজা দিতে আসেন। তৎকালীন এতদ্দেশের নদীসমূহ ক্রমে চড়া পড়িয়া মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছিল। তাহাতে তিনি মনসাদেবীর প্রতি ভক্তিপ্রবণ হইয়া তাঁহার তিনটি পুত্রকে এদেশে রাখিয়া যান। তন্মধ্যে পুণ্ডরীকাক্ষ ও ভূধরের সন্ততিগণ এ জিলার শোলক, বামরাইল প্রভৃতি গ্রামে এবং ব্যাস পূততুণ্ড সন্ততিপরম্পরা রাকুদিয়া গ্রামে বাস করিতে থাকেন। উক্ত ব্যাসের অধস্তন একাদশ পুরুষে তিতুরাম নামান্তর রামরাম পূততুণ্ড আপন পরিবারস্থ লোকের সহিত কলহ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন উদ্দেশে পরিবারস্থ লোকদিগকে না বলিয়া নিশীথে গৃহত্যাগ করেন এবং হোসেনপুর আসিয়া সূর্যদেব চক্রবর্তীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সূর্যদেব চক্রবর্তী কৌশলে তাঁহার পরিচয়াদি গ্রহণ করিয়া রাকুদিয়া সংবাদ দেন এবং তাঁহার পিতা মহাদেব পূততুণ্ড তাঁহাকে আনয়ন জন্য হোসেনপুরে আগমন করেন; কিন্তু রামরাম কিছুতেই রাকুদিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে উক্ত সূর্য্যদেব চক্রবর্তীর একমাত্র দুহিতার পানিগ্রহণ করিয়া তিনি হোসেনপুরে বসতি করিতে থাকেন। বঙ্গাব্দ ১১৪৮ সনে তিনি বাকুদিয়া হইতে হোসেনপুর আগমন করেন। রামরাম পূতভুণ্ড জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, ইহার অন্য নাম ছিল তিতুরাম পূততুণ্ড, কিন্তু তিনি রামরাম নামেই সর্বত্র পরিচিত ছিলেন ; তিনি শ্বশুরের উপদেশানুসারে মধ্যে মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ-রাজ উদয়নারায়ণ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। রাজা তাঁহাকে ভাল জ্যোতির্ব্বিদ জানিয়া সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে কিছু ভূমি দান করিতে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। রামরাম পূততুণ্ড সহসা দান গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন ; পরে ১১৫৪ সালের ১২ই বৈশাখ তারিখে রামরামের শ্বশুর সূর্যদেব চক্রবর্তী রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রথম সনন্দ গ্রহণ করেন। তৎকালে রাজদরবার হইতে সনন্দখানি সূর্যদেব চক্রবর্ত্তী উপস্থিত গ্রহণকারী বিধায় তাঁহার নামে লিখিয়া দেওয়া হয় এবং রামরাম পূততুণ্ডের নাম সেরেস্তার কাগজে ব্রহ্মত্রদার বলিয়া লিখিয়া রাখা হয়। ইহার পরে রামরাম পূততুণ্ড রাজা উদয়নারায়ণের কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রকাশ করিলে রাজা অচিরাৎ তাহার প্রত্যক্ষতা

* শ্রীমদাদিশূরো নব নবত্যধিক নবশক্তি শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানয়ামাস।
ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্।

উপলব্ধি করিয়া রামরামকে ক্রমিক আরও চারিখানি সনন্দ প্রদান করেন। উহার একখানি ১১৬৬ সনের ২৭শে পৌষ এবং ১১৬৭ সনের ১৭ই পৌষ আপন পুত্র প্রাণকৃষ্ণ পূততুণ্ড নামে, আর একখানি ঐ সনের ২রা মাঘ নিজ নামে এবং অপর একখানি ১১৭১ সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ রামরামের দ্বিতীয় পুত্র সূর্যনারায়ণ নামে সনন্দ প্রাপ্ত হন। রামরামের গণনার দ্বারা রাজা যতবার প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিয়াছিলেন, ততবারই তাঁহাকে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। নিম্নে উহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

সনন্দ গ্রহীতার নাম	সনন্দের তারিখ	যে গ্রামে সম্পত্তি	বর্ত্তমান ঃ
(১) সূর্য্যদেব চক্রবর্ত্তী	১১৫৪ সাল ১২ই বৈশাখ	চড়াদী	বাখরগঞ্জ
(২) রাম রাম পূততুণ্ড	১১৬৬ সাল ২৭শে পৌষ	কৌখালী আদমপুর	বাউফল
(৩) প্রাণকৃষ্ণ পূততুণ্ড	১১৬৭ সাল ১৭ই পৌষ	কল্যাণদরকাঠী	ঝালকাঠি
(৪) রাম রাম পূততুণ্ড	১১৬৭ সাল ২রা মাঘ	রামচন্দ্রপুর	ঐ
(৫) সূর্য্যনারায়ণ পূততুণ্ড	১১৭১ সাল ২রা জ্যৈষ্ঠ	শিবশনকাঠী	ঐ



একখানি সনন্দের নমুনা

শ্রীশ্রী.....অস্পষ্ট

ইয়াদিকীদ্দ শরণ মঙ্গলালয় মহামহিম শ্রীযুক্ত রাজোদয়নারায়ণ মহাশয়াণাং শ্রীসূর্যদেব চক্রবর্তী সুচরিতেষু নমস্কারা কার্য্যঞ্চাগে পরগণে (অস্পষ্ট) গয়রহ সরকাবে বাকলায় শ্রীরাজোদয়নারায়ণ রায়ের ধর্মে চরাজদী জোয়ারে সোয়াকাণি জমি তোমারে ব্রহ্মত্র দিল। জমি আমল করিয়া দপ্তরে আপন নাম ব্রহ্মোত্তর লিখাইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিয়া আশীর্বাদ করিতে রহ। ইতি ১১৫৪ সাল, তারিখ ১২...খ

মোকাম শ্রীনগর হুকুম হুজুর।

চন্দ্রদ্বীপ রাজার দত্ত উপরোক্ত সনন্দগুলি উত্তরকালে ঢাকার কালেক্টরীতে রেজেষ্টারী করিতে এবং চিঠা দাখিল করিতে হইয়াছিল। ১২০৭ সনে ঐ চিঠা দাখিল করা হয়।

চিঠার উপর অংশ

শ্রী.....(অস্পষ্ট)।

নং ৫২

দফাওয়ারী লাখেরাজ বকয়েদ তফরিক থানা মিলানী...

(অস্পষ্ট) আদালত ফৌজদারী জিলে ঢাকা জালালপুর।

পর্টুগীজ জাতির অবস্থিতি

রাজা উদয়নারায়ণ রায়ের সময়ে তাঁহারই নির্দেশ অনুসারে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ মধ্যে অধিকাংশ লোক বর্ত্তমান সাহেবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী শিবপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় একটি ভজনালয় (গির্জ্জা) প্রতিষ্ঠিত করে। রাজার অনুগ্রহে ইহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। শিবপুরের ভজনালয় কালক্রমে গোয়া বান্দল প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাদ্রী আসিয়া উহার তত্ত্বাবধান করায়, উক্ত গ্রামের নাম পরিশেষে পাদ্রী শিবপুর হইয়াছে ; অদ্যাপি ঐ নামই বর্ত্তমান আছে। এখানে একটি পোষ্টাফিস ও একটি মাইনর স্কুল আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এ জাতীয় লোকের অবস্থা এক্ষণ খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে পূর্ব্বকালে ডোমিঙ্গ ডিছেলবা প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, উক্ত ডিছেলবা সাহেবের বাড়ি ধামাদ্বারা টাকা মাপ করা হইত। রামচন্দ্রপুর নিবাসী গুহ পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ জনৈক গুহ উক্ত ডিছেলবা সাহেবের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। উক্ত ডোমিঙ্গ ডিছেলবা সাহেবই শিবপুর ষ্টেট স্থাপয়িতা। বর্ত্তমানে ইহার বংশধরগণ ফিরিঙ্গী নামে অভিহিত ; ইহারা বাঙালির ন্যায় ধূতি চাদর পরিধান করে এবং অধিকাংশই বঙ্গভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। পুরাকালীয় পর্টুগীজ ফিরিঙ্গী সাহেবদের কারবার স্থান ছিল বলিয়াই, বাখরগঞ্জ থানার পূর্ব্বাংশ স্থান সাহেবগঞ্জ নামে অভিহিত হইয়াছে।

তালুক সৃজন

রাজা উদয়নারায়ণের সময় চন্দ্রদ্বীপ জমিদারীর অধিন তালুক সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। রাজা তাঁহার ভ্রাতা রাজনারায়ণ রায় নিমিত্ত 'রাজমাতা' নাম্নী এক তালুক সৃষ্টি করিয়া দেন। ইহা ব্যতীত মহল হিস্যাজাত ও মহল উজুহাত এই নামে দুইটি পৃথক সম্পত্তি সৃজন করিয়া ইহাও ভ্রাতা রাজনারায়ণকে অর্পণ করেন ; এই তিনটি একত্র করিলে উহাও এক বৃহৎ জমিদারী সদৃশ ছিল। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী, রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী, রূপনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রাজারাম সেন, কৃষ্ণরাম সেন, রাধাকান্ত সেন কাশীনাথ বসু, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি নামে বহুতর তালুক সৃষ্টি হইয়া জমিদারীর আয় অধিক পরিমাণে কমিয়া যায়। এ জিলায় যত তালুকদার আছেন, সকলের মূলেই চন্দ্রদ্বীপের রাজার সম্পত্তি।

প্যাদা, পাইক নামে তালুক সৃজন

বর্ত্তমানে মাহাম্মদ হায়াত, নরুল্লা, খয়রুল্লা, সোনা উল্লা, ক্রোশ মাহাম্মদ প্রভৃতি তালুকগুলি প্যাদা, মৃধা ও পাইক প্রভৃতির নামে সৃষ্টি হইয়াছিল ; ইহার কোন কোন তালুকের আয় বার্ষিক পাঁচ সহস্রের উপরে হইবে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় উক্ত তালুকগুলির তৎকালীন দখিলকারগণ গভর্ণমেন্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া নিয়াছেন এবং এ জিলার বহু ভদ্র পরিবার উক্ত তালুকগুলি আয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

জিম্বা তালুক সৃজন

রাজার রাজসরকারি খাজনা আদায়ের জন্য মফস্বলে যে সকল তহশীলদার ছিল, তাহাদের অধিকাংশ কর্ম্মচারী বাজবাড়ি নামমাত্র কর লিখাইয়া এক একটি মহল জিম্বা নিত। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত মহলের প্রজাগণ হইতে যে কিছু রাজস্ব আদায় উসুল হইত, তাহা আদায়কারী

গোমস্তাগণ নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করিতেন এবং রাজাকে নামমাত্র কর দিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন। এইরূপ জিম্বা তালুকের নাম যথা—মাহাম্মদ আজিম, সোনারাম সেন, রামবল্লভ, রত্নেশ্বর দাস প্রভৃতি। জিম্বা তালুকগুলি কালক্রমে চন্দ্রদ্বীপ পরগণার তৌজী বন্দোবস্তের পরে নানা তৌজীর অধীন হইয়া রহিয়াছে।

উক্তরূপ তালুক ও জিম্বা তালুকদ্বারা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের কী পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। বোধহয় উক্ত তালুক ও জিম্বা তালুকগুলি যদি শেষকালেও রাজা তাঁহার নিজ আয়ত্তাধীন রাখিতেন, তবে বর্ত্তমানে তাঁহাদের বংশধরগণ পর-মুখাপেক্ষী হইতেন না।

নথুল্লাবাদ কালী স্থাপন

বর্ত্তমানে বরিশাল হইতে মাধবপাশা যাইতে যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তা আছে, উহার দুই মাইলের নিকট একটি পাকা ইটের পোল আছে। ঐ স্থানকে নথুল্লাবাদ বলে। ঐ স্থানে বর্ত্তমানে যে খালের উপর পোল আছে, রাজা উদয়নারায়ণের সময় উহা একটি ছোট নদী ছিল। ঐ স্থানে একখানি হাট ছিল, তথায় সপ্তাহে দুইদিন হাট বসিত। প্রাচীন দলিলাদিতে উক্ত স্থানের সীমানায় নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা উদয়নারায়ণের সময় নদীর পাড়ে বাজার এবং কাছারী বাড়ি ছিল এবং তৎকালীন নথুল্লাবাদ অত্যন্ত সমুন্নত স্থান ছিল; নিকটবর্ত্তী অনেক প্রজার বিচারাদি নথুল্লাবাদ কাছারীতে সম্পন্ন হইত।

রাজা উদয়নারায়ণ রায় এই কাছারীবাড়িতে ধুমধামের সহিত কালীমূর্তি স্থাপন করেন এবং বার্ষিক তিন শত টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে ঢাকা—ঢাকেশ্বরী কালীবাড়ির সন্ন্যাসী স্বর্গীয় কালীচরণ গিরি গোস্বামীর সহিত কাশীপুরের এক শূদ্র পরিবারের দেওয়ানী মোকদ্দমা হইয়াছিল। উক্ত মোকদ্দমায় হাইকোর্ট পর্যন্ত আপীল হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীর ভাগ্য কিছুতেই প্রসন্ন হয় নাই। উক্ত শূদ্র পরিবারই উহার সেবাইত বলিয়া হাইকোর্ট নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন।

কাশীপুরে মহামায়া বিগ্রহ স্থাপন

কাশীপুরে কাঠগড় পল্লীতে যেস্থানে সিপাহীদের গড় ছিল, তথায় রাজা উদয়নারায়ণের সময় একটি পুষ্করিণী খননকালে মহামায়া নাম্নী বিগ্রহের একখানি প্রতিমূর্তি পাওয়া যায়। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, রাজা উদয়নারায়ণ মহামায়া কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং স্বয়ং সপরিষদ্ কাঠগড় পল্লীতে আসিয়া উক্ত মূর্তি মাধবপাশা নেওয়ার জন্য ইচ্ছা করেন। দ্বিতীয়বার স্বপ্নাদেশ হইল যে, উক্ত মূর্তিকে ঐ স্থানেই স্থাপন করিতে হইবে। তদনুসারে রাজা যথাশাস্ত্রমতে ঐ মূর্তি স্থাপন করিয়া যান। উক্ত মহামায়া দেবীর পূজা অর্চ্চনার জন্য তিনি বার্ষিক ৩০০ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করেন। কাঠগড় অধিবাসী মাঙ্গু তেওয়ারী নামিক জনৈক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ উহার সেবাইতে নিযুক্ত হন। উক্ত তেওয়ারীর লোকান্তরে তাঁহার সহধর্মিণী আদরমণি দেবী রামানন্দ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক সংসার বিমুখ ব্যক্তির প্রতি মহামায়ার অর্চ্চনার ভার অর্পণ করেন। উক্ত ব্রহ্মচারী ও আদরমণি দেব্যার উইল অনুসারে কাশীপুর—চহুতপুর পল্লীস্থ পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় নামিক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং কানু সিংহ নামিক জনৈক ব্যক্তি সেবাইত নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে কানু সিংহের অংশ রামচন্দ্রপুরের গুহ পরিবারস্থ বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী খরিদ করিয়া মহামায়ার পূজা অর্চনার বন্দোবস্ত

করিয়া দিয়াছেন। প্রতি বৎসর মাঘী সপ্তমীর দিন এইখানে মেলা হয় এবং ঐদিন নানাস্থান হইতে বহু লোক তথায় আগমন করিয়া থাকে।

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী

রাজা উদয়নারায়ণের সময় মাধবপাশা রাজধানীতে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামে একজন ব্রাহ্মণ ভাণ্ডার-রক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন ; তৎকালীন এই পদকে 'ভারার কাইত' বলা হইত। একদা উক্ত শঙ্কর চক্রবর্ত্তী সস্ত্রীক গঙ্গাসাগর তীর্থে গিয়া সমুদ্রগর্ভে বিরূপাক্ষ নামে এক পাষাণময় শিবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। শঙ্কর অত্যন্ত নিরীহ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাশীপুর-চহুতপুর পল্লীতে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি দেশে আসিয়া নিজ বাড়িতেই বিরূপাক্ষ দেবকে স্থাপন করেন। রাজা উদয়নারায়ণ এই বিগ্রহের সেবার জন্য বিস্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন। কালক্রমে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বংশে ভোলানাথ ব্রহ্মচারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া বিরূপাক্ষ দেবের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি কাশীপুর নিবাসী ডাক্তার আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও চেষ্টায় এই বিগ্রহের জন্য একটি ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয় ময়মনসিংহ জিলার আঠারবাড়িয়ার জমিদার শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী চৌধুরাণী দিয়াছেন।

রাজ কর্ম্মচারী সীতারাম বসু

রাজা উদয়নারায়ণের সময় ১১৬০ সনে নলছিটা স্টেশনাধীন ফুলহরি গ্রামের শ্রীবল্লভ বসুর বংশধর রঘুরাম বসু কাশীপুরে আগমন করেন। তাঁহার চাবি পুত্র—সীতারাম, কাশীনাথ, নন্দকিশোর ও দেবীপ্রসাদ। উক্ত চারিপুত্রের মধ্যে সীতারাম বসু তৎকালে বিদ্যাবুদ্ধিতে বিশেষ প্রখ্যাত ছিলেন ; তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ তাঁহাকে বিচক্ষণ ব্যক্তি জানিয়া রাজসরকারে প্রধান কার্য্যকারকের পদে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে রাজার অনুগ্রহে উক্ত সীতারাম বসু নিজ আবাসভবন কাশীপুরে প্রকাণ্ড দীঘি খনন ও ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া বাড়ির সৌষ্ঠব সম্পন্ন করেন ; ইহাদের বাড়িতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। কাশীপুরে সীতারাম বসু দীঘির ন্যায় এত বড় প্রশস্ত জলাশয় আর নাই। চন্দ্রদ্বীপরাজের অনুগ্রহে ইহারা যে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে দুইটি প্রকাণ্ড খারিজা তালুক। বাখরগঞ্জ কালেক্টরীতে উহার তৌজি নং ১৭৩৫ ও ১৭৫০ বটে।

চতুর্দশ নৃপতি রাজা শিবনারায়ণ রায়
(বঙ্গাব্দ ১১৭৩-১১৮৪ সাল)

রাজা উদয়নারায়ণের লোকান্তরে তৎপুত্র রাজা শিবনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময় চন্দ্রদ্বীপের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। এই রাজা পৈতৃক উত্তরাধিকারী সূত্রে ঢাকা জিলাস্থ সুলতান প্রতাপ পরগণার এক ষষ্ঠাংশের অধিপতি ছিলেন। তিনি রামগোপাল দালাল নামক এক ব্যক্তিকে ঐ পরগণার সমুদয় অংশ আপনার বলিয়া ইজারা-স্বত্ব লিখিয়া দেন।

উলাইল নিবাসী দেবীপ্রসাদ মিত্র মজুমদার এই রাজার বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর নগরে (বর্ত্তমান ঢাকায়) দেওয়ানী আদালতে এক নালিশ উত্থাপন করেন। তাহাতে উক্ত

ইজারাদার ও দেবীপ্রসাদ মিত্র মজুমদার প্রভৃতি রাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা গঙ্গাপ্রসাদকে সালিস মান্য করেন। পরে সালিসের সাক্ষাতে ইজারাদার রামগোপাল দালাল ইজারা ইস্তাফা করিয়া দিলে উক্ত জমিদারী ছয় অংশীদারের হস্তে পূর্ববৎ প্রত্যাগত হয়। সেই মোকদ্দমায় বিচারের রায় পার্শি ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। উক্ত রায়ের তারিখ ২২শে অগ্রহায়ণ ১১৭৯ সাল; ইংরেজি ২রা ডিসেম্বর, ১৭৭২। জজদিগের নাম মি. এন. গ্লোভার ও রায় হরিরাম মল্লিক; মোহর শাহ্ আলম বাদশাহের এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির। এই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাহ আলম বাদশাহের নিকট হইতে বঙ্গদেশর দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়া তাহার কার্যারম্ভ করিয়াছিলেন।

রাজা শিবনারায়ণ সোজা প্রকৃতির লোক ছিলেন, এ জন্য লোকে তাঁহাকে পাগল রাজা বলিত। তিনি এই জিলার নথুল্লাবাদ গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বসুবংশসম্ভূত রাজবল্লভ রায়ের কন্যাকে বিবাহ্ করিয়াছিলেন। এই রাণী লোকের নিকট 'কালারাণী বলিয়া' পরিচিতা ছিলেন।

পঞ্চদশ নৃপতি রাজা জয়নারায়ণ রায়
(বঙ্গাব্দ ১১৮৫-১২২০ সাল)

রাজা জয়নারায়ণ যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন রাজা শিবনারায়ণের মৃত্যু হয়। এজন্য জয়নারায়ণকে দুর্গাক্রোড়নারায়ণও বলা হইত। বর্ত্তমান রহমতপুর নিবাসী রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বংশধর রামজীবন চক্রবর্ত্তী রাজা শিবনারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর তিনি সনন্দ আনিতে যথাক্রমে দীল্লি ও ঢাকা গমন করেন। তৎকালীন বাংলার সুবাদার, রামজীবন চক্রবর্ত্তীর প্রতিভা দৃষ্টে প্রীত হইয়া তাঁহার নিজ নামে সনন্দ আনিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তদ্রূপ নিজ নামে আনিলে সমাজে তিনি নিন্দনীয় হইবেন এই ভয়ে ধর্ম-ভীরু রামজীবন নিজ নামে সনন্দ আনিতে অস্বীকার করেন। তিনি সুবাদারকে জানাইলেন যে, রাণী দুর্গাবতী অন্তসত্ত্বা আছেন, ভগবৎ কৃপায় তিনি অচিরাৎ পুত্ররত্ন লাভ করিতে পারেন : সুতরাং উক্ত সনন্দখানি 'দুর্গাক্রোড়নারায়ণ রায়' নামে লিখিয়া দেওয়া হউক। সুবাদার বিশ্বস্ত দেওয়ান রামজীবনের উপদেশ মতে ঐরূপ নাম লিখিয়া চন্দ্রদ্বীপ জমিদারীর সনন্দ প্রদান করিলেন। রামজীবন সনন্দসহ মাধবপাশায় প্রত্যাবর্ত্তন করার কিছুদিন পরে রাজকুমার জয়নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু রাজকুমারের ভাগ্যে এহেন দেওয়ানের কার্য্য দেখা হইল না। যেহেতু অল্পদিন পরেই রামজীবন চক্রবর্ত্তী ক্ষয়কাশ রোগে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রামজীবনের পুত্র চন্দ্রশেখর। ইহারা রাজসরকার হইতে যে ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা উত্তরকালে ১৭২৯ নং খারিজা তালুক চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে অদ্যাপি বিখ্যাত আছে। উহার বিস্তৃত বিবরণ 'বিবিধ বিবরণ' অধ্যায়ে লিখিত হইবে।

শঙ্কর বক্সী

রাজা শিবনারায়ণের বিশ্বস্ত দেওয়ান রামজীবন চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পর নাবালক জয়নারায়ণের শৈশবাবস্থায় বর্ত্তমান গৌরনদী স্টেশনাধীন নলচিড়া নিবাসী বৈদ্যবংশসম্ভূত শিবশঙ্কর দাশ বক্সী প্রধান বক্সীর পদ হইতে দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। সাত বৎসরকাল তিনি উক্ত দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি নাবালক রাজা ও রাণী দুর্গাবতীর অজ্ঞাতসারে বহুতর ভূসম্পত্তি কৌশলে হস্তগত করেন। রাণী দুর্গাবতী ইহা জানিতে পারিয়া

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্যে উহার অধিকাংশ উদ্ধার করেন। অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহাও শিবশঙ্করের আত্মীয় শিবচন্দ্র দাশগুপ্ত নামে বিনামী করিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বরিশাল কালেক্টরীর তৌজি ১৭৬২ নং তালুক শিবচন্দ্র দাশই শিবশঙ্কর বক্সীর সেই সম্পত্তি। এই তালুকের বার্ষিক স্থিত অন্যূন ৬০,০০০ হাজার টাকা। কালক্রমে শিবশঙ্করের সেই পাপার্জিত সম্পত্তি তাঁহার বংশধরের ভোগে লাগিল না ; উহা বাকী রাজস্বদায় নীলাম হইলে লাখুটিয়ার স্বনামখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় রামচন্দ্র রায় চৌধুরী নীলাম খরিদ করেন। পরে তিনি ইহার অর্দ্ধাংশ জিলা ফরিদপুর নিবাসী সাহা জাতীয় গঙ্গানারায়ণ চৌধুরীকে দিয়া উহার সরিক করেন। অদ্যাপি অর্দ্ধাংশ হিসাবে উক্ত সম্পত্তি উভয় ষ্টেটের মালিকগণ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে নলচিড়া গ্রামে শঙ্কর বক্সীর বাড়িখানি জঙ্গলাবৃত থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দুর্গাসাগর খনন

রাণী দুর্গাবতী কতিপয় রাজকর্ম্মচারীর মন্ত্রণায় রাজবাড়ির পূর্বদিকে অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। ইহা এত প্রকাণ্ড যে, তিন দ্রোণ তের কাণি অর্থাৎ পাকা ৬১ কাণি জমি নিয়া এই দীর্ঘিকা খনন করা হয়। ইহার চারিপাড়ে চারিটি গ্রাম অবস্থিত আছে—পশ্চিমপাড়ে মাধবপাশা, উত্তর পাড়ে পাংশা, দক্ষিণপাড়ে শোলনা ও ফুলতলা এবং পূর্বপাড়ে কলাডেমা গ্রাম অবস্থিত আছে। ইংরেজি ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে, বঙ্গাব্দ ১১৮৭ সালে উক্ত দীঘি খনিত হয়। রাণী দুর্গাবতীর নামানুসারে উক্ত দীঘি দুর্গাসাগর নামে বিখ্যাত আছে। বরিশাল জিলায় এত বড় প্রকাণ্ড দীঘি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই দুর্গাসাগরের পশ্চিমপাড়ে একখানি ইষ্টক নির্ম্মিত বড় পাকা ঘাট আছে। কতকাল গিয়াছে এক্ষণও চতুর্দিকের পাড়গুলি যেন এক একটা ক্ষুদ্রতম পাহাড়ের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দুর্গাসাগর উৎসর্গ

১১৮৮ সালে দুর্গাসাগর উৎসর্গ করা হয়। এই উৎসর্গ উপলক্ষে চন্দ্রদ্বীপের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বিক্রমপুর পরগণা ও বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতগণ এবং মিথিলা ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের দ্রাবিব, কর্ণাট, পশ্চিমবঙ্গের পূর্বস্থলী, ভাটপাড়া ও নবদ্বীপ, কাশী, আগ্রা প্রভৃতি প্রায় সমগ্র ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়া মাধবপাশা রাজধানীতে আগমন করেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর আগমনে ও অন্যান্য দেশীয় ঘটক, স্বর্ণমাত্য, সন্নামত, কুলীন, কুলজ ও ভট্ট প্রভৃতির আগমনে তৎকালীন রাজধানী অপূর্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল ; এরূপ দৃশ্য রাজবাড়িতে আর কখনও ঘটে নাই। বিধাতার ইচ্ছা খণ্ডিবার নহে, হঠাৎ রাজ-পরিবারের কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয় ; তাহাতে রাজা রাজনারায়ণের অশৌচ হইয়া উহা একমাস কাল পালন করিতে হয়। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সকল লোকসমূহ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেশে গিয়া পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। যেহেতু বর্ত্তমানকালের ন্যায় তৎকালে এতদ্দেশে কোন রেল স্টিমারের বন্দোবস্ত ছিল না; সুতরাং নাবালক রাজা মহাবিপদে পড়িলেন এবং বাধ্য হইয়া সমস্ত লোকজনকে মাসাধিককাল যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া আহার ও বাসস্থান প্রদান করিলেন। অবশেষে নূতন পুণ্যাহ তিথিতে উৎসর্গ কার্য্য সমাধা করিতে হইয়াছিল এবং পণ্ডিতগণ একমাস কাল চন্দ্রদ্বীপে থাকিয়া উপযুক্ত বিদায় প্রাপ্তে সকলে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত

দুর্গাসাগর খনন ও উহার উৎসর্গ কার্য্যে তৎকালীন তিন লক্ষ টাকার উপর ব্যয় হয় এবং ইহাতে সরকারী ধনাগার প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। বিশেষ তৎকালে রাজকর্মচারীগণের বিশ্বাসঘাতকতায় আয়ের পথ একেবারে কমিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং চন্দ্রদ্বীপের সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইতে চলিয়াছিল।

দুর্গাসাগরে বহুদিন যাবৎ ধাপ হইয়া নিবিড় জঙ্গলে আবৃত হইয়াছিল। বরিশাল ডিস্ট্রিক্টবোর্ড ১২০০ শত টাকা ব্যয় করিয়া উক্ত ধাপ কাটিয়া দীঘিটি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। দুর্গাসাগরে বড় বড় মৎস্য আছে, উহা এক একটি ছোট কুম্ভীরের মত।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা জয়নারায়ণের রাজত্বকালে মহানুভব লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ইংরেজি ১৭৯০ সনে এবং বাঙ্গলা ১১৯৭ সালে প্রথম জমিদারী বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করেন। তৎপর ১৭৯৩ সালের ১লা মে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১শে বৈশাখ তারিখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক ১৭৯৩ সালের ১ আইন জারী করেন। উক্ত বন্দোবস্ত আরম্ভ হওয়ার পর হইতে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য হইতে কোটালীপাড়া, ইদিলপুর, সুলতানাবাদ, আজিমপুর, বোজরোগ উমেদপুর, নাজিরপুর, প্রভৃতি নামিক ৩৯টি পরগণা সৃষ্টি হইয়া ঐ পরগণাগুলি বাহির হইয়া যায় এবং লর্ড কর্নওয়ালিস বিভিন্ন মালিকগণের সহিত তাহার বন্দোবস্ত করেন। রাজা শিবনারায়ণের মৃত্যুকালে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে পনর লক্ষ টাকা আয় ছিল। তৎপর সমস্ত পরগণা বাহির হইয়া গেলে চন্দ্রদ্বীপের জমিদারীতে যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার জমিদারীতে ৮২৫৬২৪৯৪॥ পাই এবং তদাধীন ৭৩ খানা তালুকে ৫৮১০৪॥৯৮॥ পাই, একজাই সম্পত্তিতে ১৪০৬৬৭॥ ১ পাই রাজস্ব ধার্য্যে লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজা জয়নারায়ণের সহিত জমিদারী বন্দোবস্ত করিলেন। তৎকালীন নাবালক রাজার যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহার অধিকাংশই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত এবং বিশ্বাসবিহীন ছি। পরগণাগুলি বাহির হইয়া যাওয়ার সময়ে রাজার পক্ষ হইয়া কেহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নিকট দরবার করিবে এমন লোক ছিল না, সকল কর্ম্মচারী আপন আপন উদর পূর্ণ করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল ; সুতরাং নানা কারণে চন্দ্রদ্বীপের গৌরব-রবি ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতে লাগিল।*

চন্দ্রদ্বীপ নিলাম

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিলামের আইন জারী করিলেন। নিলামের ভয়ে খাজনা মাথায় লইয়া অবধারিত দিবসের পূর্ব্বে প্রাণপণে কালেক্টর সাহেবের হস্তে অর্পণ করা তখন এ দেশীয় লোকদিগের নিতান্ত অনভ্যস্ত ছিল। বিশেষত তৎকালীন রাজার বিশ্বাসবিহীন কর্মচারিগণ অতি অধার্ম্মিক ও দুষ্টাশয় ছিল ; সুতরাং রাজার সরকারি খাজনা বাকী পড়িতে লাগিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এইভাবে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, যে জমিদারীর রাজস্ব যত পরিমাণ বাকী পড়িবে সেই পরিমাণের টাকা ঐ বাকীপড়া বিত্তের যতখানি অংশ বিক্রয় করিলে উঠিতে পারে তাহাই প্রথম বিক্রয় হইবে, অল্প বাকীর জন্য ষোল আনা জমিদারী বিক্রয় হইত না। তদনুসারে ১২০০ সালের শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপের ১৭। ক্রান্তি সর্বপ্রথমে ঢাকা কালেক্টরীতে নীলাম হয়; তৎকালীন বাখরগঞ্জ জিলার সৃষ্টি হয় নাই। এই প্রদেশ ঢাকার কালেক্টরীর অধীন ছিল। উক্ত অংশ নিলামে উঠিলে বর্ত্তমান বরিশালস্থ জমিদারবাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্মণের পূর্ববর্ত্তী তৎকালীন ঢাকা সহরনিবাসী বাবু দলসিংহ বর্ম্মণ উহা ক্রয়

* [illegible] সময় লাখেরাজ খানাবাড়ীর সৃষ্টি হয়, তাহা বর্ত্তমান সেটেলমেন্টে ১৭ বি. [illegible] রাজ খান[illegible] রেকর্ড হইয়াছে।

করেন। পুনরায় ১২০২ সালে আবার ৯১২॥ গণ্ডা অংশ ঐ ভাবে নীলাম হইলে ঢাকা শহরবাসী মি. জন্ পেনেটি সাহেব তাহা ক্রয় করেন। ১২০৪ সালে উহার রকম ৯১৭॥ গণ্ডা অংশ নীলাম হইলে তাহাও উক্ত পেনেটি সাহেব ক্রয় করেন। রাজার মাতুল প্রভৃতি নৈকট্য আত্মীয়গণ তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি রাজস্ব দেওয়ার ভার ছিল ; তাঁহাদের প্রবঞ্চনাতেই রাজার ঐ সকল জমিদারী বিক্রীত হইয়া যায়। রাজা খাজনা দাখিল জন্য যে সকল টাকা ঐ সকল কর্ম্মচারীকে দিতেন, তাঁহারা কালেক্টরিতে উক্ত টাকা জমা না দিয়া আপনারা বিভাগ করিয়া লইতেন। তাঁহারা নাবালক রাজা ও রাজমাতাকে বুঝাইতেন যে, তাঁহাদের কোন চিন্তা করিবার কারণ নাই।

উল্লিখিত অংশ সকল বিক্রীত হইয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ঐ কারণে একেবারে বিক্রয় হইয়া গেল। ১২০৬ সালে অবশিষ্ট ॥১২॥ ক্রান্তি অংশ একেবারে নীলাম হইলে রাজবাড়ির দরজার বাজারের রামমাণিক্য মুদী উহা নীলাম খরিদ করেন। তৎপর রামমাণিক্যের ভ্রাতা রামমাধব মুদী উহার আনি অংশ মাত্র রাখিয়া। ১২॥ ক্রান্তি অংশ রাজাকে দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু রাজা তাঁহার দুষ্টাশয় কর্মচারিগণের পরামর্শে তাহাতে অসম্মত হইলেন। রাজার আত্মীয় ও কর্মচারিগণ রাজা ও রাজমাতাকে বুঝাইলেন যে, মুদির সহিত সরিকী করা অপমানজনক। বিশেষ মুদী যে টাকার দ্বারা নীলাম খরিদ করিয়াছে, ঐ টাকাও রাজভাণ্ডারের টাকা, মুদী যাহা রাখিবে তাহাই সে অন্যায় মতে রাখিবে।

অবশেষে রাজা জয়নারায়ণ রামমাণিক্য মুদীর নামে ঢাকার সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ উত্থাপন করিয়া ডিক্রীপ্রাপ্ত হন ; কিন্তু মুদীর পক্ষ সুপ্রীমকোর্টে উহার আপীল করিলে, নিম্ন আদালতের হুকুম রহিত হয়। পরে রাজা জয়নারায়ণ বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করেন। ইতোমধ্যে রাণী দুর্গাবতীর মৃত্যু হয় ; শোকে ও দুঃখে তিনি অচিরকাল মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হন।

রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর সময় তৎপুত্র নৃসিংহনারায়ণ নাবালক ছিলেন। রাণী করুণাময়ী এই অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুপুত্র লইয়া মহাবিপদে পতিত হইলেন ; তখন অনন্যোপায় হইয়া হোসেনপুর হইতে বৃদ্ধ কর্ম্মচারী গঙ্গাগোবিন্দ বক্সী মহাশয়কে আনিয়া প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত করিলেন। রাজা জয়নারায়ণ রামমাণিক্যের নামে ঢাকার সদর দেওয়ানী আদালতে যে মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; তাহা এই—রাজা জয়নারায়ণের পক্ষ হইতে নীলামের অব্যবহিত পরেই বলা হইল যে, রামমানি[illegible] রাজার বিনামদার মাত্র ; সুতরাং তিনি সর্বজন সমক্ষে রামমাণিক্যকে উক্ত বেনামী খরিদ সম্বন্ধে মুক্তিপত্র রেজিষ্টারী করিয়া দিতে বলেন—তাহাতে কয়েকদিন বাদানুবাদের পর রামমাণিক্য মুক্তিপত্র রেজিষ্টারী করিয়া দিতে স্বীকার হইলে, রাজার প্রধান কর্ম্মচারী রাম মাণিক্যকে সহ ঢাকা সদরে গিয়া উক্ত মুক্তিপত্র রেজিষ্টারী করেন এবং উক্ত রেজিষ্টারীর পর রামমাণিক্য মাধবপাশা আসিয়া কুচক্রী লোকের পরামর্শে উক্ত রেজিষ্টারী করা অস্বীকার করিয়া পুনরায় স্বনামা খরিদ বলিয়া দাবী করেন ; তাহাতে রাজা জয়নারায়ণ বাধ্য হইয়া ঢাকার সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত মুক্তিপত্র ১৭৯৯ সালে ঢাকা সদরে রেজিষ্টারী হইয়াছিল। তৎকালীন বর্ত্তমান সাহেবগঞ্জের নিকট বাখরগঞ্জেও একটি রেজিষ্টারী অফিস ছিল ; ইহাতে রামমাণিক্যের পক্ষে উক্ত মোকদ্দমায় এইভাবে উত্তরদায়ক হন যে, মাধবপাশার নিকটবর্ত্তী বাখরগঞ্জে রেজিষ্টারী অফিস থাকিতে দূরবর্ত্তী ঢাকায় গিয়া দলিল রেজিষ্টারী করার কোন প্রয়োজন ছিল

না ; সুতরাং উহা কৃত্রিম। ঢাকার দেওয়ানী আদালত এই বর্ণনার কোন সারবত্তা উপলব্ধি না করিয়া রাজার স্বপক্ষে মোকদ্দমা ডিক্রী দেন ; কিন্তু কলিকাতার সুপ্রিমকোর্ট রামমাণিক্যকে উপরোক্ত অজুহাতকে ঠিক মনে করিয়া মুক্তিপত্রখানি সন্দিগ্ধ মনে করিয়া রাজার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। অতঃপর রাজা জয়নারায়ণ অনতিকাল মধ্যে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভিকাউন্সীলে আপীল দায়ের করেন।

রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর রাণী করুণাময়ী নাবালক পুত্র নিয়া যেরূপ বিপদে পড়িলেন, তাহাতে তিনি প্রিভিকাউন্সিলের আপীলের কোন সংবাদাদি নিতে পারিলেন না ; বিশেষ তৎকালে প্রিভিকাউন্সিলের আপীলগুলি অন্যূন তিন চারি বৎসরের কম নিষ্পত্তি হইত না। বিপক্ষদল হইতে কুচক্রীরা এইরূপ জনরব তুলিলেন যে, রাজা প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে পরাজিত হইয়া অনর্থক খরচার দায়ী হইয়াছেন। এই জনরবের অল্পদিন পরেই বিলাত হইতে সংবাদ আসিল, রাজা মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন এবং বিনামী খরিদা স্বত্বই সাব্যস্ত হইয়াছে। বিপক্ষ দল এই সংবাদ প্রথম অবগত হইল এবং রাজবাড়ি সংবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই চতুরতাক্রমে নিষ্পত্তির কথা তুলিলেন। এদিকে রাণী করুণাময়ী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজাকে কর্মচারিগণ এইভাবে বুঝাইলেন যে, "সর্ব্বস্ব যাওয়া অপেক্ষা বরং কিছু সম্পত্তি নিয়া থাকাও ভাল।" সুতরাং নিষ্পত্তির প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়া অচিরে ছোলেনামা দাখিল করা সাব্যস্ত হইল : উক্ত নিষ্পত্তির মর্ম্মমতে রামমাণিক্য ॥১২॥ ক্রান্তি জমিদারী হইতে রাজার দুই স্ত্রী, রাণী রাজেশ্বরী ও রাণী অন্নপূর্ণার নামে দুইখানি তালুক লিখিয়া দিলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে ছোলেনামা দাখিল করা হইল। উক্ত ছোলেনামা দাখিলের অব্যবহিত পরেই বিলাত আপীলের সংবাদ রাজার নিকট ঘোষণা করা হইল। রাজপরিবার এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র শিরে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাজা নৃসিংহনারায়ণের মৃত্যু

রাজা নৃসিংহনারায়ণ দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন এবং অল্প বয়স্ক হইলেও সর্বদাই নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতেন ; তাঁহার মাতৃ আদেশে অল্প বয়সেই তিনি ক্রমিক দুইটি বিবাহ করেন ; উহার এক স্ত্রীর নাম ছিল রাণী অন্নপূর্ণা এবং অপর স্ত্রীর নাম ছিল রাণী রাজেশ্বরী। বিলাতের আপীলের সংবাদ শ্রবণ এবং কুচক্রীদিগের চক্রান্তে সম্পত্তি উর্দ্ধতন বিচার আদালতে পাইয়াও তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি কারণে নৃসিংহনারায়ণ অতিরিক্ত চিন্তায় ক্রমে শয্যাশায়ী হইলেন এবং হা হতোস্মি! কি হইল! কী করিলাম! এই প্রকার দুর্ভাবনায় দিনের পর দিন ক্রমশ দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাঁহার দেহপিঞ্জর হইতে জীবনবায়ু বহির্গত হইয়া তাঁহাকে সকল চিন্তা হইতে উদ্ধার করিল।

রাজা নৃসিংহনারায়ণের মৃত্যুর পর পুত্রশোকে রাণী করুণাময়ী অতি কাতরা হইয়া কুচক্রীদের চক্রান্ত বর্ণনা করতঃ তৎপ্রতিকারকল্পে গভর্নমেন্টে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু গভর্নমেন্ট উহার আর কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

রাজা বীরসিংহনারায়ণ ও রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ

রাণী করুণাময়ীর মৃত্যুর পরে রাণী রাজেশ্বরী বীরসিংহনারায়ণ নামে একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বীরসিংহনারায়ণ রায় অদ্যাপি জীবিত আছেন। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় একজন খ্যাতনামা শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার এক প্রকাণ্ড ছাতা ছিল ; তিনি উক্ত

ছাতাসহ দ্বিতল অট্টালিকা হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পতিত হইতেন। তিনি শক্তিশালী পুরুষ হইলেও, দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই। পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণের দুই পুত্র : উপেন্দ্রনারায়ণ ও ভূপালনারায়ণ। উহারা বর্ত্তমান আছেন, উপেন্দ্রনারায়ণকে সাধারণত গোপাল রাজা বলে।

বর্ত্তমান পরগণার ১৭২০ নং তৌজীর অধীন দুইখানি সিকিমী তালুক এবং ১৭বি, নং রাজা জয়নারায়ণ নামিক নিষ্কর লাখেরজ খানাবাড়ি এইমাত্র সম্পত্তি বর্ত্তমান রাজাদের ছিল। তাহারও ॥০ আনি (বড় রাজা বীরসিংহ নারায়নের স্বত্ব) কলসকাঠীর জমিদার বরদাকান্ত রায় নীলাম খরিদ করেন। বহুদিন যাবৎ ঐ সম্পত্তি উক্ত বরদাকান্ত রায় কি তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী দখল করিতে সাহসী হন নাই : অবশেষে পুরুষানুক্রমে রাজান্নে পরিপুষ্ট রাজবাড়ির নিকটস্থ শ্রীনগর (বাড়ৈখালী) নিবাসী জনৈক কাঞ্জবল্লীর আগ্রহে, চেষ্টায় ও যত্নে তিনি কতক সম্পত্তি দখল করিয়াছিলেন। অবশেষে ৩-৪ বৎসর গত হইল, দেওয়ানী আদালতে বণ্টকের মোকদ্দমাক্রমে বণ্টক করিয়া নিয়াছেন।

রাজা বীরসিংহনারায়ণ রায় বৃদ্ধাবস্থায় বিশেষ হীনাবস্থাপ্রযুক্ত প্রায়ই বাড়ির বাহির হন না। তাঁহার একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় শিক্ষিত এবং বিনয়ী। তিনি বাঙ্গালা, ইংরেজি ও সংস্কৃত কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছেন এবং রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ ও ভূপালনারায়ণ বিনয়ী ও ধর্ম্মনিরত। ইহাদের সহিত কেহ আলাপ করিলে অতি বিনয়ের সহিত মৃদুমধুর বচনে লোকের কথার উত্তর দিয়া থাকেন। ইহারা উভয়েই সাধারণভাবে ইংরেজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়
বিবিধ বিবরণ
(অভিষিক্ত রাজা)

বঙ্গদেশীয় প্রাচীন দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে নয়জন হিন্দু ছিলেন। তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা যথাশাস্ত্র বিধানে অভিষিক্ত (coronation) হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম নরপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহার ধুমঘাটের রাজধানীতে একবার মাত্র অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন চন্দ্রদ্বীপের রাজা ভিন্ন আর কেহই অভিষিক্ত হইতেন না।

পূর্ণ স্বাধীন অবস্থা

১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে ও বঙ্গাব্দ ১০৮১ সালে মুসলমানগণ বাখরগঞ্জ অধিকার করেন; তৎপূর্বে চন্দ্রদ্বীপ অধীশ্বর পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন এবং রাজা দনুজমর্দ্দন দে স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপনারায়ণের সময় হইতে অধীনতা আরম্ভ হয়।

নাম মাত্র করদ অবস্থা

মুসলমান কর্ত্তৃক বাখরগঞ্জ অধিকৃত হওয়ার পরেও চন্দ্রদ্বীপ নামে করদ থাকিয়া কার্য্যতঃ স্বাধীন ছিল ; দিল্লী হইতে কখন কোন ফৌজদার আসিলে তখন তাঁহাকে কিছু কর প্রদান করা হইত ; বাদসাহের লোক চলিয়া গেলে পুনরায় স্বাধীনভাবেই কাজকর্ম চলিত। দিল্লীর বাদসাহের পক্ষ হইতে ৫-৭ বৎসর অন্তর সুদূর চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের সংবাদ নেওয়া হইত। কখন কখন দিল্লী হইতে ফৌজ আসিলে রাজার লোকজন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইত। সুতরাং তাহারা কিছুই করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্নমনে চলিয়া যাইত।*

দেওয়ান সারাই আচার্য্য

বরিশাল টাউনের তিন মাইল পশ্চিমে রূপাতলী গ্রামে সারাই আচার্য্যের আবাসভূমি ছিল। ইহা মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের শেষকালে এবং রাজা রামচন্দ্রের প্রথম অবস্থায় দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; ইনি অত্যন্ত দুঃসাহসী ও নির্ভীক লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই আচার্য্য-বংশের পরই রহমতপুরের দেওয়ানবংশ চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

দেওয়ান রহমতপুরের চক্রবর্ত্তী বংশ

দ্বাদশ নৃপতি প্রতাপনারায়ণ একদা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কলিকাতা গিয়া তথা হইতে চন্দ্রদ্বীপ ফিরিতেছিলেন ; তৎকালীন কোন রেল স্টিমার ছিল না। রাজা নৌকাযোগে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জিলার কাঁচরাপাড়া নামক গ্রাম অতিক্রম করিয়া

---

* ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ব্যালফ ফিচ নামক জনৈক ইংরেজ এদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন—শ্রীপুরের অধীশ্বর চাঁদরায় প্রভৃতি সকলে একত্র মিলিত হইয়া আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তখন এদেশে নদনদী ও দ্বীপবহুল থাকাতে গোলযোগ দেখিলে বাঙালিরা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া আত্মরক্ষা করিত।

আসিতেছিলেন; কার্য্যবশত রাজার নৌকা নদীতীরে সংলগ্ন হইলে তিনি এক যুবক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার পরিচয়াদি গ্রহণ করিয়া যুবক যে একজন বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারিলেন। রাজার ইচ্ছা হইল, যুবক তাহার সহিত আসিলে তিনি তাহাকে চন্দ্রদ্বীপে নিয়া আসেন। পরিশেষে রাজার অভিপ্রায়মতে ঐ ব্রাহ্মণ যুবক রাজার সহিত মাধবপাশা আগমন করেন এবং রাজকার্য্যে সুখ্যাতি অর্জন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই দেওয়ানের পদ লাভ করেন। ইনিই রহমতপুরের চক্রবর্তীবংশীয় আদিপুরুষ রামনারায়ণ চক্রবর্তী; ইনি রাজার অনুরোধে একাধিকবার দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। রামনারায়ণের পুত্র রূপদেব ও রঘুদেব ; তাঁহারা তেমন প্রতিভাশালী ছিলেন না। এই দেওয়ান-বংশে রামনারায়ণের পরে তাঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামজীবনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ধর্মভীরু ও যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলেন; তিনি রাজা শিবনারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। এই বংশের অষ্টমপুরুষে স্বর্গীয় বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। সুরেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও রাজেন্দ্রনাথ নামে তাঁহার তিনটি পুত্র বর্ত্তমান আছে। রহমৎপুরে ইহাদের দুইখানি বাড়ি আছে, তাহা নূতনবাড়ি ও মাঝবাড়ি বলিয়া খ্যাত। চন্দ্রদ্বীপ রাজানুগ্রহে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ যে প্রভূত ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তদ্দারা বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ কালেক্টরীর ১৭৫২, ১৭৫৩, ১৭৫৫, ২৬৯৮, ১৭২৯, ১৪৪৯ নং তৌজী সৃষ্টি হইয়াছে; ইহা এক-একটি তালুক। রামজীবনের পুত্র চন্দ্রশেখর। এই চন্দ্রশেখর নামেই ১৭২৯ নং চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামিক তালুকের সৃষ্টি হইয়াছে। রহমতপুরের নূতন বাটীস্থ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী এ জিলায় একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী বলিয়া বিখ্যাত।*

রাজধানী সম্বন্ধীয় প্রমাণ

বরিশাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা-সভায় যখন চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তখন কোন কোন সভ্য উক্ত প্রবন্ধ লিখিত বিশারীকাঠী' ক্ষুদ্রকাঠি ও হোসেনপুর সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকার কথা বলিয়াছিলেন; তজ্জন্য অতি প্রাচীন কায়স্থকারিকা হইতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

কন্দর্পোপম কন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ।
মহাধর্নুদ্ধরো মানী মহারথো মহাশূরঃ॥
অক্ষৌহিণী-পতির্বীরঃ সব্যসাচীসমো রণে।
যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচক্রী যবনারির্মহাবলঃ
যবনাধিপতিং গাজীং রণে ব্যাপ্যাদয়ৎ কিল।
মগবীর্য্যং তথা খর্ব্বমকরোৎ সঃ নৃপোত্তমঃ

* রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় যখন জাহাপুর নদীর পাড় ক্ষুদ্রকাঠীতে রাজধানী স্থাপনের জন্য কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তৎকালীন বর্ত্তমান রহমতপুর খালের উত্তরপারে ভীষণ অরণ্যাবৃত স্থানে রহমত উল্লা নামক এক মুসলমান দস্যু সরদার বাস করিত। ইহার দলে ছোট বড় অনেক দস্যু ছিল। ইহারা নিকটস্থ নদীতে সর্বদা ডাকাতি করিত। উহাদের আবাসভূমি ভীষণ অরণ্যাবৃত্ত স্থানে ১৮ খান খড়গ ছিল, উহাতে নরবলি দেওয়া হইত। ইহারা ডাকাতির সময় ধৃত ব্যক্তিগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় ক্ষুদ্রকাঠি আসিয়াই এই দস্যু দলপতিকে সদলবলে নিহত করেন। রহমত উল্লা দস্যুর নামানুসারে এই গ্রামের নাম রহমতপুর বলিয়া খ্যাত আছে। বর্ত্তমানে যে খাল দৃষ্ট হয়, তৎকালে উহার পশ্চিমপাড়কে গো শাসন ও পূর্ব্ব উত্তরপাড়কে রহমতপুর বলিত।

স্থাপয়ামাস পুরঞ্চ বাসুরীকাটি সংজ্ঞকম্॥
তথা মাধবপাশাঞ্চ ক্ষুদ্রকাঠীং তথৈব চ
অতাড়য়ৎ যবনান্ স হোসেনাখ্য পুরাওখা
রথিনাঞ্চ রথী শূরঃ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদঃ॥

মাধবপাশা সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে;—চতুর্ব্বিধ সহস্রাণি প্রথমং কলিযুগস্য চ। শমিষ্যন্তি যদা বিপ্রাশ্চন্দ্রদ্বীপস্তদা মহৎ। পত্তনঞ্চ নদীপার্শ্বে মাধবপাশং ভবিষ্যতি। মাধবপাশা পত্তনস্থা লোকধর্ম্মকৃতা যদা। স্থাস্যতি গ্রামপার্শ্বে চ তথা মাধুব দেবকঃ॥

সুতরাং রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় যে বিশারীকাঠ, ক্ষুদ্রকাঠি, হোসেনপুর ও মাধবপাশার ক্রমিক রাজধানী পরিবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইল।*

রাজা রামচন্দ্রের প্রশংসা

রাজা রামচন্দ্র যে একজন বুদ্ধিমান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তৎসম্বন্ধে পর্টুগীজ পাদরিগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম-প্রচার জন্য ফনসেকো ফর্নাণ্ডেজ, কর্ডয়েস ও সোসা নামিক চারিজন পাদরী রাজা রামচন্দ্রের আমলে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১৫৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে বাকলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে যেরূপ আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহাতে পাদরিগণ মধ্যে ফনসেকো গোয়ার প্রধান পাদরী 'পাইমেন্টের' নিকট লিখিয়া পাঠান ; পাইমেণ্ট স্বীয় মন্তব্যসহ উহা ১৬০১-২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। "পার-ডি-জেরির তৎকৃত 'ভিসণ্টিইস ওরিয়াণ্টাল' নামক গ্রন্থে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। ফলসেকো বলিয়াছিলেন— আমরা আপনার শ্বশুর চ্যাণ্ডিকান (যশোহর) অধিপতির রাজ্যে গমন করিতেছি। আমাদের ইচ্ছা আপনার রাজ্যমধ্যে ধর্ম্ম প্রচার ও গীর্জ্জা স্থাপন কার্য্যে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, তৎপ্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষিত হয়।" মিঃ বেভারিজ তৎকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সীমা নির্ণয় সম্বন্ধীয় আপত্তির খণ্ডন

এই পুস্তকের প্রথম ভাগে সীমা নির্ণয় নামে যে অধ্যায় লিখিত হইয়াছে তাহাব উত্তর সীমানায় বর্ত্তমান ফরিদপুরের কতক অংশ পুরাকালে চন্দ্রদ্বীপের অধীন ছিল, এই বিষয় নিয়া কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি আপত্তি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য নিম্নে উক্ত আপত্তির খণ্ডন করা গেল:—

কুশদ্বীপোহি চোত্তরে

বাদশাহ আকবরের প্রধান রাজস্ব-সচিব রাজা তোডলমল্ল বঙ্গদেশকে উনিশটি সরকারে বিভক্ত করেন ; যথা—(১) সরকার জেন্নতাবাদ, (২) সরকার তাণ্ডা, (৩) সরকার ফতেয়াবাদ, (৪) সরকার মামুদাবাদ, (৫) সরকার খালী কেতাবাদ, (৬) সরকার বাক্‌লা, (৭) সরকার পূর্ণিয়া, (৮) সরকার তাজপুর, (৯) সরকার ঘোড়াঘাট, (১০) সরকার পিঞ্জিরা, (১১) সবকার বারকাবাদ, (১২) সরকার বাজুহা, (১৩) সরকার সোণারগা, (১৪) সরকাব শিলেট (শ্রীহট্ট), (১৫) সরকার চট্টগ্রাম, (১৬) সরকার সেরিফাবাদ, (১৭) সরকার

* ইহা ব্যতীত হালিমটি ৩য় ভলুম ৪১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য তাহাতে হোসেনপুরের যুদ্ধ বিবরণ সন্নিবেশিত আছে।

সেলিমাবাদ, (১৮) সরকার সাতগা, (১৯) সরকার মাদারণ। ইহা ব্যতীত বিহারে সরকার বিহার, মুঙ্গের চম্পারণ, হাজীপুর, সারণ, ত্রিহুত, রোটাশ এই সাত ভাগে বিভক্ত ছিল। উপরোক্ত ৩নং সরকার ফতেহাবাদের মধ্যে ৩১টি মহল ছিল ; যথা—(১) জয়শির, (২) ফুলচৌল, (৩) চরণলক্ষ্মী, (৪) কুশদিয়া ইত্যাদি। উক্ত কুশদিয়া বা বর্ত্তমান কুশন্দিয়া যে কুশদ্বীপের অপভ্রংশ তদ্বিষয় কোন সন্দেহ নাই। অতএব পুবাকালে যে চন্দ্রদ্বীপের সীমানা উক্ত কুশন্দিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে। উক্ত কুশন্দিয়া বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী গোপালগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। ফরিদপুরের ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার দেখিলে গোপীনাথপুর নামে একটি পরগণা যে পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপভুক্ত ছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত বরিশাল কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত নিম্নলিখিত পবগণাস্থিত অধিকাংশ জনপদ নিয়া বর্ত্তমান ফবিদপুর জিলা গঠন হইয়াছে। পরগণাগুলির নাম, যথা— হবিবপুর ইদিলপুর, ইদ্রাকপুর, কাদিরাবাদ, কাশীমপুর—শেলাপট্টি, নামনগর, সফিপুর, কালা ইত্যাদি। এই সকল পরগণার রাজস্ব, বিভাগ অনুসারে বর্ত্তমানে বরিশাল ও ফরিদপুর দাখিল হইয়া থাকে। মাদারীপুর এবং কোটালীপাড়া পবগণা চন্দ্রদ্বীপভুক্ত থাকার বিশিষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কোটালীপাড়া চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন পরগণায় পরিণত হয়। বর্ত্তমানে খুলনা ও ফরিদপুরের কতক অংশ চন্দ্রদ্বীপেব প্রাথমিক কাল হইতে যে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, লেখক এমন কথা কাহাকেও স্বীকার করিতে বলেন না। নোয়াখালী হইতে লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্দী করিয়া আনার পর কিছুদিন ভুলুয়া রাজ্য চন্দ্রদ্বীপ রাজাব অধীনস্থ ছিল এবং অল্পকাল পরেই ভুলুয়া উক্ত অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছিল। পুরাকালীয় চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের কতিপয় স্থান না নিলে ফরিদপুর ও খুলনা জিলা আদৌ গঠন হইতে পারিত না ; ইহা প্রতিবাদন জন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হইবে না। বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলায় যেমন বরিশালস্থ হাবিবপুর পরগণা প্রভৃতির কতকাংশ দেখা যায়, তদ্রূপ খুলনা জেলাও সেলিমাবাদ প্রভৃতি কতিপয় পরগণা বরিশাল হইতে গিয়া খুলনা জিলাভুক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, সেলিমাবাদ পরগণার সহিত চন্দ্রদ্বীপের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না ; কিন্তু রাজা রামচন্দ্রের আমলে সেলিমাবাদ মাত্র নদীগর্ভ হইতে অল্পে অল্পে বিল সৃজন করিয়াছিল, তখনও কোন মনুষ্যবাসের উপযুক্ত হইয়াছিল না; সুতরাং পরোক্ষভাবে উহা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের সীমানাভুক্তই ছিল। বর্ত্তমানে সেলিমাবাদের অধিকাংশ স্থান চন্দ্রদ্বীপের সীমানা মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; তাহার কারণ এই যে, উক্ত পরগণার ভূমি উত্থিতের পর উহার মালিকগণ বৃটিশ গভর্নমেন্টের আমলে সরকারি কাগজপত্রে লিখাইয়া দিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের রাজধানী মাধবপাশা ও হোসেনপুরের দুই মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে আশিয়ার ও গগন নামে দুইটি গ্রাম সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত দৃষ্ট হয়। চন্দ্রদ্বীপের জমিদারী নিলাম হওয়ার পরেও রাজার এমন প্রতাপ ছিল, যাহাতে অদূরবর্ত্তী গ্রামদ্বয় সেলিমাবাদ পরগণাভুক্ত বলিতে কেহ সাহসী হইত না। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে যখন থাক্‌বস্থায় জরিপ হয়, তখন এ জিলার জমিদার, তালুকদার ও মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারিগণ নিজ নিজ স্বার্থানুসারে যে স্থান যে পরগণা লিখাইয়া দিয়াছেন, তাহাই পরিমাপক কর্ম্মচারী লিখিয়া আনিয়াছেন। বর্ত্তমান স্বরূপকাঠী, কালীগঙ্গা ও কচা নদীর পূর্ব্ব পাড়ে যে, সেলিমাবাদের কোন নামগন্ধ ছিল না, ইহা সুনিশ্চিত। কালক্রমে চন্দ্রদ্বীপ রাজের অধঃপতনের পর উহা ক্রমশ পূর্বদিকে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রসারিত হইয়াছে। অতএব সীমানা নির্ণয় সম্বন্ধে প্রথম

অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা ধ্রুব সত্য ; ইহাতে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নাই। চন্দ্রদ্বীপের সামাজিক সীমানা সম্বন্ধে এই পুস্তিকার ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিকারপুরে নাসিকাপীঠস্থান

বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও খুলনা জিলা যে এক সময় সাগরগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ যে স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই জলভাগকে প্রাচীনকালে সুগন্ধা বলা হইত।* চন্দ্রদ্বীপ উৎপত্তির পূর্ব্বে উক্ত সুগন্ধায় একটি দ্বীপের সৃষ্টি হয়, তাহাই বর্ত্তমান গৌরনদী ষ্টেশনাধীন শিকারপুর গ্রাম। দক্ষালয়ে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেহ উন্মত্তাবস্থায় সতীর দেহ স্কন্ধে করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবার সময় উহা বিষ্ণুচক্রে ৫১ অংশে বিভক্ত হইয়া দেবীর নাসিকার অগ্রভাগ সুগন্ধা নদীর যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তথায় প্রথমত একটি দ্বীপ সৃষ্টি হয়। শিকারপুরের অনতিদূরে বকাইর চর নামে একটি গ্রাম আছে, কালেক্টরীর পঞ্চসনা কাগজেও উক্ত বকাইর চর গ্রামের নাম দৃষ্ট হয়। ইহাদ্বারা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, শিকারপুর পুরাকালে বৃহৎ নদীপারস্থিত ভূখণ্ড বা দ্বীপ ছিল, তদ্বিষয় অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পীঠস্থান সম্বন্ধে তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে দেবী বলিয়াছেন—

সুগন্ধায়াং নাসিকা সে বেদস্ত্র্যম্বক ভৈরবঃ
সুন্দরী সা মহাদেবী সুনন্দা তত্র দেবতা॥

কালক্রমে সুগন্ধানদীর কতক স্থান স্থলরূপে পরিণত হইলে, বর্ত্তমান শিকারপুর নামক স্থানে সুনন্দা দেবীর আবির্ভাব হয়। বিক্রমপুর নিবাসী গঙ্গাগতি চক্রবর্ত্তী নামিক জনৈক সাধক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশক্রমে প্রথমত নদীতটে এক পাষাণময়ী মূর্ত্তি ও স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হয় এবং উক্ত স্বপ্নাদেশানুসারে ঐ মূর্তিদ্বয় চরভূমিতে স্থাপন করিয়া অর্চনা করিতে থাকে। ঐ পাষাণময়ী মূর্তিখানি উগ্রতারার মূর্ত্তি বিধায় সকলে উহাকে সুনন্দা না বলিয়া উগ্রতারা নামেই অভিহিত করিতেছেন ; উক্ত উগ্রতারার বাড়ি সাধারণত শিকারপুর তারাবাড়ি নামে বিখ্যাত আছে। বর্ত্তমান পূজারিগণের পূর্ববর্তীর হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়, ৬১৭ শকাব্দে সাধক গঙ্গাগতি চক্রবর্ত্তী উক্ত তারামূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। ক্রমে সমগ্র ভারতের সাধু-সন্ন্যাসিগণ উক্ত পীঠস্থানের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শিকারপুরে উপনীত হইতেন। বঙ্গাব্দ ১২৯০ সনে শিকারপুরের নিকটস্থ আটীপাড়া গ্রাম নিবাসী কতিপয় মুসলমান কর্ত্তৃক উক্ত মূর্ত্তি অপহৃত হইয়া খণ্ড খণ্ড অবস্থায় ত্রেতার আন্ধী নামক প্রাচীন দীঘিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং অচিরাৎ ঐ মুসলমান পরিবারস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। উক্ত ত্রেতার আন্ধীর পাড়ের সেই বাড়িখানি এক্ষণ জনশূন্য হইয়া অদ্যাপি জঙ্গলাবৃত হইয়া রহিয়াছে। মূর্তিখানি অপহৃত হওয়ার পর হইতে সাধুসন্ন্যাসী সমাগম হ্রাস পাইয়াছিল। সম্প্রতি শিকারপুরনিবাসী শ্রদ্ধেয় বৈদ্যবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের আগ্রহে ও চেষ্টায় একটি ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তিনি কাশীধাম হইতে পূর্ব্ব মূর্ত্তির অনুরূপ একখানি উগ্রতারা দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি আনিয়া গত বৎসর (১৩১৯ সালের) ৯ই চৈত্র তারিখে উক্ত দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বরিশালের এই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানটীর দুর্দশা মোচন করিয়া কবিরাজ মহাশয় সমগ্র ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন তদ্বিষয় কোন মতদ্বৈধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

---

* রেনেল্ট সাহেব কৃত ১৭৮ খৃষ্টাব্দের মাপে সুগন্ধা নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পোনাবালিয়ার শ্যামরাইল শিব

বরিশাল জিলাস্থ ঝালকাঠীর ৩ মাইল দক্ষিণে পোনাবালিয়া গ্রামে শ্যামরাইল শিব বর্ত্তমান আছে। ইহাও একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। প্রতি সন শিব-চতুর্দশীর দিন দেশ-দেশান্তর হইতে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই গ্রামও এ জিলার মধ্যে অতি প্রাচীন। শিকারপুর সৃষ্টির পরেই পোনাবালিয়া ও ফুল্লশ্রী নামিক স্থান দুইটি দ্বীপ সৃষ্টি হইয়াছিল, এ বিষয় এই পুস্তিকার প্রথমেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

ফুল্লশ্রী বা মানসী গ্রামের মনসা দেবী

কবিবর বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ রচনার পর ফুল্লশ্রী গ্রামের মনসা দেবীর মাহাত্ম্য বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে। এই ফুল্লশ্রীর সপ্ত পশ্চিমাংশে ঘর্ঘরা নদী প্রবাহিত হইত, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ফুল্লশ্রী যদিও বাঙ্গরোড়া পরগণার অধীন, কিন্তু অতীতের অদূরবর্ত্তীকালে ফুল্লশ্রী খাস চন্দ্রদ্বীপের অধীন ছিল, ইহাতে কোন মতদ্বৈধ নাই। বাঙ্গরোড়া চন্দ্রদ্বীপের একটি খারিজা পরগণা।

কাত্যায়নী ও মদনগোপাল

চন্দ্রদ্বীপের শেষ রাজধানী মাধবপাশার ভগ্নশ্রী রাজবাড়িতে প্রাচীন ঝিকটি মন্দির মধ্যে অদ্যাপি চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী কর্তৃক নদীগর্ভে প্রাপ্ত কাত্যায়নী ও মদনগোপাল মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের অবস্থা দেখিলে অতীত গৌরব মনে পড়ে এবং হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রেই অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে পারেন না। বরিশালের খাসমহল ডেপুটি কালেক্টর শ্রদ্ধেয় মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব বি. এ. বি. এল. মহাশয় নিজ ব্যয়ে উক্ত মন্দির দুইটির ফোটোগ্রাফ উঠাইয়া ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে উহার প্রাচীনত্ব উপলব্ধি হইবে।

দক্ষিণচক্রঠাকুর

চন্দ্রদ্বীপ অন্তর্গত বর্ত্তমান নলছিটি ষ্টেশনাধীন নথুল্লাবাদ গ্রামে দক্ষিণচক্র ঠাকুর নামে একটি প্রত্যক্ষের বিগ্রহ আছে। এই স্থানের বিগ্রহটি চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের আমল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এই ঠাকুরবাড়িতে একটি বড় মেলা বসিয়া থাকে।

বাজার দর

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের সময় একপণ কড়িতে এক মণ ধান্য পাওয়া যাইত, আর আজ আকমণ ধান্যের মূল্য ৫ টাকা ; সুতরাং সেকালের ও একালের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিষয় কত পার্থক্য হইয়াছে, তাহা বাজারদর হইতেই উপলব্ধি হইবে।

হিন্দু ও মুসলমান

চন্দ্রদ্বীপ রাজার রাজত্বকালীন এতদ্দেশবাসীগণ অধিকাংশই হিন্দু ছিল, পরে নানা কারণে অনেক লোক মুসলমান হইয়াছে। শ্রীরামপুরের মিঞাবংশ, কোটালীপাড়ের চৌধুরীবংশ প্রভৃতি এ জিলায় বহুতর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ নানা কারণে মুসলমান হইয়াছিলেন ; কিন্তু

উহারা মুসলমান হইলেও সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন ; বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন এত গোড়ামী ছিল না। অনেক মুসলমান অদ্যাপি দুর্গোৎসবের সময় হিন্দুদের ন্যায় নূতন কাপড় ক্রয় করিয়া ছেলেমেয়ে ও পরিবারস্থ লোকদিগকে খুসী করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে মুসলমানগণ লক্ষ্মীপূজাও করে। এ জিলার শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণের সমশ্রেণীর অন্যতম গৌরনদী ষ্টেশনাধীন নলচিড়ার সৈয়দবংশ দুর্গোৎসব করিয়া বৎসর বৎসর সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করিতেন ; তাঁহাদের প্রদত্ত বৃত্তিদ্বারা পার্শ্ববর্তী হিন্দুগণ অদ্যাপি দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন। বসন্তের ভয়ে অনেকে শীতলা খোলায় মানত করিত এবং পাঠা বলি দিত। পক্ষান্তরে হিন্দুগণও মুসলমানগণের দরগায় সিন্নি মানত করিত ; বহুপূর্ব্বে এইরূপ ভ্রাতৃভাব ছিল এবং হিন্দু মুসলমানে পরস্পর সহানুভূতি ছিল। খোসাল, গোপাল, মদন, ফটিক প্রভৃতি নামগুলি হিন্দুভাবাপন্ন।

টাকা লগ্নী

পূর্বকালে সামান্য তালপাতায় পাত লিখিয়া টাকা কর্জ্জ করিত ; দেব মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া টাকা কর্জ্জ নিলে তাহা মহাজনের চাহিতে হইত না, খাতক আপনিই উহা পরিশোধ করিত। এক্ষণকার ন্যায় তখন এত অবিশ্বাস ও টিপ সহির ও রেজিস্টারির প্রয়োজন ছিল না, সকল জাতিমাত্রেই ধর্ম্ম মানিয়া চলিত; বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ছিল না।

শিল্প বাণিজ্য

রাজা কীর্তিনারায়ণের সময় এতদ্দেশে কার্পাস শিল্পের বিশেষ উন্নতিসাধন হইয়াছিল ; উজিরপুর ও মাধবপাশার তন্তুবায়গণ অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেশ দেশান্তরে চালান দিত। প্রত্যেক গৃহস্থের কার্পাস চাষের ভূমি ছিল এবং তাহাতে প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন করিত এবং প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরেই চরকা ঘুরিত। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু-বিধবাগণ চরকার সুতা কাটিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া এবং ফুল কাটিয়া ও জরির কাজ করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করিত। এক্ষণ সে দিন চলিয়া গিয়াছে এবং বঙ্গদেশেও দুর্মুল্যের অন্নকষ্টের হাহাকার লাগিয়াছে।

নদ নদী

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত বহু পূর্ব্বে সুগন্ধা বা সোন্ধা নদী ছিল। বর্ত্তমান স্বরূপকাঠী নদীর পশ্চিম পাড়কে সোন্ধারকুল বলে। সুগন্ধা নদী বিভিন্ন নামে প্রখ্যাতা আছে ; যথা— ইল্‌সা, তেতুলিয়া, মাসকাটা, কালাবদর, মেঘনা, আড়িয়ালখাঁ, কীর্তনখোলা বা বরিশাল নদী, ডাকাতিয়া, বিষখালী, পাণ্ডব, কারখানা, নেহালিয়া, বিঘাই, আন্ধারমানিক, সাপলেজা, আগুনমুখা, বলেশ্বর, ফাঁসিয়াতলা, চন্দনা, কুমার ইত্যাদি।

বিল

কাজলার বিল, বাঘিরা, কোটালীপাড়া, কুড়লিয়া, আস্কর, বড়ইয়া, ধলবাড়িয়া, যোবস্থা, হারতা, ঝনঝনিয়া, ধরণদী, আদমপুর, কালারাজা, খাজুরিয়া, ডুমরিয়া ইত্যাদি।

ঝটিকাবর্ত

চন্দ্রদ্বীপের ষষ্ঠ রাজা পরমানন্দ রায়ের রাজত্বকালে বঙ্গাব্দ ৯৯০ সালে একটি ভীষণ

ঝটিকাবর্ত উপস্থিত হইয়াছিল ; তাহাতে রাজা পরমানন্দ রায় তাঁহার অমাত্যগণসহ উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন ; নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া এরূপ জলপ্লাবন হয় যে তাহাতে ঘরবাড়ি ভাসিয়া যায় ; রাজপরিবারস্থ অধিকাংশ লোক নৌকারোহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন ; উক্ত ঝটিকাবর্ত ও জলপ্লাবনে প্রায় দুই লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে এক ভীষণ বন্যা হয়, তাহার ফলে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহাকে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলে। রাজা শিবনারায়ণ রায়ের রাজত্বের প্রাক্কালে ঐ মন্বন্তর ঘটিয়াছে।

দ্বীপ

প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ পত্তন হওয়ার সমকালে চন্দ্রদ্বীপ, শিকারপুর ও বকাইর চর, ফুল্লশ্রী প্রভৃতি দ্বীপ ছিল ; তৎপর বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সৃষ্টি হইয়াছে এবং অদ্যাপি সৃষ্টি হইতেছে। চন্দ্রদ্বীপের পরে আধুনিক দ্বীপের মধ্যে দক্ষিণ সাহাবাজপুর, কলমী, কাজল, বড় বাইশদিয়া, রাঙ্গাবালী, কোড়ালিয়া, ছোপা কুকুড়ী, মুকরী, মনপুরা প্রভৃতি দ্বীপসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে।

শস্যাদি

প্রাচীনকালে চন্দ্রদ্বীপে নানা প্রকার ধান্য ও কার্পাসের প্রচুর চাষ হইত; প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে কার্পাসের বীজ বপন জন্য ভিটা জমি থাকিত। রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের সময় টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় হইত, তৎস্থলে এইক্ষণ টাকায় ৮ সের বিক্রয় হইতেছে। ভোট কার্পাস ও লোট কার্পাস নামে দুই প্রকার কার্পাস উৎপন্ন হইত, তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে সূত্র বাহির করিয়া বস্ত্রাদি তৈয়ার করা হইত। তদ্ব্যতীত আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারী, কলা, তেঁতুল, খর্জ্জুর, খেসারি, মুশুরী, সর্ষপ, তিল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

রয়না বা রণা বৃক্ষ

পূর্ব্বে সর্ষপ, তিসি ও তিল দ্বারা কলুবাড়ির ঘাইনের গাছে তৈল প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমানকালের ন্যায় ভেজাল তৈল ছিল না। রয়না বৃক্ষের ও এরণ্ড বৃক্ষের ফল হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হইত, তাহা বেশ ঠাণ্ডা, তাহা দ্বারা আলো জ্বালান হইত। অদ্যাপি গৌরনদী ষ্টেশনাধীন বাগধা প্রভৃতি কোন কোন গ্রামে রয়না বৃক্ষের ফল দ্বারা তৈল প্রস্তুতের নিয়ম প্রচলিত আছে। রয়না বা রণা বৃক্ষের পাকা ফল আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা তৈল প্রস্তুত করা হইত।*

লবণ

চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন রাজত্বকালে নারিকেল বৃক্ষের ডগা পুরিয়া উক্ত ভস্মগুলি নেকড়ায় বাঁধিয়া তাহা উপরে রাখিয়া তদুপরি জল দিয়া টেপা ফেলিয়া লবণ প্রস্তুত করা হইত এবং সমুদ্রফেনা হইতেও কতক লবণ সংগ্রহ করা হইত ; কিছুদিন পরে সিন্ধু প্রদেশ হইতে সৈন্ধব আমদানী হইতে লাগিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আমলে আইনানুসারে এবম্বিধ লবণ প্রস্তুত-প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কাগজ

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে কাগজী নামক এক জাতি ছিল, তাহারা কাগজ প্রস্তুত করিত। মুসলমানদের

* রয়না বা রণা বৃক্ষ সম্বন্ধে ১৩১৭ সালের পৌষ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার রায় চৌধুরীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে বাদ্যকর সম্প্রদায় যেমন হিন্দুভাবাপন্ন, ইহারাও তদ্রূপ হিন্দুভাবাপন্ন এক জাতি ছিল। বৰ্ত্তমানে এ প্রদেশে ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে ; দু-এক ঘর যাহারা ছিল, তাহারাও ব্যবসান্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের উপাধি বদলাইয়া দিয়াছে। মাধবপাশা ও পাংশা গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানের কতক স্থানকে এক্ষণও কাগজীপাড়া বলিয়া থাকে।*

মালঞ্চের ও কুসুম ফুলের কারখানা

চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের সময় মালঞ্চ ও কুসুম ফুলের বৃক্ষ রোপণ করা হইত। অধিকাংশ নিম্ন শ্রেণীর গৃহস্থেরা বাড়ির চতুর্দিকে কাঁচা বাঁধিয়া মালঞ্চ নামে এক প্রকার বৃক্ষ রোপণ করত উহার মধ্যে মধ্যে কুসুম ফুলের গাছ লাগাইত। উক্ত কুসুম ফুল ও মালঞ্চ বৃক্ষের পুষ্প ও ছাল দ্বারা রং প্রস্তুত করা হইত এবং তন্তুবায় ও জোলাগণ ঐ রং দিয়া কাপড়ের পাড় প্রস্তুত করিত এবং সর্বসুন্দর নামে এক প্রকার কাপড়ের রং ফলাইত। বিদেশ হইতে রং আমদানী আরম্ভ হওয়ার পর হইতে দেশীয় লোকের এবম্বিধ আয়ের পথ বধ হইয়াছে।

নীলের কারখানা

রাজা জয়নারায়ণের সময় চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য মধ্যে নীলের ব্যবসা ও স্থানে স্থানে নীলের কারখানা ছিল। রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের সময় তাঁহার অনুমতিক্রমে নীলকুঠীর সাহেবগণ পঞ্চকরণের পূর্ব্ব পাড়ে এক কুঠিবাড়ি প্রস্তুত করিয়া নীলের কারবার চালাইতেছিলেন। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বাল্যকাল পর্য্যন্ত ঐ কারবার ছিল, পরে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কুঠীবাড়ির ভগ্ন ইষ্টকালয় এক্ষণ জঙ্গলাবৃত থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কুমলা বন ও বেতালোহা

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের বহু স্থানই বিল সমাকীর্ণ ছিল, ঐ সকল বিলে কুমলাবন ও বেতালোহা জন্মিত। গ্রামিক গরিব গৃহস্থগণ বিল হইতে কুমলাবন সংগ্রহ করিয়া খড়ের ঘর নির্ম্মাণ করিত এবং বেতালোহা দ্বারা উক্ত ঘরের মট্‌কা মারিত। অদ্যাপি গৌরনদী থানার উত্তরাংশে জল্লা, রুহীর বাড়ি, কুড়লিয়া, কালাবিলা, আস্কর, বাগধা প্রভৃতি গ্রামে কুমলাবনের ঘর দেখিতে পাওয়া যায়।

তারার ও কলার ক্ষার

প্রাচীনকালে তারাগাছ ও কলার খোল পুরিয়া উহার ভস্মরাশি হইতে এক প্রকার ক্ষার তৈয়ারী করা হইত। উক্ত ক্ষারের দ্বারা ধোপারা কাপড় ধোলাই করিত ; অদ্যাপি কোন কোন গণ্ডগ্রামে উপরোক্ত উপায়ে ক্ষার প্রস্তুতের নিয়ম প্রচলিত আছে। বৰ্ত্তমানে সাজিমাটি ও সাবানের আমদানী হইয়া এই প্রাচীন প্রথা অধিকাংশ স্থানে রহিত হইয়াছে।

মুদ্রাস্বরূপে কড়ি ব্যবহার

চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের আমলে রাজনারায়ণ রায়ের সময় পর্যন্ত বর্ত্তমান সিকি দুয়ানি, পয়সা ও

* নেকড়া, তুলা ও অন্যান্য জিনিস একত্রে কাগজ প্রস্তুত করা হইত। ঐ সকল কাগজের মধ্যে খড়িকুলিয়া লেচী মাজনা, বড়মাজনা এই ত্রিবিধ প্রকারের কাগজই সমধিক আদৃত ছিল।

আধুলির পরিবর্তে কড়ি ব্যবহৃত হইত; সাড়ে সাত কাহন কড়িতে এক টাকা গণনা করা হইত। বঙ্গাব্দ ১১৮৭ সালে যখন দুর্গাসাগর খনন করা হয়, তৎকালে কড়ি দিয়াই কুলীদিগকে বিদায় করা হইয়াছিল; সুতরাং ১২০০ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে জনসমাজে কড়ি অবাধে প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়। শহর কলিকাতাতে অদ্যাপি অল্পাধিক পরিমাণে কড়ির প্রচলন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লোকসংখ্যা

বর্ত্তমান সময় চন্দ্রদ্বীপ নামধেয় স্থানগুলিতে যে পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, পূর্ব্বে তদপেক্ষা অনেক কম ছিল। যেহেতু পূর্ব্বে অধিকাংশ বিল বহুল স্থানে লোকের বসতি ছিল না; বিল উত্থিতের সঙ্গে সঙ্গে লোকের বসতি হইয়া ক্রমিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভাষা

পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে সংস্কৃত চর্চার বহুল প্রচলন ছিল ; প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি রাজদত্ত নিষ্কর সম্পত্তির অনুবলে অভাব বোধ না করিয়া শাস্ত্রচর্চায় মনোনিবেশ করিত ; সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতির আদর বহুগুণে বর্দ্ধিত ছিল। বর্ত্তমানে সংস্কৃতের পরিবর্তে বঙ্গভাষার অনেক উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভদ্র পরিবারের মধ্যেও বিকৃত বাঙ্গলা ব্যবহৃত হইত। কোটালীপাড়া প্রভৃতি বিল অঞ্চলে অদ্যাপি অধিকাংশ ভদ্র পরিবারে 'আসিব' শব্দের পরিবর্ত্তে 'আইস্‌ফো' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে বরিশাল সদর বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিমের লোকে কেন, গিয়াছিল, দিয়াছিল, নিয়াছিল এই কথাগুলির পরিবর্তে কিয়া, গে ছেলে, দে ছেলে, নে ছেলে প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ সকল কথাগুলি মেহেন্দীগঞ্জের লোকে গেহিলাম, দিহিলাম নিহিলাম, এইভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে বঙ্গভাষার উৎকর্ষের দিনে বরিশাল জিলার গৌরনদীর উত্তরাংশ ও নলছিটী, বাখরগঞ্জ থানার দক্ষিণাংশ এবং পশ্চিমাংশে নাজিরপুর থানার ও পুবে, মেহেন্দীগঞ্জ, ভোলা এলাকার লোকে একটা শব্দের নানারূপে বিকৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে হুলাক্ (আলোক), আমেজ (চিন্তা), হান্তা (সস্তা), কোন্ মুহী (মুখী), হরবা (করবে) কি? চঙ্গ (মই), টেঙ্গা (তেঁতুল), নাও (নৌকা), সোন্দে (সন্দেহ), কাফুর (কাপড়), ঘোনা (মশারি) প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা তিন শত বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

সুন্দরবনের অবস্থা

চন্দ্রদ্বীপ রাজত্বের প্রথম সময় সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবন অঞ্চলে বৃহৎ জনপদ ও লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল। কালক্রমে আরাকানের মগ ও পর্টুগীজদিগের অত্যাচার এবং সংক্রামক রোগে উক্ত বৃহৎ বৃহৎ জনপদগুলি বহুকাল হয় জনশূন্য হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়। মি. গ্রান্ট নামিক জনৈক্ ইউরোপীয়ান তাঁহার লিখিত পুস্তকে ইহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি সুন্দরবন অঞ্চলে অনুসন্ধান করিলে বড় বড় ইষ্টক-নির্ম্মিত বাড়ির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রেনেল সাহেবকৃত ১৭৬৪-১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের প্রস্তুতি মানচিত্রে অনেক মাড়্‌ফোর্ট বা মাটিয়া দুর্গের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

বারভূঞার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) **প্রতাপাদিত্য**—ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই পুস্তিকায ৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) **কন্দর্পনারায়ণ রায়**—ইহার পরিচয় সম্বন্ধে এই পুস্তিকার ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) **লক্ষ্মণমাণিক্য**—ইহার পরিচয় সম্বন্ধে এই পুস্তিকার ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) **চাঁদ রায়, কেদার রায়**—আকবর বাদশাহের রাজত্বের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে কর্ণাটক প্রদেশ হইতে নিমু রায় নামক জনৈক ব্যক্তি বিক্রমপুরের অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া গ্রামে আসিয়া বাসস্থান সংস্থাপন করেন। এই নিমু রায়ের বংশে খ্যাতনামা চাঁদ রায় ও কেদার রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দে বংশীয় কায়স্থ ছিলেন।* ঢাকা জিলার অধীন বিক্রমপুর পরগণার অন্তঃপাতী ফুলবাড়িয়া ও শ্রীপুর গ্রাম কীর্ত্তিনাশা নদীর পাড়ে অবস্থিত ছিল এবং উক্ত রায় রাজগণের রাজধানী শ্রীপুরে অবস্থিত ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তখন বারভূঁঞার মধ্যে চাঁদ রায়, কেদার রায় সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ও অগ্রণী ছিলেন। চাঁদ রায়ের সহিত তাঁহার প্রধান অমাত্য শ্রীমন্ত খাঁর, কোটীশ্বর বিগ্রহের সেবাইত নিয়োগ উপলক্ষে মনোমালিন্য হয় এবং উক্ত মনান্তরের ফলে বিশ্বাসঘাতকতাক্রমে খিজিরপুরে ঈশা খাঁ মশনদ আলীকে চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণমণিকে অর্পণ করেন। শ্রীমন্ত খাঁ বালবিধবা স্বর্ণমণিকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ি চন্দ্রদ্বীপ আনিবার ছলে খিজিরপুর গিয়া ঈশা খাঁকে উক্ত কন্যারত্ন প্রদান করেন। ইহাতে ঈশা খাঁর সহিত চাঁদ রায়ের যুদ্ধ হয়; তাহাতে চাঁদ রায় ঈশা খাঁর কলাগাছিয়া ও ত্রিবেণী দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া খিজিরপুর লুণ্ঠন করিয়া বিক্রমপুরে প্রত্যাগমন করেন এবং কন্যাশোকে অচিরকাল মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হন। চাঁদ রায়ের লোকান্তরে কেদার বায় বিক্রমপুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের এক যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে মানসিংহ কেদার রায়কে কর দিতে বাধ্য করেন। সেই যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বিশেষভাবে আহত হন।

কেদার বাড়ি—কেদার রায় বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুর পবগণাদ্বয়ের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বাড়ি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহার চতুর্দিকে সুপ্রশস্ত পরিখাদ্বারা পবিবেষ্টিত হইয়াছিল। ঐ পরিখা সমাচ্ছন্ন স্থান অদ্যাপি কেদার বাড়ি বলিয়া বিখ্যাত আছে। বর্ত্তমানে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত পালং থানার অধীন উক্ত কেদার বাড়ি গ্রাম অবস্থিত আছে। এখানে বরিশাল শহরের সাহা জাতীয় ধনী যুধিষ্ঠির ও ভীমচন্দ্র সাহার বাড়ি। এখানে কেদার রায়ের জাঙ্গাল নামে একটি প্রকাণ্ড জাঙ্গালও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রাজবাড়ির মঠ—কীর্ত্তিনাশা নদীতটে একটি একুশরত্ন মঠ আছে, উহা কেদার রায়ের আমলের এক প্রাচীন কীর্তি। কীর্ত্তিনাশা নদী চাঁদ রায়, কেদার রায়ের প্রায় সমস্ত কীর্ত্তিই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি এই প্রাচীন মঠটির অস্তিত্ব লোপ কবে নাই।

* এ বিষযেব প্রমাণ জন্য ডাক্তাব জেমস ওযাইজেব ১৮৭৪ সনেব এসিযাটিক সোসাইটিব জার্নাল নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন কালীক্ষেত্র—চাচুরতলা ঠাকুরাণ বাড়ি এবং মাঐসারের দিগম্বরী বাড়ি কেদার রায়ের আমল হইতে বিশেষ প্রত্যক্ষ দেবালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। প্রবাদ আছে, চাচুরতলাতে ব্রহ্মানন্দ গিরি এবং মাঐসারে কেদার রায়ের ইষ্টদেব গোসাঞি ভট্টাচার্য্য সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ঈশাখাঁ মসনদ আলী—ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে ঈশাখাঁর রাজধানী খিজিরপুর অবস্থিত আছে। এই স্থানে বারভূঁঞার অন্যতম ভূঁঞা ঈশাখাঁ রাজধানী স্থাপন ও এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান সময় খিজিরপুর অন্তর্গত কতক স্থান গভর্নমেন্টের খাসমহল অন্তর্গত। উহার তৌজির নম্বর ৯৮৭১। ঈশা খাঁর পিতা হিন্দু ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল কালিদাস। ইনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুলেমান খাঁ নামে পরিচিত হন। বর্ত্তমানে ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ির নিকট কোচজাতীয় লক্ষ্মণ হাজোয়া নামক এক ব্যক্তি শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঈশা খাঁ ঐ স্থান আক্রমণ করিয়া লক্ষ্মণ হাজোয়াকে পরাজিত করেন এবং তথায় একটি বাড়ি নির্ম্মাণ করেন; এক্ষণ তাঁহার সন্ততিগণ উক্ত জঙ্গলবাড়িতেই বাস করিতেছেন। ঈশাখাঁর দুই পুত্র ; প্রথম-দেওয়ান মুশা খাঁ, দ্বিতীয় দেওয়ান মহম্মদ খাঁ। খিজিরপুরের নিকট ঈশা খাঁর প্রপৌত্রের নাম মনোর খাঁর নামানুসারে 'মনোরবাগ' গ্রাম আছে। তথায় ১৯০৯ সালে একজন কৃষক হলচালাকালে ঐ স্থলের ভূগর্ভ হইতে সাতটি কামান প্রাপ্ত হয়। উহার প্রথমটিতে ঈশা খাঁর নাম খোদা আছে। উহার একটির নম্বর ১০০২। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে ঈশা খাঁ পরলোকগমন করেন।

(৬) ফজেল গাজী ও চাঁদ গাজী—বর্ত্তমান ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভাওয়াল ও বন ভাওয়াল স্থানে যে তিনটি প্রাচীন রাজবাড়ির দৃষ্ট হয়, তথায় শিশুপাল নামে এক হিন্দু রাজা বাস করিতেন। দিল্লী হইতে ফজেল গাজী নামিক একজন সৈনিক আসিয়া কেদার রায়ের কিছু করিতে না পারিয়া ভাওয়ালের শিশুপাল রাজাকে বধ করিয়া তাঁহার রাজধানী অধিকার করেন। এই গাজী বংশের চাঁদ গাজীর নামানুসারে ঐ পরগণার নাম চাঁদপ্রতাপ হইযাছে। চাঁদ গাজীর সেনাপতি সঞ্জয় হাজরার বংশধরেরাই বর্ত্তমানে ঐ পরগণার জমিদার বলিয়া পরিচিত আছেন।

(৭) মুকুন্দরাম রায়—বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মধুমতী নদীর পূর্ব্বতীরে ভূষণা নামক স্থানে মুকুন্দরাম রায় বাস করিতেন; তিনি প্রথমত ভূষণার এক সামান্য জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন ; পরে স্বীয় প্রতিভাবলে ভূঁঞাশ্রেণীতে উন্নীত হইয়া, দ্বাদশ ভৌমিকের একজন বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন। তৎকালীন পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল পরাক্রান্ত জমিদারগণ বাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ভূঁঞা পদবাচ্য হন। তন্মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য অকুতোভয়ে বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের বহু সেনাপতিসহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; সুতরাং বারজন ভূঁঞার মধ্যে তাঁহার নামই 'বঙ্গের শেষ বীর' বলিয়া ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

ভূষণাকে পূর্ব্বে ভূষণা মামুদপুর বলিত; কিন্তু গড়ই নদীর গতি পরিবর্ত্তনে মধুমতীর উদ্ভব হইয়া ভূষণা ও মামুদপুরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রাচীনকালের সমৃদ্ধিসম্পন্না ভূষণা এক্ষণে কেবলমাত্র একটি পুলিশ ষ্টেশন বক্ষে ধারণ করিয়া পূর্ব্ব গৌরবের ক্ষীণস্মৃতি জনসাধারণের গোচরীভূত করিতেছে।

আবুল ফজলকৃত আকবরনামা গ্রন্থে মুকুন্দ রায়কে মুকুন্দ জমিদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে এবং হিজরী ৯৮৮ সালে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা দাউদের অধীনে থাকিয়া মোরাদ খাঁ ফতেয়াবাদ নামক বিস্তীর্ণ জনপদ শাসন করিতেন। পাঠান কতলু খাঁ

মোঘল মোরাদ খাঁর শাসনাধীন ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিলে, মুকুন্দ রায় তাঁহার সৈন্যগণসহ কতলু খাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাহাতে উক্ত পাঠান কতলু খাঁ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। রাজা তোডরমল মুকুন্দ রায়কে মোঘলপক্ষাবলম্বী জানিয়া রাজা উপাধি দিয়া ফতেয়াবাদের শাসন-ভার অর্পণ করেন। ফতেয়াবাদ কায়স্থ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মুকুন্দরাম রায় বহুতর নিষ্কর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গাব্দ ৯৯০ সালে দীঘলবালা গ্রাম নিবাসী প্রাণনাথ ভট্টাচার্য্য মুকুন্দ রায় প্রদত্ত যে নিষ্কর সম্পত্তির সনন্দ প্রাপ্ত হন, উক্ত নিষ্কর ১২০৯ তায়দাদে যশোহর কালেক্টরীতে দাখিল আছে।

মুকুন্দরাম রায়ের ছয়টি পুত্র; তন্মধ্যে শত্রুজিৎ রায় ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গের গভর্ণর সুলতান সুজা কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া ঢাকায় প্রেরিত হন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। উক্ত শত্রুজিৎ রায়ের প্রদত্ত একখানি দেবত্র সনন্দ গঙ্গারামপুরের পরেশনাথ স্মৃতিতীর্থের ১৯৩৩ নং তায়দাকে যশোহরের কালেক্টরীতে দৃষ্ট হয়। শত্রুজিৎ রায় ভূষণা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান যশোহর জিলার অধীন শত্রুজিৎপুরে নিজ বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মুকুন্দ রায়ের শাসনাধীন ফতেয়াবাদ বর্ত্তমানে যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর জিলায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

(৮) বিষ্ণুপুরের হাম্বির মল্ল—বর্ত্তমান বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। প্রাচীনকালে ইহাকে বন বিষ্ণুপুরও বলিত। এই স্থানে হাম্বিরমল্ল বা হামীর নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন ; তিনিও দ্বাদশ ভূঁঞার মধ্যে একজন ভূঁঞা ছিলেন। ইনি প্রকাশ্যে তৎকালীন মোঘল বাদশাহের প্রতিকূলাচরণ করেন নাই; কিন্তু পরোক্ষভাবে বঙ্গের অপর ভূঁঞাগণের সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

(৯) সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ—বর্ত্তমান পাবনা জিলার অন্তর্গত চাটমহর থানার অধীন সাতৈল নামক প্রদেশে রাজা রামকৃষ্ণ রাজত্ব করিতেন। রামকৃষ্ণের স্ত্রীর নাম রাণী সর্ব্বাণী। ইহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কালক্রমে নাটোরের রাজা রঘুনন্দন, রাজা রামকৃষ্ণের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেন এবং বর্ত্তমানেও ইহা নাটোর রাজষ্টেটের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে।

(১০) তাহিরপুরের কংশনারায়ণ—বর্ত্তমান রাজশাহী জিলার অন্তঃপাতী তাহিরপুরে কংশনারায়ণ নামে এক ভূঁঞা রাজত্ব করিতেন। ইনি জাতিতে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন; ইনি বারেন্দ্রদের নিরাবিল পটির নিয়ম বন্ধন করেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম শিবপ্রসাদ।

(১১) পুটিয়ার রাজা—রাজশাহী জিলার অন্তর্গত পুটিয়ার রাজবংশ প্রাচীন বারভূঁঞার অন্তর্গত জনৈক ভূঁঞা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। পুটিয়ার রাজবংশ অদ্যাপি তাঁহাদের প্রাচীন জমিদারী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

(১২) দিনাজপুরের রাজা—বর্ত্তমান দিনাজপুর জিলার রাজা প্রাচীন বারভূঁঞার অন্তর্গত জনৈক ভূঁঞা ছিলেন বলিয়া কোন কোন গ্রন্থকার উল্লেখ করেন ; কেহ কেহ বলেন দিনাজপুরের রাজা গণেশ ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। বার ভূঁঞাগণ যে প্রকার বড় বড় জমিদার ছিলেন, তদপেক্ষা দিনাজপুরের রাজার সৈন্য-সামন্ত এবং রাজ্যের সীমানা বহুগুণে বর্দ্ধিত ছিল। যাহা হউক, রাজা গণেশ ও তদ্বাংশধরগণ উত্তর রাঢ়ীয়-কায়স্থ ছিলেন এবং বংশে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

মধুসিংহ ভূমি (ভূঁঞা)

বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জিলার কিছু উত্তরে কোকড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার মধুসিংহ ভূমি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ও পরাক্রান্ত ছিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকেও বার ভূঁঞার মধ্যে ফেলিতে চাহেন; তাহা হইলে ভূঁঞার সংখ্যা দ্বাদশের পরিবর্ত্তে ত্রয়োদশ হইয়া পড়ে।

ব্যক্তিগত আলোচনা

প্রাচীন কালের উপরোল্লিখিত বার ভূঁঞার মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষিত এবং বিদ্বান্ ছিলেন ; তন্মধ্যে যাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা গেল।

(১) প্রতাপাদিত্য

মহারাজ প্রতাপাদিত্য সংস্কৃত, পারশ্য, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি যখন সম্রাট আকবরের দরবার জন্য দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সম্রাট আকবর একদিন সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে একটি সমস্যা পূরণ করিতে আদেশ করেন। সমাগত সভ্যগণ সকলেই এক একটি কবিতা রচনা করিয়া উক্ত সমস্যা পূরণ করেন; সম্রাটের কিন্তু উহার কোনটিই মনোমত না হওয়ায় তিনি পুনর্বার উহা পূরণ করিতে আদেশ করেন। তখন প্রতাপাদিত্য স্বীয় প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পাইয়া সম্রাট সন্নিধানে গমন করত যথাবিহিত অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "জাহাপনার আজ্ঞা হইলে এই সেবক সমস্যা পূরণ করিতে পারে।" সম্রাট সমস্যা পূরণের জন্য আদেশ প্রদান করিলে, প্রতাপ নিম্নলিখিত পাদ পূরণ করিলেন—

সম্রাটের সমস্যা—"সেত ভুজঙ্গিনী যাত চলিহেঁ।" প্রতাপাদিত্যের পূরণ—

শোবর কামিনী নীর নীহারতিরিত ভালিহেঁ
চিরম চরকে গঠন বাজিকে ধারেচ্ছু চল্ল চলিহেঁ॥
রায় বেচারী আপন মনমে উপমাও চারিহেঁ।
কেহঙ্গ মরোরতি সেত ভুজঙ্গিনী যাত চলিহেঁ॥

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এই পাদপূরণ সম্রাটের মনোমত হওয়ায় তিনি প্রতাপকে বহুমূল্য দ্রব্য পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন এবং এই সূত্রপাতে বাদশাহের সুনজরে পড়িয়া অচিরকাল মধ্যে নিজ নামে যশোহর রাজ্যের সনন্দ গ্রহণপূর্বক যশোহরে প্রত্যাবর্তন করেন।

(২) কেদার রায়

বঙ্গদেশীয় বার ভূঁঞাগণ বাদশাহ আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হওয়ার ষড়যন্ত্র করিলে বাদশাহ আকবর রাজা মানসিংহকে বারভূঁঞা দমন জন্য প্রভূত সৈন্য-সামন্ত দিয়া বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। তদনুসারে সেনাপতি মানসিংহ শ্রীপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া কেদার রায় নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। ঐ দূতের নিকট শৃঙ্খল ও তরবারী দিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, যদি কেদার রায় শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হইবে না; নচেৎ তরবারী গ্রহণ ও শত্রুভাব প্রকাশ করিলে তাঁহাকে অবশ্য দমন করিতে হইবে। ঐ দূতের নিকট রাজা মানসিংহ নিম্নলিখিত শ্লোকযুক্ত একখানি চিঠি প্রেরণ করেন; তাহা এই—

ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী

সকল পুরুষমেত ভাগ যাও পালায়ী।
হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষম সমরসিংহো মানসিংহ প্রয়াতি॥

উক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া কেদার রায় শ্লোকের উত্তরসূচক আর একটি শ্লোক লিখিয়া দূতের হস্তে দিয়া বলিলেন, যাও দূত এই শ্লোকটি তোমার প্রভুকে দিয়া বলিও যে, আমি তরবারী গ্রহণ করিলাম। শ্লোকটি এই—

ভিনত্তি নিত্যং কবিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতি রেকম্।
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

এই পুস্তিকার ৫০ পৃষ্ঠায় লক্ষ্মণমাণিক্যের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইঁনি যেমন বীরপুরুষ ছিলেন, তেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি 'বিখ্যাত বিজয়' নামে একখানি সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ নাটকের সূত্রধর প্রস্তাবটা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। সংস্কৃত ভাষাবিৎ ব্যক্তিগণ ইহা দ্বারা লক্ষ্মণের পাণ্ডিত্য অনুভব করিতে পারিবেন। অর্জুন কর্তৃক কর্ণবধ অবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছিল। যথা,—

'প্রক্ষাবৎ পরিতোষ নিস্তুল মহামাণিক্য রত্নাকরঃ।
প্রাক্ সৎপুরুষ পৌরুষোৎকর কথা স্রোতস্বতী ভূধরঃ॥
দৃপ্যচ্চারণ চাতুরী মধুকরী প্রগল্ভ্য পুষ্পাকরঃ।
শ্রীলক্ষ্মণ ভূপতের ভিনবস্তদৃক প্রবন্ধোত্তরঃ॥
আশ্রয়ের যস্য রাজা নস্তস্য বীর রসস্য চেৎ।
প্রবন্ধো ভূ ভূজাবন্ধস্তস্মিন্নৌ পয়িকশ্রমঃ॥

বারভূঁঞাগণ জমিদার হইলেও তাঁহাদের রাজপ্রাসাদ, সৈনিকাবাস, বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার, এবং অন্যান্য সমস্তই রাজোচিত বন্দোবস্ত ছিল। তাঁহাদের সময় দুর্ভিক্ষ, মহামারী অতি অল্পই সংঘটিত হইত। ইহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ ও দেব-দ্বিজে ভক্তিমান ছিলেন। ইহাদের সময় টাকায় ৮ মণ চাউল ছিল এবং অবাধ বাণিজ্যের ফলে বঙ্গদেশ অন্নাভাবে হাহাকার করিত না। ইহাদের সময় বস্ত্রের জন্য বিদেশী কলওয়ালার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না। ইহাদের সময় কলের ভেজাল কটু তৈল ছিল না; ইহাদের সময় চর্ব্বি মিশ্রিত ঘি ছিল না; ইহাদের সময় যুবকগণ 'সর্ট সাইট' বলিয়া চশমা পারিতেন না এবং ২০ বৎসর বয়স্ক যুবকের চুল পাকিত না; ইহাদের সময় ব্রহ্মচর্য্যবিহীন ভগবদুপাসনাশূন্য ব্রাহ্মণ ছিল না; ইহাদের সময় বিচারালয়ে প্রত্যহ হাজার হাজার মিথ্যা এফিডেবিট পাশ করিতে হইত না এবং টাকা কর্জ্জ নিয়া কেহ মিথ্যা জবাব দিত না। পুনরপি কবে সেই ধর্ম্মে মতি ফিরিয়া আসিবে, আবার কবে সেই সংস্কৃত সামগানে বঙ্গদেশ মুখরিত হইবে, সর্বনিয়ন্তা যিনি, তিনিই ইহা বলিতে পারেন, জনৈক ক্ষুদ্র বাঙালির পক্ষে ইহা বলা সম্ভবপর নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের খারিজা পরগণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) নিরিধি বন্দর (বরিশাল টাউন), (২) বোজরোগ উমেদপুর, (৩) হাবেলী সেলিমাবাদ, (৪) হাবেলী, (৫) ইদিলপুর, (৬) নাজিরপুর, (৭) রত্নদী কালিকাপুর, (৮) কৃষ্ণদেবপুর, (৯) রামহরিচর (১০) কল্‌মিচর, (১১) সুলতানাবাদ, (১২) জাফরাবাদ রফিয়ানগর, (১৩) খাঞ্জাবাহাদুপ্প নগর, (১৪) আবদুল্লাপুর, (১৫) আজিমপুর, (১৬) ইদ্রাকপুর, (১৭) রসুলপুর, (১৮) বঙ্গরোড়া, (১৯) কোটালীপাড়া, (২০) জালালপুর, (২১) হবিবপুর (২২) সায়েস্তাবাদ, (২৩) সায়েস্তানগর, (২৪) কাদিরাবাদ, (২৫) কাশীমপুর শেলাপট্টি, (২৬) মাদারীপুর, (২৭) রামনগর, (২৮) সফিপুরকালা, (২৯) আমিরাবাদ, (৩০) বীরমোহন, (৩১) গোপালপুর, (৩২) দুর্গাপুর, (৩৩) সাহাজাদপুর, (৩৪) বৈকণ্ঠপুর, (৩৫) আওরঙ্গপুর, (৩৬) গোপীনাথপুর, (৩৭) সৈদপুর, (৩৮) নাজিরপুর।

উক্ত পরগণা সমূহের মধ্যে কোটালীপাড়া, মাদারীপুর, গোপীনাথপুর এই তিনটি পরগণা সম্পূর্ণ ফরিদপুর কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত হইয়াছে এবং বৈকুণ্ঠপুর, আমিরাবাদ, সফিপুরকালা, কাশীমপুর, শেলাপট্টি, রামনগর, কাদিরাবাদ, জালালপুর, ইদ্রাকপুর, রসুলপুর, ইদিলপুর, হবিবপুর—বরিশাল ও ফরিদপুর উভয় জিলার কালেক্টরীতে ঐ সকল পরগণার রাজস্ব দাখিল হইয়া থাকে এবং ঐ সকল পরগণার জমিগুলি উভয় জিলায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

হাবেলী সেলিমাবাদের রাজস্ব বরিশাল ও খুলনা জিলার কালেক্টরীতে দাখিল হইয়া থাকে এবং উক্ত পরগণার জমিসমূহ বরিশাল ও খুলনা জিলাভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

উক্ত পরগণাগুলির অধিকাংশ নামই মুসলমান নামের আদ্যক্ষর বা সম্পূর্ণ যথা—সায়েস্তানগর, সায়েস্তাবাদ, আলীনগর, রসুলপুর, সফীপুর, বোজরোগ, উমেদপুর, আবদুল্লাপুর ইত্যাদি এবং এই সকল নাম তৎকালীন স্থানীয় গভর্নর বা স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোকের নামে সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। চন্দ্রদ্বীপের রাজার যখন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, তখন জনসংখ্যা ও লোকের বসতি খুব কম ছিল এবং উপরোক্ত পরগণার অধিকাংশের অন্তর্গত জমিগুলি বিলমিলে পরিণত ছিল এবং উহা অল্পসংখ্যক লোকেরই বাসোপযোগী হইয়াছিল। তৎপর রাজার অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইতে আরম্ভ হওয়ায় উক্ত পরগণার সৃষ্টিকারী কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদার ভাবে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন মহানুভব লর্ড কর্নওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে যখন জমিদারী বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়, তখন ঐ সকল পরগণার স্থান নিয়া তত্তৎ স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ লর্ড কর্নওয়ালিসের সহিত বন্দোবস্ত করেন। তখন চন্দ্রদ্বীপের নাবালক রাজা জয়নারায়ণের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারিগণ আপন আপন উদর পূরণের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। নাবালক রাজার দিকে তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া জমিদারী রক্ষা করিবার কোন উপযুক্ত লোক ছিল না; সুতরাং চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য হইতে খারিজ হইয়া উল্লিখিত বহু পরগণা স্বাতন্ত্র্য বন্দোবসন্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় যাঁহারা এই বৃত্তান্ত পাঠ

করিবেন, তাঁহারা হয় ত মনে করিবেন যে, ইহা লেখকের কল্পনা এবং একদেশদর্শিতামূলক উক্তি, বস্তুত তাহা নহে। পরগণা সৃজন সময় যে সকল বন্দোবস্ত রোবকারি লিখিত হইয়াছে, তাহা বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা ও খুলনার কালেক্টরীতে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; তাহা দৃষ্টি করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। উহার প্রত্যেক নূতন পরগণার সঙ্গেই গয়রহ শব্দ সংযোগ করার আদেশ আছে। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, কোটালীপাড়া, ইদিলপুর ও বোজরোগ উমেদপুর পরগণাত্রয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহু পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ হইতে খারিজ হইয়া স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিয়াছিল। ঐ সকল পরগণাগুলি ছোট বড় উভয় প্রকার ছিল; কারণ পরগণা সৃষ্টির সময় উহার তৎকালীন ভূম্যধিকারী যে প্রকার প্রবল ও ক্ষুদ্র ছিলেন, পরগণাও তদ্রূপ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হইয়াছিল; অমরাপুর নামে একটি পরগণা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমানে খাসমহলভুক্ত আছে; উহা এত ক্ষুদ্র যে উহার সরকারী রাজস্ব বার্ষিক ৭৯০ আনা মাত্র।

খারিজা তালুক

মহানুভব লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক জমিদারী বন্দোবস্ত হইলে, পরে জমিদারীর নিম্নস্থ হকিয়তদাগণ জমিদারের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তিপ্রয়াসে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত হকিয়তগুলি বন্দোবসন্ত করিয়া খাস গভর্নমেন্টের অধীনে থাকার প্রার্থনা করিলেন, সদাশয় বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাহাদের প্রার্থনা ও উপেক্ষা করিলেন না। উক্ত মধ্যস্বত্ত্বাধিকারিগণের রাজস্ব তদুপরিস্থ জমিদারী হইতে বাদ দিয়া তালুক, ওসত তালুক, নিম্ন ওসত তালুক, এমনকি হাওলা স্বত্বের মালিকানা সহিতও বন্দোবস্ত করিলেন। বরিশাল কালেক্টরীতে ২০৪৬নং তৌজীতে হাওলা তিহাই নামে একটি মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, উহা উদাহরণ স্বরূপ এখানে প্রদত্ত হইল। এই প্রকারে প্রত্যেক পরগণা হইতেই বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, ইহাকেই বর্ত্তমানে খারিজা তালুক ও খারিজা হাওলা বলে। বরিশাল কালেক্টরীর অধীন যত পরগণা আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গরোড়া পরগণায় যত মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এতগুলি আর কোন পরগণায় দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গরোড়া পরগণাটি সম্পূর্ণ বর্ত্তমান গৌরনদী থানার অন্তর্গত। এই পরগণায় ৯৩৯ খানি খারিজা তালুক সৃষ্টি হইয়াছিল। গৈলা গ্রামের লুপ্ত মানসী গ্রামে একখানি খারিজা তালুক আছে, তাহার সরকারি রাজস্ব ৪ পাই মাত্র ; এই তালুকের অন্তর্গত জমি সবেমাত্র অর্দ্ধকাণি পরিমিত একখানি তালভিটা, ইহাতে বহুকালের কয়েকটি তালবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। বাঙ্গরোড়া পরগণার জমিদারীর বার্ষিক সদর রাজস্ব ৩৬৫/৯৯৷৷ পাই এবং ৯৩৯ খানি খারিজা তালুকের বার্ষিক সদর রাজস্ব ২০৭২৪৯৯ পাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সম্ভবত এ জিলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গৌরনদী থানার লোকসমূহ সমধিক শিক্ষিত ছিল; এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক বন্দোবস্ত দ্বারাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গরোড়া পরগণার পরে বোজরোগ উমেদপুর পরগণার অধীন ৪০৭ খানি, উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার অধীন ২৯৪ খানি, ইদিলপুরের অধীন ১১৯ খানি এবং সায়েস্তানগরের অধীন ১৬১ খানি খারিজা তালুক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়

বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপ পরগণার মালিকগণের পরিচয়

আধুনিক চন্দ্রদ্বীপ পরগণা বাখরগঞ্জ কালেক্টরীর তিনটি তৌজীর অধীন ; যথা—১৭২০ নং হিস্যে ॥ ১২॥ ক্রান্তি, ১৭২১-১৭২২ হিস্যে। ১০ আনি এবং ১৭২৩ হিস্যে ১৭। ক্রান্তি। এই তিনটি তৌজীর মধ্যে মধ্যে ১৭২০ নং তৌজীর মালিক মাধবপাশা নিবাসী সাহাজাতীয় বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী গং, ১৭২১ ১৭২২ নং তৌজীর মালিক কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট সি. আই. ই. এবং ফরিদপুর জিলার অধীন বাইশরশির জমিদার শ্রীযুক্তা কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণী ও শ্রীযুক্তা শিবসুন্দরী চৌধুরাণী এবং ১৭২৩ নং তৌজীর মালিক বরিশাল টাউনের জমিদার বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্ম্মণ; উক্ত তৌজীত্রয়ের মালিকানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৭২০ নং তৌজী

এই তৌজীর ষোল আনি রকমের হিস্যে ॥ ১২॥ ক্রান্তির অংশে নিম্নলিখিত মালিকগণ বর্ত্তমান আছেন।

(১) বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী জমিদার মাধবপাশা হিং । — ১৫ গণ্ডা।
(২) বাবু হীরালাল রায় চৌধুরী " " — ১৫ গণ্ডা।
(৩) সারদাসুন্দরী চৌধুরাণী স্বামী মৃত গুরুদাস সাহা চৌধুরী স্থলে বর্ত্তমান দখিলকার শচীনাথ সাহা হাল সাকিন বরিশাল পূর্ব্ব মালিক কালীকুমার রায় চৌধুরী হইতে প্রাপ্ত — ॥ ৭॥ গণ্ডা।
(৪) বাবু বিরাজমোহন রায় চৌধুরী এবং তাঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয় হাল সাকিন বরিশাল, শ্রীনাথ রায় চৌধুরী হইতে প্রাপ্ত — ৫ গণ্ডা।
(৫) শ্যামলাল রায় চৌধুরী জমিদার মাধবপাশা ... — ০ আনি।
(৬) বাবু রাধারমণ রায় চৌধুরী এবং তাঁহার মাতা ভাগ্যবতী চৌধুরাণী জমিদার মাধবপাশা — ১০ গণ্ডা।
(৭) নিস্তারিণী চৌধুরাণী জমিদার মাধবপাশা... — ১০ গণ্ডা।
(৮) মৌলবী এ. কে. ফ্জলুল হক্ এম্. এ. বি. এল. এবং মৌলবী মহম্মদ এছমাইল খাঁ চৌধুরী চড়ামদ্দী... — ৭॥ গণ্ডা।

১ টাকা

মাধবপাশার সাহা জমিদার

মাধবপাশা নিবাসী বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী এবং হীরালাল রায় চৌধুরী ও বাবু শ্যামলাল রায় চৌধুরী পূর্ব্বাধিকারী পরলোকগত রামমাণিক্য সাহা চৌধুরী ১২০৬ সালে ঢাকার কালেক্টরীর নিলামে আধুনিক চন্দ্রদ্বীপ পরগণার ॥ ১২॥ ক্রান্তি অংশ খরিদ করেন। উক্ত রামমাণিক্য সাহা হইতে তাঁহার অধস্তন বংশধরগণের নিম্নলিখিত বংশপত্রিকা দেওয়া গেল। রামমাণিক্যের অপর ভ্রাতৃত্রয়ের নাম, —(২) রঘুনাথ, (৩) রাধাকৃষ্ণ, (৪) শ্যামরাম।

রামমাণিক্যের দুই পুত্র —(১) রামকানাই, (২) বলাম। রামকানাইর পুত্র গুরুদাস ও দীনবন্ধু। গুরুদাসের পুত্র কালীকুমার এবং দীনবন্ধুর পুত্র রাজকুমার; রাজকুমারের পুত্র বিহারীলাল রায় চৌধুরী। বলরামের দুই পুত্র গোলাপ ও গোবিন্দ। গোপালের পুত্র দ্বারকানাথ, রাধামাধব ও ব্রজনাথ।* গোবিন্দের পুত্র প্যারীমোহন; প্যারীমোহনের পুত্র শ্যামলাল রায় চৌধুরী। রামমাণিক্যের ভ্রাতা রঘুনাথের চারিপুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। তন্মধ্যে রাম, লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন নিঃসন্তান। ভরতের পুত্র রাজবল্লভ; তৎপুত্র মধুসূদন, তৎপুত্র হীরালাল রায় চৌধুরী। রামমাণিক্যের অপর ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণের পুত্র গৌরকিশোর, তৎপুত্র শ্রীনাথ, তৎপুত্র গোলকনাথ রায় চৌধুরী। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামরামের পুত্র মথুরানাথ, তৎপুত্র বর্ত্তমান বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী। উক্ত রাজকুমার রায় চৌধুরীর অংশ নিলাম হইলে, হাইকোর্টের উকিল মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক্ এম্. এ. বি. এল. এবং চড়ামদ্দীর জমিদার মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁ চৌধুরী খরিদ করেন। শ্রীযুক্ত নিস্তারিণী চৌধুরাণী পরলোকগত রাজবল্লভ রায় চৌধুরীর কন্যা ; ইঁনি গোলকনাথ রায়ের অংশ হইতে জমিদারীর ১০ অর্দ্ধ আনা অংশ খরিদ করিয়াছেন। সারদাসুন্দরী চৌধুরাণী পরলোকগত কালীকুমার রায় চৌধুরীর অংশ খরিদ করিয়াছেন। বাবু বিরাজমোহন রায় চৌধুরী এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় বাবু নলিনীমোহন রায় চৌধুরী ও রমণীমোহন রায় চৌধুরী—ফরিদপুর জিলার অধীন উলপুর নিবাসী বরিশালের ভূতপূর্ব স্বনামপ্রসিদ্ধ উকীল পরলোকগত নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র, তাঁহারা গোলোকনাথ বাবুর অংশ হইতে চন্দ্রদ্বীপের ৫ গণ্ডা অংশ খরিদ করেন। বিরাজবাবু বরিশাল মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারি এবং বরিশাল টাউনের সকল শ্রেণীয় লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ; ইনি নিস্বার্থভাবে বরিশাল টাউনের কল্যাণ কামনায় অনধিক ১৫ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে মিউনিসিপাল সেক্রেটারির কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

মাধবপাশা রাজবাড়ির উত্তর দিকে রামমাণিক্য সাহা চৌধুরীর বাড়ি। এই বাড়িতে বৃহৎ বৃহৎ দ্বিতল ইষ্টকালয় ও দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এই সাহা জমিদারগণ বসতি করিতেছেন। বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরীর পিতামহী পরলোকগতা পার্বতী চৌধুরাণী সাধারণের কষ্ট অপনোদন জন্য মাধবপাশা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন; অদ্যাপি ঐ রাস্তাকে 'পার্ব্বতী চৌধুরাণীর রাস্তা' বলিয়া থাকে। ঐ রাস্তা বর্ত্তমানে বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টবোর্ড গ্রহণ করিয়া মেরামত করত ইহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন। পার্ব্বতী চৌধুরাণী হিন্দুর পবিত্র তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনধামে এক দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কালাচাঁদ নামে একটি বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন এবং একটি কৃত্রিম কুঞ্জবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; অদ্যাপি তথায় তৎকৃত অতিথিশালা ও উক্ত বিগ্রহের অর্চনা চলিতেছে। তিনি বৃন্দাবনধামে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া তথায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। মাধবপাশাতে পার্বতী চৌধুরাণী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কারুকার্য্য সমন্বিত ২৪ চাকাবিশিষ্ট একখানি রথ প্রস্তুত করিয়া তাহা চালাইতেন। তাঁহার লোকান্তরেও কিছুদিন উক্ত রথের অস্তিত্ব ছিল ; কিন্তু রাজকুমার বাবুর বিবাহের সময় উক্ত রথগৃহে বাজীর আগুন পড়িয়া রথখানি ভস্মীভূত হইয়া যায়। রামমাণিক্য সাহা একজন পরদুঃখকাতর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণের কষ্টের কথা অবগত হইয়া বহু অর্থ ব্যয়ে বরিশালের পূর্ব্বদিকে সাহেবের হাট হইতে উটমপুরের নদী পর্য্যন্ত একটি ভারানী খাল কাটাইয়া দিয়াছিলেন; লোকে অদ্যাপি এই খালটিকে

* উক্ত দ্বারকানাথ ॥ ৬॥ ক্রান্তি, ব্রজনাথ ॥ ৬॥ ক্রান্তি এবং রাধামাধব ॥ ৬॥ ক্রান্তি একনে কুড়ি গণ্ডায় ১০ গণ্ডা রাধাচরণ বাবুর মাতা ভাগ্যবতী চৌধুরাণী খরিদ করেন ; অবশিষ্ট ১০ গণ্ডা বরিশাল টাউনের প্রসিদ্ধ ধনী গোবিন্দমোহন রায় চৌধুরী খরিদ করিয়াছেন।

'রামমাণিক্যের ভারানী' বলিয়া থাকে। সাম্প্রতিক এই খালটি মজিয়া যাওয়ায়, স্থানীয় ডিস্ট্রিক্টবোর্ড বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পুনরায় উক্ত খালটির পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন'। রাধাচরণ বাবুর বাড়ি হইতে প্রতি বৎসর দুর্গাসাগরের উত্তর পাড়ে চৈত্র বৈশাখ মাসে পথক্লিষ্ট পথিকগণের কষ্ট প্রশমনার্থে জলছত্র দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে পথিকগণ প্রত্যেকে আহার্য্যার্থ এক গ্লাস জল, কিছু মিষ্ট ও কিছু ফল পাইয়া থাকেন ; উহাতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর পথিকের ক্ষণিক ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে। উক্ত জমিদারবাড়িতে একটি পোষ্টাফিস ও একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত আছে। ইহাদের বাড়ি বার মাসে তের পার্বণ হয়। বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে একটি নিয়ম-সেবার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাতে একমাসকাল বহু বৈষ্ণব ও কাঙ্গালী ভোজন করিয়া থাকে।

তৌজী নম্বর ১৭২১-১৭২২

উল্লিখিত দুই তৌজীর রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অংশ বর্ত্তমানে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের শাসনাধীন আছে। জিলা চব্বিশ পরগণার কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস বর্ত্তমান ঠাকুর ওয়ার্ড ষ্টেটের ম্যানেজার, ১৭২১ ও ১৭২২ নং তৌজীর বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—বঙ্গাব্দ ১২০২ সালে চন্দ্রদ্বীপের রকম ১২॥ গণ্ডা অংশ নিলাম হইলে মিঃ জন পেনেটী খরিদ করেন, তাহা নিয়া ১৭২১ নং তৌজী গঠিত হয়। ১২০৪ সালে ১৭॥ গণ্ডা অংশ উক্ত পেনেটী সাহেব খরিদ করেন, তদ্দারা ১৭২২ নং তৌজী গঠিত হয়। উক্ত নিলাম খরিদের পরে পেনেটী সাহেবের ওয়ারিশসূত্রে তদীয় দৌহিত্র ফুলী সাহেব উক্ত। ১০ আনি অংশের ষোল আনি রকমের। ১৩ ক্রান্তি অংশ প্রাপ্ত হন। মিঃ পেনেটী সাহেব ভাগ্যকুল নিবাসী বর্ত্তমান রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ মথুরামোহন রায়ের সরকারে কতক দেনা ছিলেন, উক্ত দেনার দায়ে উক্ত মথুরামোহন রায় হিস্যে ৯৩॥ ক্রান্তি অংশ নিলাম খরিদ করেন। উক্ত ফুলী সাহেবের ১৩ ক্রান্তি অংশ হইতে নিকলিস্ কালানুস্ সাহেব ১৭॥ ১০ দন্তি অংশ প্রাপ্ত হন ; পরে ঐ অংশ বাইশরশির জমিদার নীলকণ্ঠ বাবু ও বৈকুণ্ঠরাম বাবু খোদ খরিদ করেন। উক্ত ১৭॥ ১০ ডিসিম অংশ বাদে বাকী ২।৭০ ডিসিম অংশ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিঃ জন পেনেটী ও মিঃ ফুলী সাহেব এবং মথুরামোহন রায় হইতে খরিদ করেন। উক্ত দুই তৌজীর অন্যতম স্বত্বাধিকারিণী শ্রীযুক্তা কামিনী সুন্দরী চৌধুরাণী এবং শ্রীযুক্তা মঞ্জুরী চৌধুরাণী ফরিদপুর জিলার অধীন বাইশরশি নিবাসী পরলোকগত স্বনামপ্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠ রায় চৌধুরীর পুত্রবধূ এবং শ্রীযুক্তা শিবসুন্দরী চৌধুরাণী উক্ত বাইশরশি নিবাসী পরলোকগত বৈকুণ্ঠরাম রায় চৌধুরীর পুত্রবধূ। বরিশাল জিলায় ইহারা প্রসিদ্ধ জমিদার বলিয়া খ্যাত। ইহাদের বরিশালস্থ জমিদারীর আয় লক্ষ টাকার উপরে হইবে। পটুয়াখালী মহকুমার অধীনে বাউফলে ইহাদের সদর কাছারী সংস্থাপিত আছে ; এ জন্য ইহাদের বরিশালস্থ জমিদারীকে বাউফল ষ্টেট বলিয়া থাকে।

১৭২৩ নং তৌজী

বরিশাল টাউনের জমিদার বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্ম্মণের পূর্বাধিকারী পরলোকগত বাবু দলসিংহ বর্ম্মণ বঙ্গাব্দ ১২০০ সালের শেষভাগে ঢাকা কালেক্টরীর প্রথম নিলামে বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপ পরগণার ১৭॥ ক্রান্তি অংশ খরিদ করেন। তৎকালীন বাখরগঞ্জ জিলার সৃষ্টি হয় নাই। বাবু

দলসিংহ বর্ম্মণ চাকরী উপলক্ষ্যে পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন।* তিনি প্রথমত উত্তর বঙ্গের নাটোর রাজসরকারে মুন্সীসরকারের পদ গ্রহণ করেন এবং তথায় চাকরী উপলক্ষে লগ্নি ও জহরতের ব্যবসা আরম্ভ করেন। তৎপর তথা হইতে উক্ত কারবার উঠাইয়া ঢাকায় আসিয়া উয়ারীতে এক বৃহৎ হাবেলী প্রস্তুত করেন ; অদ্যাপি ঢাকাতে উক্ত হাবেলী 'দলসিংহ বাবুর হাবেলী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১২০০ সালে তিনি চন্দ্রদ্বীপের জমিদারী খরিদ করেন। ক্রমে বাবু দলসিংহ বর্ম্মণ, বাবু গোপালকৃষ্ণ বর্ম্মণ, রাণী গোলাপ দেবী, রাণী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী, বাবু রাজকৃষ্ণ বর্ম্মণ, বাবু নিরঞ্জনপ্রসাদ বর্ম্মণ জমিদারী শাসন করিয়া গিয়াছেন। বাবু নিরঞ্জনপ্রসাদের পরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী শিবদেহী এবং তৎপরে রাণী জ্বালাদেহী বর্ম্মনী জমিদারী শাসন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্ম্মণের শাসনাধীনে উক্ত জমিদারী ন্যস্থ আছে। দলসিংহ বর্ম্মণ হইতে আটজন উত্তরাধিকারী দ্বারা ইহাদের জমিদারীর শাসন চলিয়া আসিতেছে। নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ; যথা—(১) দলসিংহ বর্ম্মণ, (২) রাণী গোলাপ দেবী (স্বামী মৃত দলসিংহ বর্ম্মণ), (৩) রাণী মঙ্গলা দেবী, পিতা মৃত দলসিংহ বর্মন (স্বামী মৃত বিশ্বেশ্বর বর্মার্ণ)। (৪) বাবু রাজকৃষ্ণ বর্ম্মণ (রাণী মঙ্গলা কর্ত্তৃক গৃহীত দত্তক), (৫) রাণী গঙ্গাদেবী (স্বামী মৃত রাজকৃষ্ণ বর্ম্মণ), (৬) বাবু নিরঞ্জনপ্রসাদ বর্ম্মণ (রাণী গঙ্গাদেবীর গৃহীত দত্তক), (৭) রাণী শিবদেহী (স্বামী মৃত নিরঞ্জনপ্রসাদ বর্ম্মণ), (৮) বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্ম্মণ (উইলসূত্রে প্রাপ্ত)।

বিক্রমপুর ভরাকৈর নিবাসী মল্লিক পরিবারস্থ পরলোকগত গঙ্গাপ্রসাদ মল্লিক, তৎপুত্র ঈশানচন্দ্র মল্লিক, তৎপুত্র কালীপ্রসন্ন মল্লিক পুরুষানুক্রমে বহুদিন দেওয়ানের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পাঞ্জাব নিবাসী বাবু বক্তারলাল সিংহ বর্ত্তমানে এই দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, কার্য্যদক্ষ, বিনয়ী এবং বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি। বর্ত্তমানে ইহার চেষ্টা ও যত্নেই এই ষ্টেট এক্ষণতক্ বজায় আছে। বাখরগঞ্জ ষ্টেশনাধীন চড়াদিতে ইহাদের এক কাছারী বাড়ি আছে। এখানে রাণী গোলাপদেবীর নামানুসারে একখানি পুরাতন হাট আছে, এজন্য এ স্থানকে 'রাণীর-হাট' বলে এবং স্থানীয় পোষ্টাফিসের নামও রাণীর-হাট বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। বরিশালের বাজারও এই জমিদারীরই অন্তর্গত। বরিশালের কাছারী বাড়িতে কালীর মন্দির আছে। প্রত্যহ সরকারী ব্যয়ে এখানে পূজা, অর্চ্চনা ও ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে।* *

* কেহ কেহ বলেন বাবু দলসিংহ বর্ম্মণ চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে কিছুকাল চাকরী করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই চন্দ্রদ্বীপ জমিদারী সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল এবং তজ্জন্য তিনি এই দূর প্রদেশস্থ ভূসম্পত্তি নিলাম খরিদ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ রাজবাড়ীর চিল্হছত্রের দক্ষিণাংশে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তার দক্ষিণ দিকে এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডকে 'দলসিংহ বাবুর হাবেলী' বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে।

* * জমিদার স্বর্গীয় শ্রীরঞ্জন প্রসাদ বর্ম্মণের একমাত্র পুত্র, ঐ জমিদারীর উত্তরাধিকারী শ্রীমনোরঞ্জন প্রসাদ বর্ম্মণ, নানাবিধ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানে যুক্ত। তিনি বরিশাল মিয়ুনিসিপালিটির কমিশনার ও বরিশাল সদব হাসপাতালের সম্পাদক ছিলেন। দেশ বিভাগের পর কলিকাতা চলিয়া আসেন। বর্তমানে তিনি ৪, পূরাণচাঁদ নাহার এভিনিউর 'বর্মণ এণ্ড কোং'র মালিক এবং বরিশাল সেবাসমিতির সহ-সভাপতি।

গ্রন্থে ৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কাশীনাথ বসু তালুক (১৭৪৮নং তৌজী) নিষ্কর ব্রহ্মত্ররূপে চন্দ্রদ্বীপের রাজা, পরমপণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ স্বরস্বতীকে দান করেন। তাঁহার পুত্র পণ্ডিত ব্রজকিশোর ন্যায়বাগীশের কোন সন্তান না থাকায় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দত্তক রূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার পৌত্র বর্তমান বরিশাল সেবাসমিতির সম্পাদক শ্রীবাদলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদেব শ্রীদেবকুমার চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকারের বৈবাহিক।—

—বরিশাল সেবাসমিতি

প্রবীণ ব্যক্তিগণের অভিমত

জিলা বাখরগঞ্জের সুযোগ্য এডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ এম. এ. মহাশয় লিখিয়াছেন—

পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিই তাঁহাদের প্রাচীন গৌরবের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলিতে যে শুধুই কেবল সত্যকথা লেখা আছে, তাহা মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই; কিন্তু পূর্ণ সত্যই হউক আর অর্দ্ধ সত্যই হউক, সকল জাতিই ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। অর্দ্ধ সভ্য অহম জাতিরও স্ব-লিখিত ইতিহাস আছে; নাই কেবল হিন্দুর। রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি দুইচারিখানি যাহা আছে তাহাও নগণ্য। হিন্দু পুরাণ লিখিয়া গিয়াছেন, মহাকাব্য লিখিয়াছেন; কিন্তু ইতিহাস বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহা লেখেন নাই। হিন্দু পুরাণকেই ইতিহাস বলিতেন; কিন্তু আমরা ইতিহাস বলিলে History বুঝি। এই জিনিষটাই হিন্দুর কোন কালে ছিল না। এ কলঙ্ক আমাদের রাখিবার স্থান নাই। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের অনেক কৃতী সন্তান এদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন ও কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকার তাঁহাদেরই একজন। ইনি চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার-মানসে বহুদিন যাবৎ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমি অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিলাম। ইতিহাসের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম। বর্ত্তমান গ্রন্থে যে সকল সামান্য অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, আশা করি, ভবিষ্যতে তাহা বিদূরিত হইবে। এ সকল অসম্পূর্ণতা এবং দু-একটী ভুল সত্ত্বেও গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বরিশালকে যাঁহারা ভালবাসেন, বরিশালের প্রাচীন গৌরবকাহিনী যাঁহারা শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই গ্রন্থখানি একবার পড়া উচিত।

বরিশাল
২৫শে শ্রাবণ, ১৩২০ (স্বাঃ) শ্রীযোগেন্দ্রকুমার ঘোষ

দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এম. এ. বি. এল, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পূতপুণ্ড মহাশয়ের 'চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস' দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। তিনি চন্দ্রদ্বীপের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে যে যত্ন ও চেষ্টার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বাখরগঞ্জবাসিগণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার্হ। এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ইহাতে অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার সঙ্কলিত তথ্যগুলি যে যে পুস্তক ও দলিল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ থাকিলে আরও সুন্দর হইত।

৯ই ভাদ্র, ১৩২০। (স্বাঃ) শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত

বরিশালের সিনিয়র সরকারী উকিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বরিশাল শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম. এ. বি. এল, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

বর্তমান সময়ে অতীতকালের প্রকৃষ্ট ইতিহাস জানিবার জন্য অনেকেই সমুৎসুক হইয়াছেন; কিন্তু অতীত ঘটনাবলীর আলোচনা ও অনুসন্ধান করার উপযোগী সুযোগ ও অবসর সকলের ভাগ্যে ঘটে না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রাচীন কাহিনী ও কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া এতদ্দেশবাসী জনসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থখানির বারভূঁঞার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা আছে ; প্রাচীন তথ্যের নির্দ্ধারণে ভ্রম-প্রমাদ অনিবার্য্য। অন্যান্য কিংবদন্তীর সহিত তুলনায় সমালোচিত হইলে এবং স্থানীয় অনুসন্ধানের দ্বারা পরীক্ষিত হইলে, ক্রমে সুসংস্কৃত হইয়া গ্রন্থের উৎকর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-শাখা-সমিতিতে গ্রন্থকার যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে লেখকের অনুসন্ধিৎসা পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, ইহা শাখা-সমিতির বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ইতি—

২০।৮।১৩২০ (স্বাঃ)—শ্রীগণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত



নির্ঘণ্ট

অরঙ্গপুর ২০৬, ৩০৮
অর্জুন ২৩
অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৯৬-৯৭, ২২৭, ২৪৯-২৫০, ৩২১, ৩২৫, ৩৫০, ৪৪৫, ৪৭৪

আওরঙ্গজেব ৬৬-৬৭, ২০৬, ২৯৪
আকবর ৩৭, ৯৬, ১৮৪, ২০৪, ৩৭৪
আইন-ই-আকবরি ৩৩, ৩৭, ৬৬, ৯৬, ১০৫, ১১৬
আগা বাখর ২৫, ৬৭-৬৯, ১০৬, ১৩৬, ৩৬৯
আধুনা ৪৪৮
আবুল কাশেম ফজলুল হক ৪৪২
আবুল ফজল ৫৫, ৬৬
আড়িয়াল খাঁ নদী ৩০, ২৯০, ৩৮৬
আর্মস্ট্রিং ১৭৯
আয়লা নদী ৩০
আরাকান রাজ ৬২
আলিবর্দি ৬৭, ১৩৯
আসমান সিং ২৬৫

ইদ্রাকপুর ১৯৪, ৩০৮
ইদিলপুর ৪৩, ১৭৮, ৩০৫
ইবার খাঁ ২০১
ইলসা নদী ৩০, ৩৮৮
ইস্টবেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন ৬৫
ইসমাইলপুর ৫৬

ঈশা খাঁ ৬৫

উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ৩২৪
উইলিয়াম হান্টার ২৯, ৩১
উইনটেল ২২৩
উজিরপুর ৩৫৩
উত্তর সাহাবাজপুর ১৮৩, ৩০৬, ৩৪৬
উদয়নারায়ণ ৩০৩
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৩৪

কচানদী ৩০
কন্দর্পনারায়ণ ১১৬, ১৪৯, ৩০৬
কলসকাঠি ৩৪০
কাশীপুর ৩৫১
কীর্তনখোলা নদী ২৯০, ৩৮৬
কেওরা ৩৪৪
কেদার রায় ৬৪
কুন্দিহার ৩৬৩
কুলকাঠি ১৭৬
কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ ১৮৮
কৃষ্ণনগর ১৯৭
কৃষ্ণরাম সেন ১৯, ১৫১-৫৫
কাদম্বিনী বসু ৩২৬
কামিনী সেন (রায়) ৩২৬
কলীপদ সেনগুপ্ত ৪৮০
কলীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ৪১৮
কালিমনগর জোয়ার দাসপাড়া ১৯১
কলীশ পণ্ডিত ৪৭৯
কীর্তিনাশা ২৩৯
কীর্তিপাশা ৩৪১, ৪৫৫
কেসি সেন ৫০
ক্ষুদ্রকাঠি-খাপুরা ৪৪৭

খলিসাকোটা ৩৬৪
খারিজা তালুক ৪৬৫
খাজে মাইকেল ১৮৭
খাঞ্জা বাহাদুর নগর ১৯১

গঙ্গা ২৯

গভর্নর বাস্টিটার্ট ১৩৪
গাছপালা ৩৯১
গাভা ৩৫৪
গারুবিয়া ৩৪০
গ্রেদ বন্দর/গিরদ-বন্দর ১৩৪
গিরিজা প্রসন্ন রায়চৌধুরী ২৪৭ ৪৮
গুরুপ্রসাদ রায় ১৭৪
গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ১৫৫
গোপীরমণ সেন ১৯২
গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ২৩৮
গৌরীনাথ ৫২
গৌরীনাথ তর্কবাগীশ ২৩৬
গৌড় ২৭, ৩৮
গৈলা ৩৫৭, ৪৮০, ৪৫১

ঘাঘর নদী ২৮

চন্দ্রদ্বীপ ১০৬-১০৮, ৩০০, ৪৫৯, ৪৬৯
চন্ড-ভন্ড ৪২
চণ্ডাল ৪৩
চণ্ডীচরণ সেন ২৪৪, ৩২৮
চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী ২৯৩
চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য ৪৬১
চন্দ্রপতি (চাঁদবেনে) ৫৩
চন্দ্রহার ৪৪৮
চর ফ্যাসন ৪৫৬
চরামন্দি ৪৪৬
চাউলা সীতারাম ৩৫১
চাখার ৪৫৪
চাঁদমণি দেবী ১৭৪
চাঁদরায় ৬৪
চাঁদসি ৩৫৯, ৪৫২
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১২৭, ৩৭৭
চৈতন্যদেব ৭৩

ছবি খান ৬৯-৭১

জগদীশচন্দ্র ৪৭৭
জন কুরজন ১৮৮
জাতিতত্ত্ব বারিধি ৫০
জানকীবল্লভ ২০৭-২১০
জালালপুর ২০০
জাহাপুর ১৯৪
জাহাঙ্গীর ৬৪
জাহাঙ্গীর নগর ১৮০
জীবজন্তু ৩৯১

ঝালকাঠি ৩৫, ১৫৬, ৪৫৫

টড ৯৫
টোডরমল্ল ৯৬, ৩৭৪

ডবলু ডবলু হান্টার ৯৫, ২২৪, ৫০৭, ৫১১, ৫১৩-১৪
ডমিনিগো ডি সিলভা ১৫৬, ৩০৪

ঢাকা প্রকাশ ৪১৫-৪১৭
ঢাকা বিভাগ ২৮৭
তপ্পে আজিমপুর ১৯৩
তপ্পে আলিনগর ১৮৮
তপ্পে আবদুল্লাপুর ১৯১
তপ্পে কাদারিবাদ ১৯৩
তপ্পে কৃষ্ণদেবপুর ১৮৮
তপ্পে নাজিরপুর ১৮০
তপ্পে বাহাদুরপুর ২০৬
তপ্পে বীরমোহন ১৯৯
তপ্পে হাবেলি ১৭৮
তারপাশা ২৪০, ৩৪৩
তেঁতুলিয়া নদী ৩৮৫
ত্রিপুরা ২৫
ত্রম্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ ৫৮, ১৬৮
ত্রৈলঙ্গস্বামী ২৮

দক্ষিণ সাহাবাজপুর ১৮৫, ৩০৬, ৩৬৬
দক্ষিণচক্র ২৯৪
দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য ১৮২
দীননাথ রায় ৩৪০
দনুজমর্দন ১০৯, ৪৬৯
দয়াল চৌধুরী ১৩৭, ৩৭০
দশশালা ব্যবস্থা ৩৭৭
দুর্গাদাস সেন ১৫৯
দৌলত খাঁ ৩৪, ৪৫৩

ধনঞ্জয়দাস মজুমদার ৪৬০
ধুবরি ২৮
ধর্মরক্ষিণী সভা ২২৯

নগেন্দ্রনাথ বসু ৮০, ৮২
নদনদী ২৯-৩০, ৩৭৮-৩৮৮
নথুল্লাবাদ ৩১৮, ৩৫৩
নবদ্বীপ ১৯৫
নয়পাল দেব ৫১
নয়াভাঙ্গা নদী ২৬১
নরোত্তমপুর ৩৬৩
নলচিড়া ৩৫৬
নলছিটি ৪৫৫
নসরত গাজি ৫৭
নসরত শাহ ৫৭
নাজিরপুর ৩০৬
নারায়ণপুর ৩৫৪, ৪৫০
নিমক মহল ৩৭০
নীহাররঞ্জন রায় ৪৭০
নুলোপঞ্চানন ৮১

নোহালিয়া নদী ৩০
ন্যামত খাঁ ৫৭

পটুয়াখালি ২২, ৩৩৭, ৩৬৫
পদ্মপুরাণ ৩৩৮
পরগনা ১০৩
পরগনে বীরমোহন ১৯৯
পরমানন্দ বসু ১১৫
পাখি ৩৯১
পাদ্রী শিবপুর ১৪৩, ৪৪৯
পাণ্ডব নদী ২৯০
পার্বতী চৌধুরানি ৪৩৩
পাঁচশালা ব্যবস্থা ৩৭৭
পিপড়াকাঠি ১৯৩
পুনিহাটি ৪৫৬
পিরোজপুর ৩৩৭, ৩৬২, ৪৫৪
পীরালী ১২২-২৩
পূর্ণচন্দ্র সেন ৩৫
পোনাবালিয়া ২৭, ৫৮, ১৭০-৭১
প্যারীমোহন দাশগুপ্ত ২৩৯
প্যারীলাল রায় চৌধুরী ৩২৩, ৩৩৪
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ৪২, ৬৪
প্রদর্শনী মেলা ৩৩৭
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩২৫
প্রতাপাদিত্যি ৬৪, ৬৫, ১১৮, ৪৬০
প্রসন্নকুমার সেন ১৯
প্রাগজ্যোতিষপুর ২৩
প্রেমনারায়ণ ৩০৩
প্লেগ মহামারী ২২৭
প্লোটিলা কোম্পানি ২২৬

ফতিয়াবাদ ৫৬
ফরিদপুর ৪১২
ফুল্লশ্রী ১৯৫, ৩৫৭, ৪৫১, ৪৮৭

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮৩
বক্তিয়ার খিলজি ৫০
বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী ২৫৪
বরিশাল ৩৩৬
বরিশাল গান ৩৬
বরিশাল-বুড়ীশ্বর ৩৮৪
বরিশালের উপভাষা ৪৭১
বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি ৪১৮
বলদিয়া ৩১
বলেশ্বর নদী ২৩, ৭৮, ২৯০
বল্লাল সেন ৭৮, ১৯৯
বলীরাজা ২৩
বাইশারি ৪৫০
বাকলা ৪৬৪
বাকরগঞ্জ ৪৪৯
বাকরগঞ্জ হিতৈষিনী সভা ২২৮, ২৪৯, ৩২৬
বাকরগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ ৫০৭
বাগেরহাট ২২৪
বাঙারোড়া ১৯৪, ৩০৮
বাটাজোড় ১৯৬, ৩৫৫, ৪৪৬
বানরিপাড়া ৩৬৩, ৪৫৪
বাংলার শস্যাগার ৩৬৯
বারইকরণ ১৭৬, ২২৩, ২২৪
বারপাইকা ৩৫৩
বার্টন সাহেব ৩৪
বালাকি সাহ ৫০৭
বাসন্ডা ৩৪৫
বাহাদুর দরগাহ ৯৭
বিঘাই নদী ৩০
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৪৭৫
বিজয় গুপ্ত ২৮, ৫২, ১৯৫, ২৪১-৪৪, ৩০৮, ৩২৭, ৩৫৮, ৫০৭
বিটসন বেল ৩২৫, ৩৩১
বিবিচিনি ৫৭
বিভারিজ ২৯, ১৪১, ২২৩, ২৪৯, ৩৭৮-৮০, ৩৯৯-৪০০
বিশখালি নদী ৩০
বিহারীলাল রায় ৩২৫
বীরমোহন ৩০৮
বেঙ্গালা ২৩
বেলদাখান ৩৪৪
বেহুলা ২৮
বোজর উমেদ খাঁ ১৩৭
বোজরগ উমেদপুর ৬৯, ১৩৫, ১৮৬, ৩০৪
ব্রজমোহন বিদ্যালয় ২৮০
ব্রজমোহন দত্ত ১৯৭, ২২৭, ৩৫৫

ব্রজমোহন বিদ্যালয় ২৮০
ব্রজসুন্দর মিত্র ৪৬০
ব্রহ্মপুত্র ২৯
বৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড ৪৬০
ব্রাকম্যান ৫৬

ভাওয়াল ২৫
ভাস্কর পণ্ডিত ৭২
ভোলা ৩৭১, ৩৩৮, ৪৫২
ভৈরবনাথ দত্ত ৩৫৫

মগের গড় ৬৪
মঠবাড়িয়া ৪৫৫
মণিকুন্তলা সেন ৪৭৪
মধুসূদন সরস্বতী ৫২
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ২৫০
মনপুরা ৪৫৩
মলুয়ারাজ ১৯৮
মহম্মদ হানিফ চৌধুরী ৩৪৮
মাছ ৩৮৮
মাধব কর ৫১
মাধবপাশা ৪৪৬, ৪৬১
মানপাশা ৩৬১
মাহিলাড়া ৫৮, ৪৪৬
মুকুন্দদাস ৪৭৭
মুতাক্ষরীণ ৬৬
মুর্শিদকুলি খাঁ ৯৭, ১৭৭, ২৯৩
মিডলটন ২২৪
মি. আলেকজান্ডার ৩৩০
মি. উইস্টল ৩২৯
মি. গেরেট ২২৮
মি. গার্ডনার ৩৩৩
মিরকাশিম ২২২
মির জিম্মন খাঁ ৩৬
মেঘনা ২৩, ২৯, ৭৮, ২৯০
মেলকেয়র ফনসিকা ১১৮
মোয়াজ্জেম ওয়াজীল খাঁ ৫৭
মৈজরদি ২০০
মৌলবি মীর মোয়াজ্জেম হোসেন খান ৩৪৮
মৌলবি সৈয়দ তোফাজ্জল আহম্মদ ৩৪৮
মৌলবি সৈয়দ মজাফর হোসেন ৩৪৮

যমুনা ২৫
যশোহর ২২৪
যামিনী সেন ২৪৯, ৩২৬
যুবরাজ সেলিম ১৪৪
যুধিষ্ঠির ২৩
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ৪১৮

রঘুনাথপুর ২১০
রতনদি কালিকাপুর ১৮১, ৩০৬
রমেল ৬৫
রমাকান্ত রায়চৌধুরী ২০৪
রমেশচন্দ্র দত্ত ৯৫, ৩৩৪, ৩৩৮
রসমতি ৩৪৪
রসুলপুর ১৯৪
রহমতপুর ৩৫২, ৪৪৮
রাজকৃষ্ণ রায় ৩৪০
রাজচন্দ্র রায় ৩২২
রাজবল্লভ রায় ২২২, ২৬২
রাজা উদয়নারায়ণ ১২৪
রাজা প্রতাপনারায়ণ ১২৩
রাজা প্রেমনারায়ণ ১২৪
রাজা বাসুদেব নারায়ণ ১২৩
রাজা রাজবল্লভ ১৩৮
রাজারাম সেন ১৯৯
রাজা রুদ্রনারায়ণ ১৪৮
রাজা শিবনারায়ণ ১২৫
রাজা রামচন্দ্র ৩৬, ৬৪, ১১৮, ১১৯, ৪৬০
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৪৩, ৫১, ৯৫
রাজা রামমোহন রায় ২২৮, ৩১৯, ৪১৪
রানি দুর্গাবতী ১২৬
রামচন্দ্রপুর ৩৬০
রামনগর ১৮৮
রামনারায়ণ সেন ১৮৮
রামবল্লভ রায় ১৭৯
রামভদ্র রায়চৌধুরী ১৭১
রামরত্ন রায় ২৬২
রামসিদ্ধি ৪৪৭
রামনাথ সার্বভৌম ২৩৮
রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন ৫৪
রামপ্রসাদ সেন ১৯২
রামমাণিক্য সাহা চৌধুরি ৪৬৬

রামহরিচর ১৮৯
রায়ের কাঠি ২৩৯, ৪৫৫
রোহিণীকুমার সেন ১৯

লতা ৩৪৬, ৪৫০
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ২২৫
লর্ড ক্যানিং ২২৫
লর্ড ক্লাইভ ২২২, ২২৩
লর্ড কর্নওয়ালিস
লর্ড ডাফরিন ২২৬
লর্ড রিপন ২২৬
লর্ড নথব্রুক ৯৭
লক্ষণ সেন ৫০, ৭৮
লাখুটিয়া ৩৫১, ৪৪৬
লালমোহন ৩৩৯

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ২৩৬
শরিকল ৪৪৭
শাহ্ আলম ২২২, ৩১২
শাহজাদা সুজা ৯৭, ১৪৭, ৩৭৫
শাহজাহান ৬৬

শিকারপুর ২৭, ২৩৮, ৩৫২, ৪৫১
শিয়ালঘুনি ৪৫০
শ্রীনাথ রায় ১৪৫
শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপা
শ্যামরাইল ২৭, ১৭৪
শুকদেব তর্কালঙ্কার ২৩০
শেরশাহ্ ৯৬, ৩৭৪
শোলোক ১৯৮, ৩৫৬

শ্রীরামপুর ১৯১
শ্রীরাম সেন ১৯১
শ্রীরাম রায় ৫৯
সন্দ্বীপ ৬১-৬২
সরকার ফতিয়াবাদ ৫৪
সাতুরিয়া ৩৬৩
সাপলেজা নদী ৩০
সাবিখান ৪৩৩
সাহাবাজ খাঁ ৬৩, ১৮৩
সায়েস্তা খাঁ ১০৫, ১৮৬, ২০১, ২০৬, ৩২২
সায়েস্তানগর ২০৩
সায়েস্তাবাদ ২০১, ৩৪৮
শাহাজাদপুর ২০৪
সিপাহী বিদ্রোহ ২২৫
সিদ্ধিকাঠি ২০৫
সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ২৫১
সিবাস্টিয়ান গঞ্জালে ৬১-৬২
সিয়ালগুনী ৫৭
সুগন্ধা ২৭
সুজাউদ্দিন ৩২২, ৩৭৫
সুজাবাদ ৬৪, ৪৪৬
সুতালড়ি ১৭০-৭১
সুগ্নি ৩১৭
সুন্দরবন ৩০৯
সুবর্ণগ্রাম/সোনার গাঁ ৫১
সুবোধ দাশগুপ্ত ৩৯৭
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫২, ৪১৮
সুলতান সুজা ২৯৪
সুলতানাবাদ ১৯০, ৩০৮
সেলিমাবাদ ১৪৪, ৩০৫
সোন্দবকুল ১৬৯, ১৭১
সৈয়দপুর ২১০, ৩০৮
সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ২২৯, ৪৬৬
সংগ্রামের কেল্লা ৬৭
সংগ্রাম নীল ৬৭
সংগ্রাম শাহ ৬৭
স্যর বিভারস টমসন ৩২৯
স্বরূপকাঠি ৪৫৪
হরিনাথ ৫২
হরিনাথ রায় চৌধুরি ২৬২
হোগলা ৬৬
হোসেন শাহ ৫৩
হুয়েন সাঙ ২৭, ৪৩
হাবেলি সেলিমাবাদ ৩৪৫

গ্রন্থতালিকা

Statistical Account of Bengal—Vol V–W. W. Hunter
Statistical Account of Sundarbans—W. W. Hunter
District of Backergang—H. Beveridge
বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার—১৯৮৪
বাঙ্গলীর ইতিহাস-আদিপর্ব—নীহারবঞ্জন রায়
স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল—হীরালাল দাশগুপ্ত
আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী—আবুল ফজল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত। কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ।
নবাবপুরের গল্পগুচ্ছ—সুবোধ দাশগুপ্ত
বঙ্গপ্রসঙ্গ—অসীমকুমার রায়
সুন্দরবনের ইতিহাস—এ. এফ. এম. আবদুল জলিল
ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়
চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস—বৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড
গৈলা থেকে বকসা—কালীপদ সেনগুপ্ত
সেদিনের কথা—মনিকুন্তলা সেন
সাময়িকী—মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ
বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস—ধনঞ্জয় দাসমজুমদার
বাখরগঞ্জের ভূগোল—প্রফুল্লকুমার গুহ
বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য
লোকসঙ্গীত রত্নাকর—আশুতোষ ভট্টাচার্য
দর্পণে বরিশাল—আভা সিংহ
স্মৃতিপরিক্রমা—বামনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

